চরিতাভিধান

FROM

THE REV. GEORGE HOWELLS,
B.A. (Lond. & Cantab.), B.D. (St. And.),
B. Litt. (Oxon.), Ph. D. (Tubengen),
Principal, Serampore College, Bengal.

DEAR SIR,

I examined with considerable interest your Bengali Biographical Dictionary. In these days of racial bitterness and animosity, a work as yours, dealing as it does, impertially and sympathetically with the great names of East and West, should prove of very real service not only to all intelligent Bengalis but to European Missionaries and officials working in Bengal. I wish you all success in your laudable undertaking and I shall be glad to become a subscriber to your work.

SERAMPORE COLLEGE,
2nd May, 1908.

Yours faithfully,
(Sd.) GEORGE HOWELLS.

FROM

THE REV. J. N. RAWSON,
B. D. (Lond.), B. Sc. (Lond.

I have seen part of Babu Upendra Chandra Mukherji's চরিতাভিধান. It attempts to give some account of the most famous men of all countries and should be useful to those who, through difficulties of language and expense, cannot find access to a good English Encyclopœdia.

To me the most interesting part of the book is the account it gives of the lives of eminent Indians and also the mass of information about Indian legend and mythology which I have never before seen gathered together in a form so convenient for reference. I have found the book especially useful as a guide to the maze of Pauranic literature.

DACCA,
2nd May, 1908

(Sd.) J. N. RAWSON.

FROM

BABU BIDHU BHUSAN GOSWAMI, M. A.
Professor of Sanskrit, Dacca College.

Charitabhidhan or a Biographical Dictionary in Bengali by Babu Upendra Chandra Mukherjee, being the only work of its kind, is an acquisition to the Bengali language and its literature. The author has taken great pains in writing short but full accounts of the "worthies" of ancient and modern India, Europe, Africa, &c in a clear and simple language, and has laid every Bengali reader under a deep debt of obligation and gratitude.

DACCA,
The 1st. March, 1908.

(Sd.) BIDHU BHUSAN GOSWAMI.

FROM

BABU RAJKUMAR DAS, M. A.
Headmaster, Dacca Collegiate School.

I have gone through the first hundred pages of Babu Upendra Chandra Mukherjee's *Charitabhidhan* or a Biographical Dictionary in Bengali. It is a surprise to find that in a wonderfully short time he has made a vast collection of noted names, modern and ancient, historical as well as mythological, not only of India but of several other countries too. In compiling this biographical dictionary he has evidently taken much pains in ransacking the the Hindu Pauranic literature, English works of reference, periodicals and every available

source of information for his materials. The work when published will undoubtedly be very valuable and prove a useful book of reference to students of Bengali. It is hardly possible for one man to bring out single-handed a work vast in its scope like this without running into the risk of making some errors in the method of treatment of accuracy and discrimination of facts and I am sure Babu Upendra Chandra Mhkherjee does not pretend to be above such defects, but taking as a whole the work is an undoubted evidence of his energy, labour and scholarship. This being the first attempt at compiling a comprehensive biographical dictionary in Bengali, it deserves every encouragement, which I am sure, it will receive from the Bengali-speaking educated public

I look forward to the completion of this dictionary with interest and can unhesitatingly say that it has given me much pleasure to peruse the earlier pages I am glad that Upendra Babu will ere long remove a long-felt want of our language and earn the gratitude of his educated countrymen.

March 1, 1908. (Sd.) RAJKUMAR DAS.

FROM

BABU MATHURANATH CHATTOPADHYAY, M. A,

Retired Inspector of Schools,

Dacca Division.

I have gone with great pleasure through 116 pages of the Biographical Dictionary named *Charitabhidhan* by Upendra Chandra Mukhopadhyay, Teacher, Dacca Training School. The author has rendered a great service to the country by bringing out this book, which is new of its kind. The labour he has bestowed in it, is laudable. When complete it will be a valuable addition to the Bengali literature. It should find a place in all school libraries for reference. Its language is simple and the price fixed is moderate.

March 8, 1908. (Sd.) MATHURA NATH CHATTOPADHYAY.

FROM

THE HON'BLE SYED NAWABALI CHOWDHURY

KHAN BAHADUR.

DEAR SIR,

I beg to thank you for your kindly presenting to me a copy of your *Charitabhidhan* in Bengali. The book appears to me to be a new venture in this direction of the Bengali language and it deserves to be encouraged by every lover of that language. I have not been able to go through the book fully but from a cursory glance I am very favourably impressed with your work and desire to see its full publication.

You have incorporated in your book Some Mahomedan characters also. I have not been able to test properly the accuracy of your accounts but your very attempt is laudable and ought to be encouraged by my community. The Mahomedan names have not been properly rendered in Bengali and I venture to suggest that if you consult men who are equally well versed in Arabic, Persian and Bengali, your work will be more perfect.

In conclusion, I wish your book every success and recommerd it to the patronage of Bengali reading public.

Yours faithfully,
(Sd.) SYED NAWABALI.

CHARITABHIDHAN

OR

A DICTIONARY OF BIOGRAPHY

AND

INDIAN MYTHOLOGY

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time."
Longfellow.

BY

UPENDRA CHANDRA MUKHERJEE,

Assistant Master, Dacca Normal School.

চরিতাভিধান

ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ঢাকা, সুতারনগর, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীবিপ্রেশ্বর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৮

মূল্য তিন টাকা

দ্বিতীয়বারের ভূমিকা।

চরিতাভিধান দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এবার ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। প্রথম খণ্ডে পৌরাণিক কালের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ঐতিহাসিক সময়ের জনগণের জীবনী সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালে যে সমুদয় ব্যক্তি ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে এবং যে সমুদয় ব্যক্তি ভারতবর্ষভিন্ন অপর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী তৃতীয় বা শেষ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইল। ইহাতে অন্যূন তিন শত নূতন জীবনী দেওয়া হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে এক শত মুসলমান ও দুই শত হিন্দু। এই সংস্করণে আসাম, শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের সমুদয় প্রসিদ্ধ জনগণের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের জীবনীসংগ্রহে গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ, গৌহাটী কর্জ্জন হলের গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ দে এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যানুশীলক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়গণের নিকট আমার ঋণ অপরিসীম।

জীবিত ব্যক্তির জীবনী লিখা বাঞ্ছনীয় নহে। প্রথম সংস্করণে কয়েকজন বৈদেশিক প্রসিদ্ধ জীবিত ব্যক্তির জীবনী প্রদত্ত হইয়াছিল কিন্তু এই সংস্করণে উহা পরিত্যক্ত হইল। প্রথম সংস্করণে বাঙ্গলা কাব্য হইতে চাঁদ সদাগর, খুল্লনা প্রভৃতি যে কয়টী কাল্পনিক চরিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইল। অনরেবল খান বাহাদুর সৈয়দ নবাবালী চৌধুরী সাহেব আমাকে মুসলমান ব্যক্তিদিগের নামের বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন; আমি এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বঙ্গাক্ষরে মুসলমান নামের ঠিক বানান হওয়া কঠিন। যাহা হউক এই সংস্করণে আমি খান বাহাদুরের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থের আকার ও মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সংস্করণের গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

ঢাকা
আশ্বিন, ১৮৩৩ শক

গ্রন্থকার

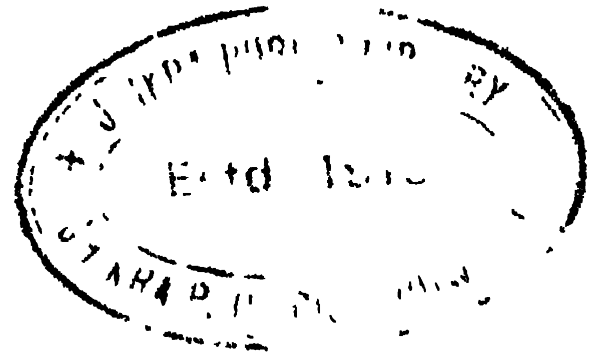
ভূমিকা।

চরিতাভিধান প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের এবং আফ্রিকা, আমেরিকা চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রসিদ্ধ জনগণের জীবনী সংগৃহীত ও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। জীবন-চরিত পাঠে দয়া মমতা, ভ্রাতৃস্নেহ গুরুভক্তি, স্বজাতি-প্রেম প্রভৃতি গুণে মানবহৃদয় স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হয়; এজন্য এত আয়াস স্বীকার করিয়া আমি জন সাধারণের হিতকল্পে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। এরূপ গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে; আশা করি, কোথাও ভ্রম দৃষ্ট হইলে, সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করিয়া বাধিত করিবেন। নানা কারণে জীবিতের জীবনী লিখা বাঞ্ছনীয় নহে, এজন্য অস্মদ্দেশীয় যশস্বী জীবিত ব্যক্তিবর্গের জীবনী পরিত্যক্ত হইল। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি রামায়ণ মহাভারত, দর্শনশাস্ত্র ও পুরাণাদি প্রকাশকগণের নিকট ঋণী। প্রামাণিকঅভিধানপ্রণেতা, সাময়িক পত্রিকা-প্রকাশক ও বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের উপদেষ্টাদের নিকটও আমার ঋণ কম নহে। ঢাকা ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক কনিষ্ঠসহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার রায় এম. এ., ঢাকা মাদ্রাসার সহকারী প্রধান শিক্ষক কাজী ইম্‌দাদুল হক্‌ বি. এ., এবং পণ্ডিত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন কবিরাজ মহাশয়গণ আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানারূপ পরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক উপকৃত করিয়াছেন; এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ঢাকা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৮৩০ শক।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সূচি



চরিতাভিধান।

প্রথম খণ্ড।

(পৌরাণিক যুগ)

অংশ—কশ্যপের পুত্র। অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। আদিত্যগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে খ্যাত ছিলেন, পরে বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণুপুরাণ)

অংশু—বিষ্ণুপুরাণমতে ইনি পুরুহোত্রের পুত্র। কিন্তু ভাগবতে পুরুহোত্রের পুত্রের নাম আয়ু। কূর্ম্মপুরাণে অংশু একজন রাজা এবং তিনি অন্ধুর পুত্র।

অংশুধর—সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা। (অসমঞ্জ দেখ)

অংশুমান্—সূর্য্যবংশীয় সগররাজের পৌত্র এবং অসমঞ্জের পুত্র। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র অপহৃত যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া পাতালে মহর্ষি কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত হন। পুত্রগণের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া সগর নিজ পৌত্র অংশুমান্‌কে প্রেরণ করেন। ইনি পাতালে গমন করিয়া স্তবে মুনির সন্তোষবিধানপূর্ব্বক অশ্ব আনয়ন করেন এবং পক্ষিরাজ গরুড়ের নিকট হইতে গঙ্গার পবিত্র জলে কিরূপে সগর বংশের উদ্ধার হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। (হরিবংশ ও মহাভা-বন, ভগীরথ ও সাগর দেখ)

অকম্পন—রাবণের সেনাপতি বিশেষ। বানরেন্দ্র হনুমান্ ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। ইনি রাবণের মাতুল। প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ ইঁহার ভ্রাতা; পিতা সুমালী; মাতা কেতুমালী। রাবণের মাতা কৈকসী ইঁহার ভগিনী; কুম্ভীনসী ইঁহার অপরা ভগিনী। (আর্ষ রামায়ণ)

অকায়—রাহুর নামান্তর। ইহার শরীর নাই বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

অকৃশাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইঁহার পিতার নাম সংহতাশ্ব। (হরিবংশ)

অক্রূর—লোকে ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া জানে। ইঁহার পিতা শ্বফল্ক, মাতা গান্দিনী; লোকে ইনি গান্দিনী-সুত বলিয়া পরিচিত। ইঁহার পরামর্শে শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎকে বধ করিয়া তদীয় স্যমন্তক মণি অপহরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শতধন্বা অক্রূরকে স্যমন্তক দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পলায়নে অসমর্থ হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। স্যমন্তকের গুণ এই যে, ইহা প্রত্যহ রাশি রাশি সুবর্ণ প্রসব করে এবং অনাবৃষ্টি নিবারণ করে। এই মণির গুণে অক্রূর ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞাদি অনায়াসে সম্পন্ন করিতেন। একদা কোন কারণ বশতঃ অক্রূর দ্বারকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, ইহাতে দ্বারকায় অনাবৃষ্টি হয়, এবং বহু লোকের ক্ষয় হয়।

অক্রূর মথুরাধিপতি কংসের ভবনে থাকিতেন। কৃষ্ণবলরামের বধের জন্য কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তাঁহাদিগকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। যদুবংশোদ্ভব অক্রূর যাদবদিগকে কংসের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য কংসের ষড়যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে কংসবধের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় গমন করিয়া কংসকে নিহত করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

অক্রোধন—ইনি কুরুবংশোৎপন্ন জনৈক রাজপুত্র। ইঁহার পিতার নাম অযুতায়ুস।

অক্ষপাদ—বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক ঋষি। ইঁহার প্রকৃত নাম গোতম। কথিত আছে যে, বিখ্যাত বেদব্যাস গোতম-প্রণীত ন্যায়সূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি ব্যাসের মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন; কিন্তু ব্যাসের অনুনয়ে তিনি প্রীত হইয়া চক্ষুতে তাঁহাকে না দেখিয়া পায়ে চক্ষু সৃষ্টি করেন, এবং তদ্দ্বারা ব্যাসের মুখ দেখেন। তদবধি তিনি অক্ষপাদ নামে অভিহিত।

ইনি ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করেন, এজন্য ন্যায়দর্শনের অপর নাম অক্ষপাদ দর্শন। সকল হিন্দুদর্শনই সূত্রাকারে লিখিত; এজন্য অনুমান হয় সংস্কৃত সাহিত্যের যে কাল সূত্রপ্রধান সেই কালেই ন্যায়াদি দর্শন সকলের আবির্ভাব হইয়াছে। আচার্য্য ম্যাক্স্‌-মূলরের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে ২০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত এই কালের বিস্তৃতি; সুতরাং ন্যায়দর্শনপ্রণেতা অক্ষপাদ এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। এই দর্শনে ৫২৮টী সূত্র আছে; এই সূত্রগুলি ৫ অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায় দুইটী আহ্নিকে বিভক্ত। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, মহর্ষি অক্ষপাদ ১০ দিনে এই দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। এই দর্শনে ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই দর্শনকারের মতে আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংসই মুক্তি, এই মুক্তি সম্পাদনের জন্য ন্যায়দর্শন প্রণীত হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারেনা; অতএব আত্মাকে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ করিতে হইবে; এই অবস্থায় নীত হইলেই আত্মার মুক্তি। আত্মাকে পাষাণাদি জড়পদার্থের ন্যায় সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানাদির অতীত করিতে হইবে। আত্মার জড়াবস্থাপ্রাপ্তিই মুক্তি। এই নিমিত্ত নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাক্ ন্যায়দর্শনপ্রণেতাকে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আত্মার জড়াবস্থাপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি উপদেশ করিতেছেন, তিনি প্রকৃতই 'গো-তম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গো পশু তুল্য।"

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্র মূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তমবেত্যৈব যথাবিত্ত তথৈব সঃ॥"

ন্যায়দর্শনের অপর একটী নাম আন্বীক্ষিকী। অন্বীক্ষা শব্দের অর্থ শ্রবণের পর আত্মার আলোচনা। এই দর্শনে অন্বীক্ষা সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম আন্বীক্ষিকী বিদ্যা হইয়াছে। এই দর্শন ভালরূপে আলোচনা করিলে তর্কশক্তি বৃদ্ধি পায়, এজন্য ইহার অপর নাম তর্কশাস্ত্র। এই দর্শনে চারিপ্রকার প্রমাণ অবলম্বিত হইয়াছে, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ (আপ্তোপদেশ)। চার্ব্বাক্ ব্যতীত সকল দর্শনেই অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। চার্ব্বাক্ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য করেন নাই। (চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার)

অক্ষয়কুমার—রাবণের পুত্র; মন্দোদরীর গর্ভে জাত। সীতান্বেষণে হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া যখন রাবণের প্রমোদভবন ভগ্ন করেন, তখন রাবণ ইহাকে হনুমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে হনুমানের হস্তে অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। (রামায়ণ)

অগস্ত্য—এই মহর্ষি মিত্রাবরুণের পুত্র। ইঁহার পূর্ব্ব নাম মান; পরে বিন্ধ্যপর্ব্বতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ইনি অগস্ত্য-নামে প্রসিদ্ধ হন। মিত্রাবরুণ আদিত্যযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তথায় স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশীকে দেখিয়া ইঁহাদের রেতঃস্খলন হয়। রেতের যে ভাগ কুম্ভে পড়ে তাহা হইতে অগস্ত্য ও স্থলে পতিত অংশ হইতে বশিষ্ঠ উদ্ভূত হন। অগস্ত্যের আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় হইয়াছিল; এই আকার পরিমিত; এজন্য এই ঋষির নাম মান হইল। (বৃহৎসংহিতা) এই ঋষি

শ্বেত নামক দিব্যপুরুষকে নরমাংসভক্ষণরূপ ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিয়া উক্ত দিব্যপুরুষ হইতে অ... লাভ করেন। এই মহাতপা ঋষির অসাধারণ তপোবল ছিল। কালকেয় নামক অসুরগণ বৃত্রাসুর বধের পর দেবতাদিগের ভয়ে সমু... লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। ইহারা রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে উঠিয়া মুনিদিগকে বধ করিত এবং তাঁহাদের প... তপোবন লণ্ডভণ্ড করিত। ঋষিরা প্রাণভয়ে আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিলেন; ইহাতে ক্রিয়াকাণ্ড সমুদয় লুপ্তপ্রায় হইল। দেবতাগণের অনুরোধে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদ্র পান করেন; ইহাতে কালকেয়গণ পলায়ন করিতে অক্ষম হইয়া দেবতাদিগকর্ত্তৃক অনায়াসে আক্রান্ত ও নিহত হইল। বিন্ধ্যপর্ব্বত গর্ব্বিত হইয়া সূর্য্যের গতি ... করে। দেবগণের অনুরোধে ইনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট গমন করেন। বিন্ধ্য গুরুকে প্রণাম করিলে, ঋষি স্বীয় প্রত্যাব... পর্য্যন্ত পর্ব্বতকে তদবস্থায় থাকিতে বলিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন, আর ফিরিলেন না। তদবধি বিন্ধ্য আর মস্ত... উত্তোলন করিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। এই ঘটনা ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে ঘটে; এজন্য ১লা ভা... যাত্রা নিষিদ্ধ; হিন্দু পঞ্জিকায় ইহা অগস্ত্যযাত্রা নামে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু লৌকিক আচারে সকল মাসের প্রথম দিনে... যাত্রাই অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া নিষিদ্ধ। (মহাভা-বন) বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্প হরণের পর অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে বাস করিতে লাগিলেন আধুনিক চিন্তাশীলেরা অনুমান করেন যে, কালকেয়গণ বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জলদস্যু এবং অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্যে গমন ও তাহার নিকট বিন্ধ্যপর্ব্বতের মস্তক নমন, এই দুই ঘটনা হইতে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতার প্রথ... সূচিত হইতেছে।

এক দিবস অগস্ত্য স্বীয় পিতৃগণকে এক গর্ত্তে লম্বমান হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতে দেখেন। অগস্ত্যের ... সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহাদের এই দুর্গতির অবসান হইবে জানিতে পারিয়া, পিতৃগণের অনুরোধে অগস্ত্য বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত রমণীর অভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীর উৎকৃষ্ট অঙ্গ লইয়া এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী রমণীর সৃষ্টি করেন। ঋষির অনুরোধে বিদর্ভরাজ ইহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। বিদর্ভরাজ এই কন্যার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। কালক্রমে লোপামুদ্রা যৌবনে পদার্পণ করিলে অগস্ত্য বিদর্ভরাজের নিকট লোপামুদ্রাকে প্রার্থনা ক... বিদর্ভরাজ লোপামুদ্রার সম্মতিক্রমে তাহাকে বিধিপূর্ব্বক অগস্ত্যের সহিত পরিণীতা করেন। লোপামুদ্রা অগস্ত্যের স... গমনকালে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়া চীর ধারণ করিলেন। একদিন লোপামুদ্রা অলঙ্কার পরিধা... বাসনা প্রকাশ করাতে, ঋষি পত্নীর সন্তোষসম্পাদনার্থ অর্থান্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ রাজা শ্রুতর্ব্বার ... এবং পরে ব্রধ্নশ্বর ও ত্রসদস্যুর নিকট গিয়া অর্থ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাদের রাজ্যের আয়ব্যয় পর্য্যালোচনা করি... তাহাদিগের নিকট অর্থগ্রহণ করিলেন না। এই রাজগণ অগস্ত্যকে প্রহ্লাদবংশীয় ধনাঢ্য দানবরাজ ইল্বলের নিকট উপস্থিত করিলেন। ইল্বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপি কোন ব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভের বর প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে, উভয় ভ্রাতা ব্রাহ্মণবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়। ইহারা এমন মায়াবী যে ইল্বল কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপিকে মেষরূপে পরিণত করিয়া ব্রাহ্মণের আহারার্থ অর্পণ করিত। ব্রাহ্মণ মেষরূপী বাতাপির মাংস ভক্ষণ করিলে ইল্বল কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন... উচ্চারণপূর্ব্বক ডাকিবা মাত্র বাতাপি ব্রাহ্মণের উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত। অগস্ত্য ইল্বলের নিকট ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে মায়াবী দানব উক্তরূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপির মাংস ভক্ষণ করায়। মহর্ষি অগস্ত্য মেষরূপী বাতাপি মাংস খাইয়া উহা জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইল্বল বাতাপিকে ডাকিলে মুনি বলিলেন যে, তিনি তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইল্বল ইহাতে ভীত হইয়া মহর্ষিকে প্রচুর অর্থ দান করেন। (কাহারো মতে ইল্বল মহর্ষির নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল)। ইল্বল হইতে ধনরাশি গ্রহণ করিয়া মহর্ষি উহা সাধ্বী লোপামুদ্রার হস্তে অর্পণ করেন এবং উক্ত ধনদ্বারা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া পত্নীর সন্তোষ সম্পাদন করেন। অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক লোপামুদ্রা স্বামীর সহিত সঙ্গত হইয়া অন্তর্ব্বত্নী হন। ৭ বৎসর গর্ভ ধারণের পর লোপামুদ্রা ইধ্মবাহ নামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন। অনন্তর অগস্ত্যের পিতৃগণ সদ্গতি লাভ করেন। অগস্ত্য বহু বেদমন্ত্রের রচক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অক্রুর মথুরাধি·

রাম বন[illegible]লে অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলে মুনি তাঁহাকে ধনু, অক্ষয়তূণীর ও খড়্গ দান করেন। অগস্ত্য এত তাপসম্পন্ন [illegible] হইলেও তাঁহাকে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত নহুষের যান বহন করিতে হইয়াছিল। নহুষ শিবিকাবাহী অগস্ত্যকে পদাঘাত করায় [illegible]নি ক্রোধে দেবচ্যুত হইয়া ইন্দ্ররূপী নহুষকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করেন যে "তুমি দশ সহস্র বৎসর সর্পরূপ ধারণপূর্ব্বক ম[illegible]লে গিয়া বাস কর।"

ধ্বংস পাপ পরিভ্রস্টঃ ক্ষীণপুণ্যো মহীতলম্।

দশবর্ষ সহস্রাণি সর্পরূপধরো মহান্॥" (রামায়ণ ও মহাভা-বন)

অগ্নি—ঋগ্বেদের প্রায় সকল মণ্ডলেই এই দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, ইনি পরমপুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন। কোন স্থলে দেখা যায় যে, ইনি ধর্ম্মের ঔরসে ও বসুভার্য্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। অপর কোন পুরাণে দৃষ্ট হয় যে ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন দিক্‌পাল; দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ইঁহার অবস্থিতি। ইনি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ; ইঁহার চক্ষু, ভ্রূ, কেশ পিঙ্গলবর্ণ; ইনি হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র ধারণ করেন এবং ইঁহার বাহন ছাগ। কোথাও এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় যে, তাঁহার তিন পা, সাত হাত, দুই মুখ এবং বর্ণ বালার্কের ন্যায় রক্ত। অগ্নিদেবের পুত্র সংখ্যা ৪৮টি; সুতরাং স্বয়ং অগ্নিদেবকে লইয়া মোট অগ্নি সংখ্যা ৪৯টি। ভারতের মতে এই সমুদয় অগ্নির নাম মাত্র; বিভিন্ন হোমে অগ্নির বিভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়। অমরকোষে অগ্নি ত্রিবিধ, যথা—দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, অগ্নি দ্বিবিধ, যথা—ভাণ ও অভাণ। অগ্নির পত্নীর নাম স্বাহা। এপত্নীর গর্ভে পাবক (বৈদ্যুতাগ্নি), পবমান (ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি) এবং শুচি (সৌরাগ্নি) নামে তিন পুত্র জন্মে। পাবকের পু কব্যবাহন পিতৃগণের অগ্নি, শুচির পুত্র হব্যবাহন দেবতাগণের অগ্নি এবং পবমানের পুত্র সহরক্ষ অসুরগণের অগ্নি। বধারা নামে অগ্নির অপর এক স্ত্রী ছিল; এই স্ত্রীর গর্ভে অগ্নির ৪৫টি পুত্র জন্মে।

অগ্নিবর্ণ—সূর্য্যবংশীয় রাজা সুদর্শনের পুত্র। ইনি একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা। সুদর্শন ইঁহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করতঃ নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলে পর, ইনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠেন। প্রজাগণ তাঁহার দেখা পাইত না; মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ইনি দিবারাত্র অন্তঃপুরেই থাকিতেন। অতিরিক্ত দোষে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া ইনি অকালে কালকবলে পতিত হন। (রামায়ণ)

অগ্নিবাহু—রাজা প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও কাম্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ছিলেন। (উত্তম দেখ)

অগ্নিবেশ—ইনি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা নামে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থের প্রণেতা। আত্রেয় মুনির নিকট ইনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অগ্নিবেশ্মন্—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

অগ্নিবেশ্য—ইনি অগ্নির পুত্র। ইনি ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের পিতা ভরদ্বাজের নিকট ইনি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। গুরু ভরদ্বাজ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে এক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করেন। বিখ্যাত দ্রোণাচার্য্য ইঁহার নিকট ধনুর্বিদ্যা লাভ করেন। ইনি গুরুপ্রদত্ত আগ্নেয়াস্ত্র গুরুপুত্র ও নিজ শিষ্য দ্রোণকে অর্পণ করেন।

অগ্নিশর্ম্মন্—একজন কোপনস্বভাব প্রাচীন ঋষি। সচরাচর লোকে যে কোন কোপনস্বভাব ব্যক্তিকে ইঁহার সহিত তুলনা করিয়া থাকে।

অগ্নীধ্র—ইনি রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠপুত্র; তদীয় পত্নী কাম্যার গর্ভজাত। প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ইনি সাতপুত্রকে সাত দ্বীপ বিভাগ করিয়া দেন। অগ্নীধ্রের ভাগে জম্বুদ্বীপ পড়িয়াছিল। ইঁহার ৯ পুত্র, যথা—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান্। এই ৯ পুত্র জম্বুদ্বীপ ৯ অংশে বিভক্ত করিয়া শাসন

করেন এবং নিজ নিজ রাজ্য স্বীয় স্বীয় নামানুসারে প্রথিত করেন। রাজা নাভির পুত্র ঋষভ। ঋষভের বহুপুত্র, তন্মধ্যে ভরত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ঋষভ জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বনগমন করেন, তদবধি তদীয় রাজ্য ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়।

অঘাসুর—এই দানব বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; পুতনা ইহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পুতনা বধের পর এই দানব কংস কর্ত্তৃক কৃষ্ণবধার্থ বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ গোপালগণের সঙ্গে গোষ্ঠে গরু চড়াইতেছিলেন, তখন এই দানব অজগরের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া বসিয়াছিল। ইহার অধর ওষ্ঠ ধরায় পতিত ও উত্তর ওষ্ঠ জলধরে সংলগ্ন হইয়াছিল; দুই স্রুক্কণী (ওষ্ঠপ্রান্ত) পর্ব্বত গুহার ন্যায় বিস্তীর্ণ রহিয়াছিল। ইহার দন্ত সকল গিরিশৃঙ্গ তুল্য, মুখবিবর গাঢ় অন্ধকার সমাচ্ছন্ন এবং জিহ্বা বর্ত্মের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

গোপবালকগণ বৎসবৃন্দসহ এই অসুরের উদরে অতর্কিতভাবে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অবগত হইয়া ইহার বদন-বিবরে প্রবেশ করিলেন। কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া দানব প্রাণত্যাগ করিল। শ্রীকৃষ্ণ আপনার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা বয়স্যগণের প্রাণদান করিলেন। (শ্রীমদ্ভা—১০ম)

অঘোর—শিবের অপর নাম। অঘোরপন্থী বা অঘোরী নামে এক শ্রেণীর শৈব সম্প্রদায় আছে। ইহারা নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন এবং ঘৃণা ও বিকার রহিত। অপক্ক মাংস, মদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত অখাদ্য বস্তু, লোকে যাহা কিছু দেয়, এমন কি নিজের মলমূত্র পর্য্যন্তও ইহারা অম্লানবদনে খাইয়া থাকে। বিকারশূন্য হওয়াই ইহাদের ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র। অধুনাতন অঘোরীরা গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা না পাইলে, তাহার গৃহে মলমূত্র নিক্ষেপ করিয়াও বহুপ্রকার কুৎসিত আচরণে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া থাকে।

অঙ্গ—বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। ইহার অধিকৃত রাজ্য ইহার নামানুসারে আখ্যাত হইয়াছে। জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল বোধ হয় অঙ্গদেশ নামে আখ্যাত হইত। এই স্থানে এখন গঙ্গার উত্তর তীরে ছাপরা জেলা এবং দক্ষিণ তীরে আরা জেলা। রামায়ণের সময় এই আরা জেলা নিবির জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল, উহা তখন তারকা রাক্ষসীর বন ছিল; মহাভারতের সময় উহা অঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল। দুর্য্যোধন কর্ণকে এই অঙ্গরাজ্যের অধিপতি করেন। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধনাদি সকলেই দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতেন। বসুষেণও—যিনি পরে অঙ্গকর্ত্তনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করিয়া কর্ণনামে খ্যাত হইয়াছিলেন—তখন কৌরবদিগের সহিত থাকিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতেন; কিন্তু তখনও তিনি সুপরিচিত হন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি অর্জ্জুনের সঙ্গে একবার অস্ত্র চালনে প্রতিযোগিতা করেন; কিন্তু বসুষেণ (কর্ণ) রাজপুত্র বা রাজা নহেন এজন্য অর্জ্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এইরূপ অবজ্ঞাত হইলে পর দুর্য্যোধন সখা বসুষেণকে অঙ্গ প্রদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। অঙ্গের জন্ম বিবরণ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে:—উতথ্যকুমার জন্মান্ধ বেদজ্ঞ ঋষি দীর্ঘতমা প্রদ্বেষীনাম্নী রূপলাবণ্যসম্পন্না এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রদ্বেষীর গর্ভে গৌতম প্রভৃতি কয়েকটী পুত্রের উৎপত্তি হয়। প্রদ্বেষী অন্ধপতি ও সন্তানগণের প্রতিপালনে ক্লান্ত হইয়া পতিসেবায় পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দীর্ঘতমা তদ্দর্শনে নিয়ম করিলেন যে "অদ্যাবধি স্ত্রীজাতিকে একমাত্র পতির অধীন থাকিতে হইবে; জীবিত কিম্বা মৃত পতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়া যদি কোন নারী পত্যন্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পতিত হইতে হইবে। আর বিধবাগণ সমৃদ্ধিভোগের অধিকারিণী হইবে না; বিধবাগণের সমৃদ্ধিভোগ তাহাদের কলঙ্কের হেতু হইবে।" স্বামীর বাক্যে প্রদ্বেষী কুপিত হইয়া তাহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপকরিতে পুত্রগণকে আদেশ করিলেন। নিষ্ঠুর পুত্রগণ মাতার আজ্ঞায় অন্ধ পিতাকে উড়ুপে (ভেলায়) বন্ধন করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। ভেলা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘতমা স্রোতোবেগে বলিরাজের রাজধানীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। বলিরাজ গঙ্গাস্নানে নিরত ছিলেন; ঋষিকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত

হইলেন এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক নিজভবনে আনয়ন করিলেন। রাজমহিষী সুদেষ্ণা নিঃসন্তান ছিলেন; রাজা মহর্ষিকে স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ধর্ম্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। ঋষি সম্মত হইলে রাজা সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। সুদেষ্ণা ঋষিকে অন্ধ ও বয়োবৃদ্ধ দেখিয়া তাহার নিকট গেলেন না, কিন্তু আজ্ঞা লঙ্ঘনে স্বামীর অসন্তোষের হেতু হইবেন মনে করিয়া স্বীয় পরিচারিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঋষি এই পরিচারিকার গর্ভে কাক্ষিবৎ প্রভৃতি একাদশটী পুত্রের উৎপাদন করিলেন। রাজা এই পুত্রদিগকে নিজ পুত্র মনে করিয়া যখন তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার্থ রাজযোগ্য বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন দীর্ঘতমা রাজাকে বলিলেন "মহারাজ, এই সমুদয় পুত্র আপনার নহে; ইহারা রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে উৎপন্ন হয় নাই; রাজমহিষী আমাকে অন্ধ মনে করিয়া ঘৃণা বশতঃ স্বীয় পরিচারিকাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।" রাজা ইহা অবগত হইয়া মহিষী সুদেষ্ণাকে ঋষির নিকট যাইতে বাধ্য করিলেন। দীর্ঘতমা মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করেন; ইহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণাকে বলিলেন "তোমার পুত্রগণের অধিকৃত রাজ্যসমূহ তাহাদের নামে খ্যাত হইবে।" (মহাভা-আদি)

অঙ্গদ—রামায়ণ-প্রসিদ্ধ কিষ্কিন্ধ্যাপতি কপিরাজ বালির পুত্র। ইঁহার মাতার নাম তারা। রামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি সুগ্রীবের কপিবাহিনীর সহিত লঙ্কাসমরে উপস্থিত হইয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। অঙ্গদ এক দিবস ইন্দ্রজিৎকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। (রামায়ণ)

অঙ্গরাজ—অঙ্গদেশের অধিপতি কর্ণ। অঙ্গদেশ গঙ্গা-সরযূর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত; ইহা বর্ত্তমান আরা জেলা। কাহারো মতে বর্ত্তমান বৈদ্যনাথ হইতে পুরী জেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ অঙ্গদেশ নামে আখ্যাত। দুর্য্যোধন কর্ণকে এই রাজ্য দান করেন। (কর্ণ দেখ)

অঙ্গিরস্ (অঙ্গিরাঃ)—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইঁহার দুই পুত্র—উতথ্য, বৃহস্পতি। বৃহস্পতি কনিষ্ঠ। বৃহস্পতির জন্মবিবরণ এইরূপ:—পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা স্বীয় আশ্রমে তপোনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অগ্নি সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। তিনি অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সন্তপ্ত ...নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু ইহার কোন কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, বোধ হয় ব্রহ্মা লোকের ... অন্য এক অগ্নি সৃষ্ট করিয়াছেন, যেহেতু বহু দিবস তপস্যা করাতে আমার অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ...রি? কিরূপে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হই? ভগবান্ হুতাশন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই হুতাশনতুল্য ...ক দর্শন করিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র স্বীয় তেজ প্রকটন ... জগতের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হউন; বিধাতা অন্ধকার নাশের জন্য আপনার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আপনার ...র আপনি গ্রহণ করুন। অগ্নি কহিলেন, লোকমধ্যে আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, আপনি এক্ষণে হুতাশনত্ব প্রাপ্ত ...ন; লোকে আপনাকেই অগ্নি বলিয়া জানিবে, আমাকে কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে না; অতএব আমি অগ্নিত্ব ... করিতেছি; আপনিই প্রথম অগ্নি হউন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হইব। অঙ্গিরা কহিলেন, আমি আপনার অধিকার ...ব না, আপনি অগ্নি হইয়া হবির্বহন দ্বারা প্রজাগণের স্বর্গলাভের পথ পরিষ্কার করুন, এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ ...য়া একটী পুত্র সন্তান আমায় দান করুন। হুতাশন সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় স্বীয় তেজ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বরে ...পতি নামে অঙ্গিরার এক পুত্র জন্মিল। (মহাভা-বন)

অঙ্গিরা একজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষি; ইঁহার প্রণীত স্মৃতি গ্রন্থের নাম অঙ্গিরঃসংহিতা। ইনি সপ্তর্ষি মণ্ডলের অন্তর্গত

অঙ্গের নামান্তর

অজ—(১) অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা ; মহারাজ রঘুর পুত্র। বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতী স্বয়ংবর-প্রথানুসারে ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। বিবাহের পর অজ ইন্দুমতীকে নিয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত নৃপতিবৃন্দ ইন্দুমতীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অজ সম্মোহন অস্ত্রে নৃপতিদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অচেতন করিয়া ইন্দুমতীসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জয়বার্ত্তা শুনিয়া মহারাজ রঘু পুত্র ও পুত্রবধূকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যথাকালে রঘুরাজ অজের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ইন্দুমতীর গর্ভে রাজা দশরথ জন্ম গ্রহণ করেন। দশরথের বাল্যাবস্থায় ইন্দুমতী প্রাণত্যাগ করেন। অজ দশরথের যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপর দারপরিগ্রহ না করিয়া রাজ্য শাসন করেন। দশরথ যৌবন প্রাপ্ত হইলে অজ তাঁহার হস্তে রাজ্যভার দিয়া অনশন-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক গঙ্গাসরযূর সঙ্গমস্থলে দেহত্যাগ করেন। (ইন্দুমতী দেখ)। (রঘুবংশ)

(২) ভাগবতের মতে ইনি একজন রুদ্র ; কিন্তু বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য পুরাণে রুদ্রগণের মধ্যে অজের নাম দেখা যায় না।

(৩)—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কামদেবের নামান্তর।

অজমীঢ়—চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা, ইঁহার পিতার নাম হস্তী। রাজা হস্তীর নামানুসারে তদীয় রাজধানী হস্তিনাপুর-নামে খ্যাত হইয়াছে। বিখ্যাত কৌরব দুর্য্যোধন এই হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন।

অজমুখ—দক্ষপ্রজাপতির অপর নাম। দক্ষ স্বীয় জামাতা শিবের অপমানের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে শিব ও সতী ব্যতীত সমস্ত দেব দেবী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হইতে যাত্রা করিলেন। মহাদেব বাধা দিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সতী, কালী তারা প্রভৃতি মূর্ত্তি প্রারিগ্রহ করাতে শিব ভীত হইয়া পলায়ন করেন। সতী পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে দক্ষ তাঁহার সমক্ষেই শিবনিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। সতী পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের সময় সতী পিতাকে বলেন "যে মুখে আপনি আমার পতিনিন্দা কারলেন, সে মুখ ছাগ-মুখ হউক। [illegible] দক্ষালয়ে আসিয়া যজ্ঞধ্বংস করেন এবং দক্ষের মস্তক ছিন্ন করেন। শাশুড়ীর স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া মহাদেব দক্ষের প্রাণদান করেন, কিন্তু কণ্ঠচ্ছিন্ন হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে এক ছাগ-মুণ্ড কণ্ঠে সংযোজিত করিয়া দেন। সতীর অভিশাপ সফল হইল এবং তদবধি দক্ষের নাম অজমুখ হইল।

অজাতশত্রু—(১) যুধিষ্ঠিরের নামান্তর। যুধিষ্ঠির কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করিতেন না, এজন্য তাঁহার এই আখ্যা।

(২) উপনিষদুক্ত একজন রাজা। এই নৃপতির রাজধানী বারাণসী। ইনি সমগ্র বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি গার্গ্য ইঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য গমন করেন। রাজা অজাতশত্রু আহ্লাদের সহিত মহর্ষির নিকট তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাকে সহস্র ধেনু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। কিন্তু অজাতশত্রু শাস্ত্রে এত ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, গর্গ তাহাকে উপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক নিজেই রাজার নিকট অনেক উপদেশ নিয়া আসিলেন।

অজামিল—এক দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ। ইনি প্রথমে অতি সাধু, অহিংসাপরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন ; অহঙ্কার-শূন্য হইয়া ইনি সর্ব্বদা গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবা করিতেন। কিন্তু পরে অসৎসংসর্গে পড়িয়া অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া উঠেন। দাসীগর্ভে ইঁহার দশটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল ; ইহাদের একটীর নাম 'নারায়ণ' রাখিলেন। মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে ইনি 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলিয়া পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রথমে যমদূত ইহাকে নিতে আসিলেন, কিন্তু 'নারায়ণ' নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত সুতরাং যমদূত ও বিষ্ণুদূতে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। যমদূত বলিলেন 'এই পাপীকে শাস্তি পাইতেই হইবে' ; বিষ্ণুদূত বলিলেন 'ভগবানের নাম উচ্চারণে এই ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হইয়াছে, অতএব এ ব্যক্তি বৈকুণ্ঠগমনের অধিকারী।' লোকপ্রবাদ যে, অজামিল এইরূপে মরিয়া বিষ্ণুদূতকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হইলেন। কিন্তু ভাগবতে অন্যরূপ বর্ণনা আছে। যমদূত ও বিষ্ণুদূতে যখন তর্কবিতর্ক হইতেছিল তখন ইঁহার বিকার

ত্যাগ হইল। কিন্তু যমদূত ও বিষ্ণুদূতের আলাপ তাঁহার স্মরণ ছিল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন যে, যখন পুত্রচ্ছলে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণেই সিদ্ধ পুরুষগণের দর্শন হইল, তখন বাস্তবিক আরাধনায় না জানি কত ফল! তিনি ইহা চিন্তা করিয়া সর্ব্বপ্রকার মায়া কাটাইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন এবং হরিদ্বারে গমন করিয়া ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তথায় ইন্দ্রিয়গণ সংযত করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন এবং তৎপর একাগ্রতার দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া উহা ভগবানে স্থাপন করিলেন। এই সময়ে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূত আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

অজিত—দেবগণবিশেষ। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে জয় নামে দ্বাদশ জন দেবতার সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইঁহারা ধ্যানে নিরত থাকিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি বিস্তারের ব্যাঘাত জন্মান। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি না হওয়াতে ব্রহ্মা ইঁহাদিগকে অভিসম্পাত করেন। ব্রহ্মার অভিশাপে ইঁহারা সাত মন্বন্তর পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সপ্ত মন্বন্তরে ক্রমে অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

অঞ্জনা—রামায়ণপ্রসিদ্ধ কপীন্দ্র হনুমানের মাতা। ইঁহার স্বামী কপিরাজ কেশরী। হনুমান্ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র। পবনদেবের ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান্ জন্মগ্রহণ করেন।

অণীমাণ্ডব্য—ইনি একজন সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, মৌনাবলম্বী, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ। একদা এই ব্রাহ্মণ স্বীয় আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদল তস্কর আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। তাহাদের অনুসরণকারী নগরপালেরা তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে তস্করদের গতিবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মাণ্ডব্য মৌনাবলম্বী হওয়ায় তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। চোরেরা ইত্যবসরে অপহৃত সামগ্রী আশ্রমে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। রাজপুরুষেরা স্তেয়ধন মাণ্ডব্যের আশ্রমে দেখিতে পাইয়া তস্কর সন্দেহে তাহাকেও ধৃত দস্যুদলের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত করিলেন। রাজা নগরপালের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দস্যুগণের সহিত তাঁহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। রাজপুরুষেরা রাজাজ্ঞায় মাণ্ডব্যকে শূলে আরোপিত করিলেন। ধ্যানমগ্ন [illegible] অনাহারে বহুকাল জীবিত রহিলেন। নগরপালেরা ঋষির জীবনধারণের সংবাদ রাজার নিকট জ্ঞাপন করিলে, রাজা স্বয়ং মাণ্ডব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ঋষি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে ক্ষমা করিলেন। রাজা ঋষিকে অবতরণ করাইয়া শূল বহির্গত করিতে বহুচেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া শূলের বাহিরের অংশ কর্ত্তন করিয়া দিলেন। মাণ্ডব্য সেই অন্তর্গত শূলাগ্র বহন করিয়া সর্ব্ব তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তদবধি মুনি অণীমাণ্ডব্য (অণী অর্থাৎ শূলাগ্র বহনকারী মাণ্ডব্য) নামে খ্যাত হইলেন। একদা এই ঋষি যমসদনে গমনপূর্ব্বক যমরাজকে নিজের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন "আপনি এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ঋষি বলিলেন যে "আপনি আমার লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিয়াছেন, এজন্য আপনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবেন।" যম মুনির শাপে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা—আদি)।

অতিকায়।—লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। ব্রহ্মা ইহাকে এক কবচ প্রদান করেন। এই কবচের বলে অতিকায় সুরাসুরের অবধ্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের সহিত ঘোর যুদ্ধে ইনি হত হন। (রামায়ণ—লঙ্কা)।

অতিথি।—মহারাজ কুশের পুত্র ও রামচন্দ্রের পৌত্র। কুমুদ নামক নাগরাজের ভগিনী কুমুদ্বতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম।

অত্রি।—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা অনসূয়া ইঁহার পত্নী; এবং মহর্ষি দুর্ব্বাসা ও চন্দ্র ইঁহার পুত্র। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে মনু হইতে দশজন প্রজাপতির জন্ম হয় এবং অত্রি ইঁহাদের অন্যতম। ইঁহার নেত্র হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছে

"নেত্রাভ্যাং বারি সুস্রাব দশধাদ্যোতয়দ্দিশঃ।
পপাত ভাসয়ন্ লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ॥ (হরিবংশ)

অথর্ব্বা—ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ দেন। ইনিই প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করিয়া আর্য্যদের মধ্যে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করেন। পূর্ব্বে সমস্ত পদ্যময়, গদ্যময় ও গীতিময় বৈদিক মন্ত্র একত্র বিমিশ্র ছিল; এই অবস্থায় এই ত্রিবিধ রচনাবলী সমন্বিত বৈদিক মন্ত্রগুলি ত্রয়ীনামে অভিহিত হইত। সেই অবস্থায় ঐ ত্রয়ীবেদ হইতে মহর্ষি অথর্ব্বা ঐহিক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শক্রমারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির প্রকরণগুলি পৃথক্ করিয়া নিজনামে প্রথিত করেন। তদবধি বেদমন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত হইল:—বৃহৎ ভাগের নাম ত্রয়ী রহিল এবং ক্ষুদ্র ভাগের নাম অথর্ব্ববেদ হইল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বৃহৎ ত্রয়ীবেদ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া রচনানুসারে উহা ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিনভাগে বিভক্ত করেন এবং তদবধি বেদ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চতুরংশ বলিয়া সর্ব্বজনে বিদিত হইয়াছে।

অদিতি—মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইনি দক্ষপ্রজাপতির কন্যা। বামন অবতারে বিষ্ণু ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইন্দ্রাদি ১২শ দেবতার জননী। নরকাসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কুণ্ডলদ্বয় লাভ করেন, তাহা তিনি ইঁহাকে দিয়াছিলেন। পারিজাত নিয়া ইন্দ্র ও কৃষ্ণে যে বিবাদ হয়, তাহা ইনি ভঞ্জন করেন।

অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠের পুত্রবধূ; শক্তি মুনির পত্নী ও পরাশরের জননী। (মহাভারত)

অধর্ম্ম—ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইঁহার বামভাগ হইতে অলক্ষ্মী উদ্ভূত হইলে ইনি তাহাকে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈঃ ব্রহ্মখণ্ড-৮ম অঃ)

অধিরথ—অঙ্গদেশবাসী চন্দ্রবংশীয় জনৈক ক্ষত্রিয়। ইঁহার পিতার নাম সত্যকর্ম্মা। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলেও সূত (সারথি) কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার পত্নীর নাম রাধা। একদা একটী কাঠের সিন্দুক নদীতে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া ইনি পত্নীর সহিত পরামর্শ ক্রমে উহা জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করেন। সিন্দুকটীর কবাট উন্মোচন পূর্ব্বক কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়বিশিষ্ট একটী সুলক্ষণাক্রান্ত মানবশিশু দেখিতে পান। ইঁহারা সযত্নে এই শিশুটীকে লালন পালন করেন। ইঁহারা এই শিশুটীকে বসুষেণ নাম দান করেন। এই শিশুটী পরে কর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। (মহাভা আদি) (কর্ণ দেখ)

অনংশা—গোপরাজ নন্দের ঔরসে ও তদীয় পত্নী যশোদার গর্ভে এই কন্যারত্নের জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

অনঘ—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র, ইনি উর্জ্জার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

অনঙ্গ—মদনদেবের অপর নাম। পূর্ব্বকালে তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবতারা ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লন। ব্রহ্মা বলিলেন যে কার্ত্তিকেয় মহাদেবের ঔরসে জন্মলাভ করিলে, তিনি দেবসেনাপতি হইয়া তারকাসুরকে বিনাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া মহাদেবের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য দেবতারা মদনকে সঙ্গে নিয়া হিমালয়ে গেলেন। মহাদেব তখন হিমশৃঙ্গে যোগমগ্ন ছিলেন। পার্ব্বতীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া মদন শিবের অঙ্গে পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করিলেন। ফুলশরে মহাদেব চঞ্চল হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং সম্মুখে মদনকে দেখিতে পাইলেন। মহাদেব মদনকেই যোগভঙ্গের হেতু মনে করিলেন। ক্রুদ্ধ শিবের নেত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তদবধি মদনের অপর নাম অনঙ্গ হইয়াছে। মদন দেহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মদনপত্নী রতিদেবীও স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য মায়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (কন্দর্প দেখ)

অনন্ত—নাগরাজ; ইঁহার অপর নাম শেষ, বাসুকি, গোনস। ইনি মহামুনি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শেষনাগ স্বীয় জননী কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ুভক্ষ্য ব্রতপরায়ণ, জটাবল্কলধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন, এবং তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে "তোমাকে মস্তক দ্বারা ধরণীমণ্ডল এরূপভাবে ধারণ করিতে হইবে যেন আর উহা বিচলিত না হয়।" আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে বিবর খনন পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিলেন এবং

ব্রহ্মার নিদেশবর্ত্তী হইয়া বসুন্ধরা মস্তকে ধারণ করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া নাগ-শক্র বিনতানন্দন গরুড়কে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন। (হরিবংশ)

অনল—অগ্নির নামান্তর। ইনি অষ্টবসুর মধ্যে অন্যতম। পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইঁহার বসুসংজ্ঞা হইয়াছে। অগ্নি বসুগণের অগ্রগামী (বিষ্ণুপু)। পদ্মপুরাণ মতে যে সকল দেবতা তেজদ্বারা সর্বদিক ব্যাপিত করেন তাঁহাদের বসুসংজ্ঞা।

অনসূয়া—অত্রিমুনির পত্নী। দক্ষপ্রজাপতির ঔরসে ও প্রসূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইনি দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। ভগবতী পার্ব্বতীর বরপ্রভাবে উষা ইঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া পতিত্বে বরণ করেন এবং অনিরুদ্ধকে দ্বারবতী (দ্বারকা) হইতে স্বীয় গৃহে আনিবার জন্য বিশ্বস্তা সখী চিত্রলেখাকে প্রেরণ করেন। চিত্রলেখা দ্বারবতী নগরে উপস্থিত হইয়া অনিরুদ্ধকে কিরূপে করায়ত্ত করিবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নারদের পরামর্শে চিত্রলেখা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নারদপ্রদত্ত তামসী বিদ্যাপ্রভাবে সকলকে মোহাচ্ছন্ন করিলেন। এবং অনিরুদ্ধকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পথে চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অনিরুদ্ধ বাণের রাজধানী শোণিতপুর প্রবেশপূর্ব্বক উষার কক্ষে উপস্থিত হন। এখানে অনিরুদ্ধের সহিত উষার গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পাদিত হয়। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে এই গান্ধর্ব বিবাহ বৃত্তান্ত দৈত্যরাজ বাণের কর্ণগোচর হইল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে বন্দী করিতে কয়েক জন সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অনিরুদ্ধ বীরপুরুষ; তাঁহার সহিত যুদ্ধে বাণ প্রেরিত সমস্ত সৈন্য নিহত হইল। ইহাতে বাণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। অনিরুদ্ধও বাণের সম্মুখীন হইয়া বীরের ন্যায় বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে মায়াযুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাণের হস্তে বন্দী হইলেন। অনিরুদ্ধের বিপদের সংবাদ দ্বারবতীতে প্রচারিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বাণের রাজধানী শোণিতপুর আক্রমণ করিলেন এবং ঘোর যুদ্ধে বাণকে পরাজিত করিয়া অনিরুদ্ধ ও উষাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। (হরিবংশ)

অনুমতি—মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা। ইঁহার মাতার নাম স্মৃতি। (বিষ্ণুপু)

অনুশাল্ব—দৈত্যবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের উপরই ইহার প্রবল বিদ্বেষ। এই অসাধারণ পরাক্রমশালী দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণও ভয় করিয়া চলিতেন। একদা পাণ্ডবদের সহিত অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণকে এই দৈত্য আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইয়া সসৈন্যে হস্তিনাপুরী অবরোধ করেন। ভীম ও অর্জ্জুন নগরের বাহিরে যাইয়া এই দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হন। অবশেষে কর্ণপুত্র বৃষকেতু ইঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আনয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ইঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরিত হয় এবং ইনি তপস্যার্থ বনগমন করেন। (মহাভা ও জৈমিনিভা)

অনুহ্ল—বিভ্রাজের পুত্র। ইনি ব্যাসদেবের পৌত্রী ও শুকদেবের কন্যা কৃত্বির পাণি গ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র ব্রহ্মদত্ত। (বিষ্ণুপু)

অন্তরীক্ষ—ইনি ত্রয়োদশ ব্যাস। বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে যাঁহারা বেদ বিভাগ করেন তাঁহাদের নাম ব্যাস। এই মন্বন্তরে ২৮ জনে বেদ বিভাগ করেন। ইঁহাদের নাম স্বয়ম্ভু, প্রজাপতি, উশনা, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্র, ত্র্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণ, ভরদ্বাজ, গোতম, উত্তম, বেণ (রাজশ্রবা), তৃণবিন্দু, ঋক্ষ (বাল্মীকি), শক্তি, পরাশর, জরৎকারু ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। (বিষ্ণু-বায়ু-কূর্ম্মপু)

অন্ধ—অযোধ্যার সরযূতীরবাসী বৈশ্যজাতীয় মুনিবিশেষ। ইনি শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া বনে পত্নীসহ নিজ আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। একদা অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ বনে মৃগয়া করিতে গিয়া কুম্ভে জলপূরণরত উক্ত মুনির একমাত্র পুত্রকে হস্তিভ্রমে শব্দভেদি বাণে বিদ্ধ করেন। বাণবিদ্ধ পুত্রকে পিতামাতা দর্শন করিয়া পুত্রশোকে হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মুনি পুত্রহন্তা রাজাকে শাপ দেন "আমার ন্যায় তুমিও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবে।" অন্ধের এই অভিশাপ সফল হইয়াছিল।

অন্ধক—(১) এই দৈত্য কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাগণকর্ত্তৃক দিতির সমস্ত পুত্র হত হওয়াতে তিনি কশ্যপের নিকট দেবের অবধ্য এক পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া দিতিকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহার অঙ্গুলিগর্ভ হইতে এক পুত্র প্রসূত হইল। এই পুত্রের সহস্র বাহু, সহস্র শীর্ষ, দ্বিসহস্র নয়ন এবং দ্বিসহস্র চরণ হইল। এই পুত্র অন্ধ না হইলেও পথিমধ্যে অন্ধের ন্যায় গমন করিত বলিয়া লোকে এই অসুর অন্ধক নামে খ্যাত হইল। কালক্রমে এই অসুর অতি পাপাচারী, দুর্দ্দান্ত ও বলদর্পান্ধ হইয়া ত্রিলোকস্থিত প্রাণিমাত্রকেই অশেষ যাতনা দিতে লাগিল। দেবতাগণের প্রার্থনায় স্বয়ং মহাদেব মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ইহাকে বধ করেন। তদবধি মহাদেব অন্ধকান্তক নামে খ্যাত। (হরিবংশ)

(২) স্থানান্তরে অন্ধকাসুরের বধবৃত্তান্ত অন্যরূপ বর্ণিত আছে। রুদ্রদেব স্বীয় ত্রিশূলাঘাতে অন্ধকাসুরের দেহ ভেদ করেন, কিন্তু তাহাতে অসুর বিনষ্ট হইল না, অধিকন্তু তাহার শরীর হইতে পতিত রক্তবিন্দুসন্দোহ হইতে অসংখ্য দানবের উদ্ভব হইল। মহাদেব এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ত্রিশূলাগ্রে অন্ধকাসুরকে গ্রহণ করিয়া রণভূমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও অসুরবংশ সমূলে ধ্বংস হইল না দেখিয়া মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রুষ্ট মহাদেবের বদনমণ্ডল হইতে এক বহ্নিশিখা নির্গত হইল, এই বহ্নিশিখা এক দেবীরূপে পরিণত হইল। দেবীর নাম হইল যোগেশ্বরী। ইনি অষ্টমাতৃকাগণ মধ্যে প্রধান।। তৎপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, যম ও বরাহরূপী বিষ্ণু ইহারা ক্রমে ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রাণী, কৌমারী, দণ্ডধারিণী ও বারাহী এই ষণ্মাতৃকা সৃষ্টি করেন। এই সপ্তশক্তি রণক্ষেত্রে দানবদলকে বিনাশ করেন।

(৩) যদুবংশীয় সাত্বতের সাতটি পুত্রের মধ্যে ইনি অন্যতম।

অন্নপূর্ণা—ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। একদিন ভোলামহেশ্বর গৌরীর সহিত কলহ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া ভিক্ষার্থ ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবতী মায়াপ্রকাশ পূর্ব্বক অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাশীতে জগতের লোকদিগকে অন্নদান করিতে লাগিলেন। মহাদেব অন্নদার নিকট উপস্থিত হইয়া অন্নভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি এইরূপ :—"অন্নপূর্ণা পদ্মাসনে সমাসীনা; তাঁহার বাম হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদির থালা, দক্ষিণ হস্তে হাতা, সম্মুখে পঞ্চানন মহেশ্বর ভিক্ষার্থী হইয়া অন্নদা সমীপে দণ্ডায়মান।" সহস্রাধিক বৎসর হইল এই দেবীমূর্ত্তি কাশীতে নির্ম্মিত হইয়াছে।

অপরাজিত—ইনি ১১শ রুদ্র মধ্যে অন্যতম।

অবিক্ষি—একজন প্রাচীন সূর্য্যবংশীয় রাজা। ইনি বিদিশাধিপতি বিশালের কন্যা ভামিনীকে বিবাহ করেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক সপত্নীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

অবীক্ষিৎ—রাজা করন্ধমের পুত্র। ইনি বিদিশাধিপতি বিশালের কন্যা বৈশালিনীকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করেন। সভায় উপস্থিত রাজবৃন্দ অবীক্ষিৎকে কন্যাহরণে বাধা দেন। ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অবীক্ষিৎ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। পুত্রের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারাজ করন্ধম সসৈন্যে রাজগণকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পুত্রের উদ্ধারসাধন করেন। বিদিশাধিপতি বিশাল অবীক্ষিতের হস্তে স্বীয় কন্যাকে সমর্পণ করিতে চাহিলেন কিন্তু অবীক্ষিৎ যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বৈশালিনী অবীক্ষিতের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন; এখন তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বনগমনপূর্ব্বক তপস্যায় রত হইলেন। একদা এক রাক্ষস বন আক্রমণ-পূর্ব্বক বৈশালিনীকে হরণ করিতেছিল; বৈশালিনী অবীক্ষিতের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক চীৎকার করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে অবীক্ষিৎ তথায় উপস্থিত হন। তিনি রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বৈশালিনীর উদ্ধারসাধন করেন। অনন্তর তিনি বৈশালিনীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে মরুত্ত নামে এক পুত্র জন্মে। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

অভিমন্যু—(১) অর্জ্জুনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়। সুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব-পক্ষীয় সমুদয় প্রধান প্রধান বীর একে একে এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের নিকট পরাস্ত হইলে উক্ত পক্ষীয় সাতজন প্রধান

রথী মিলিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে ইঁহাকে বধ করেন। অভিমন্যু মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর সময় উত্তরা অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদের সমুদয় পুত্র নিহত হইয়াছিল; কেবল পরীক্ষিৎ হইতেই পাণ্ডবদের বংশ রক্ষা হয়। অভিমন্যু-বধ ভারতযুদ্ধের এক কলঙ্ক। অর্জ্জুন নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; এদিকে অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্য-রচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ব্যূহের দ্বাররক্ষক জয়দ্রথকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরই অভিমন্যুর সাহায্যার্থ ব্যূহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। অভিমন্যু বীরপরাক্রমে বহু যোদ্ধাকে সমরশায়ী করেন। অবশেষে কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি সপ্তরথী মিলিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে ইঁহাকে বধ করেন। (মহাভারত)

(২) স্বায়ম্ভুব বংশীয় চাক্ষসের পুত্র। ইঁহার জননী নবলা। (বিষ্ণুপু)

অভূতরজাঃ—রৈবত মন্বন্তরে দেবতারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, যথা—অমিতাভ, অভূতরজাঃ, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধাঃ (বিষ্ণুপু)। সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতাদের তিন শ্রেণী ছিল, যথা—সুতপ, অমিতাভ, মুখ্য। প্রত্যেক শ্রেণীতে ২১টি দেবতা।

অমাবসু—চন্দ্রবংশীয় কুশের ৪র্থ পুত্র। (বিষ্ণুপু)

অমিতধ্বজ—চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মধ্বজের পুত্র। (বিষ্ণুপু)

অমিত্রজিৎ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সুবর্ণের পুত্র। (বিষ্ণুপু)

অমূর্ত্তরয়াঃ—পুরুবংশীয় রাজা কুশের তৃতীয় পুত্র। (বিষ্ণুপু)

অমোঘা—শান্তনু ঋষির ভার্য্যা ও ব্রহ্মপুত্র নদের জননী।

অম্বরীষ—সূর্য্যবংশীয় এক বিখ্যাত নৃপতি। অযোধ্যানগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহার পিতার নাম নাভাগ। এই অমিত বলশালী রাজা একাকী দশ লক্ষ নৃপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং সমুদয় বসুন্ধরা অধিকৃত করিয়া যথাবিধানে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি এই পুণ্যের ফলে দুর্লভ স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। (মহাভারত)।

মহারাজ অম্বরীষ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি সহস্র বৎসর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। বিষ্ণু তাঁহার ভক্তি পরীক্ষার্থ ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ ইন্দ্রের নিকট কোন বর প্রার্থনা না করিয়া বলিলেন "হে ইন্দ্র, আমি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করি নাই; হে দেবরাজ, আপনার বর আমি প্রার্থনা করি না; আমার প্রভু নারায়ণ; সেই জগদীশ্বর নারায়ণকে আমি নমস্কার করিতেছি।" ইহাতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণপূর্ব্বক গরুড়োপরি আসীন হইয়া এবং চতুর্দ্দিকে দেবতাগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অম্বরীষের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। (লিঙ্গপুরাণ)

মহারাজ অম্বরীষের পরম রূপলাবণ্যবতী শ্রীমতী নাম্নী এক কন্যা ছিল। এই কন্যা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে একদা দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি পর্ব্বত কোন কার্য্যোপলক্ষে অম্বরীষের ভবনে উপস্থিত হন। নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই রাজতনয়া শ্রীমতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করায় অম্বরীষ বলিলেন "আপনারা উভয়েই মহামুনি; কন্যার অর্পণ সম্বন্ধে আমার কোন স্বাধীনতা নাই; আপনারা অন্য এক দিবস আসিলে কন্যা যাহাকে বরমালা দিবে, সে তাঁহারই গৃহিণী হইবে।" মুনিদ্বয় অম্বরীষের বাক্য শ্রবণে সেদিন প্রস্থান করিলেন। নারদ অম্বরীষকে বিষ্ণুভক্ত জানিয়া বিষ্ণুর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং পর্ব্বত মুনির মুখ বানরের মুখের ন্যায় করিতে বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণু নারদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, কিন্তু পর্ব্বতকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এদিকে পর্ব্বতও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক নারদের মুখ গোলাঙ্গুল জাতীয় বানরের মুখের ন্যায় করিতে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণু হাসিয়া তাঁহার প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন, কিন্তু নারদের নিকট এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এদিকে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে নারদ ও পর্ব্বত উভয়ে অম্বরীষভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী অম্বরীষের আদেশে বরমাল্য

গ্রহণ পূর্ব্বক উভয় মুনির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী আর কেহই নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীমতী রাধা। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়া অম্বরীষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমতী মুনিদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত ভীতির ভাব প্রকাশ করিলেন। অম্বরীষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমতী বলিলেন যে তথায় নারদ ও পর্ব্বত মুনিকে তিনি দেখিতেছেন না; তিনি দুইজন মনুষ্য দেখিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাদের একজনের মুখ বানরের মুখের ন্যায় এবং অপরের মুখ গোলাঙ্গুল জাতীয় বানরের মুখের ন্যায়। রাজা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীমতী ইঁহাদের মধ্যে আসীন অপর একটী সুন্দর পুরুষ দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই গলে মালা দিলেন। বরমালা দেওয়া মাত্র শ্রীমতী অন্তর্হিত হইলেন। মধ্যবর্ত্তী পুরুষ আর কেহ নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্ গোপীজনবল্লভ শ্রীমতী রূপধারিণী শ্রীরাধাকে অঙ্কে গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। মুনিদ্বয় বলিলেন অম্বরীষ মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে ছলনা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বরীষকে শাপ দিলেন "তোমাকে অন্ধকাররাশি আচ্ছন্ন করিবে, এজন্য তুমি নিজ দেহ পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পাইবে না।" অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুচক্র উপস্থিত হইল; বিষ্ণুচক্র অন্ধকাররাশি দূরীকৃত করিয়া মুনিদ্বয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল। মুনিদ্বয় ত্রিভুবন ঘুরিয়া কোথাও বিষ্ণুচক্র হইতে অব্যাহতি পাওয়ার স্থান দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিষ্ণু সুদর্শনকে নিবৃত্ত করিলেন। মুনিদ্বয় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহারা বিবাহ করিবেন না। (লিঙ্গপুরাণ)

অম্বা—কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি জন্মান্তরে শিখণ্ডীরূপ ধারণ করিয়া ভীষ্মের প্রাণবধের কারণ হন। (কাশীরাজ দেখ)

অম্বালিকা—কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। ইনি বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী এবং পাণ্ডুর মাতা। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি শাশুড়ী সত্যবতীর সহিত বনে গমন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করেন; এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বাভিলষিত মার্গে প্রস্থান করেন। (কাশীরাজ দেখ)

অম্বিকা—কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। ইনি বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী এবং ধৃতরাষ্ট্রের মাতা। ইনি পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সত্যবতীর সহিত বনগমন করিয়া তপস্যা দ্বারা নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। (কাশীরাজ দেখ)

অযুতনায়ী—চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপতি। অযুত নরমেধযজ্ঞ করিয়া ইঁহার এই নাম। পিতার নাম মহাভৌম, মাতা সুযজ্ঞা।

অরিমর্দ্দন—অক্রূরের ভ্রাতা; পিতা—শফল্ক (অক্রূর দেখ)।

অরিষ্ট—বৃষভাকৃতি অসুরবিশেষ। এই অসুর কংসকর্ত্তৃক কৃষ্ণবধার্থ ব্রজে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার বিপুল দেহ দেখিয়া ও ভয়ঙ্কর নিনাদ শুনিয়া ব্রজের গোপ গোপীগণ সন্ত্রস্ত হইল; পশুসকল ভয়ব্যাকুল হইয়া গোকুল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গদ্বয় উৎপাটন করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়া আর্দ্রবসনের ন্যায় নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন এবং শৃঙ্গদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারাই তাহাকে নিহত করিলেন। (শ্রীমদ্ভা—১০ম স্ক)

(২) বৈবস্বত মনুর পুত্র; ইঁহার নাম নাভাগ। (কূর্ম্মপু)

অরিষ্টা—দক্ষকন্যা ও কশ্যপের চতুর্থী পত্নী।

অরিষ্টনেমি—যক্ষ বিশেষ। বৎসরের প্রতিমাসে সূর্য্যরথে এক এক আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, নাগ, ও রাক্ষস অধিষ্ঠিত থাকেন। পৌষ মাসে সূর্য্যরথে অধিষ্ঠিত আদিত্য ভগ, ঋষি ক্রতু, গন্ধর্ব্ব ঊর্ণায়ু, অপ্সরা পূর্ব্বচিত্তী, যক্ষ অরিষ্টনেমি, নাগ কর্কোটক এবং রাক্ষস স্ফূর্জ্জ। ঋষি স্তব করেন, গন্ধর্ব্ব গান করেন, অপ্সরা নৃত্য করে, রাক্ষস পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, নাগ অশ্ব সজ্জিত করে এবং যক্ষ লাগাম লাগায়।

(২) প্রজাপতি বিশেষ। ইনি দক্ষের ৪টী কন্যা বিবাহ করেন।

অরুণ—গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও বিনতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। বিনতা দুইটী অণ্ড ও তাঁহার

সপত্নী সহস্র অণ্ড প্রসব করেন। কদ্রুপ্রসূত অণ্ড হইতে এক একটী পুত্র (সর্প) বহির্গত হইল, কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল দেখিয়া বিনতা লজ্জিত হইলেন এবং স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের একটী ভাঙ্গিয়া দেখিলেন উহার একার্দ্ধ সুসঙ্গঠিত হইয়াছে কিন্তু অপরার্দ্ধ অপকাবস্থাতেই আছে। তখন সদ্যঃপ্রসূত বিকলাঙ্গ পুত্র (অরুণ) জননীকে অভিসম্পাত করিলেন যে "যেহেতু তুমি সপত্নীর সহিত স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক এই অন্যায় কর্ম্ম করিয়া আমায় বিকলাঙ্গ করিলে, এই হেতু তুমি ৫০ বৎসর সপত্নীর দাসত্ব করিবে।" অরুণ আরও বলিলেন যে "এই অপর অণ্ডমধ্যে যে পুত্র আছে যদি তাহা অকালে ভেদ না কর, তবে সেই তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবে।" ইহা বলিয়া অরুণ আকাশমার্গে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার পত্নীর নাম শ্যেনী; সম্পাতি ও জটায়ুনামে ইঁহার দুই পুত্র হয়। (মহাভা—আদি)

অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ মুনির পত্নী ও প্রজাপতি কর্দ্দম মুনির কন্যা। বশিষ্ঠের ন্যায় ইনিও নক্ষত্রলোকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি পতিব্রতা ও পতিসেবাপরায়ণা বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তির অন্তিমকাল আসন্ন হইয়াছে, সে ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে ইঁহাকে দেখিতে পায় না। (ব্রহ্মবৈঃ—মহাভা)

(২) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী। ধর্ম্ম দক্ষের ১০টী কন্যা বিবাহ করেন। (হরিবংশ)

অর্জ্জুন—(১) পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র; দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি, তৃতীয় পাণ্ডব। ইঁহার ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্যায় নিপুণ লোক তৎকালে অতি বিরল ছিল। ইনি দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য। ভারতযুদ্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার সারথ্য করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন দ্রুপদরাজভবনে স্বয়ংবরস্থলে লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া অগ্নিদেবের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বনবাসকালে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে যাইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট পাশুপতাস্ত্র লাভ করেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করেন; তথায় একদিন অপ্সরা উর্ব্বশী মদনাতুরা হইয়া অভিসারিকাবেশে অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বাভিলাষ জ্ঞাপন করেন। অর্জ্জুন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাতে উর্ব্বশী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন যে "তুমি ক্লীবভাবাপন্ন হইয়া রমণীগণমধ্যে নৃত্য করতঃ ষণ্ডের ন্যায় বিচরণ করিবে।" বিরাট রাজভবনে এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে এই অভিশাপ বররূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে এক বৎসর বিরাটভবনে যাপন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের তিনটী পত্নী—দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদা। এতদ্ব্যতীত কৌরব্য নাগের কন্যা উলূপীকেও তিনি বিবাহ করেন। দ্রৌপদী-গর্ভজাত পুত্র ভারতযুদ্ধের শেষ দিন নিশাকালে অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক হত হন। সুভদ্রার গর্ভজাত ষোড়শবর্ষীয় পুত্র অভিমন্যু ভারতযুদ্ধে সপ্তরথিকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অন্যায় সমরে হত হন। অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা তখন অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন; এই যুদ্ধের অবসানে উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিৎ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পত্নী উলূপীর গর্ভে কোন সন্তান হয় না। ৪র্থ পত্নী চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজ চিত্রভানুর দুহিতা; ইঁহার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে অর্জ্জুনের এক পুত্র জন্মে। মাতামহের মৃত্যুর পর বভ্রুবাহন মণিপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। (মহাভারত)। এতদ্ব্যতীত ইরাবান্ নামে অর্জ্জুনের অপর এক পুত্র ছিলেন; ইনি ঐরাবত নাগের বিধবা কন্যার গর্ভসম্ভূত। (ইরাবান দেখ)।

যদুবংশ ধ্বংস হইলে শ্রীকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করেন। অর্জ্জুন দ্বারকায় যাইয়া সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণের পত্নীগণ ও তদীয় পৌত্র বজ্রকে লইয়া মথুরায় আসিতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দস্যুগণ লগুড় হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণপত্নীদিগকে অপহরণ করে। গাণ্ডীবে বাণ যোজনা করিতে অর্জ্জুনের শক্তি হইল না। অর্জ্জুন দুঃখিত মনে বজ্রকে লইয়া মথুরায় আগমন করেন এবং তাঁহাকে মথুরার সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই সময়ে ব্যাসদেব মথুরায় উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং ভারত যুদ্ধ জয়ী হইয়াও তিনি লগুড়ধারী সামান্য দস্যুদিগের হস্ত হইতে কৃষ্ণপত্নীদিগকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের তেজেই তিনি তেজস্বী ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারও চলিয়া যাইবার

সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অর্জ্জুনকে সাংসারিক বিষয়ে বিমুখ ও আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠিরাদিরও যে চলিয়া যাওয়ার সময় হইয়াছে একথাও বলিলেন। অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিয়া ব্যাসদেবের উপদেশ বাক্য ভ্রাতৃগণকে বলিলেন। তাঁহারা তদনুসারে মহাপ্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। (যুধিষ্ঠির দেখ)

(২) যমলার্জ্জুন—কুবেরের তনয় নলকুবের ও মণিগ্রীব দেবর্ষি নারদের অভিশাপে ব্রজধামে অর্জ্জুন বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের অনুনয়ে নারদ প্রীত হইয়া বলিলেন "তোমাদের বৃক্ষরূপ প্রাপ্তির পরও পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত তোমাদের স্মৃতিপথারূঢ় থাকিবে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধালাভ করিতে পারিলেই তোমাদের মুক্তি হইবে।" যশোদা নবনীতাপহরণ হেতু শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় উদূখলের সহিত রজ্জুবদ্ধ করিয়া কার্য্যান্তরে গেলে পর ভগবান্ কৃষ্ণ দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য যেখানে অর্জ্জুনবৃক্ষরূপী কুবের-তনয়দ্বয় দণ্ডায়মান ছিল তথায় ধীরে ধীরে গমন করিলেন। অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে গমন করিবামাত্র উদূখলটা বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যগত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে যমলার্জ্জুনের মূল উৎপাটিত হইল ; উৎপাটিত হইবামাত্র দুইটী সিদ্ধ পুরুষ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও তাহাদের শাপ মোচন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। (শ্রীমদ্ভা—১০মস্ক)—

অর্থ—ধর্ম্মের পুত্র। ইনি দক্ষের কন্যা ক্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (শ্রীমদ্ভা)

অলক্ষ্মী—লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইনিও লক্ষ্মীর ন্যায় সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লিঙ্গ পুরাণের উত্তর ভাগে ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে ভগবান্ বিষ্ণু অগ্রে অলক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়া তৎপশ্চাৎ ভগবতী লক্ষ্মীকে সৃষ্টি করেন ; এজন্য ইঁহার নাম জ্যেষ্ঠা হইয়াছে। অমৃতোৎপাদন কালে বিষের উৎপত্তির পর অত্যন্ত উগ্রবিষ হইতে অকল্যাণকারিণী জ্যেষ্ঠা (অলক্ষ্মী) উৎপন্ন হন। জ্যেষ্ঠার উৎপত্তির পর পদ্মালয়া লক্ষ্মী উৎপন্ন হন। লক্ষ্মীকে বিষ্ণু গ্রহণ করেন, কিন্তু অলক্ষ্মীকে কোন দেবতাই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করায়, অবশেষে দুঃসহ নামক বিপ্রর্ষি গ্রহণ করেন। দুঃসহের সহিত বিবাহিত হইলেও অলক্ষ্মী কোন ক্রমেই তাঁহার নিকট থাকিতে চান না ; ইহাতে মুনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। একদা মহামুনি মার্কণ্ডেয় দুঃসহের আশ্রমে উপস্থিত হইলে দুঃসহ তাঁহাকে বলিলেন "আমার এই ভার্য্যা আমার নিকট কোন প্রকারেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন না, এ ভার্য্যা লইয়া আমি কি করিব ? আমি ইঁহার সহিত কোন্ স্থানে যাইব, কোন্ স্থানেইবা প্রবেশ করিব না, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিন"। মার্কণ্ডেয় কহিলেন "তোমার এই ভার্য্যা অমঙ্গল ও অকীর্ত্তির নিদান অলক্ষ্মী। যে স্থানে বিষ্ণুভক্ত মনুষ্যগণ অবস্থিতি করেন, যে স্থানে শিবভক্তগণ সর্ব্বদা বাস করেন, সে সকল স্থানে তুমি অলক্ষ্মীর সহিত কদাচ প্রবেশ করিও না। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অনবরত শিব ও বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে তাহাদের গৃহাদিতে, উপবনে বা গো-গৃহে কদাচ অলক্ষ্মীর সহিত প্রবেশ করিও না। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নশীল, যে সকল ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সকল ব্যক্তিকে তুমি অলক্ষ্মীর সহিত দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। যাহাদিগের গৃহে নিত্য হোম হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তির গৃহে নিত্য শিবলিঙ্গের পূজা হইয়া থাকে, যাহাদিগের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, যে সকল ব্যক্তির গৃহে ভগবতী দুর্গার পূজা হইয়া থাকে, সে সকল নিষ্পাপ লোকদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলক্ষ্মীর সহিত অন্যত্র গমন করিবে। যে সকল গৃহস্থের গৃহে বেদজ্ঞব্রাহ্মণ সকল, গাভীগণ, গুরুজন, অতিথিগণ ও শিবভক্তগণ পূজিত হন, তুমি অলক্ষ্মীর সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু যে সকল স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, গাভী নাই, গুরুপূজা নাই, অতিথিসেবা নাই এবং যে স্থানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর কলহপরায়ণ, সেই সকল গৃহে নিজভার্য্যা অলক্ষ্মীর সহিত প্রবেশ করিবে। যে সকল মনুষ্যের গৃহে বিষ্ণুভক্তি নাই, মন্ত্র জপ নাই, হোমাদি সৎকর্ম্ম নাই, কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে মহাদেবের পূজা নাই, সন্ধ্যাকালে যাহারা ভস্মলিপ্ত হয় না, যেখানে শিবচতুর্দ্দশীতে মহাদেবের পূজা হয় না, যাহারা হরিনাম করে না, তুমি নিজভার্য্যা অলক্ষ্মীর সহিত তথায় প্রবেশ কর। যে সকল গৃহে বালকগণের সলোভদৃষ্টি সত্ত্বেও তাহাদিগকে না দিয়া গৃহস্বামিগণ অনায়াসে ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করে, তুমি সেই গৃহে ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে গৃহস্থের গৃহে শিবপূজা বা বিষ্ণুপূজা না করিয়া এবং

নিয়মানুসারে হোম না করিয়া গৃহস্বামিগণ আপনারা নানা উত্তম দ্রব্যাদিদ্বারা স্বীয় উদর পূর্ণ করে, তুমি সে গৃহে সর্ব্বদা সস্ত্রীক প্রবেশ কর। যে গৃহে কণ্টকীবৃক্ষ, পলাশবৃক্ষ বর্ত্তমান তুমি তথায় ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি বটবৃক্ষ, অর্ক প্রভৃতি সক্ষীরবৃক্ষ, বন্ধুজীব, করবীবৃক্ষ, টগর ও মল্লিকাবৃক্ষ প্ররূঢ় তুমি সে গৃহে ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। তাল, তমাল, তিন্তিড়ী, কদম্ব, খদির, এ সকল বৃক্ষ যে গৃহোপরি প্ররূঢ় তুমি সে সকল গৃহে ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে গৃহে একটী মাত্র দাসী, তিনটী মাত্র গাভী, পাঁচটী মাত্র মহিষ, ছয়টী মাত্র অশ্ব এবং সাতটী মাত্র হস্তী থাকে, তুমি সে গৃহে ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল মূঢ় অন্নাদি পাক করিয়া দেবতা, অতিথি ও অভ্যাগতগণকে বঞ্চনা করিয়া কেবল আপনারা ভোজন করে এবং যে সকল ব্যক্তি স্নান ও মঙ্গলাচরণশূন্য, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর।" দুঃসহ মুনিকে এই সকল উপদেশ দিয়া মার্কণ্ডেয় অন্তর্হিত হইলে, দুঃসহ ভার্য্যার সহিত তত্তৎস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। একদা দুঃসহ জ্যেষ্ঠাকে বলিলেন "তুমি এই জলাশয় মধ্যস্থ আশ্রমে অবস্থিতি কর, আমি পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিব ; আমি পাতালপুরীর মধ্যে আমাদের বাসযোগ্য স্থান দেখিয়া আসিব।" জ্যেষ্ঠাকে এই কথা বলিয়া দুঃসহ পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন, আর ফিরিলেন না। অতঃপর একদা অলক্ষ্মী বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "আমি পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি, আমি এক্ষণে উপায়হীনা, আমি ভরণপোষণের জন্য কোথায় ধন পাইব ?" বিষ্ণু বলিলেন "যে সকল ব্যক্তি আমাকে ও শিবকে নিন্দা করিবে, তাহাদিগের ধন তোমার ধন বলিয়া গণ্য হইবে ; যাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শিবের উপাসনা করে, বা শিবকে পরিত্যাগ করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহাদিগের ধন তোমার ধন হইবে।" এই বলিয়া অলক্ষ্মীর দৃষ্টিক্ষয়ের জন্য ভগবান্ জনার্দ্দন লক্ষ্মীর সহিত রুদ্রমন্ত্র জপ করিলেন। (লিঙ্গপুরাণ)

অলম্বল—জটাসুরের পুত্র। কুন্তীপুত্রগণ জটাসুরকে বধ করাতে অলম্বল পাণ্ডবদের প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে এই অসুর কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করে। ঘটোৎকচ বহুক্ষণ ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মায়াযুদ্ধে ইহাকে পরাস্ত করেন এবং খড়্গাঘাতে ইহার মস্তকচ্ছেদন করেন। (মহাভা—দ্রোণ)

অলম্বুষা—অপ্সরা বিশেষ ; কশ্যপের ঔরসে প্রধার গর্ভে ইহার জন্ম। রাজা তৃণবিন্দুর সহিত ইহার বিবাহ হয় ; এবং ইহার গর্ভে বিশালরাজ জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশালরাজ বৈশালীনগরী স্থাপন করেন। (বিষ্ণুপু)

অলম্বুষার তিন পুত্র—বিশাল, শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু। (মহাভা)

অলর্ক—(১) সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর ভৃগুমুনির শাপে এই কীটরূপ প্রাপ্ত হয়, পরে পরশুরামের দৃষ্টিতে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করে। এই কীটের দেহ শূকরের ন্যায়, পা আটখানা, দাঁত তীক্ষ্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত। একদা উপবাসক্লিষ্ট পরশুরাম পরিশ্রান্ত হইয়া স্বীয় শিষ্য কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময়ে মেদমাংসলোলুপ অলর্ককীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে সেই কীটকে বিনাশ বা দূরে নিক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না ; ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কীটের দংশনজনিত বেদনা সহ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির বাহির হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরশুরাম জাগ্রত হইয়া ব্যস্ততার সহিত কর্ণকে রক্তপাতবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণের উক্তি শুনিয়া কীটের প্রতি অরুণ দৃষ্টি করিবা মাত্র ঐ কীট প্রাণত্যাগ করিল এবং অসুর মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক পরশুরামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "হে ভৃগুবংশাবতংস, আপনার কল্যাণ হউক ; আপনার অনুগ্রহে আমি মুক্ত হইলাম। আমি সত্যযুগে দংশনামে অসুর ছিলাম ; আপনার পূর্ব্বপিতামহ মহর্ষি ভৃগু অপেক্ষা আমার বয়স কম ছিল না ; আমি বলপূর্ব্বক ঐ মহর্ষির ভার্য্যাকে হরণ করাতে তিনি আমাকে শ্লেষ্মামূত্রভোজী কীট হও বলিয়া অভিসম্পাত করেন। পরে আমার অনুনয়ে প্রীত হইয়া বলিলেন 'আমার বংশসম্ভূত রাম হইতে তোর মুক্তি হইবে।' সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমার এই দুর্গতি হইয়াছিল ; এখন মহাশয়ের অনুগ্রহে মুক্তি পাইলাম।" এই বলিয়া মহাসুর স্বস্থানে প্রস্থান করিল। (মহাভা—শান্তি)

(২) রাজা কুবলয়াশ্বের পুত্র। মদালসার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইঁহার মাতা মদালসা অতি বিদুষী সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শিনী রমণী ছিলেন। পুত্র অলর্ককে মদালসা ধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রাজা কুবলায়শ্বপুত্র অলর্কের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মদালসা সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। রাজা অলর্ক দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। রাজা অলর্কের সহিত কাশীরাজ সুবাহুর যুদ্ধ হয়; কাশীরাজ সসৈন্যে অলর্ককে আক্রমণ করেন। শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া দীর্ঘকাল নগরে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন। যুদ্ধের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করাতে তিনি অনতিবিলম্বেই ক্ষীণকোষ হইয়া পড়িলেন। তত্ত্বদর্শী অলর্ক রাজ্যের নিমিত্ত লোকক্ষয় অধর্ম্মমূলক মনে করিয়া কাশীরাজকে রাজ্য অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু কাশীরাজ অলর্কের নিকট উপদেশ লাভ করিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বহুকাল রাজত্ব করিয়া অলর্ক বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

অলায়ুধ—রাক্ষস বিশেষ। ভীমকর্ত্তৃক ইহার জ্ঞাতি বক ও কির্ম্মীর এবং বন্ধু হিড়িম্ব নিহত হইয়াছিল; এজন্য প্রতিশোধমানসে এই রাক্ষস বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হয় ও ঘোর সংগ্রামে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক নিহত হয়। (মহাভা—দ্রোণ)

অশ্বত্থামা—(১) দ্রোণাচার্য্যের পুত্র। দ্রোণাচার্য্য পিতৃনিয়োগানুসারে শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। কৃপীর গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামানামে পুত্র জন্মে। এই পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিয়াছিল। এই ধ্বনি হওয়ার পরে দৈববাণী হইল "এই পুত্র জন্মিবা মাত্র অশ্বহ্রেষার ন্যায় গভীর ধ্বনিদ্বারা দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল, এজন্য ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবে।" অশ্বত্থামা পিতার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিন অশ্বত্থামা ভগ্নোরু-দুর্য্যোধনকে দেখিতে যান এবং তাঁহার নিকট পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসেন। দুর্য্যোধনকে তদবস্থায় রাখিয়া কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মার সহিত গুপ্তভাবে নিশাভাগে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাণ্ডবপক্ষের যে কয়জন সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, সকলকে বধ করেন। পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি সেই সময় শিবিরে না থাকায়, তাঁহারা এই নৃশংস গুপ্তহত্যা হইতে রক্ষা পান। পুত্রগণের মৃত্যুতে দ্রৌপদী অত্যন্ত বিলাপ করেন। দ্রৌপদীর বিলাপে মর্ম্মপীড়িত-মহাবীর ভীম অশ্বত্থামাকে বধ করিতে দ্রুতপদে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন একাজ হওয়া অসম্ভব, যেহেতু অশ্বত্থামা অমর; তিনি অর্জ্জুনকে লইয়া ভীমের অনুসরণ করেন। অশ্বত্থামা ভীমার্জ্জুনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঐশিকাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুন এই অস্ত্র ধ্বংসের জন্য ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি নারদ উভয়কে স্ব স্ব অস্ত্র প্রতিসংহারে আদেশ দেন। জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন স্বীয় অস্ত্রের প্রতিসংহার করিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা অজিতেন্দ্রিয় হওয়াতে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে অক্ষম হইলেন; উহা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে পতিত হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিলেন। (মহাভারত)

(২) পাণ্ডবপক্ষীয় মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার হস্তী। ভারতযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য এক দিবস মহাবিক্রমে পাণ্ডবীয় চমূ ধ্বংস করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে দ্রোণকে উন্মনস্ক করিতে না পারিলে আর সৈন্য রক্ষা হয় না। মালবরাজের হস্তী অশ্বত্থামা হত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কৌশল পূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় লোকদ্বারা দ্রোণাচার্য্যের নিকট সংবাদ দিলেন যে তৎপুত্র বীর অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্য জানিতেন যে তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা অমর; তিনি কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। বারংবার এই কথা বলায় দ্রোণের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন যে যদি স্বয়ং যুধিষ্ঠির এই কথা বলেন তবে তিনি ইহা বিশ্বাস করেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন এই কথা না বলিলে যুদ্ধে পরাজিত হন, অথচ বলিলেও মিথ্যা কথা বলা হয়। তিনি মহা সঙ্কটে পড়িলেন। অবশেষে তিনি "অশ্বত্থামা হত" এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে এবং "ইতি কুঞ্জরঃ" এই বাক্যাংশটুকু অনুচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। "ইতি কুঞ্জরঃ" এই বাক্যাংশ দ্রোণের কর্ণে প্রবেশ না করাতে

তাঁহার বিশ্বাস হইল যে পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধে হত হইয়াছে। তিনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন; অবিলম্বেই তিনি পরাজিত ও হত হইলেন। এইরূপে অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন ও ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মনিষ্ঠা ইতিকুঞ্জরস্বে পরিণত হইল। (মহাভারত)

অশ্বপতি—মদ্রদেশের রাজা। ইঁহার পিতার নাম অশ্বপুত্র। অন্ধ হওয়াতে ইঁহার জ্ঞাতিগণ ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পত্নীসহ ও পুত্র সত্যবানকে সঙ্গে লইয়া অরণ্য আশ্রয় করেন। এখানে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ হয়। সাবিত্রী যমের নিকট হইতে মৃত পতিকে ফিরাইয়া আনেন এবং যমের বরে শ্বশুরের অন্ধত্ব দূরীভূত করেন। অশ্বপতি চক্ষু লাভ করিয়া স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। (মহাভা ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অশ্বসেন—তক্ষকের পুত্র। খাণ্ডবদাহ সময়ে নাগরাজ তক্ষক স্থানান্তরে ছিলেন; তৎপুত্র অশ্বসেন অগ্নিবেষ্টিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু অর্জ্জুনের শরজালে অবরুদ্ধ হওয়াতে কোন ক্রমেই বহির্গত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মাতা স্নেহপরবশ হইয়া বিপন্ন পুত্রের রক্ষার্থ ধাবমান হইলেন। অশ্বসেনের মস্তক ও লাঙ্গুল দগ্ধ হইয়াছিল; নাগপত্নী পুত্রকে রক্ষা করিতে যাইয়া আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণধার শরদ্বারা নাগপত্নীর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা দেখিয়া অশ্বসেনের প্রাণ রক্ষার্থ বাণবর্ষণ দ্বারা অর্জ্জুনকে অচেতন করিলেন; ইত্যবসরে অশ্বসেন পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। মাতৃহন্তা অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য অশ্বসেন কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণের তূণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্পবাণরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কর্ণ এই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপার অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে সতর্ক করেন। অর্জ্জুন মস্তক নত করিলে সর্পবাণ অর্জ্জুনের কিরীট ছেদন করিয়া চলিয়া যায়। অশ্বসেন বিফলমনোরথ হইয়া কর্ণের নিকট আত্ম পরিচয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধনুতে সংযোজিত হইতে প্রার্থনা করেন। কিন্তু কর্ণ মহাবীর; তিনি এক বাণ দুইবার ক্ষেপণ করিতে অসম্মত হওয়াতে অশ্বসেন নিজেই অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইল এবং অনতিবিলম্বেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইল। (মহাভা—আদি)

অশ্বিনী—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের পত্নী। এই নক্ষত্রের আকার অশ্বমুখের ন্যায়, এজন্য ইহার নাম অশ্বিনী হইয়াছে। এই নক্ষত্র আশ্বিনমাসের পৌর্ণমাসীতে অবস্থিতি করে বলিয়া ইহার নামানুসারে উক্তমাসের নাম আশ্বিন হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার—অশ্বরূপী সূর্য্যের ঔরসে ও বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে এই যমজ স্বর্গবৈদ্যদ্বয়ের উৎপত্তি। কথিত আছে যে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহনে অসমর্থা হইয়া আপনার মত আর একটী স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া আপনার স্থানে রাখিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) স্বীয় তনয়ার স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কন্যাকে ভর্ৎসনা করেন এবং স্বামীর আলয়ে যাইতে বাধ্য করেন। কন্যা স্বামীর গৃহে না যাইয়া, অশ্বিনী রূপ ধারণ পূর্ব্বক উত্তরকুরুবর্ষে গমনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য ইহা অবগত হইয়া অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক বড়বারূপিণী পত্নীর সহচর হইলেন। এই সঙ্গমে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন। (ছায়া দেখ), (হরিবংশ)। ঋগ্বেদেও উপাখ্যানটী এইরূপই কিন্তু ঐ গ্রন্থে সূর্য্যপত্নীর নাম সরণ্যু লিখা আছে।

অশ্মক—কল্মাষপাদ নামক নৃপতির ক্ষেত্রজপুত্র। এই রাজার মহিষী মদয়ন্তী পতির আদেশে ভর্ত্তার বংশরক্ষার্থ মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট গমন করেন। বশিষ্ঠের ঔরসে মদয়ন্তীর গর্ভে অশ্মকের জন্ম হয়। মদয়ন্তী ৭ বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। তিনি একখণ্ড অশ্ম (প্রস্তর) দ্বারা স্বীয় উদর ভেদ করেন, ইহাতে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়; এজন্য এই পুত্রের নাম অশ্মক হয়। (হরিবংশ)

অষ্টক—মহারাজ যযাতির দৌহিত্র। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। (গালব দেখ)। ইনি একজন পুণ্যবান্ রাজা। নহুষ-তনয় যযাতি পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কিরূপ তপোনুষ্ঠানের বলে স্বর্গে আগমন করিয়াছ?" যযাতি কহিলেন

"হে দেবরাজ, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিদিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিতে ক্ষম হয় নাই।" তখন ইন্দ্র কহিলেন "মহারাজ, যেহেতু অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষলোকের অবমাননা করিলে, সেই হেতু তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে।" যযাতি কহিলেন "হে দেবরাজ, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নরলোকের অবমাননা করিয়া যদি আমাকে দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধু-সন্নিধানে পতিত হই এইরূপ অনুকম্পা করুন। ইন্দ্র কহিলেন "মহারাজ, তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে, কিন্তু সাবধান এইরূপ আর কাহারও অবমাননা করিও না।" রাজা যযাতি এইরূপে ইন্দ্রাদেশে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ পথে স্বীয় দৌহিত্র অষ্টকের ও তৎসমভিব্যাহারী প্রতর্দ্দনের এবং হর্য্যশ্বের পুত্র বসুমানের ও উশীনরপুত্র শিবির সাক্ষাৎ পাইলেন। (গালব দেখ)। ইঁহাদের সহিত যযাতির পরিচয় হইলে অষ্টক কহিলেন "মহারাজ আমার দিব্য বা অন্তরীক্ষ যে কোন স্থান থাকে তাহা আমি আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি অচিরাৎ সেই স্থানে গমন করুন।" প্রতর্দ্দন কহিলেন "মহারাজ, আপনি জ্ঞানী; অতএব যদি অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান থাকে, আপনাকে তাহার অধিকারী করিলাম।" বসুমান্ কহিলেন "মহারাজ, যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার ভোগ্য কোন স্থান থাকে, তাহা আমি আপনাকে প্রদান করিলাম; যদি প্রতিগ্রহ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় হয়, তবে তৃণদ্বারা উহা ক্রয় করুন।" শিবিও মহারাজ যযাতিকে উক্তরূপ বলিলেন। যযাতি কহিলেন "আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী স্বর্গে যাইব না; আমরা কর্ম্মফলে সকলেই স্বর্গ জয় করিয়াছি; অতএব চল, সকলে সমবেত হইয়া তথায় গমন করি।" এইরূপে মহারাজ যযাতি, অষ্টক, প্রতর্দ্দন, বসুমান্ ও শিবির সহিত স্বর্গলোকে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। (মহাভা—আদি)

অষ্টাবক্র—মহর্ষি অসিতের পুত্র দেবল রম্ভার শাপে কৃষ্ণবর্ণ ও বক্রদেহ হইয়া অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যখন মুনিশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় দেবল দৈবসহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বরে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন দৈববশতঃ একদিন স্বর্গীয় অপ্সরা রম্ভা মুনিবরকে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ দেখিয়া উপভোগার্থিনী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। ঋষি তাঁহাকে বহুপ্রকার উপদেশ দিলেও রম্ভা সম্ভোগের নিমিত্ত নানাপ্রকার প্রলোভন বাক্যে তাঁহাকে মিনতি করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহর্ষি দেবল ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহাতে রম্ভা কুপিত হইয়া মুনিকে শাপ দিলেন "হে বক্র বিপ্র, তোমার সকল শরীর বক্র ও অঙ্গনাকার হইবে এবং তুমি রূপযৌবন বিবর্জ্জিত হইয়া ত্রিভুবন গর্হিত অতীব বিকটাকার ধারণ করিবে এবং তোমার পুরাতন তপোবল নিশ্চয় সদ্যঃ বিনষ্ট হইবে।" এই বলিয়া রম্ভা চলিয়া গেল; মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল হরিপাদপদ্ম আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম বিরহে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; এবং স্বীয় অঙ্গ পূর্ব্বপুণ্যবিবর্জ্জিত ও বিকৃত দেখিয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ হরি ইহা দেখিয়া মুনির নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং নানাপ্রকার উপদেশ-বচনে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। এবং তাঁহার অষ্ট অঙ্গ বক্র দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার নাম অষ্টাবক্র রাখিলেন। (ব্রহ্মবৈঃ ৩০ অ)

মহাভারতের অষ্টাবক্রঘটিত বিবরণ অন্যরূপ। মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিল। উদ্দালক শিষ্যের জ্ঞান ও ব্যবহারে তৎপ্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যা সুজাতাকে তাহার সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ করেন। সুজাতা গর্ভবতী হইলে তাঁহার গর্ভস্থ বালক গর্ভে থাকিয়াই সর্ব্ববেদে জ্ঞানলাভ করিলেন। একদিন মাতৃ-কুক্ষিস্থিত বালক শিষ্যগণ পরিবৃত বেদপাঠকারী পিতার ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন "আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ-বেদচতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; এবং অর্জ্জিত জ্ঞানে দেখিতেছি যে আপনাদ্বারা সমীচীনরূপে বেদ পঠিত হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণ মধ্যে তদ্বাক্যে অবমানিত হইয়া উদরস্থ বালককে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন "যে হেতু তুমি কুক্ষিতে থাকিয়া আমার নিন্দা করিলে, সেই নিমিত্ত তোমার অঙ্গের অবস্থান বক্র হইবে।" গর্ভস্থ শিশু

যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হইলেন। কহোড় ধনহীন ছিলেন; অন্তর্বত্নী সুজাতাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কহোড় বিত্তলাভাশয়ে দানশীল জনকরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জনকরাজ-সভার পণ্ডিত তার্কিক-চূড়ামণি বন্দীকর্তৃক পরাজিত হইলেন। বন্দী তাঁহাকে প্রতিজ্ঞানুসারে জলমগ্ন করিয়া রাখিলেন। উদ্দালকের নিকট এ সংবাদ গেলে, তিনি কন্যার অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। যথাসময়ে অষ্টাবক্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। উদ্দালক সুজাতাকে কহোড়ঘটিত ব্যাপার অষ্টাবক্রের নিকট গোপন করিতে অনুরোধ করেন। সুজাতা পিতার আদেশ পালন করিলেন। অষ্টাবক্র মহর্ষি উদ্দালকের প্রতি পিতৃবৎ ও মাতুল শ্বেতকেতুর প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। অষ্টাবক্র ও শ্বেতকেতু প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। শ্বেতকেতু একদিন অষ্টাবক্রকে পিতার ক্রোড়ে আসীন দেখিয়া বাল-চাপল্য বশতঃ তাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক বলিলেন "এ তোমার পিতার ক্রোড় নহে।" অষ্টাবক্র মাতার নিকট দৌড়িয়া গেলেন এবং পিতার সম্বন্ধে তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুত্রকর্তৃক বারংবার সনির্ব্বন্ধে অনুরুদ্ধ হইয়া সুজাতা স্বামীর দুর্দশার বিষয় সমস্ত পুত্রকে বলিলেন। অষ্টাবক্র ইহা শুনিয়া পিতার উদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি মাতুল শ্বেতকেতুকে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞে প্রভূত ভক্ষ্যদ্রব্য লাভের আশা দেখাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় জনকরাজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক তাহাদিগকে অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়া যজ্ঞস্থলে যাইতে বাধা দিল। ইত্যবসরে রাজর্ষি জনক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, অষ্টাবক্র তাঁহার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। এক বালক সভাপণ্ডিতকে পরাজিত করিতে আসিয়াছে দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং জ্ঞানের পরীক্ষার্থ অষ্টাবক্রকে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অষ্টাবক্র রাজার সকল প্রশ্নেরই যথার্থ উত্তর দিলেন দেখিয়া রাজা তাঁহাকে সভায় যাইতে অনুমতি দিলেন। রাজা স্বয়ং বিচারস্থলে উপস্থিত হইলেন। বিচারে বন্দী পরাজিত হইলেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বন্দীকর্তৃক জলে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বন্দীর পিতা বরুণদেবের অনুগ্রহে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের স্থলে বন্দী জলনিমজ্জিত হইয়া পিতা বরুণদেবের সমীপে গমন করিলেন। অষ্টাবক্র পিতা কহোড়কে লইয়া প্রভূত ধন-রত্নসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতার আদেশে অষ্টাবক্র সমঙ্গানদী মধ্যে স্নান করিলে, তাহার অঙ্গের বক্রতা বিনষ্ট হইল; এবং সম-অঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া নদী হইতে উত্থিত হইলেন। অষ্টাবক্র জনকরাজকে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া অষ্টাবক্রসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (মহাভা—বন)

অসঙ্গ—চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের (সাত্যকি) পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)

অসমঞ্জ—সূর্য্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার অপর নাম অংশুধর। অসমঞ্জ অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হইয়া উঠাতে সগর তাঁহাকে রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইঁহার মাতার নাম কেশিনী। অংশুমান নামে ইঁহার এক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। (অংশুমান দেখ)

অসিক্নী—দক্ষ প্রজাপতির পত্নী। (দক্ষ দেখ)

অসিতলোমা—দানব বিশেষ। কশ্যপের ঔরসে ও তদীয় পত্নী দনুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ব্রহ্মার বরে এই দানব সমস্ত ভূমণ্ডল পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন। দেবতারা পরাস্ত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হন। বিষ্ণুর শরীর হইতে অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মী আবির্ভূত হইয়া ইঁহাকে বিনাশ করেন। (দেবীভাগবত)

অস্তি—কংসের জননী। (কংস দেখ)।

অহল্যা—মহর্ষি গৌতমের পত্নী। ইঁহার পিতার নাম বৃদ্ধাশ্ব। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন; ইহাতে গৌতম রুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দেন। গৌতমের শাপে ইন্দ্র বিগতবৃষণ হন।

"মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে।
অকর্ত্তব্যমিদং যস্মাদ্বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ রামায়ণ—আদি। ৪৮। ২৮

ইহার পর দেবতারা পরামর্শ করিয়া এক মেষবৃষণ ইন্দ্রে সংযোজিত করিয়া দেন; তদবধি ইন্দ্রের এক নাম মেষবৃষণ হইল। গৌতম অহল্যাকেও অভিশপ্ত করেন। তাঁহার শাপে ইনি বাতভক্ষ্যা, নিরাহারা, অনুশোচনপরায়ণা, ভস্মানুলিপ্তদেহা এবং সর্ব্ব প্রাণীর অদৃশ্যা হইলেন।

"বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যাসর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥" রামায়ণ—আদি। ৪৮। ৩০

অহল্যার অনুনয়ে গৌতম প্রীত হইয়া বলিলেন যে "আমার অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে; তবে যখন বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্র এই আশ্রমে আসিবেন তখন তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া তুমি মুক্ত হইবে।" রামলক্ষ্মণ যখন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা ইঁহাকে উক্তরূপ তপস্বিনী দেখিয়াছিলেন।

"দদর্শচ মহাভাগং তপসাদ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ।" রামায়ণ আদি।

রাম লক্ষ্মণ অহল্যাকে প্রণাম করিলেন এবং অহল্যাও স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া রামের পাদ বন্দনা করিলেন।

"রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্ম্মুদা।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সাহি তৌ॥" রামায়ণ—আদি। ৪৯। ১৮

কিন্তু পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে অহল্যা গৌতম-শাপে পাষাণী হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্র অনন্তযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"শাপদগ্ধা পুরাভর্ত্রা রাম শক্রাপরাধতঃ।
অহল্যাখ্যা শিলা জজ্ঞে শতলিঙ্গীকৃতঃ স্বরাড়্॥

(এখানে শত শব্দ অনন্তবোধক ও লিঙ্গশব্দ ভগাকারচিহ্নবাচী)

এই শাপহেতু ইন্দ্র পদ্মপুরাণে ভগাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদের ভাষ্যকার কুমারিলভট্টের মতে অহল্যা ও ইন্দ্র ঘটিত উপখ্যানটী একটা রূপকমাত্র। অহল্যা শব্দের অর্থ রাত্রি এবং ইন্দ্র শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়। দিবসে সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রি থাকে না; এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া অহল্যা ও ইন্দ্রঘটিত ব্যাপার কল্পিত হইয়াছে।

আ

আপস্তম্ব—অষ্টাদশ ধর্ম্মশাস্ত্রকারের মধ্যে ইনি অন্যতম। (মনু দেখ)। আপস্তম্ব সংহিতা ১০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ; এই গ্রন্থে কেবল প্রায়শ্চিত্তবিধি সবিস্তরে লিখিত হইয়াছে। ইনি কল্পসূত্রও সঙ্কলন করিয়াছেন। কেহ কেহ কল্পসূত্রকে বেদের সমান জ্ঞান করেন কিন্তু অপরে ইহাতে আপত্তি করেন। "কল্পস্য বেদত্বং নাদ্যাপি সিদ্ধম্" (গুরুপ্রভাকরং)।

অনেকের মতে বৌধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন প্রভৃতি নামে চলিত কল্প সূত্রাদি গ্রন্থ অপৌরুষেয়। ইনি শ্রৌত সূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করেন।

ইউক্লিডের জ্যামিতির ১ম অধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞাটি পিথাগোরসের দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া লোকে বলে কিন্তু প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষি বৌধায়ন, কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব বহুপূর্ব্বে ইহা জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন কোন বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণের বর্গ উক্ত ক্ষেত্রের দ্বিগুণ। তাঁহারা আরও জানিতেন যে কোন আয়তক্ষেত্রের কর্ণের বর্গ উক্ত আয়তক্ষেত্রের কর্ণের সম্মুখীন দুই বাহুর বর্গসমষ্টির সমান। (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলের ৪৪শ খণ্ড দেখ)।

আবি—দৈত্যরাজ অন্ধকের পুত্র। মহাদেব কর্ত্তৃক অন্ধক হত হয়; এজন্য অন্ধকপুত্র আবি পিতৃহন্তা মহাদেবের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিতে থাকেন। কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া সে এই বর লাভ করে যে নিজরূপ পরিত্যাগ না করিলে কেহ তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। একদা পার্ব্বতী স্থানান্তরে গেলে পর আবি মহাদেবের গৃহে সর্পরূপে প্রবেশ করে। নন্দী দ্বার রক্ষা করিতেছিল; সর্প মহাদেবের অঙ্গভূষণ, এজন্য সে সর্পরূপী দৈত্যকে বাধা দিল না। আবি মহাদেবের গৃহে প্রবেশ করিয়া উমারূপধারণ পূর্ব্বক মহাদেবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু রূপ পরিবর্ত্তন করাতে আবি অতি সহজেই মহেশ্বরকর্ত্তৃক নিহত হয়।

আয়োদধৌম্য—একজন বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে ইঁহার তিনজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। (মহাভা—আদি)

আরুণি—মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য। পাঞ্চাল দেশে ইঁহার নিবাস। মহর্ষি একদিন আরুণিকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে অনুমতি করিলেন। আরুণি গুরুর আদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিলেন কিন্তু অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও আলি বাঁধিতে অশক্ত হইলেন। অবশেষে তথায় শয়ন করিয়া নিজ শরীর দ্বারা ক্ষেত্র হইতে জল নির্গমের পথ বন্ধ করিলেন। কিছুকাল পরে গুরু অন্যান্য শিষ্যগণকে আরুণি কোথায় গিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আপনি তাহাকে ক্ষেত্রে আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে তথা হইতে এখন পর্য্যন্ত ফিরে নাই।" গুরু শিষ্যগণকে লইয়া ক্ষেত্রের নিকট গমন করিলেন এবং আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ডাকিতে লাগিলেন। আরুণি আলির মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বিনীতভাবে কর্দ্দমলিপ্ত দেহে গুরুর নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। গুরুর প্রশ্নের উত্তরে আরুণি বলিলেন "ক্ষেত্র হইতে অন্য উপায়ে জল নির্গমের রোধ অসম্ভব মনে করিয়া আমি নিজ শরীরদ্বারা তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত শয়ন করিয়াছিলাম, আপনার স্বর শুনিয়া কেদারখণ্ড বিদারণ পূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি।" গুরু আরুণির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড ভেদ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, এজন্য অদ্যাবধি তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং আমার আজ্ঞা পালন হেতু তোমার অশেষ শ্রেয়োলাভ হইবে; সকল বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকালে সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে। (উদ্দালক দেখ)। তদনন্তর আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া যথাভিলষিত দেশে প্রস্থান করিলেন। (মহাভা—আদি)

আয়ান (ঘোষ)—ইনি নন্দঘোষের পত্নী যশোদার সহোদর ও বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার স্বামী। ইনি ক্লীব ছিলেন।

আয়ু—একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা। ইনি বিখ্যাত রাজা নহুষের পিতা। আয়ুর পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে নহুষই জ্যেষ্ঠ (হরিবংশ)

আস্তিক—(আস্তীক)—জরৎকারু মুনির পুত্র; ইঁহার মাতার নামও জরৎকারু। মাতা সর্পরাজ বাসুকির ভগিনী। আস্তিক পিতৃকুল ও মাতৃকুলের দাহ-ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় সর্পসত্র নামে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে মহাতপাঃ আস্তিক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণের রক্ষা করিয়াছিলেন। আস্তিকের পিতা জরৎকারু পূর্ব্বে অবিবাহিত থাকাতে, তাঁহার পিতৃকুল অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছিলেন। দৈববশে জরৎকারুর সহিত পিতৃকুলের সাক্ষাৎ হয়। পিতৃকুলের দুর্দশার কারণ অবগত হইয়া তাঁহাদের উদ্ধারার্থ বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু পিতৃগণকে বলিলেন, "যদি আমি স্বনাম্নী কোন কন্যা পাই ও যদি কেহ ঐ কন্যা আমাকে ভিক্ষা স্বরূপ প্রদান করেন এবং যদি আমার ঐ কন্যাকে ভরণপোষণ করিতে না হয়, তবে আমি বিবাহ করিব।" নাগরাজ বাসুকি এই চুক্তিতে সম্মত হইয়া স্বীয় ভগিনী জরৎকারুকে অর্পণ করেন। (মহাভা—আদি)

আহুক—প্রাচীনকালে মৃত্তিকাবত নগরীতে যে সমুদয় রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহারা ভোজ নামে প্রসিদ্ধ। এই ভোজবংশে অভিজিৎ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। অভিজিতের দুই যমজ সন্তান জন্মে—পুত্রের নাম আহুক এবং কন্যা আহুকী। মহারাজ আহুক ভোজবংশীয় সমস্ত নৃপতি অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন; ভোজগণ সর্ব্বদা আহুকের

আজ্ঞানুবর্ত্তন করিতেন। আহুক স্বীয় ভগিনী আহুকীকে অবন্তিনাথের সহিত বিবাহ দেন। আহুকের পত্নীর নাম কাশ্যা। কাশ্যার গর্ভে আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবক শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ এবং উগ্রসেন কংসের পিতা। (হরিবংশ-৩৮ অ) (উগ্রসেন দেখ)

ই

ইক্ষ্বাকু—(১) বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইনি অযোধ্যার প্রথম রাজা এবং রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ; ইঁহার পুত্রের নাম কুক্ষি। (রামায়ণ—আদি)

(২) বারাণসীর রাজা; পিতার নাম সুবন্ধু। ইনি ইক্ষুদণ্ড ভেদ করিয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম ইক্ষ্বাকু হইয়াছে।

ইড়া—বৈবস্বত মনুর কন্যা। বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টি মানসে যজ্ঞার্থ আনীতজলে ঘৃত, নবনীত, আমিক্ষা (জ্বাল দেওয়া তপ্ত দুধে দধি দিলে যে ছানা হয়) ক্ষেপণ করেন। ইহা হইতে এক বৎসরে ইড়ানাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়; বুধ এই কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ইঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে বুধের এক পুত্র জন্মে। (শতপথ—ব্রাহ্মণ)

ইন্দুমতী—বিদর্ভরাজকন্যা। ইনি স্বয়ংবর সভায় অন্যান্য রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া অযোধ্যার রাজা রঘুর পুত্র অজকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহাতে অপরাপর রাজগণ ঈর্ষ্যান্বিত হন এবং অজ যখন পত্নীসমভিব্যাহারে অযোধ্যার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন তাঁহারা ইঁহাকে আক্রমণ করেন। অজ সম্মোহন অস্ত্রে সমুদয় রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অচেতন করিয়া ইন্দুমতীসহ অযোধ্যায় উপনীত হন। যথাকালে অজ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথ নামে অজের এক পুত্র জন্মে। একদা অজ ইন্দুমতীসহ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গগনমার্গগামী নারদের বীণা হইতে পারিজাত কুসুমের মালা ইন্দুমতীর গাত্রে পতিত হয়; মালা দর্শনমাত্রেই ইন্দুমতী প্রাণত্যাগ করেন এবং অপ্সরা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। পুরাকালে তৃণবিন্দু নামক ঋষির কঠোর তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইয়া অপ্সরা হরিণীকে তাঁহার তপোভঙ্গ হেতু প্রেরণ করেন। হরিণী বিলাস-বিভ্রমে মুনির তপোভঙ্গ করিতে যাইয়া তাঁহার কোপে পতিত হন। মুনি তাঁহাকে মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে অভিসম্পাত করেন। হরিণীর অনুনয়ে প্রীত হইয়া মুনি বলিলেন "স্বর্গীয় কুসুম দর্শনে তুমি শাপমুক্ত হইবে।" হরিণী মুনির শাপে বিদর্ভ রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন; এক্ষণে পারিজাত পুষ্পদর্শনে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। (রামায়ণ)

ইন্দ্র—(১) বেদোক্ত দেবতা। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যে সমুদয় দেবতার আরাধনা করিতেন তন্মধ্যে ইন্দ্র অন্যতম। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে ইঁহার মাতা ইঁহাকে বহুবর্ষ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; জন্মগ্রহণের পর ইনি পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন।

(২) পৌরাণিক দেবতা। মর্য্যাদায় ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নীচে। অপর সকল দেবতার উপর কর্ত্তৃত্ব করেন বলিয়া ইনি দেবরাজ নামে খ্যাত। ইনি পুলোমা দানবের কন্যা শচীকে বিবাহ করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ইঁহার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে ইঁহার উৎপত্তি। বৃত্রাসুর বধের জন্য দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা দেবশিল্পিবিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক ইঁহার বজ্রাস্ত্র নির্ম্মিত হয়। সমুদ্রমন্থনে ইনি ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব এবং পারিজাত বৃক্ষ প্রাপ্ত হন। (মহাভা—আদি)। বৈজয়ন্ত ইঁহার রাজপ্রাসাদ ও জয়ন্ত ইঁহার পুত্র। রাবণের পুত্র মেঘনাদ ইঁহাকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রজিৎ আখ্যা প্রাপ্ত হন। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দানব ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহাদিগের বধের জন্য ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমা নামে এক অপূর্ব্বরূপলাবণ্যসম্পন্না

রমণীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। সমুদয় প্রাণীর উৎকৃষ্ট অঙ্গ তিল তিল গ্রহণ করিয়া এই রমণীমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম তিলোত্তমা হয়। ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট গমন করেন; গমনের প্রাক্কালে ইনি ইন্দ্র ও মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করেন। চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণকারিণী এই লাবণ্যময়ী রমণীকে সর্ব্বাবস্থায় দেখিবার জন্য মহেশ্বরের চতুর্ম্মুখ ও ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী লোচনসহস্র উৎপন্ন হইল। (মহাভা—আদি)। গৌতমপত্নী অহল্যার সতীত্ব হরণের জন্য গৌতমশাপে ইনি বৃষণচ্যুত হন; এজন্য ইঁহার নাম অবৃষণ হয়। (ব্রহ্ম বৈঃ ও রামায়ণ আদি), (অহল্যা দেখ)

ইন্দ্রজিৎ—লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম মেঘনাদ। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ আখ্যা প্রাপ্ত হন। (মেঘনাদ দেখ)

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(১) কৃতযুগে এই রাজা জন্মগ্রহণ করেন। একদা এই রাজা বিষ্ণুপূজা করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কোথায় গিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকল তীর্থস্থানই তাঁহার মনে উদিত হইল, কিন্তু কোন স্থানই তাঁহার মনোমত হইল না; অবশেষে তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনান্তে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করেন এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই মন্দিরে কিরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইলেন। বিষ্ণু স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন "তুমি আমার সনাতনী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে; আজ অতি প্রত্যুষে সাগরতীরে গিয়াই এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দেখিতে পাইবে; একাকী কুঠারহস্তে তথায় গমন করিয়া স্বহস্তে কাষ্ঠখণ্ড ছেদন করিবে, এবং কর্ত্তিত কাষ্ঠখণ্ড আনিয়া আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে।" ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর আদেশানুসারে সমুদ্রতীরে গমন করিয়া স্বহস্তে কুঠারদ্বারা কাষ্ঠখণ্ডচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ম্মা ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু ছলপূর্ব্বক রাজাকে কাষ্ঠ ছেদনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে রাজা যথাযথ উত্তর দিলেন। ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু বলিলেন, "আপনার উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু আপনি এ কঠিন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না সন্দেহ; আমার সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার তুল্য এক শিল্পী আছেন, আপনার অনুমতি হইলে এই শিল্পী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্মত হইলেন এবং শিল্পিরূপী বিশ্বকর্ম্মাকে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা পদ্মপত্রায়তনয়ন, শঙ্খ চক্র গদাধর শান্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি, গোক্ষীর সদৃশ গৌরবর্ণ লাঙ্গলাস্ত্রধারী মহাবল বলদেব মূর্ত্তি ও বাসুদেবভগিনী সুভদ্রার সুশোভন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। (নারদ পুরাণ)

(২) মহাভারতের বনপর্ব্বে এক ইন্দ্রদ্যুম্নের বিষয় লিখিত আছে; তিনি মার্কণ্ডেয় মুনি অপেক্ষাও প্রাচীন। তিনি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন, পরে আবার স্বর্গারোহণ করেন।

ইরাবান্—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র। পার্থের ঔরসে ঐরাবতের বিধবা কন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম। পক্ষিরাজ বৈনতেয় নাগরাজ ঐরাবতের জামাতাকে বিনষ্ট করিলে, নাগরাজ সন্তানবিহীনা, দীনমনা স্বীয় বিধবা কন্যাকে অর্জ্জুনে সম্প্রদান করেন। অর্জ্জুন কামবশবর্ত্তিনী সেই কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইরাবান্ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া কৌরব পক্ষীয় বহু সৈন্য ধ্বংস করেন, পরে দুর্য্যোধন পক্ষভুক্ত আর্য্যশৃঙ্গ নামক রাক্ষস কর্ত্তৃক তুমুল সংগ্রামে নিহত হন। (মহাভা—ভীষ্ম)

ইলা—(১) বৈবস্বত মনুর কন্যা। ইনি বিষ্ণুর বরে পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে কুমার-বনে (কার্ত্তিকেয়ের বিহার বনে) প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন। ইনি বুধের পত্নী; ইঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। (ইড়া দেখ)।

(২) ধ্রুবের পত্নী ও বায়ুর কন্যা। ইঁহার গর্ভে ধ্রুবের উৎকল নামে পুত্র ও অপর এক কন্যা জন্মে।

ইলবিলা—যক্ষরাজ কুবেরের মাতা ও বিশ্রবা মুনির পত্নী। ইঁহার সন্তান বলিয়া কুবেরের অপর নাম ঐলবিল। (রামায়ণ)।

ইল্বল—দানববিশেষ। মহামুনি অগস্ত্য ইহার কনিষ্ঠ সহোদর বাতাপীকে ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করেন এবং ইহার নিকট প্রচুর অর্থ লাভ করেন। ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মণদিগকে আমন্ত্রণ করিত এবং বাতাপীর মাংস ভক্ষণ করাইয়া তাঁহাদিগকে বধ করিত। (রামায়ণ), (অগস্ত্য দেখ)

উ

উগ্র—শিবের বায়ুমূর্ত্তি। শিবের অষ্টমূর্ত্তিঃ—ক্ষিতিমূর্ত্তি সর্ব্ব, অপ্ (জল) মূর্ত্তি ভব, তেজ (অগ্নি) মূর্ত্তি রুদ্র, মরুৎ (বায়ু) মূর্ত্তি উগ্র, ব্যোম (আকাশ) মূর্ত্তি ভীম, যজমান মূর্ত্তি পশুপতি, চন্দ্রমূর্ত্তি মহাদেব ও সূর্য্যমূর্ত্তি ঈশান।

উগ্রচণ্ডা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। ইঁহার অষ্টাদশ ভুজ। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে এই কোটিযোগিনী-পরিবৃতা, অষ্টাদশভুজ-সমন্বিতা দেবী হিন্দুগৃহে আবির্ভূতা হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন। এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতী স্বীয় পিতা দক্ষের যজ্ঞধ্বংস করিয়াছিলেন। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রজাপতি দক্ষ দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে অস্থিমালাপরিহিত জামাতা শিবকে এবং স্বীয় কন্যা সতীতে দক্ষ নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী স্বামীর অনুরোধ রক্ষা না করিয়াই অনিমন্ত্রিতভাবে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হন; পিতা তৎসমক্ষে শিবের নিন্দা করেন। পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী ক্রোধে ও অপমানে দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ শিবের নিকট গেলে, মহাদেব ভূত প্রেত প্রভৃতি অনুচর লইয়া দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হন। সতী উগ্রচণ্ডারূপ ধারণপূর্ব্বক কোটিযোগিনীপরিবৃত হইয়া ও শিবের অনুচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। (কালিকা পুরাণ)

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ; ইঁহার অপর নাম মাতঙ্গী। শুম্ভ-নিশুম্ভের উৎপাতে দেবগণ উৎপীড়িত হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে মতঙ্গমুনির আশ্রমে সমবেত হন এবং তথায় ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। ভগবতী মতঙ্গমুনির পত্নী মাতঙ্গীর রূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট আবির্ভূত হন; এবং তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত মুনিপত্নীর শরীর হইতে এক দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও নৃমুণ্ডমালিনী; ইঁহার দক্ষিণদিকের উপরের হাতে খড়্গ ও নীচের হাতে চামর, এবং বামদিকের উপরের হাতে কাতারী ও নীচের হাতে খর্পর। ইঁহার গলায় মুণ্ডমালা, চক্ষু রক্তবর্ণ, পরিধান কৃষ্ণবস্ত্র ও দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত। ঋষিগণ এই মূর্ত্তিকে উগ্রতারা বলেন; মাতঙ্গীর শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভগবতীর এই উগ্রতারা মূর্ত্তির নাম মাতঙ্গী।

উগ্রসেন—যদুবংশীয় রাজা আহুকের পুত্র ও কংসের পিতা। আহুকের কাশ্যানাম্নী মহিষীর গর্ভে দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবকের ৪ পুত্র ও ৭টী কন্যা। দেবক কন্যা ৭টীকে বসুদেবের সহিত বিবাহ দেন। এই সাত কন্যার মধ্যে দেবকী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা; দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরষে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। উগ্রসেনের ৯ পুত্র ও ৫ কন্যা। এই ৯ পুত্রের মধ্যে কংস সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। (কংস দেখ)। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জরাসন্ধের সাহায্যে কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। (হরিবংশ)

উতঙ্ক—মহর্ষি বেদের শিষ্য। মহর্ষি আয়োদধৌম্যের তিনটী বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন।—আরুণি, উপমন্যু ও বেদ। বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য নামক অপর এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন। একদা বেদ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ার সময় শিষ্য উতঙ্কের উপর সমস্ত গৃহকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া গমন করেন। একদিন উপাধ্যায়-পত্নীগণ উতঙ্কের চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন "তোমার এক গুরুপত্নী ঋতুমতী হইয়াছেন; এ সময় তোমার গুরু গৃহে নাই; যাহাতে তোমার গুরুপত্নীর ঋতু নিষ্ফল না হয়, তাহা তোমাকে করিতে হইবে।" উতঙ্ক এই অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিতে

অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহর্ষি বেদ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পত্নীদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং উতঙ্ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বৎস, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক, এখন তুমি গৃহে গমন করিয়া গৃহী হও।" উতঙ্ক গুরুকে দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করিলেন। গুরু বলিলেন "বৎস্ উতঙ্ক, তুমি এ বিষয়ে তোমার গুরুপত্নীকে বল, তিনি যাহা অভিরুচি করেন তাহাই আনিয়া দিবে।" অনন্তর উতঙ্ক গুরুপত্নীর নিকট যাইয়া স্বাভিলাষ প্রকাশ করাতে গুরুপত্নী বলিলেন, "বৎস, আগামী চতুর্থ দিবসে এক ব্রত উপলক্ষে আমাকে কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে পরিবেশন করিতে হইবে; অতএব যাও, পৌষ্যরাজার মহিষী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, তাহা আনিয়া দেও, তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে।" এইরূপ অভিহিত হইয়া উতঙ্ক গমন করিলেন। পথিমধ্যে মহাকায় বৃষভে আরূঢ় এক পুরুষ দেখিতে পাইলেন। পুরুষটী বলিলেন, "ওহে উতঙ্ক, তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে; তোমার উপাধ্যায়ও এই বৃষপুরীষ ভক্ষণ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া উতঙ্ক বৃষপুরীষ ভক্ষণপূর্ব্বক আচমন করিতে করিতে মহারাজ পৌষ্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। উতঙ্ক মহারাজ পৌষ্যের সমীপে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, মহারাজ উতঙ্ককে অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মহিষীর নিকট কুণ্ডল প্রার্থনা করিতে বলিলেন। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গিয়া রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন না, বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া চতুরতা করার জন্য মহারাজকে ভৎর্সনা করিলেন। রাজা বলিলেন "আমি চতুরতা করি নাই, আমার কথা মিথ্যা নহে, তবে আপনি বোধ হয় অশুচি আছেন; কারণ কোন ব্যক্তি অশুচি থাকিলে সে আমার পত্নীকে দেখিতে পায় না।" উতঙ্ক কহিলেন যে তাহার অশুচি হওয়ার আর কোন কারণ তিনি দেখিতে পান না, তবে বৃষপুরীষভক্ষণ করিয়া আচমন করিতে করিতে তিনি আসিয়াছেন, ইহাই হয়ত অশুচিত্বের করণ হইয়া থাকিবে। পৌষ্য বলিলেন ইহাই কারণ বটে, যেহেতু উত্থানাবস্থায় ও গমনকালে আচমন করা আর না করা উভয়ই তুল্য। উতঙ্ক পুনর্ব্বার জলগ্রহণপূর্ব্বক তিনবার আচমন করিলেন এবং অন্তঃপুরে গিয়া রাজমহিষীর দর্শন পাইলেন। রাজপত্নী উতঙ্কের আগমন কারণ অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে এই কুণ্ডল অতি সাবধানে নিতে হইবে, যেহেতু নাগরাজ তক্ষক ইহা অপহরণ করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কুণ্ডল লইয়া আসিতে আসিতে উতঙ্ক পথিমধ্যে এক নগ্ন ক্ষপণক দেখিতে পাইলেন; এই ক্ষপণক মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল। উতঙ্ক রাজমহিষীদত্ত কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নান তর্পণাদির জন্য এক সরোবরে অবতীর্ণ হইলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণক নিঃশব্দপদসঞ্চারে সত্বর তথায় যাইয়া কুণ্ডলদ্বয় অপহরণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। উতঙ্ক স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া দ্রুতবেগে ক্ষপণকের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ক্ষপণকের সন্নিকৃষ্ট হইবামাত্র সে তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূপৃষ্ঠ বিদারণপূর্ব্বক নাগলোকে স্বীয়ভবনে উপস্থিত হইল। উতঙ্ক পৌষ্যমহিষীর বচন স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণে যত্নবান্ হইলেন, এবং প্রবেশদ্বার বিস্তৃত করিবার জন্য দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখিয়া বজ্রকে ব্রাহ্মণের সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন। বজ্র প্রভুর আদেশক্রমে তদ্দণ্ডে কাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্ত্তদ্বার বিস্তীর্ণ করিল। উতঙ্ক তদ্দ্বারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া বহুবিধ হর্ম্ম্য অবলোকন করিলেন এবং কুণ্ডল প্রাপ্তির জন্য নাগগণের স্তব আরম্ভ করিলেন কিন্তু সর্পদিগের স্তব করিয়া যখন কুণ্ডল পাইলেন না, তখন একটু চিন্তিত হইয়া ইতস্ততো দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; দেখিলেন দুইটী স্ত্রী সুচারু-বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে; তন্ত্রের সূত্রসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বাদশ অরযুক্ত একখানি চক্র ৬টী শিশুকর্তৃক ঘূর্ণিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি অপর একজন পুরুষ ও মনোহর একটী অশ্ব দেখিলেন। পুরুষটী উতঙ্কের স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার কি উপকার করিতে পারেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। উতঙ্ক স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি তাঁহাকে অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিতে বলিলেন। ফুৎকার করামাত্র অশ্বের ইন্দ্রিয় রন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল ও তাহা হইতে নাগলোকে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল।

ইহা দেখিয়া তক্ষক অগ্ন্যুৎপাত ভয়ে ভীত হইয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক উতঙ্ক সমীপে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে উহা অর্পণ করিল। উতঙ্ক ভাবিলেন "আজ ব্রতোপলক্ষে উপাধ্যায় পত্নী কুণ্ডল পরিধানপূর্ব্বক পরিবেশন করিবেন, আর আমি এতদূর রহিয়াছি।" ভাবিতে ভাবিতে উতঙ্ক চিন্তায় বিশীর্ণ হইতে লাগিলেন। সেই পুরুষ উতঙ্কের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সেই অশ্বে আরোহণ করিতে বলিলেন। আরোহণ করিবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে উতঙ্ক গুরুপত্নী সমীপে নীত হইলেন। উতঙ্ক গুরুপত্নীকে কুণ্ডল অর্পণ করিলে, উপাধ্যায়পত্নী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গুরু উতঙ্কের নিকট বিলম্বের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন "তুমি যে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছ তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা, দ্বাদশ অরযুক্ত চক্র সংবৎসর, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র দিবারাত্রি, ৬টী শিশু ৬ ঋতু, পুরুষটী ইন্দ্র, ও অশ্বটী অগ্নি; যে বৃষের পুরীষভক্ষণ করিয়াছ তাহা নাগরাজ ঐরাবত এবং ঐ পুরীষ অমৃত।" (মহাভা—আদি)

উতথ্য—একজন ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন ঋষি। ইঁহার পত্নীর নাম মমতা এবং কনিষ্ঠভ্রাতা দেবগুরু বৃহস্পতি। মমতার গর্ভে উতথ্যের এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র স্বীয় পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন এবং জগতে দীর্ঘতমা নামে খ্যাত হন। (মহাভা—আদি)

উত্তম—রাজা উত্তানপাদের পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র; প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই মহিষী—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব ও রাজার প্রিয়তমা সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুব বিমাতা সুরুচি কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া বনে গমন করেন এবং কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া জগতে ধন্য হন। উত্তম অল্পবয়সে অবিবাহিত অবস্থায় একদিন মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করেন। এবং একটা বলবান্ যক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হন। উত্তমের মাতা সুরুচিও পুত্রের অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ করিয়া পুত্রের গতি প্রাপ্ত হন। (বিষ্ণুপুরাণ)

উত্তর—মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের পুত্র। বিরাট রাজের শ্যালক ও সেনাপতির মৃত্যুসংবাদ হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধনের কর্ণে প্রবেশ করিলে, রাজা দুর্য্যোধন বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণের জন্য সৈন্যসহ সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করেন এবং উত্তর গোগৃহ আক্রমণার্থ স্বয়ং ভীষ্মদ্রোণ কর্ণাদিসহ যাত্রা করিলেন। সুশর্ম্মা দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করিয়া বল পূর্ব্বক গো গ্রহণ করিলে স্বয়ং মৎস্যরাজ বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া সুশর্ম্মার হস্তে বন্দী হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অজ্ঞাতবাসে বিরাটরাজ-ভবনে ছিলেন; এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার কয়েক দিন মাত্র বাকী আছে। যুধিষ্ঠির দেখিলেন তাহাদের আশ্রয়দাতা শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। তিনি বিরাট রাজের উদ্ধারের জন্য ভীমের প্রতি আদেশ দান করিলেন। জ্যেষ্ঠের অনুরোধে ভীম সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া গোসকল সহ রাজা বিরাটকে উদ্ধার করেন। সুশর্ম্মার পরাজয় বার্ত্তা শুনিয়া দুর্য্যোধন সসৈন্যে ভীষ্মদ্রোণাদিসহ উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করিলেন। বিরাট স্বীয় পুত্র উত্তরকে দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বৃহন্নলা নামধারী ক্লীবরূপী অর্জ্জুন উত্তরের সারথ্য গ্রহণ করেন। কুরুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া উত্তর ভয়ে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পলায়নোদ্যত হইলে অর্জ্জুন আত্ম পরিচয় দিয়া স্বয়ং রথী হইয়া যুদ্ধে গমন করেন; উত্তর অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধে কুরুসৈন্য বিমথিত করিয়া, ভীষ্মদ্রোণকর্ণাদি মহারথীদিগের সহিত দুর্য্যোধনকে পরাভূত করিয়া অপহৃত গো পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক জয়ধ্বনির সহিত বিরাটের নিকট উপস্থিত হন। এই দিনই পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের শেষ দিন। উত্তর বিরাটের নিকট অর্জ্জুনের পরিচয় করিয়া দিলেন; পরে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত বিরাটের পরিচয় হইল। রাজভবনে আনন্দের উৎস দেখা দিল। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত বিরাটরাজকন্যা উত্তরার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। (মহাভা—বিরাটপর্ব্ব)

উত্তরা—মৎস্যরাজ বিরাটের কন্যা এবং অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর পত্নী। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম উত্তর। পাণ্ডবদের বিরাট ভবনে অজ্ঞাতবাস কালে বৃহন্নলা নামধারী ক্লীবরূপী অর্জ্জুন ইঁহাকে চিত্র-নাট্যসঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। বিরাটের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয়ের পর অর্জ্জুন স্বীয় পুত্র অভিমন্যুর সহিত ইহার বিবাহ দেন। ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু হত হইবার সময় ইনি গর্ভবতী ছিলেন। এই যুদ্ধের অবসানে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক অশ্বত্থামার শিরোমণি কর্ত্তিত হইলে,

অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বংশ লোপের জন্য ইঁহার গর্ভে ইষিকাস্ত্র প্রয়োগ করেন। ইঁহার গর্ভ হইতে ৬ মাসে পরীক্ষিৎ মৃত সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে পরীক্ষিতের জীবন দান করিলেন। (মহাভারত)

উত্তানপাদ—সায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইঁহার মাতার নাম শতরূপা। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রিয়ব্রত। রাজা উত্তানপাদের দুই মহিষী—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতি অপেক্ষা সুরুচি রাজার অধিকতর প্রিয়া ছিলেন। সুনীতির গর্ভে বিখ্যাত ধ্রুব ও সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

উদ্দালক—প্রাচীন আর্য্যঋষি। ইঁহার প্রকৃত নাম আরুণি; ইনি গুরু আয়োদধৌম্যের বরে উদ্দালক নামে খ্যাত হইয়াছেন। (আরুণি দেখ)। ইঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতকেতু পিতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই তাঁহার মাতাকে রমণাভিলাষে বলপূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া চলিলেন। মাতাকে এইরূপ নীয়মানা দেখিয়া শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলেন। উদ্দালক বলিলেন "বৎস, ক্রোধ করিও না; এ সনাতন ধর্ম্ম; গবীগণের ন্যায় স্ত্রীসকল অরক্ষিতা; তাহারা স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও অধর্ম্ম লিপ্ত হয় না।" কিন্তু শ্বেতকেতু পিতৃবাক্যে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিলেন "আজ হইতে যে স্ত্রী পতিভিন্ন পুরুষান্তরসংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, তাহারা উভয়েই ভ্রূণ হত্যারূপ ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবে।"

"ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিংনার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥ (মহাভা আদি—১১২ অ)।

শ্বেতকেতু এই ধর্ম্মানপেত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণের সখা ও তাঁহার পরমভক্ত। ভারতযুদ্ধের অবসানে একদা ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠ গমনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন "আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; আমি আপনাদের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীর ভার অপহৃত করিয়াছি; ভূমি আর এখন পাপভারাক্রান্ত নহেন। কিন্তু আমি যদি বলদৃপ্ত যদুকুলকে বিনাশ না করিয়া যাই, তাহা হইলে এই বংশীয়েরা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদয় লোক বিনষ্ট করিবে। আর বিপ্রশাপ দ্বারা অচিরে এই বংশ বিনাশের সম্ভাবনা হইয়াছে। অতএব আপনারা গমন করুন, আমি এই যদুবংশ ধ্বংস সমাপন করিয়াই আসিতেছি।" উদ্ধবের প্রার্থনার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান, বদ্ধ ও মুক্তজীব, সাধুলক্ষণ ও ভক্তিলক্ষণ প্রভৃতি, সাধুসঙ্গের মহিমা, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন; এবং বলিলেন "হে উদ্ধব, এখন তুমি বদরিকাশ্রম নামক আমার ধামে গমন কর, তথায় বল্কল পরিহিত হইয়া বন্য ফল মূল আহারে জীবিকা নির্ব্বাহ কর, এবং সুখে নিস্পৃহ হইয়া অলকানন্দা দর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার পাপমুক্ত হও। অতঃপর আমাতে মন সমর্পণ করিয়া পরমগতিলাভ সহকারে আমাকে প্রাপ্ত হও।" অনন্তর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে অন্তরে ধ্যান করিতে করিতে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং যোগান্তে তনু ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। (শ্রীমদ্ভা—১১ শস্ক)

উপমন্যু—মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য। ইনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন। একদা তাঁহার উপাধ্যায় তাঁহাকে সাবধানে গো-রক্ষা করিতে বলিয়া গোচারণে প্রেরণ করেন। উপমন্যু গুরুর আদেশক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন গুরু তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আহার কর?" উপমন্যু বলিলেন যে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন। গুরু আপত্তি করিয়া বলিলেন যে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন এরূপ করা উপমন্যুর উচিত হয় নাই। ভক্তশিষ্য ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য গুরুকে অর্পণ করিলেন। তৎপর আর একদিন তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া গুরু তাঁহার আহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। উপমন্যু

গুরুকে বলিলেন যে দিনে একবার ভিক্ষা করিয়া তিনি গুরুকে প্রদান করেন, পরে আবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া যে তণ্ডুল পান তদ্দ্বারা নিজের উদর পূর্ত্তি করেন। গুরু ইহাতেও আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, দিনে দুইবার ভিক্ষা করাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হয়। কিয়দ্দিবস পরে গুরু আবার শিষ্যকে তাহার আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য বলিলেন যে গোবৎসের দুগ্ধ পান হইয়া গেলে তাহার মুখনিঃসৃত ফেন তিনি পান করেন। গুরু বলিলেন "শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের আহারের ব্যাঘাত হয়।" এই কথা বলিয়া গুরু তাঁহাকে বৎসের মুখ-নিঃসৃত ফেন পান করিতেও নিষেধ করিলেন। তৎপর একদিন উপমন্যু অরণ্যে গোচারণ সময় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্ররস পান করায় তিনি অবিলম্বে অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে পতিত হন। রাত্র আগত হইল অথচ উপমন্যু ফিরিল না দেখিয়া গুরু অপর শিষ্যদিগকে বলিলেন "উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি বলিয়া সে বোধ হয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেনা; অতএব চল আমরা তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" ইহা বলিয়া আয়োদধৌম্য সশিষ্য বনে গমন পূর্ব্বক উপমন্যুকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু কূপমধ্য হইতে উত্তর দিয়া তাঁহার কূপে পতিত হইবার কারণ গুরুকে বলিলেন। গুরু উপমন্যুকে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন। অশ্বিনীকুমার উপমন্যুর স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক পিষ্টক ভক্ষণ করিতে দিলেন; কিন্তু গুরুর অনুমতি ব্যতীত উপমন্যু পিষ্টক ভক্ষণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ইঁহার গুরুভক্তি দেখিয়া বলিলেন "তোমার দন্ত হিরণ্ময় হউক এবং তুমি চক্ষুষ্মান হও।" স্বর্গবৈদ্যের বর-প্রভাবে উপমন্যু অচিরে চক্ষুরত্ন লাভ করিলেন। গুরু আয়োদধৌম্য বর দিলেন "সকল বেদ ও সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে।" অতঃপর গুরুর আজ্ঞাক্রমে উপমন্যু স্বগৃহে গমন করিলেন। (মহাভা—আদি)

উপসুন্দ—দৈত্য বিশেষ। ইহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম সুন্দ। ইহারা নিকুম্ভ নামক দৈত্যের পুত্র। মহাসুর হিরণ্য-কশিপুর বংশে নিকুম্ভের জন্ম। সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্য বিজয়ের অভিপ্রায়ে বিন্ধ্য পর্ব্বতে গিয়া কঠোর তপস্যা করে। ব্রহ্মা ইহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে তাহারা ত্রৈলোক্য স্থাবর জঙ্গমের অবধ্য হইবে এবং তাহারা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া একে অন্যকে বধ না করিলে আর তাহাদের মৃত্যু নাই। এই বর পাইয়া তাহারা ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ-ধ্বংস করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা উহাদের প্রতি অভিসম্পাত দিলেন কিন্তু ব্রহ্মার বর প্রভাবে তাঁহাদের অভিশাপ কার্য্য-কর হইল না। তাহারা ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা নানারূপ ধারণ করিয়া তপস্বীদিগকে বধ করিতে লাগিল; ইহাতে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যাদি লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সিদ্ধগণ ব্রহ্মার সমীপে প্রতীকার লাভের জন্য গমন করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমানাম্নী পরমরূপলাবণ্যবতী ললনা সৃষ্ট করিলেন। তিলোত্তমা ব্রহ্মার আদেশে সুন্দ উপসুন্দের নিকট গমন করিল। তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হইয়া উহাকে পাইবার জন্য উভয় ভ্রাতায় পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং একে অন্যকে নিহত করিল।

(ইন্দ্র দেখ), (মহাভা-আদি)।

উমা—মহাদেবের পত্নী, পার্ব্বতী। ইনি হিমালয়ের কন্যা; মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। পূর্ব্বজন্মে ইনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতরাজের গৃহে জন্মধারণ করেন এবং তপস্যা-দ্বারা মহাদেবকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন। উমার কঠোর তপস্যা দেখিয়া জননী মেনকা "উঃ মা আর তপস্যা করিওনা" বলিয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম উমা হইয়াছে।

"উ মেতিমাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" কুমারসম্ভবম্।

তারকাসুরের উৎপাতে ইন্দ্রাদি দেবতারা উপদ্রুত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা কহিলেন যে মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ের হস্তে তারকাসুরের নিধন হইবে; অতএব যাহাতে মহেশ্বরের সন্তানোৎপাদনে প্রবৃত্তি হয় তদ্বিষয়ে

দেবতাদিগকে উপায়াবলম্বনে পরামর্শ দিলেন। দেবতাদের কৌশলে হর পার্ব্বতীর মিলন হইল; কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব হইল এবং অবশেষে তারকাসুরের পতন হইল। (কার্ত্তিকেয় দেখ)

উর্ব্বশী—অপ্সরা বিশেষ; বিখ্যাত স্বর্গবেশ্যা। একদা ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিতে করিতে সভাস্থলে উপস্থিত রাজা পুরূরবার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে উর্ব্বশীর তালভঙ্গ হয়। এজন্য দেবরাজ ইঁহাকে কিছুকাল মর্ত্ত্যবাসিনী হইতে শাপ দেন। হরিবংশ মতে উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। অভিশপ্ত হইয়া উর্ব্বশী মর্ত্ত্যে অতুল যশস্বী রাজা পুরূরবার সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার পত্নীত্ব স্বীকার করেন। উর্ব্বশী কহিলেন "মহারাজ, যতদিন আমি আপনাকে নগ্ন না দেখিব, যতদিন অকামা পত্নীতে আপনি সঙ্গত না হইবেন, যতদিন পর্য্যন্ত আমার শয্যাপার্শ্বস্থ মেষদ্বয় অপহৃত না হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত আপনি একসন্ধ্যা ঘৃত মাত্র আহার করিবেন, ততদিন ভার্য্যাভাবে আপনার গৃহে বাস করিব; ইহার অন্যথা হইলে আমি শাপমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত হইব"। পুরূরবা এই চুক্তিতে সম্মত হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, ও শতায়ু নামে ৭টী পুত্র জন্মে। এদিকে বহুবর্ষ গত হইলে উর্ব্বশীর অভাবে গন্ধর্ব্বগণ বড়ই বিমর্ষ হইলেন; তাঁহারা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বকে উর্ব্বশীর মেষ হরণে নিযুক্ত করেন। বিশ্বাবসু নিশাকালে উর্ব্বশীর মেষদ্বয় হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, ইহা দেখিয়া উর্ব্বশী রাজাকে জাগরিত করেন। রাজা সেই সময় উলঙ্গাবস্থায় নিদ্রিত ছিলেন; তদবস্থাতেই মেষদ্বয় উদ্ধারের জন্য গন্ধর্ব্বের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ অবসর বুঝিয়া অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে রাজভবন আলোকিত করিলেন। উজ্জ্বল আলোকে রাজাকে উলঙ্গ দেখিয়া উর্ব্বশী তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এদিকে উর্ব্বশীকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। (হরিবংশ)

মহাভারতে আছে অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষার্থ বৈজয়ন্তপুরে গমন করেন। বহুদিন তিনি ইন্দ্রের নিকট অস্ত্র শস্ত্র ও গন্ধর্ব্বগণের নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। একদিন অর্জ্জুন ইন্দ্রের সভায় অপ্সরাদের নৃত্য দর্শন ও গীতবাদ্য শ্রবণ করিবার সময়ে তিনি উর্ব্বশীর দিকে উৎফুল্ললোচনে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলেন। পরবর্ত্তী নিশায় অর্জ্জুনের সহিত উর্ব্বশীর সাক্ষাৎ হয়। উর্ব্বশীর প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "আপনি আমার গুরুপত্নী তুল্য; কুন্তী ও ইন্দ্রাণী আমার যেরূপ পূজনীয়া আপনিও তদ্রূপ। আমি ইন্দ্রসভায় নৃত্যের সময় পৌরববংশের জননী মনে করিয়া আপনার প্রতি উৎফুল্ললোচনে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, আপনার গর্ভ হইতে পৌরববংশের উদ্ভব হইয়াছে, অতএব আপনি আমার পরম গুরু।" উর্ব্বশী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন "তুমি মানহীন ও ক্লীব হইয়া স্ত্রীগণ মধ্যে নৃত্যকরতঃ ষণ্ডের ন্যায় কালযাপন করিবে।" অর্জ্জুনকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়া উর্ব্বশী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(মহাভা—বন)

দেব মিত্রাবরুণ উর্ব্বশীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু উর্ব্বশী সম্মত না হওয়ায় মিত্রাবরুণের রেত স্খলন হয়। এই রেতের একভাগ হইতে মহামুনি অগস্ত্য এবং অপর ভাগ হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন।

(অগস্ত্য দেখ)।

উলূক (উলুক)—(১) ইনি ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কুরুপক্ষ হইতে দূতরূপে যুধিষ্ঠিরাদির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। শকুনির পরামর্শে দুর্য্যোধন পাণ্ডবপক্ষীয় কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরাদিকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। উলূক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় যথাযথরূপে যুধিষ্ঠিরাদির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। (মহাভা-উদ্যোগ)। ভারত যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে উলূক সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হন; সহদেব ভল্লাস্ত্রে ইঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন। (মহাভা-শল্য)

(২) বৈশেষিকদর্শন প্রণেতা। ইঁহার অপর নাম কণাদ। এজন্য বৈশেষিক দর্শনকে ঔলুক্য (ঔলুক্য) দর্শন বা কাণাদ দর্শনও বলা হইয়া থাকে। ইনি ৬০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (কণাদ দেখ)

উলূপী—ঐরাবতকুলে সমুদ্ভূত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশানুসারে অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষকাল বনবাস করেন। এই বনবাস কালে তিনি গঙ্গাদ্বারে গমন পূর্ব্বক তথায় আশ্রম নির্দেশ পূর্ব্বক বাস করেন। একদা অর্জ্জুন তর্পণার্থ স্নান করিয়া গঙ্গা হইতে উঠিতেছিলেন, এমন সময়ে নাগরাজদুহিতা উলূপী মদনবাণে পীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক পাতালে নাগ-ভবনে লইয়া গেলেন এবং তথায় অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অর্জ্জুন সেই রাত্রি তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পরদিন প্রাতে উলূপী সমভিব্যাহারে গঙ্গাদ্বারে উপনীত হন। উলূপী অর্জ্জুনকে তথায় রাখিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। (মহাভা—আদি)।

উশীনর—চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজা। ইনি মহারাজ যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে শিবি নামে পুত্র উৎপাদন করেন। (গালব দেখ)। যমুনা নদীর যে স্থানে জলা ও উপজলা নামে শাখা নদীদ্বয় উভয় পার্শ্বে প্রবহমানা ছিল, তথায় রাজা উশীনর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ধর্ম্মজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন পক্ষিরূপে ও অগ্নিদেব কপোতরূপে ইঁহার সভায় আগমন করেন। কপোত শ্যেন ভয়ে ভীত হইয়া উশীনরের উরুদেশে পতিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। শ্যেন কপোতের অনুসরণ করিয়া রাজা উশীনরের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল "মহারাজ, সকলেই আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া জানে; ক্ষুৎপীড়িত আমাকে বঞ্চিত করিয়া আমার ভক্ষ্য কপোতকে আশ্রয় দেওয়া আপনার পক্ষে অধর্ম্মের কাজ হইবে।" রাজা বলিলেন "আমি ভীত ও শরণাগতকে আশ্রয় দিয়াছি, ইহাতে আমার অধর্ম্ম না হইয়া পুণ্যই হইবে, এবং ইহাকে তোমার নিকট ছাড়িয়া দিলে আমার কার্য্য নিন্দনীয় হইবে; যেহেতু যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, লোকমাতা বা গো হনন করে এবং যে শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে তাহাদের উভয়েরই তুল্যপাপ হয়।" শ্যেন কহিল "মহারাজ, সকল প্রাণীই আহারহেতু উৎপন্ন, আহার দ্বারা বর্দ্ধিত এবং আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অদ্য যদি আমি ভক্ষ্যদ্রব্যে বঞ্চিত হই তবে ক্ষুধায় আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে এবং আমার পুত্র কলত্র আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিবে; অতএব আপনি এক প্রাণীর রক্ষার্থ বহুপ্রাণী বিনষ্ট করিতে যাইতেছেন; ইহাতে আপনার অধর্ম্ম হইবে। যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্ম কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয় তাহা ধর্ম্মই নহে, তাহাকে অপধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, আর যে ধর্ম্মে কোন বিরোধ নাই তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।" রাজা কহিলেন "তুমি প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ; তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব সুন্দররূপে অবগত আছ, তবে তুমি কেন শরণাগতকে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছ? যাহা হউক এখানে কপোত ব্যতীত তোমার আহার্য্য অনেক আছে; গো, বৃষ, মহিষ ও অন্যান্য তোমার আহার্য্য বস্তু বহু আছে; তুমি যাহা চাও তাহাই দিতেছি।" শ্যেন বলিল "বৃষ, বরাহ, মৃগ প্রভৃতি আমি কিছুই খাইব না, অন্য কোন আহার্য্য বস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই। রাজা কহিলেন "কপোত ব্যতীত তুমি যাহা চাও তাহাই আমি দিতেছি; যে কর্ম্ম করিলে তুমি এই কপোতটীকে পরিত্যাগ করিবে তাহা আমাকে বল, আমি তাহাই করিতেছি।" শ্যেন বলিল "যদি কপোতের প্রতি আপনার স্নেহ হইয়া থাকে তবে, তুলাদণ্ডে তুলিত কপোতপরিমিত আপনার শরীরের মাংস দিলে আমি তুষ্ট হইব।" রাজা সম্মত হইয়া বলিলেন যে অদ্যই কপোতপরিমিত মাংস আমার শরীর হইতে কর্ত্তন করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া ধর্ম্মপরায়ণ রাজা উশীনর স্বয়ং আত্মমাংস কর্ত্তন করিয়া কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে তুলিত করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ স্বদেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিয়াও যখন দেখিলেন কপোতের সমান ওজন হইতেছে না, তখন রাজা, শরীরে আর মাংস না থাকায়, আপনিই তুলার অপর পাল্লায় আরোহণ করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল; ইন্দ্র ও অগ্নি পক্ষিরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া উশীনরকে বলিলেন যে তাঁহারা রাজার ধর্ম্ম পরীক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেবতাদ্বয় উশীনরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "তোমার কীর্ত্তি পৃথিবীতে অক্ষয় হইবে।" ইহা বলিয়া তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিলেন। রাজাও বহু ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলেন। (মহাভা-আদি ও বন)

উ

উর্ম্মিলা—শিরধ্বজ জনকের ঔরসজাত কন্যা ; লক্ষ্মণের পত্নী। শিরধ্বজ জনকের যজ্ঞবেদিসম্ভবা কন্যা সীতা-দেবীকে রামচন্দ্র বিবাহ করেন। শিরধ্বজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ জনক। কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করেন। শিরধ্বজের আদি পুরুষ নিমি ; নিমির পুত্র মিথি। (রামায়ণ—আদি) এই মিথি হইতে মিথিলা দেশের নামকরণ হয়। মিথির পুত্র জনক। জনকবংশে যত রাজা জন্মগ্রহণ করেন, সকলেই জনক উপনামে খ্যাত।

উষা—দৈত্যরাজ বাণের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পত্নী। (অনিরুদ্ধ দেখ)

ঋ

ঋচীক—ঔর্ব্ব নামক বিখ্যাত ঋষির পুত্র। ইঁহার পত্নীর নাম সত্যবতী। এই পত্নীর গর্ভে ঋচীকের তিন পুত্র জন্মে ; পুত্রগণের নাম জমদগ্নি, শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ। (হরিবংশ—২৭ অ)। ক্ষত্রিয় বিনাশের জন্য কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ এই মুনিতে সংক্রান্ত হইয়াছিল। ঋচীক আপনার বংশ রক্ষার্থ মহারাজ কুশিকের পুত্র গাধিরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন। গাধিরাজের কোন বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে তাঁহার ভার্য্যা অতি বিষণ্নমনে কালযাপন করিতেছিলেন। ঋচীক আপনার ভার্য্যা ও শ্বশ্রূর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুইপ্রকার চরু প্রস্তুত করেন। গাধিরাজ-মহিষী উৎকৃষ্ট পুত্র লাভাশয়ে কন্যার সম্মতিক্রমে স্বয়ং ব্রাহ্মচরু ভক্ষণ করেন ; কন্যা, ঋচীক পত্নী, ক্ষাত্রচরু ভক্ষণ করিলেন। পরিশেষে ঋচীক পত্নী চরুর প্রভাব অবগত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে নিজ পুত্রে সংক্রান্ত না হইয়া পৌত্রে সংক্রান্ত হয় সেইরূপ বর স্বামীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। এই চরুপ্রভাবে ঋচীকের ভার্য্যা জমদগ্নি নামে এক তেজস্বী পুত্র প্রসব করেন। জমদগ্নির ঔরসে রাম (পরশুরাম) জন্মগ্রহণ করেন। রাম স্বীয় পিতামহীর বরানুসারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অধিকার করিয়াছিলেন। এদিকে গাধিরাজ-পত্নী জামাতা-প্রদত্ত চরুপ্রভাবে ব্রাহ্মতেজযুক্ত বিশ্বামিত্র নামে পুত্র প্রসব করেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(মহাভা-অনুশাসন)।

ঋতুপর্ণ—ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব বিখ্যাত নৃপতি। ইঁহার রাজধানী অযোধ্যা-নগরী এবং ইনি রাজা অযুতাশ্বের পুত্র। কলির কোপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহারাজ নল ইঁহারই অশ্বাধ্যক্ষের কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক কলির কোপের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঋতুপর্ণের নিকট নিজনাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া নল বাহুক নামে পরিচিত হন। বাহুককে ঋতুপর্ণ মাসিক দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বেতনে অশ্বাধ্যক্ষের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। বাহুক অশ্ববিদ্যার বিনিময়ে ঋতুপর্ণের নিকট অক্ষ-ক্রীড়া শিক্ষা করেন। অক্ষক্রীড়া শিক্ষার ফলে নলের শরীর হইতে কলি পলায়ন করে। ঋতুপর্ণ অক্ষক্রীড়ায় এবং নল অশ্বচালনে অতি নিপুণ ছিলেন ; অতি সহজেই তাঁহারা স্ব স্ব বিদ্যার বিনিময় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। নলের রাজ্যচ্যুতির পর বিদর্ভরাজ ভীম জামাতা নলের ও কন্যা দময়ন্তীর বিপদ অবগত হইয়া নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিলেন। তৎপ্রেরিত সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চেদীরাজ-ভবনে রাজকন্যা সুনন্দার দাসীরূপে নিযুক্তা দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। অবিলম্বেই দময়ন্তীর পরিচয় হইল। চেদীরাজ বহুবিধ খাদ্যসামগ্রী ও উপঢৌকনসহ বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে দময়ন্তীকে তাঁহার পিতা বিদর্ভরাজ ভীমের নিকট প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তীও পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া নলের অনুসন্ধানে বহুলোক প্রেরণ করিলেন। তৎপ্রেরিত একটী লোক সংবাদ আনিল যে নল অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ রাজের অধীনে ছদ্মবেশে অশ্বাধ্যক্ষের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। দময়ন্তী পিতার অজ্ঞাতসারে মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ংবরের

কথা ঋতুপর্ণের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন এবং ঋতুপর্ণকে স্বয়ংবরে উপস্থিত হইতে আমন্ত্রণ করিলেন। ঋতুপর্ণ অশ্বাধ্যক্ষ বাহুককে সারথি করিয়া দ্রুতবেগে বিদর্ভরাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঋতুপর্ণ উপস্থিত হইলে মহারাজ ভীম তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। বিদর্ভরাজ ভীম দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ংবর ও ঋতুপর্ণের আমন্ত্রণ ইত্যাদি কিছুই অবগত ছিলেন না। ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন; এমন সময়ে ভীম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋতুপর্ণ মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন যে তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভীম উত্তর শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; যাহা হউক এ বিষয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি ঋতুপর্ণের উপযুক্ত আহারবাসস্থানাদির বন্দোবস্ত করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে কেশিনী নাম্নী পরিচারিকাদ্বারা দময়ন্তী নলের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন। অবিলম্বেই নলের সহিত ভীম ও ঋতুপর্ণের পরিচয় হইল। রাজভবনে আনন্দের সীমা রহিল না। ঋতুপর্ণ সসম্মানে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিষধরাজ নল অবিলম্বে দময়ন্তীর সহিত স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। (মহাভা-বন)

ঋষ্যশৃঙ্গ—তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ঋষি। ইনি মহারাজ দশরথের কন্যা শান্তাকে বিবাহ করেন; মহারাজ ইঁহাদ্বারা পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া রামাদি পুত্রচতুষ্টয় লাভ করেন। ইনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র। একদিন স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া মহর্ষি বিভাণ্ডকের রেত জলমধ্যে পতিত হয়; তাঁহার আশ্রমস্থ এক হরিণী সেই রেত সহ জলপান করাতে গর্ভিণী হইয়া যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করে। এই হরিণী এক শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতে এই মুনির শৃঙ্গ জন্মিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা আশ্রমে পিতার নিকটে থাকিয়া তৎকর্ত্তৃক লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পিতা বিভাণ্ডককে ছাড়া তিনি অন্য কাহাকেও জানিতেন না। এই আশ্রমে অবস্থিত হইয়া তিনি মুখ্য ও গৌণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। একদা অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তিনি বড় বিপন্ন হইয়া পড়েন। তিনি রাজ্যের ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের উপদেশ চাহিলেন। ব্রাহ্মণেরা পরামর্শ দিলেন যে ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনয়ন করিয়া এক যজ্ঞ সম্পাদন করা হউক। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করা সহজ নহে; রাজা গণিকা প্রেরণ করিয়া তাহাদের হাবভাবে ভুলাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে পরামর্শ স্থির করিলেন। গণিকাগণ যথাসময়ে প্রেরিত হইল; তাহারা বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিকালে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল, মোদক ও পানীয়দ্বারা এবং আলিঙ্গনদ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আমোদিত করিল। পরে বিভাণ্ডকের প্রত্যাগমন আশঙ্কা করিয়া গণিকাগণ সেদিন দ্রুতপদে আশ্রমত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ঋষ্যশৃঙ্গের মন একটু চঞ্চল হইল; তিনি গণিকাদিগের বিষয় কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যে স্থানে গণিকাদিগের দেখা পাইয়াছিলেন, পর দিবস সেই স্থানে গেলেন এবং পুনর্ব্বার তাহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া উৎফুল্ল হইলেন। বারাঙ্গনারা ঋষ্যশৃঙ্গকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল; তিনি সম্মত হইলেন এবং বারাঙ্গনাদের সহিত অঙ্গদেশে রোমপাদের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে বিভাণ্ডক ধ্যানবলে এই সমুদয় ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধভরে রোমপাদের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন রোমপাদ বিভাণ্ডক মুনির রোষ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় মিত্র অযোধ্যাপতি দশরথের কন্যা শান্তাকে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ কন্যারূপে তাহাকে ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত পরিণীতা করিলেন। দশরথ শান্তাকে রোমপাদের নিকট পোষ্যপুত্রিকারূপে অর্পণ করেন। বিভাণ্ডক রোমপাদের রাজ্যে উপস্থিত হইবামাত্র সকলেই ঐ রাজ্য ঋষ্যশৃঙ্গের রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহা শুনিয়া বিভাণ্ডকের ক্রোধ উপশমিত হইল; তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে আদর প্রদর্শন করিয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (রামায়ণ-আদি)



একলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। একদা পাণ্ডব ও কৌরবগণ গুরু দ্রোণাচার্য্যের আদেশে মৃগয়ার্থ বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা মৃগান্বেষণে বনমধ্যে ইতস্ততঃ গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের একটী কুকুর কৃষ্ণচর্ম্মাবৃত মলিন কলেবর একলব্যকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। একলব্য সারমেয়টীর মুখবিবরে ৭টী শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার শব্দ করিবার শক্তি রহিত করিলেন। সারমেয় মুখসংসক্ত শরগুলিসহ পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইল। পাণ্ডবেরা কুকুরের মুখে বাণপ্রয়োগের কৌশল অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বোধে বাণপ্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবেরা অনুসন্ধান করিয়া একলব্যের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তিনি দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য ইহা তাঁহার মুখে শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। পাণ্ডবেরা রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট এই বৃত্তান্ত বলিলেন। অর্জ্জুন বিনীতভাবে গুরুকে বলিলেন "আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আমাপেক্ষা কোন শিষ্যই উৎকৃষ্টতর হইবে না, এখন তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে।" গুরু কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন কিন্তু একলব্যের সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই স্মরণ হইল না। তিনি অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া সেই বনে প্রবেশ পূর্ব্বক একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। একলব্য গুরুকে সন্নিহিত দেখিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। একলব্য বলিলেন যে তিনি ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক তাহাকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে না পারিয়া তিনি বিষণ্নমনে অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক মৃণ্ময় দ্রোণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহাতে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রতধারণ পূর্ব্বক যথাবিধি অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া দ্রোণ বলিলেন "হে বীর, যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। একলব্য প্রীতমনে গুরুদক্ষিণা দিতে সম্মত হইলে দ্রোণ বলিলেন "হে বীর, তোমার দক্ষিণ হস্তের একটী অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে প্রদান কর।" সত্যবাক্ একলব্য অম্লানবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। তৎপর একলব্য অপর অঙ্গুলি দ্বারা শর ক্ষেপণ করিয়া দেখিলেন যে তাহার শরের গতি পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে। এইরূপে হৃদয়ের কঠোরতার পরিচয় দিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। (মহাভা-আদি ও বন)



ঐলবিল—যক্ষরাজ কুবেরের নামান্তর। (ইলবিলা দেখ)



ঔর্ব্ব—বিখ্যাত প্রাচীন আর্য্য ঋষি। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান ছিলেন; কিন্তু কোন অলৌকিককারণবশতঃ ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। উঁহারা দৈবোপহতচিত্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তানদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতেন। এই সময়ে কোন একটী ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী রমণী স্বীয় গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন। শত্রু কর্তৃক অনুসৃত হইয়া প্রবলবেগে প্রধাবন বশতঃ ঐ রমণীর উরুদেশ ভেদ করিয়া হুতাশন সদৃশ এক তেজস্বী সন্তান নির্গত হয়। উরু হইতে নির্গত হওয়াতে এই ঋষির নাম ঔর্ব্ব হইয়াছিল। ঔর্ব্ব ভূমিষ্ঠ হইয়াই ক্রোধানলে অবনী ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। ঔর্ব্ব পিতৃপুরুষগণ কর্তৃক ক্রোধোপশমে অনুরুদ্ধ হইয়া ক্রোধবহ্নি সমুদ্রে বড়বামুখে নিঃক্ষেপ করেন। তদবধি বাড়বাগ্নির অপর নাম ঔর্ব্বানল হইয়াছে। (মহাভা-অনুশাসন)।

ক

কংস—ভোজবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইনি মথুরার রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা। ইনি জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দানবরাজ দ্রুমিলের ঔরসে ও উগ্রসেনের পত্নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের সাহায্যে পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। পিতা মাতা, জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই ইঁহাকে বিদ্বেষ করিতেন। ইনি নিজ পিতৃব্যকন্যা দৈবকীকে বসুদেবের সহিত বিবাহ দেন। বিবাহ কালে দৈববাণী হয় যে দৈবকীর গর্ভসম্ভূত অষ্টমগর্ভজাত সন্তান কংসকে বধ করিবে। কংস এইজন্য বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। কারাগারে ইঁহাদের যে সকল সন্তান হইতে লাগিল, কংস সকলকেই বধ করিতে লাগিলেন। বসুদেব ও দৈবকী বংশলোপের আশঙ্কায় ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রে অষ্টম গর্ভজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে গোকুলে গোপরাজ নন্দের আলয়ে রাখিয়া আসেন। সেই রাত্রিতেই নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মে। কন্যা আর কেহ নহে, স্বয়ং যোগমায়া। যোগমায়ার মায়াতে সেই রাত্রিতে গোকুলের সকলেই অচেতন হইয়াছিল; এজন্য বসুদেবের সন্তান পরিবর্ত্তন করিতে অসুবিধা হয় নাই। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গৃহে রাখিয়া যশোদার কন্যাকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে কংস জানিলেন যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা জন্মিয়াছে; তিনি সেই কন্যাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া কন্যা দর্শকবর্গের চমৎকার বিধান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে আকাশ মার্গে গমন করিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেল "রে দুর্বৃত্ত কংস, তোর হন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া কংস, বসুদেব ও দৈবকীকে কারামুক্ত করিলেন এবং কৃষ্ণের অনুসন্ধান লইয়া তাহার বধের জন্য নানা চর নিযুক্ত করিলেন। কংসপ্রেরিত চরসকল কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইল। অবশেষে কংস ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। (হরিবংশ)

কংসাবতী—কংসের ভগিনী ও উগ্রসেনের কন্যা। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহার স্বামী।

ককুৎস্থ—সূর্য্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, তৎপুত্র শশাদ, তৎপুত্র পুরঞ্জয়। এই পুরঞ্জয় ককুৎস্থ নামে জগতে খ্যাত হইয়াছিলেন। পুরাকালে দেব ও দানবে বিশ্ববিনাশক ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবতারা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পুরঞ্জয়ের সাহায্য প্রর্থনা করেন। পুরঞ্জয় বলিলেন "যদি দেবরাজ ইন্দ্র আমার বাহন হন, তবে আমি দৈত্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিব।" ইন্দ্র প্রথমে এই প্রস্তাবে লজ্জায় অসম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে বিষ্ণুর অনুরোধে সম্মত হইলেন। ইন্দ্র এক মহা বৃষভের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুরঞ্জয়কে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। পুরঞ্জয় বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুদে আসীন হইয়া দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; ঘোর যুদ্ধের পর দানবগণ পরাজিত হইল। বহু দৈত্য সমরে বিনষ্ট হইল এবং অপরে পাতালে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। বৃষের ককুদে আরূঢ় হইয়া দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এই হেতু পুরঞ্জয়ের নাম ককুৎস্থ হইয়াছিল। পুরঞ্জয়বংশীয় নৃপতিগণ কাকুৎস্থ নামে জগতে খ্যাত হইলেন। (শ্রীমদ্ভা—৯ম স্ক)

কচ—পুরাকালে এই বিশ্বলাভের জন্য দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যে সমুদয় অসুর দেবতা কর্ত্তৃক নিহত হইত, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে জীবিত করিতেন। পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্ত এই সকল দৈত্য দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু অসুরেরা যে সকল দেবতার প্রাণনাশ করিত, দেবগুরু বৃহস্পতি তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না। এজন্য এই মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যালাভার্থ দেবতারা বৃহস্পতির পুত্র কচকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন। কচ শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হইলেন এবং অনতিবিলম্বে গুরুকন্যা দেবযানীর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। অসুরেরা কচের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বধ করিল। দেবযানীর

অনুরোধে শুক্রাচার্য্য কচকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। দৈত্যেরা কয়েক দিন পর পুনর্ব্বার কচের প্রাণ সংহার করিল। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য এবারও কচের প্রাণদান করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে দেবযানী কচকে পুষ্পাহরণার্থ প্রেরণ করিলে দৈত্যেরা তাঁহাকে পথে আক্রমণ পূর্ব্বক তৃতীয়বার বধ করিল এবং তাঁহার শব অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ সুরার সহিত মিশ্রিত করিল। এই ভস্মমিশ্র সুরা শুক্রাচার্য্যের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে পান করাইল। এদিকে দেবযানী কচকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না দেখিয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক কচের জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য বলিলেন "অসুরেরা নিশ্চয়ই কচকে বধ করিয়াছে; আমি দুইবার তাঁহাকে বাঁচাইয়াছি, এখন দেখিতেছি তাঁহার জীবনদান বৃথা হইতেছে, যেহেতু অসুরেরা সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে বধ করিবে; অতএব কচের বিষয় তুমি বৃথা ভাবনা করিয়া শরীর ক্ষয় করিও না।" কিন্তু দেবযানী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না; অবশেষে তাঁহার অনুনয়ে শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে কচকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কচ আহুত হইয়া গুরুর উদরের মধ্য হইতে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার উত্তর শুনিয়া তাঁহাকে জঠরে গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কচ বলিলেন "আপনার প্রভাবে আমি বলবতী স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার পূর্ব্বঘটনা স্মরণ হইতেছে; এবং আমার পূর্ব্বার্জ্জিত তপস্যা ক্ষয় না হওয়ায় আমি এই ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেছি। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ আপনার পানীয় সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল।" শুক্র কহিলেন "দেবযানী, আর কচের প্রাণ রক্ষা হয় না যেহেতু সে আমার উদরস্থ হইয়াছে। তাহাকে বাঁচাইতে গেলে আমার প্রাণ যাইবে।" দেবযানী বলিলেন "কচ মরিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব এবং আপনি জীবিত না থাকিলেও আমি প্রাণ রাখিব না; এখন যাহা আপনার ভাল বোধ হয়, করুন।" শুক্রাচার্য্য কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কচকে বলিলেন "দেখ দেবযানী তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, এজন্য আমি তোমাকে সঞ্জীবনী বিদ্যাদান করিব, কিন্তু আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; অতএব তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে তুমি আমার উদর হইতে বহির্গত হইয়া আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবে। দেখিও, এই ধর্ম্মপ্রতিপালনে বিমুখ হইও না।" কচ গুরুর প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি শুক্রাচার্য্যের নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়া উদর হইতে বহির্গত হইলেন এবং মৃত গুরুকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কচ সহস্রবৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া তাঁহার আদেশে স্বর্গে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে দেবযানী বলিলেন "দেখ, তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ, এখন যথাশাস্ত্র আমার পাণিগ্রহণ কর, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছি।" কচ কহিলেন "হে শুভে, তুমি আমার গুরুকন্যা, অতএব মাননীয়া, এজন্য আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না। দুইজনে বহুক্ষণ যুক্তিতর্কের পরও যখন কচ দেবযানীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না, তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। দেবযানী কহিলেন "আমি নিরাপরাধা, তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ, এজন্য আমার পিতৃপ্রদত্ত বিদ্যা ফলবতী হইবে না"। কচ বলিলেন "আমি তোমাকে কোন দোষাশঙ্কায় ত্যাগ করিতেছি না, গুরুপুত্রী বলিয়া গ্রহণে অসম্মত হইয়াছি; আমি শাপের উপযুক্ত নহি; তোমার এই শাপ কামপ্রযুক্ত, অতএব ইহা আমাতে কার্য্যকারী হইবে না; আর আমি প্রতিশাপ দিতেছি যে তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন মুনিকুমার বা ব্রাহ্মণকুমার তোমার পাণিগ্রহণ করিবে না; তুমি ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত জাতীয়ের ভার্য্যা হইবে। তুমি আমাকে যে অভিসম্পাত করিতেছ, আমি স্বীকার করিলাম তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু আমি যাহাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিব তাহার ইহা ফলবতী হইবে"। অতঃপর কচ স্বর্গে গমন করিয়া দেবতাদিগকে এই সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিলেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। (মহভা—আদি)

কণাদ—বিখ্যাত প্রাচীন আর্য্য ঋষি। ইনি হিন্দুর ষড়্‌দর্শনান্তর্গত বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। ইনি তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া কণাদ নামে খ্যাত হইয়াছেন। জীবিকার কঠোরতাই আর্য্য ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলসূত্র। এই ঋষির প্রকৃত নাম উলূক (বা উলুক); এজন্য কণাদদর্শনের অপর নাম ঔলূক্য (বা উলুক্য) দর্শন। কণাদের মতে ভাব পদার্থ ৬টী যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। তিনি

বলেন এই ষট্পদার্থ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়। কণাদ পরমাণুবাদী ; তাঁহার মতে অদৃষ্ট কারণ বিশেষদ্বারা পরমাণু সমুদয়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকে বলেন যে কণাদ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তিনিই প্রথমে জগতের নিকট দেখাইয়াছেন যে, তেজ ও আলোক একই মূল পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা। কণাদ দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় না, এজন্য অনেকে কণাদকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন।

কণ্ব—ইনি তপঃপ্রভাবসম্পন্ন প্রাচীন ঋষি। ইনি অপ্সরা মেনকাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা শকুন্তলার পালক পিতা। ইঁহার আশ্রম মালিনী নদীদ্বারা বেষ্টিত। একদা দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া স্বর্গ-বেশ্যা মেনকাকে ঋষির তপোভঙ্গহেতু প্রেরণ করেন। মেনকার চেষ্টায় ঋষির তপোভঙ্গ হয় এবং ঋষি রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত কিয়ৎকাল বাস করেন। মেনকা মুনির সহযোগে অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। অনন্তর যথাকালে এক কন্যা সন্তান প্রসূত হইলে মেনকা মালিনী নদীতটে বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। পক্ষিগণ সদ্যোজাতা কন্যাটীকে ভূপতিত দেখিয়া করুণহৃদয়ে বেষ্টন পূর্ব্বক হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিল। মহর্ষি কণ্ব সেই সময়ে স্নানার্থ মালিনীতটে গমন করিয়া কন্যাটীকে দেখিতে পান এবং তথা হইতে উহাকে আশ্রমে আনয়ন করিয়া নিজ কন্যার ন্যায় লালন পালন করেন। শকুন্ত (পক্ষী) কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া মুনি ইহার নাম শকুন্তলা রাখেন। (মহাভা—আদি)

কণ্ডু—ঋষি বিশেষ। ইনি কণ্ড মুনির পুত্র। একদা ইঁহার কঠোর তপস্যায় দেবরাজ পুরন্দর ভীত হইয়া প্রম্লোচা নাম্নী এক অপ্সরাকে ইঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। প্রম্লোচার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইনি বহুকাল অপ্সরার সহিত বাস করেন। একদিন হঠাৎ নিজের অধোগতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ইঁহার চৈতন্য হইল। ইনি অপ্সরাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় কঠোর তপস্যাদ্বারা মুক্তিলাভ করেন।

(বিষ্ণু পুরাণ)।

কতি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। ইনি এই মহর্ষির ঔরসে শালাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কতি হইতে কাত্যায়নবংশ প্রতিষ্ঠিত।

কদ্রু—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইঁহার গর্ভে সহস্র অণ্ড জন্মে ; এই অণ্ডগুলি হইতে সহস্র নাগ বহির্গত হয়। কদ্রু স্বামীর নিকট তুল্যবলসম্পন্ন সহস্র নাগ পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কদ্রুর সহিত পণে পরাজিত হইয়া সপত্নী বিনতা পঞ্চাশৎ বর্ষ তাঁহার দাসত্ব করেন, পরে গরুড়ের চেষ্টায় তাঁহার দাসত্ব মোচন হয়। একদা ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা কদ্রু ও বিনতার নিকট দিয়া গমন করিতেছিল ; কদ্রু সেই অশ্বটীকে দেখিয়া বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের বর্ণ কিরূপ ? বিনতা কহিলেন শুক্ল ; কিন্তু কদ্রু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে উহা কৃষ্ণবর্ণ। উভয়ে পণ করিলেন যে যাঁহার কথা মিথ্যা হইবে, তিনি অপরের দাসত্ব করিবেন। অশ্ব চলিয়া গেল। কদ্রু পুত্রগণের নিকট অবগত হইলেন যে উক্ত অশ্বের পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ। কদ্রু বিপদ গণিলেন ; তিনি আগামী দিবস পুত্রদিগকে উক্ত অশ্বের পুচ্ছ বেষ্টন করিয়া থাকিতে বলিলেন। সর্পগণ তাহাই করিল ; দূর হইতে শ্বেত-পুচ্ছ সর্পবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছিল। বিনতা পণে হারিয়া কদ্রুর দাসত্ব স্বীকার করিলেন। কদ্রু সপত্নীপুত্র গরুড়ের সহিত দাসীপুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। কদ্রুর আদেশানুসারে গরুড় সর্পদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে নিতে বাধ্য হইতেন। গরুড় মাতার নিকট এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে তাঁহার পণের বিষয় সবিস্তর বলিলে গরুড় শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং সর্পগণের নিকট গিয়া বলিলেন "ওহে বল দেখি, তোমাদের কি কাজ করিয়া দিলে আমরা মাতাপুত্রে তোমাদের এই অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারি ?" সর্পগণ বলিল যে যদি তুমি আমাদিগকে অমৃত আনিয়া দিতে পার, তবে তোমাদের দাসত্ব মোচন হইবে। গরুড় তাহাই হইবে বলিয়া মাতার অনুমতিক্রমে চন্দ্রলোকে গমন করিলেন। পথে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করাতে পিতা কশ্যপের

পরামর্শে প্রকাণ্ডকায় যুদ্ধনিরত গজকচ্ছপদ্বয় ভক্ষণ করিয়া অমৃতাহরণার্থ ঊর্দ্ধমুখে প্রস্থান করেন। (গরুড় দেখ)। ইন্দ্রাদি দেবগণ গরুড়কে যথাসাধ্য বাধা দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সমুদয় দেবতা গরুড়ের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। গরুড় অমৃত হরণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষ পথে আগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে ইন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলেন। উভয়ের পরামর্শ হইল যে গরুড় গৃহে অমৃত স্থাপন করা মাত্র ইন্দ্র উহা অপহরণ করিবেন। গরুড় অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক সর্পদিগকে বলিলেন "এই অমৃত আনিয়াছি; ইহা কুশের উপর রাখিলাম; শীঘ্র তোমরা স্নানপূত হইয়া আগমন পূর্ব্বক অমৃত পান কর।" নাগগণ অমৃত দর্শনপূর্ব্বক স্নান করিতে গেল। এদিকে ইন্দ্র আসিয়া অমৃত অপহরণ করিলেন। নাগগণ স্নানানন্তর গৃহে প্রবেশ করিয়া অমৃত দেখিতে পাইল না; তাহারা মনে করিল যে কুশাসনে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অমৃত থাকিবে; এই মনে করিয়া তাহারা কুশাসনের উপর লেহন করিতে লাগিল। বারংবার লেহনে তাহাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তদবধি সর্পগণের দ্বিজিহ্ব সংজ্ঞা হইয়াছে। এইরূপে গরুড় কর্ত্তৃক বিনতার দাসত্ব মোচন হইল। (মহাভা—আদি)।

কন্দর্প—কামদেবের নামান্তর। ইনি ইন্দ্রাদি দেবতাকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মহেশ্বরের ক্রোধে পড়িয়া তাঁহার নেত্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন। তদবধি কন্দর্পের অনঙ্গ আখ্যা হইয়াছে। জন্মান্তরে তিনি প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে ও রুক্মিণীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম হইতে সপ্তম দিনে তিনি অন্তঃপুর হইতে শম্বর দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃত হন। শম্বর শ্রীকৃষ্ণের ভয়ানক শত্রু। শম্বরের পত্নী মায়াবতী নিঃসন্তান ছিলেন। শম্বর পত্নীর সন্তোষবিধানার্থ কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে মায়াবতীর হস্তে লালন পালনার্থ অর্পণ করিলেন। মায়াবতী অন্য কেহ নহেন, ইনি কন্দর্পের পত্নী রতিদেবী। মহাদেবের ক্রোধে পতিকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া তিনি জন্মান্তরে পতির রক্ষণার্থ শম্বরের গৃহে তাহার পত্নীরূপে উপস্থিত হন। প্রদ্যুম্নকে হস্তে পাইয়া মায়াবতীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি স্বামীকে পুত্রভাবে পালন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া স্বীয় দাসীর হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়া মায়াবতী শম্বরকে বিনাশ করিতে প্রদ্যুম্নের প্রতি উপদেশ দিলেন। মায়াবতীর পরামর্শ অনুসারে প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে যুদ্ধে বধ করিয়া মায়াবতী সহ জননী রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। (হরিবংশ)

কন্দলী—ইনি মহামুনি ঔর্ব্বের জানুস্তবা কন্যা। কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসার সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার পৌত্র ও অত্রিমুনির পুত্র; ইনি শঙ্করের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই অযোনিসম্ভবা কন্যা কন্দলী অত্যন্ত রূপসম্পন্না ছিলেন; কিন্তু তাঁহার একটু দোষ ছিল, তিনি অত্যন্ত কলহপ্রিয়া। যথাশাস্ত্র পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে ঔর্ব্ব দুর্ব্বাসাকে কন্যার একশত অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কলহপ্রিয়া পত্নীর সহিত দুর্ব্বাসার মনোবাদ আরম্ভ হইল, ক্রমে দিন দিন মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুর্ব্বাসা পত্নীর শতাধিক কটুবাক্য সহ্য করিয়া অবশেষে একদিন তাঁহাকে শাপ দিলেন "তুমি দগ্ধ হও।" তখন জনার্দ্দন বিপ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্ব্বাসাকে তপস্যায় মন দিতে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কন্দলী জন্মান্তরে আর কাহারও ভার্য্যা হইলেন না; তিনি কদলীজাতি (কলাগাছ) হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিলেন। কন্যার বিপদের সংবাদ ধ্যানযোগে অবগত হইয়া মহামুনি ঔর্ব্ব দুর্ব্বাসার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক অভিশাপ দিলেন "যেহেতু তুমি সামান্য দোষে আমার কন্যাকে ভস্মসাৎ করিলে, এজন্য তোমার মহা পরাভব হইবে।" এই অভিসম্পাত করিয়া মহামুনি ঔর্ব্ব প্রস্থান করিলেন। এই শাপ প্রভাবে দুর্ব্বাসা মহারাজ অম্বরীষের নিকট হতদর্প হন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

কপালী—মহাদেবের নামান্তর; কপাল (মাথার খুলি) ধারণ করাতে তাঁহার এই নাম।

কপিল—বিখ্যাত সিদ্ধর্ষি। ইনি কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে ও দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহামুনি কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার বলিয়া খ্যাত। ইনি সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর; নিরীশ্বর হইলেও ষড়্দর্শনের

মধ্যে দার্শনিক যুক্তির মহিমায় ইহার স্থান অতি উচ্চ। এই দর্শনে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই—অন্ততঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব একথা স্পষ্টই আছে। কপিল বলেন সমস্ত জগৎ প্রকৃতি (জড়প্রকৃতি) হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতি অনাদি, প্রকৃতির ন্যায় পুরুষ (আত্মা) ও অনাদি। আত্মা সৃষ্ট করেন না, তিনি দ্রষ্টা মাত্র। মানবের কর্ম্মফলানুসারে আত্মা দেহান্তর আশ্রয় করেন। যখন কর্ম্মক্ষয় হয় তখন আত্মা আর দেহান্তরে প্রবেশ করেন না, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন। এই দর্শনের মতে বস্তু মাত্রই সৎ। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি, ইহা এই দর্শনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে বীজের ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না; বীজের অবয়ব বর্ত্তমান থাকে। এই ভাবভূত বীজাবয়ব হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়; অতএব প্রমাণিত হইল ভাবপদার্থই ভাবের উৎপত্তির কারণ। এই দর্শনে বেদের অবিরোধী ও অনুকূল যুক্তিসকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দর্শনের মতে দুঃখ ত্রিবিধ:—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। বাতপিত্ত শ্লেষ্মাদির বৈষম্য নিবন্ধন শারীর দুঃখকে এবং কামক্রোধাদিজনিত মানস দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। মনুষ্যপশ্বাদি হইতে জনিত দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ এবং যক্ষপিশাচাদির আবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মুক্তি। কিরূপে এই মুক্তিলাভ করিতে হইবে তাহার উপায় এই দর্শনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তর্ক হইতে পারে, বিবিধশাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই ত এই ত্রিবিধ দুঃখ নাশ হইতে পারে, তবে কেন কঠোর শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণ করিব? একটা প্রচলিত কথা আছে, "যদি আকন্দ বৃক্ষেই মধু পাওয়া যায়, তবে কোন্ মূর্খ মধু আহরণার্থ পর্ব্বতে যাইতে ইচ্ছা করে?" ঔষধ সেবনে শারীর দুঃখ, লাবণ্যবতী অঙ্গনা সংসর্গে বা মদিরাদি সেবনে মানসদুঃখ ও নিরাপদ স্থানে বসতি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখ এবং মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে আধিদৈবিক দুঃখ দূর করা যাইতে পারে। ইহার উত্তর অতি সহজ। প্রোক্ত উপায়ে দুঃখের সাময়িক নিরসন হইলেও, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। ঔষধ সেবনে রোগের একবার নিবৃত্তি হইলেও পুনরায় রোগ হইতে পারে। শাস্ত্রোপদেশ যথাযথ অনুসরণ করিলে বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হয়; এই বিবেকদ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইলে উহা পুনরায় উদ্ভূত হইতে পারে না। আবার অশ্বমেধ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও পুনরায় স্বর্গচ্যুতি ঘটিতে পারে। শাস্ত্রে নহুষ যযাতি প্রভৃতির স্বর্গচ্যুতি বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গ সুখবিশেষ মাত্র; সুখের উৎপত্তি আছে; কাজেই লয়ও আছে। আর এক কথা, যজ্ঞে পশুবধ বিহিত হইয়াছে। যজ্ঞদ্বারা যেমন পুণ্যসঞ্চয় হয়, পশুবধ দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পাপও সঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞাদি দ্বারা স্থায়িস্বর্গ বা মুক্তিলাভ হয় না। মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় বিবেকলাভ। বিবেক লাভ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে তত্ত্ব জ্ঞানলাভ কঠোর পরিশ্রমসাধ্য হইলেও উহা লাভ করা চাই, নচেৎ মুক্তি অসম্ভব। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ। সাংখ্যদর্শনে জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত শব্দে প্রতীয়মান জগৎ বুঝায় এবং অব্যক্ত শব্দে যাহা প্রকৃত (অর্থাৎ প্রকৃতি) তাহাকে বুঝায়। বেদান্তে যেমন জগৎকে অলীক জ্ঞান করা হইয়া থাকে, সাংখ্যে তদ্রূপ নহে। এই দর্শনে সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি যাহা আছে মনে করি, বাস্তবিক তাহা সত্যই আছে, তাহা মিথ্যা নহে, প্রকৃত। সাংখ্যেরা অলীকের পরিবর্তে ক্ষণিক বলেন; অর্থাৎ আমরা চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি যাহা দেখিতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা যদিও প্রকৃত চন্দ্র সূর্য্য নহে, তথাপি উহারা অলীক নহে। উহারাও এক প্রকার পদার্থ, তবে উহারা ক্ষণিক এবং উহাদের দ্বারা উহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারি। জগতের কারণ লইয়া বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে ঘোর বিবাদ। বৈদান্তিক বলেন যে প্রতীয়মান জগতের (অর্থাৎ মায়ার) পশ্চাতে ঈশ্বর আছেন কিন্তু সাংখ্য বলেন তাহা নহে, ঐ প্রতীয়মান জগতের পশ্চাতে প্রকৃতি (অর্থাৎ অব্যক্ত) বর্ত্তমান। বৈদান্তিক বলেন যে সংসার (জগৎ) রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তি মাত্র; ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন যে সর্পের স্থানে যেমন রজ্জু আছে, তদ্রূপ সংসারের স্থানে একটা কিছু আছে এবং উহাই প্রকৃতি। মহামুনি কপিল এই সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়া জগতে কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। (চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার)। কপিলের শাপে সূর্য্যবংশীয় রাজা সগরের

ষষ্টিসহস্র পুত্র নিহত হয়। সগর এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষস বেশে যজ্ঞের অশ্বটী হরণ করিয়া পাতালে তপোনিমগ্ন কপিল মুনির সন্নিধানে রাখিয়া দেন। সগরের ৬০ হাজার পুত্র অশ্বের অন্বেষণে পাতালে যাইয়া অশ্বটীকে মুনির নিকট দেখিতে পান। মুনিকে অশ্বাপহারক মনে করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। মুনি তপোবিঘ্নকারী সগরসন্তানদিগকে অভিসম্পাতে ভস্মীভূত করেন। পরে সগরবংশীয় ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া কপিলশাপে নিহত পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করেন। (সগর ও ভগীরথ দেখ)

কপিলা—দক্ষরাজের কন্যা।

কবন্ধ—রাক্ষস বিশেষ। পুরাকালে এই রাক্ষস ঋষিদিগকে উৎপীড়ন করিত। একদিন স্থূলশিরা নামক এক মহর্ষি অভিসম্পাত দ্বারা ইহাকে কদাকার রাক্ষসরূপে পরিণত করেন; কিন্তু পরে ইহার অনুনয়ে প্রীত হইয়া বলেন যে "যখন রামচন্দ্র তোমার বাহুদ্বয় ছিন্ন করিবেন, তখন তুমি মুক্তি লাভ করিবে।" এই রাক্ষস কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভজাত। ব্রহ্মার বরে এই রাক্ষস দীর্ঘায়ু লাভ করে। ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া এই রাক্ষস ইন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল; দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রাঘাতে ইহার উরুদেশ, মস্তক ও মুখ ভগ্ন করেন। রাক্ষস বলিল "ব্রহ্মার বরে আমি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি এখন আপনার বজ্রাঘাতে ভগ্নশির ও ভগ্নমুখ হইয়া কিরূপে জীবন রক্ষা করিব? ব্রহ্মার বচন ত ব্যর্থ হইবার নহে?" দেবরাজ ইহার বাক্য শুনিয়া ইহার বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত দীর্ঘ করিলেন এবং কুক্ষিতে তীক্ষ্ণ দন্তসমন্বিত মুখ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এই রাক্ষস তদবধি এই দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া দীর্ঘ বাহুদ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক আহার করিত। রামের আগমনে তৎকর্ত্তৃক ছিন্নবাহু হইয়া শাপমুক্ত হইল। রামলক্ষ্মণকে অপহৃত সীতার বৃত্তান্ত বলিয়া দিয়া তাঁহার অন্বেষণের জন্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দিল এবং অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করিল। রামলক্ষ্মণ চিতানলে তাহার দেহ ভস্মীভূত করিলেন। (রামায়ণ—আরণ্য)

কর্কোটক—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে সহস্রনাগ জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে কর্কোটক একটী প্রধান সর্প। প্রথমে শেষনাগ, তৎপরে বাসুকি ও তারপর ক্রমে ঐরাবত, তক্ষক ও কর্কোটক জন্মগ্রহণ করে। একদা কর্কোটক দেবর্ষি নারদকে বঞ্চনা করে। নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন, "অদ্যাবধি তোমাকে এই বনে স্থাবরভাবাপন্ন হইয়া থাকিতে হইবে; মহারাজ নল এইস্থানে আসিয়া তোমাকে অপসরণ করিলে, তুমি শাপমুক্ত হইবে।" নিষধাধিপতি মহারাজ নল কলির কোপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে বিচরণ পূর্ব্বক ঘটনাক্রমে একদিন এই বনে উপস্থিত হন। এই বনটী তখন দাবানলে দগ্ধ হইতেছিল। তিনি দাবানলের মধ্য হইতে "নল, নল" ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। নল অগ্রসর হইয়া কর্কোটককে দাবানল হইতে উদ্ধার করিলেন। শাপমুক্ত হইয়া কর্কোটক নলের নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে দংশন করিল। সর্পদংশনে নলের শরীর বিবর্ণ হইয়া গেল। নল কর্কোটকের আচরণে বিস্মিত হইলেন। কর্কোটক বলিলেন "আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না; আমি দংশন করিয়া আপনার উপকারই করিলাম; যেহেতু আপনার বর্ণ বিকৃত হওয়াতে আপনার কোন শত্রু আপনাকে চিনিতে পারিবে না, বিশেষতঃ আমার বিষের জ্বালায় আপনার শরীরস্থ কলি নির্জ্জিত হইয়া থাকিবে।" এই বলিয়া কর্কোটক নলকে অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে থাকিতে উপদেশ দিল এবং ঋতুপর্ণের নিকট হইতে অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করিতে পরামর্শ দিল, যেহেতু তিনি অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করিলে কলি দূরে পলায়ন করিবে।

কর্ণ—ভারত যুদ্ধের বিখ্যাত বীরপুরুষ ও দুর্যোধনের সখা। ইহার আদি নাম বসুষেণ, পরে স্বীয় অঙ্গকর্ত্তন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বেশধারী ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করিয়া কর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। কর্ণ পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীর কানীন পুত্র; কুন্তীর অনূঢ়াবস্থায় তদীয় গর্ভে সূর্য্যদেবের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। কুন্তী লোকলজ্জাভয়ে সদ্যোজাত শিশুটীকে সিন্ধুকে ভরিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। রাধানাম্নী এক সূতজাতীয়া রমণী সিন্ধুকটী জল হইতে উত্তোলন করেন; কিন্তু তন্মধ্যস্থ কবচকুণ্ডলপরিহিত শিশুটীকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হন। রাধার পুত্রসন্তান ছিল না; তিনি

স্বামী অধিরথের সহিত পরামর্শ করিয়া শিশুটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। রাধা ইহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। রাধাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া বসুষেণের অপর নাম রাধেয়, কিন্তু বসুষেণ কর্ণনামেই জগতে প্রসিদ্ধ। কর্ণও কুরুপাণ্ডবদিগের ন্যায় দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং তিনি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের সহিত সমকক্ষতা করিতে চেষ্টা পাইতেন। অর্জ্জুনের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ দুর্য্যোধন কর্ণের বল বিক্রম দেখিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করেন; কর্ণ ও দুর্য্যোধনে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। কর্ণের একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও অর্জ্জুন তাঁহার সহিত অস্ত্রচালনে প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছা করিলেন না, যেহেতু কর্ণ সামান্য লোক, রাজা বা রাজপুত্র নহেন। কর্ণ ইহাতে লজ্জিত ও বিমর্ষ হইলেন। ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশ দান করেন এবং তাঁহাকে ঐ প্রদেশের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। একদিন কর্ণ দ্রোণের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিতে চাহিলেন, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য সূতপুত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। কর্ণ ক্ষুণ্ণ হইয়া পরশুরামের নিকট গেলেন; তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন পরশুরাম কর্ণের উরুর উপর মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় একটা অলর্কজাতীয় কীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। কর্ণ দারুণ যন্ত্রণা পাইয়াও গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে উরু একটুও সঞ্চালিত করিলেন না। কীটদষ্ট স্থান হইতে নির্গত রক্তপ্রবাহ পরশুরামের গাত্রস্পর্শ করিলে, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরশুরাম কর্ণের নিকট রক্তনির্গমের হেতু শুনিয়া কীটের প্রতি অরুণ দৃষ্টি করিবা মাত্র ঐ কীট প্রাণত্যাগ করিল এবং অসুরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরশুরামকে প্রণাম করিল। (অলক দেখ)। পরশুরাম কর্ণের ব্যবহারে একটু সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "দেখ, ব্রাহ্মণে কিছুতেই এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না, তুমি সত্য করিয়া তোমার পরিচয় বল।" কর্ণ নিজের প্রকৃত পরিচয় বলিলে, পরশুরাম কহিলেন "যেহেতু তুমি আত্মগোপনপূর্ব্বক প্রতারণা করিয়া আমার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, এজন্য আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে যুদ্ধের সময় ঐ অস্ত্র মনে পড়িবে না।" যে উদ্দেশ্যে তিনি পরশুরামের নিকট আসিয়াছিলেন তাহা তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপে ব্যর্থ হইল। পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষার সময়ে তিনি হঠাৎ কোন ব্রাহ্মণের হোমধেনু শরবিদ্ধ করেন; ধেনু শরবিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ কর্ণকে শাপ দিলেন "তুমি যাঁহাকে পরাজিত করিতে সর্ব্বদা যত্নপর আছ, তাঁহারই হস্তে তোমার নিধন হইবে।" এই অভিশাপের ফলে অর্জ্জুনহস্তে কর্ণ নিহত হন।

পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া কর্ণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিয়ৎকাল পরে কলিঙ্গরাজের কন্যার স্বয়ংবর উপলক্ষে কর্ণের সহিত মগধাধিপতি জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জরাসন্ধ সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণকে মালিনী নগরী দান করেন।

পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে বাসকালে দুর্য্যোধন চিত্রসেন গন্ধর্ব্বহস্তে সপরিবারে নিগৃহীত হইয়া অবশেষে পাণ্ডবদের সাহায্যে মুক্ত হন এবং লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। কর্ণ তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিলেন। ভীষ্ম কিন্তু তাঁহাকে দ্বৈতবনে যাইতে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলেন; পিতামহের বাক্য অবহেলা করিয়া যাওয়াতে দুর্য্যোধনের এই অপমান হইল। পিতামহ দুর্য্যোধন ও কর্ণ উভয়কেই নিন্দা করিলেন পক্ষান্তরে যুধিষ্ঠিরাদির আত্মসম্মান জ্ঞান দেখিয়া তাহাদিগকে শতমুখে প্রশংসা করিলেন। পাণ্ডবদিগের প্রশংসা অসহ্য হওয়াতে কর্ণ দুর্য্যোধনের সমীপে ভীষ্মে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপিত করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের নিকট দিগ্বিজয় যাত্রার অনুমতি চাহিলেন; তিনি বলিলেন পাণ্ডবেরা চারি ভ্রাতায় তাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, তিনি একাকীই তাহা সম্পন্ন করিবেন। কর্ণ একার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে ভীষ্ম নিশ্চয়ই লজ্জিত হইবেন মনে করিয়া দুর্য্যোধন কর্ণকে দিগ্বিজয় যাত্রায় অনুমতি দিলেন। কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমেই পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করেন এবং তৎপর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মিথিলাদি দেশ জয় করিয়া তত্রত্য নৃপতিদিগের নিকট হইতে রাজকর আদায় করেন। এইরূপে কর্ণ অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবীর ভূপালগণকে পরাজয় করিয়া প্রভূত ধন গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে কর্ণের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; তিনি পদ্মাবতী নাম্নী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। পদ্মাবতীর গর্ভে কর্ণের বৃষসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রভৃতি পুত্র জন্মে। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণার্জ্জিত সুবর্ণ মুদ্রাদ্বারা লাঙ্গল প্রস্তুত করিলেন এবং এই লাঙ্গলে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিয়া

তথায় বৈষ্ণবযজ্ঞ নামে এক সুমহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দুর্য্যোধনের যজ্ঞ সমাপনের পরে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া পাদধৌত বা জলগ্রহণ করিবেন না। এবং সেই দিন হইতেই তিনি আসুরব্রত অবলম্বন করিলেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অর্জ্জুনকে বধ না করা পর্য্যন্ত তিনি এই ব্রত পালন করিবেন এবং এই ব্রত পালনের সময় কোন অর্থী আসিয়া তাঁহার নিকট যাহা চাহিবেন তিনি অম্লানবদনে তাহাকে তাহাই দিবেন, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবেন না। কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষা করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভোজনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কর্ণ অম্লানবদনে স্বীয় পুত্রকে বধ করেন। ভগবান কৃষ্ণ ইঁহার দানশীলতা দেখিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে বৃষকেতুকে পুনর্জ্জীবিত করেন। এই ব্রত পালনের সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করেন; কর্ণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া উহা তাঁহাকে অর্পণ করেন। স্বীয় অঙ্গ কর্ত্তন করাতে ইনি কর্ণনামে বিখ্যাত হইলেন। সূর্য্য পূর্ব্বরাত্রিতে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রের ব্রাহ্মণবেশে আবির্ভাবাদি বৃত্তান্ত বলিয়া ইন্দ্রকে স্বীয় কবচ ও কুণ্ডল দিতে নিষেধ করেন কিন্তু কর্ণ ব্রতের নিয়ম ভঙ্গ করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে সূর্য্যদেব তাঁহাকে ইন্দ্রের নিকট শক্তি অস্ত্র প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দেন। সূর্য্যের পরামর্শানুসারে কর্ণ ইন্দ্রের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া উহা লাভ করেন। এই শক্তি কর্ণ অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতযুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ ভয়ঙ্কররূপে কুরুসৈন্য নিপাত করিতে আরম্ভ করিলে, কর্ণ এই শক্তিপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বধ করেন। ভারতযুদ্ধের প্রাক্কালে ভীষ্ম কর্ণকে নীচ জাতীয় মনে করিয়া তাহাকে মহারথ শ্রেণীতে না রাখিয়া অর্দ্ধরথ শ্রেণীতে রাখিবার জন্য দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দেন; এজন্য ভারতযুদ্ধে ভীষ্মের জীবিতকাল পর্য্যন্ত কর্ণ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ভীষ্মের শরশয্যায় অবস্থানকালে কর্ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ভীষ্ম বলিলেন তিনি কুন্তীর নিকট কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন অতএব এখন তিনি তদীয় সহোদর পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন। কর্ণ বলিলেন যে তিনি দুর্য্যোধনের নিকট অত্যন্ত ঋণী এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, এরূপ অবস্থায় তিনি এক্ষণে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কর্ণের দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া পিতামহ তাঁহাকে অন্যায় যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। পিতামহের এই অনুরোধও কর্ণ রক্ষা করিতে পারেন নাই, যেহেতু তিনি প্রধান সেনাপতি দ্রোণাচার্য্যের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে অপর ছয় মহারথের সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের পতনের পর যুদ্ধের ষোড়শ দিবসে কর্ণ প্রধান সেনাপতি হইয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করেন। অর্জ্জুন ব্যতীত সকল পাণ্ডবই কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু জননী কুন্তীর নিকট প্রতিশ্রুত থাকা বশতঃ তিনি তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বধ করেন নাই। যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে কর্ণ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন।

কর্দ্দম—প্রজাপতি ঋষিবিশেষ। সম্রাট্, কুক্ষি, বিরাট্ ও প্রভুনামে ইঁহার চারি পুত্র এবং কাম্যা নামে এক কন্যা জন্মে। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত কাম্যার পাণিগ্রহণ করেন। কাম্যার গর্ভে প্রিয়ব্রতের বহুপুত্র জন্মে। কর্দ্দম ঋষি স্বায়ম্ভুব মুনির কন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন; দেবহূতির গর্ভে বিখ্যাত কপিল মুনি ও কলা প্রভৃতি নয়টী কন্যা জন্মে। (হরিবংশ—বিষ্ণুপুরাণ)।

কলা—ইনি কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা; দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে প্রজাপতি ঋষি কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

কলাবতী—শ্রীরাধার জননী।

কলি—যুগপ্রবর্ত্তক দেবতা; ইঁহার নামানুসারে যুগের নাম কলিযুগ হইয়াছে। ৪৩২০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই দেবতার অধিকার থাকিবে; এই যুগের অবসানে ভগবান বিষ্ণু কল্কিরূপে আবির্ভূত হইবেন। দ্বাপরের অবসানে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের সৃষ্টি করেন; এই অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে অধর্ম্মের ঔরসে পরমকোপন দম্ভ নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের লোভ নামক পুত্র ও

নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে ; লোভ স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকে বিবাহ করেন এবং তাহাদের ক্রোধ নামক পুত্র ও হিংসা নাম্নী কন্যা জন্মে ; ক্রোধ সহোদরা হিংসাকে বিবাহ করেন, এবং তাহাদের কলি নামক পুত্র ও দুরুক্তি নাম্নী কন্যা হয়। কলি স্বীয় ভগিনী দুরুক্তির পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাহাদের ভয় নামক পুত্র ও মৃত্যুনাম্নী কন্যা জন্মে। ভয় স্বীয় ভগিনী মৃত্যুকে বিবাহ করেন, এবং তাহাদের নিরয়নামে পুত্র ও যাতনানাম্নী তনয়া হয়। নিরয়ের ঔরসে ও যাতনার গর্ভে বহু পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (কল্কিপুরাণ ১ম অঃ) কলির অত্যাচারে নিষদরাজ নল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহিষী দময়ন্তীসহ অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিদর্ভরাজ কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে গমন করিয়াছিলেন। দময়ন্তী দেবতাগণকে অতিক্রম করিয়া মহারাজ নলের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করেন। তৎপর যথাশাস্ত্র নলের সহিত দময়ন্তীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্বয়ংবর সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত কলি ও তৎসখা দ্বাপরের সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে সচেষ্ট রহিলেন। কিরূপে দময়ন্তীকে বিপন্না করিবেন তাহার সুযোগ ইঁহারা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১১ বৎসর পরে কলি কোন ছিদ্রে নলের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন ; একদিন নল মূত্র পরিত্যাগের পর শুচি হইতে ভুলিয়া গেলেন ; অশুচি অবস্থায় থাকাতে কলি নলের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। নলের দুর্ব্বুদ্ধি হইল ; তিনি স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ; ক্রীড়ায় নল রাজ্য-সম্পদ সকলই হারিলেন ; পুষ্কর রাজা হইলেন। নল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দময়ন্তীসহ বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কর্কোটক নাগকর্ত্তৃক দষ্ট হইলেন। সর্পবিষের জ্বালায় কলি নির্জ্জিত হইয়া নল শরীরে বাস করিতে লাগিলেন। নল কর্কোটকের উপদেশে অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের নিকট অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করেন। অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করাতে নলের শরীর হইতে কলি নির্গত হইলেন। নল দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজপদে আসীন হইলেন। (মহাভা—বন)

কলিঙ্গ—বলিরাজের ক্ষেত্রজপুত্র। ইনি বলিরাজ মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার অধিকৃত রাজ্য কলিঙ্গনামে খ্যাত। উড়িষ্যার দক্ষিণ হইতে দ্রাবিড়ের উত্তর পর্য্যন্ত উপকূলবর্ত্তী ভূভাগ কলিঙ্গনামে অভিহিত। (অঙ্গ দেখ)

কল্কি—বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। বর্ত্তমান কলিযুগের শেষভাগে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির সংহার বিধানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধরাতলে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন। লক্ষ্মী পদ্মারূপে ভূতলে আবির্ভূত হইবেন, এবং কল্কিকে পতিত্বে বরণ করিবেন। পদ্মাকে বিবাহ করিয়া ইনি বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুরীতে শম্ভল গ্রামে বাস করিবেন এবং তৎপর বৌদ্ধদিগকে দমন ও কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসীকে বধ করিবেন। অতঃপর ভল্লাট নগরে গমন করিবেন ; তথায় শয্যাকর্ণ প্রভৃতি ও রাজা শশিধ্বজের সহিত ইঁহার সংগ্রাম হইবে। কল্কির অনুগ্রহে রাজা শশিধ্বজের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিবে। তৎপর শম্ভল গ্রামে নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে ও সত্যযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। পরে শম্ভলে দেবগন্ধর্ব্বের আগমন হইলে কল্কিরূপী বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিটী যুগ ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এই যুগ চতুষ্টয়ের সমষ্টিকে দিব্য যুগ বলে। ৭১টী দিব্য যুগে এক মন্বন্তর হয়। বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। এই বৈবস্বত মনুর ৭১টী দিব্যযুগের মধ্যে অষ্টাবিংশ দিব্যযুগের কলিযুগ চলিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে গতপূর্ব্ব ৬টী মন্বন্তরে ৪২৬টী (৭১ × ৬) কলিযুগ এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর অধিকারে ২৭টী কলিযুগ, মোট ৪৫৩টী কলিযুগ অতীত হইয়াছে। অতএব ভগবান বিষ্ণুর ইতঃপূর্ব্বে ৪৫৩টী কলি লীলার অবসান হইয়াছে। (কল্কিপুরাণ)

কল্মাষপাদ / **কল্মষপাদ**—অযুতায়ুর পুত্র ও নিষধরাজ নলের সখা অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ। এই ঋতুপর্ণের প্রপৌত্র এবং রাজা সুদাসের পুত্র মহারাজ সৌদাস অযোধ্যার রাজত্ব করিতেন। সৌদাসের মহিষীর নাম দময়ন্তী। একদা সৌদাস মৃগয়ার্থ

বনে বহির্গত হইয়া একটা রাক্ষস বধ করিলেন। রাক্ষসের ভ্রাতা প্রতিশোধপরায়ণ হইল এবং নিজরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজা সৌদাসের ভবনে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। একদিন রাজগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ সৌদাসের গৃহে আহারার্থ উপবিষ্ট হইলেন। পাচকরূপী রাক্ষস নরমাংস পাক করিয়া ঋষির নিকট উপস্থিত করিল। ঋষি দিব্য চক্ষুতে অভক্ষ্য বস্তু উপলব্ধি করিয়া রাজাকে "রাক্ষস হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। রাজাও বিনাদোষে অভিশপ্ত হইয়া গুরুকে অভিসম্পাত করিবার জন্য জলগ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজ্ঞী দময়ন্তী উপস্থিত হইয়া রাজাকে এই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে বাধা দিলেন। রাজা গৃহীত মন্ত্রপূত জল স্বকীয় পদে নিক্ষেপ করিলেন। মন্ত্রপূত জলের স্পর্শে তাঁহার পদদ্বয় কল্মষ (মলিন বা কৃষ্ণবর্ণ) হওয়াতে তিনি তদবধি কল্মষপাদ নামে খ্যাত হইলেন। বশিষ্ঠও রাজাকে নিরপরাধ বুঝিতে পারিয়া রাজার পাপক্ষয়ের জন্য দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া অরণ্যে বিচরণপূর্ব্বক একদিন রতিক্রিয়াতে আসক্ত এক ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণীর অনুনয়েও যখন কল্মষপাদ তাঁহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিলেন না, তখন তিনি রাক্ষসরূপী রাজাকে শাপ দিলেন "যেহেতু তুই আমার পতিকে রতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্ষণ করিলি, এই জন্য তোরও রতিক্রিয়াতেই মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী পতির কঙ্কালগুলি সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে স্বদেহ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠের দ্বাদশবার্ষিক ব্রতানুষ্ঠানফলে দ্বাদশ বৎসর পর কল্মষপাদের শাপমোচন হইল। তিনি স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাণী দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইলেন। একদা রাজা মৈথুনে উদ্যত হইলে রাজ্ঞী দময়ন্তী ব্রাহ্মণীপ্রদত্ত শাপ স্মরণ করাইয়া রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন। এইরূপে রাজা অপুত্রক ও স্ত্রী সুখে বঞ্চিত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে বশিষ্ঠ সৌদাসের অনুমতিক্রমে রাণী দময়ন্তীর গর্ভসঞ্চার করিলেন কিন্তু রাজমহিষী বহুমাস গর্ভধারণ করিয়াও যথাসময়ে প্রসব না হওয়াতে বশিষ্ঠ আসিয়া এক অশ্ম (প্রস্তর) দিয়া গর্ভে আঘাত করিলেন, তাহাতে একপুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। অশ্মের আঘাতে ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া পুত্রের নাম অশ্মক রাখা হইল।

কশ্যপ—বিখ্যাত প্রজাপতি ঋষি। ইনি ব্রহ্মার পৌত্র এবং মরীচির মানসপুত্র। কাহারও মতে মরীচির ঔরসে ও কলানাম্নী পত্নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। এই মহর্ষির সাতটি পত্নী; দিতি নাম্নী পত্নী হইতে দৈত্যগণ, অদিতি হইতে আদিতেয় বা দেবগণ, বিনতা হইতে পক্ষিকুল, কদ্রু হইতে সর্পগণ, সুরভি হইতে গো মহিষাদি, সরমা হইতে কুক্কুর প্রভৃতি চতুষ্পদ এবং দনু হইতে দানব সকলের উদ্ভব হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈং পুরাণ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও হরিবংশের মতে কশ্যপের পত্নী ১৩টী, যথা—দিতি, অদিতি, দনু, বিনতা, খসা, কদ্রু, মুনি, ক্রোধা, অরিষ্টা, ইরা, তাম্রা, ইলা ও প্রধা। আর্ষ রামায়ণের আদিকাণ্ডে কশ্যপের এক বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই :—কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্, তৎপুত্র বৈবস্বত মনু, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু, তৎপুত্র কুক্ষি, তৎপুত্র বিকুক্ষি, তৎপুত্র বাণ, তৎপুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র পৃথু, তৎপুত্র ত্রিশঙ্কু, তৎপুত্র ধুন্ধুমার, তৎপুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মান্ধাতা, তৎপুত্র সুসন্ধি, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র ভরত, তৎপুত্র অসিত, তৎপুত্র সগর, তৎপুত্র অসমঞ্জ, তৎপুত্র অংশুমান, তৎপুত্র দিলীপ, তৎপুত্র ভগীরথ, তৎপুত্র ককুৎস্থ, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র প্রবৃদ্ধ, তৎপুত্র কল্মষপাদ, তৎপুত্র শঙ্খন, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ, তৎপুত্র শীঘ্রগ, তৎপুত্র মরু, তৎপুত্র প্রশুশ্রুক, তৎপুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ এবং তৎপুত্র রামলক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়। এই তালিকার সহিত মহা কবি কালিদাস কৃত রঘুবংশের নামাবলীর ঐক্য হইতেছে না। কর্ণেল টড সাহেব জয়পুরাধিপতির নিকট হইতে রঘুবংশের যে তালিকা প্রাপ্ত হন, তাহার সহিত রঘুবংশের নামাবলীর ঐক্য আছে।

কহোড়—মহর্ষি উদ্দালকের শিষ্য এবং বিখ্যাত ঋষি অষ্টাবক্রের জনক। (অষ্টাবক্র দেখ)

কাত্যায়ন—(১) বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ইনি বিশ্বামিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রণীত "কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র" ও "কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র" পণ্ডিত সমাজে আদৃত। গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণের দশবিধ সংস্কার ও বাস্তুক্রিয়াদির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

(২) বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রকার। ইনি মহর্ষি গোভিলের পুত্র। ইঁহার প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম কর্ম্মপ্রদীপ।

কাত্যায়নী—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। মহর্ষি কাত্যায়ন ইঁহার প্রথমে অর্চ্চনা করেন, এজন্য এই দেবী কাত্যায়নী নামে খ্যাত হইয়াছেন। মহিষাসুর কর্ত্তৃক শতবার্ষিক যুদ্ধে দেবগণ উৎপীড়িত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হরি ও হরের নিকট উপস্থিত হন। হরি ও হর ব্রহ্মার মুখে দেবগণের বিপদের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বদনমণ্ডল হইতে এক তেজ নির্গত হইল; এই তেজ এক স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। এই ভয়ঙ্করী নারীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবতারা তাঁহাকে স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান করিলেন। মহিষাসুর স্বীয় সৈন্য ও সেনাপতিসহ এই দেবীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সদলবলে হত হইলেন। এই সিংহবাহিনী দুর্গা (কাত্যায়নী) মূর্ত্তি আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে সৃষ্টা হইয়াছিলেন এবং উক্ত মাসের শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কাত্যায়নের পূজা গ্রহণ করিয়া দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন। এই দেবীমূর্ত্তি দশভুজা। মহিষাসুর রম্ভাসুরের পুত্র। শিবের বরে স্বয়ং মহাদেব তিনবার রম্ভাসুরের পুত্ররূপে দেবনরের অবধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনবারই দেবী ভগবতী তিনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহিষাসুরকে বধ করেন। প্রথমে উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয়বার ভদ্রকালী, এবং তৃতীয়বার দুর্গামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। মহিষাসুর অত্যন্ত মায়াবী ছিলেন; তিনি একদা কাত্যায়ন মুনির শিষ্যকে মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিমালয়বাসী কাত্যায়ন ইহা অবগত হইয়া তাহাকে শাপ দেন "যেহেতু তুমি মোহিনী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার শিষ্যের তপোবিঘ্ন সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতেছিলে, এইজন্য তুমি নারীর হস্তে নিহত হইবে।" এই অভিশাপের ফলে ভগবতীর হস্তে মহিষাসুর নিহত হন।
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

কামলী—পরশুরামের জননী। উহার অপর নাম রেণুকা। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুনামে নরপতির কন্যা। মহর্ষি জমদগ্নির সহিত ইহার বিবাহ হয়। পিতার আদেশে পরশুরাম জননীর মস্তকচ্ছেদন করেন। (হরিবংশ—২৭অ)

কার্ত্তবীর্য্য—নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী হৈহয়রাজ্যের অধিপতি। রাজা হৈহয়ের নামানুসারে তদীয় রাজ্যের নাম হৈহয় হইয়াছিল। কার্ত্তবীর্য্যের অপর নাম হৈহয়; ইহার আর একটী নাম অর্জ্জুন। মাহিষ্মতীনগরী হৈহয় রাজ্যের রাজধানী। একদা লঙ্কেশ্বর রাবণ পুষ্পোপহার দ্বারা স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ পূজা করিতেছিলেন; এই সময়ে অর্দ্ধযোজন দূরে সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য রমণীগণ সহ জলক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। অর্জ্জুনের সহস্রবাহুদ্বারা তাড়িত হইয়া নর্ম্মদা সলিল প্রতীপগামী হইয়াছিল; এবং প্রতীপগামী সলিলস্রোত রাবণের উপহৃত পুষ্পচয় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। রাবণ ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য মন্ত্রী শুক ও সারণকে আদেশ করেন। মন্ত্রিদ্বয় অগ্রসর হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের জলক্রীড়া ব্যাপার দর্শন করেন এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাযথরূপে রাবণের নিকট বিবৃত করেন। মন্ত্রিদ্বয়ের মুখে বিবরণ শুনিয়া রাবণ যুদ্ধার্থ কার্ত্তবীর্য্যসমীপে উপস্থিত হন এবং বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। রাবণের পিতামহ স্বর্গস্থ পুলস্ত্য ঋষি দেবতাগণের নিকট এই পরাভববৃত্তান্ত অবগত হন। পুলস্ত্য অবিলম্বে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট যাইয়া রাবণের মুক্তি প্রার্থনা করেন। কার্ত্তবীর্য্য মহর্ষির প্রার্থনায় তদীয় পৌত্রের বন্ধন মোচন করেন। এইরূপে মুক্ত হইয়া রাবণ লঙ্কায় প্রতিগমন করেন এবং পিতামহ পুলস্ত্যও ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করেন। (রামা—উত্তর)।

একদা কার্ত্তবীর্য্য ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া সসৈন্যে জমদগ্নি ঋষির আশ্রমের সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যকে প্রচুর রাজযোগ্য আহার্য্য বস্তু দ্বারা ভোজন করাইয়াছিলেন। জমদগ্নির কপিলা নামে একটী কামধেনু ছিল; এই গাভীর দৈবশক্তি প্রভাবে জমদগ্নি প্রচুর নবনীত ঘৃত দুগ্ধদ্বারা রাজার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য গাভীর গুণ অবগত হইয়া উহা মুনির নিকট প্রার্থনা করেন। মুনি কার্ত্তবীর্য্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হওয়াতে, রাজা উহা বলপূর্ব্বক লইতে ইচ্ছা করেন। কপিলা দৈবশক্তি প্রভাবে বহু সৈন্য ও অস্ত্রাদি সৃষ্টি করেন; এই সৈন্যসমূহের নিকট কার্ত্তবীর্য্য সসৈন্যে পরাভূত হন এবং আশ্রম ত্যাগ করিয়া সলজ্জভাবে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। অনন্তর কার্ত্তবীর্য্য বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে জমদগ্নির আশ্রম আক্রমণ করেন। জমদগ্নি অর্জ্জুনকে যথাসাধ্য বাধা দেন কিন্তু অবশেষে

তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। কপিলা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এই গাভী অর্পণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা ভৃগুমুনিকে এবং ভৃগু জমদগ্নিকে উহা দান করেন। জমদগ্নির মৃত্যুর সময় তৎপুত্র পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না; তিনি আশ্রমে আসিয়া মাতা রেণুকার নিকট পিতৃবধবৃত্তান্ত অবগত হন। পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি কেবল কার্ত্তবীর্য্যকেই বধ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, পরন্তু একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন। অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের বরে সহস্রবাহুসম্পন্ন হইয়াও পরশুরাম হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। পরশুরামের কুঠারাঘাতে তাহার সহস্রবাহুচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। পরশুরাম ইহার পর একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈঃ পুরাণ)

কার্ত্তিকেয়—মহাদেবের পুত্র। চন্দ্রের পত্নী কৃত্তিকা নক্ষত্রের স্তন্যদ্বারা পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া এই দেবতা কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত। ইনি দেবসেনাপতি; তারকাসুর বধের নিমিত্ত ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দেবসেনা পরিচালন করিয়া তারকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করেন। তারকাসুরকে বধ করিয়া ইনি তারকারি নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার পত্নীর নাম দেবসেনা; এই দেবসেনা ব্রহ্মার কন্যা এবং ইনি ভূতলে ষষ্ঠীদেবী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। পুরাণে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম বিবরণ এইরূপ:—দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পর্ব্বতরাজ শঙ্করকে এই কন্যা সম্প্রদান করেন। শঙ্করের পুত্রোৎপাদনবিষয়ে দেবগণ কোন কারণে পার্ব্বতীর বিরাগভাজন হন। পার্ব্বতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন। পার্ব্বতীর শাপভয়ে ভীত হইয়া দেবতাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। পার্ব্বতী শাপ দিলেন "আজ হইতে দেবগণের বীর্য্য নিষ্ফল হইল" (অর্থাৎ তাহারা সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইবে)। পৃথ্বী ভূপতিত শঙ্করবীর্য্য ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন; অগ্নিকর্ত্তৃক উহা শরবণে নিক্ষিপ্ত হয়। কৃত্তিকাগণ এই শরবণে সন্তানকে স্তন্যদ্বারা লালন পালন করিয়াছিলেন। স্কন্ন (স্খলিত) রেত হইতে উৎপন্ন বলিয়া কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম স্কন্দ হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈঃ পুরাণ—মহাভা)

একদা সুরাসুরে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। সুরগণ অসুরপতি তারকাসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া একজন উপযুক্ত সেনাপতি লাভার্থ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে মহাদেবের সহিত হিমালয়ের কন্যা উমার বিবাহ সম্পন্ন করিতে পারিলে, এই বিবাহ ফলে যে সন্তান জন্মিবে তৎকর্ত্তৃক তারকাসুর নিহত হইবে। যাহাতে মহেশ্বরের বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মে তদ্বিষয়ে উপায় অবলম্বন করিতে ব্রহ্মা দেবতাদিগকে পরামর্শ দিলেন। দেবতারা ইহা শুনিয়া পর্ব্বত-রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ সঙ্ঘটন করিলেন। রতিক্রিয়া সময়ে মহাদেবের উৎসৃষ্ট বীর্য্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়; অগ্নি উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন; গঙ্গা ঐ তেজধারণে অশক্ত হইয়া উহা হিমালয়ের পার্শ্বস্থ শরবণে ত্যাগ করেন। এই শরবণে উৎসৃষ্ট বীর্য্য হইতে এক উগ্রতেজবিশিষ্ট সন্তান উৎপন্ন হইল। এই সন্তানকে স্তন্যপানে বর্দ্ধিত করিবার জন্য দেবতারা কৃত্তিকাদিগকে নিয়োজিত করেন। কৃত্তিকাগণের স্তন্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া এই দেবতা কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং স্কন্ন (স্খলিত) রেত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম স্কন্দ হইয়াছে। (রামায়ণ—আদি)

কালকেয়—এই নামধেয় দানবগণ বৃত্রাসুরের অনুচর। ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধের পর এই অসুরগণ প্রাণভয়ে সমুদ্রে লুক্কায়িত হইল; কিন্তু মাঝে মাঝে নিশাভাগে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আশ্রমবাসী তপোধনদিগকে বিনাশ করিত। একদিন তাহারা বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ১৯৭ জন বিপ্র বধ করে। তাপসদিগের প্রতি এইরূপ উৎপীড়ন করাতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্তপ্রায় হইল এজন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রতীকার প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট গমন করিলেন; নারায়ণের পরামর্শে দেবতারা মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমুদ্র পান করিতে অনুরোধ করেন। মহর্ষি সমুদ্র পান করিলে দেবতারা অনায়াসে কালকেয়দিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (মহাভা—বন)। অনেকে অনুমান করেন এই কালকেয় অসুরগণ অনার্য্য জলদস্যু; আর্য্যগণ কর্ত্তৃক স্থলভাগ হইতে তাড়িত হইয়া ইহারা জলভাগে গমন করে এবং দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকে।

কালনেমি—(১) প্রসিদ্ধ দানব। ইনি পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে বরুণ কুবেরাদি লোকপালদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; অবশেষে ভগবান বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু চক্রদ্বারা ইঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন। (হরিবংশ)।

(২) রাক্ষস বিশেষ। ইনি বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাবণের মাতামহ সুমালী রাক্ষসের সহিত লঙ্কা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পাতালে যাইয়া বসতি করেন। (রামা—উত্তর)

(৩) কৃত্তিবাসী রামায়ণে এক কালনেমির উল্লেখ আছে; ইনি লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতুল। হনুমান বিশল্যকরণী আনয়নার্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গেলে ইনি রাবণের পরামর্শে হনুমানকে কৌশলপূর্ব্বক বধ করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু অবশেষে স্বয়ংই হনুমানের হস্তে নিহত হন। (কৃত্তিবাস)

কালপুরুষ—ইহার অপর নাম যম। ইনি ব্রহ্মার পৌত্র এবং সূর্য্যের পুত্র। ইনি তাপসের বেশে অযোধ্যাপতি রামের নিকট উপস্থিত হন এবং রাজভবনে নিভৃত কক্ষে স্বমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রামকে বৈকুণ্ঠে যাইবার জন্য ব্রহ্মার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তপস্বীর বেশে তিনি যখন রামের সহিত নিভৃত কক্ষে ছিলেন; তখন তিনি রামকে এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করেন যে তাঁহাদের আলাপের সময় যে কেহ তাঁহাদের সম্মুখে আসিবে তাহাকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি দুর্ব্বাসা রামদর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ দুর্ব্বাসার শাপভয়ে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বাসার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। কালপুরুষের সহিত পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে রাম প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন করিলেন এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় রোধ করিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্থির ভাবে রহিলেন। স্বর্গ হইতে তাহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মণকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন। (রামা—উত্তর)

কালপুরুষের মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী। ইঁহার ৬ মুখ, ১৬ বাহু, ২৪ লোচন ও ৬ পা; ইনি কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবস্ত্র পরিহিত। (ব্রহ্মাবৈঃ—পুরাণ)।

কালভৈরব—শিবের অংশজাত তদনুচর বিশেষ। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদনের জন্য ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। পবিত্র কাশীক্ষেত্রে যাহারা দুষ্কর্ম্মদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, ইনি তাহাদের শাস্তি বিধান করেন।

কালযবন—পরাক্রান্ত যবন পতি। ইনি মগধাধিপতি জরাসন্ধ ও তৎপক্ষীয়রাজগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি গার্গ্যের ঔরসে গোপালী নাম্নী গোপবেশধারিণী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গার্গ্য পুত্র কামনায় দ্বাদশ বৎসর লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করেন। এই আরাধনার ফলে মহাদেবের বরে তিনি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের নিগ্রহকারক এই পুত্র কালযবনকে লাভ করেন (গার্গ্য দেখ)। কালযবন প্রসূত হইলে অপুত্রক যবন পতির যত্নে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন এবং যবন পতির লোকান্তর গমনের পর তিনিই তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনতিবিলম্বেই কালযবন অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। যাদবগণ জরাসন্ধ ও কালযবনের ভয়ে ভীত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে সুশৃঙ্খলার সহিত মথুরায় স্থাপন করিয়া কালযবনের সহিত যুদ্ধার্থ স্বয়ং মথুরায় আগমন করেন। কালযবন কৃষ্ণের সম্মুখীন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ পলায়নের ছলে হিমালয়ের যে গুহায় মান্ধাতার পুত্র রাজা মুচুকুন্দ নিদ্রিত ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অলক্ষিত ভাবে তাঁহার মস্তকেরদিকে লুক্কায়িত রহিলেন। কালযবন শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতে করিতে মুচুকুন্দের গুহায় প্রবেশ করিলেন। কালযবন নিদ্রিত মুচুকুন্দকে কৃষ্ণবোধে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া কালযবনের প্রতি দৃষ্টি করা মাত্র যবনরাজ মুচুকুন্দের নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। (হরিবংশ)

কালা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা।

কালিন্দী—সূর্য্যের কন্যা ; ইঁহার অপর নাম যমুনা। শনৈশ্চর ও যম ইঁহার দুই ভ্রাতা। (ব্রহ্মবৈঃ পুঃ)

কালিয়—সর্পরাজ। গরুড়ের ভয়ে এই উরগপতি সমুদ্রত্যাগ করিয়া ব্রজের নিকটবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড হ্রদে বাস করিতেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটে বিচরণ করিতে করিতে এই হ্রদ দেখিতে পান। কালিয়ের ভয়ে এই হ্রদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ জনশূন্য হইয়াছে। এই হ্রদের উভয় তীর শৈবাল, বৃক্ষপত্র ও লতাদি দ্বারা আচ্ছন্ন। এই হ্রদের জল সকলের উপভোগ্য করিবার জন্য এবং ব্রজবাসীরা যাহাতে এই হ্রদে সুখে সন্তরণ করিতে পারে তজ্জন্য, তিনি কালিয়কে দমন ও দূরীভূত করিতে সংকল্প করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তীরস্থিত কদম্ব বৃক্ষ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক হ্রদে পতিত হইলেন। হ্রদজলের আন্দোলনে কালিয় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের শরীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তদনুচরগণকর্ত্তৃক দষ্ট হইতে লাগিলেন। ব্রজবাসিগণ ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবননাশের আশঙ্কায় পরিতাপ করিতে লাগিলেন ; নন্দ ও যশোদা অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কালিয় ও তদনুচরদিগের আক্রমণে ভীত হইলেন না ; কালিয়ের ফণরাজি জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে উত্থিত করিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালিয় সেই নৃত্যে বিমর্দ্দিত হইয়া রক্তবমন করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দয়াভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "তোমাকে আমি এই যমুনাহ্রদে থাকিতে দিব না ; তুমি ভার্য্যা ও বন্ধুগণের সহিত সমুদ্র সলিলে প্রবেশ কর সেখানে গরুড় হইতে তোমার ভয় আছে বটে, কিন্তু তোমার মস্তকস্থিত আমার এই পদচিহ্ন তাহাকে দেখাইলে, পক্ষিরাজ তোমাকে আক্রমণ করিবে না।" সৌভরি মুনির শাপে গরুড়ের কালিয় হ্রদে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, এজন্য কালিয় সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া এই হ্রদে বাস করিত। (হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভা—১০ম স্ক)

কালী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা। ভারতে শক্তির উপাসকগণ ইঁহাকে আদ্যাশক্তি বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ইনি চতুর্হস্ত সমন্বিতা দেবী ; ইঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস এবং বামহস্তদ্বয় চর্ম্ম ও পাশ শোভিতা। ইনি নৃমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিতা, কৃশাঙ্গী ; ইঁহার দন্ত দীর্ঘ, জিহ্বা লোলা, চক্ষু আরক্ত, মুখ বিস্তৃত ও কর্ণ স্থূল ; এবং ইঁহার বাহন কবন্ধ (মস্তক বিহীন শব)। (কালিকা পুরাণ)

ইনি তারা এবং চামুণ্ডা নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহার ত্রিপুরা, ভীষণা প্রভৃতি ৮টী যোগিনী। দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি চণ্ডকে বিনাশ করিয়া চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

"চণ্ডের কপালে পড়ি নাম হৈল চণ্ডী।" (অন্নদামঙ্গল)

দেবগণ দৈত্যরাজ শুম্ভ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া ভগবতীর শরণাপন্ন হন। দেবগণের বিপদ দেখিয়া ক্রুদ্ধা ভগবতীর ললাটদেশহইতে করালবদনা কালী আবির্ভূত হন। (মার্কণ্ডেয় পুঃ ৮৭ অ)। কালীর সহিত শুম্ভের সেনাপতি চণ্ড ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুণ্ডের যুদ্ধ হয় ; যুদ্ধে উভয় ভ্রাতাই চণ্ডিকার হস্তে নিহত হন। চণ্ডমুণ্ডের পতনে দৈত্যরাজ শুম্ভ কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। চণ্ডিকা ঘোর রণে উভয় দৈত্যকেই বিনাশ করেন। শুম্ভের অপর সেনাপতি রক্তবীজকে বধ করিতে চণ্ডিকাকে ক্লান্ত হইতে হইয়াছিল। রক্তবীজের গাত্রহইতে পতিত রক্তবিন্দুসন্দোহ হইতে অসংখ্য দৈত্য উদ্ভূত হইতে লাগিল। দেবী দৈত্যহননপূর্ব্বক তাহাদের গাত্র হইতে পতিত রক্ত জিহ্বাদ্বারা লেহন করিয়া পান করিতে লাগিলেন ; ইহাতে অবিলম্বে দৈত্যকুল নির্ম্মূল হইল।

পিতৃযজ্ঞে গমনার্থিনী সতী এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাদেবের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥" (অন্নদামঙ্গল)।

ক্রমে দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করিয়া ইনি স্বামীর ভয় উৎপাদন করেন। দশ মহাবিদ্যা এই :—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥　　(তন্ত্রসার)।

(কালিকা-মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও দেবী ভাগবত)

কাশীরাজ—প্রাচীন কালের বারাণসী নগরীর অধিপতি। ইঁহার তিনকন্যা, জ্যেষ্ঠা অম্বা, মধ্যমা অম্বিকা ও কনিষ্ঠা অম্বালিকা। কাশীরাজ এই তিনটী কন্যাকেই স্বয়ংবর প্রথানুসারে পাত্রস্থা করিতে মনস্থ করিয়া নানাদিগ্দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রণ করেন। এই সময়ে মহারাজ শান্তনুর পুত্র মহামতি ভীষ্ম, সত্যবতী-গর্ভজাত স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত দেখিয়া, তাঁহার জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধানে ছিলেন। কাশীরাজের আমন্ত্রণ পত্র পাইয়া ভীষ্ম স্বয়ংবর সভায় গমনকরিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাত্রয় হরণ করেন। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত কন্যাপ্রার্থী বহু নৃপতি ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সকলেই পরাস্ত হইলেন এবং কন্যালাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভীষ্ম কন্যাত্রয়কে অতি যত্নের সহিত আনয়ন করিয়া বিমাতা সত্যবতীর হস্তে অর্পণ করেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করেন। এই সময়ে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা বলিলেন যে, তিনি শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন এবং শাল্বরাজও তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এ বিষয়ে তাঁহার পিতারও অভিমত আছে। ভীষ্ম ইহা শুনিয়া অম্বাকে স্বেচ্ছানুসারে শাল্বরাজের নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন। যথাসময়ে অম্বিকা ও অম্বালিকা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত পরিণীতা হইলেন। অতিরিক্ত স্ত্রৈণতা হেতু যৌবনেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া বিচিত্রবীর্য্য প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদর চিত্রাঙ্গদ বিবাহের পূর্ব্বেই এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং স্বামীর বংশলোপের আশঙ্কায় সত্যবতী ভীষ্মকে বিধবা বধূদ্বয়ে সন্তান উৎপাদনে অনুমতি দিলেন। ভীষ্ম বিমাতাকে তাঁহার দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; সত্যবতী উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার কানীনপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসকে স্মরণ করিলেন। মাতার অনুরোধে ব্যাস অম্বিকা ও অম্বালিকাতে গর্ভ সঞ্চার করিলেন। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্যাস অম্বিকার দাসীর গর্ভেও এক পুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহার নাম বিদুর। (অণীমাণ্ডব্য দেখ)। অম্বালিকা ব্যাসের বিরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুরবর্ণ হইয়াছিলেন, এজন্য ব্যাস বলিলেন "তোমার সন্তান পাণ্ডুরবর্ণ হইবে ও তাঁহার নাম পাণ্ডু হইবে।" অম্বিকা ঋষির বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন নিমীলিত করিয়াছিলেন; এজন্য ব্যাস সত্যবতীর নিকট কহিলেন যে, অম্বিকা এক অন্ধপুত্র প্রসব করিবে। ব্যাসের বাক্য বৃথা হইবার নহে; যথাকালে অম্বিকা এক অন্ধপুত্র প্রসব করিলেন। তৎপর সত্যবতী পুনরায় ব্যাসকে আহ্বান করিলেন এবং পুত্রবধূ অম্বিকাকে তাঁহার নিকট নির্ভয়ে গমন করিতে বলিলেন। কিন্তু অম্বিকা ব্যাসের নিকট না গিয়া এক রূপবতী দাসীকে নিজের বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করেন। মুনি এই দাসীর গর্ভসঞ্চার করিয়া বলিলেন "তোমার দাসত্ব মোচন হইবে এবং তোমার গর্ভে পরম ধার্ম্মিক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।" (অণীমাণ্ডব্য দেখ), (মহাভারত)

কাশ্যপ—বিষবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণ বিশেষ। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনে বহির্গত হইয়া শমীকনামে এক মৌনাবলম্বী ঋষিকে বাণাহত পলায়মান মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মৌনব্রতাবলম্বী মুনি, রাজার প্রশ্নের কোন উত্তর না দেওয়াতে নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক মৃতসর্প মুনির গলদেশে স্থাপনপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শমীকের অল্পবয়স্ক পুত্র শৃঙ্গী ইহা শুনিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, মৃগয়ার দিন হইতে সাতদিনের মধ্যে সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। শমীক ইহা শুনিয়া পুত্রকে ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু বালকপুত্র শৃঙ্গী, প্রদত্ত শাপ প্রত্যাহার করিলেন না।

এই সংবাদ রাজা পরীক্ষিতের কর্ণগোচর হইলে তিনি তক্ষকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। কাশ্যপ নামে এক সর্পবিষবৈদ্য রাজার এই বিপদের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন। পথে ব্রাহ্মণবেশধারী তক্ষকের সহিত কাশ্যপের সাক্ষাৎ হয়। তক্ষক কাশ্যপের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য এক বৃক্ষে দংশন করিলেন। বৃক্ষটী তক্ষকের বিষের জ্বালায় দগ্ধীভূত হইল, কিন্তু কাশ্যপ নিজ বিদ্যাবলে ভস্মীভূত বৃক্ষটীকে অনায়াসে সঞ্জীবিত করিলেন। ব্রাহ্মণের ঈদৃশী ক্ষমতা দেখিয়া তক্ষক তাঁহাকে প্রচুর ধন অর্পণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বিষবৈদ্য কাশ্যপ ব্রাহ্মণরূপী তক্ষকের নিকট আশাতিরিক্ত ধন পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। (মহাভা—আদি)

কির্ম্মীর—বকরাক্ষসের ভ্রাতা। পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া নরমাংসলোলুপ রাক্ষসগণসমাকীর্ণ কাম্যকবনে প্রবেশ করিলে, এই ভয়ঙ্কর রাক্ষস মায়াবিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদের পথ অবরোধ করে। ভীম অগ্রসর হইয়া ইহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম ইহাকে বধ করেন। কির্ম্মীর বধের পর পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে প্রস্থান করেন। (মহাভা—বন)

কীচক—মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের শ্যালক এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি। পার্শ্ববর্ত্তিনৃপতিবৃন্দ ইঁহাকে ভয় করিতেন; এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত কৌরবেরাও ইঁহার ভয়ে মৎস্যদেশ আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিরাটরাজের গোগৃহ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য বিরাটরাজভবনে ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীর (দাসী) বেশে এবং ভীম সূপকার (পাচক) বেশে বিরাটের অন্তঃপুরে থাকেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কীচক সৈরিন্ধ্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট অসদভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; কিন্তু সাধ্বী সৈরিন্ধ্রী তাহার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করাতে কীচক তাহাকে আক্রমণ করেন। সৈরিন্ধ্রী পলায়নপূর্ব্বক সভাস্থলে উপস্থিত হন; কীচকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে পদাঘাত করেন। দ্রৌপদী কীচকের দুরভিসন্ধির বিষয় ভীমের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে অপমানের প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করেন। ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে নিশাভাগে বিরাটের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণের নাট্যশালায় যাইতে বলেন। প্রলুব্ধ কীচক সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীবেশপরিহিত, শয্যায় শয়ান ভীমকে সম্বোধন করা মাত্র, ভীম শয্যা হইতে উঠিয়া কীচককে বাহুযুদ্ধে পরাজয় করিয়া পশুর ন্যায় বধ করেন।

কুন্তি-ভোজ (কুন্তীভোজ)—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের দুই সহোদরা ছিলেন, একার নাম পৃথা, অপরা সুপ্রভা। পৃথা রাজা পাণ্ডুর মহিষী হইয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি ইঁহার গর্ভজাত। সুপ্রভার গর্ভে শিশুপাল জন্মগ্রহণ করেন। পৃথার জনক বসুর (মতান্তরে সুরসেনের) পিতৃষসার পুত্র কুন্তি-ভোজ অপুত্রক ছিলেন। পৃথার পিতা তাহাকে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুন্তি-ভোজের নিকট প্রতিপালনার্থ অর্পণ করেন। পৃথা স্বীয় পিতৃব্য কুন্তি-ভোজকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কুন্তী নামে খ্যাত হন। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তীভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন এবং কুন্তীদেবীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে একটী বশীকরণ মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্রের প্রভাব এই যে, ইহা যে দেবতার নামে উচ্চারিত হইবে, সেই দেবতাই মন্ত্রোচ্চারণকারিণীর নিকট উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহার প্রসাদে মন্ত্রোচ্চারণকারিণী গর্ভবতী হইয়া পুত্র সন্তান প্রসব করিবেন। কুন্তী অবিবাহিত অবস্থাতেই কুতূহলিনী হইয়া এই মন্ত্র পরীক্ষার জন্য সূর্য্যদেবের স্মরণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণ করা মাত্র সূর্য্যদেব স্বদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগে পৃথিবীতে তাপদান করিতে লাগিলেন এবং অপর মূর্ত্তিতে তিনি কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কুন্তীর সম্মতিক্রমে তপনদেব তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। কুন্তীর প্রার্থনায় সূর্য্যদেব বলিলেন "তোমার পুত্র আমার অভেদ্য কবচ ও কুণ্ডল লাভ করিবে।" এই বলিয়া সূর্য্যদেব অন্তর্হিত হইলেন। যথাসময়ে কবচকুণ্ডলধারী হইয়া কর্ণ জন্মলাভ করেন। কুন্তী লোকলজ্জা-ভয়ে নবজাত কুমারকে সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। (কর্ণ দেখ)। কিয়ৎকাল পরে

কুন্তী-ভোজের চেষ্টায় কুন্তী স্বয়ংবর প্রথানুসারে পাণ্ডুর সহিত পরিণীতা হন। কিয়ৎকাল পর পাণ্ডু তদীয় দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী সহ বিহারার্থ বনগমন করেন। এই বনেই পাণ্ডুর মৃত্যু হয় এবং কুন্তী ও মাদ্রী ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতার ঔরসে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র লাভ করেন। (পাণ্ডু দেখ), (হরিবংশ ও মহাভারত)

কুবলয়াশ্ব—(১) মহারাজ শ্রাবস্তের পৌত্র এবং বৃহদশ্বের পুত্র। ইঁহার পিতামহ শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নাম্নী নগর নির্ম্মাণ করেন। কুবলয়াশ্ব মহর্ষি উতঙ্কের আদেশে ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করেন। ধুন্ধুকে বধ করাতে ইনি ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। (শ্রীমদ্ভা—৯ম অ)

(২) শত্রুজিৎ নামক রাজার পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম ঋতধ্বজ। কুবলয় নামক দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন বলিয়া ইনি কুবলয়াশ্ব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কুবলয়াশ্ব পাতালকেতু নামে এক দানবের অনুসরণ করিতে করিতে পাতালপুরে উপস্থিত হন; তথায় গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে বিবাহ করেন। তাঁহার নিকট পাতালকেতুর সন্ধান পাইয়া তাহাকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক বধ করেন। অতঃপর মদালসাকে সঙ্গে করিয়া ঋতধ্বজ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পাতালকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ বাসনায় রাজধানীর সন্নিধানে এক আশ্রমে তপস্বিভাবে অবস্থান করিয়া কুবলয়াশ্বের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজকুমার কুবলয়াশ্ব তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, তপস্বিবেশধারী তালকেতু ঋতধ্বজের উষ্ণীষ প্রার্থনা করিয়া লইলেন এবং রাজকুমারকে আশ্রমরক্ষার ভার দিয়া উষ্ণীষগ্রহণপূর্ব্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তালকেতু রাজার হস্তে কুবলয়াশ্বের উষ্ণীষ প্রদানপূর্ব্বক রাজকুমারের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র রাজপুরীতে এক শোকের ছায়া পতিত হইল। সাধ্বী পত্নী মদালসা পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। এদিকে কিয়ৎকাল পরে কুবলয়াশ্ব গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং মদালসার মৃত্যুতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, আর বিবাহ করিবেন না। যাহাতে জন্মান্তরে মদালসাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে মদালা পাতালে এক নাগরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই নাগরাজের পুত্রদ্বয়ের সহিত কুবলয়াশ্বের গাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছিল। ঘটনাক্রমে কুবলয়াশ্ব পাতালপুরে উপস্থিত এবং বিরহিণী মদালসার সহিত মিলিত হইলেন। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

কুবের—মহর্ষি পুলস্ত্যের পৌত্র এবং বিশ্রবার পুত্র। ইনি যক্ষনামক ভূতযোনিদের অধিপতি এবং শিবের ধনরক্ষক। অলকা ইঁহার রাজধানী। বিশ্রবার সহিত তদীয় পুত্রের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া পুত্রের নাম বৈশ্রবণ রাখা হইয়াছিল। বৈশ্রবণের অঙ্গের গঠন অতি কুৎসিত বলিয়া তিনি কুবের আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার তিন পা, আটটী দাঁত এবং তিনি দেখিতে অতি কদাকার। মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। বৈশ্রবণ কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলে, পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলেন। বৈশ্রবণ কহিলেন যে, তিনি বিত্তরক্ষক লোকপাল হইতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনা মতে তাঁহাকে ধনাধিপতি ও চতুর্থ লোকপাল করিয়া দিলেন। বরলাভ করিয়া কুবের পিতা বিশ্রবার নিকট গিয়া বলিলেন "আমি লোকপাল হইয়াছি কিন্তু পিতামহ আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন নাই; অতএব আমি কোথায় অবস্থান করিব আপনি নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" বিশ্রবা পুত্রের বাক্য শুনিয়া তাহাকে দক্ষিণ সাগরের তীরে ও ত্রিকূট নামক পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত, ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভমানা হেমপ্রাকারবেষ্টিত ও বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত লঙ্কাপুরীতে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। পিতার আজ্ঞায় কুবের লঙ্কাপুরীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই পুরীতে পূর্ব্বে সুকেশ নামক রাক্ষসের পুত্র দেববতীর গর্ভজাত মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন রাক্ষস বাস করিতেন। এই রাক্ষসত্রয় ব্রহ্মার বরে অজেয় ও দীর্ঘজীবী হইয়া দেবতাগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদের দুরবস্থা দেখিয়া রাক্ষসদিগের শাসনের জন্য লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে মালী হত হইয়াছিলেন; মাল্যবান ও

সুমালী স্ত্রীপুত্রসহ পাতালপুরী আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে সুমালী মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়া পুষ্পকারোহী কুবেরকে দেখিতে পান এবং তাহার ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হন। গৃহে প্রতিগমন করিয়া কিরূপে তিনি কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় কন্যা কৈকসীকে (অপর নাম নিকষা) সমীপে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে অমিতবলসম্পন্ন পুত্র কামনায় কুবেরপিতা বিশ্রবার নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। কৈকসী পিতার উপদেশানুসারে বিশ্রবা মুনির নিকট যাইয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করাতে মুনি তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিনপুত্র এবং সূর্পনখা নামে কন্যা উৎপাদন করিলেন। বিভীষণ সর্ব্বকনিষ্ঠ; সূর্পনখা, বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কিন্তু রাবণ ও কুম্ভকর্ণের কনিষ্ঠা। রাবণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেন; ইহারও আকৃতি কুবেরের ন্যায়ই কুৎসিত। রাবণের দশ মস্তক। (রাবণ দেখ)। একদা যক্ষরাজ কুবের তদীয় জনক বিশ্রবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, পিতা তাঁহাকে রাবণাদির জন্মবৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতে কুবেরকে অনুরোধ করিলেন। বিশ্রবা দশাননকে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক কুবেরের তুল্য ধনশালী হইতে উপদেশ দিলেন; ঈর্ষ্যাপরায়ণ রাবণ পিতাকে বলিলেন যে, তিনি স্বীয় বাহুবলে কুবের অপেক্ষা অধিক ধনসম্পন্ন হইবেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বরলাভ করিলেন। ব্রহ্মার বরে রাবণ দেবদানবযক্ষরক্ষগন্ধর্ব্বনাগাদির এবং সুপর্ণের অবধ্য হইলেন। সুমালী দৌহিত্রগণের বরলাভ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাবণকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবাস লঙ্কা অধিকার করিতে পরামর্শ দিলেন। রাবণ মাতামহের অনুরোধ সঙ্গত মনে করিলেন এবং তিনি কুবেরের নিকট প্রহস্তকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া মাতামহের রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। কুবের দূতমুখে রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া রাবণকে লঙ্কাদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং তিনি এই সংবাদ পিতাকে জানাইলেন। বিশ্রবা কুবেরের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাবণের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি রাবণকে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিতাড়িত ও বরলাভে উদ্ধত মনে করিয়া কিছু বলিলেন না। বিশ্রবা কুবেরকে লঙ্কা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন এবং কৈলাসপর্ব্বতের উপর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া আত্মীয় ও অনুচরগণসহ তথায় তাঁহাকে বাস করিতে আদেশ করিলেন। কুবের পিতার আদেশে লঙ্কাপরিত্যাগপূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতের উপর অলকানাম্নীপুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। (রামায়ণ—উত্তর)

কুব্জা।—কংসের মাল্যানুলেপনবাহিনী দাসী। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের সহিত কংসের ধনুর্যজ্ঞোপলক্ষে মথুরায় উপস্থিত হইলেন এবং এক কুব্জদেহা পরিচারিকাকে রাজমার্গে অনুলেপন হস্তে কংসালয়ে যাইতে দেখিয়া তাহার নিকট অনুলেপন প্রার্থনা করিলেন। কুব্জা আহ্লাদের সহিত তাহাকে অনুলেপন প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া হস্তাগ্রভাগ দ্বারা তাহার পৃষ্ঠস্থিত উন্নত মাংসখণ্ড নিপীড়িত করিয়া তাহাকে দেহদোষমুক্ত করিলেন। (শ্রীমদ্ভা—১০ম স্ক)

কুমার—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম। তারকাসুর ব্রহ্মার বরে দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি উহাদিগকে বলেন যে, মহাদেবের ঔরসে কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিলে তিনি দেবসেনাপরিচালনপূর্ব্বক তারকাসুরকে বধ করিবেন। অতএব যাহাতে মহাদেবের সন্তানোৎপাদনে প্রবৃত্তি জন্মে তজ্জন্য উপায় অবলম্বন করিতে দেবতাদিগকে উপদেশ দিলেন। দেবতাদের কৌশলে হরগৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হইল; কিন্তু এই মিলন সম্পাদন করিতে যাইয়া মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইলেন। এই বিবাহের ফলে কার্ত্তিকেয় (বা কুমার) উৎপন্ন হইলেন; এবং তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। অনন্তর দেবসেনাপরিচালনপূর্ব্বক তিনি তারকাসুরকে নিহত করেন এবং দেবতাদিগকে পুনরায় স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। (কার্ত্তিকেয় দেখ)

কুমারিকা—রাজা ভরতের পৌত্রী এবং সিংহলেশ্বর শতশৃঙ্গের কন্যা। শতশৃঙ্গের ইন্দ্রদ্বীপাদি ৮ পুত্র ও কুমারিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কুমারিকার মুখ বর্করিকাকৃতি (অর্থাৎ মেষশাবকের মুখের ন্যায়)।

একদা এক ক্ষুৎপিপাসাকুল যুথভ্রষ্ট মেষী মহাসাগর সঙ্গমে লতাজালে জড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহার দেহ সাগরসঙ্গমে জলে পতিত হয় কিন্তু মস্তকটী লতাজালে আবদ্ধ থাকাতে জলমগ্ন হইতে পারে নাই। সাগরসঙ্গমের মাহাত্ম্যে ঐ বর্করী (মেষী) সিংহলরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার দেহ অনুপম নারীদেহের তুল্য হইল, কিন্তু মুখটী মেষীর মুখের ন্যায়ই রহিল। অপুত্রক রাজার সন্তান হইল শুনিয়া সকলেই সুখী হইল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া সকলে বিষণ্ণ হইল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের মুখ দর্পণে দেখিলেন; দর্শনমাত্র তাহার পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তিনি রাজার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক বহু অনুচর ও দ্রব্যসম্ভার সমভিব্যাহারে যেখানে তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ ও মুখ নিপতিত ছিল তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কঙ্কালগুলি সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। মুখের অস্থি জলে পতিত হইবামাত্র তাহার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া দিব্য নারীর মুখতুল্য হইল। তিনি সেখানে থাকিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। শিব বরদানের জন্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। কন্যা মহেশ্বরকে সেই স্থানে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে প্রার্থনা করিলেন। শিব সম্মত হইলেন। রাজকুমারী তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং মন্দিরাভ্যন্তরে এক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই শিবলিঙ্গ বর্করেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হইলেন। স্বস্তিক নামে এক নাগেন্দ্র মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কুমারিকাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; তাহাতে মন্দিরের পার্শ্বে এক কূপ উৎপন্ন হইল। এই কূপ গঙ্গাজলে পূর্ণ হইল। শিব বর দিলেন যে, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে যিনি এই কূপে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ ও বর্করেশ্বরের পূজা করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন; এবং যাহাদের মৃত শরীর এই স্থানে দগ্ধ হইলে পর অস্থি সাগরজলে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাদের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। কুমারী লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত পিতা লঙ্কেশ্বর শতশৃঙ্গের নিকট বর্ণন করিলেন। রাজ্যের সমস্ত লোক রাজকন্যার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শতশৃঙ্গ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া পরমপ্রীত হইলেন এবং পরিবারবর্গ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া সাগর-সঙ্গমে বর্করেশ্বর লিঙ্গ পূজা করিতে আসিলেন। কুমারিকা মহাকালকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত রুদ্রলোকে গমন করিলেন। পার্ব্বতী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সখী সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহার নাম চিত্রলেখা রাখিলেন। (স্কন্দ পুরাণ)

কুম্ভকর্ণ—লঙ্কেশ্বর রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর। বিশ্রবা মুনির ঔরসে সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর (নিকষার) গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে দেবতারা প্রজাপতিকে বলিলেন যে, বর না পাইয়াই এই রাক্ষস যেরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে, বরলাভ করিলে আর কাহারও রক্ষা থাকিবে না। দেবতাদের বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন; স্মরণ মাত্র বাগ্দেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "বাণি, তুমি দেবতাদের অনুকূলে কুম্ভকর্ণের বদন হইতে বহির্গত হও।" কুম্ভকর্ণ বর চাহিলেন, "আমি যেন বহুবৎসর ক্রমাগত নিদ্রা যাইতে পারি এবং ৬ মাস নিদ্রার পর একদিন জাগরিত হইয়া আহার করিতে পারি।" বর চাহিবার সময় কুম্ভকর্ণ অচেতনবৎ ছিলেন; তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন "আমি কি বর চাহিলাম?" কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ফিরিবার নহে, ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। (রামা—উত্তর)। (কুবের দেখ)

কুম্ভাণ্ড—(মতান্তরে কুষ্মাণ্ড)—বাণাসুরের মন্ত্রী। বাণ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া বধ করিতে আদেশ দিলে, এই মন্ত্রী তাহাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ দিয়া হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরকে বধ করিয়া এই মন্ত্রীকেই তাহার রাজ্য দান করেন। (হরিবংশ—১৮৮ অ)

কুম্ভীনসী—(১) লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতৃস্বসা; তাঁহার মাতা কৈকসীর কনিষ্ঠা ভগিনী। রাবণের দিগ্বিজয়ে বহির্গত হওয়ার পর মধুনামক রাক্ষস কুম্ভীনসীকে হরণ করেন। রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া মধুকে শাস্তি দিতে মধুবনে গেলে, কুম্ভীনসীর অনুরোধে উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণাসুরের জন্ম। শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক এই লবণাসুর হত হয়। (রামায়ণ)

(২) গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের পত্নী। অঙ্গারপর্ণ চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। পাণ্ডবদের বনবাসকালে এই গন্ধর্ব্ব অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দী হন। একদা পাণ্ডবেরা রাত্রিকালে নিশাচরসঙ্কুল এক ঘোর অরণ্য অতিক্রমপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে উপনীত হন। এই সময়ে চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন। পাণ্ডবদের উপস্থিতিতে চিত্ররথের জলক্রীড়ার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। চিত্ররথের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক চিত্ররথ পরাভূত ও বন্দী হন। কুম্ভীনসীর প্রার্থনায় দয়ার্দ্র হইয়া যুধিষ্ঠির এই গন্ধর্ব্বকে বন্ধনমুক্ত করিতে অর্জ্জুনের প্রতি আদেশ দেন; জ্যেষ্ঠের আদেশে অর্জ্জুন ইহার বন্ধনমোচন করেন। চিত্ররথ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে মায়াযুদ্ধ শিক্ষা দেন। অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইলে পর চিত্ররথ তাহার বিচিত্র রথখানি দগ্ধ করিয়া স্বীয় নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক দগ্ধরথ নাম ধারণ করেন।

(মহাভা—বন)।

কুরু—ভরতবংশীয় মহারাজ সংবরণের পুত্র। মহিষী তপতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ রাজা। ইনি বহুবৎসর কুরুজাঙ্গালনামক স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এজন্য এইস্থান পবিত্র হইয়া কুরুক্ষেত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। মহারাজ কুরুর নামানুসারে তদ্বংশীয় নৃপতিগণ সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। অবিক্ষিৎ, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মনু ও জনমেজয় নামে ইঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। ইঁহার রাজধানী হস্তিনাপুর নামে নগরী। ভরতবংশীয় রাজা হস্তীর নামানুসারে নগরের নামকরণ হইয়াছিল। মহারাজ হস্তীর পিতা সুহোত্র ও মাতা সুবর্ণা। সুবর্ণা বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুর কন্যা। হস্তী ত্রিগর্ত্তরাজতনয়া যশোধরাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বিকুণ্ঠন নামক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভারত)।

কুশ—অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি সীতাদেবীর গর্ভে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে জন্মগ্রহণ করেন। কুশ ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লব, রামচন্দ্রের সভায় বাল্মীকিরচিত রামায়ণ গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের সহিত রামের পরিচয় হয়। রাম ইঁহাকে কুশাবতী নগরীতে স্থাপন করেন। রামের বৈকুণ্ঠ গমনের পর অযোধ্যা শ্রীহীন, বনাকীর্ণ ও হিংস্রজন্তুসমাকুল হইয়া পড়ে। এইজন্য অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুশাবতী নগরীতে যাইয়া রাত্রিকালে কুশের শয়নকক্ষে উপস্থিত হন এবং অযোধ্যার দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়া কুশকে তদীয় পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যাতে যাইতে অনুরোধ করেন। দেবীর অনুরোধে কুশ কুশাবতী পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন। (রঘুবংশ)। মহাকবি ভবভূতি মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় রামের সহিত তদীয় পুত্রদ্বয়ের মিলন সম্পাদন করেন নাই। তিনি একটী যুদ্ধের অভিনয় করিয়া স্বয়ং রামকে তদীয় ভ্রাতৃগণসহ বালক কুশ ও লবের দ্বারা পরাজিত করাইয়াছেন। ভবভূতি প্রণীত বিখ্যাত নাটক উত্তরচরিতে কুশ ধনুর্ব্বিদ্যায় অতি নিপুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

(উত্তরচরিত)।

কুশধ্বজ—ইনি মিথিলার রাজা হ্রস্বরোমার পুত্র ও রামায়ণপ্রসিদ্ধ সীতাদেবীর খুল্লতাত। সীতাদেবীর পিতা সীরধ্বজ জনক; সীরধ্বজের কনিষ্ঠ সহোদর কুশধ্বজ। কুশধ্বজের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণ্ডবীকে ভরত ও কনিষ্ঠা শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করেন। সীরধ্বজ রাজা সুধন্বাকে পরাজিত করিয়া তদীয় সাঙ্কাশ্যা নামক রাজ্য স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে অর্পণ করেন। কুশধ্বজের পূর্ব্বপুরুষ নিমি; নিমির পুত্র মিথি; এই মিথি হইতে তদীয় অধিকৃত রাজ্য মিথিলা নামে খ্যাত হইয়াছে। মিথির পুত্র জনক হইতে তদ্বংশীয় সমস্ত রাজাই "জনক" এই উপনামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

(রামা—আদি)।

কুশনাভ—মহারাজ কুশের পুত্র। প্রাচীনকালে কুশনামে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। মহারাজ কুশের চারিপুত্র:—কুশাম্ব (বা কুশম্ব), কুশনাভ, অমূর্ত্তরজ ও বসু। ইঁহারা চারিজনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কুশাম্বকর্ত্তৃক কৌশাম্বী, কুশনাভকর্ত্তৃক মহোদয়, অমূর্ত্তরজকর্ত্তৃক ধর্ম্মারণ্য এবং বসুকর্ত্তৃক গিরিব্রজনগর স্থাপিত হয়। নৃপতি কুশনাভের ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী একশত কন্যা হয়। একদা এই কন্যাগণ যথেচ্ছভাবে আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় পবনদেব তাহাদের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের

সহিত সঙ্গম প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাহারা পিতার অনুমতি ব্যতীত এই ব্যাপারে সম্মতি দিতে অসক্ত হওয়ায় পবনদেবের শাপে কুব্জভাবাপন্ন হন। কন্যাগণের অনুনয়ে পবনদেব প্রসন্ন হইয়া বলেন "যদি কাম্পিল্যনগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত তোমাদিগকে বিবাহ করেন, তবে তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হইবে"। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্রহ্মদত্ত মহোদয় রাজকন্যাগণের শাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন; বিবাহের পর কন্যাগণ পূর্ব্বশ্রীলাভ করিলেন। যে স্থানে পবনশাপে কন্যাগণ কুব্জা হইয়াছিলেন, সে স্থান কন্যাকুব্জনামে খ্যাত হইল; এক্ষণে উহা কনোজ নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমান কনোজ সহর রামায়ণের সময় কুশনাভের রাজধানী মহোদয় নামে খ্যাত ছিল।

কুশিক—এই রাজা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ ও গাধিরাজের পিতা। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চারিত হইয়াছিল। একদা চ্যবন নামে বিখ্যাত ঋষি জানিতে পারেন যে কুশিকবংশ হইতে তাহার বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারিত হইবে। আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সঞ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে না করিয়া তিনি রাজা কুশিকের বংশনাশ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। গাধিরাজের কন্যাকে চ্যবনবংশীয় ঋচীক মুনি বিবাহ করেন। এই বিবাহফলে ঋচীকের এক পুত্র জন্মে; ইঁহার নাম জমদগ্নি। জমদগ্নির পুত্র রাম (পরশুরাম)।

(চ্যবন ও ঋচীক দেখ)। (মহাভারত—অনুশাসন)।

কূর্ম্ম—বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু কূর্ম্মশরীর ধারণ করেন। সমুদ্রমন্থনসময়ে দেবগণের প্রার্থনায় কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু মন্দরগিরিপৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।

কৃতবর্ম্মা বা কৃতবীর্য্য—যদুবংশীয় রাজা কনকের পুত্র। কনকের চারিপুত্র; ইহাদের নাম কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতবর্ম্মা ও কৃতাগ্নি। কৃতবীর্য্যের বিখ্যাত পুত্র অর্জ্জুন পরশুরামকর্ত্তৃক নিহত হন। (কার্ত্তবীর্য্য দেখ)

কৃপ—প্রসিদ্ধ গৌতম ঋষির পুত্র। কথিত আছে যে, শরস্তম্বে প্রসিক্ত গৌতম ঋষির রেতঃ হইতে কৃপের জন্ম হয়। কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন; ইনি দুর্য্যোধনাদিকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরবদিগের পক্ষভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে তিনজন মাত্র জীবিত ছিলেন; তন্মধ্যে কৃপাচার্য্য অন্যতম। (মহাভারত—আদি)

কৃপী—দ্রোণাচার্য্যের পত্নী ও অশ্বত্থামার মাতা; ইনি কৃপাচার্য্যের ভগিনী। শরস্তম্বে প্রসিক্ত গৌতমঋষির রেতঃ হইতে ইঁহার উৎপত্তি। (মহাভারত—আদি)

কৃষ্ণ—বসুদেবতনয়। ইনি দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার; স্বয়ং বিষ্ণু পূর্ণরূপে দৈবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কংসকর্ত্তৃক দৈবকীর ৬টী সন্তান নিহত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু কলা (অংশ) রূপে তাঁহার সপ্তম গর্ভ আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিষ্ণু যোগমায়াকে বলিলেন, "হে দেবি! তুমি ব্রজপুরে গমন কর; বসুদেব পত্নী রোহিণী গোকুলে নন্দের গৃহে অবস্থান করিতেছেন; কেবল রোহিণী নহেন, বসুদেবের অন্যান্য ভার্য্যারাও কংসের ভয়ে নানাস্থানে লুক্কায়িত আছেন। তুমি গিয়া দৈবকীর জঠরে যে সন্তান আছে, তাহা আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর; আকর্ষণ করিলে ভ্রূণ কিরূপে জীবিত থাকিবে তাহা চিন্তা করিও না; উহা আমার অংশ; পরে পূর্ণরূপে আমি দৈবকীর পুত্রত্ব গ্রহণ করিব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গৃহে জন্মিও।" এইরূপে বলরাম বিষ্ণুর অংশ হইলেন। (শ্রীমদ্ভা—১০স্ক—২য় অ)। বসুদেব ও দৈবকী কংসকর্ত্তৃক কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। দৈবকী সম্পর্কে কংসের ভগিনী, সুতরাং কংস সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা; তিনি শ্বশুরের সাহায্যে পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং মথুরার রাজা হন। কংস দৈবকীকে বসুদেবের সহিত বিবাহ দেন; বিবাহের সময় দৈববাণী হয় যে, দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে বধ করিবে। কংস দৈববাণী শুনিয়া বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগারে রুদ্ধ করেন। কারাগারে বসুদেবের যত সন্তান হইতে লাগিল, সকলকেই কংস একেএকে বধ করিতে লাগিলেন। ৮ম গর্ভে যখন ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ

করেন, তখন বসুদেব বংশলোপাশঙ্কায় শিশুটীকে গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রিতে গোকুলে নন্দালয়ে লইয়া যান। সেই রাত্রিতেই নন্দের পত্নী যশোদা এক কন্যা প্রসব করেন; কন্যা আর কেহ নহেন, স্বয়ং যোগমায়া। বসুদেব যশোদার আতুর ঘরে শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া তাঁহার নবপ্রসূতা কন্যাকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। মহামায়ার মায়াতে গোকুলের সকলেই অচেতন ছিলেন, এজন্য বসুদেব সন্তানপরিবর্ত্তনের সুবিধা পাইয়াছিলেন। প্রভাত হইলেই কংস জানিতে পারিলেন যে, বসুদেবের কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। তিনি কন্যাটীকে প্রস্তরের উপর ফেলিয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। কন্যাকে প্রস্তরের উপরে নিক্ষেপ করিলে, মহামায়া উপস্থিত জনগণের চমৎকারবিধানপূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় কন্যারূপিণী মহামায়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেলেন "রে মূঢ় কংস, তোর হন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" প্রাণনাশকের জন্মগ্রহণ সংবাদ শুনিয়া কংস বসুদেব ও দৈবকীকে অবরুদ্ধ রাখা নিষ্ফল মনে করিলেন এবং তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে গোপবালকরূপে লালিত পালিত হইয়া দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণুর ৮ম অবতার। ইঁহার মনুষ্যজীবন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) ব্রজলীলা (২) মথুরা লীলা (৩) দ্বারকা লীলা।

(১) ব্রজলীলা—এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বহু অলৌকিক ও অতিমানুষিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকৃত যমলার্জ্জুনরূপধারী সিদ্ধপুরুষদ্বয়ের মুক্তি, কংসপ্রেরিত পূতনা, বক, অঘ, অরিষ্ট প্রভৃতি অনুচরগণের বিনাশ, কালিয়-নাগের দমন ও নির্ব্বাসনসম্পাদনপূর্ব্বক কালিয়হ্রদ ব্রজবাসিগণের ব্যবহারে আনয়ন এবং রাধাপ্রমুখ শতগোপিনীর সহিত বিবাহ, এ সমস্তই তাঁহার অলৌকিক ও অতিমানুষিক শক্তির পরিচায়ক। বৃষভানুনন্দিনী প্রেমময়ী রাধিকা সর্ব্বস্বত্যাগিনী হইয়া কৃষ্ণগতপ্রাণা হইলেন। শ্রীমতী রাধিকা ক্লীবে বিবাহিতা সুতরাং শাস্ত্রানুসারে অনূঢ়া। শ্রীরাধা পরকীয়া হইয়াও পরস্ত্রী নহেন, কুলত্যাগিনী হইয়াও ব্যভিচারিণী নহেন। শ্রীরাধা প্রেমভক্তির পূর্ণ আদর্শ। শ্রেষ্ঠতম ভক্তি গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের কোন স্থানেই শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয় না। অন্য কোন ভক্তি গ্রন্থে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় এবং তথায় তিনি বৃষভানুনন্দিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের দুইজন ভক্তসাধক ছিলেন; একের নাম শ্রীদাম ও অপর সুবল; উভয়েই আদর্শ সাধক।

(২) মথুরালীলা—গুপ্তচরদ্বারা শ্রীকৃষ্ণবধে অসমর্থ হইয়া কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরায় আনয়নার্থ অক্রূর প্রেরিত হন। অক্রূর যাদবদিগকে কংসের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট কংসের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যক্ত করেন এবং কংসবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় উপনীত হইলেন। কংস শ্রীকৃষ্ণবধের জন্য মল্ল আনয়ন করিয়াছিলেন ও সিংহদ্বারে কুবলয়াপীড়নামে এক দুর্দ্দান্ত হস্তী রাখিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ মথুরার রাজপথে চন্দনানুলেপনবাহিনী কংসের পরি-চারিকা কুব্জাকে অঙ্গদোষ মুক্ত করিয়া এবং মল্লদিগকে ও দ্বাররক্ষক হস্তীটাকে বিনাশ করিয়া কংসের সভায় উপস্থিত হন। কংস শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেন, কিন্তু অবশেষে তিনি কৃষ্ণহস্তে নিহত হন। কংসের পিতা উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে মথুরার রাজা হইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাজত্বের জন্য তিনি কংসকে বিনাশ করেন নাই; রাজা হওয়ার অভিলাষ তাঁহার ছিলনা; তিনি উগ্রসেনকে পুনরায় রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং অন্যান্য যাদবগণের ন্যায় তাঁহার অধীন রহিলেন। কিয়ৎকালের জন্য কাশীর নিকটবর্ত্তী অবন্তীনগরে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। এখানে পঞ্চজন নামক দৈত্য আচার্য্য সান্দীপনির পুত্র হরণ করে; শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চ-জনকে সংহার করিয়া গুরুপুত্রের উদ্ধার করেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ গুরুপুত্রকে তাহার হস্তে অর্পণ করেন। এই ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ লাভ করেন।

(৩) দ্বারকা লীলা—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং গোপনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চর পাঠাইয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে

বিবাহ করিবার জন্য বিদর্ভরাজের নিকট প্রস্তাব করেন, কিন্তু পুত্র রুক্মীর পরামর্শে ভীষ্মক শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে অসম্মত হন। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি রুক্মিণীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংবর প্রথানুসারে বলপূর্ব্বক স্বয়ংবর স্থান হইতে রুক্মিণীকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে রুক্মীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে রুক্মিণীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ উঁহাকে পরিত্যাগ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিরাজগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃষস্তৃতনয় শিশুপাল ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া রুক্মিণী লাভাশয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ প্রভৃতি দশটী পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা হয়। রুক্মিণী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববতী, সুশীলা, সত্যভামা ও লক্ষ্মণা নামে চারিটী প্রধানা পত্নী ও ১৬ হাজার অপ্রধানা ভার্য্যা ছিলেন। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন যৌবন প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক বিদর্ভরাজ রুক্মী তদীয় কন্যা সুভাঙ্গীর জন্য স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিলেন। সুভাঙ্গী স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন। প্রদ্যুম্ন সুভাঙ্গীকে লইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি মধ্যমপাণ্ডব অর্জ্জুনের সহিত সখ্যস্থাপন করেন। দ্রৌপদী স্বয়ংবরে উপস্থিত থাকিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে উন্মত্ত কৌরবদিগকে সদুপদেশদানপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে সমারোহপূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞসম্পন্ন করেন। এই যজ্ঞের প্রাক্কালে তিনি ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানীতে গমন করেন এবং তাঁহাদের একতমের সহিত জরাসন্ধকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করেন। জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। প্রবল শত্রুকে এইরূপে বিনাশ করিয়া কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবৃত্ত হন।

নরকাসুর নামে পৃথ্বীর এক পুত্র ছিল। বিষ্ণু বরাহাবতারে পৃথ্বীকে যখন উদ্ধার করেন, তখন বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত পৃথিবীর গাত্রসঙ্গম হওয়ায় পৃথ্বীর গর্ভে এই নরকাসুরের উৎপত্তি হয়। ইঁহার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী)। ইন্দ্র দ্বারকায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই নরকাসুরের উৎপীড়নের বিষয় বর্ণনা করেন। ভগবান কৃষ্ণ এই দুরাচার অসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্রকে নিঃশঙ্ক করেন। তিনি বহু ধনরত্ন সহ নরকাসুরের ১৬ হাজার রমণী দ্বারকায় আনয়ন করেন। পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "আপনিই আমাকে পুত্র দিয়াছিলেন আবার আপনিই উহা গ্রহণ করিলেন। আপনার অভিপ্রায় কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।" (ভগদত্ত দেখ)। এই বলিয়া পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণকে দুইটী কুণ্ডল দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কুণ্ডলদ্বয় দেবমাতা অদিতিকে দিবার জন্য সত্যভামাসহ স্বর্গে গমন করেন। অদিতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং আহ্লাদের সহিত কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনের সময় সত্যভামা মনোহর দেবতরু পারিজাত দেখিতে পান। দ্বারকায় আগমন করিয়া সত্যভামা একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন; এই ব্রতের জন্য সত্যভামা পারিজাত বৃক্ষ প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট এক বৎসরের জন্য পারিজাত বৃক্ষটী চান। এই অভিপ্রায়ে নারদ ইন্দ্রের নিকট দূতরূপে প্রেরিত হন; কিন্তু নারদের দৌত্য বিফল হইল; ইন্দ্র পারিজাত দিতে অসম্মত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক পারিজাত আনয়নার্থ গরুড়কে প্রেরণ করেন। গরুড়ের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরাভূত হন; গরুড় পারিজাত আনয়ন পূর্ব্বক উহা সত্যভামাকে অর্পণ করেন। ব্রতের সময় অতিবাহিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ একবৎসর পরে পারিজাত প্রত্যর্পণ করেন।

অগ্নিদেবের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে খাণ্ডবদাহে সাহায্য করেন। এই কার্য্যে অগ্নি প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ও কৌমুদকী গদা দান করেন।

রাজসূয় যজ্ঞে সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা হওয়াতে চেদিরাজ শিশুপাল সর্ব্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেন; শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন।

ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করেন। অর্জ্জুনের পক্ষে

শ্রীকৃষ্ণ নিজে থাকিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু একদল পরাক্রান্ত নারায়ণী সেনা দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ অর্পণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই নারায়ণী সেনা এক প্রবল শক্তিরূপে দুর্য্যোধনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল।

কুরুক্ষেত্র সমরের প্রারম্ভে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থী অসংখ্য জ্ঞাতিবর্গের বধে বিমুখ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করেন। ভগবান্ কৃষ্ণের প্রেরণায় অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে প্রণোদিত করিতে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমালা এক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতা অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ; জগতের সাহিত্যে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর উপাদেয় গ্রন্থ আর নাই। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার পূতিগন্ধ নাই ও সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই; এজন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতগণই এই উপাদেয় গ্রন্থের প্রতি সমান আদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্যান্য হিন্দুদর্শনের ন্যায় গীতাও সংসারকে অশাশ্বত (ক্ষণভঙ্গুর) ও দুঃখময় বলিয়াছেন। "পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়ং অশাশ্বতম্।" (গীতা ৮।১৫)

রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান কালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তদীয় ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেন।

ভারতযুদ্ধের তৃতীয় ও নবম দিনে অর্জ্জুনকে পিতামহের সহিত শিথিলভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া এবং ভীষ্মকর্ত্তৃক অসংখ্য পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধার নাশ অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ভীষ্মের বধের জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন, অবশেষে অর্জ্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে এই লোকনাশন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই, কেবল একদিন ভগদত্তনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণে অর্জ্জুনকে অক্ষম দেখিয়া নিজেই উহা নাশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষদিন নিশাকালে অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে হত্যা করেন। ভারতযুদ্ধে নিহত অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা তখন অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন; এই গর্ভস্থ শিশুই পাণ্ডবদিগের বংশরক্ষার একমাত্র সম্বল। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রনিক্ষেপপূর্ব্বক এই শিশুকেও মাতৃগর্ভে নাশ করেন; কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

যদুবংশের ধ্বংসের পর রমণীদিগকে হস্তিনাপুরে আনয়নের ভার অর্জ্জুনের উপর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করেন। তথায় তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ দূর হইতে মৃগ ভ্রম করিয়া বিষাক্ত শরে তাঁহাকে বধ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত-হরিবংশ-মহাভারত)

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস)— সত্যবতীর কানীন পুত্র। সত্যবতী দাসরাজ বসুর পালিত কন্যা। যমুনার এক দ্বীপে ধীবরদের জালে এক মৎস্যী ধৃত হয়; এই মৎস্যীর উদরে সত্যবতীর জন্ম হয়। গাত্রে মৎস্যের গন্ধ থাকায় ইহার নাম মৎস্যগন্ধা রাখা হইয়াছিল। এক দিবস ধীবরেরা খেয়ানৌকায় লোক পারাপারের জন্য মৎস্যগন্ধাকে নিযুক্ত করে। ঘটনাক্রমে মহর্ষি পরাশর ঐ দ্বীপে যাইবার জন্য খেয়া নৌকায় উপস্থিত হন; মৎস্যগন্ধার রূপে মুগ্ধ হইয়া মধ্যনদীতে মহর্ষি তাহার সঙ্গম প্রার্থনা করেন। উন্মুক্ত নদীবক্ষে একার্য্যে রত হইতে মৎস্যগন্ধা প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যখন মহর্ষি তপঃপ্রভাবে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিলেন, তখন তাহার আর আপত্তি রহিল না। মহর্ষি মৎস্যগন্ধার গর্ভসঞ্চার করিলেন এবং তপোবলে তাহার গাত্রগন্ধ দূরীভূত করিয়া সুগন্ধিযুক্ত করিলেন। মৎস্যগন্ধা স্বীয় গর্ভ দ্বীপে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিলেন; ঋষির বরে তাহার কন্যাভাব কলঙ্কিত হইল না। দ্বীপে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার উপনাম দ্বৈপায়ন হইল। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপশ্চর্য্যার জন্য বনে গমন করেন। ধীবরেরা এই কন্যাকে দাসরাজ বসুর হস্তে অর্পণ করেন। বসু ইহাকে কন্যাবৎ প্রতিপালন করিতে থাকেন এবং ইহার সত্যবতী নাম রাখেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া বেদবিভাগ করিতে আরম্ভ করেন। একার্য্য সম্পন্ন করিতে তাঁহাকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই বেদবিভাগ সম্পন্ন করায় তিনি ব্যাস (বিভাগ কর্ত্তা) নামে পরিচিত হন। এই সময় হইতে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ব্যাসদেবের পূর্ব্বে সমস্ত পদ্যময়, গদ্যময় ও গীতিময় বৈদিক মন্ত্র একত্র বিমিশ্র ছিল; এই

অবস্থায় এই ত্রিবিধ রচনাবলী সমন্বিত বৈদিক মন্ত্রগুলি ত্রয়ীনামে অভিহিত হইত। এই ত্রয়ী হইতে অঙ্গিরো বংশাবতংস মহর্ষি অথর্ব্বা ঐহিক প্রত্যক্ষফলপ্রদ শত্রুমারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির প্রকরণগুলি পৃথক্ করিয়া নিজনামে প্রথিত করেন। তদবধি বেদমন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত হইল; বৃহৎভাগের নাম ত্রয়ীই রহিল এবং ক্ষুদ্রভাগ অথর্ব্ববেদ নামে পরিচিত হইল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বৃহৎ ত্রয়ী বেদমন্ত্র গ্রহণ করিয়া রচনানুসারে ঋক্, যজুঃ ও সাম নামে বিভক্ত করেন। তদবধি বেদ চতুরংশ বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছে। বেদবিভাগই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের একমাত্র কার্য্য নহে। তিনি তাঁহার সমস্ত অর্জ্জিত বিদ্যা লোকহিতার্থ নিয়োজিত করেন। তিনি নিম্নলিখিত ১৮ খানি পুরাণ রচনা করেন—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, পদ্ম, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। এতদ্ব্যতীত তিনি পঞ্চম বেদ অষ্টাদশপর্ব্বসমন্বিত সুবৃহৎ মহাভারত রচনা করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে যে মহাভারত লিখিবার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রহ্মার আদেশে গণদেবকে স্মরণ করেন। গণদেব উপস্থিত হইয়া এই চুক্তি করিলেন যে তাঁহার লেখনী থামিলে আর তিনি লিখিবেন না; ব্যাসদেবও বলিলেন যে তাঁহার শ্লোক রচনা করিতে বিলম্ব হইবে না, কিন্তু তিনি গণদেবকে শ্লোকের অর্থ পরিগ্রহ করিয়া লিখিতে অনুরোধ করেন। এই চুক্তিতে উভয়ে স্বীকৃত হইলেন; ব্যাসদেব শ্লোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন, গণদেব শ্লোকার্থ পরিগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ব্যাসদেব শ্লোক রচনার সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে কঠিন শ্লোক রচনা করিতেন; গণদেবের উহার অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইত; ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহু শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতেন। আর একটী প্রবাদ এই যে পুরাণগুলি রচনা করিয়া তিনি একটী শ্লোকে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন; শ্লোকটী এই :—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

(রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী)।

অর্থ—হে ভগবন্ তুমি রূপবিবর্জ্জিত, কিন্তু আমি ধ্যানদ্বারা তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ও বাক্যের অতীত, কিন্তু আমি স্তুতিদ্বারা তোমার অনির্ব্বচনীয়তা নষ্ট করিয়াছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু তীর্থযাত্রাদি বর্ণনা করিয়া আমি তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি; অতএব হে জগদীশ, আমার এই বিকলতাজনিত ত্রিবিধ অপরাধ ক্ষমা কর।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটী মহাভারতে কিম্বা কোন পুরাণে দৃষ্ট হয় না, এজন্য অনেকে ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন না।

দ্বৈতবনে বাসকালে যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাক্ষাৎ করেন এবং ভাবী যুদ্ধের জন্য দৈব অস্ত্র লাভ করিতে অর্জ্জুনকে পরামর্শ দেন। অর্জ্জুন তাঁহার পরামর্শে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপতাস্ত্র লাভ করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভারবি বিখ্যাত "কিরাতার্জ্জুনীয়" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জননী দাসরাজ বসুর পালিত কন্যা সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ শান্তনু তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু দাসরাজ বৃদ্ধ রাজার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে যদি সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তান রাজ্যলাভ করে, তবে বৃদ্ধ রাজার সহিত কন্যা বিবাহ দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। ইহাতে শান্তনু বিবাহের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

মহারাজ শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন; তিনি পিতার বিবাহে অভিলাষ ও বসুদেবের প্রস্তাব

অবগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি বিবাহ করিবেন না। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আমরণ রক্ষিত হইয়াছিল ; এজন্য "ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা" একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। পুত্রের অনুরোধে শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মে। চিত্রাঙ্গদ অল্পবয়সেই এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে হত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বালিকা ও অম্বিকার পাণিগ্রহণ করেন। (কাশীরাজ দেখ)। মহাবীর সত্যব্রত ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য এই কন্যাদ্বয় কাশীরাজের স্বয়ংবর সভা হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত স্ত্রৈণতা হেতু বিচিত্রবীর্য্য অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। সত্যবতী বংশলোপের আশঙ্কায় বিচিত্রবীর্য্যের বিধবা পত্নীদ্বয়ে সন্তানোৎপাদনের জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করেন ; কিন্তু ভীষ্ম তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মাতাকে স্মরণ করাইয়া তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভীষ্ম অনুরোধ প্রত্যাখান করিলে পর, সত্যবতী তদীয় কানীন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্মরণ করেন। ব্যাসদেব উপস্থিত হইলে সত্যবতী তাঁহাকে অম্বালিকা ও অম্বিকার গর্ভ সঞ্চার করিতে আদেশ দেন। মাতার আজ্ঞায় ব্যাস সম্মত হইলে, সত্যবতী বিধবা পুত্রবধূদ্বয়কে তাহার সমীপে প্রেরণ করেন। ব্যাস উভয়ের গর্ভসঞ্চার করেন। অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। ব্যাসের মূর্ত্তি দেখিয়া অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণা ও অম্বিকা মুদ্রিতনয়না হইয়াছিলেন বলিয়া অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু নামে খ্যাত হয় ও অম্বিকার পুত্র অন্ধ হয়। অম্বিকার অন্ধপুত্র হইবে ইহা সত্যবতী ব্যাসের নিকট শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের পরে আবার অম্বিকাকে ব্যাসের নিকট যাইতে বলিলেন, শাশুড়ীর আদেশ অম্বিকা এবার পালন না করিয়া স্বীয় পরিচারিকাকে নিজের বসনভূষণে সুশোভিত করিয়া ব্যাসের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্যাস ইঁহার গর্ভ সঞ্চার করেন ; এই গর্ভে মহাত্মা বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। (অণীমাণ্ডব্য দেখ)

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতযুদ্ধের বিবরণ যথাযথরূপে বর্ণন করেন।

এক অপ্সরাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের রেত স্খলন হয়, অপ্সরা ভীত হইয়া শুকপক্ষীরূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। ঐ বিসৃষ্ট রেত হইতে শুকদেবের উৎপত্তি হয়। রেতঃপাতের পর শুকদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ব্যাসদেব পুত্রের নাম শুকদেব রাখেন। (শুকদেব দেখ)

বেদবিভাগ ও মহাভারত প্রণয়ন ব্যতীত তিনি উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন নামে বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এই দর্শনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম যে এক পদার্থ তাহা প্রতিপাদন করাই বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য। বেদান্ত দর্শনকার বলিতেছেন যে আমরা অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের বিক্ষেপ করিয়া থাকি। অজ্ঞানের দুইটি শক্তি আছে, একটি আবরণ ও অপরটি বিক্ষেপ। অনেক সময় রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে ; রজ্জুর অজ্ঞান ভ্রমের কারণ। রজ্জুর অজ্ঞান স্বীয় আবরণ শক্তিদ্বারা রজ্জুর স্বরূপ ঢাকিয়া ফেলে, পরে উহার বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা উহাতে সর্প উদ্ভাবিত করে। আমরা দেখি মেঘে সূর্য্য আবৃত করে ; কিন্তু এত বড় গ্রহকে সীমাবদ্ধ মেঘে আবৃত করিতে পারে না ; মেঘ দ্রষ্টার দৃষ্টিপথ আবৃত করে মাত্র। সেইরূপ সসীম অজ্ঞান অসীম আত্মাকে আবৃত করিতে পারে না ; দ্রষ্টা বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে মাত্র। আত্মার স্বরূপ আবৃত হইলে প্রকৃত আত্মবোধ হইতে পারে না। এজন্যই দ্রষ্টা অনাত্মাকে আত্মা ও অনাত্মার ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। এইরূপ বোধের নাম অধ্যাস। আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি বলিবার সময় আমি স্বীয় আত্মাতে দেহধর্ম্মের অধ্যাস সম্পন্ন করি ; স্থূলত্বাদি দেহধর্ম্ম আমি আত্মাতে অধ্যস্ত করিতেছি। এই দর্শনের মতে কেহ আত্মার মঙ্গল বা অমঙ্গল বিধান করিতে পারে না, যেহেতু যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার রাগ, দ্বেষ হওয়া অসম্ভব। অধ্যাসবশতঃ দেহাদির ইষ্ট বা অনিষ্ট আত্মার ইষ্টানিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই দর্শন মতে কর্ম্মফলভোগ সুখদুঃখের উপলব্ধি মাত্র। শরীর ভিন্ন সুখদুঃখের উপলব্ধি হয় না। কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। মোহান্ধ মানব ভোগের জন্য কর্ম্ম করে ও কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করে। (চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার)

বিখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাসকৃত মহাভারতের একটী ক্ষুদ্র অংশ। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। গীতা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ; জগতের সাহিত্যে ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই; ইহার আয়তন বৃহৎ নহে, ইহাতে মাত্র ৭০০ শ্লোক আছে; ইহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সার কথা আছে; এই গীতা সার্ব্বভৌম ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতেছে; অসাম্প্রদায়িকতার জন্য গীতা সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকদিকের নিকট সমান আদৃত। অন্যান্য হিন্দু দর্শনের ন্যায় গীতাও বলেন যে সংসার দুঃখের আলয়, কেবল দুঃখবহুল নহে, দুঃখময়; সংসারে যেটুক সুখ দেখা যায় তাহাও দুঃখের পূর্ব্বাভাস মাত্র। গীতা সংসারকে অশাশ্বত (ক্ষণভঙ্গুর) ও দুঃখ ভূমি বলেন—"পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়ং অশাশ্বতম্।" গীতা ৮। ১৫। আত্মার অবিনশ্বরতা ও পুনর্জ্জন্ম প্রমাণ করিতে যাইয়া গীতাকার লিখিতেছেন :—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

অর্থ—"মানবগণ যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ দেহী (অর্থাৎ আত্মা) জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন।"

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তিনি নারদ পুরাণও রচনা করেন। নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশচ্ছলে এই পুরাণ রচিত বলিয়া ইহা নারদ পুরাণ নামে খ্যাত।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তৎকৃত অন্নদামঙ্গলে ব্যাসের সহিত শিবের কলহ বর্ণন করিয়াছেন। শিবের মায়ায় ব্যাস কাশীতে ভিক্ষা না পাইয়া কাশীর প্রতি শাপ দেন "তবে আমি বেদব্যাস দিনু এই শাপ। কাশী বাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥ অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী। কাশীতে যে পাপ হবে, হবে অবিনাশী।" মহাদেব এই শাপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্যাসকে কাশী হইতে দুর করিয়া দিলেন। ব্যাস অভিমানে দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিলেন। ব্যাস বলিলেন "তবে আমি বেদব্যাস, এইখানে পরকাশ, করিব দ্বিতীয় বারাণসী।" এই নূতন কাশীর নাম ব্যাসকাশী হইল। ব্যাসকাশীর মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার জন্য অন্নদা বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া ব্যাসকে ছলনা করেন; তাঁহার ছলনায় স্থির হয় যে ব্যাসকাশীতে মরিলে লোক গর্দ্দভ হইবে। "গর্দ্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে॥ বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কান। তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান। (অন্নদামঙ্গল)

কৃষ্ণা—দ্রৌপদীর নামান্তর। ইনি জন্মিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, এজন্য কৃষ্ণা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। (মহাভা-আদি ১৬৮ অ)।

কেকয়ী (কৈকেয়ী)—অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের মহিষী এবং ভরতের জননী। দশরথের কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা নামে তিন প্রধানা মহিষী ছিলেন এবং ৭০০ শত ভার্য্যা ছিলেন। কৈকয়ী কেকয় (বা কেকেয়) রাজ্যের রাজকন্যা। কেকয় রাজ্য পঞ্জাবে শতদ্রু ও বিপাশা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং বাহ্লিক নামক জনপদের দক্ষিণে অবস্থিত। কেকয়ী যুবতী ও পরমরূপলাবণ্যসম্পন্না; মহারাজ দশরথ তাঁহার একান্ত অনুগত ছিলেন। একদা পীড়িত স্বামীকে শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট করিয়া তিনি অবসর ক্রমে তাঁহার নিকট দুইটী বর যাচ্ঞা করেন এবং দশরথও উহা দান করিতে প্রস্তুত হন, কিন্তু কেকয়ী কোন উপযুক্ত অবসরে বরদ্বয় গ্রহণ করিবেন বলিয়া তৎসময়ে বরগ্রহণ করিলেন না। দশরথ প্রতিশ্রুত হইলেন যে ভাবিকালে তিনি কেকয়ীর প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন। কিয়ৎকাল পরে মহারাজ বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে অভিলাষ করিলেন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইল; এমন সময় কেকয়ী মহারাজের নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। তিনি একবরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। রাজভবনে ক্রন্দনের রোল উঠিল। অযোধ্যায় আনন্দ কোলাহল সহসা ক্রন্দনে পরিণত হইল। সৌধকিরীটিনী নগরী অকস্মাৎ শোকের ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। কেকয়ীর বরপ্রার্থনায় দশরথ মৃতপ্রায়

হইলেন। এই বৃত্তান্ত অবিলম্বে রামের কর্ণগোচর হইল ; তিনি পিতার অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া পিতাকে বিমাতার সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। পতিপ্রাণা সীতাদেবী এবং সহোদরপ্রতিম একান্ত অনুগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ শ্রীরামের অনুগমন করিলেন। ভরত এই সময়ে অযোধ্যায় ছিলেন না, মাতুলালয়ে ছিলেন ; তাঁহাকে আনিবার জন্য কেকয় রাজ্যে দূত প্রেরিত হইল। ভরত আসিয়া দেখেন, রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং পিতা দশরথ রামের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি জননী কৈকেয়ীকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্রুতগতি তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। রাম প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না ; তিনি ভরতকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। ভরত ভ্রাতৃপ্রেমবশতঃ রাজমুকুট গ্রহণ না করিয়া, রামের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভরত রাজলক্ষ্মীকে রামের হস্তে অর্পণ করিয়া ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীরাম রাজ্যগ্রহণ করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে পারেন নাই ; তাঁহাকে সীতা বিসর্জ্জন করিতে হইল। ইহার কয়েক বৎসর পর তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অশ্বমেধ যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইল। যজ্ঞ সমাপনের কিয়ৎকাল পরে জননী কৌশল্যা স্বর্গারোহণ করেন ; কৌশল্যার মৃত্যুর পর কেকয়ী পরলোক গমন করেন।

কেতু—দানব বিশেষ। সমুদ্রমন্থনের পর দেবতাগণ অমৃত পানের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন ; এই দেবশ্রেণীর মধ্যে দানব কেতু দেবরূপধারণপূর্ব্বক অমৃতপানার্থ আসীন হইলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য এই ব্যাপার দেখিয়া অপর দেবগণের নিকট ইহা প্রকাশ করেন ; তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা ইহার মস্তক ছেদন করেন। অমৃত পানকরা হেতু এই দানব ছিন্নমস্তক হইয়াও বিনষ্ট হইল না ; মস্তকভাগের নাম রাহু ও শরীরভাগের নাম কেতু হইল। চন্দ্রসূর্য্যের প্রতি ক্রোধবশতঃ রাহু গ্রহণ সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। হিন্দু জ্যোতিষে এই রাহু ও কেতু গ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ; উভয়েই অশুভগ্রহ। বিংশোত্তরীয় গণনামতে কেতুর দশার ফল সাতবৎসর। কেতুর দশার পূর্ব্বে বুধের ও পরে শুক্রের দশা। মঘা, মূলা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতকের প্রথমেই কেতুর দশা হয়। কিন্তু ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের মতে রাহু ও কেতু গ্রহমধ্যে গণ্য নহে।০

কেশী (কেশি)—কংশের অনুচর। এই দানব মহাহয়রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। এই অশ্বরূপী দানব পদাঘাতে গোপালদিগকে ও ধেনু সকলকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইত। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখীন হইলে ঘোটকরূপী দানব মুখব্যাদান করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার পশ্চাদ্দিকের পদদ্বয় ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত ধনু (৪০০ হাত) দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দানব কিয়ৎ কাল অচেতন অবস্থায় ছিল, পরে চৈতন্য পাইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে দানবের মুখবিবরে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন ; অশ্বরূপী দানব শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পুরীষ ত্যাগ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

(শ্রীমদ্ভা-১০ম-স্ক হরিবংশ ৮০ অ)।

কৈকসী—লঙ্কেশ্বর রাবণ-কুম্ভকর্ণাদির মাতা। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও মেঘনাদবধ কাব্যে ইনি নিকষা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি সুমালী রাক্ষসের কন্যা ও বিশ্রবা মুনির পত্নী। (কুবের দেখ)। ইঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্পনখা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শূর্পনখা বিভীষণের জ্যেষ্ঠা ও অপর দুই ভ্রাতার কনিষ্ঠা। (রামা—উত্তর)

কৈকেয়ী (কেকয়ী)—ভরতের মাতা। (কেকয়ী দেখ)।

কৈটভ—পুরাকালে কমলযোনি ব্রহ্মা দুইটী মৃণ্ময় মহাসুর সৃষ্ট করিয়াছিলেন। এই মহাসুরদ্বয় মহার্ণবে যোগনিদ্রামগ্ন ভগবান্ বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকুড্যের (কাঠের দেয়াল) ন্যায় বিচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করে। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে উহাদের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হওয়াতে অসুরদ্বয়ের জীবন সঞ্চার হয়। এই অসুরদ্বয় জীবন

লাভ করিয়া দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মা উহাদের গাত্রে হস্তস্পর্শ পূর্ব্বক দেখিলেন যে একের গাত্র কোমল ও অপরের গাত্র কঠিন ; এজন্ত তিনি একের নাম মধু ও অপরের নাম কৈটভ রাখিলেন। মধু ও কৈটভ বলদৃপ্ত হইয়া একার্ণব জলরাশিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি হইতে যে কমল উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে গূঢ় আবাস স্থাপন করিয়া, যোগমগ্ন রহিলেন। বহুকাল পরে এই অসুরদ্বয় বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা পদ্মনালের আঘাতে বিষ্ণুকে জাগরিত করিলেন। বিষ্ণু জাগরিত হইয়া অসুরদ্বয়ের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিয়াও অসুরদ্বয় ক্লান্ত হইলেন না। অনন্তর তাহারা বিষ্ণুকে বলিল "আমরা তোমার সহিত যুদ্ধে পরম প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার হস্তে মৃত্যুই আমাদের শ্লাঘ্য ; কিন্তু যে স্থান সলিলদ্বারা আপ্লুত নহে তথায় আমাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে (মৎস্য পুরাণ মতে যেস্থানে কেহ মরে নাই, এমন স্থানে আমাদিগকে বধ করিতে হইবে)। যিনি যুদ্ধস্থলে আমাদিগকে পরাভূত করিবেন তিনিই আমাদের পিতা ; তোমার হস্তে নিহত হইলে আমরা তোমারই পুত্রত্ব স্বীকার করিব।" অসুরদ্বয় ইহা বলিলে, বিষ্ণু তাহাদিগকে বাহুতে ধারণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। নিহত অসুরদ্বয় সাগরসলিলে মগ্ন হইল ; পরে ঐ উভয় শরীর হইতে মেদ নিঃসৃত হইয়া সমস্ত সাগরজল ব্যাপ্ত করিল ; তখন আর তাহাদের শরীরের চিহ্নমাত্র রহিল না। দৈত্যদ্বয়ের মেদপুঞ্জে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ধরণীর নাম মেদিনী হইয়াছে। (হরিবংশ—৫২ অ ; মৎস্যপুরাণ—১৭০ অ)

কৌশল্যা—অযোধ্যাধিপতি দশরথের প্রধানা মহিষী ও শ্রীরামচন্দ্রের জননী। ইনি দক্ষিণ কোশলের রাজার কন্যা ; এজন্য ইঁহার নাম কৌশল্যা হইয়াছে। শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনের পর ইনি দেহত্যাগ করেন। (রামায়ণ)

কৌশিক—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নামান্তর। ইনি মহারাজ কুশিকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গাধিরাজ ইঁহার জনক। (বিশ্বামিত্র ও চ্যবন দেখ)।

ক্রতু—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি একজন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। ইঁহার পত্নীর নাম সন্নীতি। বালখিল্য মুনিগণ ইঁহার পুত্র। (শ্রীমদ্ভাগবত)

ক্রোধা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও প্রজাপতি ঋষি কশ্যপের পত্নী। (বিষ্ণু পুঃ)



খগম—জনৈক তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণতনয়। ইঁহার শাপে ইঁহার সখা সহস্রপাদ ডুণ্ডুভরূপে (ঢোঁড়াসাপ) পরিণত হন। সহস্রপাদের অনুনয়ে খগম বলেন যে রুরুমুনির দর্শনে তাহার শাপ মোচন হইবে। (মহাভা-আদি—১১ অ)

খর—রাক্ষস বিশেষ। সুমালী রাক্ষসের কন্যা রাখা বিশ্রবা মুনির সহিত পরিণীতা হয়। রাখার গর্ভে খর নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য লইয়া রাবণের অধিকৃত জনস্থানের সীমা রক্ষা করিতেছিল। রামের বনবাসকালে সূর্পনখার নাসাকর্ণ ছিন্ন হইলে, খর চৌদ্দজন রাক্ষসকে রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে ; ইহারা সকলেই রামকর্তৃক নিহত হয়। অবশেষে খর তদীয় সেনাপতি দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য সহ রামকে আক্রমণ করে। সেনাপতি দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া খরের ত্রাস হইয়াছিল ; কিন্তু খর সাহস অবলম্বন করিয়া রামের সহিত ঘোর যুদ্ধ করে। অবশেষে রামের হস্তে খরের পতন হয়। অকম্পন নামে এক রাক্ষস পলায়ন পূর্ব্বক রাবণকে খরদূষণের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করে। (রামা-আরণ্য)

খ্যাতি—মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। ইঁহার গর্ভে ধাতৃ ও বিধাতৃ নামে মহর্ষি ভৃগুর দুই পুত্র ও লক্ষ্মী নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

গ

গঙ্গা—ভারতের পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী। ইহা পার্ব্বত্য উৎপত্তিস্থল হইতে ১৬৫ মাইল আসিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাসাশ্রম তপোবনের পার্শ্ব দিয়া নিম্নদিকে আগমনপূর্ব্বক দেরাদুনে প্রবেশ করিয়াছে এবং তথা হইতে ক্রমে সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ঋষিগণ এই নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে যে শৈলেন্দ্র হিমালয়ের দুই কন্যা, একার নাম গঙ্গা, অপরা উমা। হিমালয় সুমেরুর তনয়া মেনকাকে বিবাহ করেন। এই মেনকার গর্ভে হিমালয়ের গঙ্গা নামে কন্যা জন্মে। দেবগণ কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য হিমালয়ের নিকট হইতে গঙ্গাকে ভিক্ষা করিয়া লন। এই গঙ্গাতে মহাদেবের বীর্য্য নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু গঙ্গা উহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ শরবণে নিক্ষেপ করেন। সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে, দেবতা ও ঋষিগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভ রক্ষা করিবার জন্য ছয়টী কৃত্তিকাকে প্রেরণ করেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই হুতাশন নিহিত তেজ ধারণে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবতাদের আদেশে গঙ্গাবিসৃষ্ট রেত পান করিয়া গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ছয় কৃত্তিকার একবারে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা ছয় পুত্র প্রসব করেন; এবং প্রসব মাত্রেই ঐ ছয় পুত্র একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া গেল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন; তখন সেই দিব্যকায়সম্পন্ন কুমার শরবণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কৃত্তিকাগণ সেই পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া স্তন্যদ্বারা তাহার পুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব হইল। গঙ্গা স্বীয় গর্ভ নিক্ষেপের পর হইতেই ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে অবস্থান করিতেছিলেন। সগরবংশীয়েরা পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ গঙ্গাকে পাতালে আনয়ন করিবার জন্য বহুবৎসরব্যাপী তপস্যা করার পর অবশেষে কৃতকার্য্য হন। সগরবংশীয় ভগীরথ গঙ্গাকে পাতালে আনয়ন করিয়া ষষ্টি সহস্র সগরসন্তানের উদ্ধার সাধন করেন।

গঙ্গার এক নাম বিষ্ণুপদী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিষ্ণুপদী হইয়াছে। এই পুরাণে লিখিত বিবরণ এইরূপ :—লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী ইঁহারা সকলেই নারায়ণের পত্নী। গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে যাঁহার অঙ্গ হইতে তিনি উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। কিন্তু ইহাতে মানিনী রাধা ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাকে পান করিতে উদ্যত হইলেন, গঙ্গা ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা জগৎ শুষ্কপ্রায় দেখিয়া গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ব্রহ্মার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ভগবান্ স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ নখের অগ্রভাগ হইতে গঙ্গাকে বহির্গত করিয়া দেন। তৎপর ব্রহ্মার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে গঙ্গার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপর গঙ্গা পৃথিবীতে পুনর্ব্বার আগমন করেন। তিনি বিষ্ণুপদ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া জগতে বিষ্ণুপদী নামে খ্যাত হইয়াছেন। (ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতি খণ্ড—১২শ অঃ)

পৌরাণিকগণ আকাশের যে স্থানে ধ্রুবনক্ষত্র বর্ত্তমান সেই স্থানকে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলিয়া থাকেন। ঐ স্থানে বৃষ্টি সঞ্চিত হইয়া ভূতলে পতিত হয় এবং এই বৃষ্টি হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। কাহারও কাহারও মতে এই জন্য গঙ্গার উক্ত নাম হইয়াছে।

গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মলোকে পতিত হইয়াছেন; তথা হইতে ব্রহ্মপুরী বেষ্টন করিয়া চারিটি ধারায় চারিদিকে গিয়াছেন। এই স্রোতচতুষ্টয়ের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। মহাদেব অলকনন্দাকে বহুবৎসর মস্তকে ধারণ করেন। এই ধারা তথা হইতে ভূমিতে পড়িয়া সগর সন্তানদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী (বা জহ্নুকন্যা)। ভগীরথ যখন গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে পাতালে আনয়ন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে গঙ্গার অতি বেগপ্রভাবে জহ্নুমুনির আশ্রম প্লাবিত হইয়া যায়। জহ্নু একটী যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন। আশ্রম গঙ্গাজলে প্লাবিত হওয়ায় যজ্ঞ নষ্ট হইল; ঋষি কুপিত হইয়া যোগবলে গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। পরে ভগীরথ-কৃত অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তিনি গঙ্গাকে কর্ণরন্ধ্রদ্বারা বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গা জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পুরাণ মতে ভাদ্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে গঙ্গার জল যত উর্দ্ধে উত্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত গঙ্গাগর্ভনামে অভিহিত হইয়া থাকে, তদূর্দ্ধ স্থানকে গঙ্গাতীর বলে।

"ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্।
তাবদগর্ভ বিজানীয়াত্তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে॥"

মহাভারত মতে গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্ত স্থান গঙ্গাতীরনামে উক্ত হইয়া থাকে; এই স্থানে বসিয়া দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

গণেশ—পার্ব্বতীর পুত্র। সতী পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পতিনিন্দায় দেহত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মেনকার কন্যারূপে জন্মিয়া তিনি পার্ব্বতী নামে অভিহিত হন। যৌবনাগমে মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হইল। বিবাহের পর বহুবৎসর সম্ভোগ হইল, কিন্তু কোন সন্তানোৎপত্তি হইল না। পার্ব্বতী ইহাতে খেদ করিতে লাগিলেন। শিব চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদনার্থ পুণ্যক-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন। মহাদেব বলিলেন, "এই পুণ্যক-ব্রত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসিদ্ধির মূলস্বরূপ; এক বৎসর মাত্র এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়; এই ব্রত সুখদ, পুণ্যজনক ও সকল সম্পদবিধায়ক; যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় মনুষ্য পিতৃপুরুষগণসহ মুক্তিলাভ করে, তিনিই এই ব্রতের আরাধ্য; যিনি হরি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হরিসেবা করেন, তিনি পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হন। অতএব তুমি দুর্লভ হরিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান কর।" পার্ব্বতী বর্ষব্যাপী পুণ্যক-ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে পর বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুত্রবর দান করেন। বিষ্ণুর বরে পার্ব্বতীর এক পুত্র হইল; হরপার্ব্বতীর আনন্দের সীমা রহিল না। কৈলাসে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল; নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল; ইন্দ্রচন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিলেন। অন্যান্য দেবতাগণের সহিত শনৈশ্চরও আসিলেন। শনৈশ্চর স্বীয় পত্নীর নিকট এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন তাহারই বিনাশ হইবে। শাপ স্মরণপূর্ব্বক শনৈশ্চর পার্ব্বতীর নিকট অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। পার্ব্বতী তাহাকে নবজাত পুত্রের দিকে দৃষ্টি করিতে বলিলেন। শনৈশ্চর পার্ব্বতীর ক্রোড়স্থ শিশুটীর দিকে দৃষ্টি না করিয়া স্বীয় শাপবৃত্তান্ত পার্ব্বতীর সমীপে নিবেদন করিলেন। শনি বলিলেন, "আমার দৃষ্টি না করার একটী গোপনীয় ইতিহাস আছে; ইহা মাতার নিকট অকথ্য, তথাপি আপনি যখন বারংবার অনুরোধ করিতেছেন তখন আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি"। বৃত্তান্তটী এই :—আমি চিত্ররথের কন্যাকে বিবাহ করি; এই পত্নী একদিন ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গম প্রর্থনা করে; আমি তখন হরিধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলাম। পত্নী ঋতু বিফল হইল মনে করিয়া শাপ দিলেন 'যেহেতু তুমি আমাকে দেখিলে না ও আমার ঋতুরক্ষা করিলে না, এজন্য তুমি যাহার দিকে দৃষ্টি করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইবে।' সেইদিন হইতে আমি নিজ চক্ষু দিয়া কিছু দেখি না এবং প্রাণিহিংসা ভয়ে আমি মস্তক অবনত করিয়া থাকি।" পার্ব্বতী এই সমস্ত শুনিয়াও শনির কথা গ্রাহ্য করিলেন না; তিনি পুনর্ব্বার শনিকে স্বীয় পুত্রের মুখ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। পার্ব্বতীর অনুরোধে শনি শিশুর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দৃষ্টি করিবামাত্র শিশুর মস্তক উড়িয়া গেল। পার্ব্বতী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বিষ্ণুর নিকট এই দুঃসংবাদ প্রেরিত হইল। বিষ্ণু আসিবার সময় দেখিলেন, একটী হস্তী পরমসুখে শয়ন করিয়া আছে; তিনিই

তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনিলেন এবং উহা গণেশের কণ্ঠে সংযোজিত করিয়া দিলেন। হস্তিমুখ বলিয়া যদি কেহ গণেশকে অনাদর করে, তজ্জন্য সকল দেবতা একত্র মিলিত হইয়া নিয়ম করিলেন যে, গণেশের পূজা না হইলে তাঁহারা কেহই পূজা গ্রহণ করিবেন না। এজন্য গৃহস্থের বাড়ীতে সকল দেবতার অগ্রে গণেশের পূজা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে শিবের প্রতি কশ্যপের অভিশাপই গণেশের মুণ্ডচ্ছেদের আদি কারণ। এই শাপবৃত্তান্ত এইরূপ :—একদা সূর্য্যদেব মালী ও সুমালী নামক দুই শিবভক্তকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায় মহাদেব সূর্য্যকে ত্রিশূলাঘাত করেন। ত্রিশূলদ্বারা আহত হইয়া সূর্য্য চেতনাশূন্য হইয়া পড়েন। ইহাতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; দেবগণ হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের পিতা মহর্ষি কশ্যপ পুত্রকে হতচেতন দেখিয়া শিবকে শাপ দেন "যেহেতু তুমি শূলদ্বারা আমার পুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার পুত্রেরও মস্তক ছিন্ন হইবে।" (ব্রহ্মবৈঃ গণেশখণ্ড)

একদা পরশুরাম মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৈলাসে গমন করেন। মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, গণেশ পুরপ্রবেশের পথে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। পরশুরাম পুরপ্রবেশে উদ্যত হইলে গণেশ তাঁহাকে বাধা দিলেন; পরশুরাম বাধা মানিলেন না; উভয়ে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরশুরামের কুঠারঘাতে গণেশের একটী দন্ত সমূলে উৎপাটিত হইল। তদবধি গণেশ একদন্ত বলিয়া লোকে বিদিত। (ব্রহ্মবৈঃ)

গণেশ প্রসিদ্ধ লেখক; সমগ্র মহাভারত তাঁহার হস্তলিখিত। (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখ)।

গয়—(১) একজন ধর্ম্মপরায়ণ সৎকর্ম্মান্বিত রাজা। ইনি রাজা অমূর্ত্তরয়ের পুত্র। ইনি ১০০ বৎসর যজ্ঞান্নভোজী হইয়াছিলেন। অগ্নির বরে ইনি বেদ পাঠে অধিকার লাভ করেন। ইনি সমস্ত শত্রুধ্বংস করিয়া জগতে আপনার অধিকার বিস্তার করেন। ইনি প্রত্যহ প্রাতে এক লক্ষ ষাট হাজার গো, দশ হাজার অশ্ব এবং এক লক্ষ নিষ্ক (মুদ্রাবিশেষ) দান করিতেন। ইনি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; এই যজ্ঞের বেদি দীর্ঘে ৩৬ যোজন এবং প্রস্থে ৩০ যোজন। এই বেদি স্বর্ণময়। এই যজ্ঞকার্য্যদ্বারা গয় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। (মহাভা-দ্রোণ-৬৬ অ)

(২) বিখ্যাত অসুর। ইঁহার নামানুসারে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়া নামে অভিহিত হইতেছে। হিন্দুগণ পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানার্থে এই পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। এই গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ পাচ ক্রোশ এবং গয়াশির এক ক্রোশ পরিমিত স্থান। গয়াসুর অতি প্রকাণ্ডকায় দৈত্য, কিন্তু তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তাঁহার স্বভাব অতি ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। এই অসুর কোলাহল নামক পর্ব্বতে গমন করিয়া বিষ্ণু হইতে বর লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণুপ্রমুখ দেবতাগণ কোলাহল পর্ব্বতে গমন করিয়া গয়াসুরকে বর দিতে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। গয়াসুর বর গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুপ্রমুখ দেবতাদিগের বরে গয়াসুরের শরীর দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, কর্ম্মী ও ধর্ম্মীদিগের দেহ হইতে পবিত্রতর হইল। দেবতারা প্রস্থান করিলে গয়াসুরের পবিত্র দেহ অবলোকন করিয়া সকলে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে লাগিল। গ্রাম, নগর শূন্য হইয়া গেল; যমপুরীতে আর লোক যায় না, সকলেই গয়াসুরের দর্শনে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত। যম, বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় অবগত করিলেন। বিষ্ণুর বাড়ীতে দেবতাদের সভা হইল। সভায় স্থির হইল যে, গয়াসুরকে নিশ্চল করিতে হইবে। দেবতারা ভক্ত গয়াসুরের সমীপে গমন করিয়া তাহার শরীরটা ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন; ভক্ত গয়াসুর তৎক্ষণাৎ তাহা দেবতাদিগকে দান করিলেন। তাঁহারা গয়াসুরের শরীরের উপর যজ্ঞের স্থান করিলেন। তাঁহার শরীরের উপর এক প্রকাণ্ড শিলা চাপাইয়া দেওয়া হইল এবং দেবতাগণ তদুপরি আসীন হইলেন। কিন্তু ইহাতেও গয়াসুর নিশ্চল হইলেন না; অবশেষে স্বয়ং বিষ্ণু গয়াসুরের বক্ষঃস্থল স্থাপিত শিলার উপর আসীন হইলেন; ইহাতে গয়াসুর নিশ্চল হইলেন। গয়াসুর দেবতাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনারা আমাকে নিশ্চল করিবার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করিলেন কেন? আপনারা অনুগ্রহ করিলেইত আমি নিশ্চল হইয়া থাকিতাম; আমিত কখনও আপনাদের

অবাধ্য হই নাই।" দেবতারা গয়াসুরের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন; গয়াসুর বলিলেন "যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য বা পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে সে পর্য্যন্ত আপনারা আমার বক্ষঃস্থ শিলায় অবস্থিত থাকিবেন; আমার নামে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে এবং এই গয়া ক্ষেত্র পাঁচ ক্রোশ ও গয়া শির এক ক্রোশ স্থান পরিমিত হইবে।"

(বায়ুপুরাণ)।

এই গয়াসুরের বৃত্তান্ত মহাভারতে উল্লেখ নাই; ইহা হইতে বোধ হয় যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীন কালে এই গয়াক্ষেত্র বিষ্ণু-পাদপদ্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। তবে ঋগ্বেদের টীকায় "গয়াশির" শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু উহা "অস্তগিরি" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

গরুড়—পক্ষিরাজ; বিষ্ণুর বাহন। প্রজাপতি ঋষি কশ্যপের ঔরসে ও বিনতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ বিকলাঙ্গতাহেতু সূর্য্যের সারথ্য করিতেছেন। বিমাতা কদ্রুর দাসত্ব হইতে মাতাকে মুক্ত করিবার জন্য পক্ষিরাজ গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন। (কদ্রু ও অরুণ দেখ)। মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া অমৃত আনয়নার্থ স্বর্গের দিকে প্রস্থান করিলে, পথে ইঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পিতা কশ্যপের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার নিকট ভক্ষ্য প্রার্থনা করেন। পিতা তাহার ভক্ষণের জন্য অদূরবর্ত্তী জলাশয়ে যুধ্যমান গজকচ্ছপকে দেখাইয়া দেন। এই গজকচ্ছপ পূর্ব্বে বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে তপোবলসম্পন্ন দুই সহোদর ছিল। জ্যেষ্ঠ বিভাবসু কোপনস্বভাব কিন্তু কনিষ্ঠ সুপ্রতীক অতি মৃদু ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের জন্য সুপ্রতীক জ্যেষ্ঠ বিভাবসুকে অনুরোধ করেন। জ্যেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া কনিষ্ঠ সুপ্রতীককে বারণরূপ ধারণ করিতে শাপ দেন; অভিশপ্ত হইয়া কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠকে কচ্ছপরূপ ধারণ করিতে অভিসম্পাত করেন। তদবধি গজ-কচ্ছপরূপী দুই সহোদর পরস্পরকে বিনাশ করিতে যুদ্ধে নিরত আছে। পিতার আদেশে গরুড়, গজকে এক নখে ও কচ্ছপকে অপর নখে ধরিয়া উড্ডীয়মান হইলেন এবং সন্নিহিত এক বটবৃক্ষের উপরে বসিয়া উহাদিগকে ভক্ষণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বটবৃক্ষে বসিবামাত্র গজ-কচ্ছপের ভারে ডালটী ভগ্ন হইল। গরুড় দেখিলেন যে, ঐ ডালে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য ঋষিগণ লম্বমান হইয়া তপোনিরত আছেন। ডাল ভূমিতে পড়িলে ঋষিগণ আহত হইয়া তাহাকে অভিশপ্ত করিবেন, এই ভয়ে চঞ্চুপুটে ডালটী ধারণ পূর্ব্বক উড়িতে উড়িতে পিতা কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সঙ্কটে তাঁহার উপদেশ চাহিলেন। কশ্যপের অনুরোধে বালখিল্যগণ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। গরুড় শাখাটী এক পর্ব্বতে ফেলিয়া দিলেন এবং সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে গজ-কচ্ছপকে ভক্ষণ করিলেন। প্রচুর আহারে তৃপ্ত হইয়া গরুড় অমৃতানয়নার্থ স্বর্গের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া অমৃত আনয়নপূর্ব্বক মাতার দাসত্ব মোচন করিলেন।

(কদ্রু দেখ)।

ইন্দ্রের সারথি মাতলীর গুণকেশীনাম্নী কন্যা সুমুখনামক নাগের সহিত পরিণীতা হইয়াছিল। মাতলির প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ বরদানে সুমুখকে দীর্ঘজীবী করেন। গরুড় স্বীয় ভক্ষ্য নাগকে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং স্বর্গে গমন করিয়া নারায়ণ ও ইন্দ্রের নিকট আস্ফালন করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের মস্তকে হস্তস্থাপন করেন; গরুড় ভগবান্ কৃষ্ণের হস্তভরে পীড়িত হইয়া নম্র হইলেন। এইরূপে গরুড়ের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল। অমৃত আনয়নের সময় পথে গরুড় নারায়ণের সাক্ষাৎ পান; শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে বর দিতে চাহিলে গরুড় প্রার্থনা করেন যে, "আমি সর্ব্বদা আপনার উপরে থাকিব"। কৃষ্ণ তাহাকে এই বরই দিলেন। গরুড়ও শ্রীকৃষ্ণকে বর দিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি আমার বাহন হইবে এবং সর্ব্বদা আমার রথের ধ্বজরূপে বর্ত্তমান থাকিবে।" ইহাতে গরুড়ের বাক্যও ঠিক রহিল; যেহেতু ধ্বজরূপে গরুড় সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের উপরে অবস্থিত রহিলেন। (মহাভা—আদি)

গর্গ—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ঋষি। ইনি যদুবংশীয়দিগের কুলগুরু ছিলেন। ইঁহার পুত্র গার্গ্য ও কন্যা গার্গী।

(গার্গ্য দেখ, শ্রীমদ্ভাগবত)।

গাধি—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ কুশিকের পুত্র। গাধিরাজ বিখ্যাত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতা। দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজ কুশিকের মহিষী পৌরকুৎসীর গর্ভে গাধিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র ঋচীক এই গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি মুনির জন্ম হয়। (চ্যবন ও ঋচীক দেখ, হরিবংশ—২৭ অ)।

গান্দিনী—অক্রূরের মাতা ও যদুবংশীয় শফল্কের পত্নী। অক্রূরকে লোকে গান্দিনীসুত বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। গান্দিনী কাশীরাজের কন্যা। ইনি প্রত্যহ বিপ্রগণকে গাভীদান করিতেন বলিয়া ইঁহার এই নাম হইয়াছে (গো শব্দ—দৈ ধাতু—গিন্)। ইনি বহুমাস মাতার উদরে থাকায় পিতা চিন্তিত হইলেন; উদরস্থ কন্যা বলিলেন যে, যদি তাহাকে প্রত্যহ ধেনু দান করিতে অনুমতি করেন, তবে তিনি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। পিতা স্বীকৃত হইলে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা প্রতিজ্ঞাপালনপূর্ব্বক কন্যাকে প্রত্যহ দানার্থ ধেনু অর্পণ করিতেন। কন্যা পিতার নিকট ধেনুলাভ করিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। হরিবংশে ইঁহার নাম নিরুক্তি। অক্রূর ব্যতীত ইঁহার গর্ভে ১২টী পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ), (অক্রূর দেখ)।

গান্ধারী—(১) রাজা ক্রোষ্টুর পত্নী ও অনমিত্রের মাতা। মৃত্তিকাবতী নগরীতে যে সমুদয় রাজন্য বাস করিতেন তাঁহারা ভোজ নামে প্রসিদ্ধ। এই ভোজবংশীয় ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। গান্ধারীর গর্ভে মহাবল অনমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ—৩৮ অ)

(২) কুরুবংশীয় বিখ্যাত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী। ইনি গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা ও দুর্য্যোধনাদির জননী। শকুনি (সৌবল) ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুবলকন্যা গান্ধারী মহাদেবের আরাধনাদ্বারা শতপুত্রলাভের বর পাইয়াছিলেন। এই বরপ্রাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহার্থে সুবলের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সুবল বরের অন্ধতা অবগত হইয়াও কেবল কুলশীলের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। গান্ধারী ভাবিপতির অন্ধতা অবগত হইয়া বহুগুণ বস্ত্রখণ্ডে স্বীয় নয়নদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক অন্ধের ন্যায় থাকিতে লাগিলেন, বিবাহের পরও তিনি এই অবস্থাতেই থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইনি গর্ভবতী হইয়া অকালে এক কুষ্মাণ্ডাকার মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। এই মাংসপিণ্ড হইতে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। অকালে প্রসূত কুষ্মাণ্ডাকার মাংসপিণ্ড হইতে কুরুকুলের ধ্বংসকারী শত পুত্রের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া "অকাল কুষ্মাণ্ড" শব্দটি বাঙ্গলায় গালাগালিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা রমণী; ইনি পাণ্ডবদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পুত্রদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদমত্তপুত্রগণ তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। ইনি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি শতপুত্রের শব দর্শন করিয়া পাণ্ডবদের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপণপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি বিশেষ চেষ্টা করিলে কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ অনায়াসে থামাইতে পারিতে, অতএব আমি তোমাকে আজ অভিশপ্ত করিব। আমি পতিশুশ্রূষাদ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই তপঃপ্রভাবে আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার নিজের জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে এবং অদ্যাবধি ষট্‌ত্রিংশবর্ষ সমাগত হইলে, তুমি অমাত্য জ্ঞাতি পুত্রহীন হইয়া ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায়ে নিধনপ্রাপ্ত হইবে।" গান্ধারীর এই অভিশাপ সফল হইয়াছিল। অনন্তর কিছুকাল যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে হস্তিনায় অবস্থান করিয়া মৃতপুত্রদিগের উদ্দেশে ক্রমাগত ১০ দিন দানকার্য্য সম্পন্ন করেন; তৎপর কার্ত্তিকপূর্ণিমা তিথিতে স্বামীর সহিত বনগমন করেন; সঞ্জয়ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। একদা বেদব্যাস তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার অনুগ্রহে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব রমণীগণ ভারতযুদ্ধে হত ভীষ্মদ্রোণকর্ণদুর্য্যোধনাদির দর্শন পাইলেন। এই সমুদয় বীরগণ ব্যাসের তপঃপ্রভাবে দিব্যমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। গান্ধারী যুদ্ধে নিহত পুত্রগণের দর্শন পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। তৎপর ৬ মাস অতীত হইলে একদিন তপোবনে দাবানল প্রজ্বলিত হইল। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, ও কুন্তী

অনাহার নিবন্ধন ক্ষীণ হইয়াছিলেন, এজন্য পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহারা দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সঞ্জয় অন্ধরাজের পরামর্শে অতিকষ্টে পলায়নপূর্ব্বক জীবনরক্ষা করিলেন।

গায়ত্রী—বেদমাতা। ইনি গানকারীকে ত্রাণ করেন বলিয়া গায়ত্রী নামে অভিহিতা। পদ্মপুরাণ মতে ইনি ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মার প্রথমা পত্নী সাবিত্রী। একদা ব্রহ্মা একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; স্ত্রীভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান হয় না; এজন্য ব্রহ্মা সাবিত্রীকে আনিতে ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র সাবিত্রীর নিকট ব্রহ্মার আদেশ জ্ঞাপন করিলে সাবিত্রী বলিলেন "এখন লক্ষ্মী প্রভৃতি সখিগণ উপস্থিত নাই, আমি একাকিনী যাইতে পারিব না; উক্ত সখিগণ আসিলেই আমি যাইব।" ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপর এক পত্নী গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া এক গোয়ালিনীকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। ব্রহ্মা ইঁহাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। ইঁহার নাম গায়ত্রী। ইঁহার দুই হস্ত, এক হস্তে একটী মৃগশৃঙ্গ, অপর হস্তে একটী পদ্ম, পরিধানে রক্ত বস্ত্র, গলে মুক্তাহার, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে মুকুট। বেদে লিখিত আছে যে, একদা বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া গায়ত্রীর মস্তক বিদীর্ণ করেন; কিন্তু গায়ত্রীর মৃত্যু নাই; ইঁহার মস্তিষ্ক হইতে বষট্কার দেবের উৎপত্তি হইল। অনেকে এই ঘটনাটীকে একটী রূপক মাত্র মনে করেন। গায়ত্রী হিন্দুধর্ম্মের বীজমন্ত্র; নাস্তিকমত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতি বা চার্ব্বাক হিন্দুধর্ম্মের বিনাশচেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

গার্গী—বৈদিক সময়ের এক বিদুষী ঋষিতনয়া। ইঁহার পিতা গর্গমুনি; ইনি অতি প্রতিভাসম্পন্না রমণী ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মিথিলায় জনকরাজসভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বেদান্তাদি শাস্ত্রে আলাপ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। ইঁহার সহোদর গার্গ্যমুনি যাদবদিগের কুলগুরু ছিলেন।

গার্গ্য—যাদবদিগের কুলগুরু এবং গর্গমুনির পুত্র। কোন কারণে ইনি যাদবদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদিগের নিগ্রহকারক এক পুত্র লাভের বাসনায় দ্বাদশবর্ষ লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে বরদান করেন। ইঁহার ঔরসে ও গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে যাদবদিগের প্রবল শত্রু কালযবন জন্মগ্রহণ করেন। (কালযবন দেখ)।

গালব—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। (হরিবংশ—২৭ অ)

(২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য। মহর্ষি ইঁহার প্রতি প্রীত হইয়া ইঁহাকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি করিলেন, গালব গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করিলেন; মহর্ষি বলিলেন, "আমি তোমার ভক্তিতে ও সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে আর দক্ষিণা দিতে হইবে না।" কিন্তু শিষ্য দক্ষিণা গ্রহণের জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র একটু বিরক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ৮ শত অশ্ব দক্ষিণাস্বরূপ চাহিলেন। গালব চিন্তিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে তদীয় বাহন পক্ষিরাজ গরুড় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। গরুড়ের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি গরুড়ের পরামর্শে তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক রাজা যযাতির সমীপে উপস্থিত হইয়া উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ৮ শত অশ্ব চাহিলেন। রাজা বলিলেন যে, তিনি বহুবিধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া সম্প্রতি ক্ষীণকোষ হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট উক্ত লক্ষণযুক্ত অশ্বও নাই। যাহা হউক তিনি অন্য প্রকারে গালবের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা যযাতি স্বীয় কন্যা মাধবীকে গালবের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "এই কন্যা কোন যোগ্যপাত্রে দান করিয়া ইহার শুল্কস্বরূপ ৮ শত অশ্ব ত সামান্য বিষয়, আপনি ইচ্ছা করিলে রাজ্যও লাভ করিতে পারিবেন; এই রূপবতী কন্যাকে অনেকেই প্রার্থনা করিবেন।" ৮ শত অশ্বলাভের উপায় স্বরূপ কন্যা লাভ হইলে, গরুড় প্রস্থান করিলেন। গালব মাধবীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যাপতি সন্তানার্থী রাজা হর্য্যশ্বের নিকট উপস্থিত হইলেন; রাজা পণের চতুর্থাংশ দুই শত অশ্ব গালবকে দান করিয়া মাধবীকে রাখিলেন। গালব এই দুই শত অশ্ব গুরুদক্ষিণার চতুর্থাংশ স্বরূপ বিশ্বামিত্রকে দিলেন। একটী সন্তান জন্মিলে মুনি মাধবীকে লইয়া যাইবেন এইরূপ

চুক্তি হইল। তৎপর যথাকালে মাধবীর গর্ভে বসুমনা নামে পুত্র উৎপন্ন হইলে, গালব আসিয়া হর্য্যশ্বের নিকট কন্যা মাধবীকে প্রার্থনা করিলেন। রাজা পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে পুত্র বসুমনাকে রাখিয়া মাধবীকে মুনির হস্তে সমর্পণ করিলেন। গালব মাধবীকে গ্রহণ করিয়া কাশীরাজ দিবোদাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। সন্তানার্থী দিবোদাস উক্ত লক্ষণাক্রান্ত দুইশত অশ্ব দিয়া মাধবীকে গ্রহণ করিলেন এবং একটী সন্তান উৎপন্ন হইলে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিবেন ইহাও প্রতিশ্রুত হইলেন। গালব দুইশত অশ্ব গুরু বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণাস্বরূপ অর্পণ করিলেন। তাঁহার গুরুদক্ষিণার অর্দ্ধাংশ দেওয়া হইল। যথাকালে মাধবীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে পুত্র উৎপন্ন হইলে গালব দিবো-দাসের নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে প্রার্থনা করিলেন; দিবোদাস প্রতর্দ্দনকে রাখিয়া গালবের হস্তে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। গালব মাধবীকে গ্রহণপূর্ব্বক উশীনর রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। উশীনর গালবকে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত দুইশত অশ্ব দিয়া মাধবীকে গ্রহণ করিলেন এবং যথাকালে তাহার গর্ভে শিবিনামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। গালব দুইশত অশ্ব বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিয়া আসিলেন এবং শিবির জন্মসংবাদ শুনিয়া উশীনরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। উশীনর শিবিকে রাখিয়া গালবের হস্তে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। গালব কন্যাকে লইয়া কোথায় যাইবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময় গরুড় তথায় উপস্থিত হইলেন। গরুড় বলিলেন, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত দুইশত অশ্ব আর পাওয়া যাইবে না। তাহার পরামর্শে গালব অবশিষ্ট দুইশত অশ্বের পরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের হস্তে মাধবীকে সম্প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র পূর্ণদক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়াছেন স্বীকার করিয়া মাধবীকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার গর্ভে অষ্টক নামক পুত্রের উৎপাদন করিলেন। এইরূপে মাধবীর গর্ভে হর্য্যশ্বের ঔরসে বসুমনা, দিবোদাসের ঔরসে প্রতর্দ্দন, উশীনরের ঔরসে শিবি ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে অষ্টকের উৎপত্তি হইল।

অষ্টকের উৎপত্তির পর গালব বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া মাধবীকে প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে শিষ্যের হস্তে মাধবীকে অর্পণ করিলেন। গালব মাধবীকে গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষিরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যযাতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে কন্যা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর যযাতি স্বয়ংবর প্রথামতে মাধবীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাধবী অপর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া অবশিষ্ট জীবন বনে ধর্ম্মচর্য্যায় অতিবাহিত করিলেন।

(মহাভা—উদ্যোগ—১০৬-৮অ)।

গিরিজা—পার্ব্বতীর নামান্তর। সতী পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

গুহক—একজন অনার্য্য রাজা। অযোধ্যারাজ্যের প্রান্তভাগে এই অনার্য্য রাজার রাজ্য ছিল। ইঁহার রাজধানীর নাম শৃঙ্গবেরপুর। এই রাজা মহারাজ দশরথের সহিত সর্ব্বদা বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। রামচন্দ্র এই অনার্য্য মিত্র রাজাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। রামের ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত রাজা লঙ্কা বিজয়ের পর অনায়াসেই এই রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। রাজ্যজয়সম্বন্ধে রাম উদারনীতিপরায়ণ ছিলেন। বনবাস কালে রামচন্দ্র এই অনার্য্য রাজার সাহায্যে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন।

গোতম—ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা। (অক্ষপাদ দেখ)।

গোপাল—বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। ইনি বাসুদেবের পুত্র কিন্তু ব্রজধামে নন্দালয়ে পালিত বলিয়া ইনি বাল্যকালে নন্দনন্দন নামে খ্যাত ছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি গোপবালক ও গোপকন্যাগণ দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকিতেন। (কৃষ্ণ দেখ)। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, ইনি সর্ব্বদা গোপবেশে বালকের ন্যায় থাকিতেন; ইঁহার পরিধানে পীতবাস, হস্তে বেণু, মস্তকে মোহন চূড়া এবং ইনি কদম্বমূলে উপবেশন করিতে প্রীতি অনুভব করিতেন। বৈষ্ণব ভক্তগণ এই মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য ও জগদীশ তর্কালঙ্কার স্বস্ব গ্রন্থে ইষ্টদেব বাল-গোপালের প্রতি নমস্কার করিয়াছেন।

গোপালী—অপ্সরা বিশেষ। ইনি গার্গ্যমুনির পত্নী। ইঁহার গর্ভে কালযবন জন্মগ্রহণ করেন। (কালযবন দেখ)।

গৌতম—(১) বিখ্যাত গোত্রপ্রবর্ত্তক ভরদ্বাজ মুনির নামান্তর। ইনি মহর্ষি গোতমের অপত্য।
(২) কৃপাচার্য্যের নামান্তর। ইনি গোতমগোত্রীয় শরদ্বানের পুত্র বলিয়া গৌতম নামে অভিহিত।
(৩) রামায়ণপ্রসিদ্ধ ঋষি। ইঁহার পত্নী অহল্যা। (অহল্যা দেখ)।

ঘ

ঘটোৎকচ—দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পুত্র। হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ভারতযুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনি নিশীথকালে কর্ণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহার আকৃতি ভয়ানক—লোহিতনেত্র, মহাবাহু, মহাকায়, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নীলকলেবর ও মুখ আকর্ণবিস্তৃত। দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ কৌরব সৈন্যের ধ্বংস দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; অবশেষে কর্ণ যে শক্তি-অস্ত্র ইন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন বধার্থ রাখিয়াছিলেন সেই শক্তি, কৌরব সৈন্যের রক্ষার্থ, ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। শক্তির আঘাতে ঘটোৎকচ নিহত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন "এখন কর্ণকে অর্জ্জুন অনায়াসে নিহত করিতে পারিবে; আমরা এখন কর্ণকে নিহত মনে করিতে পারি।" (মহাভা—দ্রোণ)

ঘণ্টাকর্ণ—শিবের অনুচর বিশেষ। ইনি মঙ্গলের পুত্র; মেধার গর্ভে উৎপন্ন; ইঁহার অপর নাম ঘণ্টেশ্বর। ইনি অভিশপ্ত হইয়া মনুষ্যরূপে উজ্জয়িনী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, বিক্রমাদিত্য সভার নবরত্নাখ্য পণ্ডিত মণ্ডলীকে তিনি পরাজয় করেন। এজন্য তিনি শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আগমন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, "সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস ব্যতীত অপর সকলকেই তুমি পরাজয় করিতে পারিবে।" ঘণ্টাকর্ণ কালিদাসকে পরাজয় করিতে চাহিলেন, কিন্তু শিব এই বর দিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে ঘণ্টাকর্ণ অসন্তুষ্ট হইয়া সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি মুখে শিব নাম লইবেন না। কিন্তু তাঁহার শিবের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। তিনি উজ্জয়িনী নগরের পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিতে যাত্রা করিলেন। পণ্ডিতেরা ইত্যবসরে ঘণ্টাকর্ণ সম্বন্ধি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়াছিলেন। বিচারে কালিদাস ব্যতীত সকল পণ্ডিতই একে একে পরাজিত হইলেন। অবশেষে কালিদাসের সহিত বিচার আরম্ভ হইল। কালিদাস দীর্ঘচ্ছন্দে শিবের স্তোত্র রচনা করিতে ঘণ্টাকর্ণকে অনুরোধ করিলেন। এই শ্লোক রচনা করিতে পারিলে কালিদাস পরাজয় স্বীকার করিবেন। কালিদাস মনে করিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি যখন শিবনাম মুখে আনেন না তখন ইনি শিবের স্তোত্র রচনা করিতে পারিবেন না, কাজেই বিনা বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন। কিন্তু ঘণ্টাকর্ণের শিবভক্তি অচলা ছিল, তিনি বিশেষ কারণে শিবের নাম উচ্চারণ করিতেন না। ঘণ্টাকর্ণ শিবনাম বিরহিত দীর্ঘচ্ছন্দে শিবের স্তোত্র রচনা করিয়া বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিস্মিত করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ শাপমুক্ত হইলেন; মহাদেব তাঁহার অচলা ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে পার্শ্বচর করিলেন। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে মিথুন সংক্রান্তিতে মুহী বৃক্ষের (মনসা বা সিজগাছ) মূলে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে।

হরিবংশে আর এক ঘণ্টাকর্ণের বিবরণ আছে। ইনি প্রথমে বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন; যাহাতে হরিনাম কর্ণে প্রবেশ না করে এজন্য কর্ণে ঘণ্টা রাখিতেন। এই হেতু তাঁহার নাম ঘণ্টাকর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগের উপর দ্বারাবতী রক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া হরপার্ব্বতীর নিকট পুত্রবর লাভাশয়ে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলে, তথায় ঘণ্টাকর্ণ নামে পিশাচ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঘণ্টাকর্ণ মহাদেবের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলে, মহেশ্বর তাঁহাকে, বদরিকাশ্রম নামক নারায়ণের আশ্রমে যাইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। ঘণ্টাকর্ণ

বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন। (হরিবংশ ২৭৩ অ)।

ঘৃতাচী—স্বর্গীয় অপ্সরা ; ইহাকে দেখিয়া ভগবান ব্যাসের কামোদ্রেক হয় ; ইহার ফলে মহর্ষি শুকদেবের জন্ম হয়। (শুকদেব দেখ)।

চ্যবনের পুত্র প্রমতি এই ঘৃতাচীর গর্ভে রুরুনামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভা-আদি-৮ অ)।

মহোদয়ের (বর্ত্তমান কনোজের) রাজা কুশনাভ এই অপ্সরার গর্ভে একশত কন্যা উৎপাদন করেন। এই কন্যাগণ পবন দেবের শাপে যে স্থানে কুব্জভাবাপন্ন হন, সেই স্থান কন্যাকুব্জ (কনোজ) নামে খ্যাত হইয়াছে। (কুশনাভ দেখ)।

গঙ্গাদ্বারের সমীপে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। একদা ঋষি এই ঘৃতাচীকে নদীতে স্নান করিতে দেখিয়া কামপরতন্ত্র হন। কামপরবশ হওয়াতে তাঁহার রেতস্খলন হয় ; মুনি তৎক্ষণাৎ সেই রেতঃ এক দ্রোণীর (পাত্র বিশেষ) মধ্যে ধারণ করেন। এই দ্রোণী মধ্যে স্থাপিত রেতঃ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; এই পুত্র দ্রোণাচার্য্য নামে জগতে খ্যাত হইয়াছিলেন।

চ

চণ্ড—(১) বিখ্যাত শুম্ভাসুরের প্রধান সেনাপতি। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুণ্ড। চণ্ড ও মুণ্ড উভয়ে ভগবতীর হস্তে নিহত হয়। চণ্ডকে বিনাশ করিয়া ভগবতী চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে খ্যাত হন। "চণ্ডের কপালে পড়ি নাম হৈল চণ্ডী।" (অন্নদামঙ্গল), (কাত্যায়নী দেখ)।

চণ্ডী—দুর্গার নামান্তর। (কাত্যায়নী ও মহিষাসুর দেখ)। শুম্ভাসুরের সেনানী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া এই দেবী চণ্ডী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে চণ্ডীর ধ্যান কল্পিত হইয়াছে :—সাত্বিক মূর্ত্তি বা সরস্বতী মূর্ত্তি, রাজসিক মূর্ত্তি বা মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি এবং তামসিক মূর্ত্তি বা দশভুজ-দশবক্ত্রা মূর্ত্তি।

চন্দ্র—লক্ষ্মীর সহোদর। সমুদ্রমন্থনে অমৃত, পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে ইহার উৎপত্তি হয়। ইনি একজন দেবতার মধ্যে গণ্য। অমৃত পান সময়ে দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে একটা অসুরও বসিয়া গিয়াছিল। চন্দ্র ইহা দেখিতে পাইয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দেন ; বিষ্ণু চক্রদ্বারা সেই অসুরের মস্তকচ্ছেদন করেন। এই ক্রোধে মস্তকরূপী রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকেন। ইহাকে লোকে চন্দ্রগ্রহণ বলিয়া থাকে। (মহাভা-আদি)

কাশীখণ্ডের মতে চন্দ্র ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রিমুনির সন্তান। এই বিখ্যাত মুনি তিনসহস্র দিব্য বৎসর তপস্যা করেন ; সেই সময়ে তাহার রেতঃ সোমরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্মা এই সোমকে গ্রহণপূর্ব্বক রথে স্থাপন করেন ; সোম সেই রথে অবস্থিত হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ভ্রমণ সময়ে অনেক রেতঃ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহাই ওষধিরূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎ পোষণ করে। চন্দ্র মহাদেবের কৃপায় একটী রাজত্ব লাভ করেন ; ইহার নাম চন্দ্রলোক। ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই নয়টী নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী ও দক্ষের কন্যা। রোহিণীও চন্দ্রের অপরা পত্নী। চন্দ্র রোহিণীতে অধিকতর আসক্ত ; এজন্য ভরণী প্রভৃতি নয়টী নক্ষত্র চন্দ্রকে ভৎসনা করেন। ইহাতে চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করেন যে, "যেহেতু তোমরা আমার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, এজন্য তোমরা উগ্র বলিয়া খ্যাত হইবে এবং তোমাদের ভোগ্য দিন যাত্রার অনুপযুক্ত হইবে"। চন্দ্রকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সকলে পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক পিতা দক্ষকে চন্দ্রের দুর্ব্ব্যবহার জ্ঞাত করিলেন। চন্দ্র যে রোহিণীর প্রতি অধিকতর আসক্ত এবং ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যে তাঁহারা চন্দ্রকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন, এই সমুদয় বৃত্তান্ত যাথাযথরূপে তাঁহারা পিতার নিকট বর্ণন করিলেন।

দক্ষ চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া জামাতাকে সকল পত্নীর উপর সমানাদর করিতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্র ভয়ে ও লজ্জায় তখন সম্মত হইলেন, কিন্তু কিছু কাল যাইতেই আবার রোহিণীর প্রতি পূর্ব্ববৎ অত্যাসক্তি ও ভরণী প্রভৃতির প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইল, এমন কি চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রতি চন্দ্রের দুর্ব্যবহার জ্ঞাপন করিলেন এবং স্বামীর নিকট গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক তপস্বিনীভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পিতার অনুমতি চাহিলেন। দক্ষ চন্দ্রের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ হইতে রমণীসম্ভোগলোলুপ যক্ষ্মার উৎপত্তি হইল। দক্ষের আদেশে যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। যক্ষ্মরোগহেতু চন্দ্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। দেবতারা চন্দ্রের বিপদ দেখিয়া দক্ষকে চন্দ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। দক্ষ বলিলেন যে যদি চন্দ্র তাঁহার সমুদয় পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার দেখান তবে পক্ষান্তরে তাহার কলার বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইবে। তদবধি চন্দ্র এক পক্ষে ক্ষয় অপর পক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (কালিকাপুরাণ)। একদা চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি দেবতাদিগের নিকট চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং পত্নীপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। চন্দ্র দেবতাগণের অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না; ইহাতে শুক্রাচার্য্য ও স্বয়ং মহাদেব বৃহস্পতির পক্ষ হইয়া চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য, এজন্য দেবগুরু বৃহস্পতির বিপদে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। দেবগণ মহা বিপদ মনে করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। প্রজাপতি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রুদ্র ও শুক্রাচার্য্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং তারাকে চন্দ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতির হস্তে অর্পণ করিলেন। তখন তারা সসত্ত্বা ছিলেন। বৃহস্পতির আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ গর্ভ শরস্তম্বে ত্যাগ করিলেন। শরস্তম্বে পুত্র উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ পুত্র কাহার?" তারা উত্তর করিলেন "সোমদেবের"। তখন চন্দ্র এই পুত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। এই বুধ গগনমণ্ডলে চন্দ্রের বিপরীত দিকে উদিত হয়। চন্দ্র এই পাপে যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হন। রোগমুক্ত হইবার জন্য তিনি পিতা অত্রির শরণাপন্ন হন। অত্রির অনুগ্রহে ইনি শাপমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার দীপ্তিশালী হইয়া উঠেন।

চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের পুত্র। রাম ইঁহাকে কারাপথ নামক স্থানে স্থাপন করেন।

চন্দ্রসেন—(১) প্রাচীন ভারতবর্ষের একজন প্রবল রাজা। ইঁহার পিতা সমুদ্র সেন। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন। (মহাভারত)

(২) ইনি ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরামের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভবতী মহিষী দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই রাণীর নবপ্রসূত সন্তান হইতে চন্দ্রসেনী কায়স্থগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

চন্দ্রাবলী—চন্দ্রভানুর কন্যা। চন্দ্রভানু শ্রীরাধার জ্যেষ্ঠতাত। শ্রীরাধার পিতার নাম বৃষভানু। চন্দ্রাবলী গোবর্দ্ধন মল্লের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। শ্রীরাধার ন্যায় চন্দ্রাবলীও কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন; উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবলী করলা নামক গ্রামে স্বামীর বাড়ীতে থাকিতেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিযাপন করেন; এজন্য শ্রীরাধার সহিত চন্দ্রাবলীর মনোবাদ হয়। (বৃন্দাবনলীলা)

চরক—বিখ্যাত বৈদ্যকগ্রন্থ চরকসংহিতার প্রণেতা। অনন্তদেব চররূপে (গুপ্তবেশে) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে মানবমণ্ডলী নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। মানবের এই দুর্দ্দশা অবলোকনে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি ষড়ঙ্গ বেদবেত্ত্ব ঋষিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মানবে ব্যাধিজনিত দুঃখ দূর করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করেন। চররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া অনন্তদেব চরকনামে খ্যাত হন। ইনি অত্রিপুত্র ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

চামুণ্ডা—শক্তির মূর্ত্তি বিশেষ। শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া ইনি চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন।

"যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বাত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥"
(চণ্ডী)

যখন দৈত্যপতি শুম্ভের সেনাপতিগণের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধ হয়, তখন অসুরদলের জন্য ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু ও ইন্দ্র স্ব স্ব শক্তি হইতে রমণীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে বাহন ও অস্ত্র শস্ত্র দান করেন। এই পাঁচ দেবতা হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বারাহী ও ঐন্দ্রাণী সৃষ্ট হন। ইঁহারা মাতৃকা নামে অভিহিত। (মাতৃকা দেখ)। চামুণ্ডার যোগিনী সংখ্যা আট, যথা ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হন্ত্রী, বিধাতৃকা, করালা ও শূলিনী।

চার্ব্বাক—নাস্তিক মত প্রবর্ত্তক ঋষি। কেহ বলেন ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে অভিন্ন; কেহ বলেন ইনি বৃহস্পতির শিষ্য; আবার কেহ বলেন চার্ব্বাক নামে কোন ব্যক্তি নাই, ইহা সাংখ্যবেদান্তাদির ন্যায় একটী দার্শনিক মত মাত্র। চার্ব্বাক মতে স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি), ঈশ্বর ও দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই; নিম্নোদ্ধৃত নাস্তিক মতদ্যোতক শ্লোকগুলি বৃহস্পতির প্রণীত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তি কারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্নদীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিত স্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্করীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥"

অর্থ—স্বর্গ অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই; বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফলদায়িনী হয় না। অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন এই সমুদায় বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগেরই বিধাতৃবিহিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান স্বপিতাকে কেন বলিদান করে না? যে প্রাণিগণ মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত

ভক্ষ্য বস্তুতে যদি তাহাদের তৃপ্তি জন্মে, তবে পথিকদিগের পাথেয় সঙ্গে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি স্বর্গস্থিত লোকে ভূতলস্থ (অন্নব্যঞ্জনাদি) দানে তৃপ্তি লাভ করে, তবে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তিনিমিত্ত ভূতলে অন্ন দেওয়া হয় না কেন? যতদিন জীবিত থাক, সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও, ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ পরলোকে যায়, তবে বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া কেন ফিরিয়া আসে না? সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করা ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র, অন্য কিছু নহে। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর বেদত্রয়ের কর্ত্তা; জর্ফরী তুর্করী ইত্যাদি পণ্ডিতদিগের বচন সকলেরই জানা আছে।

চার্ব্বাক দর্শনের অপর নাম লোকায়ত দর্শন, যে হেতু ইহলোকই এই দর্শনের সর্ব্বস্ব। এই দর্শনে পরলোক স্বীকৃত হয় নাই। চার্ব্বাক বলেন পরলোক অসম্ভব। যেমন সুরাসমুৎপাদক দ্রব্যচয়ের মিলনে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারিভূতের বিয়োগ হইবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। চার্ব্বাক বলেন যে দেহাতিরিক্ত আত্মা কোথাও লক্ষিত হয় না; যেখানে চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, সেখানেই তাহা দেহান্তর্গত; অতএব দেহের বিনাশের সহিত চৈতন্যেরও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। চার্ব্বাক বলেন সুখই পরম পুরুষার্থ। যাঁহারা দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া সুখের উপভোগ ইচ্ছা করেন না, চার্ব্বাকের মতে তাঁহারা পশুবৎ মূর্খ। তিনি বলেন "মৎস্যে শল্ক ও কাঁটা আছে বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ করিব না? ধান্যে তুষ বাছিতে হইবে বলিয়া কি অন্নাহার পরিত্যাগ করিব? কণ্টকের ভয়ে কি কমল তুলিব না? ভিক্ষুকের যাচ্ঞা আশঙ্কা করিয়া কি আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিব না?" (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)। চার্ব্বাক বলেন যে কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত নহে, যে হেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি ঘটে।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

(বৃহস্পতি)

কোন্ সময়ে চার্ব্বাক বা বৃহস্পতির মত প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই মতবাদ বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়।

"নৈতদ্ যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতম্॥
যজ্ঞৈ রনেকৈর্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক পশুঃ॥

অর্থ—হিংসায় ধর্ম্ম হয় এ বাক্য যুক্তিসহ নহে; অগ্নিতে ঘৃত দগ্ধ করিলে কোন ফল হয়, ইহা বালকের উক্তি। ইন্দ্র যদি বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শম্যাদি কাষ্ঠ ভক্ষণ করেন, তবে পত্রভুক্ পশুও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই চার্ব্বাকমত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বে চার্ব্বাককে দুর্য্যোধনের সখা বলা হইয়াছে। ভারত যুদ্ধের পর চার্ব্বাক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"তুমি কুনৃপতি ও জ্ঞাতি-ঘাতী; জ্ঞাতি এবং গুরু ক্ষয় করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তোমার পক্ষে জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।"

(মহাভা-শান্তি-চার্ব্বাকবধ পর্ব্বাধ্যায়)।

এই মতবাদ রামায়ণেও দৃষ্ট হয়। মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে অরণ্যযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন—"যাহারা শাস্ত্রার্থধর্ম্মপরায়ণ আমি তাঁহাদিগের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। তাঁহারা ইহলোকে দুঃখ পাইয়া, অন্তে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে; দেখ, ইহাতে কেবল অন্নধ্বংসই হইয়া থাকে; মৃত

ব্যক্তি কি আহার করিতে পারে? যদি একের ভুক্ত অন্ন অন্যের দেহে যায়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধীয় অন্নব্যঞ্জনাদি তাহার পাথেয় হয় না কেন?

যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষা গ্রহণ কর, তপস্যা কর, বিষয় বাসনা ত্যাগ কর, এইরূপ দান ও ত্যাগ প্রবর্ত্তক গ্রন্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম কোনও কাজের নয়, হে মহাত্মন্ তুমি এই বুদ্ধি কর। পরোক্ষ পশ্চাতে রাখিয়া যাহা প্রত্যক্ষ তাহার অনুষ্ঠান কর।" (রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড)

এই সমুদয় দ্বারা চার্ব্বাকের সময় নির্ণীত হইতেছে না, তবে এই মাত্র বুঝায় যে চার্ব্বাক মতটী অতি প্রাচীন।

পুরাতন কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে একদা বৃহস্পতি গায়ত্রী দেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া যায়, এবং মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু গায়ত্রীর মৃত্যু নাই, তজ্জন্য প্রতিখণ্ড মস্তিষ্কবসা হইতে এক একটী বষট্কার দেবের উৎপত্তি হয়। অনেকে এই গল্পের গূঢ় অর্থ এইরূপ করেন—গায়ত্রী হিন্দুদের বীজমন্ত্র, বৃহস্পতি সেই গায়ত্রীর মস্তকে আঘাত করেন, সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বৃহস্পতি হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বৃহস্পতি নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাক হইবেন বলিয়া বোধ হয়। অতএব বলিতে হইতেছে যে সৌত্রিক সময়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ প্রধানকালে কর্ম্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ির সময়ে এই লোকায়ত বাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। আচার্য্য ম্যাক্সমুলর সাহেবের মতে এই সময় খৃঃ পূঃ ৮০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৬০০ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অতএব চার্ব্বাক মত খৃঃ পূঃ ৭০০।৮০০ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে।

হিন্দুর ষড়্দর্শনে এবং বৌদ্ধদর্শনে অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কেবল চার্ব্বাকই প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য করেন। বেদের প্রমাণ দ্বারা অপর হিন্দুদার্শনিকগণ ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু চার্ব্বাক বলেন যে বেদ অপ্রামাণ্য; উহা প্রত্যক্ষ বিলোপী, যুক্তিবিরুদ্ধ ও ধূর্ত্ততাসম্ভূত।

চিত্রগুপ্ত—ব্রহ্মার অঙ্গজাত পুত্র। যখন ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি করিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গ হইতে নানাবর্ণে চিত্রিত এক পুরুষ মস্যাধার (দোয়াত) ও লেখনী (কলম) হস্তে করিয়া উদ্ভূত হইলেন। এই পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে কোথায় কি কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে ব্রহ্মার সমীপে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা এইরূপে জিজ্ঞাসমান হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং যোগনিদ্রার অবসানে পুত্রকে আদেশ করিলেন "তুমি লোকদিগের পাপপুণ্যের বিচারার্থ যমের বাড়ীতে গিয়া বাস কর।" ইহাদ্বারা পাপপুণ্যের চিত্র বিচিত্র হিসাব গুপ্ত (রক্ষিত) হয় বলিয়া ইনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইলেন। ব্রহ্মা আরও বলিলেন "আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া তুমি লোকে কায়স্থ নামে অভিহিত হইবে।" চিত্রগুপ্তের অম্বষ্ঠ, মাথুর, গৌর প্রভৃতি নয়টী পুত্র। (ভবিষ্যপুরাণ)। এই চিত্রগুপ্ত মানুষের কপালে শুভাশুভ ফল লিখিয়া থাকেন (পদ্মপুরাণ)। যমালয়ের নিকট চিত্রগুপ্তলোক নামক একটী স্বতন্ত্র লোক বর্ত্তমান আছে; এই স্থানে কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের নিদেশানুরূপ লোকের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। (গরুড় পুরাণ) কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা হইয়া থাকে। এই শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির নাম যম দ্বিতীয়া। এই যম দ্বিতীয়াতে বঙ্গীয় গৃহস্থগণ যম, যমদূত ও চিত্রগুপ্তের পূজা করিয়া থাকেন। ভগিনীহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি ও গণ্ডূষ পান করিলে লোকের আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। অভিশপ্ত রাজা সৌদাস এই যমদ্বিতীয়াতে চিত্রগুপ্তের পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাবীর ভীষ্ম এই চিত্রগুপ্তের উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে ইচ্ছামৃত্যুবর লাভ করেন। (ভীষ্ম দেখ)

চিত্ররথ—(১) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ইঁহার প্রকৃত নাম অঙ্গারপর্ণ। এই গন্ধর্ব্বের একখানা নানাবর্ণে চিত্রিত রথ থাকাতে ইনি চিত্ররথ নামে খ্যাত ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে অঙ্গারপর্ণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া স্বীয় রথখানা দগ্ধ করেন এবং তদবধি ইনি দগ্ধরথ নামে খ্যাত হন।

(কুম্ভীনসী দেখ)।

(২) ইনি ধর্ম্মরথের পুত্র। বলিরাজের ক্ষেত্রজপুত্র অঙ্গ অঙ্গদেশের অধিপতি। রাজা অঙ্গের পুত্র মহারাজ দধিবাহন; দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ এবং দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। চিত্ররথ রাজা ধর্ম্মরথের পুত্র। (হরিবংশ—৩১ অ)।

চিত্রলেখা—দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষার সখী ও বাণমন্ত্রী কুম্মাণ্ডের (কুষ্মাণ্ডের) কন্যা। ইনি উষার প্রর্থনায় দেবর্ষি নারদের সাহায্যে অনিরুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর হইতে হরণ করেন। (অনিরুদ্ধ দেখ)।

চিত্রসেন—গন্ধর্ব্ব বিশেষ। দুর্দ্দশাগ্রস্ত পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে অবস্থান কালে তাঁহাদিগকে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য, দুর্য্যোধন দ্বৈতবনস্থ আভীরপল্লী (গোপপল্লী) পরিদর্শনচ্ছলে কর্ণ শকুনি প্রভৃতির সহিত সপরিবারে দাসদাসীগণে পরিবৃত হইয়া বহুসৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে গমন করেন। এই অরণ্যস্থ এক সরোবর তীরে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বাস। গন্ধর্ব্বদিগকে সরোবর হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে আদেশ দান করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে দুর্য্যোধনের সৈন্য গন্ধর্ব্বদিগের নিকট পরাজিত হয়। মহাবীর কর্ণ কিয়ৎকাল যুদ্ধ করেন কিন্তু অবশেষে আত্মত্রাণার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। দুর্য্যোধন পরাজিত ও বন্দী হইলেন; রাজপত্নী ও রাজান্তঃপুরচারী মহিলাবৃন্দ গন্ধর্ব্বদিগের হস্তে পতিত হইলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ পলায়নপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইয়া দুর্য্যোধনাদির ও কৌরব কুলবধূগণের অপমান ও দুর্দ্দশা বর্ণনাপূর্ব্বক অতি দীন ভাবে সাহায্য প্রর্থনা করিলেন। দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিতে ভীমের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু মহানুভব যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন যে কুরুবংশীয় ললনাগণের অপমানে তাঁহাদেরই অপমান; দুর্য্যোধন তাঁহাদের শত্রু হইলেও অপর কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের অবমাননা তাঁহাদেরও নিন্দা আনয়ন করে; যদি তাঁহাদের সমক্ষে দুর্য্যোধন সপরিবারে এইরূপ অপমানিত হন, তবে লোকে তাঁহাদেরই নিন্দা করিবে। এইরূপ উদারহৃদয় যুধিষ্ঠির যুক্তিযুক্ত বাক্যে ভীমকে প্রবোধ দিলেন এবং তাঁহাকে ও অর্জ্জুন নকুল সহদেবকে দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। ভীমার্জ্জুনের সহিত গন্ধর্ব্ব সৈন্যের যুদ্ধ হয়। গন্ধর্ব্ব সেনা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে স্বয়ং গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। চিত্রসেনের সহিত অর্জ্জুনের আর যুদ্ধ হইল না; গন্ধর্ব্বরাজ দুর্য্যোধন ও রাজপত্নীদিগকে লইয়া ভীমার্জ্জুন সহ যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন ও তদীয় অন্তঃপুরমহিলাদিগকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মধুর বচনে বিদায় করেন এবং চিত্রসেনকে বন্দীদিগের প্রতি শিষ্ট ব্যবহারের জন্য প্রশংসা করেন। হতদর্প দুর্য্যোধন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (মহাভারত)

চিত্রাঙ্গদ—মহারাজ শান্তনুর পুত্র ও মহাবীর ভীষ্মের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইনি সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য। বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়স্ক থাকিতেই মহারাজ শান্তনু পরলোক গমন করেন। ভীষ্ম পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রাজপদ গ্রহণ না করাতে, চিত্রাঙ্গদ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। রাজা চিত্রাঙ্গদ প্রজাগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব্বের সহিত শান্তনুতনয় রাজা চিত্রাঙ্গদের তিনবৎসরব্যাপী ঘোর যুদ্ধ হয়; অবশেষে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ শান্তনুতনয়কে পরাজিত ও নিহত করেন। অনন্তর সত্যব্রত ভীষ্ম অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (মহাভা—আদি)

চিত্রাঙ্গদা—অর্জ্জুনের পত্নী। ইনি মণিপুরাধিপতি চিত্রবাহনের (চিত্রভানুর) কন্যা। ইঁহার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে অর্জ্জুনের এক মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মে। বভ্রুবাহন অপুত্রক মাতামহের মৃত্যুর পর মণিপুরের রাজপদ প্রাপ্ত হন। (মহাভারত)।

চ্যবন—এক বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি। ভৃগুর ঔরসে পুলোমার গর্ভে ইঁহার জন্ম। কোন রাক্ষস ইঁহার গর্ভবতী মাতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতেছিল, ইহাতে গর্ভস্থ শিশু ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমিতে পতিত হন এবং ক্রোধাগ্নিদ্বারা রাক্ষসকে ধ্বংস করেন। বেগবশতঃ গর্ভ হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া পতনার্থ চ্যুধাতু হইতে ইনি চ্যবন নামে অভিহিত

হন। একদিন চ্যবন দেবসভায় অবগত হইলেন যে মহারাজ কুশিকবংশের ক্ষাত্রতেজ তাঁহার বংশে সংক্রামিত হইবে। যাহাতে তাঁহার সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণবংশে উক্ত ক্ষাত্রতেজ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি কুশিককে শাপে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন। তিনি কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যাকে দীর্ঘকাল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করেন। মহারাজ কুশিক ও তদীয় মহিষী প্রাণপণে ঋষিকে সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। তিনি এক দিবস রাজা ও মহিষীদ্বারা স্বীয় যানবহনের কার্য্য করাইয়াছিলেন। যান বহনের সময় চ্যবন বেত্রাঘাতে রাজা ও মহিষীকে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা চ্যবন কৃত অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিলেন। চ্যবন দেখিলেন যে রাজা ও মহিষীর ব্যবহারে তাঁহার ক্রোধ কিছুতেই উদ্দীপিত হইল না; ক্রোধহীন অবস্থায় শাপ দেওয়াও অসম্ভব; কাজেই তিনি তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি রাজা ও রাজমহিষীকে বর দিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ঋষি তপঃ প্রভাবে রাজা ও রাজমহিষীকে স্বীয় আশ্রমে স্বর্গের শোভা দর্শন করাইয়াছিলেন।

চ্যবনের পুত্র ঔর্ব্ব ও পৌত্র ঋচীক। ঋচীক মহারাজ কুশিকের পুত্র গাধিরাজের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি ও পৌত্র রাম। এই রাম পরশু নামে লোকে প্রসিদ্ধ হন। এদিকে গাধিরাজের বিশ্বামিত্র নামে একপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন; এই পুত্র (বিশ্বামিত্র) কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (ঋচীক ও ঔর্ব্ব দেখ)।

একদা চ্যবন এক সরোবরতীরস্থ অরণ্যে দীর্ঘকাল তপস্যারত হইলে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ব্যতীত সমস্ত শরীর বল্মীকদ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়। রাজা শর্য্যাতির দুহিতা সুকন্যা ঘটনাক্রমে ঐ বনে গমন করেন এবং মহর্ষি চ্যবনের দুইটী চক্ষু কোন উজ্জ্বল পদার্থ জ্ঞানে কণ্টক বিদ্ধ করেন। মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা শর্য্যাতির সৈন্য ও অশ্বাদির মলমূত্রত্যাগ বন্ধ করেন। রাজা বহু অনুসন্ধানের পর ঘটনা অবগত হইয়া ঋষির শরণাপন্ন হন। মুনি রাজার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া শাপপ্রত্যাহার করেন কিন্তু তাঁহার সঙ্গে রাজতনয়া সুকন্যার বিবাহ দিতে রাজাকে অনুরোধ করেন। রাজা অগত্যা তাহাতে সম্মত হন; সুকন্যাও বৃদ্ধ ঋষির সহিত পরিণীতা হইতে আপত্তি করিলেন না। একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় পূর্ণযৌবনা সুকন্যাকে দেখিয়া কামার্দ্দিত হন এবং জরাগ্রস্ত ঋষিকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু পতিব্রতা সুকন্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুকন্যার পাতিব্রত্য দর্শনে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং চ্যবন ঋষিকে নবযৌবনসম্পন্ন করিয়া দিলেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যে ঔষধ সেবনে জরাগ্রস্ত চ্যবন ঋষি নবযৌবন লাভ করেন, তাহা তদীয় নামানুসারে চ্যবনপ্রাশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহর্ষি চ্যবন এই উপকারের পরিবর্ত্তে তাঁহার শ্বশুরের যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারকে সোমরস পান করান। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির প্রতি বজ্র উত্তোলন করেন। মুনি ইন্দ্রের হস্ত স্তম্ভিত করেন এবং হোমবলে এক রাক্ষস সৃষ্ট করিয়া উহার প্রতি ইন্দ্রকে বধ করিতে আদেশ দেন। ইন্দ্র মুনির শরণাপন্ন হইলেন এবং ঋষি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। চ্যবন মুনির নিকট আস্তিক শিক্ষালাভ করেন।

(মহাভা—আদি, অনুশাসন)।

ছ

ছায়া—সূর্য্যপত্নী। সংজ্ঞা নামে সূর্য্যের এক পত্নী ছিল; এই ভার্য্যার গর্ভে তপনদেবের যম নামে পুত্র ও যমুনা নামে কন্যা জন্মে। সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ অসহমানা হইয়া স্বকীয় ছায়া হইতে আত্মসদৃশী এক কামিনী মূর্ত্তি সৃষ্ট করেন এবং এই রমণীকে সূর্য্যের নিকট থাকিতে ও স্বীয় পুত্র কন্যার লালন পালন করিতে অনুরোধ করিয়া পিতৃভবনে গমন করেন। পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) কন্যার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করেন এবং পুনর্ব্বার স্বামী সকাশে যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু সংজ্ঞা স্বামীর সদনে না যাইয়া উত্তরকুরুবর্ষে গমন পূর্ব্বক এক ঘোটকী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন ও নিশ্চিন্ত মনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকেন। এদিকে সূর্য্য ছায়াকে নিজ পত্নী সংজ্ঞা মনে করিয়া তাঁহাকে উপভোগ করেন এবং তাঁহাতে সাবর্ণি ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। অনন্তর ছায়া নিজ পুত্রদ্বয়কে সপত্নী গর্ভজাত পুত্র যম অপেক্ষা

অধিকতর আদর প্রদর্শন করাতে যম বিমাতাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। বিমাতা ছায়া যমকে শাপ দিলেন "তোমার পা খসিয়া পড়ুক।" যম পিতার নিকট বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। সূর্য্য যমকে তদীয় বিমাতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিলেন না এবং বলিলেন যে কৃমিগণ তাঁহার পায়ের মাংস লইয়া ভূতলে গমন করিবে। কিন্তু তিনি ছায়াকে যমের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ভৎর্সনা করিলেন। ছায়া পতিকর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজসৃষ্টি ও সংজ্ঞার পতিগৃহে গমন প্রভৃতি বৃত্তান্ত স্বামীকে বলিয়া দিলেন। সূর্য্য সংজ্ঞার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করেন এবং তাঁহার নিকট সংজ্ঞার ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। ত্বষ্টা বলিলেন "বৎস, সংজ্ঞা তোমার তেজ অসহমানা হইয়া আমার ভবনে আসিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া পুনর্ব্বার তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছি।" সূর্য্য প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং অনুসন্ধানে সংজ্ঞার বর্ত্তমান অবস্থা অবগত হইলেন। সূর্য্য এক ঘোটকের রূপ ধারণ করিয়া ঘোটকীরূপিণী সংজ্ঞার সহিত উত্তরকুরুবর্ষে বিচরণ করিতে থাকেন। এই সঙ্গমে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। অবশেষে সূর্য্য স্বকীয় তেজ কিয়ৎ পরিমাণে সংহৃত করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে সংজ্ঞা স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পতিসহ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। (অশ্বিনীকুমার দেখ)

জ

জগদ্ধাত্রী—চতুর্হস্ত সমন্বিত সিংহবাহিনী দেবী। শারদীয় দুর্গাপূজার পর এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। একদা দেবগণের মধ্যে কয়েকজন মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহাদের উপরে আর দেবতা নাই, তাঁহারাই ঈশ্বর; পরমেশ্বর বলিয়া কোন দেবতার অস্তিত্ব নাই। ভগবতী দুর্গা এই উদ্ধত দেবতাগণের মনোভাব অবগত হইয়া কোটীসূর্য্যসমপ্রভ এক উগ্র জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিরূপে তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ এই জ্যোতির স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরামর্শপূর্ব্বক পবনদেবকে প্রথমে এই জ্যোতির নিকট প্রেরণ করিলেন; জ্যোতির অন্তর্নিহিতা ভগবতী দুর্গা একগাছি তৃণ সম্মুখে স্থাপন করিয়া পবনকে বলিলেন "যদি তুমি এই তৃণগাছি উত্তোলন করিতে পার, তবে তোমাকে শক্তিশালী মনে করিব।" পবন বহু চেষ্টায়ও তৃণটী উত্তোলন করিতে পারিলেন না। তৎপর অগ্নি উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ঐ তৃণগাছটী দগ্ধ করিতে বলা হইল কিন্তু তিনিও উহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অতঃপর এই উদ্ধত দেবতাগণ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে পরমেশ্বরী বলিয়া আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবী তেজঃপুঞ্জ মধ্য হইতে জগদ্ধাত্রীরূপে বহির্গত হইলেন। এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, হাস্যমুখী ও সিংহবাহিনী; ইঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র এবং সর্ব্বাবয়ব অলঙ্কারে বিভূষিত।

জগন্নাথ—শ্রীক্ষেত্রস্থ দারুব্রহ্ম। সত্যযুগে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। জগন্নাথদেবের আবির্ভাবহেতু পুরীক্ষেত্র, জগন্নাথক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্র সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর নিকট পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে পানাহারে জাতিভেদ বিচার করা হয় না; ব্রাহ্মণগণ অপরাপর নিম্ন ও অন্ত্যজ জাতীয় লোকদিগের সহিত একত্র বসিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অভিপ্রায়ানুসারে ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে পর রাজা ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন ছদ্মবেশধারী ভগবান বিষ্ণু স্বীয় পরিচয় দান করিয়া বলিলেন "আমিই পুরুষোত্তম, আমিই ব্রহ্মা, আমিই শিব; আমি তোমাকে বর দিতেছি যে তুমি দশহাজার নয়শত বর্ষ রাজত্ব করিবে এবং দেহত্যাগ করিয়া নির্গুণ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।" (ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখ)। মহাপ্রসাদ ভক্ষণ আধুনিক প্রথা মনে করিয়া বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বীয় স্মৃতি গ্রন্থে জগন্নাথের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলেও, মহাপ্রসাদের উল্লেখ মাত্র করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য বিখ্যাত দার্শনিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন না। একদিন সূর্য্যোদয় কালে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁহাকে মহাপ্রসাদ দান করেন; তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্নানাহ্নিক কিছুই হয় নাই; গুরুপ্রদত্ত মহাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়

আনন্দের সহিত ভক্ষণ করেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের ব্যবহার দর্শনে প্রেমাপ্লুত হইয়া বলিলেন "আজ আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইল, আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম, আজ আমার বৈকুণ্ঠ লাভ হইল, যেহেতু সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে।"

জটায়ু—সূর্য্য সারথি অরুণের পুত্র। (অরুণ দেখ)। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের সহিত ইহার সখ্য ছিল। সীতাহরণের সময় জটায়ু সীতাদেবীর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া রাবণের গতিরোধ করেন, কিন্তু রাক্ষসরাজের অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় হওয়াতে রাবণ সীতাসহ লঙ্কায় যাইতে সমর্থ হন। রাবণের অস্ত্রাঘাতেই জটায়ুর মৃত্যু হয়। রামলক্ষ্মণ সীতান্বেষণে বহির্গত হইয়া জটায়ুর সাক্ষাৎ পাইলেন ; জটায়ু রামের নিকট সীতাহরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া দেহত্যাগ করেন। রাম পিতৃসখার মৃতদেহের যথাবিধানে সৎকার করেন। (রামায়ণ—আরণ্য)

জটাসুর—রাক্ষস বিশেষ। যুধিষ্ঠিরাদির বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে একদা এই রাক্ষস দ্রৌপদীহরণের অভিপ্রায়ে মন্ত্রণাদক্ষ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হয় এবং স্বাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত অবসর অপেক্ষা করিতে থাকে। একদিন ভীমসেন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে, এই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে বন্ধন করিয়া তাহাদিগের সহিত দ্রৌপদীকে হরণ করে। পথিমধ্যে ভীমসেন যদৃচ্ছাক্রমে মৃগান্বেষণ করিতে করিতে জটাসুরের গমনপথে উপস্থিত হন। ভ্রাতৃগণসহ কৃষ্ণাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন এবং রাক্ষসকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করেন। (মহাভা-বন-১৫৭ অ)

জটিল—এক বিষ্ণুভক্ত বালক। ইহার সম্বন্ধে অদ্ভুত আখ্যান প্রচলিত আছে। এই বালক পাঠশালায় যাইবার সময় ভয় পাইত। মাতার নিকট ইহা বলাতে, জননী তাহাকে গোবিন্দনাম স্মরণ করিতে বলেন। বালক মাতার উপদেশ অনুসারে প্রত্যহ গোবিন্দনাম স্মরণ করিতে করিতে পাঠশালায় যাইতে লাগিল। বালকের ভক্তি দেখিয়া ভগবান্ গোবিন্দ বালকবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাহার সহিত খেলা করিতেন। একদিবস সখার সহিত খেলা করিতে করিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে জটিল যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই। গুরু বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক সমস্ত ঘটনা বলিল, কিন্তু তিনি বালকের কথা বিশ্বাস করিলেন না, এবং বালকের চতুরতা মনে করিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। বালকের শরীরে বেত্রের দাগ পড়িল না দেখিয়া গুরু বিস্মিত হইলেন। অপর একদিন গুরুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে জটিলের উপর দধি সংগ্রহের ভার পড়িল। ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে বালক এক ভাঁড় মাত্র দধি লইয়া উপস্থিত হইল। সকলে দধির পরিমাণ দেখিয়া জটিলকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। জটিল বলিল যে তাহার সখা গোবিন্দ তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইলেও এই ভাণ্ডের দধি পূর্ণই থাকিবে। কিন্তু কেহ জটিলের কথা বিশ্বাস করিল না। আহারের সময় জটিল যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঘটিল। গুরু ইহা দেখিয়া জটিলের সঙ্গে গোবিন্দ দর্শনে বনে গমন করিলেন। গোবিন্দ একটি তিন্তিড়ী (তেঁতুল) বৃক্ষ দেখাইয়া জটি-লকে বলিলেন "ঐ বৃক্ষে যত পত্র আছে তত বৎসর তপস্যা করিলে তোমার গুরু আমাকে দেখিতে পাইবে।" জটিলের নিকট ইহা অবগত হইয়া গুরু তিন্তিড়ী বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

জটিলা—শ্রীরাধার শাশুড়ী ; আয়ান ঘোষের মাতা। আয়ান ব্যতীত ইহার দুর্ম্মদ নামে অপর এক পুত্র ছিল। জটিলার একটি মাত্র কন্যা, নাম কুটিলা। জটিলা কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত রাধিকার চরিত্রে বহু দোষারোপ করেন।

(বৃন্দাবন লীলা—২২ অ)

জড়ভরত—পুরাকালে শালগ্রাম নামক স্থানে ভরত নামে এক নৃপতি বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া বাস করিতেন। এই মহাভাগ রাজা অহিংসাদি গুণে ও চিত্তের সংযমে অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা, এমন কি স্বপ্নেও, ভগবানের নাম জপ করিতেন। এই যোগতপোরত নৃপতি সর্ব্বদা ভগবানের অর্চ্চনার জন্য সমিৎপুষ্পকুশপ্রভৃতি আহরণ করিতেন। একদিন রাজা স্নানার্থ মহানদীতে গমন করিয়া অবগাহন সমাপন পূর্ব্বক স্নানের

পরে বিহিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিল। মৃগীর জলপান প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে এক ভয়ানক সিংহনাদ তথায় শ্রুত হইল। সিংহনাদ শ্রবণে হরিণী নদীর তীরে হঠাৎ লম্ফ প্রদান করিল এবং উচ্চ তীরের উপর উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; তীর অত্যন্ত উচ্চ হওয়াতে তাহার গর্ভস্থ হরিণশিশু গর্ভচ্যুত হইয়া নদীতে পতিত হইল। গর্ভপ্রচ্যুতি প্রযুক্ত এবং উচ্চতীরে আরোহণজনিত ক্লেশহেতু মৃগী ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মৃগশিশুটী নদীর তরঙ্গে বেগে ভাসিয়া যাইতেছিল, দেখিয়া নৃপতি ভরত তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মৃগশিশুটীর উপর ভরতের এমন স্নেহ জন্মিল যে তিনি জপতপ পরিত্যাগ করিয়া উহার লালন পালনেই সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মৃগশিশুটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইল। উহা আহারান্বেষণে মধ্যে মধ্যে আশ্রমের বহির্দ্দেশে গমন করিতে লাগিল। উহা আশ্রমের বাহিরে গেলে রাজার চিন্তার অবধি থাকিত না। রাজা রাজ্য, তনয় ও অশেষ ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যার জন্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু এখানে মৃগশিশুটীর প্রতি অত্যাসক্ত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয় লোপ হইল। পরিশেষে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল, তিনি মৃগশিশুটীর দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া ও তাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুসময়ে মৃগচিন্তা করাতে রাজা এক জাতিস্মর মৃগরূপে কালঞ্জর পর্ব্বতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ থাকাতে মৃগরূপী ভরত মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার শালগ্রাম নামক স্থানে আগমন করেন। নিজকর্ম্মদোষেই তিনি মৃগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া স্বীয় আশ্রমে শুষ্কতৃণাদি ভক্ষণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে দেহত্যাগ পূর্ব্বক জাতিস্মর হইয়া এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুনর্ব্বার যাহাতে অধোগতি না হয় এজন্য তিনি সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রহিলেন; কাহারও সহিত অধিক বাক্যালাপও করিতেন না। তিনি জনগণের নিকট সর্ব্বদাই আপনাকে জড়বুদ্ধি ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন, এজন্য তিনি লোকে জড়ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন, দেহ অপরিষ্কৃত ও দন্ত অমার্জ্জিত রাখিতেন। তাঁহার শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল, তিনি গুরুর নিকট কখনও অধ্যয়ন করিতেন না এবং অস্পষ্ট অল্প বাক্য ব্যবহার করিতেন। ব্রীহি, শাক, বন্যফল মূল যাহা যখন সম্মুখে পাইতেন তাহাই আহার করিয়া কোন প্রকারে কাল কাটাইতেন। নগরবাসীরা তাঁহাকে স্বল্পবুদ্ধি ও উন্মত্ত মনে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার অপমান করিত; তাঁহার স্থূলশরীর ও জড় বুদ্ধি দেখিয়া লোকে আহার মাত্র দিয়া তাহাদ্বারা, যখন যে কর্ম্ম পারিত তাহা সম্পাদন করাইয়া লইত। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদা সৌবীররাজ শিবিকা-রোহণে ইক্ষুমতী তীরস্থ কপিলাশ্রমে গমন করিতেছিলেন। দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যের কি করা কর্ত্তব্য ইহা অবগত হওয়াই রাজার কপিলাশ্রমে গমনের উদ্দেশ্য। রাজার সারথির বাক্যানুসারে বিনা পারিশ্রমিকে জড়ভরত শিবিকা বাহকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য শিবিকাবাহীদিগের ন্যায় তিনি দ্রুতগমনে অসমর্থ হওয়াতে, শিবিকাটী বিষম গতি প্রাপ্ত হইতেছিল। রাজা শিবিকা হইতে জড় ভরতকে বলিলেন "ওহে তোমাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখা যাইতেছে, অথচ তুমি এত অল্প পথ শিবিকাবহন করিয়াই ক্লান্ত হইলে কেন?" রাজার কথার উত্তরে ভরতের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল; তিনি বলিলেন "আমি স্থূল নহি আমি তোমার শিবিকাও বহন করিতেছি না এবং আমি ক্লান্তও হই নাই।" সৌবীররাজ শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণের এই সমুদয় কথার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। জড়ভরত বলিলেন "আমি আত্মা, আত্মা দেহ নহে; আত্মার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই; আত্মা এক, অক্ষয়, নির্গুণ, শান্তিময় ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং আমি স্থূল নহি, ক্লান্তও নহি; যে হেতু আমি শান্তিময়। আমি শিবিকা বহন করিতেছি না; যেহেতু শিবিকা কাষ্ঠবিশেষ এবং বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ হয়। শিবিকা কুঠার প্রয়োগে খণ্ড খণ্ড করিলে উহা কাষ্ঠনামে অভিহিত হইবে, শিবিকা থাকিবে না; আবার কাষ্ঠ বৃক্ষ হইতে জন্মে; সুতরাং আমি শিবিকা বহন করিতেছি একথা সত্য নহে, বরং শিবিকা আমাকে বহন করিতেছে এই কথাই সত্য, যেহেতু যে পঞ্চভূতে বৃক্ষনির্ম্মিত সেই পঞ্চভূতই আমাকে বহন করে। কুঠার দ্বারা শিবিকা ভেদ করিলে শিবিকা দেখিতে পাইবে না, উহা কাষ্ঠখণ্ড মাত্র;

সেইরূপ আমার দেহে অন্বেষণ করিলে আমাকে দেখিতে পাইবে না, হস্তপদাদি মাত্র দেখিতে পাইবে ; আমি দেহ নহি, দেহ হইতে ভিন্ন।" সৌবীররাজ শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণের এই জ্ঞানগর্ভ ও পরমার্থযুক্ত বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ত্বরায় শিবিকা হইতে অবরোহণ করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে ? কেনই বা এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছেন ? এবং এখানে আপনার আসিবারই বা কারণ কি ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি কে, এই কথা বলা বড় কঠিন, তবে উপভোগের জন্য আমি সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকি একথা সত্য। আমি আত্মা ; আত্মা দেব নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন, বৃক্ষাদিও নহেন ; কেবল কর্ম্মভোগের জন্য ইঁহার শরীরাদি ভেদ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে সুখ দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং কর্ম্মজনিত সুখদুঃখ উপভোগের জন্য জীব বা আত্মা দেহাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখভোগের জন্যই আমার এখানে আগমন ; আগমনের অন্য কারণ নাই।" এইরূপ বহুপ্রকার পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়া রাজা ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন এবং এই ব্রাহ্মণরূপী জড়ভরত ও পূর্ব্ব জন্মস্মরণে জ্ঞানলাভ করিয়া এই জন্মেই মোক্ষলাভ করিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ—দ্বিতীয়াংশ-১৩-১৫ অঃ)

এই রাজা ভরতের নামানুসারে তদধিকৃতদেশ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। "ততশ্চ ভারতং বর্ষং এতল্লোকেষু গীয়তে। ভরতায় যতঃ পিত্রাদত্তং প্রাতিষ্ঠতা বনম্॥" ভরতের জনক মহারাজ ঋষভ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার সময় স্বীয় পুত্রের হস্তে এই দেশ অর্পণ করিয়া যান ; এই হেতু এই ভরত শাসিত দেশ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। পুরাণে পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত। এতন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামক ভূখণ্ডে অগ্নীধ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। অগ্নীধ্রের নয় পুত্র, যথা—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এই নয়পুত্র জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া শাসন করেন এবং তাঁহাদের নামানুসারে স্বীয় স্বীয় রাজ্য প্রথিত করেন। তদবধি নাভিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ইত্যাদি নয় ভাগে বিভক্ত হইল। রাজা নাভির পুত্র ঋষভ। ঋষভের বহু পুত্র, তন্মধ্যে ভরতই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। রাজা ঋষভ জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনগমন করেন। তদবধি তদীয় রাজ্য ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। (ভরত দেখ)।

জনক—বিদেহের রাজা। জনক বংশের পূর্ব্বপুরুষ নিমি। নিমির পুত্র মিথি। এই মিথি হইতে বিদেহের নাম মিথিলা হইয়াছে। মিথির পুত্র জনক ; এই জনক হইতে তদ্বংশীয় সকল রাজাই "জনক" উপনামে খ্যাত। সীতাদেবীর পিতার নাম সীরধ্বজ জনক ; সীরধ্বজের কনিষ্ঠ সহোদর কুশধ্বজ। কুশধ্বজ জনক, ভরত ও শত্রুঘ্নের শ্বশুর। (রামা-আদি-৭১ অ) (কুশধ্বজদেখ)।

জনদেব—মিথিলার রাজা। ইঁহার সভায় নানাবিধ উপাসনামার্গপ্রদর্শক বহু দার্শনিক পণ্ডিত নিরন্তর বাস করিতেন। এই সমুদয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে লোকায়ত মতবাদী ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ দেহধ্বংসের সহিত আত্মার ধ্বংস স্বীকার করিতেন, কেহবা দেহকে অবিনাশী জ্ঞান করিতেন। এই সমুদয় পণ্ডিতগণের সহিত আলাপে মোক্ষ লাভেচ্ছু রাজার মনে শান্তি আসিত না ; তিনি এই জন্য পণ্ডিতদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। রাজা, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া মানসিক অশান্তিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা কপিলার পুত্র মহামুনি পঞ্চশিখ সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক মিথিলায় উপস্থিত হন। পঞ্চশিখ কপিলানাম্নী কোন কুটুম্বিনীর স্তন্য পান করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি কপিলাপুত্র বা কাপিলেয় নামে খ্যাত হন। রাজা জনদেব পঞ্চশিখাচার্য্যের নিকট মোক্ষতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করেন এবং মনুষ্যভোগ্য সমুদয় বস্তু ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। (মহাভা-শান্তি-২১৮ অ)

জনমেজয়—(১) পুরুর পুত্র ও যযাতির পৌত্র। এই জনমেজয়ের পুত্র প্রাচিন্বৎ স্বীয় ভুজবলে সমগ্র পূর্ব্বদিগ্‌-ভাগ জয় করিয়াছিলেন। (হরি-৩১ অ)

(২) রাজা পরীক্ষিতের পুত্র ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র। রাজা পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন, এজন্য তদীয় পুত্র জনমেজয় সর্পকুলের ধ্বংসের জন্য এক বৃহৎ সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরীক্ষিতের হন্তা তক্ষক প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণ লয়। সর্পসত্র নিবারণের জন্য নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভাগিনেয় ও জরৎকারু মুনির পুত্র আস্তিককে জনমেজয়ের নিকট প্রেরণ করেন। আস্তিক (আস্তীক) জনমেজয়ের নিকট সর্পযজ্ঞের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জনমেজয় বলিলেন যে যদি ইন্দ্র তক্ষককে পরিত্যাগ না করেন, তবে দেবরাজের সহিত তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মসাৎ করিতে হইবে। পুরোহিত-দিগের মন্ত্রে তক্ষকের সহিত ইন্দ্র আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তক্ষক যজ্ঞের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। জনমেজয় আস্তিককে তাঁহার অভীষ্ট বিষয় দানে প্রতিশ্রুতি হইলে, আস্তিক সর্পসত্রের নিবৃত্তি প্রার্থনা করেন। আস্তিক বলিলেন "মহারাজ, সর্পসত্র নিবারিত হউক; ইহা হইলে আমার মাতৃকুল রক্ষা পাইবে; ইহাই আমার একমাত্র অভিলাষ ও প্রার্থনা।" জনমেজয় আস্তিকের প্রার্থনায় সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

জনা—মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের মহিষী। ইঁহার পুত্রের নাম প্রবীর ও কন্যা স্বাহা। অগ্নিদেব স্বাহাকে বিবাহ করেন। জনার পরামর্শে প্রবীর পাণ্ডবগণের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে বহু আয়াসের পর প্রবীর সমরক্ষেত্রে নিহত হন। জনা পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইয়া জাহ্নবী জলে দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সংসার জ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করেন। (জৈমিনী-ভারত)।

জমদগ্নি—মহর্ষি ঋচীকের পুত্র। (ঋচীক দেখ)। ইনি একজন বৈদিক ঋষি। ঋগ্বেদের সূক্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি উভয়েই বশিষ্ঠের প্রতিপক্ষ। জমদগ্নি রাজা প্রসেনজিতের তনয়া রেণুকাকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে জমদগ্নির পাঁচটী পুত্র জন্মে; যথা—রুমণ্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও রাম (পরশুরাম)। পরশুরাম সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (মহাভা-বন)

একদা জমদগ্নিপত্নীরেণুকা স্নানার্থ গমন করিয়া দেখিলেন রাজা চিত্ররথ ভার্য্যাসহ জলক্রীড়ায় রত। ইহা দেখিয়া রেণুকাও কামোন্মত্ত হইয়া চিত্ররথের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেন। জমদগ্নি তদবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত ভার্য্যার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া একে একে সকল পুত্রকেই তাঁহাদের মাতৃবধের জন্য আদেশ করেন। পরশুরাম ব্যতীত সকলেই মাতৃবধে অসম্মত হওয়াতে তাঁহারা পিতৃশাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হন। পরশুরাম পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন; তাঁহার কুঠারাঘাতে মাতার মস্তক ছিন্ন হইল। জমদগ্নি প্রীত হইয়া তাহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। পরশুরাম বলিলেন "আমার জননী যেন পাপ মুক্ত হন ও তিনি যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করেন এবং আমি যেন সকলের অজেয় হই।" রেণুকা জীবিত হইলেন ও তাঁহার জড়ভাবাপন্ন পুত্রগণের জড়ত্ব অপনীত হইল। (জামদগ্ন্য দেখ)

জমদগ্নি হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যের হস্তে নিহত হন (কার্ত্তবীর্য্য দেখ)। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে যাইয়া পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই; কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে রক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের যত্নে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মহর্ষি পরাশর সৌদাসপুত্রকে রক্ষা করেন; এই পুত্রের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবল বৎস গোষ্ঠে গোবৎসকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গোপতি গোষ্ঠে গোসমূহের যত্নে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দিবিরথের পুত্র ও দধিবাহনের পৌত্র মহর্ষি গৌতমকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রভূত অর্থবলসম্পন্ন রাজা বৃহদ্রথ গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গোলাঙ্গুল জাতীয় বানরকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মরুত্তবংশীয় বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্থপতি ও স্বর্ণকারগণের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সকল ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও তাহাদিগের পুত্র পৌত্রদিগকে আনয়ন করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (মহাভা—শান্তি)

জমদগ্নি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের মধ্যে অন্যতম।

"জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥"
(মনুসংহিতা)

জয়—ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বিজয়। এই দুই সহোদর বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক ছিলেন। একদা ইঁহারা সনকাদি ঋষিগণকে ব্রহ্মদর্শনে বাধা দেওয়াতে ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন; কিন্তু ইঁহাদের অনুনয়ে ঋষিগণ প্রীত হইয়া বলিলেন "আমাদের শাপ ব্যর্থ হইবে না; তবে তোমরা দুই প্রকার মুক্তির যে কোন প্রকার পাইতে পার :—তোমরা বিষ্ণুর সহিত শত্রুতা করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পার, অথবা তাঁহার সহিত মিত্রভাবে অবস্থিত হইয়া মুক্তি পাইতে পার।" জয় বিজয় শীঘ্র শীঘ্র বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শত্রুভাবে মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। মুনিগণ "তাহাই হইবে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনিগণের শাপে জয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও দ্বাপরে শিশুপালরূপে এবং বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইঁহারা বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা। ইনি দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে বিবাহ করেন। ইঁহার পিতার নাম বৃদ্ধক্ষত্র। পাণ্ডবদের কাম্যকবনে অবস্থান কালে ইনি দ্রৌপদীকে একাকিনী কুটীরে দেখিতে পান; তৎকালে পাণ্ডবগণ গৃহে ছিলেন না। জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে হরণ করেন। মহাবীর ভীমসেন জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন। জয়দ্রথ ভীম ও অর্জ্জুনের হস্তে অত্যন্ত অবমানিত ও লাঞ্ছিত হন। তাঁহারা জয়দ্রথের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়দ্রথ কঠোর তপস্যা করেন। তিনি ভোগ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। মহাদেব তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বরদানার্থ তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। জয়দ্রথ বলিলেন "আমি এই বর চাই যে একাকী রথারূঢ় হইয়া যেন আমি পঞ্চপাণ্ডবকে পরাজিত করিতে সমর্থ হই।" মহাদেব কহিলেন "তুমি মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতীত একদিন সকলকেই নিবারণ করিতে পারিবে।" এই বর দিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। মহাদেবের এই বরপ্রভাবে ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু বধের সময় জয়দ্রথ দ্রোণ নির্ম্মিত চক্রব্যূহের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহই ব্যূহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যুর সহায়তা করিতে সমর্থ হন নাই। অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; তিনি ব্যূহের অভিমুখে আগমন করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। অর্জ্জুন পুত্রবধ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিবার পূর্ব্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করিবেন অন্যথা তিনি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবেন। কৌরবেরা জয়দ্রথকে অর্জ্জুনের কোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা জয়দ্রথকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। ভগবান কৃষ্ণ চক্রদ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগেই সন্ধ্যা সমাগম লোকের চক্ষে প্রতিভাত করিয়াছিলেন। কৌরবেরা কৃষ্ণের কৌশল বুঝিতে পারিলেন না; অর্জ্জুনের মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া জয়দ্রথ প্রমুখ কৌরবেরা উৎফুল্ল হইলেন। জয়দ্রথকে সম্মুখে দেখিয়া কৃষ্ণ চক্র অপসৃত করেন। দিনমণি আবার পূর্ব্ববৎ কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিল; কৌরবেরা বিষণ্ণ হইলেন। জয়দ্রথ পলায়নের অবসর পাইলেন না; কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন জয়দ্রথের মস্তকচ্ছেদন করেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক জয়দ্রথ নিহত হইলেন। পিতা বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথকে বর দিয়াছিলেন যে কেহ জয়দ্রথের মস্তক ভূতলে পাতিত করিলে তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। জয়দ্রথ বধের সময় বৃদ্ধক্ষত্র কুরুক্ষেত্রের অনতিদূরবর্ত্তী সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে তপস্যায় নিরত ছিলেন। অর্জ্জুন জয়দ্রথের মস্তকচ্ছিন্ন করিয়া তপোনিরত বৃদ্ধক্ষত্রের অঙ্কে স্থাপন করেন। বৃদ্ধক্ষত্র তপস্যান্তে উঠিবামাত্র পুত্রের মস্তক তদীয় অঙ্ক হইতে ভূতলে পতিত হয়; সুতরাং তাঁহার বরের ফলে তাঁহার নিজেরই মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইল। এই রূপে পিতাপুত্রের এক সময়ে বিনাশ সম্পন্ন হইল। জয়দ্রথের পুত্রের নাম সুরথ। (মহাভা—বন—দ্রোণ।)

জয়ন্ত—(১) অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের একজন মন্ত্রী। (রামায়ণ বালকাণ্ড)

(২) দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। পারিজাতহরণকালে শচীনন্দন জয়ন্তের সহিত কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের যুদ্ধ হইয়াছিল। (হরিবংশ)

জয়মল—ভক্তমাল গ্রন্থে এক জয়মলের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইনি অত্যন্ত বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। ইনি প্রত্যহ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ্ণুবিগ্রহ পূজা করিতেন। এক দিন কোন রাজা, জয়মল বিষ্ণুপূজায় আসীন হইলে, সুযোগ পাইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়মল উপস্থিত বিপদেও বিগ্রহের পূজা পরিত্যাগ করিলেন না। স্বয়ং বিষ্ণু মনুষ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক যোদ্ধৃবেশে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া শত্রু পক্ষের সমুদয় সৈন্য ধ্বংস করেন; আক্রমণকারী রাজা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। জয়মল পূজা সমাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। যে অলৌকিক উপায়ে তাহার সমুদয় সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে তাহা প্রতিপক্ষ রাজা সবিস্তরে জয়মলের নিকট বর্ণন করিলেন। জয়মলের কথা শুনিয়া আক্রমণকারী রাজাও বিষ্ণুভক্ত হইয়া পড়েন।

জরৎকারু—নাগরাজ বাসুকির ভগিনীপতি। বাসুকির ভগিনীর নামও জরৎকারু। ইঁহার পুত্রের নাম আস্তিক। আস্তিকের মাতা জরৎকারু আস্তিকের পিতাকে এক দিবস সন্ধ্যার সময় নিদ্রা হইতে জাগরিত করেন। অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ করাতে তিনি পত্নী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। জরৎকারুর প্রস্থানের সময় তদীয় পত্নী বিলাপ করিতে থাকেন। তাঁহার বিলাপ শ্রবণে স্বামী বলিয়া গেলেন যে তাঁহার উদরে সন্তান আছে। সংস্কৃত "অস্তি" (আছে) এই শব্দ হইতে পুত্রের নাম আস্তিক হইয়াছে।

জরা—(১) রাক্ষসী বিশেষ। এই রাক্ষসীই মগধাধিপতি জরাসন্ধের অর্দ্ধশরীর সংযোজিত করিয়া তাঁহাকে জীবিত করিয়াছিলেন। (জরাসন্ধ দেখ) ব্রহ্মা ইঁহার নাম "গৃহদেবী" রাখিয়াছিলেন। এই জরা লোকে "ষষ্ঠী দেবী" নামে পরিচিত। এই গৃহদেবীর (সপুত্রা জরার) মূর্ত্তি গৃহে রাখিলে ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হয়। (মহাভা-আদি)

(২) এক জন ব্যাধ। যদুবংশের ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন এই ব্যাধ মৃগভ্রমে শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করিয়া বধ করে। প্রবাদ এই যে এই ব্যাধ পূর্ব্বজন্মে কপিরাজ বালির পুত্র অঙ্গদ ছিল। (শ্রীমদ্ভা)

জরাসন্ধ—মগধের বিখ্যাত রাজা। ইঁহার পিতার নাম বৃহদ্রথ। রাজা বৃহদ্রথ পুত্রলাভার্থ চণ্ডকৌশিকের আরাধনা করেন। চণ্ডকৌশিক বৃহদ্রথের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটী ফল প্রদান করেন এবং বলিয়া দিলেন যে এই ফল রাণীকে ভক্ষণ করাইলে নিশ্চয়ই এক পুত্র প্রসব করিবেন। রাজা বৃহদ্রথের দুই মহিষী; এই দেবদত্ত ফল দুই মহিষীকে প্রদান করায়, উভয়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করেন। রাজা এই অস্বাভাবিক পুত্রোৎপত্তির বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্দ্ধ গঠিত শিশুটীকে শ্মশানে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। এই শ্মশানে জরানামে এক কামরূপা রাক্ষসী বাস করিত; সেই রাক্ষসী অর্দ্ধ বিভক্ত শিশুটীকে সংযোজিত করিয়া এক সম্পূর্ণাঙ্গ শিশু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রাণদান করিল। তদবধি এই শিশু জরাসন্ধ নামে খ্যাত হইল। এই রাক্ষসী রাজার হস্তে শিশুটীকে অর্পণ করিয়া বলিল "মহারাজ, এই শিশু অতি পরাক্রমশালী রাজা হইবে এবং ইহার সন্ধিস্থল ভিন্ন না হইলে মৃত্যু হইবে না।" জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই কন্যা মথুরাপতি উগ্রসেনের পুত্র কংসের সহিত বিবাহিত হয়। (কংস দেখ)। জরাসন্ধের সাহায্যে কংস পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মথুরার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হইলে জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মথুরা আক্রমণ করেন। তিনি নিজেই কেবল মথুরা আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; যবনরাজ কালযবনকেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন উভয়ের আক্রমণে যদুবংশীয়দের আত্মরক্ষা করা দুষ্কর; তিনি তাঁহাদিগকে মথুরা ত্যাগ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দ্বারাবতী (দ্বারকা) নগরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদবদিগকে দ্বারাবতীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক কালযবনকে নিহত করিলেন। (কালযবন দেখ)। যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে না পারিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া মগধের দিকে অগ্রসর

হইলেন। ইঁহারা তিন জনেই স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ইঁহারা জরাসন্ধের রাজভবনে প্রবেশ করিলেন; ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিয়া কেহই ইঁহাদিগকে বাধা দিল না। মধ্যরাত্রে জরাসন্ধ ইঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারা স্বকীয় পরিচয় দিয়া জরাসন্ধকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতানুসারে মহাবীর ভীম জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশ নিষ্পেষণ পূর্ব্বক পদদ্বয় করকবলিত করিয়া ইহার দেহের সন্ধিস্থল দ্বিধা বিভক্ত করেন। সন্ধিস্থলে শরীর বিভক্ত হওয়াতে জরাসন্ধ প্রাণত্যাগ করিলেন। (মহাভা—সভা)।

জলন্ধর —দৈত্যবিশেষ। একদা ইন্দ্র মহাদেবকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন; তথায় এক ভীমাকৃতি পুরুষকে দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকট শিবের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। এই পুরুষ ইন্দ্রের বাক্যে কোন উত্তর না দেওয়ায় দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। বজ্রাহত পুরুষের মস্তক হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে দগ্ধ করিতে চলিল; ইন্দ্র এতক্ষণে বুঝিলেন যে তিনি রুদ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছেন। তিনি মহাদেবের স্তব আরম্ভ করিলেন; মহাদেব ইন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। এই অগ্নি হইতে এক বালক উৎপন্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল; তাহার ক্রন্দনে জগৎ বধির হইয়া উঠিল; ব্রহ্মা ব্যাপারটী অবগত হইতে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্র ব্রহ্মাকে বলিলেন "এ আমার পুত্র; আপনি ইহাকে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করুন।" ব্রহ্মা ইহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন; শিশুটী ব্রহ্মার শ্মশ্রু এরূপ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল যে ব্রহ্মার নেত্রদিয়া জলধারা নির্গত হইল। ব্রহ্মা এজন্য এই বালকের নাম "জলন্ধর" রাখিলেন এবং ইহাকে বর দিলেন যে এই বালক রুদ্র ব্যতীত সকলের অবধ্য হইবে। স্থানান্তরে আছে যে গঙ্গার গর্ভে সাগরের ঔরসে জলন্ধরের উৎপত্তি হয়। এই বালকের জন্ম হওয়া মাত্র পৃথিবী দেবী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতাল কম্পিত হইল। ব্রহ্মা পৃথিবীর বিপৎপাত আশঙ্কা করিয়া হংসারোহণপূর্ব্বক সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মা এই বালককে অসুর রাজ্যে স্থাপন করিলেন। কালক্রমে জলন্ধর পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন ও স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া জয় করেন। ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত হইয়া মহাদেবের শরণ লইলেন। মহাদেব জলন্ধরকে বধ করিয়া ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। জলন্ধরের বর ছিল্ যে যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহার পত্নী বৃন্দার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক থাকিবে ততদিন জলন্ধরকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব হরণ করেন; এই হেতু শিব অনায়াসেই জলন্ধরকে বধ করিতে সমর্থ হন। (পদ্মপুরাণ)।

জহ্নু—বিখ্যাত রাজর্ষি। ইনি সরিদ্বরা গঙ্গাকে পান করিয়া লোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম সুহোত্র ও মাতা কেশিনী। উর্ব্বশীর গর্ভে রাজা পুরুরবার সাতপুত্র জন্মে; ইহাদের নাম আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু। অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নজিৎ। ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভ; কাঞ্চনপ্রভের পুত্র সুহোত্র এবং সুহোত্রের তনয় জহ্নু। জহ্নু সর্ব্বমেধ নামক এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সরিদ্বরা গঙ্গা ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য অভিসারিকা বেশে ইঁহার নিকট গমন করেন, কিন্তু রাজা জহ্নু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যাত হইয়া গঙ্গা জহ্নুর সভাস্থল প্লাবিত করেন। রাজর্ষি জহ্নু ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া মহর্ষিগণ রাজর্ষিপীত গঙ্গাকে "জাহ্নবী" আখ্যা প্রদান করিলেন। জহ্নু যুবনাশ্বের তনয়া কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। কাবেরীর গর্ভে জহ্নুর সুনহ নামে এক পুত্র জন্মে। (হরিঃ—২৬, ২৭ অ)।

রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে জহ্নুঘটিত প্রস্তাবটী অন্যরূপ। যখন ভগীরথ পিতৃপুরুষের উদ্ধারহেতু গঙ্গাকে পাতালে আনয়ন করিতেছিলেন, তখন মর্ত্ত্যে রাজর্ষি জহ্নু এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার স্রোতোবেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। রাজর্ষি জহ্নু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। ভগীরথ মহা বিপদ গণিলেন; তিনি জহ্নুর স্তুতি আরম্ভ করিলেন। রাজর্ষি জহ্নু ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে কর্ণপথে (মতান্তরে জানুদেশ দিয়া) বাহির করিয়া দিলেন। (রামায়ণ ও বিষ্ণু পু)

জাজলি—অথর্ব্ববেদজ্ঞ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইনি অত্যন্ত দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলেন; পরে বারাণসীর বণিক তুলাধারের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রে উপদেশ লাভ করেন। (মহাভা—শান্তি)

জামদগ্ন্য—বিষ্ণুর অবতারভেদ। ইনি জমদগ্নি ঋষির পুত্র, ইঁহার প্রকৃত নাম রাম। মহাদেবের নিকট পরশু অস্ত্রলাভ করিয়া ইনি পরশুরাম নামে খ্যাত হন। ঋচীকপ্রদত্ত চরুর প্রভাবে বিশ্বামিত্র রাজকুমার হইয়াও ব্রাহ্মণধর্ম্মী এবং জামদগ্ন্য (পরশুরাম) ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম বিশিষ্ট হইলেন। (ঋচীক, জমদগ্নি ও পরশুরাম দেখ) (মহাভা-শান্তি)। মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত ঘটনাটী অন্যরূপ; এই পর্ব্বপাঠে জানা যায় যে ঋচীক সত্যবতীকে চরু দেন নাই, ঋচীকের পিতা ভৃগু দিয়াছিলেন।

ইনি জননীর মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। (জমদগ্নি দেখ) মস্তকচ্ছেদনের পর জমদগ্নি পুত্রকে বর দিতে চাহিলেন। পরশুরাম ৪টী বর প্রার্থনা করেন।

(১) আমার জননী পুনর্জ্জীবন লাভ করুন এবং তাঁহার বধ যেন তাঁহার স্মরণ না থাকে।

(২) যুদ্ধে যেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহ না পারে।

(৩) আমি যেন দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারি।

(৪) আমার ভ্রাতৃ-গণ যেন অচিরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হন।

পিতা সন্তুষ্টচিত্তে বরদান করিলেন; পিতার বরে জামদগ্ন্যের মাতা পুনর্জ্জীবিত হইলেন এবং ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় সংজ্ঞালাভ করিলেন।

একদা হৈহয়পতি কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের অনুপস্থিতি কালে জমদগ্নিকে বধ করেন। পরশুরাম গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মাতার নিকট পিতৃবধ বৃত্তান্ত অবগত হন এবং তৎক্ষণাৎ হৈহয় দেশে গমন পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের সহস্রবাহুচ্ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করেন ও হোম ধেনুর উদ্ধার করেন। (কার্ত্তবীর্য্য দেখ)। (মহাভা—বন)। কিন্তু মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে ঘটনাটী অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বপাঠে জানা যায় যে কার্ত্তবীর্য্যের বাণাগ্নিতে বশিষ্ঠাশ্রম দগ্ধীভূত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাকে অভিসম্পাত করেন যে "যেহেতু তুমি আমার তপোবন দগ্ধ করিয়াছ, এইজন্য জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম তোমার বাহুচ্ছেদন করিবে।" এই শাপভয়ে ভীত হইয়া কার্ত্তবীর্য্য সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের হিতকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এক-দিবস কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নিকে বধ করিয়া তাহার হোমধেনু অপহরণ করেন। পরশুরাম ইহা অবগত হইয়া হৈহয়রাজ্যে গমন পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করেন ও হোমধেনুর উদ্ধার করেন। (মহাভা-শান্তি)। কার্ত্ত-বীর্য্যকে বধ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। তিনি ক্ষত্রিয়রুধিরে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী সমন্তপঞ্চকে পাঁচটী হ্রদ নির্ম্মাণ করেন এবং এই হ্রদে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়া মহর্ষি ঋচীকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ঋচীক পরশুরামকে ক্ষত্রিয়বধ করিতে বারণ করেন। পরশুরাম ঋচীক কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বধে নিষিদ্ধ হইলে পর তিনি প্রজাপতি ঋষি কশ্যপকে পৃথিবীদান করেন এবং ব্রাহ্মণ প্রদত্ত পৃথিবীতে আর বাস না করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। পরশুরামের আজ্ঞায় সমুদ্র অপসৃত হওয়াতে মহেন্দ্রগিরি তদীয় বাসোপযোগী হইয়াছিল।

পরশুরাম গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া মহাদেবের সন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহার বরে তেজোময় পরশু অস্ত্র লাভ করেন।

রাম সীতাকে বিবাহ করিয়া যখন মিথিলা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন পরশুরাম তাঁহার সম্মুখীন হন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল পুনরুদ্ভূত মনে করিয়া রামকে বধ করিতে অগ্রসর হইলেন। পরশুরামকে দূর হইতে দেখিয়া দশরথ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; শ্রীরাম তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। পরশুরাম শ্রীরামকে স্বীয় ধনুতে শর যোজনা করিতে বলিলেন; শর যোজনা করিতে সমর্থ হইলে পরশুরাম পরাজয় স্বীকার করিবেন। শ্রীরাম অনায়াসে পরশুরামের

বৈষ্ণবধনুতে শরযোজনা করিলেন। শ্রীরাম বলিলেন "আমি এখন এই শরে আপনার তপস্যার্জ্জিত লোক নষ্ট করিব, না আপনার গতিরোধ করিব ?" পরশুরামের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীরাম শরত্যাগ করিয়া পরশুরামের গতিনাশ না করিয়া তপস্যার্জ্জিত লোক নষ্ট করিলেন। অতঃপর পরশুরাম মহেন্দ্র পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। (রামা-বাল-৭৫-৭৬ সর্গ)

রামায়ণ কিম্বা মহাভারতের কোথাও পরশুরাম ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণিত হন নাই। মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণে তিনি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার ও শ্রীমদ্ভাগবতে ষোড়শ অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

পরশুরাম সমুদ্র হইতে কঙ্কণপ্রদেশ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণের আবাস স্থাপন করেন। ইহা হইতে চিন্তাশীলেরা অনুমান করেন যে সামুদ্রিক জলদস্যুদিগের হস্ত হইতে কঙ্কণপ্রদেশ অধিকার করিয়া পরশুরাম তথায় ব্রাহ্মণোপনিবেশ স্থাপন করেন।

জাম্ববতী—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নীগণের মধ্যে ইনি অন্যতমা। শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর সত্রজিতের স্যমন্তক নামে এক মণি ছিল। সত্রজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেন এই উজ্জ্বল স্যমন্তক কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে মৃগয়ায় গমন করেন। এক সিংহ সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক প্রসেনকে বধ করে এবং মণিটী গ্রহণ করিয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করে। পরে জাম্ববান্ গিরিগুহাস্থ সিংহকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। এবং উহা স্বীয়তনয়া জাম্ববতীকে ক্রীড়নকস্বরূপ অর্পণ করেন। সত্রজিৎ মনে করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভ্রাতা প্রসেনকে বধ করিয়া মণি অপহরণ করিয়াছেন, যেহেতু কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সত্রজিতের নিকট মণিটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু সত্রজিৎ জামাতাকে উহা দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ অপযশ দূরীকরণের অভিপ্রায়ে প্রসেনের অন্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় প্রসেন ও সিংহের মৃতদেহ দেখিতে পান। অতঃপর অনুচরদিগকে গুহার বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং অন্ধকারাবৃত ঋক্ষরাজের গুহাতে প্রবেশ করেন। এই গুহাতে প্রবেশ করিয়া ঋক্ষরাজের কন্যা জাম্ববতীকে স্যমন্তক লইয়া খেলা করিতে দেখেন। অদৃষ্টপূর্ব্ব নরমূর্ত্তি দেখিয়া জাম্ববতীর ভীরুস্বভাব ধাত্রী ক্রন্দন করিয়া উঠিল। জাম্ববান্ ক্রন্দন শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং প্রাকৃত পুরুষজ্ঞানে আপনার অভীষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক অর্পণ করেন। স্যমন্তকের সঙ্গে স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকেও গ্রহণ করিতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া স্যমন্তক সহ মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। জাম্ববতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের দশটী পুত্র জন্মে; তাহাদের নাম;—সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিণ ও কেতু। (শ্রীমদ্ভা—১০মস্ক)।

জাম্ববান্—ঋক্ষপতি। এই ভল্লূকরাজ ব্রহ্মার পুত্র। ত্রেতাযুগে কপিরাজ সুগ্রীবের সেনাপতি হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার উদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। দ্বাপরে স্যমন্তক মণি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই ঋক্ষপতির যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের অবসানে ইনি স্যমন্তক মণিসহ স্বীয়তনয়া জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। (জাম্ববতী দেখ) (শ্রীমদ্ভা-১০ম স্ক) চিন্তাশীলেরা অনুমান করেন যে ভল্লূকপতি জাম্ববান্ এক অনার্য্যরাজা ছিলেন। (পরশুরাম দেখ)।

জৈগীষব্য—বিখ্যাত ঋষি অসিত দেবলের গুরু। পূর্ব্বকালে আসিতদেবল নামে একজন ঋষি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আদিত্যতীর্থে অবস্থান করিতেছিলেন; কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি জৈগীষব্য এই আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিতে থাকেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করেন। মহর্ষি দেবল জৈগীষব্যের যোগবল অবলোকন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। (মহাভা—শল্য)।

জৈমিনি—বিখ্যাত হিন্দুদর্শন প্রণেতা। ইঁহার রচিত দর্শনের নাম পূর্ব্ব মীমাংসা। এই দর্শন জৈমিনি দর্শন নামেও পরিচিত। পূর্ব্বমীমাংসা হিন্দুর ষড় দর্শনান্তর্গত একখানা দর্শন। এই দর্শন ১২শ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই দর্শনে অনেক বেদমন্ত্রের মীমাংসা থাকাতে ইহা মীমাংসাদর্শন নামে খ্যাত। যে যে বিষয়ে বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ আছে, তত্তদ্বিষয়ের মীমাংসা এই দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় এজন্য এই দর্শনকে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যবর্ত্তী বলা যাইতে পারে।

জৈমিনি দর্শনের প্রথমেই আছে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"। আচার্য্যপ্রেরিত হইয়া যে যাগাদি করা হয়, তাহাকে জৈমিনি দর্শনে ধর্ম্ম কহে; অর্থাৎ আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত যাগাদির নাম ধর্ম্ম। যাহা অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হয় তাহাই ধর্ম্ম। "য এব শ্রেয়স্কর স এব ধর্ম্মশব্দেনোচ্যতে।" (মীমাংসা ১।২ সূত্রভাষ্য)। এই দর্শনে মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা স্বীকৃত হয় নাই। যদি কোন ঘটে ইন্দ্রের আবাহন করা যায় এবং দেবরাজ তাহাতে অধিষ্ঠিত হন, তবে ঐরাবতে আরূঢ় ইন্দ্রের ভারে ঘট নিশ্চয়ই চূর্ণ হইয়া যাইবে। আর ক্ষুদ্র ঘটে এত বৃহদায়তনের ঐরাবত ও ইন্দ্রের আবেশ অসম্ভব। সুতরাং যে মন্ত্রে যে দেবতার আবাহন করা হয়, সেই মন্ত্রকেই সেই দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলে আর কোন গোল হয় না। জৈমিনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের শিষ্য; ইনি ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইনি দর্শন ব্যতীত একখানা সংহিতাও রচনা করেন, ইহা জৈমিনি ভারত নামে খ্যাত। সুমন্তু ও সুত্বান্ নামে ইঁহার দুই পুত্র জন্মে; উভয় পুত্রই বিদ্বান্ ও কৃতী হইয়াছিলেন। এবং উভয়েই বেদের সংহিতা রচনা করেন। লোকপ্রবাদ এই যে, পাঁচ জন ঋষির নাম উচ্চারণ করিলে বজ্রাঘাত নিবারিত হয়। এই বজ্রবারক পাঁচ জন ঋষির মধ্যে জৈমিনি অন্যতম।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥"

জ্বর—দৈত্যরাজ বাণের সেনাপতি। ইঁহার তিন পা, তিন মাথা, ছয় বাহু ও নয়টী চক্ষু। মহাদেব ইহাকে সৃষ্টি করিয়া বাণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্নসহ বাণের হস্ত হইতে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিতে গমন করেন। (অনিরুদ্ধ দেখ)। শ্রীকৃষ্ণ বাণের সেনাপতি জ্বরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পীড়া প্রাপ্ত হইলেন; জ্বর কৃষ্ণশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অপর এক জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। এই জ্বর কৃষ্ণশরীরে প্রবিষ্ট জ্বরকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করে। জ্বর কৃষ্ণহস্তে সমর্পিত হইয়া নত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়া তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিল। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে বর দিতে অভিলাষ করিলেন। জ্বর বর চাহিলেন যে, পৃথিবীতে অন্য জ্বর থাকিতে পারিবে না। কৃষ্ণ বলিলেন, তাহাই হইবে। (হরিবংশ)।



ডিম্বক—শাল্বনগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র। ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম হংস। হংস ও ডিম্বক মহাদেবের বরে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের অবধ্য হইয়াছিলেন এবং বিরূপাক্ষ ও কুণ্ডোদর নামে দুই রুদ্রচর (ভূত) ইঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন। ইঁহারা একদা দুর্ব্বাসা মুনিকে অবমানিত করেন; মুনির কমণ্ডলু, দণ্ড, পাত্র প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। মুনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইঁহাদের ঔদ্ধত্যের বিষয় জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ হংস ও ডিম্বকের সহিত যুদ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ হংসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাকে অনেক দূরে লইয়া গেলেন। ডিম্বক সাত্যকির সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন। ডিম্বক মনে করিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণকর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। ইহা মনে করিয়া তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যমুনার জলে প্রবেশ করেন এবং নিজ জিহ্বা উৎপাটনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। ডিম্বক আত্মহত্যাপাপে ঘোর নিরয়ে গমন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ)



তপতী—সূর্য্যতনয়া। ইনি সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভজাত। (ছায়া দেখ) কুরুবংশে ঋক্ষনামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ অতি সূর্য্যভক্ত ছিলেন। সূর্য্যদেব সংবরণের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যা তপতীকে অর্পণ করেন। (মহাভা-আদি)।

তাড়কা—সুকেতু নামক যক্ষের কন্যা। সুকেতু নিঃসন্তান হওয়াতে ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে ইনি তাড়কানাম্নী তনয়া লাভ করেন। জম্ভের পুত্র সুন্দের সহিত তাড়কার বিবাহ হয়। কোন কারণ বশতঃ মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে সুন্দ নিহত হয়। স্বামীর নিধনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়কা স্বীয় পুত্র মারীচকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যের বিনাশ-সাধনার্থ গমন করে। অগস্ত্যের শাপে তাড়কা ও মারীচ রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। মাতাপুত্রে রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির উপর ক্রুদ্ধ হইল, ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিত। অগস্ত্যের তপোবনের সমস্ত তপস্বিগণ তাড়কার উৎপীড়নে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতেন। মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবন এইরূপে অরণ্যে পরিণত হইল এবং উহা অতঃপর তাড়কারাক্ষসীর বনরূপে সর্ব্বত্র বিদিত হইল। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে আরা জিলা; ইহাই পূর্ব্বে তাড়কারাক্ষসীর বন ছিল। মুনিগণ তাড়কা ও তৎপুত্র মারীচকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইতে লাগিলেন, অবশেষে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা নগরে গমনপূর্ব্বক তাড়কাবধের জন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তদীয় হস্তে সমর্পণ করিতে মহারাজ দশরথকে অনুরোধ করেন। দশরথ পুত্রস্নেহহেতু রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে এই ভয়াবহ কার্য্যে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, কিন্তু ঋষিদিগকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম মনে করিয়া বিশ্বামিত্রের হস্তে পুত্রদ্বয়কে অর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র দশরথের অনুমতিক্রমে রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাড়কার বনে উপস্থিত হন। এখানে রামের হস্তে তাড়কা নিহত হয় এবং মারীচ বাণ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে সীতাহরণে রাবণের সাহায্য করিয়া মারীচ মাতৃবধের প্রতিশোধ লইয়াছিল। তাড়কাবধে রামের চরিত্রে নারীবধ কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু যে নারী স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ও কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে, তাহার বধে নারীহত্যা জনিত পাপ হয় না। (রামায়ণ)

তারক (১)—দেবদ্বেষী অসুর। তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দুইটী বর লাভ করেন। একটী বর এই :—জগতে তদপেক্ষা অধিকতর বলসম্পন্ন আর কেহ যেন জন্ম গ্রহণ না করেন; অপর বর এই যে, মহাদেবের বীর্য্যসম্ভূত পুত্রের হস্তে যেন তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া তারক দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। দেবতারা তারকোপপ্লুত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বলেন যে, তিনি তারককে বিনাশ করিতে পারিবেন না; যেহেতু তাঁহার বরে তারক কেবল শিবের বীর্য্যসমুদ্ভূত পুত্রের হস্তেই নিহত হইবেন, অন্য কেহ তাহাকে নিহত করিতে পারিবে না। অতএব যাহাতে শিবের সন্তান উৎপাদনে প্রবৃত্তি জন্মে তদ্বিষয়ে ব্রহ্মা দেবতাদিগকে পরামর্শ দিলেন। দেবতারা মদনকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে যোগমগ্ন মহাদেবের সন্নিধানে গমন করিলেন। এই সময়ে হিমাদ্রিতনয়া পার্ব্বতী শিবের আরাধনার নিমিত্ত পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহার সম্মুখে আসীন ছিলেন। কামদেবের পুষ্পধনু হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইল; কন্দর্পশরে মহাদেব চঞ্চল হইলেন; তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল; তিনি ক্রোধ-কষায়িতলোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেবতারা ভয়ে পলায়মান হইলেন, কিন্তু কন্দর্প পলায়নের অবসর পাইলেন না; তিনি মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। মদনভস্মের পর মহাদেব সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন, এবং তথায় পুনরায় যোগমগ্ন হইলেন। পার্ব্বতী মহাদেবের লাভে ব্যথমনোরথ হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন; অতঃপর তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়া তিনি মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। বিবাহের পর পতিপত্নীতে বহুকাল সম্ভোগ চলিতে লাগিল; কিন্তু কোন সন্তান উৎপাদন হইল না। দেবগণ সন্তান উৎপাদনে বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; তারকের উৎপীড়ন তাহাদের আর সহ্য হয় না। পরে অগ্নি কপোতরূপধারণপূর্ব্বক মহাদেবের সমীপস্থ হইলেন। মহাদেব কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার শুক্রধারণ করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক ভোগ হইতে বিরত হইলেন। কপোতরূপী অগ্নি শিববীর্য্যধারণে অক্ষম হইয়া উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন; গঙ্গা বীর্য্য ধারণে অসক্ত হইয়া উহা হিমালয়ের পার্শ্বস্থ শরবণে ত্যাগ করেন। ইহাতে দেবগণ বিপদ মনে করিয়া সে বীর্য্যরক্ষার্থে ছয় কৃত্তিকাকে তথায় প্রেরণ করেন; কৃত্তিকাগণ রেতঃ পান করিয়া গর্ভধারণপূর্ব্বক ঐ গর্ভ পোষণ করিতে লাগিলেন। এই ছয় কৃত্তিকা সকলেই এক সময়ে প্রসব করিলেন; ইহাদের পুত্র একত্র মিলিত হইল; পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন; এই পুত্র শরবণে অবস্থান পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইঁহার

নাম কার্ত্তিকেয় রাখা হইল। কার্ত্তিকেয় পরিবর্দ্ধিত হইলে তাঁহার নিকট দেবতারা তারকাসুরের উৎপীড়নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া অবার্থ-শক্তিপ্রভাবে তারকাসুরকে নিহত করেন।

(মহাভা—অনুশাসন) কার্ত্তিকেয় দেখ।

(২) ইন্দ্র-দ্বেষী অসুর। এই অসুর ইন্দ্রকে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিয়াছিল। ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাগত হন; বিষ্ণু নপুংসকরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে বধ করেন। (গরুড় পুরাণ)

"হরির্নপুংসকোভূত্বা ঘাতয়িষ্যতি শঙ্কর।" (গরুড় পুরাণ)

তারা (১)—কপীন্দ্র বালীর পত্নী। ইনি সুষেণ নামক বানররাজের কন্যা এবং অঙ্গদের মাতা। রামচন্দ্রের হস্তে বালী নিহত হইলে ইনি দেবর সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করেন। (রামা-কিষ্কিন্ধ্যা)। লৌকিক ব্যবহারে ইঁহার নাম অপর চারিটী নারীর সহিত প্রাতঃকালে হিন্দু মহিলারা স্মরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু বিখ্যাত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের আহ্নিক-তত্ত্বে এই পঞ্চ কন্যা স্মরণের নিয়ম দৃষ্ট হয় না।

(২) দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক বিদ্যা। বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্র ইঁহার রূপ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন;—

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্প বান্ধা ঊর্দ্ধ একজটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধ চন্দ্র পাঁচ খানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা ব্যাঘ্র ছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গকাস্তি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥" (অন্নদা মঙ্গল)

(৩) দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী। এক দিন চন্দ্র অপূর্ব্বরূপসম্পন্না তারার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি চন্দ্রের এই দুষ্ক্রিয়ার কথা দেবগণকে জ্ঞাপন করেন। দেবগণ ও ঋষিগণ চন্দ্রকে তারা প্রত্যর্পণে অনুরোধ করেন; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন না। রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা বিপদ্ মনে করিয়া নানাপ্রকার অনুনয়ে রুদ্রকে নিবৃত্ত করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে গ্রহণপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। কিন্তু তারা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; বৃহস্পতি তারাকে গর্ভত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে আদেশ দিলেন। তারা তদনুসারে শরস্তম্বে গর্ভত্যাগ করিলেন। এই পুত্রের নাম হইল দস্যু সুস্তম। ব্রহ্মা তারার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই পুত্র প্রকৃত পক্ষে চন্দ্রের ঔরসজাত, তখন চন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া বুধ নাম দিলেন।

তিলোত্তমা—পুরাকালে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভনামে এক অসুর জন্মে। এই নিকুম্ভের দুই পুত্র, সুন্দ ও উপসুন্দ। এই অসুরদ্বয় ত্রৈলোক্যজয়মানসে বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা ইঁহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আগমন করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ এই বর প্রার্থনা করেন যে, তাঁহারা ত্রৈলোক্যস্থ সমুদয় জীবের অবধ্য হইবেন; যদি উভয়ভ্রাতা বিবাদপরায়ণ হইয়া একে অন্যকে বিনাশ করেন, তবেই তাঁহাদের মৃত্যু, নচেৎ অন্য কোন উপায়ে তাঁহাদের মৃত্যু হইবে না। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর দিয়া প্রস্থান করিলে ইঁহারা ঋষিদিগকে ভয়ানক

উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। যজ্ঞকার্য্য সমুদয় লুপ্তপ্রায় হইল। এই অত্যাচার নিবারণমানসে সমস্ত দেবর্ষি ও সিদ্ধপুরুষগণ কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া অসুরদ্বয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্রে বিশ্বকর্ম্মা লোকপিতামহের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে এক অপূর্ব্বলাবণ্য-সম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ত্রিভুবনে যত উৎকৃষ্ট বস্তু আছে, তাহা হইতে তিল তিল পরিমাণে উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া এক রমণীরত্ন সৃষ্টি করিলেন। এই রমণীর নাম হইল তিলোত্তমা। ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে সুন্দ ও ও উপসুন্দের নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন। তিলোত্তমা উপস্থিত হইলে অসুরদ্বয় তিলোত্তমালাভের জন্য পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অন্যকে নিহত করিল। ত্রিভুবন শান্ত হইল। যোগী, ঋষিগণ পুনর্ব্বার যথানিয়মে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। (মহাভা-আদি) এই স্বর্গবেশ্যা দুর্ব্বাসার শাপে বাণরাজের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

(ব্রহ্মবৈঃ কৃষ্ণখণ্ড ২৩ অ) অনিরুদ্ধ দেখ।

তুলসী—গোপিকা বিশেষ। (ইহার জন্মবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়) ইনি গোলোকে তুলসীরূপে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী ছিলেন ; শ্রীমতী রাধিকা একদিন ইঁহাকে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ায় রত দেখিয়া অভিসম্পাত করেন "তুমি মানব-যোনি প্রাপ্ত হও।" এই শাপ শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে তুলসী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন; "তুমি মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা দ্বারা আমার অংশ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" রাধিকার শাপে তুলসী পৃথিবীতে ধর্ম্মধ্বজ রাজার ঔরসে তদীয় পত্নী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া সকলে অন্য পদার্থের সহিত তাহার তুলনা দিতে অসমর্থ হইয়াছিল ; এজন্য তিনি তুলসীনামে অভিহিতা হইলেন। ইনি বনে গিয়া কঠোর তপস্যা করেন। ইহার তপস্যায় প্রীত হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে আসেন। তুলসী কৃষ্ণকে পাইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলিলেন, সুদাম নামে এক গোপ গোলোকে বাস করিতেন; ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূত। সুদাম শ্রীরাধিকার শাপে শঙ্খচূড় নাম ধারণ করিয়া বানরগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তুমি তাহাকে এখন পতিত্বে বরণ কর ; পরে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে। নারায়ণের শাপে তুমি কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়া অতি পূতা হইবে এবং তাহার প্রাণাধিকা হইবে। ব্রহ্মা চলিয়া গেলে তুলসী যথাসময়ে শঙ্খচূড়ের সহিত বিবাহিতা হইলেন। শঙ্খচূড়ের উৎপাতে দেবতাগণ অস্থির হইলেন। তাহার বর ছিল যে, তাহার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট না হইলে তাহার মৃত্যু হইবে না। দেবগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া নারায়ণ শঙ্খচূড়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুলসীর সহিত রমণ করেন। তুলসীর সতীত্ব নষ্ট হইল, শিবকর্ত্তৃক দানবরাজ শঙ্খচূড় অনায়াসে নিহত হইল। তাহার অস্থিগুলি লবণ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল এবং সেই অস্থিসমূহ হইতে দেবার্চ্চনে প্রশস্ত নানাপ্রকার শঙ্খজাতির উৎপত্তি হইল। তুলসী, সতীত্ব নষ্ট হইল দেখিয়া নারায়ণকে শাপ দিলেন "তুমি পাষাণ হও।" তুলসী স্বামীর মৃত্যুসংবাদশ্রবণে নারায়ণের চরণে পতিত হইলেন। নারায়ণ বলিলেন, "তোমার শরীর গণ্ডকী নদী হউক এবং কেশ সমূহ তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হউক। তুমি লক্ষ্মীর সদৃশী হইয়া আমার প্রিয়া হইবে।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড—১৫-২ঃ অধ্যায়)

তুলাধার—(১) বারাণসী নিবাসী এক ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বণিক্। ইনি মহর্ষি জাজলিকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। (মহাভারত)।

(২) বারাণসী নিবাসী এক ব্যাধ। ইনি মাতাপিতৃসেবাপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদর্শী হইয়াছিলেন। সকলের জীবনবৃত্ত তাহার স্মৃতিপটে ভাসিত।

তৃণবিন্দু—এই ঋষি ২৪শ দ্বাপরে বেদ সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাসনামে খ্যাত হন।

তৃণাবর্ত্ত—কংসের অনুচর দানব বিশেষ। কংসকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণবধার্থ গোকুলে প্রেরিত হইয়াছিল। তৃণাবর্ত্ত বায়ুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভারী হওয়াতে তাহাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণ ইহার গলদেশ ধারণ করাতে পলায়নেও সে অক্ষম হইয়াছিল। দানব চেষ্টাশূন্য হইয়া আকাশ হইতে শিলাতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। (শ্রীমদ্ভাগবত —১০ম স্কন্ধ)।

ত্রিজটা— লঙ্কেশ্বর রাবণের অন্তঃপুরস্থা রাক্ষসী। ইনি সীতার রক্ষিকা ছিলেন। অন্যান্য রাক্ষসীরা সীতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত; কিন্তু ইনি সীতার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিতেন। (রামা—সুন্দর)

ত্রিত—গৌতম মুনির পুত্র। একত ও দ্বিত নামে ইঁহার অপর দুই ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই তপোবলসম্পন্ন ছিলেন। ত্রিত অপর দুই ভ্রাতা অপেক্ষা কর্ম্ম ও অধ্যয়ন দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। একদা তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া পশু সংগ্রহের জন্য গ্রামান্তরে গমন করেন; পশু সংগ্রহ হইলে দুই ভ্রাতা ইঁহাকে অরণ্যে ফেলিয়া পশু লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ত্রিত অরণ্যমধ্যে এক বৃকের সম্মুখীন হন এবং ভয়ে পলায়মান হইয়া এক কূপে পতিত হন। এই তৃণলতাবৃত কূপে বসিয়া তিনি সোমযাগের অনুষ্ঠান করেন। কথিত আছে যে, এই যজ্ঞে দেবতাগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এই কূপোদকে সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইয়াছিল। এইজন্য এই কূপ উদপানতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই তীর্থের জলপান করিলে সোমপানের ফললাভ হয়। ইঁহার অভিশাপে ভ্রাতৃদ্বয় বৃকরূপে পরিণত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতে থাকে।
(মহাভারত—শল্য)

ত্রিপুরারি—মহাদেবের নামান্তর। পুরত্রয় বিনাশ করিয়া মহাদেবের এই নাম হয়। তারকাসুরের তিন পুত্র:—তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী। ইঁহারা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, তিন ভাই তিন স্বতন্ত্র পুরে বাস করিবে; সহস্র বৎসর পরে এই পুরত্রয় একত্র মিলিত হইবে। যদি সেই সময়ে কেহ এক বাণে এই সমবেত পুরত্রয় বিনাশ করিতে পারেন, তবে তাঁহারই হস্তে তাহাদের নিধন হইবে। এই বর লাভ করিয়া তাহারা ময়দানবকে তিন পুর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। ময়দানব স্বীয় তপোবলে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় এই পুরত্রয় নির্ম্মাণ করেন। তারকাক্ষ সুবর্ণময় পুরীতে, কমলাক্ষ রজতময় পুরীতে ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুরীতে বাস করিয়া আধিপত্য করিতে লাগিলেন। হরিনামে তারকাক্ষের একপুত্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করেন যে, তাহারা তাহাদের পুরমধ্যে এক সরোবর খনন করিবে; ঐ সরোবরে অস্ত্র-নিহত কোন ব্যক্তিকে নিমজ্জিত করা হইলে সে তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। ব্রহ্মার বরলাভে অসুরগণ বলদৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুরদিগকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে, ঐ দানবগণ তাঁহারই বরপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তিনি বুঝিলেন যে, মহাদেব ব্যতীত এই দানবদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারিবেন না। অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণকে লইয়া ব্রহ্মা মহেশ্বরের সমীপগত হইলেন। মহাদেব ব্রহ্মার মুখে দেবগণের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন; তিনি দেবগণের কল্যাণহেতু দানবগণের বিনাশসাধনে সম্মত হইলেন। তিনি দিব্যরথে আরোহণ করিলেন; স্বয়ং ব্রহ্মা রথের সারথি হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ও বৃষের মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক দানবপুর নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি অশ্বের স্তনচ্ছেদন ও বৃষের খুর দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তদবধি অশ্ব স্তনহীন ও গোসমূহ খণ্ডিতখুর হইল। মহাদেব শরাসনে পাশুপতাস্ত্র সংযোজিত করিয়া ত্রিপুরের মিলন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরত্রয় সমবেত হওয়া মাত্র মহাদেব বাণত্যাগ করিয়া উহা ভেদ করিলেন। পুরত্রয় শৈববাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পুরান্তর্গত অনুচরগণ ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাদেব অসুরদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিমসাগরবক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ স্বর্গরাজ্যে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। (মহাভা—কর্ণ ও হরিবংশ)

ত্রিশঙ্কু—সূর্য্যবংশীয় রাজা। ইনি সশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী হইয়া স্বীয় গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞ করিতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহা হওয়া অসম্ভব"। গুরুকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ত্রিশঙ্কু গুরুপুত্রগণের নিকট গমনপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বশিষ্ঠপুত্রগণ বলিলেন যে, একর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারা হইবার নহে। তাঁহারা পিতাকে অতিক্রম করিয়া একাজ করিতে পারিবেন না। রাজা বলিলেন যে, "গুরু আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন,

এখন আপনারাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কাজেই আমার গুরুকুল ত্যাগ করিয়া অন্যের নিকট যাইতে হইবে"। বশিষ্ঠপুত্রগণ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং "তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে" বলিয়া অভিশাপ দিলেন। রাজা গুরুপুত্রগণের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তাহার দেহ বিবর্ণ হইল; মনোবৃত্তি মলিন হইল মন্ত্রিগণ চণ্ডালরূপী রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া রাজা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র যোগবলে রাজাকে চিনিলেন এবং তাহার চণ্ডালত্বপ্রাপ্তির কারণও বুঝিলেন। রাজার প্রতি মুনির দয়া হইল। তিনি তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণের জন্য যজ্ঞ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ দান করিলেন। বেদবিদ্ ঋষিদিগকে আনয়নের জন্য শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল। বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় নামে এক ঋষিব্যতীত যাবতীয় বেদজ্ঞ ঋষি এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় আপত্তি করিলেন, "যে যজ্ঞে ক্ষত্রিয় যাজক; বিশেষতঃ যজ্ঞকর্ত্তা চণ্ডাল ভাবাপন্ন, সেই যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিগণ কিরূপে হবিঃ ভোজন করিবেন?" বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন; তিনি বশিষ্ঠপুত্রগণকে কুক্কুরমাংসভোজী ডোম হইতে এবং মহোদয়কে নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিসম্পাত দিলেন। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে বেদজ্ঞঋষিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; স্বয়ং বিশ্বামিত্র এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইলেন। কিন্তু কোন দেবতাই এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে স্বীয় তপস্যার বলে স্বর্গে প্রেরণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। রাজা ধীরে ধীরে স্বর্গের দিকে উঠিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গে স্থান দিতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। রাজা ত্রিশঙ্কু অন্তরীক্ষে নিশ্চল হইলেন। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইলেন; দক্ষিণদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রগণ সৃষ্ট হইল। দেবতারা সঙ্কট মনে করিয়া বিশ্বামিত্রের শরণ লইলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, ত্রিশঙ্কু আর অধঃপতিত হইবেন না। দেবতারা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। তদবধি ত্রিশঙ্কু অধোমস্তক হইয়া বিশ্বামিত্রসৃষ্ট ধ্রুব ও অপর নক্ষত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তরীক্ষে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

(রামা—আদি-৫৭-৬০ সর্গ)।

(২) হরিবংশে অপর এক ত্রিশঙ্কুর বিষয় বর্ণিত আছে। ইনি মহারাজ এয্যাবরুণের পুত্র। ইঁহার পূর্ব্বনাম সত্যব্রত। এই সত্যব্রত অন্যের বিবাহিতা পত্নী হরণ করিয়া পিতার অসন্তোষভাজন হন; তৎপর গুরু বশিষ্ঠের পয়স্বিনী গাভী হত্যা করেন এবং উহার বৃথামাংস নিজে ভক্ষণ করেন। এই ত্রিবিধপাপে তিনি ত্রিশঙ্কুনামে অভিহিত হন। তিনি দুশ্চরিত্রতা হেতু জনককর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ইহার অবস্থা দেখিয়া বিশ্বামিত্রের দয়া উপস্থিত হয়। বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পৈতৃকরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ইঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণের জন্য বিশ্বামিত্র এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; দেবতারা ইঁহাকে স্বর্গে স্থান দিতে সম্মত হন। ইঁহার পত্নীর নাম সত্যরথা। সত্যরথার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র নামে ত্রিশঙ্কুর একপুত্র জন্মে; এই পুণ্যাত্মা হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব নামে অভিহিত হইতেন। (হরিবংশ ১২-১২অ)



দংশ—অসুর বিশেষ। ভৃগুমুনির শাপে অলর্ককীটরূপে পরিণত হয়। (অলর্ক দেখ)

দক্ষ—প্রজাপতি বিশেষ, ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়।

কালিকা পুরাণে দৃষ্ট হয় যে, ব্রহ্মা জগৎ-সৃষ্টিমানসে অর্দ্ধ শরীরে পুরুষ ও অপরার্দ্ধে নারী হন; এবং এই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করেন। বিরাট্ পুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করেন। স্বায়ম্ভুব মনু তপশ্চর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মার সন্তোষ উৎপাদন করেন; অনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য দক্ষকে উৎপাদন করেন। দক্ষ যোগমায়াকে আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, স্বয়ং যোগমায়া দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের গৃহিণী হইবেন। এইরূপে দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই সমুদয় পুত্রগণ নারদের পরামর্শে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। ইহাতে প্রজার

বৃদ্ধি হইল না দেখিয়া মৈথুনদ্বারা প্রজার সৃষ্টির মানসে দক্ষ অসিক্নীকে বিবাহ করেন। ইহার সহিত মৈথুন ধর্ম্মে লিপ্ত হওয়াতে ইঁহার গর্ভে যোগমায়া আবির্ভূত হইলেন; ইঁহারই নাম সতী হইল।

গরুড় পুরাণে দৃষ্ট হয় যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিমানসে ধর্ম্ম, রুদ্র, মনু, সনক, ভৃগু প্রভৃতিকে মানসপুত্র করেন এবং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষকে, বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপত্নীকে সৃষ্টি করেন। দক্ষ এই পত্নীতে বহুকন্যা উৎপাদন করেন। রুদ্র একতম কন্যা সতীকে বিবাহ করেন।

হরিবংশে এইরূপ দৃষ্ট হয়—দশজন প্রচেতার মানসে মারিষার গর্ভে ও সোমদেবের অংশে দক্ষের উৎপত্তি হয়। এই দক্ষ বহুসংখ্যক মানস কন্যার সৃষ্টি করেন। এই কন্যাগণের মধ্যে ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, অবশিষ্ট ২১টী সোমদেবকে অর্পণ করেন। এই সমুদয় কন্যাগণের গর্ভে দৈত্য, দানব, নাগ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানা জাতি জীবের সৃষ্টি হইল।

হরিবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ ও বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপত্নী সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে মানসে সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, মানসসৃষ্ট প্রজাবর্গ আর বৃদ্ধি পাইতেছেনা; তখন তিনি স্ত্রী পুরুষসহযোগে প্রজাসৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন। তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্নীকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ এই অসিক্নীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ হর্য্যশ্ব ও সবলাশ্ব প্রভৃতি দক্ষ পুত্রগণকে নানাপ্রকার উপদেশ ও শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরামর্শ প্রদান করিয়া একবারে নিরুদ্দেশ করিয়া দিলেন; তাঁহারা আর প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে মনোযোগ দিলেন না; ইহা দেখিয়া দক্ষ রোষপরবশ হইয়া অভিসম্পাত দ্বারা নারদকে সংহার করেন। তখন ব্রহ্মা স্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া স্বীয় পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। দক্ষ অভিসন্ধি করিয়া কহিলেন, "আমি স্বীয় কন্যা অসিক্নীকে প্রদান করিতেছি, ইহাকে লইয়া কশ্যপকে প্রদান করুন।" ইহার গর্ভে পুনরায় নারদ জন্ম গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মা দক্ষকন্যা অসিক্নীকে কশ্যপের হস্তে অর্পণ করিলেন। কশ্যপ অভিসম্পাতভয়ে কন্যা গ্রহণ করিলেন এবং এই কন্যার গর্ভে পুনরায় নারদকে উৎপাদন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে দক্ষ ব্রহ্মার মানস পুত্র। দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। এই প্রসূতির গর্ভে ১৬টী কন্যা জন্মে; এই কন্যাগণের ১৩টী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী পিতৃগণকে এবং সতী নাম দিয়া অবশিষ্ট কন্যাটী মহাদেবকে অর্পণ করেন। দক্ষ সতীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদা বিশ্বস্রষ্টৃগণ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সকল দেবতা উপস্থিত ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ যখন এই যজ্ঞে উপস্থিত হন, তখন সকল দেবতাই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হন; কিন্তু মহাদেব তাঁহার আসনেই উপবিষ্ট রহিলেন। ইহাতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া শিবনিন্দা করেন এবং শিবকে অভিসম্পাত করিলেন যে, ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তিনি যজ্ঞভাগ পাইবেন না। তিনি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ক্রোধ সহকারে যজ্ঞস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। তদবধি শ্বশুর ও জামাতাতে বিদ্বেষ চলিতে লাগিল। কিয়দ্দিবস পরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্য প্রদান করেন। ইহাতে দক্ষ গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃহস্পতিনামে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞে ত্রিলোক নিমন্ত্রিত হইল; কেবল মহাদেব ও সতীর নিমন্ত্রণ হইল না। সতী যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতৃযজ্ঞে যাইবার জন্য স্বামীর অনুমতি চাহিলেন; মহাদেব কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই স্বামীর বাক্য উপেক্ষা করিয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ সতীর সন্নিধানে শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন। জনককর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। মহাদেব নারদমুখে সতীর দেহত্যাগের বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে একটী জটা ছিন্ন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। এই জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র শিবানুচরগণসহ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রস্থান করিলেন। তিনি ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষার দন্ত উৎপাটন করিলেন এবং অস্ত্রাঘাতে দক্ষের শিরশ্ছেদ করিলেন। পরে ঐ ছিন্নমুণ্ড যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মা দক্ষের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া অন্যান্য দেবতাগণের সহিত

কৈলাসে গমন করিলেন এবং নানা প্রকার স্তবে শিবের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া দক্ষের জীবন প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন, দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে, এখন ছাগমুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক। প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাদেবের বাক্যানুসারে দক্ষের কণ্ঠে এক ছাগমুণ্ড যোজনা করিলেন। দক্ষ পুনর্জীবিত হইলেন এবং যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া নানা প্রকারে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। (শ্রীমদ্ভা-৪র্থ স্ক-১-৭অ)

মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৫ম খণ্ডে লিখিত আছে, প্রচেতার দক্ষনামে একপুত্র জন্মে; এই দক্ষ হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলে। দক্ষ বীরিণীর গর্ভে সহস্র পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। এই কন্যাগণ মধ্যে ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে ও ২৭টী চন্দ্রকে অর্পণ করেন। কশ্যপের ১৩টী পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী শ্রেষ্ঠ। ইহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়। তৎপর কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। বিবস্বানের দুই পুত্র—বৈবস্বত মনু ও যম।

দগ্ধরথ—গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ইঁহার প্রকৃত নাম অঙ্গারবর্ণ। ইঁহার বিচিত্র বর্ণের একখানা রথ ছিল বলিয়া ইনি লোকে চিত্ররথ নামে পরিচিত। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার যুদ্ধ হয়, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইনি নিজের রথখানি দগ্ধ করেন। তদবধি ইনি দগ্ধরথ নামে প্রসিদ্ধ।

দত্তাত্রেয়—বিখ্যাত ঋষি। ভগবান বিষ্ণু অত্রিপত্নী অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুশিক-বংশীয় কোন কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন ও তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতেন। এই ব্রাহ্মণ একদিন এক বেশ্যাকে দেখিয়া কামমোহিত হইলেন এবং তাহার নিকট লইয়া যাইতে পত্নীকে অনুরোধ করিলেন। সাধ্বী পত্নী কামার্ত্ত পতিকে স্কন্ধে করিয়া সেই বেশ্যার গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে অন্ধকারে অণীমাণ্ডব্য ঋষির গাত্রে ব্রাহ্মণের পদ সংলগ্ন হওয়াতে ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন যে, তাহার গাত্রে যাহার পদ সংলগ্ন হইয়াছে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইবে। পতিব্রতা পত্নী ঋষির অভিশাপ শ্রবণে ব্যথিতা হইলেন এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "সূর্য্যের আর উদয় হইবে না।" সাধ্বীর কথা ব্যর্থ হইবার নহে; রাত্রি অতীত হইল, কিন্তু সূর্য্য আর উদিত হইল না; জগত তমসাচ্ছন্ন রহিল, সূর্য্যালোকের অভাবে জগত বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। দেবতারা মহা ব্যস্ত হইয়া ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, পতিব্রতার মাহাত্ম্যে যখন সূর্য্য উদিত হইতেছে না, তখন পতিব্রতা রমণীর সাহায্যেই সূর্য্যের উদয় সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ অত্রিপত্নী অনসূয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনসূয়া ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট যাইয়া সূর্য্যোদয়ের জন্য অনুমতি চাহিলেন এবং বলিলেন, যদি সূর্য্যোদয়ে তাঁহার স্বামী প্রাণত্যাগ করেন, তবে তিনি তাহার স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়া নবকলেবরসম্পন্ন করিয়া দিবেন। অতঃপর ব্রাহ্মণপত্নী অনুমতি দিলেন; সূর্য্য উদিত হইল। দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া অনসূয়াকে বর দিতে আসিলেন। অনসূয়া বর চাহিলেন, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে যেন আমি পুত্ররূপে প্রাপ্ত হই।" অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা সোমরূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে এবং মহেশ্বর দুর্ব্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

দধীচি—(দধীচ) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ইনি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের পুত্র। ইনি অথর্ব্বার ঔরসে প্রজাপতির কন্যা শান্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ঋগ্বেদে আছে ইনি অথর্ব্বার পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, যে সময় দক্ষ হরিদ্বারে শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তখন দধীচি তাহাকে বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু দক্ষ তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিলেন। দধীচি বিরক্ত হইয়া দক্ষের যজ্ঞস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বৃত্রাসুরের আক্রমণে ইন্দ্রাদি দেবগণ উৎপীড়িত হইলে তাহারা জানিতে পারিলেন যে, দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইলে, সেই বজ্রাস্ত্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের পতন হইবে। ইহা অবগত হইয়া ইন্দ্র দধীচির সকাশে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অস্থি প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র ইতঃপূর্ব্বে দধীচির অপকার করিয়াছিলেন। একদা দধীচি উগ্র তপস্যায় রত ছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অলম্বুষাকে দেখিয়া মহর্ষির রেতঃপাত হয়; এই

রেত হইতে সারস্বত নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। উদারচেতা মহর্ষি পূর্ব্বাপকার বিস্মৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের উপকারার্থ স্বদেহ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইল; সেই বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরের নিধন হইল।

দনু—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। ইঁহার গর্ভে, বাতাপী, নরক, বৃষপর্ব্বা, নিকুম্ভ, প্রলম্ব, বনায়ু প্রভৃতি ৪০ চল্লিশটি দানবের উৎপত্তি হয়।

দন্তবক্র—শিশুপালের ভ্রাতা। বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ইনি ত্রেতায় কুম্ভকর্ণ রাক্ষস ও সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ছিলেন। (জয় দেখ)।

দমঘোষ—চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি চেদি দেশের অধিপতি। দমঘোষ যদুবংশীয় বসুদেবের দ্বিতীয়া ভগিনী সুপ্রভাকে বিবাহ করেন। সুপ্রভার গর্ভে শিশুপাল ও দন্তবক্র জন্ম গ্রহণ করেন। বসুদেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির ও শিশুপাল উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বস্তনয়। (হরিবংশ ৪৯অ)

দমন—বিদর্ভরাজ ভীমের পুত্র। সন্তান না হওয়াতে মহারাজ ভীম বহুকাল বিমর্ষভাবে কাল অতিবাহিত করেন। একদা দমননামে এক ব্রহ্মর্ষি বিদর্ভরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রহ্মর্ষির বরে ভীম তিন পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। তিনি দমন ঋষির নামানুসারে পুত্র কন্যাগণের নামকরণ করেন। পুত্রগণের নাম দম, দান্ত ও দমন এবং কন্যার নাম দময়ন্তী রাখিলেন। নিষধাধিপতি নলকে অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না দময়ন্তী স্বয়ংবর প্রথানুসারে পতিত্বে বরণ করেন। (মহাভা-বন-৫৩ অ)

দময়ন্তী—বিদর্ভাধিপতি ভীমের কন্যা। ব্রহ্মর্ষি দমনকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে ভীম এই কন্যারত্ন লাভ করেন। এজন্য রাজা ব্রহ্মর্ষির নামানুসারে কন্যার নাম দময়ন্তী রাখেন। (দমন দেখ)। ভীম অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবতী কন্যার বিবাহার্থ এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেন। এই সভায় দেবগণও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দময়ন্তী হংস সমূহের মুখে নিষধরাজ নলের গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া নিষধরাজ নলের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন। কলি ও শনি স্বয়ংবর সভায় যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে সভা হইতে প্রত্যাগত দেবগণের মুখে শুনিলেন যে, দময়ন্তী দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।

কলি ও শনি উভয়েই দময়ন্তীর উপর রুষ্ট হইলেন। তাঁহারা দময়ন্তীকে বিপন্ন করিবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহুবৎসর তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই; অবশেষে বিবাহের ১১ এগার বৎসর পরে কলি নলের শরীরে প্রবেশ লাভ করিলেন। নল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দময়ন্তীসহ বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নলের ভ্রাতা পুষ্কর নিষধের সিংহাসন অধিকার করিলেন। বহুবৎসর পরে কলি নির্জ্জিত হইয়া নলের শরীর হইতে বহির্গত হইলেন; নল ও দময়ন্তী পুনরায় নিষধের সিংহাসনে আসীন হইলেন। (মহাভা-বন), (কলি ও কর্কোটক দেখ)।

দশরথ—অযোধ্যার অধিপতি; পিতার নাম অজ। ইনি বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের পিতা। দশরথের রাজধানী অযোধ্যা অতি প্রাচীন নগরী; ইহা সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত ও দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত। দ্বাদশযোজন-আয়ত নগরী বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর কোন স্থানে দেখা যায় না। দশরথের তিনটী প্রধানা মহিষী কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা এবং ৩৫০টী অপ্রধানা রাণী। দশরথ ৬০ হাজার বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। দশরথের আয়ু ও তদীয় রাজধানীর বিস্তৃতি অতিরঞ্জিত কি না বিচারের বিষয়। বহু বৎসর পর্য্যন্ত দশরথের কোন বংশধর সন্তান জন্মে নাই। শান্তা নাম্নী একমাত্র কন্যা ছিলেন; দশরথ তাহাকে পরম মিত্র অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদের (লোমপাদ) নিকট পোষ্যপুত্রিকা-রূপে অর্পণ করেন। রোমপাদ শান্তাকে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত বিবাহ দেন। (ঋষ্যশৃঙ্গ দেখ)। অপুত্রক বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ দুঃখিত মনে বহুকাল অতিবাহিত করেন; পরে মন্ত্রিগণের পরামর্শে জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা পুত্র কামনায় এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সরযূর উত্তরতীরে ইষ্টক দ্বারা যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়া প্রধানা মহিষীত্রয় অন্তঃসত্ত্বা হন। যথাকালে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কেকয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রেষ্টিতে অঙ্গ, মগধ, মিথিলা, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত রাজগণের মধ্যে কুরু পাণ্ডব বা তাঁহাদের বংশধরগণের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (একদল লোক আছেন যাঁহারা বলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রাম রাবণের যুদ্ধের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। যদি তাহাই হইবে, তবে দশরথের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে কুরু পাণ্ডব বা তদ্বংশীয়দিগকে উপস্থিত দেখা যাইতেছে না কেন ?) পুত্রেষ্টি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দশরথ মৃগয়ার্থ বনগমন করিয়াছিলেন। তিনি শব্দভেদী বাণের পরীক্ষার্থ রাত্রিতে নদীতীরে অবস্থানপূর্ব্বক এক শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ পরিত্যাগ করেন; পরিত্যক্ত বাণে অন্ধমুনির পুত্র আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পুত্রশোককাতর অন্ধমুনি শাপ দেন যে, দশরথকে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। (অন্ধ দেখ)। শাপগ্রস্ত হইয়া দশরথ বিষণ্নমনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অযোধ্যার অল্প দক্ষিণে গঙ্গার উত্তর তীরেই নিষাদপতি গুহের (গুহক) রাজ্য, ইহার নাম শৃঙ্গবেরপুর। বর্ত্তমান সময়ে উহা সংরুর নামে খ্যাত। গুহ (গুহক) অনার্য্যজাতীয় রাজা। এই অনার্য্য রাজার সহিত দশরথের মিত্রতা ছিল। দশরথ মিথিলার রাজা জনকের অযোনিজা কন্যা সীতাদেবীর সহিত রামের ও ঔরসজাত কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের এবং জনকের ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দেন। ভরত মাণ্ডবীকে ও শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করেন। সীতার বিবাহে একটা পণ ছিল; বিবাহার্থীকে জনকগৃহস্থ হরধনুতে গুণযোজনা করিতে হইবে। বিবাহার্থী সকল রাজা গুণযোজনায় অক্ষম হইলেন; রাম অনায়াসে গুণযোজনা করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দশরথ রামকে বিবাহার্থ জনকপুরীতে প্রেরণ করেন নাই। তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচ ও সুবাহুর উৎপাতে ঋষিগণের যজ্ঞবিঘ্ন হইত; এই রাক্ষসদ্বয়ের বধার্থ বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক দশরথের নিকট রাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করেন। দশরথ প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে অনেকটা বিবেচনার পর মুনির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে লইয়া গঙ্গা-সরযূর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে আরা জিলা ও উত্তরে ছাপরা জিলা অবস্থিত; রাম এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণতীরে অবতরণ করিলেন। এইস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে তাড়কা রাক্ষসীর নিবিড় বন বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। বনে প্রবেশ করা মাত্র তাড়কা ইঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল; বিশ্বামিত্রের ইঙ্গিতে রাম তাড়কাকে বধ করেন। কেহ কেহ তাড়কাবধে রামের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে তাড়কা নারীজাতির সাধারণ গুণ ভীরুতা ও কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করে, তাহার বধে নারীবধের কলঙ্ক হয় না। রাম গো ব্রাহ্মণ হিতের জন্য তাড়কাকে বধ করিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মারীচ ও সুবাহু রামকে আক্রমণ করে; যুদ্ধে সুবাহু হত হয়, মারীচ রামশরে আহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ মারীচ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। এই মারীচ সীতাহরণ ব্যাপারে রাবণের সাহায্য করিয়া মাতৃবধের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লয়। ইহার পর রাম পুনর্ব্বার গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর তীরে অবতরণ করেন। এই তীরেই বিশালানগরী। এই ভূভাগ গঙ্গার উত্তরে, গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বে ও মিথিলার দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম বিসার। বিশালা হইতে রাম গৌতমাশ্রমে প্রবেশ করিয়া অহল্যার শাপ মোচন করেন। অহল্যা যে পাষাণী হইয়াছিলেন অথবা ইন্দ্র যে গৌতমশাপে সহস্রলোচন হইয়াছিলেন একথা আর্ষ রামায়ণে নাই। (অহল্যা দেখ)। গৌতমাশ্রম হইতে বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া মিথিলায় প্রবেশ করেন। মিথিলা বিশালার উত্তরে অবস্থিত; মিথিলা নামটী এই রাজ্যের রাজা মিথি হইতে আগত। নিমির পুত্র মিথি। মিথির পুত্র জনক। এই জনক হইতে তদ্বংশীয় সমস্ত রাজাই "জনক" উপনামে অভিহিত। সীতার পিতা যে জনক তাহার প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। সীরধ্বজ জনকের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম কুশধ্বজ জনক। কুশধ্বজ জনক ভরত ও শত্রুঘ্নের শ্বশুর। সীতার পিতা সীরধ্বজ সাঙ্কাশ্যার রাজা সুধন্বাকে পরাজিত করিয়া এই রাজ্যে স্বীয় ভ্রাতা কুশধ্বজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাঙ্কাশ্যা অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহা মিথিলার নিকট অবস্থিত। রাম ধনুর্ভঙ্গ করিলে পর সীরধ্বজ দূত প্রেরণ করিয়া দশরথকে তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন

করেন। দশরথ মন্ত্রিগণ ও ভরতশত্রুঘ্নসহ মিথিলায় উপস্থিত হন। এখানে বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবানুসারে সীরধ্বজের আযোনিজা কন্যা সীতাকে রামের সহিত ও ঔরসজাত কন্যা উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের সহিত বিবাহ দেন। এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী মাণ্ডবীকে ভরতের সহিত ও শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্নের সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের পর দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। পথে ক্ষত্রিয়বংশনাশক পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রাম পরশুরামের ধনুকে শর যোজনা করাতে পরশুরাম পরাজয় স্বীকার করেন। রাম শর নিক্ষেপ করিয়া পরশুরামের তপস্যার্জ্জিত লোক নাশ করেন। পরশুরাম মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। দশরথ রামের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যে দিন রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন স্থির হইল, তৎপূর্ব্ব দিন ভরতজননী কেকয়ী দশরথের নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন ; এক বরে রামের চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বনবাস, অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। দশরথ কেকয়ীর দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন ; কিন্তু কি করেন, তিনি পূর্ব্বে কেকয়ীকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তিনি অনিচ্ছাসত্বেও নিতান্ত বিরক্তির সহিত কেকয়ীর প্রার্থিত বর দিতে বাধ্য হইলেন। রাম বনে চলিলেন। দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার মৃতদেহ তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হইল। অন্ধ মুনির শাপ সফল হইল। ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে ছিলেন। সংস্কারের লোক ছিল না, তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে দ্রুতগামী দূত প্রেরিত হইল। ভরত অযোধ্যায় আগমন করিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

দারুক—কৃষ্ণের সারথি। অর্জ্জুনকৃত সুভদ্রা হরণের সময় ইনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "আমি যাদবদিগের বিরুদ্ধে রথ চালনা করিতে পারিব না, আপনি আমাকে বন্ধন করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করুন।" শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুসময়ে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা ইনি অর্জ্জুনকে জ্ঞাপন করিয়া অরণ্যে গমন করেন। (মহাভারত—মূষলপর্ব্ব)

দিতি—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী ও দৈত্যগণের মাতা। দেবগণের আক্রমণে দৈত্যগণ বিনষ্ট হইলে দিতি স্বামীর নিকট ইন্দ্রদমনকারী এক পুত্র প্রার্থনা করেন ; কশ্যপ পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে সহস্র বৎসর গর্ভধারণ করিতে হইবে এবং সন্তান প্রসব পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শুচি থাকিতে হইবে।" দিতি যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন-পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভাবিবিপদের আশঙ্কায় দিতির গর্ভ নষ্ট করিতে ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন দিতি অধৌত পদে শয়ন করিয়াছিলেন ; ইন্দ্র এই সুযোগ অবলম্বনে দিতির গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক বজ্রদ্বারা গর্ভ ৪৯ খণ্ডে বিভক্ত করেন। এই প্রসূত সন্তানগণ পরে মরুৎনামে প্রসিদ্ধ হন।

দিবিরথ—মহারাজ অঙ্গের পৌত্র ও দধিবাহনের পুত্র। দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ ও পৌত্র চিত্ররথ। (হরিবং—৩১অ)

দিবোদাস (১) ব্রধ্নস্বের পুত্র। মেনকার গর্ভে ইহার উৎপত্তি। ইহার ভগিনীর নাম অহল্যা।

(২) কাশীর রাজা মনুবংশীয় রিপুঞ্জয়ের পুত্র। ইনি ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া বর লাভ করেন। তাঁহার বরে ইনি নাগর রাজের নিকট অনঙ্গমোহিনীনাম্নী মহিলাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন এবং স্বর্গ হইতে রত্ন ও কুসুম প্রাপ্ত হন। এই জন্য তিনি দিবোদাসনামে খ্যাত। ইনি বহুকাল কাশীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(৩) ইনি প্রতর্দ্দন নামে পুত্র লাভ করেন। (গালব দেখ)। ইহার পিতা সুদেব। (মহাভা-অনুশা)। আয়ুবংশীয় সুহোত্রপুত্র কাশ প্রথম রাজা। তৎপুত্র কাশীরাজ বা কাশ্য হইতে রাজ্যের নাম কাশী বা কাশি হইয়াছে। এই বংশে হর্য্যশ্বনামে এক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। যদুবংশীয় হৈহয় পুত্রগণকর্ত্তৃক ইনি হত হন। হর্য্যশ্বের পর সুদেব কাশীর রাজা হন ; তিনিও হৈহয় পুত্রগণকর্ত্তৃক নিহত হন, সুদেবের পুত্র দিবোদাস সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কাশীর দুর্গ প্রাকার সুরক্ষিত করেন। এই সময় কাশী গঙ্গার উত্তরতীর ও গোমতীর দক্ষিণ তীর ব্যাপিয়া ছিল। (মহাভা-অনুশা, ৩০অ ও বিষ্ণুপু)। হরিবংশ ও মৎস্য পুরাণ মতে হৈহয় বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্য কাশী অধিকার করেন। দিবোদাস ইঁহাকে বধ করিয়া কাশীর রাজা হন। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম দিবোদাসকে পরাজিত করিয়া কাশীর রাজা হন। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন দুর্দ্দমকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য কাশী অধিকার করেন।

দিলীপ—উদয়পুরের মহারাণার নিকট হইতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক কর্ণেল টড্ যে বংশাবলী-পত্র প্রাপ্ত হন তাহাতে দেখা যায় যে দিলীপ দুই জন। একজন ভগীরথের পিতা, অপরজন রঘুর পিতা। এই দ্বিতীয় দিলীপের পুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ। কালিদাসের রঘুবংশের সহিত এই তালিকার ঐক্য আছে। কিন্তু আর্ষরামায়ণে দিলীপ এবং রামের মধ্যে ১৭জন রাজা। রাজগণের নাম যথা—দিলীপ, তৎপুত্র ভগীরথ, তৎপুত্র কাকুৎস্থ, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র প্রবৃদ্ধ, তৎপুত্র কল্মাষপাদ, তৎপুত্র শঙ্খণ, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ, তৎপুত্র শীঘ্রগ, তৎপুত্র মরু, তৎপুত্র প্রশুশ্রক, তৎপুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অজ ও অজের পুত্র দশরথ।

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস দিলীপের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দিলীপ একদা স্বর্গ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালে পথে স্বর্গীয় গাভী সুরভিকে অতিক্রম করিয়া আসেন। সুরভি মর্ত্ত্যরাজকর্ত্তৃক পূজিত না হইয়া নিজকে অপমানিত মনে করেন। তিনি দিলীপকে এই শাপ দেন যে, সেবাদ্বারা তাঁহার কন্যা নন্দিনীর প্রীতি সাধন করিতে না পারিলে তাঁহার সন্তান হইবে না। রাজা বহুদিন নিঃসন্তান অবস্থায় থাকিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে নিঃসন্তান হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বশিষ্ঠ ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া স্বীয় আশ্রমস্থিতা নন্দিনীর সেবা করিতে পরামর্শ দেন। দিলীপ মহিষী সুদক্ষিণাসহ বশিষ্ঠের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক নন্দিনীর সেবা করিতে থাকেন। নন্দিনী দিলীপের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন। নন্দিনীর বরে দিলীপ বংশপ্রবর্ত্তক রঘুনামে পুত্র লাভ করেন। (রঘুবংশ)

দীর্ঘতমা—উতথ্যের পুত্র। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। (মহাভা-আদি)।

দুঃশলা—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা। দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠা ভগিনী। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার পুত্রের নাম সুরথ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে জয়দ্রথের মৃত্যু হয়; সেই সময় সুরথ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। দুঃশলা নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হইয়া সিন্ধুরাজ্য শাসন করেন। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। পিতৃহন্তার আগমনে সুরথ ভয়ে অভিভূত হন এবং হঠাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুন ইহা অবগত হইয়া সুরথের নাবালক পুত্রকে সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (মহাভারত)

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দুর্য্যোধন সর্ব্বদা ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেন। ইনিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল। দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ পরাজিত হইলে দুঃশাসনই দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ সহায় থাকাতে দ্রৌপদীর মান রক্ষা পায়। দুঃশাসন যতই বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, দ্রৌপদীর বস্ত্র ততই দীর্ঘ হইতে লাগিল; অবশেষে দুঃশাসন ক্লান্ত হইয়া দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া দিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন না তিনি দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপাত করিবেন এবং সেই রক্তধারায় দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত করিবেন ততদিন দ্রৌপদীর বেণীবন্ধ মুক্ত থাকিবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইঁহাকে বধ করিয়া ভীম প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। (মহাভারত)

দুন্দুভি—মহিষরূপী দানব। বালী ইঁহাকে বিনাশ করিয়া ইঁহার দেহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে নিক্ষেপ করেন। তদবধি মতঙ্গ মুনির শাপে বালী আর ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইতে পারিতেন না (রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যা)

দুর্গা—আদ্যাশক্তি। ইনি দুর্গ নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া দুর্গানামে খ্যাত হন।

"অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গ দৈত্যস্য সমরে ঘাতনাদতি দুর্গমাৎ॥" (কাশীখণ্ড ৭২অ)।

মহিষাসুর দেবগণকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবগণ বিপন্ন হইয়া ব্রহ্মার শরণ লন। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে সঙ্গে করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন এবং মহেশ্বরের নিকট দেবতাদিগের দুর্দ্দশা বর্ণন করেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে এক তেজঃ নির্গত হইল। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের মুখ হইতে

তেজোরাশি নির্গত হইল। সমবেত তেজোরাশি এক রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। দেবতাগণ স্ব স্ব আয়ুধ এই রমণীকে প্রদান করেন। এই দেবীই মহিষাসুরকে তিনবার নিধন করেন। প্রথমবার উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয়বার ভদ্রকালীরূপে ও তৃতীয়বার দুর্গারূপে। (উগ্রচণ্ডা দেখ)। ভদ্রকালীর ষোড়শভুজা মূর্ত্তি রাত্রিতে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তৎপর দিন তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবী মহিষাসুরের নিকট উপস্থিত হইলে মহিষাসুর বলিলেন "আপনি আমাকে বিনাশ করিবেন, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আপনার সঙ্গে যাহাতে আমি পূজা প্রাপ্ত হই তাহা আপনি বিধান করিবেন।" দেবী বলিলেন "উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা এই তিন মূর্ত্তিতে তুমি সর্ব্বদা আমার পাদলগ্ন থাকিয়া মনুষ্য, দেবতা ও রাক্ষসগণের পূজ্য হইবে।" (দেবীভাগবত; মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও কালিকা পুরাণ)

দুর্য্যোধন—ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। ভারতযুদ্ধে ইনিই কৌরবদলের নেতা। ইনি ভীমের সমবয়স্ক ছিলেন। ভীমের বলবীর্য্য দেখিয়া ইনি সর্ব্বদাই ঈর্ষান্বিত থাকিতেন। বাল্যকালে ক্রীড়ার সময় ইনি ভীমকে বিষপান করাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন; ভীম বাসুকিকর্ত্তৃক পাতালে নীত হন এবং বিষজ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্র বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের আপত্তিতে উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দুর্য্যোধনের কুপরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীসহ পাণ্ডুপুত্রগণকে রাজধানী হস্তিনাপুর হইতে অপসৃত করিয়া বারণাবতে প্রেরণ করেন; দুর্যোধন বারণাবতে গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। পাণ্ডবেরা কৌশলপূর্ব্বক রাত্রিকালে বারণাবত হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন এবং পঞ্চালরাজ্যে উপনীত হন। এই রাজ্যের রাজা দ্রুপদ। মহাভারতের সময়ে পঞ্চাল দুইভাগে বিভক্ত ছিল;—উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চাল বর্ত্তমান রোহিল খণ্ডে; ইহার প্রাচীন রাজধানী অহিচ্ছত্রা। দক্ষিণ পঞ্চাল গঙ্গার দোয়াব; ইহার প্রাচীন রাজধানী কাম্পিল্য। দ্রুপদের সহিত কৌরবদিগের চিরশত্রুতা; উভয়ই প্রবল পরাক্রান্ত। পাণ্ডবগণ দ্রুপদের কন্যা বিবাহ করাতে দ্রুপদের সহিত কৌরবের শত্রুতা ঘনীভূত হইল। এজন্য কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকে অনেকে কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধ বলেন। পাণ্ডবগণ উপলক্ষ মাত্র। এই সময়ে দ্রৌপদীর বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভা আহূত হইয়াছিল; যুধিষ্ঠিরাদি ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হন। কৌরবগণ একে একে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে যাইয়া পরাঙ্মুখ হইতেছিলেন; ছদ্মবেশধারী অর্জ্জুন ঐ লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন।

দ্রুপদ পরাক্রান্ত রাজা; পাণ্ডবগণ তাঁহার জামাতা হইয়াছেন। পলায়িত পাণ্ডবেরা একজন বড় সহায় পাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্দ্ধরাজ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়া অর্দ্ধরাজ্য দান করেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করিয়া দেন। এখানে পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মহাসমারোহের সহিত যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। ইহাতে দুর্য্যোধনের ঈর্ষা আরও বর্দ্ধিত হয়। ইনি মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করেন; শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির অক্ষে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইলেন এবং ১২শ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে পণবদ্ধ হইলেন। ইহার উপরে দ্রৌপদীকেও পণে হারিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভায় আনিলেন এবং তাঁহাকে বিবস্ত্র করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ সহায় থাকাতে দ্রৌপদী এই অপমান হইতে রক্ষা পাইলেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে উরুদেশে বসাইতে আহ্বান করিলেন; পত্নীর উপর এই সমুদয় অত্যাচার দেখিয়া ভীম দুঃশাসনের রক্তপানের ও দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। পাণ্ডবদের ১২শ বর্ষ বনবাসে দুর্য্যোধন অতি উৎফুল্ল হইলেন; তিনি পাণ্ডবদিগকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য ঘোষযাত্রা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সপরিবারে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের হস্তে বন্দী হন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের পরিবারবর্গের এই বিপদ্ অবগত হইয়া উহা নিজের অপমানজনক মনে করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের পরিবারবর্গকে চিত্রসেনের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য ভীম ও অর্জ্জুনকে প্রেরণ করেন। চিত্রসেন পরাজিত হইয়া ভীমার্জ্জুনের হস্তে পরিবারসহ দুর্য্যোধনকে অর্পণ করেন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বিদায় করেন। এই ঘটনায়

দুর্য্যোধন অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। পাণ্ডবগণ এক বৎসর মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে অজ্ঞাত বাস করেন। কেহ বলেন, মৎস্যদেশ বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য, আবার কাহারও মতে উহা গুজরাটের সন্নিহিত প্রদেশ। কিন্তু অনেকের মতে ইহা বর্ত্তমান গুজরাটের সন্নিহিত প্রদেশ। আবার অনেকে বলেন, ইহা বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও বগুড়া জিলা। রংপুর জিলায় এখনও লোকে বিরাটের বাড়ী দেখাইয়া থাকে এবং বগুড়া জেলায় কীচকের বাড়ী দৃষ্ট হয়। বিরাটের ও কীচকের বাড়ী যে স্থানে, ঐ স্থানদ্বয় বিরাট ও কীচক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কীচকের বাড়ীতে বর্ত্তমান সময়ে একটী মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে; ইহা কীচকস্কুল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রংপুর ও বগুড়া জেলা পূর্ব্বে জলাভূমি ছিল। বগুড়ার সেরপুর হইতে ময়মনসিংহের সেরপুর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জলময় ছিল। এই জলাভূমি উত্তীর্ণ হইতে পাটনীকে দশ কাহন কড়ি দিতে হইত; এজন্য উহাকে দশকাহনী পাড়ী বলে। এই স্থান জলময় বলিয়া মৎস্যবহুল, এজন্য মৎস্যদেশ নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে রংপুরের বিরাট হইতে বগুড়ার কীচক পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে, ইহাকে ভীমের জাঙ্গল বলে। বিরাটের ভবনে অজ্ঞাতবাস কালে বিরাটের দুর্দ্দান্ত শ্যালক ও প্রধান সেনপতি কীচক ভীমকর্ত্তৃক নিহত হন। কীচকের ভয়ে কেহ, এমন কি কৌরবেরাও, বিরাটের সহিত শত্রুতা করিতে সাহসী হন নাই। কীচকের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে দুর্য্যোধন সসৈন্যে বিরাটের গোগৃহ আক্রমণ করেন। কিন্তু অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া বিষণ্ণমনে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই গো-গৃহযুদ্ধের দিনই পাণ্ডবদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস শেষ হয়। অতঃপর বিরাটের সহিত পাণ্ডবদের পরিচয় হইল; বিরাটের অনুরোধে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। পাণ্ডবগণ এখন দুইটী সহায় পাইলেন; একজন পঞ্চালরাজ দ্রুপদ; অপরজন মৎস্যরাজ বিরাট। নির্দ্দিষ্ট বনবাস ও অজ্ঞাতবাস কাল গত হইলে ইঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্দ্ধরাজ্য চাহিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন যুদ্ধ ব্যতীত কিছুই পাণ্ডবদিগকে দিতে প্রস্তুত নহেন। কৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ শুনিলেন না। কাজেই উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও কৌরব উভয়েই কৃষ্ণের সাহায্য চাহিলেন; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবদিগের পক্ষে গেলেন কিন্তু তাঁহার সেনাদল (নারায়ণী সেনা) দুর্য্যোধনকে দিলেন। ১৮ দিন যুদ্ধ হইল। ১০ দিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি ভীষ্ম যুদ্ধে পতিত হইলেন; পাঁচ দিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি দ্রোণ, আড়াই দিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি কর্ণ এবং অর্দ্ধদিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি শল্যের পতন হয়। অতঃপর কৌরবপক্ষের পরাজয় হয়। দুর্য্যোধন পলায়ন করিয়া এক হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন, কিন্তু ভীমের দুর্ব্বাক্যে ও বিদ্রূপে উত্তেজিত হইয়া হ্রদ হইতে বহির্গত হইলেন। ভীম ও দুর্য্যোধনে গদাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভীম পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভগ্ন করিলেন; দুর্য্যোধন মৃতপ্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত রহিলেন। মৃতপ্রায় দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবেরা শিবিরে গমন করিলেন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। দুর্য্যোধনের অনুরোধে অশ্বত্থামা গুপ্তভাবে পাণ্ডবশিবিরে গমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মস্তকচ্ছেদ করিলেন; এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণের বিনাশ সংবাদ দুর্য্যোধনের নিকট দিলেন। পাণ্ডবগণের বংশ লোপ হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন উৎফুল্ল অন্তঃকরণে দেহত্যাগ করিলেন। (মহাভারত)

দুর্ব্বাসা—অত্রিমুনির পুত্র; অনসূয়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম। মহাদেবের অংশভূত হইয়া অনসূয়ার গর্ভে দুর্ব্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করেন। (দত্তাত্রেয় দেখ)। দুর্ব্বাসা অতি কোপনস্বভাব ঋষি। ইনি ঔর্ব্ব মুনির কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করেন। (কন্দলী দেখ)। ইঁহার কোপে দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন। ইঁহার অভিসম্পাতে শকুন্তলা দুষ্মন্তকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নানা কষ্ট ভোগ করেন। একদা উত্তপ্ত পায়স ভোজন করিতে করিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উহা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে কহিলেন; ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ পদতলে পায়স লেপন করিলেন না; দুর্ব্বাসা বলিলেন, তুমি পদতলে পায়স লেপন করিলে না এজন্য তোমার পদতল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ অভেদ্য হইবে। এই হেতু মৃত্যুসময়ে কৃষ্ণ ব্যাধবাণে পায়ে বিদ্ধ হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র যদুবংশনাশক মুষল প্রসব করেন।

ইনি কুন্তিভোজনন্দিনী কুন্তীর পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে মন্ত্র শিক্ষা দেন তৎপ্রভাবে কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হয়। (মহাভা, ব্রহ্মবৈঃ ও শ্রীমদ্ভাঃ)

দুষ্মন্ত—(দুষ্মন্ত) পৌরববংশীয় বিখ্যাত রাজা, মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক বিখ্যাত নাটকের নায়ক। কালিদাস মহাভারতের অন্তর্গত আদিপর্ব্বে বর্ণিত দুষ্মন্ত শকুন্তলা বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্ব্বক তদুপরি স্বীয় অসাধারণ কল্পনাশক্তি প্রয়োগ ও অমৃতময়ী লেখনী সঞ্চালন করিয়া উক্ত নাটক রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের প্রস্তাবটী এই :—একদা রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মৃগের অনুসরণক্রমে সুগন্ধি পুষ্পভারাবনত লতাপল্লব-সুশোভিত মালিনীতটবর্ত্তী শান্তরসাস্পদ কণ্বমুনির তপোবন পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী ও পুরোহিতগণকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া রাজা একাকী আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কণ্ব আশ্রমে নাই, ফলান্বেষণে গিয়াছেন; রাজার স্বর শুনিয়া কুটীরাভ্যন্তর হইতে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী তাপসবেশধারিণী কন্যা বহির্গত হইলেন এবং যথারীতি পাদ্য ও অর্ঘ্যদানে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিলেন। রাজা ঋষিকে অনুপস্থিত দেখিয়া শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা কণ্বের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। "একদা দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যায় ভীত হইয়া অপ্সরা মেনকাকে তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। মেনকার হাবভাবে মহর্ষির তপোভঙ্গ হইল; তিনি তপজপ ত্যাগ করিয়া মেনকাতে অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে মেনকা মুনিসহযোগে গর্ভবতী হইলেন; যথাকালে মেনকা এক কন্যা প্রসব করিলেন, এই কন্যাকে মালিনীতীরে নিক্ষেপ করিয়া মেনকা স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তসকল (পক্ষিগণ) হিংস্রজন্তুসমাকুল নির্জ্জন স্থানে সদ্যোজাতা কন্যাকে পতিতা দেখিয়া সদয়হৃদয়ে বেষ্টনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিল। মহর্ষি কণ্ব প্রভাতে মালিনীতে স্নান করিতে গমন করিতেছিলেন; তিনি সদ্যো-জাতা কন্যাকে পক্ষিবেষ্টিতা দেখিয়া স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন। আমিই সেই কন্যা। মহর্ষি কণ্বকে আমি পিতৃ-সম্বোধন করিয়া থাকি। শকুন্তসমূহকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলাম বলিয়া পিতা আমার নাম শকুন্তলা রাখিলেন।" শকুন্তলার পরিচয় পাইয়া রাজা বুঝিলেন, শকুন্তলা রাজপুত্রী, যেহেতু বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া মহর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন। রাজা স্বয়ংই শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, শকুন্তলা কণ্বের আগমন প্রতীক্ষা করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, শাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ; এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে। এ বিষয়ে আর অন্যের অনুমতির অপেক্ষা কি? শকুন্তলা শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু তাঁহার গর্ভজাত সন্তান রাজা হইবেন বলিলেন। যথারীতি উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইল। কণ্বের আগমনের পূর্ব্বে রাজা আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন; শকুন্তলাকে রাজধানীতে নেওয়ার জন্য চতুরঙ্গ সৈন্য প্রেরিত হইবে, এই কথা বলিয়া গেলেন। কণ্ব আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া শকুন্তলার বিবাহ বৃত্তান্ত শুনিলেন, শুনিয়া সুখী হইলেন। শকুন্তলা গর্ভবতী হইলেন; যথাকালে তিনি এক অলৌকিক রূপ-সম্পন্ন কুমার প্রসব করিলেন। কুমারের বয়ঃক্রম তিন বৎসর পূর্ণ হইলে কণ্ব যথাশাস্ত্র তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলেন। সেই পুত্র ৬ বৎসর বয়সে বন্য সিংহব্যাঘ্রাদিকে আশ্রমস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিতেন এজন্য আশ্রমস্থ তাপসগণ তাহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি বালকের নাম সর্ব্বদমন হইল। মহর্ষি কণ্ব সর্ব্বদমনের অসাধারণ বল বিক্রম দর্শনে শকুন্তলাকে বলিলেন "তোমার পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময় উপস্থিত, এখন আর তোমার এ স্থানে থাকা উচিত নহে।" এই বলিয়া পুত্রবতী শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে রাজা দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণের জন্য শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। কণ্বশিষ্যগণ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সপুত্র শকুন্তলাকে অর্পণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু রাজা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না; শকুন্তলা সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহার স্মরণ হইতেছে না। শকুন্তলা পতির মুখে এই বজ্রপাতসদৃশ

বাক্য শুনিয়া লজ্জিত হইলেন ও দুঃখে চিত্রপুত্তলিকাপ্রায় বিচেতন হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইল; ক্রোধে অভিমানে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাজাকে অতি তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ যুক্তিতর্কের বিনিময় হইতে লাগিল; মন্ত্রিগণ ও পুরোহিত মণ্ডলী নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহাদের আলাপ শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল "শকুন্তলা সত্যই কহিতেছেন, তুমিই এই পুত্রের জনক; তুমি শকুন্তলাসম্ভূত পুত্রকে প্রতিপালন কর। যেহেতু আমাদের উপরোধে তোমার পুত্রকে ভরণ করা আবশ্যক হইল এই নিমিত্ত ইনি ভরতনামে খ্যাত হইবেন।" দৈববাণী শুনিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। রাজা পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন, আমিও এই কুমারকে আমারই আত্মজ বলিয়া জানি," কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী বলিবে এবং পুত্রটী কলঙ্কী হইবে; এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম।" (মহাভা-আদি ৭ অ)। কিন্তু কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলায় গল্পাংশ ইহা হইতে একটু ভিন্ন। অভিজ্ঞানশকুন্তলায় দুষ্মন্তের বিস্মৃতি দুর্ব্বাসার শাপজনিত, উহা লোকলজ্জাভয়জনিত বিস্মৃতির ভাণ নহে। কালিদাসের গ্রন্থে গর্ভবতী শকুন্তলা কণ্বকর্তৃক দুষ্মন্তের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, সপুত্রা শকুন্তলা নহে। কালিদাসের নাটকে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন; মরীচি মুনির আশ্রমে শকুন্তলার প্রসব হয়, তথায় সর্ব্বদমন জন্ম লাভ করেন। ঘটনা ক্রমে দুষ্মন্ত এই মারীচ আশ্রমে উপস্থিত হন ও শকুন্তলার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মারীচের অনুরোধে দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও সর্ব্বদমনকে লইয়া রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করেন। (কণ্ব দেখ)।

দূষণ—লঙ্কেশ্বর রাবণের সেনাপতি বিশেষ। ইঁহার অপর ভ্রাতার নাম খর। রাবণের রাজ্য গোদাবরী তীরস্থ দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; খর ও দূষণনামে সেনাপতিদ্বয় চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যসহ এই রাজ্যের প্রান্তসীমা রক্ষা করিতেছিলেন। রাবণের ভগিনী শূর্পণখা এই বনে বিচরণ করিতেন। সীতাসহ রাম লক্ষ্মণের এই দণ্ডকারণ্যস্থ পঞ্চবটীবনে অবস্থানকালে শূর্পণখা মদনার্দ্দিত হইয়া রামকে বন্দনা করেন। এই ঘটনায় রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে শূর্পণখার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। শূর্পণখা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া খরদূষণের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহারা শূর্পণখার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সসৈন্য রামকে আক্রমণ করেন। দূষণ পঞ্চ সহস্র সেনার অধিনায়ক। সমস্ত সৈন্যসহ খর ও দূষণ রাম লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। অকম্পন-নামে এক রাক্ষস এই দুঃসংবাদ লইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হন।

দেবক—ভোজবংশীয় আহুকের পুত্র। ইঁহার ভ্রাতা উগ্রসেন এবং কন্যা দেবকী। দেবক শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ। (আহুক দেখ)।

দেবকী—শ্রীকৃষ্ণের মাতা। (দেবক দেখ)।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং নহুষাত্মজ রাজা যযাতির পত্নী। ইনি ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করেন। (কচ দেখ)। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীর সৌহৃদ্য ছিল। একদা উভয়ে সহচরীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়ায় রত ছিলেন এমন সময়ে ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সরোবর তটস্থিত পরিধেয় বস্ত্রগুলি একত্র করিয়া দেন। শর্ম্মিষ্ঠা জল হইতে উঠিয়া ভ্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিয়া ফেলিলেন। এই বস্ত্র পরিবর্ত্তন ব্যাপার লইয়া উভয়ে অত্যন্ত কলহ হয়। শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধভরে দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য্যকে অসুরের স্তুতিপাঠক বলিয়া গালি দেন এবং দেবযানীকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করেন। ঘটনা ক্রমে রাজা যযাতি কূপের সন্নিধানে উপস্থিত হন; তিনি কূপ মধ্যে রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত কূপের পার্শ্বে উপস্থিত হন এবং দেবযানীকে উত্তোলন করেন। দেবযানী যযাতির নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন; রাজা তাহাকে সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। কূপ হইতে উত্থিত হইয়া দেবযানী আর গৃহে প্রতিগমন করিলেন না, তিনি দৈত্যনগরে

আর প্রবেশ করিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন। একজন দাসীকে পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার দুর্দশা ও সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। শুক্রাচার্য্য দুহিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং প্রিয়তমা কন্যার কথা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বাকে দৈত্যনগর ত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বৃষপর্ব্বা মহাবিপদ্ দেখিয়া গুরুকে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুনয় করিতে লাগিলেন। গুরু দৈত্যরাজকে বলিলেন "তুমি দেবযানীর সন্তোষ বিধান কর; যদি আমার কন্যা তোমার নগর ত্যাগ না করে, তবে আমিও ত্যাগ করিব না।" বৃষপর্ব্বা দেবযানীর নিকট যাইয়া নানা প্রকার অনুনয় আরম্ভ করিলেন। দেবযানী বলিলেন "যদি তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র দাসী লইয়া আমার দাসত্ব করে, এবং আমার বিবাহের পরও যদি সে আমার সঙ্গে আমার দাসীভাবে আমার স্বামীর আলয়ে যায়, তবে আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারি।" দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা দেবযানীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; দেবযানীও স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র দাসী পরিবৃত হইয়া দেবযানীর সেবা করিতে শুক্রাচার্য্যের গৃহে আসিলেন। একদা দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা ও সহস্র দাসীসহ পূর্ব্বোক্ত সন্নিহিত বনে বিচরণ করিতেছিলেন এমন সময় যযাতি তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবযানী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন; শুক্রাচার্য্য বিবাহে সম্মতি দিলেন; যযাতি ঐ বনবিভাগেই দেবযানীকে বিবাহ করিয়া দৈত্যরাজপ্রদত্ত বহু উপঢৌকনসহ দাসীগণপরিবৃত দেবযানীকে লইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং দাসী শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবযানী দেখিলেন, তাঁহার স্বামী অধর্ম্মাচারী হইয়া দাসীতে উপগত হইয়াছেন এবং দাসীগর্ভে অধিক সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। দেবযানী স্বামীর এই ব্যবহার অপমানজনক মনে করিয়া পিতার নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে এই অভিশাপ দেন, "যেহেতু তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অধর্ম্ম আচরণ করিতেছ, এইজন্য তুমি অকালে বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইবে।" যযাতি শুক্রাচার্য্যের সমীপে বহু অনুনয় করেন; দৈত্যগুরু একটু প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন "আমার শাপ ব্যর্থ হইবার নহে; কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার জরা গ্রহণ করে, তবে তুমি তাহাতে জরাসংক্রান্ত করিয়া পুনর্ব্বার যৌবন লাভ করিতে পারিবে।" যযাতি পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া জরাগ্রহণে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠাগর্ভজাত পুরুব্যতীত সকলেই পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। যযাতি পুরুতে জরাসংক্রামিত করিলেন এবং তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন।

দেবল—অসিতমুনির পুত্র ব্যাসদেবের শিষ্য। ইনি রম্ভার শাপে অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন। (অষ্টাবক্র দেখ)।

দেববর্ণিনী—ভরদ্বাজ মুনির কন্যা ও বিশ্রবার পত্নী। বিশ্রবা ইঁহার গর্ভে বৈশ্রবণ নামে পুত্র উৎপাদন করেন। বৈশ্রবণের অপর নাম কুবের। ইনি দেবতাদের ধনাধ্যক্ষ। প্রথমে লঙ্কা ইঁহার রাজধানী ছিল, পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণকে লঙ্কাপুরী অর্পণ করিয়া নিজে হিমালয়ের উত্তরে অলকাপুরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। (কুবের দেখ)।

দেবসেনা—সাবিত্রী-গর্ভজাত প্রজাপতির কন্যা। ইঁহার অপর নাম ষষ্ঠী; ইনি মাতৃকাশ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় ইঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা।

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ও কর্দ্দম প্রজাপতির ভার্য্যা। বিখ্যাত সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কপিল ইঁহার গর্ভজাত পুত্র। কপিলব্যতীত ইঁহার ৯টী কন্যাও আছে। (হরিবংশ—বিষ্ণু পুঃ), (কর্দ্দম ও কপিল দেখ)।

দৈত্যসেনা—প্রজাপতির কন্যা ও দেবসেনার ভগিনী। (দেবসেনা দেখ)। ইনি কেশী নামক দানবের ভার্য্যা। কেশী ইঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। (মহাভারত—বন)

দ্যুমৎসেন—শাল্বদেশের রাজা। ইঁহার পুত্রের নাম সত্যবান্ ও পুত্রবধূ সাবিত্রী। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ দ্যুমৎসেন অন্ধ হইয়া পড়েন। কতকগুলি কুচক্রী মিলিত হইয়া দ্যুমৎসেনকে রাজচ্যুত করে। দ্যুমৎসেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহিষী শৈব্যা ও একমাত্র পুত্র সত্যবানের সহিত অরণ্য আশ্রয় করেন। একদা মদ্রদেশাধিপতি এই বনে আগমন করেন এবং সত্যবানের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। সত্যবান্ অল্পায়ু ছিলেন;

অচিরেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। সাবিত্রী যমরাজকে পাতিব্রত্যে বিমোহিত করিয়া যমের নিকট হইতে কয়েকটী বর গ্রহণ করেন। বরগুলির প্রভাবে শ্বশুর দ্যুমৎসেন চক্ষুলাভ করেন ও রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন এবং সত্যবান্ পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। দ্যুমৎসেন যথাকালে সত্যবানের উপর রাজ্যভার দিয়া পত্নীসহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (মহাভারত বন ও শান্তি), (সত্যবান ও সাবিত্রী দেখ)।

দ্রুপদ—চন্দ্রবংশীয় পৃষত নামক রাজার পুত্র। রাজা পৃষতের সহিত ভরদ্বাজ ঋষির বন্ধুতা ছিল। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ ও ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ সমবয়স্ক। দ্রুপদ অনেক সময় ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া দ্রোণের সহিত খেলা করিতেন। দ্রুপদ ও দ্রোণে সৌহার্দ্দ জন্মিল। কিয়ৎকাল পরে রাজা পৃষতের মৃত্যু হইলে দ্রুপদ উত্তর পঞ্চালের অধীশ্বর হইলেন। মহাভারতের সময় পঞ্চাল দুইভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চাল বর্ত্তমান রোহিলখণ্ড; ইহার প্রাচীন রাজধানী অহিচ্ছত্রা। দক্ষিণ পঞ্চাল গঙ্গা যমুনার অন্তর্গত দোয়াব; ইহার প্রাচীন রাজধানী কাম্পিল্য নগর। কালক্রমে ভরদ্বাজের তিরোভাব হইলে দ্রোণ তপস্যায় রত হন। দ্রুপদ রাজা হইয়া ঋষিপুত্র দ্রোণের সৌহার্দ্দ ভুলিয়া যান। দ্রোণ পূর্ব্বসৌহার্দ্দ স্মরণ করাইয়া দ্রুপদের নিকট উপস্থিত হন। দ্রুপদ অভিমানবশতঃ নির্ধন ঋষিপুত্রের সহিত বন্ধুতা করিতে অসম্মত হন। কিছুকাল পরে দ্রোণ কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। দ্রুপদকৃত অপমান দ্রোণের স্মরণ ছিল। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি যথারীতি অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিলে, দ্রোণ অর্জ্জুনকে পঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ-পূর্ব্বক দ্রুপদকে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ দেন। দ্রোণাচার্য্য শিক্ষকপদগ্রহণের সময় অর্জ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চাল অবরোধ করিয়া অমাত্যগণসহ দ্রুপদকে বন্দী করিয়া আনেন। দ্রোণ দ্রুপদকে পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করাইয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন; এটা বলপূর্ব্বক সখ্য হইল; দ্রুপদ এই সখ্য নিতান্ত অপমানজনক মনে করিলেন এবং এই অবমাননার প্রতিশোধের জন্য তিনি দ্রোণহন্তা পুত্রলাভের কামনা করেন। কিরূপে এই পুত্রলাভ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরে যাজ ও উপযাজ নামে দুই তপোবলসম্পন্ন ব্রহ্মপরায়ণ স্নাতক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দ্রুপদ বহুচেষ্টায় ইঁহাদিগকে পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন; ইঁহাদের দ্বারা এক যজ্ঞ করাইয়া তাহাতে দ্রোণনাশক এক পুত্র উৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। যাজ ও উপযাজ রাজাকে আশ্বাস দিলেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন (ধৃষ্ট=প্রগল্ভ; দ্যুম্ন=কবচকুণ্ডল) নামক পুত্র জন্মে এবং যজ্ঞবেদী হইতে যাজ্ঞসেনী নামধেয়া ভাবী দ্রৌপদী সমুদ্ভূতা হন। দ্রৌপদীর বর্ণ শ্যাম বা কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণা রাখা হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে দ্রুপদ হত হন এবং দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধ সাধন করেন। দ্রুপদের অপর সন্তান নপুংসক ভাবাপন্ন শিখণ্ডী মহারথ ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। (মহাভারত—আদি—দ্রোণ)।

দ্রোণ—ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র। ভরদ্বাজের আশ্রম গঙ্গার নিকট অবস্থিত ছিল। একদিন ভরদ্বাজ গঙ্গাস্নানে যাইতে-ছিলেন; তখন তিনি ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে স্নান করিয়া উঠিতে দেখিলেন। বিগলিতবসনা ঘৃতাচীকে দেখিয়া ঋষি কামার্ত্ত হইলেন। ঋষির রেতঃস্খলন হইল; উহা তিনি দ্রোণ নামক যজ্ঞীয় পাত্রে ধারণ করিলেন। এই রেত হইতে এক পুত্রের জন্ম হইল। ভরদ্বাজ দ্রোণপাত্রে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম দ্রোণ রাখিলেন। ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ্যনামক ঋষিকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। দ্রোণ অগ্নিবেশ্যের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। অগ্নিবেশ্য গুরুপুত্র ও নিজ শিষ্য দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন। (অগ্নিবেশ্য দেখ)। পূর্ব্বকালে নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র যুদ্ধকার্য্যে প্রযুক্ত হইত। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে "নালীক" যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "নালীকৈস্তাড়য়ামাস।" (রামা—উত্তর)। নালীক যন্ত্রের আকার ও কার্য্য পাঠ করিলে ইহা বর্ত্তমান কালের বন্দুক ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।

"তুলা গুড়া" নামক আর একপ্রকার আগ্নেয় যন্ত্র ছিল। ইহা তুলা নামক পরিমাণ দণ্ডের আকারবিশিষ্ট এবং গোলক-নিক্ষেপক একটী পাত্র। ইহা আগ্নেয় দ্রব্যবলে নিক্ষিপ্ত হয়, বায়ু উৎপাদন করে, ভয়ঙ্কর মেঘধ্বনির ন্যায় শব্দ উৎপাদন করে এবং ইহা চক্রযুক্ত (চাকা বিশিষ্ট)।

"তথৈবাসনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা॥" (মহাভারত—বন)

উপরি উক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে এই বৃহন্নালীক তুলাগুড়া যন্ত্রটীকে বর্ত্তমান সময়ের কামান হইতে অভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হয়।

এই সমুদয় অস্ত্র দেবতাগণ ও অস্ত্রশাস্ত্রে নিপুণ আর্য্যগণ ঘৃণা করিতেন, যেহেতু তাঁহারা উক্ত অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করায় কোন পৌরুষ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা উহাকে কূট যুদ্ধের উপকরণ মাত্র মনে করিতেন। কূট যুদ্ধ তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল। যে যুদ্ধে শারীরিক বলের প্রকাশ হয়, সেই যুদ্ধই তখন প্রশস্ত ছিল। বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিতেছেন, "হে মহারাজ, কলি কালের পৌরুষহীন অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময় মদুক্ত গুলিকা নিক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তরক্ষেপক যন্ত্র এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্র সকল কূট যুদ্ধের উপকরণ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক কূটযুদ্ধ ও তদুপযোগী অস্ত্রের আশ্রয় লইবে।"

"যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপকানিচ।
তথা চোপল যন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণি চ॥
কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা চৈতানি ভবিষ্যন্ত্যুত্তরোত্তরম্॥" (ধনুর্ব্বেদ—৫ম অ)।

যাঁহারা মনে করেন, যীশুখৃষ্টের জন্মের-পূর্ব্বে বারুদের প্রচলন ছিল না, তাঁহারা এই সমুদয় বিষয় একটু ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

প্রাচীন কালে লোকেরা কূট যুদ্ধ করিতেন না বলিয়া নালীকাদি যন্ত্র পরিত্যক্তপ্রায় ছিল; কিন্তু দুর্গাদির রক্ষণে এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। রামায়ণে রাবণের দুর্গ বর্ণন এবং মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গ বর্ণন পাঠ করিলে এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

দ্রোণের সহিত দ্রুপদের মিত্রতা ছিল; কোন কারণ বশতঃ এই সখ্যের ভঙ্গ হয়। (দ্রুপদ দেখ)। দ্রোণ, পিতার আজ্ঞানুসারে শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহকালে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। অশ্বত্থামা জন্মসময়ে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত শব্দ (স্থাম) করিয়াছিলেন, এজন্য উহার ঐরূপ নাম হয়। দ্রোণ, মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইয়া ভার্গব পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ লইয়া আসেন।

অর্জ্জুন গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে দ্রোণ বলিলেন "দেখ অর্জ্জুন, আমি তোমার সহিত কোন সময়ে যদি যুদ্ধে রত হই, তবে তুমিও আমার সহিত প্রতিযুদ্ধে লিপ্ত হইবে, কোন প্রকার সঙ্কোচ করিবে না।" অর্জ্জুনের এই প্রতিশ্রুতিই তিনি গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করেন। এই প্রতিশ্রুতি হেতুই অর্জ্জুন ভারতযুদ্ধে গুরুর সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, নচেৎ দ্রোণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন কখনই একার্য্যে লিপ্ত হইতেন না। ভারতযুদ্ধে দ্রোণ যখন অর্জ্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তিনি হতজ্ঞান হন (অশ্বত্থামা দেখ)। এই অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণের রথে প্রবেশ করিয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদন করেন।

দ্রৌপদী—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদীসম্ভবা কন্যা। (দ্রুপদ দেখ)। বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ইঁহার অপর নাম কৃষ্ণা। স্বয়ংবর স্থানে অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া ইঁহাকে লাভ করেন এবং পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া ইঁহাকে বিবাহ করেন। ইনি পতিগণের সহিত বনচারিণী হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজগৃহে ইনি সৈরিন্ধ্রী (দাসী) বেশে ছিলেন। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন সভাস্থলে ইঁহাকে অপমানিত করেন; ভীম কুরুক্ষেত্র সমরে এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

ভারতযুদ্ধের অবসানে ইনি পতিগণের সহিত কিছুকাল সুখশান্তিতে বাস করিয়াছিলেন। পতিগণের মহাপ্রস্থানের সময়ে ইনি তাঁহাদের সহিত গমন করেন ; এবং তুষারাচ্ছন্ন হিমগিরিতে অগ্রে ইঁহারই পতন হয়।

দ্বিবিদ—বানরবিশেষ। দেববিরোধী নরকাসুরের সহিত ইহার সখ্য ছিল। বলদেব ইহাকে নিহত করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

দ্বৈপায়ন—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেখ।

ধ

ধনপতি—(১) কুবেরের নামান্তর। (কুবের দেখ)।

(২) দেহস্থিত বায়ুবিশেষ। এই বায়ু ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহারই আদেশে মূর্ত্তিবিশিষ্ট এবং ধনপতি নামে আখ্যাত হয়। এই মূর্ত্তিই ব্রহ্মার আদেশে দেবতাদিগের ধন রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়। (বামন পুরাণ)

ধন্বন্তরি—(১) দেববৈদ্যবিশেষ ; সমুদ্রমন্থনে ইঁহার উৎপত্তি। দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলে ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ সমুদ্র মন্থন করেন এবং তথা হইতে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। এই সমুদ্র মন্থনে নানাবিধ পদার্থ লাভ হয়। এই মন্থনে মন্দর পর্ব্বত মন্থনদণ্ড, বিষ্ণুরূপী কূর্ম্ম মন্দরের অধিষ্ঠান এবং বাসুকি মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। এই মন্থনে প্রথমে চন্দ্র তৎপর ক্রমে লক্ষ্মী, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, অমৃত হস্তে ধন্বন্তরি এবং সর্ব্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে—ধন্বন্তরি তৎপর ক্রমে সুধা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, সুদর্শন চক্র এবং সর্ব্বশেষে লক্ষ্মী। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে প্রথমে বিষ তৎপর ক্রমে বারুণী, পারিজাত, অপ্সরাগণ, চক্র, বিষ, অমৃত সহিত ধন্বন্তরি ও সর্ব্বশেষে লক্ষ্মী। মৎস্য পুরাণমতেঃ—প্রথমে বিষ তৎপরে সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ, চন্দ্র, অমৃত সহিত ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী, অপ্সরা, সুরভি, পারিজাত ও সর্ব্বশেষে বারুণছত্র ও কর্ণাভরণ। ধন্বন্তরি মন্থনে উৎপন্ন হইয়া দেববৈদ্যরূপে গৃহীত হইলেন। ইনি বেদজ্ঞ এবং শঙ্করের শিষ্য (বিষ্ণু, মহাভা, ব্রহ্মবৈঃ, হরিবংশ)

(২) হরিবংশে ধন্বন্তরির উৎপত্তি ভিন্নরূপ। ইহাতে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হইলে পর, ইনি বিষ্ণুকে সম্মুখে পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, আমি আপনার পুত্র, আপনি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক আমার জন্য হোমভাগ বিধান করুন এবং আমার অবস্থানের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন"। বিষ্ণু কহিলেন, "বৎস দেবতারা হোম বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, এখন তোমার জন্য হোম বিভাগ করিতে আমার শক্তি নাই ; তুমি এজন্মে দেবতাদিগের পুত্র হইয়াছ, দ্বিতীয় জন্মে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হইবে এবং তুমি সেই শরীর দ্বারাই দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। তুমি আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত করিবে"। বিষ্ণু, ধন্বন্তরিকে এই বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

(৩) ভাব প্রকাশে লিখিত আছে যে, ধন্বন্তরি ইন্দ্রের অনুরোধে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীতে অবতীর্ণ হন। ইনি কাশীতে এক ক্ষত্রিয়গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিবোদাসনামে খ্যাত হন।. দিবোদাস কাশীর বিখ্যাত রাজা। দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীর লোকদিগকে নানা ব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়া স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরিকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কাশীতে দিবোদাসরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। দিবোদাস বহু তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার তৃপ্তি সাধন করেন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া দিবোদাসকে কাশীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি রাজা হইয়া লোক মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচার করেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'ধন্বন্তরি সংহিতা'।

ধর্ম্ম—ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়। বরাহপুরাণে ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন। চিন্তাপরায়ণ ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে এক পুরুষের (ধর্ম্মের) উৎপত্তি হইল। ইঁহার কর্ণে শ্বেত কুণ্ডল, গলে শ্বেত মাল্য ও অঙ্গে অনুলেপন। ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি চতুষ্পাদ বৃষতাকৃতি ; তুমি জ্যেষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন কর" এই ধর্ম্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে

ত্রিপাদ ও কলিতে একপাদ হইয়া প্রজাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণরূপে, ক্ষত্রিয়দিগকে তিনভাগে, বৈশ্যদিগকে দ্বিভাগে এবং শূদ্রদিগকে একভাগ দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটী ধর্ম্মের পাদ। বেদে ইঁহার নাম বৃশৃঙ্গ; ইঁহার মস্তক দুইটী ও হস্ত সাতটী। একাদশী তিথিতে ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত; এই তিথিতে ধর্ম্মোদ্দেশে যাঁহারা উপবাস করেন, তাঁহারা পাতক হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

বামন পুরাণ মতে ধর্ম্মের ভার্য্যা অহিংসা। অহিংসার গর্ভে ধর্ম্মের ৪টী পুত্র জন্মে—সনৎকার, সনাতন, সনক, সনন্দ। পুরাণান্তরে ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করিলে পর ধর্ম্ম প্রপীড়িত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। তদবধি সেই অরণ্য ধর্ম্মারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে।

ধর্ম্মধ্বজ—মিথিলার জনকবংশীয় এক রাজা। দণ্ডনীতি, বেদ ও মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পণ্ডিত্য ছিল। একদা সুলভানাম্নী এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন করেন এবং ধার্ম্মিক মহাত্মগণের মুখে ধর্ম্মধ্বজের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মিথিলায় উপস্থিত হন। ধর্ম্মধ্বজের মোক্ষধর্ম্মের অধিকার হইয়াছে কি না ইহা পরীক্ষার্থ নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া এক মনোহর স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ভিক্ষাগ্রহণের ছলে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মধ্বজ ও সুলভাতে বহুক্ষণ ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ হইল। রমণীর মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ শুনিয়া ধর্ম্মধ্বজকে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। (মহাভারত শান্তি)

ধর্ম্মপুত্র—যুধিষ্ঠিরের নামান্তর। দুর্ব্বাসাপ্রাপ্ত মন্ত্রপ্রভাবে কুন্তী ধর্ম্মকে (যমকে) আকর্ষণ করেন। ধর্ম্ম কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেন। (দুর্ব্বাসা ও কুন্তী দেখ)।

ধর্ম্মব্যাধ—একদা কৌশিক নামে এক বেদজ্ঞ তপস্বী ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষমূলে আসীন হইয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে এক বকী বৃক্ষ হইতে তাহার গাত্রে পুরীষোৎসর্গ করে। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বকীর দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র বকী গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ইহাকে মৃত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তিনি ভিক্ষার নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক গৃহস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হন। গৃহিণী ব্রাহ্মণকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিক্ষানয়নার্থ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পতি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন; পতিকে সমাগত দেখিয়া গৃহিণী পতিসেবায় রত হইলেন; তিনি বহির্বাটীতে যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে গৃহিণীর স্মরণ হওয়ায় তিনি ভিক্ষাসামগ্রী লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ রমণীর ভিক্ষা দিতে বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; রমণী উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন এবং শাপ দেওয়ার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। গৃহিণী বলিলেন, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা মাপ করুন; আমি পতি সেবায় নিযুক্ত ছিলাম; স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা। আর আপনি যে আমাকে অভিশাপের ভয় দেখাইতেছেন, তাহাতে আমি ভীত নহি। আমি বকী নহি! আপনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আপনার ধর্ম্মতত্ত্ব অধিগত হয় নাই। যদি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে মিথিলা দেশে এক ধর্ম্মব্যাধ আছেন, তাঁহার নিকট গমন করুন। ব্রাহ্মণ, রমণীর বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ লাভার্থ মিথিলায় চলিলেন। মিথিলায় গমন করিয়া দেখিলেন, সেই তপস্বী ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিতেছেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্যাধ সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে আপনি এক ব্রাহ্মণীর কথানুসারে আমার নিকট আসিয়াছেন; চলুন, আমার গৃহে আসুন। কৌশিক ইঁহার বাক্যে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি এই ধার্ম্মিক পুরুষকে এই বীভৎস কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার জন্য নিন্দা করিলেন। ব্যাধ বলিলেন, যে এই মাংস বিক্রয় আমার পিতৃপিতামহাগত কার্য্য; বিধাতা পূর্ব্বেই আমার এই বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন। ব্যাধ পূর্ব্বজন্মে এক বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন; কোন রাজার সহিত মৃগয়া করিতে যাইয়া এক মৃগরূপী তপস্বীকে বাণবিদ্ধ করেন। তাহার শাপে ব্রাহ্মণ জাতিস্মর ব্যাধরূপে শূদ্রযোনিতে জন্ম লইলেন।

ধুন্ধু—রাক্ষস বিশেষ। এই পরাক্রান্ত রাক্ষস প্রসিদ্ধ মধু রাক্ষসের পুত্র। (মধু ও কৈটভকে বিষ্ণু সংহার করেন)। এই রাক্ষস উতঙ্ক মুনির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী এক বালুকাময় সমতল ক্ষেত্রে বাস করিত। লোকনাশের নিমিত্ত এই রাক্ষস মরুক্ষেত্রে শয়ান হইয়া কঠোর তপস্যা করে। এক বৎসর শ্বাসরোধ করিয়া পরে এক দিন শ্বাস ত্যাগ করে; এই শ্বাস ত্যাগের সময় বন, পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠে; ধূলিরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করে। এই রাক্ষসকে দেবতাগণও ভয় করিয়া থাকেন। রাজা বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব ইহাকে বধ করেন। বৃহদশ্ব পুত্রকুবলয়াশ্বের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহর্ষি উতঙ্কের অনুরোধে কুবলয়াশ্ব পুত্রগণসহ ধুন্ধুকে আক্রমণ করেন। ধুন্ধুর সহিত যুদ্ধে রাজা কুবলয়াশ্বের শত পুত্র মধ্যে ৯৭ জন বিনষ্ট হইল। পুত্রগণের বিনাশ দেখিয়া কুবলয়াশ্ব প্রবলবেগে ধুন্ধুকে আক্রমণ করিয়া বধ করেন। ধুন্ধুকে বধ করিয়া কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। (কুবলয়াশ্ব দেখ)।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক বিদ্যা। ইঁহার উৎপত্তি বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে:- একদা পার্ব্বতী ক্ষুধাক্লিষ্ট হইয়া মহাদেবের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু মহেশ্বর খাদ্যদানে অসমর্থ হন। তখন ক্ষুৎকাতরা পার্ব্বতী ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মহাদেবকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। ইহাতে পার্ব্বতীর শরীর হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তদবধি তিনি ধূমাবতী নামে খ্যাত হইলেন। তখন মহাদেব মায়া দ্বারা শরীর কল্পিত করিয়া বলিলেন "দেবী যখন তুমি আমাকে ভোজন করিয়াছ, তখন তুমি বিধবা হইয়াছ; অতএব তোমাকে বিধবা বেশে থাকিতে হইবে; এই বেশেই তুমি লোকের পূজনীয়া হইবে; এবং তোমার নাম ধূমাবতী হইবে।" কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী-তিথিতে পুরশ্চরণসিদ্ধির জন্য ধূমাবতীর মন্ত্র জপ করা হইয়া থাকে।

ধূম্রলোচন—দানবেন্দ্র শুম্ভের সেনাপতি। ইঁনি দানবকর্ত্তৃক ৬০ হাজার সেনা পরিবৃত হইয়া ভুবনমোহিনী রূপধারিণী মহামায়াকে ধরিতে প্রেরিত হন। মহামায়া হুঙ্কারে ৬০ সহস্র সৈন্যসমেত ধূম্রলোচনকে বধ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র—(১) শান্তনুনন্দন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। ইঁহার জননী কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা। কাশীরাজের অপর এক কন্যা অম্বালিকাও বিচিত্রবীর্য্যের সহিত পরিণীতা হন। অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হওয়াতে তদীয় জননী সত্যবতী বংশলোপাশঙ্কায় চিন্তিত হইলেন এবং স্বীয় কানীনপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্মরণ করিলেন। ব্যাসদেব উপস্থিত হইলে সত্যবতী পুত্রবধূ-দ্বয়ের (অম্বালিকা ও অম্বিকার) গর্ভসঞ্চারে অনুমতি দিলেন। সঙ্গমের সময় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন এবং অম্বিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এজন্য অম্বিকার গর্ভজাত সন্তান অন্ধভাবাপন্ন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রনামে লোকে পরিচিত হইলেন। অম্বিকার গর্ভজাত সন্তান অন্ধভাবাপন্ন হইবে, ব্যাসদেব ইহা সত্যবতীকে বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের পর, সত্যবতী পুত্রবধূ অম্বিকাকে পুনরায় ব্যাসের সহিত সঙ্গত হইতে বলেন। অম্বিকা শাশুড়ীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে ভীত হইলেন অথচ ব্যাসদেবের নিকট যাইতেও তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার দাসীকে স্বীয় বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া ব্যাসদেবের নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাসদেব ইঁহার গর্ভসঞ্চার করেন; এই গর্ভে মহাত্মা বিদুরের জন্ম হয়। (অণীমাণ্ডব্য দেখ)। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেন। ব্যাসদেবের বরে গান্ধারীর শতপুত্র হওয়ার কথা; তিনি গর্ভবতী হইয়া দুই বৎসর গর্ভধারণ করেন তথাপি কোন সন্তান হইল না; ইত্যবসরে তিনি শুনিতে পাইলেন কুন্তী তেজস্বী পুত্রত্রয় প্রসব করিয়াছেন, ইহাতে তিনি ঈর্ষ্যা-পরায়ণ হইয়া স্বীয় উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার গর্ভ হইতে লৌহপিণ্ড সদৃশ এক মাংসপিণ্ড প্রসূত হইল; গান্ধারী ইহা দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। এই মাংসপিণ্ড ব্যাসের পরামর্শে জলে ধৌত করাতে শতখণ্ডে বিভক্ত হইল; এই খণ্ডগুলি ঘৃতপূর্ণ শতকলসে যত্নপূর্ব্বক রাখা হইল। দুই বৎসর পরে এই সকল মাংসখণ্ড হইতে প্রথমে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ

করিতে লাগিলেন। তখন নানাদিকে অমঙ্গল চিহ্নসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাজ্ঞানী বিদুর ইহাকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিদুরের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেন না। অনন্তর এক মাসের মধ্যে অপর ৯৯টী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। এই কন্যার নাম দুঃশলা। গান্ধারী যখন দীর্ঘকাল গর্ভধারণ করিয়া ক্লেশ পাইতে ছিলেন, তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সেবার জন্য বৈশ্যাজাতীয়া এক নারী নিযুক্ত হয়। ধৃতরাষ্ট্র এই বৈশ্যাতে আসক্ত হইয়া ইহার গর্ভসঞ্চার করেন। এই গর্ভে যুযুৎসু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। যুযুৎসু ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতে করণ জাতীয় হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বরে দ্রৌপদী পণে পরাজিত স্বামিগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে ভীমের হস্তে শতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে এক লৌহভীম অন্ধরাজের অঙ্কদেশে স্থাপিত হইল; অন্ধরাজ ক্রোধালিঙ্গনে লৌহভীমমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভারতযুদ্ধের অবসানে পাণ্ডুপুত্রগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত বন গমন করেন, কিন্তু ৬ মাস পরে বনে দাবানল প্রজ্বলিত হয়; বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পলায়নে অক্ষম হইয়া অনলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঞ্জয়ও বনে গিয়াছিলেন। সঞ্জয় পলায়নপূর্ব্বক অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করেন। (মহাভারত)

(২) নাগবিশেষ। ইনি কদ্রুর পুত্র। এই নাগের সহিত পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত মনোবাদ হইয়াছিল। অর্জ্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া মণিপুর গমন করেন; অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন অশ্বধারণ করাতে, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে অর্জ্জুন সসৈন্যে হত হন। অর্জ্জুনের নিধন সংবাদে বভ্রুবাহনজননী চিত্রাঙ্গদা বিলাপ করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনের নাগজাতীয়া পত্নী উলূপীও তথায় উপস্থিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। উলূপীর পরামর্শে ও জননীর আজ্ঞায় বভ্রুবাহন সঞ্জীবনমণি আনয়নার্থ পাতালে গমন করিলেন। উলূপী বলিয়াছিলেন, যে এই মণির সংস্পর্শে অর্জ্জুন জীবিত হইবেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র নাগের পরামর্শে বাসুকি মণিদানে অসম্মত হন; ইহাতে বাসুকির সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে বাসুকি পরাজিত হইয়া বভ্রুবাহনকে মণিদান করেন। বাসুকি মণিদান করিলেন দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় দুই পুত্রকে দ্রুতগতিতে রণস্থলে প্রেরণ করেন; এই পুত্রদ্বয় ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশানুসারে অর্জ্জুনের মস্তক কর্ত্তন করিয়া বকদাল্ভ্যের অধিষ্ঠিত এক অরণ্যে উহা নিক্ষেপ করেন। এদিকে অর্জ্জুনের দেহ মস্তকশূন্য দেখিয়া মণিপুরের রাজপুরীতে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদ্বয় নিহত হয়, মস্তকের উদ্ধার হয়, উহা অর্জ্জুন শরীরে সংযোজিত হয় এবং সঞ্জীবন মণির সংস্পর্শে অর্জ্জুন জীবিত হন। (জৈমিনী ভারত)

ধৃষ্টকেতু—চেদিপতি শিশুপালের তনয়। ইনি ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। (মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব)

ধৃষ্টদ্যুম্ন—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র ও পৃষতের পৌত্র। ইনি ভারতযুদ্ধে পুত্রশোকাতুর দ্রোণের মস্তকচ্ছেদন করেন এবং যুদ্ধের শেষ দিন রাত্রিকালে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অজ্ঞাতসারে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ইঁহাকে বিনাশ করেন। (মহাভারত), (দ্রুপদ দেখ)।

ধেনুক—অসুর বিশেষ। ইহার আকৃতি গর্দ্দভের ন্যায়। বলরামের হস্তে এই নরমাংসলোলুপ অসুর হত হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ধেনু চরাইতে চরাইতে এক তালবনে উপস্থিত হইলেন এবং তাল পাড়িতে লাগিলেন। এই বন ধেনুক রাক্ষসের অধ্যুষিত। ধেনুক তাল পতনের শব্দ শুনিয়া ইঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। বলরাম ইহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া তালবৃক্ষের উপর সবলে পাতিত করেন; এই আঘাতেই ধেনুকের মৃত্যু হয়। (শ্রীমদ্ভা—১০ম স্ক—১৫শ অ)

ধৌম্য—পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম দেবল। চিত্ররথের পরামর্শে পাণ্ডবগণ ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ইনি নারদের নিকট সূর্য্যদেবের এক স্তোত্র প্রাপ্ত হন; তিনি যুধিষ্ঠিরকে এই স্তব শিক্ষা দেন। যুধিষ্ঠির এই স্তবপ্রভাবে অক্ষয়স্থালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহাভারত)

ধ্রুব—রাজা উত্তানপাদের পুত্র। পুরাকালে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র ছিল। রাজা উত্তানপাদের দুই মহিষী:—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচি রাজার অধিকতর প্রিয় ছিলেন। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব ও সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে রাজার দুই পুত্র জন্মে। একদা রাজা উত্তানপাদ সুরুচি গর্ভজাত পুত্র উত্তমকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ধ্রুব তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার ক্রোড়ে উঠিতে অভিলাষ করিলেন। গৌরব-শালিনী সুরুচি সপত্নীপুত্রকে রাজার ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছুক দেখিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি সুনীতির গর্ভসম্ভূত, আমার উদরজাত নহ, তুমি বৃথা এই উচ্চাভিলাষ করিতেছ, ; এই রাজাসন আমার গর্ভজাত পুত্রেরই যোগ্য, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে।" বিমাতার এইরূপ দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে ধ্রুব জননীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। সুনীতি ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ধ্রুব মায়ের নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। সুনীতি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সস্নেহসম্বোধনপূর্ব্বক পুত্রকে কহিলেন, "বৎস, এবিষয়ে অন্যের অপরাধ লইও না, যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয়, সে আপনার প্রদত্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। আর দেখ, সুরুচি সত্যকথাই বলিয়াছে, তুমি দুর্ভগা আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমার স্তন্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ, ইহাতে কি প্রকারে রাজাসন পাইবে? সুরুচি পুণ্যবতী, সে পুণ্যের ফলে রাজার অতিশয় প্রেয়সী হইয়াছে। অতএব তুমি শান্ত হও, বর্ত্তমান অবস্থাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদি সুরুচির বাক্য তোমার একান্তই অসহ্য হইয়া থাকে, তবে তপস্যা দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ে মনোনিবেশ কর। তোমার মন সর্ব্বদা ধর্ম্মে স্থাপন কর, নিবিষ্টমনে ভগবানের আরাধনা কর, সর্ব্বদা প্রাণিহিতে রত থাক, তাহা হইলে অনায়াসেই উত্তমের ন্যায় সম্পদ্‌শালী হইতে পারিবে। বৎস, সেই পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান ব্যতীত অন্য কেহ তোমার দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইবে না।" জননীর এই প্রকার বিলাপ ও সার্থক-বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব তাঁহাকে বলিলেন, "জননি, আপনি যে সমুদয় কথা বলিলেন, তাহা বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণ বিদারিত আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না। আমি কঠোর তপস্যা করিয়া এমন স্থান লাভ করিতে চেষ্টা করিব, যাহা আমার পিতাও কখন পান নাই।" এই বলিয়া ধ্রুব মায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্রমাগত পূর্ব্ব দিকে গমন করিতে করিতে মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষির (লিঙ্গ পুরাণ মতে বিশ্বামিত্রের ও ভাগবতের মতে নারদের) সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাদের নিকট ধ্রুব সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহারা ধ্রুবের অল্প বয়স দেখিয়া এবং তাঁহার এই দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। ধ্রুব বিষ্ণুর আরাধনার প্রণালী অবগত নহেন; সপ্তর্ষিগণ তাঁহাকে বিষ্ণুমন্ত্র শিক্ষা দিয়া ইহা জপ করিতে উপদেশ দিলেন। ধ্রুব মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যমুনাতীরে মধুনামক পুণ্যবনে তপস্যার্থ গমন করেন। রামায়ণপ্রসিদ্ধ শত্রুঘ্ন, এই স্থানে মধুরাক্ষসের পুত্র লবণকে বধ করিয়া মধুরানামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ধ্রুবের তপস্যায় ভীত হইয়া তপোভঙ্গের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই বিফলমনোরথ হইলেন। তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া বরদানার্থ ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব বিষ্ণুর নিকট অভিলষিত বর লাভ করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। উত্তানপাদ ভগবদ্ভক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। অতঃপর ধ্রুব শিশুমার তনয়া ভ্রমিকে বিবাহ করেন; ধ্রুবের অপরা ভার্য্যার নাম ইলা। ভ্রমির গর্ভে কল্প ও বৎসর এবং ইলার গর্ভে উৎকল এই পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়। ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া যক্ষকর্ত্তৃক হত হন। (উত্তম দেখ)। ধ্রুব এইজন্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। যক্ষরাজ কুবেরের অনুরোধে পিতামহ মনু ধ্রুবকে যুদ্ধে নিরস্ত হইতে বলাতে ধ্রুব কুবেরের নিকট বরলাভ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। ধ্রুব ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া বিষ্ণুদত্ত স্বনামখ্যাত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

(শ্রীমদ্ভা—বিষ্ণু পুঃ—লিঙ্গ পুঃ)।

নকুল—পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। পাণ্ডুর মহিষী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইঁহার জন্ম। পাণ্ডু

শাপগ্রস্ত হইয়া পত্নীদ্বয়সহ বনে বাস করেন, এই সময়ে দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্রপ্রভাবে কুন্তীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। ইহা দেখিয়া মাদ্রী স্বামীর নিকট সন্তান প্রার্থনা করেন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে দুর্ব্বাসা হইতে লব্ধ মন্ত্র দান করেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করাতে এই মন্ত্রপ্রভাবে নকুল ও সহদেবকে গর্ভে ধারণ করেন। ইনি অজ্ঞাত বাসকালে মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে তন্ত্রিপাল নাম ধারণ করিয়া গোরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ইনি দশার্ণ (বর্ত্তমান ছত্রিশ গড়ের অংশ বিশেষ; দশার্ণের প্রাচীন রাজধানী বিদিশা) মালব প্রভৃতি এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী আভীর দেশ জয় করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপনীত হন। তৎপর পঞ্চনদ (বর্ত্তমান পঞ্জাব), অমর পর্ব্বত, দ্বারপাল প্রভৃতি দেশ জয় করেন। অতঃপর তিনি বাসুদেবের নিকট দ্বারকায় দূত প্রেরণ করেন। যাদবগণ যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিলে তিনি ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ম্লেচ্ছ, পহ্লব প্রভৃতি অসভ্য জাতীয় লোকদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি চেদিরাজকন্যা করেণুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। করেণুমতীর গর্ভে নকুলের নিরমিত্রনামে এক পুত্র জন্মে।

নন্দ—(১) ইনি শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। বর্ত্তমান মথুরা জিলায় যমুনার অপর তীরে প্রাচীন কালে গোকুল-নামে এক গ্রাম ছিল; এই গ্রামে গোপজাতীয় লোকের বাস ছিল। নন্দ এই গোপগণের অধিপতি। এই সময়ে কংস মথুরায় রাজত্ব করিতেন। গোপরাজ নন্দ মথুরারাজ কংসের একজন করদ নৃপতি। নন্দের পত্নী যশোদা। যে রাত্রিতে যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্যারূপে গোকুলে অবতীর্ণ হন, সেই রাত্রিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরার কারাগারে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কংসের ভয়ে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যরাত্রে নন্দালয়ে রাখিয়া যশোদার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসেন। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)। মহামায়ার উৎপত্তি সময়ে তাঁহার মায়াতে গোকুলে সকলেই অচেতন ছিলেন, এজন্য বসুদেব সন্তানপরিবর্ত্তনে সুবিধা পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়েই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হন; এখানেই তিনি কংসপ্রেরিত দানবচরদিগকে বধ করেন। এখান হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া অক্রূরের সহিত গমন করেন এবং কংসকে বিনাশ করিয়া মথুরায় মাতাপিতার সহিত বাস করেন; আর বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। শ্রীকৃষ্ণের গোকুলত্যাগের দিন হইতেই নন্দের জীবন বিষাদতমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ হংস ও ডিম্বককে বধ করিতে একবার বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন করেন। এখানে নন্দ ও যশোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্নেহপ্রবণ নন্দ যশোদাকে প্রবোধ দিয়া মথুরায় প্রতিগমন করেন। এই সময়ের পর আর একবার মাত্র ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়. এই সাক্ষাৎ প্রভাসক্ষেত্রে; ইহাই জীবনের শেষ দেখা।

একদা নন্দ একাদশীর উপবাস করিয়া নিশাসমাগমে যমুনায় স্নান করিতেছিলেন; এমন সময়ে বরুণ-দূতগণ তাঁহাকে বরুণ সভায় লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থান হইতে নন্দকে উদ্ধার করেন। এই দিবস নন্দ যমুনার যে ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন, তাহা নন্দঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নন্দ পূর্ব্বজন্মে দ্রোণনামে বসু ছিলেন। বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তৎপত্নী ধরা জন্মান্তরগ্রহণপূর্ব্বক নন্দ ও যশোদারূপে ব্রজমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। (শ্রীমদ্ভা—১০স্ক—৮অ)

নন্দা—ভগবতীর নামান্তর। বরাহপুরাণে ব্রহ্মা দেবী ভগবতীকে বলিতেছেন, "হে দেবি, তুমি দেবতাদিগের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, কিন্তু তোমার আরও একটী কার্য্য করিতে হইবে। তোমাকে ভবিষ্যতে মহিষাসুরকে বিনাশ করিতে হইবে।" ব্রহ্মা ইহা বলিলে পর দেবতারা দেবী ভগবতীকে হিমালয়ে স্থাপন করিয়াছিলেন। হিমালয়ে স্থাপন করাতে দেবতাদের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল বলিয়া ভগবতী নন্দানামে খ্যাত হন। স্থানান্তরে আরও লিখিত আছে যে, দেবী ভগবতী সুরলোক, নন্দন কানন এবং পবিত্র হিমালয়ে অবস্থান করিয়া অতি আনন্দিত হন, এজন্য দেবীর নাম নন্দা হইয়াছে।

নন্দী—মহাদেবের অনুচর ও গণাধিনায়ক। ইনি শৈলাদ মুনির পুত্র। শৈলাদ অন্ধ ছিলেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রসমীপে এক অযোনিজ ও অমর পুত্র প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র বলেন যে, এরূপ পুত্রবর দিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, এমন কি ব্রহ্মা বা বিষ্ণুরও ক্ষমতা নাই। যদি মহাদেব সন্তুষ্ট হন, তবে এরূপ পুত্রবর দিতে পারেন। অনন্তর শৈলাদ

মহাদেবের আরাধনা করেন। মহেশ্বর প্রীত হইয়া বলেন যে, তিনি স্বয়ংই তদীয় পুত্ররূপে অযোনিজ ও অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপর শৈলাদ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; এই যজ্ঞাগ্নি হইতে অমিত তেজঃসম্পন্ন নন্দী উদ্ভূত হন। মহাদেব নন্দীকে স্বীয় পার্শ্বচর ও গণাধিপতি নিযুক্ত করেন। নন্দী মরুত্তনয়া সুযশাকে বিবাহ করেন।

(লিঙ্গপু—৪২—৪৫ অ)।

নমুচি—(১) দৈত্য বিশেষ। মহাসুর শুম্ভের তৃতীয় সহোদর। শুম্ভের কনিষ্ঠ নিশুম্ভ ও তৎকনিষ্ঠ নমুচি। (বামন পুরাণ)।

(২) বিখ্যাত দানবরাজ। ইহার সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সখ্য ছিল। নিয়মভঙ্গপূর্ব্বক এই দানবকে বিনাশ করিয়া সুরপতি ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। পরে অরুণা নদীতে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অরুণা সরিৎপ্রধানা সরস্বতীর শাখা। একদা দানবপতি নমুচি ইন্দ্রভয়ে ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মির মধ্যে প্রবেশ করেন। ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। দেবরাজ, মিত্র নমুচিকে বলিলেন, "হে সখে, আমি সত্যই বলিতেছি যে. দিবসে, রজনীতে এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুদ্বারা তোমার সংহারে প্রবৃত্ত হইবনা।" অনন্তর এক দিবস নীহারজলে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইলে সুরপতি সলিলফেনদ্বারা নমুচির মস্তকচ্ছেদন করেন। তখন সেই ছিন্ন মস্তক "রে পাপাত্মন্, তুই মিত্রকে বধ করিলি" এই বলিয়া দেবরাজের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ইন্দ্র ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ব্রহ্মা তাহাকে বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অরুণা নাম্নী নদীতে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইতে বলিলেন। সুরপতি, ব্রহ্মার উপদেশানুসারে অরুণাতীর্থে বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্নান করিলেন এবং পাপ মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দানবরাজ নমুচির সেই ছিন্নমস্তকও এই অরুণাতীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইল। (মহাভা—শল্য—৪৩অ)।

নর—ভাগবতে ইনি ভগবানের চতুর্থ অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি ধর্ম্মের পত্নী মুক্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ, দুই মূর্ত্তি হইলেও একের সদৃশ; অপরকল্পে নরসিংহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এই মূর্ত্তি ধারণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস লিখিয়াছেন যে, স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্ররূপে নর, নারায়ণ, হরি ও শ্রীকৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে নর ও নারায়ণ এই দুইজন বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করেন। একদা দেবর্ষি নারদ ইহাদিগকে উপাসনারত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, চতুরাশ্রমবাসী লোকেরা মুক্তির জন্য যাহাদের উপাসনা করিতেছে, তাঁহারা আবার কাহার উপাসনায় রত? উত্তরে ভগবান নারায়ণ কহিলেন, ইহা অতিশয় গোপনীয়; তবে তোমাকে অতি ভক্তিমান্ দেখিতেছি, তোমার নিকট এই নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি:—"যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ত্রিগুণাতীত, যাঁহাহইতে সত্ত্বাদি গুণসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তি কারণ। আমরা তাঁহাকেই মাতা, পিতা বা প্রকৃতিজ্ঞানে উপাসনা করিতেছিলাম।" (মহাভারত)। নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্যা অবলোকনে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হইয়া কামদেব সহ অপ্সরাদিগকে ইহাদের তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। ইঁহারা অপ্সরাদিগকে দেখিয়া দেবগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন এবং অপ্সরাদিগের রূপের গর্ব্ব ও দেবগণের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ইঁহারা উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করেন। উর্ব্বশী রূপে অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। উর্ব্বশী সৃষ্ট হইলে নরনারায়ণ তাহাকে দেবলোকে প্রেরণ করিলেন। এই নরনারায়ণই দ্বাপরের শেষভাগে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভা ও মহাভা)।

নরক—(১) কলির পৌত্র। ভয়ের ঔরসে ও মৃত্যুর গর্ভে ইহার জন্ম। (কল্কি দেখ)।

(২) দানববিশেষ। পৃথিবীর গর্ভে ইহার উৎপত্তি। (কৃষ্ণ ও ভগদত্ত দেখ)।

নরনারায়ণ—(১) শরভরূপী মহাদেব দন্তাঘাতে নরসিংহকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। নররূপ দেহার্দ্ধ হইতে মহাতপা মুনিরূপধারী নর ও সিংহরূপ দেহার্দ্ধ হইতে মহাতপা নারায়ণ নামক জনার্দ্দন উৎপন্ন হয়। (কালিকা পুরাণ)।

(২) ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষ প্রজাপতির দশটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ সর্ব্বদা যোগরত রহিলেন এবং নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এজন্য বদরিকাশ্রমকে নরনারায়ণাশ্রম বলে বলে। (দেবী ভাগবত)।

নরসিংহ (নৃসিংহ)—ভগবানের চতুর্থ অবতার। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বধের জন্য ভগবান হরি এই রূপ গ্রহণ করেন। এই নৃসিংহ মূর্ত্তি অৰ্দ্ধনরাকার এবং অৰ্দ্ধসিংহাকার। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে দেবাসুর গন্ধর্ব্বনরাদির অবধ্য হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার বরে মুনিগণ তাহাকে অভিশপ্ত করিতে পারিতেন না। অস্ত্রশস্ত্রাদি তাহার শরীরে বিদ্ধ হইত না। এই বরপ্রভাবে দৈত্যরাজ অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠেন এবং দেবগণকে নানাপ্রকার অপমানিত করিতে লাগিলেন। দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবগণকে অভয় দিয়া বিদায় করিলেন এবং কিরূপে হিরণ্যকাশিপুকে বধ করিবেন তাহা ধ্যান করিতে লাগিলেন। অবশেষে নরসিংহ মূর্ত্তি গ্রহণই সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ভয়াবহ নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর সভায় উপস্থিত হইলেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দানবরাজকে বলিলেন যে, এই নৃসিংহকে যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহা হইতে দানবদিগের বিনাশ হইবে। দৈত্যরাজ এই সিংহকে অবিলম্বে বধ করিতে দানবদিগকে আদেশ করিলেন। দানবগণ হিরণ্যকশিপুর আদেশে নরসিংহরূপী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিয়া স্বয়ংই নিহত হইল। অনন্তর হিরণ্যকশিপু ক্রোধারুণনেত্রে অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুকে আক্রমণ করিলেন। নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। (হরিবংশ—৩০-৩৯ অ)।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রস্তাবটী অন্যরূপ। হিরণ্য তপোবলে ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন এবং স্বর্গরাজ্য পরাজয় করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইলেন। ইহার ৪ পুত্র, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত। দানবগণের গুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র ষণ্ড ও অমার্ক দৈত্যপতির পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন। একদিবস দৈত্যরাজ পুত্রগণকে বিদ্যাপরীক্ষার্থ সভায় আহ্বান করেন। জিজ্ঞাসিত হইলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণ বর্ণনা করেন। দৈত্যপতি স্বীয় ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বধের জন্য বিষ্ণুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। পুত্রের মুখে শত্রুর গুণকীর্ত্তন শুনিয়া দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন; কিন্তু পিতার ভর্ৎসনায় কোন ফল হইল না, প্রহ্লাদ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ইহাতে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নানারূপে নিপীড়িত করেন, কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় তিনি সকল বারেই রক্ষা পান। দৈত্যবালকগণ প্রহ্লাদের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে সমীপে আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন, "মূঢ় পুত্র! তুমি কাহার বলে বলীয়ান হইয়া এইরূপ সাহস করিতেছ? তোর হরি কোথায়?" ইহাতে প্রহ্লাদ বিনীত ভাবে বলিলেন "আমার হরি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।" হিরণ্যকশিপু বলিলেন, হরি যখন সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে, সর্ব্ববস্তুতে বর্ত্তমান, তখন তিনি নিশ্চয় এই স্তম্ভে আছেন?" প্রহ্লাদ পুনরায় বিনীত ভাবে বলিলেন, "হাঁ তিনি স্তম্ভে আছেন।" ইহার পর দৈত্যপতি ক্রোধভরে স্তম্ভভঙ্গ করিলে উহা হইতে ভীমগর্জ্জন করিয়া এক নৃসিংহ মূর্ত্তি নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভগবান নৃসিংহরূপী বিষ্ণু অবলীলাক্রমে দৈত্যপতিকে ধারণ করিয়া উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক নখরাঘাতে বধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর প্রহ্লাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান বরদানপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন।

নল—নিষধাধিপতি। ইনি স্বয়ম্বর প্রথামতে বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীকে বিবাহ করেন। নল দময়ন্তীর রূপগুণের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। একদিন উদ্যানে ভ্রমণ করিবার সময় নল একটি সুবর্ণ-হংসকে ধৃত করেন। হংস মনুষ্যবাক্যে নলকে বলিলেন যে, আপনি আমাকে মুক্ত করুন। আমি আপনার উপকার করিব। ভীমকন্যা দময়ন্তীর নিকট আপনার গুণগ্রাম এরূপভাবে বর্ণন করিব, যেন তিনি আপনাকে পতিত্বে বরণ করেন। নল হংসকে মুক্ত করিলেন; হংস দময়ন্তীর নিকট নলের বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিলে দময়ন্তী নলের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

ভীম কন্যার নবযৌবন দেখিয়া স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করেন। এই সভায় দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া দময়ন্তী নলকে পতিত্বে বরণ করেন। (মহাভা-বন) (দময়ন্তী, কর্কোটক ও কলি দেখ)।

নলকুবর—ধনাধিপ কুবেরের পুত্র। ইঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব। একদা উভয় ভ্রাতা মদমত্ত হইয়া কৈলাস-সমীপে গঙ্গাতীরস্থ তপোবনে নারীগণের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন। নারদ ইহা দেখিয়া দুইভ্রাতাকে অভিশপ্ত করেন। নারদের অভিশাপে ভ্রাতৃদ্বয় অর্জ্জুনবৃক্ষে পরিণত হন। (শ্রীমদ্ভা-১০ম স্ক) (যমলার্জ্জুন দেখ)। একদা স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা অভিসারিকাবেশে নলকুবরের নিকট যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে লঙ্কেশ্বর রাবণ তাহাকে দেখিয়া কামমুগ্ধ হন এবং বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করেন। রম্ভা ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে এই অভিশাপ দিলেন যে, যদি রাবণ কামমুগ্ধ হইয়া কোন নারীর প্রতি বলপ্রয়োগ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। (রামা-উত্তর)। রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র লিখিয়াছেন যে, নলকুবর নারদের শাপে বঙ্গদেশে ভবানন্দ মজুমদাররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (অন্নদা মঙ্গল)।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় আয়ু নামক রাজার পুত্র। ইনি তপস্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে ইনি ইন্দ্রপদ হইতে চ্যুত হইয়া পৃথিবীতে দশহাজার বৎসর সর্পরূপে বাস করেন (অগস্ত্য দেখ) নহুষের বহু অনুনয় বিনয়ে অগস্ত্য তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার বংশে যুধিষ্ঠির নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন; তাঁহারই অনুগ্রহে নহুষ শাপমুক্ত হইবেন।

বনে অবস্থান কালে মৃগয়াগামী ভীমসেন সর্পরূপী নহুষকর্তৃক আক্রান্ত হন। ভীমের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাহার অন্বেষণে বাহির হন এবং ভীমকে এক বৃহৎ সর্পকর্তৃক আক্রান্ত দেখিতে পান। যুধিষ্ঠির সর্পের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কি আহার দিলে সর্প ভীমকে মুক্ত করিবেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্প নিজ পরিচয় দিলেন এবং শাপমুক্ত হইয়া দিব্যরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। (মহাভা-আদি-বন-অনুশা)।

নাচিকেতা—(১) মহাতপঃপ্রভাবসম্পন্ন উদ্দালক ঋষির পুত্র। একদা উদ্দালক ভ্রমক্রমে কুশপুষ্পাদি নদীতীরে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রকে উহা আনয়ন করিতে প্রেরণ করেন, কিন্তু নাচিকেতা নদীতীরে গমন করিয়া উহা পাইলেন, তিনি রিক্তহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া উদ্দালক ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন, "তোমার অবিলম্বে যম দর্শন হউক।" এই শাপ উচ্চারণ করিবামাত্র নাচিকেতা বিগতপ্রাণ হইয়া ভূপতিত হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রের মৃত্যুতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। একদিন ও একরাত্রি শব কুশাসনের উপরই রহিল। তৎপর দিন প্রাতে হঠাৎ শবদেহে জীবনসঞ্চার দৃষ্ট হইল; উদ্দালক পুত্রকে এই বলিয়া অভিবাদন করিলেন, "হে পুত্র! তুমি নিজপ্রভাবে দেবলোক সকল দর্শন করিয়াছ; তোমার দেহ মানবদেহ নহে।" পুত্র নাচিকেতা বলিলেন, যে তিনি পিতৃশাপে দেহত্যাগপূর্ব্বক যমের সভায় উপস্থিত হইয়া যমরাজকে দর্শন করিলেন এবং তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে তদ্বিষয়ে যমরাজের অনুমতি চাহিলেন। যম বলিলে, আপনার পিতা আপনাকে "যমদর্শন হউক" বলিয়া অভিশাপ দিয়াছেন; আপনার যমদর্শন হইয়াছে, এখন আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। নাচিকেতা যমের নিকট পুণ্যোপার্জ্জিত লোক সকল দর্শন করিতে প্রার্থনা করিলে যমের আদেশে এক দিব্যরথ উপস্থিত হইল। তিনি রথারোহণে পুণ্যার্জ্জিত স্থান সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যে ধেনুদানার্জ্জিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। নাচিকেতা এই সমুদয় পুণ্যলোক দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (মহাভারত-অনুশাসন)

(২) কঠোপনিষদে নাচিকেতার বিবরণ অন্যরূপ। ইনি বাজশ্রবা নামক রাজার পুত্র। বাজশ্রবার অপর নাম গৌতম। এই গৌতম একদা বিশ্বজিৎনামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে রাজার সমস্ত ধনরত্ন ব্রাহ্মণসাৎ করিতে হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সময় নাচিকেতা বালকমাত্র ছিলেন। তিনি যজ্ঞে দানাদি দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং পিতার নিকট প্রার্থনা করেন যে, তাহাকেও কোন ঋত্বিককে দান করা হউক। রাজা ইহাতে

কর্ণপাত করিতে ছিলেন না। নাচিকেতা এইরূপ তিনবার প্রার্থনা করিলে রাজা বাজশ্রবা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি তোমাকে যমের নিকট অর্পণ করিলাম।" রাজা প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য পুত্রকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। নাচিকেতা যমসদনে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন; যম সেই সময়ে ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন এজন্য নাচিকেতা তাহার দর্শন পান নাই। যম ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নাচিকেতাকে দেখিলেন যে তিনি ত্রিরাত্র উপবাসী আছেন। যম বলিলেন "যে হেতু তুমি তিন দিন অনাহারে আছ এজন্য তুমি তিনটী বর আমার নিকট প্রার্থনা কর।" নাকিচেতা নিম্নলিখিত তিনটী বর প্রার্থনা করেন।

(ক) আমার পিতা সর্ব্বদা এই ভাবিয়া চিন্তামগ্ন আছেন যে, আমি কিরূপে এখানে বাস করিতেছি। আমার প্রার্থনা যে, আমার পিতার এই চিন্তা নিবৃত্ত হউক এবং তিনি আমার উপর পূর্ব্বের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকুন। আমি আপনার ভবন হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা যেন মনে করেন যে আমি যমালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি।

(খ) স্বর্গলোকে যাহারা গমন করিবে, তাহারা মর্ত্ত্যের ন্যায় যেন ক্ষুৎপিপাসা, জরা, মৃত্যু ও শোকগ্রস্ত না হইয়া সুখে বাস করিতে পারে।

যমরাজ এই দুইবর দিলেন। তৎপর নাচিকেতা অপর এই বর প্রার্থনা করেন :—

(গ) কেহ বলেন মানবদেহাবসান হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এ সকল হইতে ভিন্ন জীবাত্মা থাকেন; আবার কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা নাই। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। আপনি আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করুন; এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।

যম নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যাদির প্রলোভনে তাহাকে এই তৃতীয় বর প্রার্থনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নাচিকেতা কিছুতেই ছাড়িলেন না। নাচিকেতার বচনে যম প্রীত হইয়া তাহাকে পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ দানে তাহার সন্দেহ দূর করেন। (কঠোপনিষদ)

নাভাগ—করুষের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে দিষ্ট একতম। মহারাজ দিষ্টের পুত্র নাভাগ। নাভাগ পিতার অনভিমতে বৈশ্যকন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া কোন মুনির বরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১১৩—১১ অ)

নায়িকা—ভগবতী দুর্গার শক্তি। নায়িকা ৮টী, যথা :—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী। (বৃহ্ম বৈঃ-প্রকৃতি খঃ—৬১ অ)।

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রথম মরীচি, অত্রি প্রভৃতিকে ও তৎপর সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এবং নারদকে সৃষ্টি করেন। ইহার বিবরণ প্রায় সকল পুরাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। নার শব্দে জল বুঝায়। সর্ব্বদা তর্পণার্থ জলদান করাতে ইনি নারদ নামে খ্যাত হন। প্রজাপতি দক্ষ প্রজা সৃষ্টির উৎকট বাসনাবশতঃ বীরণ প্রজাপতির তপঃপরায়ণা লোকধারিণী কন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করেন এবং এই ভার্য্যার গর্ভে হর্য্যশ্ব প্রভৃতি পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। নারদ নানাবিধ উপদেশ ও যোগশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক হর্য্যশ্ব শবলাশ্ব প্রভৃতি দক্ষপুত্রগণকে সৃষ্টিকার্য্য হইতে বিরত করিয়া সংসারত্যাগী (একবারে নিরুদ্দেশ) করিয়া দেন। দক্ষ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রোষে নারদকে অভিসম্পাত করিয়া সংহার করিলেন। ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ দক্ষের নিকট নারদের পুনর্জ্জীবনার্থ উপস্থিত হইলে দক্ষ স্বীয় তনয়াকে ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন যে, প্রজাপতি কশ্যপ ইহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে তাঁহার ঔরসে এই কন্যার গর্ভে পুনরায় নারদ উৎপন্ন হইবেন। ব্রহ্মা দক্ষতনয়াকে কশ্যপের হস্তে অর্পণ করেন; ইঁহার গর্ভে পুনর্ব্বার নারদ উৎপন্ন হন।

(হরিবংশ ১ম ও ৩য় অ)

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ ভগবান ব্যাসের নিকট স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এইরূপ বলিতেছেন :—

তিনি (নারদ) পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে সর্ব্বদা উক্ত বেদজ্ঞ ঋষিদিগের সেবাকর্ম্মে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি একদিন ঋষিদের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিয়া পাপমুক্ত হন; তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল; ঋষিদিগের উচ্চারিত হরিগুণ গানে তাঁহার মন নিরতিশয় আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫ বৎসর মাত্র। একদিন হঠাৎ তাহার মাতা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। মাতার মৃত্যুর পর ইনি স্বাধীন হইয়া আশ্রমত্যাগপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একহ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক জল পান করিলেন এবং বটবৃক্ষমূলে আসীন হইয়া হরির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে তিনি হৃদয়ে হরিদর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন; কিন্তু অল্পকাল পরে ভগবান চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইলেন; তিনি হরিদর্শনে বঞ্চিত হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভগবান হরি আকাশবাণীতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "নারদ, এই জন্মে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবেনা, যেহেতু অজিতেন্দ্রিয় যোগিগণ আমাকে দেখিতে পায়না; তবে যে আমি তোমাকে দেখা দিলাম, তাহা কেবল আমাতে তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য। আমাতে অনুরাগ জন্মিলে সাধুগণ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া আমাকে লাভ করিতে পারেন। অতএব সাধুসেবা দ্বারা আমাতে তোমার চিত্ত স্থির কর; অচিরেই তুমি এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্শ্বচর হইতে পারিবে এবং আমার সহিত অতঃপর তোমার আর বিচ্ছেদ হইবে না। আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তোমার স্মৃতি থাকিবে।" অনন্তর তিনি হরিনাম জপ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভোগ শেষ হইলে যথাসময়ে তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল। অনন্তর হরি, যখন কল্পান্তে সমুদ্রজলে শয়ান ছিলেন, তখন তিনি নিশ্বাস যোগে হরিতে প্রবিষ্ট হইলেন। যোগ নিদ্রায় যুগসহস্র অতীত হইল। তৎপর যখন হরির পুনর্ব্বার সৃষ্টির ইচ্ছা হইল তখন নারদ, মরীচি. অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত ভগবান বিষ্ণুর মানস হইতে উদ্ভূত হইলেন।

(শ্রীমভা ১ম স্ক—১৬ অ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা উহাকে তাঁহার অপর মানসপুত্রদিগের সহিত সৃষ্টি কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। নারদ দেখিলেন, প্রজাসৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইলে ঈশ্বর চিন্তার ব্যাঘাত হয় এজন্য তিনি পিতার আদেশ পালনে অসম্মত হইলেন। ব্রহ্মা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। ব্রহ্মার শাপে নারদ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া উপবর্হ নামে খ্যাত হন। এই জন্মে তিনি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের ৫০টী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যাগণেরমধ্যে মালাবতী প্রধানা। একদা ব্রহ্মার সভায় স্বর্গবেশ্যা রম্ভার নৃত্য দেখিয়া ইহার কামপ্রবৃত্তি এত উত্তেজিত হয় যে, এই নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনায় ইহার রেতঃ স্খলিত হয়। ব্রহ্মা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেন। তাঁহার শাপে নারদ গন্ধর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কান্যকুব্জবাসী গোপরাজ দ্রুমিলের পত্নী কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কলাবতী বন্ধ্যা ছিলেন। কাশ্যপ-নারদ নামক এক ঋষি স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে দেখিয়া কামমোহিত হন এবং তাহার রেতঃপাত হয়। কলাবতী এই রেতঃ ভক্ষণ করিয়া গর্ভবতী হন এবং নারদকে প্রসব করেন। কাশ্যপ-নারদের বীর্য্যে উৎপন্ন বলিয়া ইনি নারদ নামে খ্যাত হন। ইনি বালকদিগকে জলদান ও জ্ঞানদান করিতেন এবং ইনি জাতিস্মর ও মহাজ্ঞানী ছিলেন, এজন্য ইহার নারদ আখ্যা হইয়াছিল।

"দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।
জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনেয়ং নারদাভিধঃ॥"

(ব্রহ্ম বৈঃ—ব্রহ্মখ.)

বিপ্রগণ ইহাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার আরাধনায় বিষ্ণুও তুষ্ট হইয়া ইহাকে একবার দেখা দেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি অন্তর্দ্ধান পান। নারদ ব্যাকুল হইলে এক দৈববাণী হইল "তুমি এই নশ্বর দেহের অবসানে আমাকে পাইবে।" যথাসময় তনু ত্যাগ করিয়া নারদ ব্রহ্মে লীন হইলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং দক্ষের পুত্রকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়া সংসার ত্যাগ করেন। (মহাভা—শল্য)

নারদ বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতিকে বিবাহ করিতে যাইয়া অপ্রতিভ হন। (অম্বরীষ দেখ)

একদা বিষ্ণুসভায় নারদও তুম্বুরু উপস্থিত হন। বিষ্ণুর আদেশে তুম্বুরু গান করেন। তুম্বুরুর গান শুনিয়া নারদ ঈর্ষ্যান্বিত হন এবং বিষ্ণুর আদেশে উলুকেশ্বরের নিকট যাইয়া বহুকাল গান শিক্ষা করেন। গীতবাদ্যে শিক্ষা লাভের পর নারদ তুম্বুরুকে জয় করিতে তাহার গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন, পথে কতকগুলি বিকৃতাকার স্ত্রীপুরুষের সাক্ষাৎ পান। ইহারা বলিল যে, ইহারা রাগরাগিণী; নারদের গানে ইহাদের এইরূপ বিকৃত বেশ হইয়াছে; তম্বুরুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য ইহারা পথে অপেক্ষা করিতেছিল। নারদ লজ্জিত হইয়া বিষ্ণুর নিকট সমুদায় বলিলেন। বিষ্ণু বলিলেন "তোমার গীত-শাস্ত্রের পারদর্শিতা হয় নাই; যখন আমি যদুবংশে কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিব, তখন আমার নিকট গমন করিলে তোমার গান শিক্ষার বিধান করিব।" ভগবান যদুবংশে অবতীর্ণ হইলে নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় নারদ প্রথমে জাম্ববতী ও সত্যভামার নিকট দুই বৎসর গান করেন, কিন্তু তাহাতে স্বর আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া তিনি রুক্মিণীর নিকট দুইবৎসর বীণাযোগে গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হন।

নারদ একদা বিষ্ণুর নিকট মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বিষ্ণু ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক নারদকে সঙ্গে নিয়া পৃথিবীর নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং নানা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মায়ার বিভিন্নরূপ প্রদর্শন করেন। এই ভ্রমণের সময় একদা বিষ্ণুর মায়ায় নারদকে কোন সরোবরে স্নান করিয়া স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল এবং স্ত্রীবেশে তিনি তালধ্বজ রাজার পত্নী হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বাস করেন এবং এই রাজার যোগে ইনি এক অলাবু প্রসব করেন। এই অলাবু হইতে ৫০টী পুত্র উৎপন্ন হয়। উক্ত পুত্রগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হত হন। পুত্রগণের বিনাশে স্ত্রীভাবাপন্ন নারদ স্বামীর সহিত বিলাপ করিতে থাকেন। ভগবান বিষ্ণু দেবগণসহ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চিত্ত সান্ত্বনা পাইলনা। অবশেষে বিষ্ণু রাজপত্নীকে পুনর্ব্বার সরোবরে স্নান করাইয়া নারদরূপে পরিণত করেন। বিষ্ণু এই সময় নারদকে মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, তিনি মায়ার স্বরূপ বুঝিয়াছেন। (শ্রীমদ্ভা – ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুপু)

ব্রহ্মার শাপে নারদ লোকসমূহে অনবরত ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারেন না।

"তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেৎ ভ্রমতঃ পদম্।"

নারদ যে কলহের সাহায্যকারী বা তাহার বাহন যে ঢেঁকী ছিল, ইহা কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না; ইহা লোকপ্রবাদ মাত্র। এই লোকপ্রবাদ অবলম্বন করিয়াই বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী। ইত্যাদি।

* বেদেও নারদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইনি ঋগ্বেদ সংহিতায় ৮ম মণ্ডলের ১৩শ সূক্তের ঋষি। নারদ কৃত গ্রন্থের নাম নারদ পঞ্চরাত্র।

নারায়ণ—(নর দেখ)।

নিকষা—রাবণের মাতা। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের মাতার নাম কৈকসী। (কৈকসী দেখ)।

নিকুম্ভ—(১) দৈত্য বিশেষ। এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়।

(২) কুম্ভকর্ণের পুত্র; ইনি রাবণের মন্ত্রী ছিলেন; লঙ্কাযুদ্ধে ইনি হত হন; ইঁহার সহোদরের নাম কুম্ভ। (রামা—লঙ্কা ৭৫ সর্গ)।

নিবাতকবচ—দৈত্য বিশেষ। এই দৈত্য সংহ্লাদের পুত্র ও দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। ইহার বংশীয় দানবগণ নিবাতকবচ নামে খ্যাত। মহাভারতের মতে ইহাদের সংখ্যা তিন কোটি। এই সমুদায় দানব ইন্দ্রাদি দেবতাগণের ঘোর শত্রু। পাণ্ডবগণের বনবাস কালে, অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ স্বর্গপুরে গমন করেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। অস্ত্রবিদ্যায় সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিলে ইন্দ্র তাহাকে গুরুদক্ষিণা দিতে বলেন। অর্জ্জুন গুরুদক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে দেবরাজ তাহাকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ নিবাতকবচদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা করেন। অর্জ্জুন মাতলি দ্বারা চালিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া নিবাতকবচদিগের বাসস্থানে উপস্থিত হন এবং ঘোর যুদ্ধে তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করেন। (মহাভা—বন)। এই দানবগণ রসাতলে বাস করিত। (রামা—সুন্দরকাণ্ড)

নিমি—সীতাদেবীর পিতা কুশধ্বজ জনকের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহার পুত্র মিথি হইতে তদীয় রাজ্য মিথিলা নামে খ্যাত হয়। মিথির পুত্র জনক। এই জনক হইতে তদ্বংশীয় সমস্ত নৃপতিই "জনক" উপনামে খ্যাত। (কুশধ্বজ দেখ)

নিশুম্ভ—বিখ্যাত দানব। এই দানব কশ্যপের ঔরসে তদীয় পত্নী দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম শুম্ভ ও কনিষ্ঠের নাম নমুচি। নমুচি ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। কনিষ্ঠের মৃত্যুতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন এবং দেবতাদিগকে স্বর্গচ্যুত করিয়া এই মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয় স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হন। ইহার সহিত মহিষাসুরের মন্ত্রী রক্তবীজ নামক প্রসিদ্ধ দানবের সাক্ষাৎ হয়। রক্তবীজের নিকট ইহারা শুনিতে পাইলেন যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতে কাত্যায়নী দেবীর হস্তে মহিষাসুর নিহত হইয়াছেন। তদীয় সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড প্রাণভয়ে জলে লুক্কায়িত আছেন। শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুরমর্দ্দিনী কাত্যায়নীকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। চণ্ড ও মুণ্ড দানবপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন। তাহারা সুগ্রীব নামক একজন দূতকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে দেবীর নিকট প্রেরণ করেন। দূত দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "পৃথিবীর মধ্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর; তুমিও ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী; তুমি এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বরমাল্য দিতে পার।" দেবী দূতকে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমি একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে আমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিব।" দূত শুম্ভ নিশুম্ভকে এই কথা বলিলে তাহারা দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন। ধূম্রলোচন দেবীর হস্তে নিহত হইলে দানবপতি শুম্ভ সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে প্রেরণ করেন। ইহারাও দেবীর হস্তে নিহত হইলেন। চণ্ডমুণ্ডের বিনাশের পর ত্রিশকোটি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রক্তবীজ প্রেরিত হইলেন। রক্তবীজ দেবীর সহিত ঘোর যুদ্ধ করিলেন। ইহার এক এক বিন্দু রক্ত হইতে এক এক জন দানবের উদ্ভব হইল; কিন্তু দেবীর তেজে সৈন্যসহ রক্তবীজ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন। ঘোর যুদ্ধের পর ইহারা দেবীর হস্তে নিহত হইলেন। ইন্দ্র পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। (বামন পুরাণ)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভ নিশুম্ভের উৎপত্তি বিবরণ লিখা নাই। ইহাতে এই যুদ্ধব্যাপার একটু ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণ শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ভগবতীর শরণ লইলেন। দেবী ভগবতী মনোহররূপ ধারণ করিয়া রহিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড মুণ্ড হিমাচলে তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যপতি দ্বয়ের নিকট

তাঁহার রূপ বর্ণন করেন। চণ্ড মুণ্ডের বর্ণনা শুনিয়া দেবীকে আনিবার জন্য তিনি সুগ্রীবকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। দেবী দূতকে বলিলেন, "যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন এবং আমার দর্প নাশ করিতে ক্ষম হইবেন তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।" তৎপরবর্ত্তী ঘটনা বামনপুরাণের ঘটনার ন্যায়। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। রক্তবীজ যে মহিষাসুরের মন্ত্রী ছিলেন এবং চণ্ড মুণ্ড যে তাঁহার সেনাপতি ছিলেন তৎসম্বন্ধে চণ্ডীতে কোন উল্লেখ নাই। (কাত্যায়নী দেখ)।

নীল—(১) মাহিষ্মতী পুরীর রাজা। অগ্নিদেব ইঁহার পরমসুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। অগ্নি, রাজা নীলকে বর দেন যে, যিনি এই নগরী অবরোধ করিবেন তিনি দগ্ধ হইবেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় সহদেব এই নগরী অবরোধ করেন। সহদেব স্বীয় সৈন্য অগ্নিবেষ্টিত দেখিয়া অগ্নিদেবের উপাসনা করেন। অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে নীলরাজের পূজাগ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলেন। অগ্নির আদেশে নীলরাজ সহদেবকে পূজা করেন এবং সহদেব করগ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। (মহাভারত)

(২) বানর-সেনাপতি। সেতুবন্ধনের সময় এই বানর রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। (রামায়ণ)

প

পঞ্চজন—অসুর বিশেষ। এই অসুর হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও সংহ্লাদের পুত্র। এই অসুর পাতালে বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে নিহত করেন। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)। ইহার অস্থিতে যে শঙ্খ হয় তাহা পাঞ্চজন্য নামে খ্যাত; শ্রীকৃষ্ণ এই শঙ্খ লাভ করেন।

পঞ্চশিখ—এই বিখ্যাত দার্শনিক মহাত্মা আসুরির শিষ্য। আসুরি বিখ্যাত সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের শিষ্য। পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যদর্শনের মতবাদ সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। আসুরির সহধর্ম্মিণীর নাম কপিলা। পঞ্চশিখ পুত্রভাবে গুরুপত্নী কপিলার স্তন্যপান করিতেন বলিয়া কপিলাপুত্র নামে অভিহিত হইতেন। (জনদেব দেখ)।
(মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব)।

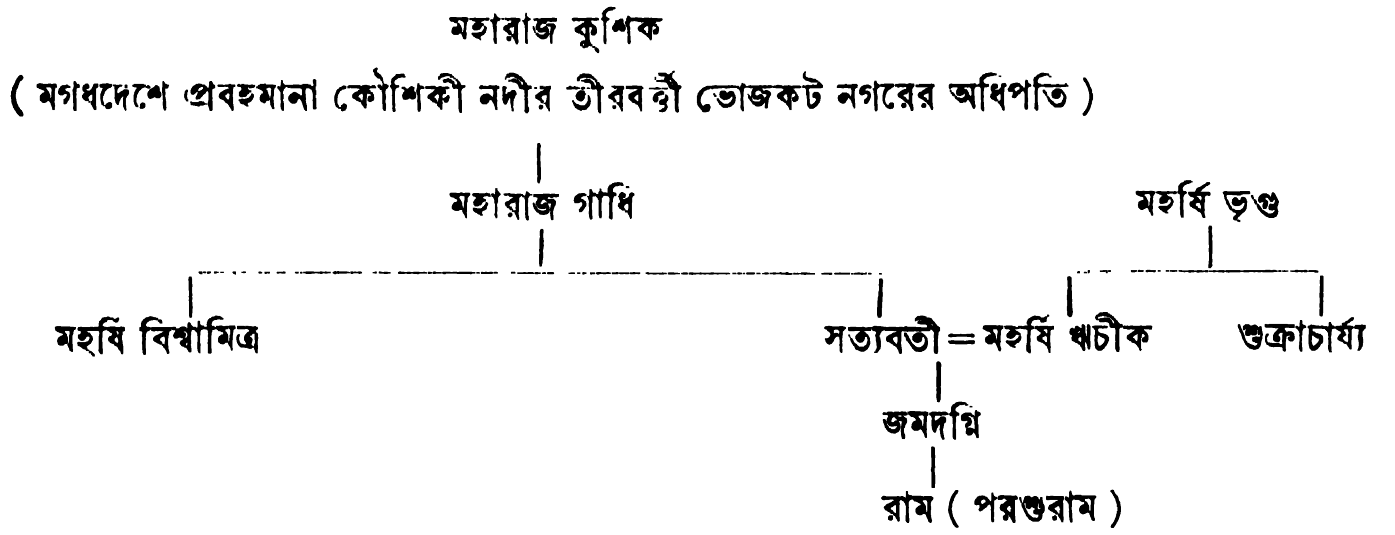
পতঞ্জলি—বিখ্যাত যোগশাস্ত্রপ্রণেতা। ইঁহার রচিত দর্শন "পাতঞ্জল দর্শন" নামে প্রথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি ও পাণিনিকৃত ব্যাকরণের মহাভাষ্য-প্রণেতা পতঞ্জলি এক ব্যক্তি। মহামুনি কাত্যায়ন পাণিনি সূত্রের ভ্রম প্রদর্শনার্থ বার্ত্তিক রচনা করেন। পাণিনির পক্ষপাতী পতঞ্জলি পাণিনি সূত্র সমর্থন করিয়া ইহার এক "মহাভাষ্য" রচনা করেন। এই মহাভাষ্যে কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকের মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। পতঞ্জলি আবার একখানা বৈদ্যক গ্রন্থও রচনা করেন।

কেহ কেহ বলেন, যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি এবং এই মহাভাষ্যকারই বৈদ্যক গ্রন্থের প্রণেতা। ইঁহাদের মতে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ব্যাকরণকার পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। অপর কেহ বলেন যে, যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও বৈদ্যক গ্রন্থকার পতঞ্জলি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কেহ বলেন, দর্শনকার পতঞ্জলি পরাশরপুত্র বেদব্যাসের শিষ্য, অপরে বলেন, তিনি জৈমিনীর পুত্র, আবার কেহ বলেন তিনি পরাশরের পুত্র। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত পাতঞ্জল দর্শন চারিপাদে বিভক্ত। যথা—যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্য পাদ। মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীয় দর্শনে ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা কপিল স্বীয় দর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন, মহর্ষি পতঞ্জলিও তৎসমুদয় স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি ইহা ছাড়া অপর একটী তত্ত্বও স্বীকার করেন; এই তত্ত্ব পরমেশ্বর। পতঞ্জলির মতে যাঁহাকে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় স্পর্শ করিতে পারে না এবং যিনি নিখিল সংসারী আত্মা ও মুক্তাত্মা হইতে পৃথক্, তিনিই ঈশ্বর। পতঞ্জলি বলেন, একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা সমাধি লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। যখন যে কার্য্য করিবে, ফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সুখের

অনুসন্ধান না করিয়া, সমস্ত কার্য্যই সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে। সকল সময়ে কেবল তাঁহারই ধ্যানে রত থাকিবে। পতঞ্জলির ঈশ্বর নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাতে জ্ঞানশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অল্পতার চূড়ান্ত যেমন পরমাণু, বৃহত্ত্বের শেষ সীমা যেমন আকাশ—পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং আকাশ অপেক্ষা বৃহত্তর কোন জিনিষের যেমন কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ জ্ঞানশক্তির অল্পতার সীমা ক্ষুদ্র জীব এবং ঐ জ্ঞানশক্তির আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর। পাতঞ্জলদর্শনমতে-প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই সকলে সংসারে আগমন করে; অবিদ্যাবশতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ঘটিয়া থাকে। বিবেকখ্যাতিদ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হইলে লোক কৈবল্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

পদ্মবর্ণ—মহারাজ যদুর পুত্র। ইনি নাগকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হন। ইঁহার মাতার নাম মুচুকুন্দা। (হরি—৯৩ অ)

পরশুরাম—মহর্ষি জমদগ্নির পুত্র। ইঁহার মাতা রেণুকা। ইঁহার পিতামহ মহর্ষি ঋচীক ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত কিন্তু; পিতামহী সত্যবতী ক্ষত্রবংশজাতা। নিম্নের বংশাবলী দেখ।



উপরি উক্ত বংশাবলী হইতে দেখা যাইতেছে, ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবংশে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। মহর্ষি ঋচীকের জীবনী পাঠ করিলে ইহার কারণ জানা যাইবে।

পরশুরামের প্রকৃত নাম রাম; গন্ধমাদন পর্ব্বতে ইনি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া এক তেজোময় পরশু লাভ করেন এবং তদবধি পরশুরাম নামে খ্যাত হন। (মহাভা—শান্তি)

পরশুরাম স্বীয় জননী রেণুকার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াও ক্ষত্রিয়কুল একবারে নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই। কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লূকদিগের যত্নে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ভল্লূকের যুদ্ধ রামায়ণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চিন্তাশীলেরা মনে করেন যে, ভল্লূক এক অনার্য্য জাতি; চতুষ্পদ নহে। অনার্য্য জাতীয়দিগের মধ্যে ভল্লূক, ব্যাঘ্র প্রভৃতির পূজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমুদয় পদার্থকে ইংরেজীতে "টোটেম" বলে। যে জাতি যে জন্তু বা দ্রব্যের পূজা করে, সে জাতি সেই জন্তু বা বস্তুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়েও সাঁওতালদিগের মধ্যে ব্যাঘ্রগোত্র, সুপারীগোত্র প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে জাতি যে প্রাণী পূজা করে সেই জাতীয় অনার্য্য লোকেরা সেই প্রাণী হিংসা করে না। ব্যাঘ্রগোত্রীয় জাতি ব্যাঘ্র হিংসা করে না।) মহর্ষি পরাশর, সৌদাসপুত্র সর্ব্বকর্ম্মাকে রক্ষা করেন। প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস, গোষ্ঠে গোবৎসকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সকল ক্ষত্রিয় রাজকুমারদিগকে আনয়নপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (মহাভা—শান্তি ও জমদগ্নি দেখ)

পরাশর—মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্ত্রির পুত্র। ইঁহার মাতার নাম অদৃশ্যন্তী। ইঁহার জন্মবিবরণ মহাভারতে এইরূপ দৃষ্ট হয়:—

একদা ইক্ষ্বাকু-বংশোৎপন্ন রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া এক মহাঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা ক্লান্ত হইয়া এক সংকীর্ণ পথে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময় মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শক্ত্রি সেই পথে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। রাজা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শক্ত্রি তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, কল্মাষপাদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন। শক্ত্রি রাজাকে শাপ দিলেন "যেহেতু তুই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন আমাকে রাক্ষসের ন্যায় কশাঘাত করিলি, সেই হেতু তুই অদ্যাবধি রাক্ষস হইবি এবং নরমাংসলোলুপ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিবি"। শক্ত্রিশাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসরূপে পরিণত হইলেন। কল্মাষপাদ রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া প্রথমেই শক্ত্রিকে ভক্ষণ করেন এবং পরে বশিষ্ঠের একোনশত পুত্রকে একে একে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। বশিষ্ঠের শত পুত্রনাশে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ঋষি বিশ্বামিত্রের ইঙ্গিত ছিল; তিনি রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদকে প্রত্যক্ষভাবে একার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। পুত্র-শোকে কাতর বশিষ্ঠ জানিতে পারিলেন যে, বিশ্বামিত্রের কৌশলে তাঁহার শত পুত্রের বিনাশ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বামিত্র অথবা তাহার বংশের কোন ক্ষতি করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বশিষ্ঠ পুত্রশোকে দেহ ত্যাগ করিবার জন্য মেরুপর্ব্বতের শিখর হইতে ভূমিতে লম্ফ প্রদান করিলেন; অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, কণ্ঠদেশে শিলা খণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্রে মগ্ন হইলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না; তাহার দেহ অক্ষতই রহিল। আত্মবিনাশে অসমর্থ হইয়া তিনি সন্তপ্তচিত্তে আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিকে বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আমার অনুসরণ করিতেছে?" পশ্চাদ্দিক হইতে উত্তর হইল "আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র বধূ অদৃশ্যন্তী।" অদৃশ্যন্তী বলিলেন, "আমার গর্ভে আপনার পৌত্র বর্ত্তমান; এই সন্তান গর্ভে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ বেদাধ্যয়ন করিতেছে।" বশিষ্ঠ দেখিলেন তাঁহার বংশ রক্ষার সম্ভাবনা হইয়াছে; তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে পুত্রবধূসহ আশ্রমের দিকে আগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক রাক্ষস অদৃশ্যন্তীকে গ্রাস করিতে ধাবিত হইল। বশিষ্ঠ যোগবলে দেখিলেন এ রাক্ষস নহে, তাঁহার পুত্রের শাপে রাক্ষসভাবাপন্ন সৌদাসাপরনামা রাজা কল্মাষপাদ। বশিষ্ঠ পুত্রবধূকে অভয় দিলেন এবং রাক্ষসের শরীরে মন্ত্রপূত জল ক্ষেপণপূর্ব্বক যোগবলে তাহার শাপ মোচন করিলেন। বশিষ্ঠ রাজাকে পুত্রবর দিলেন এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে অনুমতি করিলেন। যথাসময়ে অদৃশ্যন্তী একপুত্র প্রসব করিলেন; বশিষ্ঠ তাহার নাম পরাশর রাখিলেন। পরাশর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতার মুখে পিতার মৃত্যুর কারণ অবগত হইলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষস বংশের ধ্বংসের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ পুলস্ত্য, পুলহ প্রভৃতি মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বৎস, তুমি যাহাদিগকে পিতৃহত্যার কারণ বলিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের কোন দোষ নাই; তোমার পিতাই তাঁহার নিজ বধের কারণ হইয়াছিলেন, তোমার পিতৃহন্তা কল্মাষপাদ শাপমুক্ত হইয়া এখন স্বর্গে বাস করিতেছেন। অতএব তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। প্রজাক্ষয়ে কাজ নাই।" ঋষিদিগের উপদেশে পরাশর সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি হিমালয়ের উত্তর দিকে মহাবনে নিক্ষিপ্ত হইল। অদ্যাবধি এই অগ্নি প্রতি পর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সহিত পর্ব্বত দগ্ধ করিয়া থাকে। (মহাভা-আদি)।

পরাশর বেদবিভাগকর্ত্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জনক। পরাশর তীর্থযাত্রা উপলক্ষে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া একদিন যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং নদী পার করিবার জন্য ধীবরকে আদেশ করিলেন। ধীবর তদীয় কন্যা মৎস্য-গন্ধাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। নদীর মধ্যভাগে নৌকা উপস্থিত হইলে, মুনি কামাতুর হইয়া মৎস্যগন্ধার সঙ্গম প্রার্থনা করেন। মৎস্যগন্ধা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া মুনির অভিলাষ পূরণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনতি-বিলম্বে নৌকা যমুনার দ্বীপে উপনীত হইল। মৎস্যগন্ধা মুনিকে রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন যেহেতু দিবাবিহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মুনি তপোবলে চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করিলেন এবং মৎস্যগন্ধার অনুরোধে তাহার শরীর সুগন্ধযুক্ত করিয়া তাহাতে সঙ্গত হইলেন। এই সঙ্গমের ফলে বেদব্যাসের উৎপত্তি হইল। ইনি দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ননামে অভিহিত হইলেন। দ্বৈপায়ন জন্ম গ্রহণ করিয়াই মাতার অনুমতি

গ্রহণপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে চলিয়া গেলেন। বনগমনের সময় মাতাকে বলিয়া গেলেন, স্মরণ মাত্রেই তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরাশর এক সংহিতা প্রণয়ন করেন; এই স্মৃতিশাস্ত্র পরাশরসংহিতা নামে খ্যাত।

পরীক্ষিৎ—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র ও কুরুক্ষেত্রে অন্যায়যুদ্ধে হত বীরবর অভিমন্যুর পুত্র। পরীক্ষিৎ মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের কন্যা উত্তরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একদা পরীক্ষিৎ শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার রাজ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে। তিনি কলিকে দমন করিতে বহির্গত হইয়া সরস্বতী নদী তীরে উপনীত হইলেন। এখানে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রাজবেশপরিহিত এক শূদ্র একটী গাভী ও একটী বৃষকে দণ্ডাঘাতে তাড়না করিতেছে। সেই বৃষের তিনটী পা নাই, একটীমাত্র পদ আছে। রাজা পরীক্ষিৎ মনে করিলেন যে এই বৃষই ত্রিপাদহীন ধর্ম্ম, গাভীটী পৃথিবী এবং দণ্ডধারী শূদ্রটী কলি। বৃষের নিকট পরিচয় পাইয়া রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে বধ করিতে খড়্গোত্তোলন করিলেন। কলি রাজবেশপরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা পরীক্ষিতের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার শরণ লইলেন এবং তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ অত্যন্ত করুণহৃদয়; তিনি কলিকে পদতলে পতিত দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাঁহার প্রাণসংহারে বিরত হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি কলির বাসের জন্য দ্যূত, মদ্যাদিপান, স্ত্রী, হিংসা এই সমুদয় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই চারি বিষয়ে চারি প্রকার অধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে; দ্যূতে মিথ্যা, মদ্যপানে মত্ততা নিমিত্ত তপোনাশ, স্ত্রীতে শৌচনাশ, হিংসায় ক্রূরতাপ্রযুক্ত দয়ানাশ ইত্যাদি অধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। (শ্রীমদ্ভা—১৭ অ)

একদা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া এক বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং এক মুনিকে দেখিয়া পলায়িত মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং তিনি রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধ ক্ষুধাতুর রাজা ঋষিকে নীরব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজা জানিতেন না যে মুনি মৌনব্রতাবলম্বী; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুষ্কোটীদ্বারা এক মৃত সর্প ঋষির স্কন্ধে জড়াইয়া দিলেন। ঋষি ইহাতেও কোনরূপ শব্দ প্রয়োগ না করাতে রাজা বিরক্ত হইয়া রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।

এই মুনির শৃঙ্গী নামে এক মহাতেজা পুত্র ছিল। ইঁহার এক বয়স্য পরিহাসচ্ছলে বলিল, "হে শৃঙ্গিন্, তুমি গর্ব্বিত হইও না, তোমার পিতা মৃত সর্প স্কন্ধে ধারণ করিতেছেন।" এই বাক্যে শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক অভিশাপ দিলেন, "যে পাপাত্মা নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প দিয়াছে, আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে তক্ষক আসিয়া তাহাকে দংশন করিবে।" যখন শৃঙ্গীর পিতা পুত্রের মুখে এই শাপ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন তিনি শৃঙ্গীকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া শাপ প্রত্যাহার করিতে বলিলেন, কিন্তু পুত্র কিছুতেই শাপ প্রত্যাহার করিলেন না। তখন মুনি গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া পুত্রের শাপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং তক্ষকের আক্রমণ হইতে সতর্ক থাকিতে বলিলেন। এদিকে সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে তক্ষক কাশ্যপ নামক এক ব্রাহ্মণকে রাজধানীর দিকে দ্রুত যাইতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি কোথায় যাইতেছ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ তক্ষক আমাদের রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিবে, আমি তাহাকে আরোগ্য করিতে যাইতেছি।" তক্ষক আত্ম-পরিচয় দিয়া এক বৃক্ষে দংশন করিল; বৃক্ষটী তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইলে তক্ষক বৃক্ষটীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিলেন। কাশ্যপ অবিলম্বে বৃক্ষের জীবন দান করিলেন। তক্ষক বিষ-বৈদ্য ব্রাহ্মণের ক্ষমতা দেখিয়া বিমর্ষ ও নিরাশ হইল; ব্রাহ্মণের সহিত আলাপে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রচুর অর্থলাভের আশায় রাজার নিকট যাইতেছেন। ইহা অবগত হইয়া তক্ষক ব্রাহ্মণকে আশাতিরিক্ত অর্থদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং তাঁহাকে রাজার চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ প্রচুর অর্থ পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছদ্মবেশধারী তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

(মহাভা—আদি—৫০ অ এবং বিষ্ণুপুরাণ)।

দেবীভাগবতে মূল ঘটনা এইরূপই বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহাতে লিখিত আছে যে, পরীক্ষিৎ সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তক্ষক কয়েকটী সর্পকে তপস্বী সাজাইয়া তাহাদের হস্তে ফল দিল এবং স্বয়ং সেই ফলের ভিতর প্রবেশ করিল। তপস্বীবেশধারী সর্পদিগকে দ্বার-রক্ষকেরা রাজভবনে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, তবে তাহাদের প্রদত্ত ফল রাজার সমীপে উপস্থিত করিয়াছিল। রাজা একটী সুপক্ক ফল বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে একটী ক্ষুদ্র কীট দেখিতে পাইলেন; তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। রাজা দেখিলেন ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হয়, এজন্য ঐ ক্ষুদ্র কীটদ্বারা দষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-বাক্যের সম্মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ঐ কীটকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন। তক্ষক তখন স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজাকে দংশন করিল। তাহার দংশনে রাজা প্রাণত্যাগ করিলে তক্ষক গগনে প্রস্থান করিল। (দেবী ভাঃ ২য় স্ক)।

পশুপতি—ব্রহ্মা আদি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত সকলই পশুনামে অভিহিত। এই সকলের পতি বলিয়া মহাদেব পশুপতি নামে পরিচিত।

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ পশবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং পতির্মহাদেবঃ স্মৃতঃ পশুপতিঃ শ্রুতৌ॥”

(চিন্তামণি উদ্ধৃত বচন)।

“অহঞ্চ সর্ব্ববিদ্যানাং পতিরাদ্যঃ সনাতনঃ।
অহং বৈ পতিভাবেন পশুমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥
অতঃ পশুপতির্নাম তৎলোকে খ্যাতিমেষ্যতি॥

(বরাহ পুরাণ)।

অর্থ—আমিই সকল বিদ্যার আদি ও পতি এবং পশুমধ্যে পতিভাবে ব্যবস্থিত এইজন্য লোকে আমাকে পশুপতি বলে।

পাণ্ডু—বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজপুত্র। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের বিধবা পত্নী অম্বালিকার গর্ভে উৎপন্ন। (অম্বালিকা দেখ)। ইঁহার দুই পত্নী, কুন্তী ও মাদ্রী। ভোজকন্যা কুন্তী স্বয়ংবরে পাণ্ডুকে বরমাল্য দিয়া পতিত্বে বরণ করেন। তৎপর ভীষ্ম মদ্রদেশাধিপতির কন্যা মাদ্রীকে পাণ্ডুর সহিত বিবাহ দেন। ভীষ্মই ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের অভিভাবক ছিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন ইঁহারা কুন্তীর গর্ভে এবং নকুল ও সহদেব মাদ্রীর গর্ভে উৎপন্ন। ইঁহারা সকলেই পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ-পুত্র। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের ঔরসে, ভীম বায়ুর ঔরসে, অর্জ্জুন ইন্দ্রের ঔরসে, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ-পুত্রগণ পাণ্ডব নামে খ্যাত হইলেন।

পাণ্ডু শান্তনুর নষ্টপ্রায় কীর্ত্তির উদ্ধারসাধন করেন। তিনি রাজগণকে পরাজিত করিয়া, প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন এবং তদ্দ্বারা পাঁচটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর পত্নীদ্বয়সহ পাণ্ডু বনে গমন করেন। এই বনে একদিন এক মহাতেজস্বী ঋষিপুত্র মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক এক মৃগীর সহিত সঙ্গত হইতেছিলেন। রাজা পাণ্ডু এই কাম-মোহিত মৃগ ও মৃগীকে পাঁচটী শরে বিদ্ধ করিলেন। এই মৃগরূপী ঋষিকুমার বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগীতে সংসক্ত থাকিয়াই রাজাকে বলিলেন “আমি ফলমূলাহারী মুনি; আমার নাম কিমিন্দম; আমি লোকলজ্জায় মৃগরূপ ধারণ করিয়া মৃগীতে মৈথুনাচরণ করিতেছিলান; তুমি অতৃপ্তি কালে আমাকে সংহার করিলে। আমার মৃগরূপাবস্থায় তুমি আমাকে বধ করিয়াছ এজন্য তোমার ব্রহ্মবধের পাতক হইবে না, কিন্তু আমি অভিশাপ দিতেছি যে, স্ত্রীসংসর্গ করিলে তুমিও অতৃপ্ত মনে প্রাণত্যাগ করিবে।” এই শাপপ্রভাবে পাণ্ডু স্ত্রীসংসর্গ করেন নাই। কুন্তী দুর্ব্বাসার নিকট যে মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবে দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি তিন পুত্র লাভ করেন। (কুন্তী দেখ)। পাণ্ডুর

অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকেও ঐ মন্ত্র শিক্ষা দেন এবং মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুলসহদেবকে লাভ করেন। বসন্ত সময়ে একদিন পাণ্ডু মদনার্ত্ত হইয়া মাদ্রীর নিষেধসত্ত্বেও তাহাতে সঙ্গত হন এবং মৃগরূপী মুনির শাপে দেহত্যাগ করেন। মাদ্রী পাণ্ডুর অনুগমন করিলেন। অরণ্যস্থ মহর্ষিগণ কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবসহ এই দুই মৃত দেহ লইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও মাদ্রীর শোকে বহু বিলাপ করিলেন, অবশেষে তাঁহাদের আজ্ঞায় বিদুর পাণ্ডুর মৃতদেহের সৎকার করেন।

পার্ব্বতী—মহাদেবের পত্নী। দক্ষযজ্ঞে সতী অনিমন্ত্রিতভাবে উপস্থিত হইলে পিতাকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হন এবং পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতরাজ হিমাচলের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পর্ব্বতরাজকন্যা বলিয়া ইঁনি পার্ব্বতী নামে খ্যাত হন। (অজমুখ ও দক্ষ দেখ)

পুণ্ড্র—বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। (অঙ্গ দেখ)।

পুরঞ্জয়—একজন সূর্য্যবংশীয় প্রাচীন রাজা। পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণ দৈত্যের নিকট পরাজিত হইলে তাঁহারা গোলোকবিহারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার পরামর্শে দেবগণ মহারাজ পুরঞ্জয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দেবগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি ইন্দ্রকে বৃষরূপ ধারণ করিতে বলেন। ইন্দ্র প্রথমে লজ্জায় অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে দেবগণের অনুরোধে সম্মত হন। পুরঞ্জয় বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুদে (ঝুঁটিতে) আরোহণ করিয়া দৈত্যদিগকে পরাজয় করেন। তদবধি পুরঞ্জয় "ককুৎস্থ" নামে আখ্যাত হন এবং তদ্বংশীয় রাজগণ "কাকুৎস্থ" নামে জগতে পরিচিত হইয়াছেন। (বিষ্ণু পুঃ)

পুরন্দর—দেবরাজ ইন্দ্রের নামান্তর। শত্রুনগরী বিদারণ করেন বলিয়া দেবরাজের এই আখ্যা।

পুরু—(১) যযাতির পুত্র ও নহুষের পৌত্র। যযাতির দুই পত্নী দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা ও শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার তনয়া। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে যযাতির দুই পুত্র জন্মে এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুনামে তাঁহার তিনপুত্র হয়। শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে রাজা দৈত্যগুরুকে অনুনয় করিয়া অপরের সম্মতিতে তাহাতে জরা সংক্রমণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। যযাতি একে একে সকল পুত্রকেই জরা গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন; কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত আর কেহই জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। যযাতি পুরুতে জরা সংক্রামিত করিলেন এবং তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন।

পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করাতে পুরু সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে অতিক্রম করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পুরুর তিন পুত্র জন্মে—প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব। (মহাভারত ও হরিবংশ)।

পুরুকুৎস—মান্ধাতার পুত্র। ইঁনি রাজা শশবিন্দুর দুহিতা ইন্দুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুচুকুন্দ। পুরুকুৎসের পত্নী ঋষিশাপে নদীরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। মহর্ষি সৌভরি ইঁহার পঞ্চাশটী ভগিনীকে বিবাহ করেন। নর্ম্মদা নদীর উত্তরতীরবর্ত্তী দেশসমূহে পুরুকুৎস রাজত্ব করিতেন। নর্ম্মদা গর্ভে পুরুকুৎসের এক পুত্র জন্মে। ইঁহার নাম ত্রসদস্যু। পুরুকুৎস নর্ম্মদার অনুনয়ে পাতালে গমনপূর্ব্বক বহু গন্ধর্ব্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। (হরিবংশ)।

পুরূরবা—বুধের পুত্র ও চন্দ্রের পৌত্র। চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অপহরণ করেন। তৎকালে তারার গর্ভে চন্দ্রের এক পুত্র হয়; এই পুত্রের নাম বুধ; (তারা দেখ)। বুধ রাজপুত্রী ইলাকে বিবাহ করেন। এই ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে পুত্র জন্মে। উর্ব্বশী ইন্দ্রশাপে পুরূরবার ভার্য্যারূপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। (উর্ব্বশী দেখ) রাজা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাতে উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। পুরূরবা উর্ব্বশীর বিরহে অধীর হইয়া পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন করেন, অবশেষে একদিন কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে তাহার সাক্ষাৎ পান।

রাজা তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেন। উর্ব্বশী রাজার মানসিক দুরবস্থা অবগত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনার সহযোগে গর্ভবতী হইয়াছি; সংবৎসর পরে কতিপয় সন্তান জন্মিবে; আমি তাহাদিগকে আপনার গৃহে দিয়া আসিব এবং সেই সময় একরাত্রি আপনার সহিত যাপন করিব। উর্ব্বশীর গর্ভে রাজা পুরূরবার আয়ু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে; উর্ব্বশী ইহাদিগকে লইয়া রাজার নিকট দিয়া আসেন এবং একরাত্রি তাঁহার সহিত বাস করেন। প্রয়াগ নগরী পুরূরবার রাজধানী ছিল; এই নগরী জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। পুরূরবা গন্ধর্ব্বদিগের নিকট একটী অগ্নিপূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হন। তিনি এই অগ্নিদ্বারা বহু যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক যজ্ঞবলে গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হন।

পুরোচন—দুর্য্যোধনের মিত্র ও কর্ম্মচারী। ইনি জাতিতে যবন। দুর্য্যোধনের আদেশে ইনি পাণ্ডবদিগের বিনাশের জন্য বারণাবত নগরে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করেন। বিদুরের সাঙ্কেতিক বচনে পাণ্ডবেরা পুরোচনের এই দুরভিসন্ধি অবগত হন। ভীমসেন পুরোচনের গৃহে এবং তাঁহাদের আবাসের জন্য যে জতুগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে অগ্নিদান করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণসহ সুরঙ্গপথে পলায়ন করেন। পুরোচন স্বগৃহে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (মহাভা—আদি)

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং ইনি একজন প্রজাপতি মধ্যে গণ্য। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা। পুলস্ত্যের আশ্রমের সমীপে অপ্সরা ও মুনিকন্যাগণ মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি করিত; ইহাতে ঋষির তপোবিঘ্ন হইত। এজন্য ঋষি অভিশাপ দেন যে, কোন নারী তাঁহার দৃষ্টিপথগত হইবামাত্র গর্ভবতী হইবে। দৈবক্রমে তৃণবিন্দু ঋষির কন্যা হবির্ভূ ইঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হন; ইহাতে হবির্ভূ গর্ভবতী হন। অনন্তর তৃণবিন্দুর অনুরোধে পুলস্ত্য হবির্ভূকে বিবাহ করেন; হবির্ভূর গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। বিশ্রবার প্রথমা পত্নী দেববর্ণিনীর গর্ভে ধনাধিপ কুবেরও অপরা ভার্য্যা কৈকসীর গর্ভে রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয়ের জন্ম হয়। (কুবের দেখ)। (রামা—উত্তর)

পুলহ—ইনিও পুলস্ত্যের ন্যায় ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম। পুলহের পত্নী গতি; ইঁহার গর্ভে কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীমান্ ও সহিষ্ণু নামে পুলহের তিন পুত্র জন্মে। (ভাগবত)

কাহারও মতে পুলহের পত্নীর নাম ক্ষমা এবং ক্ষমার গর্ভে পুলহের কর্দ্দম, অর্ব্বরীজও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র হয়।

পুলোমন্—বেদরাজ ইন্দ্র ইঁহার কন্যা শচীকে বিবাহ করেন।

পুলোমা—মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ও চ্যবনের মাতা। ইঁহার পিতা দৈত্যরাজ বৈশ্বানর।

পুষ্কর—নিষধরাজ নলের কনিষ্ঠভ্রাতা। পুষ্কর কলির সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করেন এবং নিজে নিষধের রাজা হন। কলি নলকে পরিত্যাগ করিলে নল পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হন।

পুষ্পদন্ত—(১) শিবের অনুচর বিশেষ। এই অনুচর একদা গোপনে মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন, ইহাতে পার্ব্বতী অতি ক্রুদ্ধ হন। গৌরীর শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্ত্যলোকে কৌশাম্বী নগরে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণের নাম সোমদত্ত; সোমদত্ত পুত্রের নাম কাত্যায়ন—বররুচি রাখিলেন। (পাণিনি দেখ) কথাসরিৎসাগর)

(২) একজন প্রধান গন্ধর্ব্ব। ইনি পার্ব্বতীর সহচরী জয়ার স্বামী। ইনি কোন কারণে শিবের কোপে পতিত হইয়া আকাশমার্গে গমনের ক্ষমতাচ্যুত হন, পরে বহু প্রকারে শিবের স্তব করাতে, মহাদেবের অনুগ্রহে পুনরায় খেচরত্ব লাভ করেন। পুষ্পদন্তের রচিত শিবস্তোত্র মহিম্নস্তোত্র নামে খ্যাত। মহিম্নস্তব শিবপূজায় পঠিত হয়।

(৩) অষ্ট দিগ্‌গজের মধ্যে অন্যতম। উত্তরপশ্চিম দিগের অধিপতি বায়ু, এই হস্তীর উপর আরূঢ় হইয়া উক্তদিক রক্ষা করিয়া থাকেন।

পূতনা—দানবী বিশেষ। এই দানবী কংসকর্ত্তৃক কৃষ্ণবধার্থ গোকুলে প্রেরিত হয়। এই বালঘাতিনী দানবী মায়াবলে রমণীয় স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নন্দালয়ে উপস্থিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার মুখে বিষপূর্ণ স্তন দান করে। শ্রীকৃষ্ণ স্তনপান করিতে আরম্ভ করিলেন; দানবী স্তনে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব

করিতে লাগিল এবং স্বীয় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখ বিবর হইতে স্তন ছাড়াইয়া আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাহাতে সমর্থ হইল না। দানবী অসহ্য যাতনা পাইয়া ঘোররবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং অবিলম্বে দেহত্যাগ করিল। শ্রীকৃষ্ণ দানবীর চক্ষের উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন। (শ্রীমদ্ভা—১০ম স্ক)

হরিবংশে বর্ণিত পূতনা ঘটিত বৃত্তান্তটি অন্যরূপ। পূতনা কংসের ধাত্রী; কংসের আদেশে পূতনা গোকুলে প্রেরিত হয়। এই মায়াবিনী ধাত্রী শকুনী বেশধারণপূর্ব্বক মধ্যরাত্রে নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দিতে লাগিল। এই সময়ে গোকুলের সকল লোক নিদ্রায় অভিভূত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করিতে লাগিলেন; পূতনা অসহ্য যাতনা অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে ছিন্নস্তনী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। নন্দালয়ে সকলে জাগরিত হইল এবং পূতনার মৃত দেহ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাঁহারা কেহই পূতনার মৃত্যুর কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না।

পৃথু—বেণ রাজের পুত্র। ইনি বাহুবলে পৃথিবীস্থ সমুদয় নৃপতিকে পরাজয় করেন। ইঁহাদ্বারা পৃথিবী মণ্ডল প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া ইনি পৃথুনামে খ্যাত হন। মহর্ষিগণ ইঁহার অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার শাসনকালে ভূমি কর্ষিত না হইয়াও অভীষ্ট ফল দান করিত; ধেনুসকল কামদুঘা হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপ-সম্পন্ন মহারাজ পৃথু নানা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় প্রাণীকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তুর স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি ৬৬ হাজার সোণার ছাতা ও মণিরত্নে ভূষিত সুবর্ণময় পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। (মহাভা—দ্রোণ)

পূর্ব্বকালে অত্রিবংশে অঙ্গনামে এক প্রজাপতি ছিলেন। ধর্ম্মরাজদুহিতা সুনীথার গর্ভে ইঁহার বেণনামে একপুত্র জন্মে। বেণ অতি পাষণ্ড, দুরাচার ও কুনৃপতি। এই পাপাত্মা নৃপতি মনে করিতে লাগিলেন যে তদপেক্ষা কেহ পূজ্য নাই; কাজেই দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞ সকল কেবল নিস্ফল আড়ম্বর মাত্র।

বেণের অত্যাচারে লোক সকল প্রপীড়িত হইতে লাগিল। অনন্তর একদা মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ইঁহার দুর্ব্বৃত্ততা সহ্য করিতে না পারিয়া ইঁহাকে এই সমুদয় অত্যাচারমূলক কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত বেণ তাঁহাদের বাক্য উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে ঋষিগণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং সমবেত হইয়া বলগর্ব্বিত বেণকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বেণের বাম উরু নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। এই মথ্যমান উরু হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উদ্ভূত হইল। এই পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষিগণের সম্মুখে ভয়বিহ্বলচিত্তে দণ্ডায়মান রহিল। ঋষি-শ্রেষ্ঠ অত্রি ইঁহাকে ভীত দেখিয়া বলিলেন "নিষীদ" (উপবেশন কর)। এই পুরুষই নিষাদ বংশের আদিপুরুষ। এই পুরুষ হইতে ধীবর সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ধীবরদিগকে বেণকল্মষ সম্ভূত বলিতে হইবে। অনন্তর ঋষিগণ বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিতে লাগিলেন; এই মথিত বাহু হইতে প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ পৃথু উদ্ভূত হইলেন। পৃথু জন্মকালেই কবচ, ধনু ও দিব্য শরগ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। সৎপুত্র পৃথু উৎপন্ন হইলে বেণ পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া পৃথুকে ভূমণ্ডলের একাধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথিবীস্থ জনগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানপূর্ব্বক তিনি রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা সমস্ত প্রজা উপস্থিত হইয়া পৃথুকে তাহাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে বলিলেন। পৃথু তাহাদের প্রার্থনায় শর সন্ধান করিয়া পৃথিবীকে আক্রমণ করিলেন। পৃথিবী পৃথুর ভয়ে ভীত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথুও ধনুর্ব্বাণ হস্তে পৃথিবীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এইরূপে গোরূপধারিণী ধরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও স্থির থাকিতে পারিলেন না; সর্ব্বত্রই পৃথু শর হস্তে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পৃথ্বী মহারাজ পৃথুর শরণ লইলেন। পৃথু কহিলেন "হে ধরিত্রী তুমি সকল প্রজালোকের জীবিকা

বিধান কর এবং আমার দুহিতৃত্ব লাভ কর।" পৃথিবী কহিলেন, "আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি; কিন্তু কিপ্রকারে আপনি প্রজা ধারণ করিবেন তাহা চিন্তা করুন। প্রজাদিগের জীবিকা বিধান করিতে হইলে আমাকে দোহন করা আবশ্যক। কিন্তু দোহন করিতে বৎসের প্রয়োজন; বৎসব্যতীত কখনও ক্ষীর প্রস্রুত হইতে পারে না। আর আমাকে সমতলও করিতে হইবে, নচেৎ আমাহইতে প্রস্রুত ক্ষীর কিরূপে সর্ব্বত্র প্রসৃত হইবে?"

পৃথু এইরূপে অভিহিত হইয়া ধনুকের অগ্রভাগদ্বারা অসংখ্য পর্ব্বত উৎসারিত করিয়া উপর্য্যুপরি স্থাপন করিলেন। এইরূপে সমস্ত পৃথিবী সমতল হইল। অনন্তর মহারাজ পৃথু ভগবান স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে গোরূপা পৃথিবী হইতে বিবিধ শস্যজাত দোহন করিলেন। প্রজাগণ সেই অন্ন দ্বারা অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছে। অনন্তর ঋষিগণ সোমদেবকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী পুনরায় দোহন করাইয়াছিলেন। এইবারে দেবগুরু বৃহস্পতি দোহন কর্ত্তা, বেদচতুষ্টয় পাত্র ও শাশ্বত তত্ত্বজ্ঞান দুহ্যমান পদার্থ হইল। অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কাঞ্চনপাত্রে পৃথিবী পুনর্ব্বার দোহন করেন। এবার দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং বৎস-সবিতা দোগ্ধা হইলেন ও যজ্ঞীয় হবিঃ ক্ষীররূপে উৎপন্ন হইল। পৃথুর নিকট ধরা দুহিতৃত্ব স্বীকার করেন বলিয়া বসুন্ধরা পৃথ্বী নামে অভিহিত হইলেন। মহারাজ পৃথু এইরূপ অলোকসামান্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়া রাজন্যগণের অগ্রণী হইলেন। (হরিবংশ ৫ম ও ৬ষ্ঠ অ)

শ্রীমদ্ভাগবতে পৃথুঘটিত বৃত্তান্ত এইরূপ:—ব্রাহ্মণগণ অপুত্রক বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করাতে তাহা হইতে একটী পুরুষ ও অপরটী স্ত্রী উৎপন্ন হইল। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, যেহেতু এই পুরুষ সকল রাজার প্রথম এই জন্যই পৃথু নামে অভিহিত হইবেন। কন্যার নাম অর্চ্চি রাখা হইল। ব্রাহ্মণগণের অভিপ্রায়ানুসারে পৃথুর সহিত অর্চ্চি বিবাহিতা হইলেন। অনন্তর কুবের পৃথুকে স্বর্ণময় আসন, বরুণ শুভ্র ছত্র, বায়ু দুইটী ব্যজন, ব্রহ্মা বেদময় কবচ, হরি সুদর্শন চক্র ও লক্ষ্মী অনপায়িনী সম্পত্তি দান করিলেন এবং ভগবান রুদ্র তাহাকে একখানি অসি দান করিলেন। অতঃপর অগ্নি পৃথুকে ছাগ ও সূর্য্য রশ্মিময় বাণ এবং ভূমি যোগময়ী পাদুকা উপহার দিলেন।

এই মহাত্মা পৃথু ভগবান হরির অংশে উৎপন্ন। ইনি সকল প্রজার প্রতি সমভাবে দিবাকরের ন্যায় প্রতাপ বিস্তার করিতে লাগিলেন। পৃথু মনোরঞ্জন কার্য্যদ্বারা সকল লোকের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি পরস্ত্রীতে মাতৃভক্তি ও আত্মপত্নীতে দেহার্দ্ধবৎ প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পৃথু শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু ইহার শেষ যজ্ঞটী সমাপ্ত না হইতেই দেবরাজ ইন্দ্র এই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করেন। অনন্তর সনৎকুমারের আরাধনা করিয়া ইনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং যথাসময়ে সদ্গতি লাভ করেন। অন্যান্য অংশ হরিবংশে বর্ণিত বৃত্তান্তের অনুরূপ।

পৌণ্ড্রক—পুণ্ড্রদেশের একজন রাজা; ইনি পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নামে খ্যাত। ইনি জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বাসুদেব। বসুদেবের দুই পত্নী ছিল, সুতনু ও নাচাটী। সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্রক এবং নাচাটীর গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল সংসারত্যাগী হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করেন; পৌণ্ড্রক বাসুদেব নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে থাকেন। বাসুদেব দ্বারকায় অবস্থিত হইয়া এই পৌণ্ড্রক বাসুদেবের প্রগল্‌ভতা শুনিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে যে বাসুদেব বলা হইত, ইহা পৌণ্ড্রক সহ্য করিতে পারিতেন না। পৌণ্ড্রক মনে করিতেন, "আমি শঙ্খচক্র-গদাধারী; আমার শার্ঙ্গ, শরাসন, শর ও তূণীর আছে। আমার মত সহায় কাহারও নাই।" এইরূপে তিনি দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেন। তিনি আরও বলিতেন "এই জগতে বাসুদেব বলিয়া যে নাম ছিল, তাহা গোপতনয় হরণ করিয়াছে।" তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শাস্তি দিবার জন্য দ্বারকা আক্রমণ করেন। বহু যাদব তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হয়। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব হত হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চক্রদ্বারা পৌণ্ড্রকের দেহ বিদীর্ণ করেন। (হরিবংশ ২৯১ অ)

প্রচেতা—ব্রহ্মার পুত্র। লোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় দেহ হইতে বেদ-বেদাঙ্গবিৎ পুত্রগণের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের নাম—অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রতু বশিষ্ঠ, বোঢ়ু, কপিল, আসুরী, কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ ও প্রচেতা। (ব্রহ্মবৈ-শ্রীকৃষ্ণ খং—৩২ অং)।

প্রতর্দ্দন—(গালব দেখ)।

প্রতীপ—মহারাজ শান্তনুর পিতা।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কামদেব হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়া প্রদ্যুম্ননামে শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম দিন হইতে সপ্তম দিনে শ্রীকৃষ্ণের প্রবল শত্রু শম্বরাসুর তাঁহাকে সূতিকাগৃহ হইতে অপহরণ করেন। দেবমায়াভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবগত হইয়াও ইহার কোন প্রতিকার করিলেন না। মায়াবতী নামে দৈত্যপতি শম্বরের এক মহিষী ছিলেন; মায়াবতী অপুত্রা ছিলেন; শম্বর প্রদ্যুম্নকে মায়াবতীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে বলেন। মায়াবতী আর কেহ নহেন, স্বয়ং রতি দেবী। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়াই মায়াবতীর পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হইল; তিনি স্বামীকে পুত্রবৎ লালনপালনে সঙ্কোচ মনে করিয়া ধাত্রীহস্তে ইঁহার লালনপালনের ভার অর্পণ করেন। যখন প্রদ্যুম্ন যৌবন সীমায় উপস্থিত হইলেন তখন মায়াবতী তাঁহাকে কান্তভাবে পাইবার জন্য হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি পুত্রভাব পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিতেছ কেন?" মায়াবতী প্রদ্যুম্নকে নির্জ্জনে লইয়া বলিলেন, "নাথ, তুমি আমার পুত্র নহ, শম্বরও তোমার পিতা নহেন। তুমি বৃষ্ণিবংশসম্ভূত; তুমি রুক্মিণীগর্ভজাত এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। তোমার জন্মের সপ্তম দিবসে আমার স্বামী শম্বর তোমাকে সূতিকাগৃহ হইতে অপহরণ করেন। আমি তোমার রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি শম্বরকে বিনাশ করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর।" এই কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন কোন ছলে শম্বরের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করেন ও তাহাকে যুদ্ধে বৈষ্ণবাস্ত্রপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া মায়াবতীসহ দ্বারকায় রুক্মিণী ভবনে উপস্থিত হন। রুক্মী ইঁহার মাতুল। ইনি রুক্মীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে ইঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্ন অসীম বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন; তিনি বহুযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা করিয়াছেন। আত্মদ্রোহে যদুবংশ ধ্বংস হইবার সময় ইনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি অসুররাজ বজ্রনাভের তনয়া প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। প্রভাবতী সহচরীর মুখে প্রদ্যুম্নের গুণাবলী অবগত হন এবং পরে ঘটনাক্রমে প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরে উপস্থিত হইলে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। এই বিবাহের ফলে প্রভাবতীর গর্ভলক্ষণ দেখা দিলে অসুরগণ একত্র হইয়া ইঁহার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করে। প্রদ্যুম্ন একাকীই সমবেত অসুরদিগকে সবংশে নিহত করেন। প্রভাবতীর গর্ভজাত পুত্রই বজ্রপুরের রাজপদে আসীন হন। (বজ্রনাভ দেখ)।

(হরিবংশ—১৬২—১৬৪অ)।

প্রদ্বেষী—মহর্ষি দীর্ঘতমার পত্নী।

প্রধা—প্রজাপতি ঋষি কশ্যপের ভার্য্যা। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

(হরিবংশ ও মহাভা বন-আদি)

প্রমদ্বরা—গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে এই কন্যার উৎপত্তি। প্রমতি ঋষির পুত্র রুরু ইঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে রুরুর ঔরসে মহর্ষি শুনকের জন্ম হয়। (মহাভা—আদি)।

প্রলম্ব—এক দুর্বৃত্ত দানব। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং গোপ বালকগণ যখন খেলা করিতেছিলেন তখন এই দানব গোপবেশধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বাসুরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গোপ বালকগণের সহিত কৃত্রিম মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই কৃত্রিম যুদ্ধে পণ হইল যে, পরাজিত ব্যক্তি জেতাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবেন। প্রলম্বাসুর বলরামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক লইয়া চলিল। বলরামকে কিছু দূরে লইয়া গিয়া বধ করাই প্রলম্বের ইচ্ছা ছিল। বলরাম ইহা বুঝিতে পারিয়া এত ভারী হইলেন যে, প্রলম্ব আর তাঁহাকে বহন করিতে পারিল না। অবশেষে প্রলম্ব স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বলরামকে আক্রমণ করিল। কিন্তু অবিলম্বে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বলরামের হস্তে নিহত হইল। (শ্রীমদ্ভা—১০ম স্কঃ)।

প্রসূতি—দক্ষের পত্নী ও সতীর মাতা। দক্ষযজ্ঞধ্বংস করিয়া মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলে প্রসূতির অনুরোধে পুনরায় তিনি দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

প্রহ্লাদ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র। ইনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বাল্যকালেই ইঁহার বিষ্ণুভক্তি প্রকাশ পায়। দৈত্যরাজের পুরোহিত যণ্ড ও অমর্কের উপর প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল। প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া তাঁহার গুরু তাঁহাকে বিষ্ণুনাম লইতে নিষেধ করেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না, বরং প্রহ্লাদের অনুরোধে অন্যান্য দৈত্য-বালকগণও বিষ্ণুভক্ত হইয়া উঠিল। যণ্ডামার্ক বিপদ্ মনে করিয়া প্রহ্লাদের ব্যবহার দৈত্যপতির নিকট জ্ঞাপন করিলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পরুষবাক্যে প্রহ্লাদকে ভৎর্সনা করিলেন; কিন্তু প্রহ্লাদ বিনীতভাবে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পিতার নিকট বিষ্ণুর গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া প্রহ্লাদকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ, সর্পবিষপ্রয়োগ, জলে বিসর্জ্জন এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ভগবান স্বীয় ভক্তকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বধ করিতে না পারিয়া নিতান্তই বিষণ্ণ হইলেন। অবশেষে দৈত্য-পুত্র প্রহ্লাদ, দৈত্যরাজের উপরও যে জগতের ঈশ্বর আছেন, তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ আরও বলিলেন যে, সেই ঈশ্বর সর্ব্বত্র সকল ঘটে বর্ত্তমান। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, "অরে মন্দবুদ্ধি, তোর নিতান্ত মৃত্যু উপস্থিত। যদি তোর ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, তবে এই সম্মুখবর্ত্তী স্তম্ভে নাই কেন?" প্রহ্লাদ স্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক হরিকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন "ঐ যে হরি দেখা যাইতেছে।" হিরণ্যকশিপু স্তম্ভের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি প্রহ্লাদের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সিংহাসন হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক স্তম্ভোপরি এক দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র স্তম্ভের মধ্যে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রুত হইল। প্রহ্লাদ স্তম্ভের মধ্যে নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিলেন; কিন্তু হিরণ্যকশিপু তাহা দেখিতে না পাইয়া কোন্ স্থান হইতে শব্দ উদ্গত হইতেছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে সেই ভয়ঙ্কর নৃসিংহমূর্ত্তি স্তম্ভ হইতে নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু গদাগ্রহণপূর্ব্বক সেই নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তদুপরি গদাঘাত করিতে লাগিলেন। ভগবান নৃসিংহ-রূপধারী হরি দানবকে ধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে আপনার উরুর উপর নিপাতিত করিয়া নখদ্বারা তাঁহার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিলেন এবং যে সকল অনুচর অস্ত্রধারণপূর্ব্বক দানবরাজের উদ্ধারার্থ উদ্যত হইয়াছিল তাহাদিগকে নখরাঘাতে নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও দেবর্ষিগণ সকলে সেই সভায় উপস্থিত হইয়া নৃসিংহের কোপশান্তির জন্য স্তব আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার নিয়োগে প্রহ্লাদ নৃসিংহের কোপপ্রশমনের জন্য স্তব করিতে লাগিলেন। নৃসিংহরূপী ভগবান হরি ভক্ত প্রহ্লাদের স্তবে প্রীত হইয়া ক্রোধসংহারপূর্ব্বক প্রহ্লাদকে বলিলেন, "হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ বলিলেন, "আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত, আবার এই সকল বরদ্বারা কামের প্রতি লোভ দেখাইবেন না; আমি কামসঙ্গ হইতে ভীত হইয়া নির্ব্বিঘ্নচিত্তে মুক্তিবাসনায় আপনার শরণ লইতেছি। যদি আপনি আমাকে অভিলষিত বর নিতান্তই দান করেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে আমার হৃদয় মধ্যে যেন কামাঙ্কুর উৎপন্ন না হয়।" শ্রীহরির অনুরোধে প্রহ্লাদ অপর বরে এই প্রার্থনা করিলেন যে, "আমার পিতা আপনার ঐশ্বরিক তেজ না জানিয়া যে নিন্দা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া মিথ্যাবাদপূর্ব্বক আপনার প্রতি যে তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, এই সমুদয় ক্রিয়ায় তাঁহার যে দুস্তর পাপ হইয়াছে, তাহা হইতে তিনি মুক্ত হউন।" ভগবান বলিলেন "তোমার পিতা কেবল পবিত্রীকৃত হন নাই, তাঁহার পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষও পবিত্রীকৃত হইল, যে হেতু তুমি তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।" (শ্রীমদ্ভা-৭ম স্ক ৫।১০ অ)। হিরণ্য-কশিপু ব্রহ্মার বরে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অবধ্য হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাকে বলিলেন "আপনার অভ্যন্তরে

অথবা বাহিরে, দিবাতে অথবা রাত্রিতে আপনার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য হইতেও আমার যেন নিধন না হয়; অস্ত্র, নর কিম্বা মৃগদ্বারা যেন আমি নিহত না হই এবং ভূমিতে অথবা আকাশেও যেন আমার মরণ না হয়।" (শ্রীমদ্ভা- ৭ম স্ক)। ব্রহ্মা প্রোক্ত বর দান করাতে হরির নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করা আবশ্যক হইয়াছিল এবং তাঁহার উরুতে স্থাপন করিয়া দৈত্যরাজকে বধ করা আবশ্যক হইয়াছিল।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইঁহার ভ্রাতা উত্তানপাদ। উত্তানপাদ ধ্রুবের পিতা। (ধ্রুব দেখ)

ব

বক—অসুর বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে এই অসুর নিহত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত ধেনু চরাইতে বনগমন করিয়াছিলেন। পিপাসার্ত্ত ধেনুকে জল পান করাইবার জন্য তিনি এক জলাশয়ে উপস্থিত হন। এই সময়ে বকরূপী অসুর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বক তাহাকে উদ্গার করে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ দুই বাহুতে এই বকরূপী রাক্ষসের দুই তুণ্ড ধারণ করিয়া ইহাকে বধ করেন। (শ্রীমদ্ভা—১০ম স্ক)

বঙ্গ—বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। ইঁহার নামানুসারে ইঁহার অধিকৃত রাজ্য বঙ্গনামে অভিহিত হইয়াছে। (অঙ্গ দেখ) এই প্রদেশের বর্ত্তমান সীমা:—উত্তরে হিমাচলের পাদদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও আসামের সীমাস্থান ও পশ্চিমে বেহার। কিন্তু প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ এই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইত না। পূর্ব্বকালে কখনও ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, কখনও বা ইহা নানারাজ্যে বিভক্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বজ্র—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও অনিরুদ্ধের পুত্র। রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ফলে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি অনিরুদ্ধ রুক্মীর দৌহিত্র। এই অনিরুদ্ধই আবার রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। অনিরুদ্ধের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে বজ্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

(শ্রীমদ্ভা-১০ম স্ক-৯০ অ)

বজ্রনাভ—সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশবাসী এক মহাসুর। লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে এই অসুর সমস্ত দেবের অবধ্য হয় এবং বজ্রপুর নামে এক সুন্দর নগরী লাভ করেন। তদবধি বজ্রনাভ সুমেরুশিখর পরিত্যাগ করিয়া বজ্রপুরে বাস করিতে থাকেন। কিয়ৎকাল পরে বজ্রনাভ বরলাভে দৃপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইন্দ্রকেও স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত পরামর্শ করিয়া বজ্রনাভের সহিত দেবাসুরের জনক মহামুনি কশ্যপের নিকট উপস্থিত হন এবং বজ্রনাভের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এবিষয়ে তাঁহার আদেশ জানিতে ইচ্ছা করেন। কশ্যপ দেবরাজের কথা শুনিয়া বজ্রনাভকে বলিলেন "বৎস, আমি এক যজ্ঞ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি; এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যাহা সঙ্গত হয় তাহা আমি তোমাদিগকে বলিব। এখন তুমি প্রশান্তভাবে বজ্রপুরেই বাস কর।"

অনন্তর ইন্দ্র দ্বারকায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বজ্রনাভের দুরভিসন্ধির বিষয় জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহার পিতা বসুদেব এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তিনি বজ্রনাভকে সংহার করিবেন। এই দানবের পুর সুরক্ষিত; তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বায়ুও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। কিরূপে এই পুরীতে প্রবেশ করা যায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্র স্বর্গে প্রস্থান করিয়া স্বর্গীয় হংসদিগকে বজ্রপুরে গমন করিয়া দানবরাজের অন্তঃপুরস্থ দীর্ঘিকায় বিচরণ করিতে আদেশ করিলেন এবং দানবরাজ-কন্যা প্রভাবতীর সহিত গোপনে আলাপ করিয়া যাহাতে তাহার মন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি আকৃষ্ট হয় তদ্বিষয়ে

উপায় অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন। হংসগণ ইন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিল; প্রভাবতীর চিত্ত প্রদ্যুম্নে আকৃষ্ট হইল। প্রদ্যুম্ন হংসমুখে এই সংবাদ পাইয়া বজ্রপুরে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভদ্রনামে এক নট বজ্রপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছিল; প্রদ্যুম্নপ্রমুখ যাদবগণ এই নটবেশধারণ করিয়া বজ্রপুরে প্রবেশ করিলেন। এখানে প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের মিলন হইল ও গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ সম্পাদিত হইল। চন্দ্রবতী ও গুণবতী নামে প্রভাবতীর দুই কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন; প্রদ্যুম্নের এক ভ্রাতা গদ চন্দ্রবতীর ও অপর ভ্রাতা শাম্ব গুণবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে এই কন্যাগণের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এই ব্যাপার বজ্র-নাভের গোচরীভূত হইলে তিনি যাদবদিগকে বিনাশ করিতে আদেশ করেন। ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। প্রদ্যুম্নের হস্তে শ্রীকৃষ্ণের চক্র উপস্থিত হইল। প্রদ্যুম্ন চক্রদ্বারা বজ্রনাভের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। বজ্রপুর যাদবগণের অধিকৃত হইল। (হরিবং ১৫৭-১৫৮)

বৎসাসুর—কংসের অনুচর অসুর বিশেষ। এই অসুর কংসকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবধার্থ প্রেরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ চেষ্টায় এই অসুর বৎসরূপে বিচরণ করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া ইহাকে বধ করেন।

(শ্রীমদ্ভা—১০ম স্ক)

বভ্রু—একজন যাদব। যদুবংশের ধ্বংস হইলে ইনি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাদব রমণীদিগকে রক্ষার্থে যাইতেছিলেন কিন্তু পথে দস্যুহস্তে নিহত হন। (মহাভা—মুষল)

বভ্রুবাহন—অর্জ্জুনের পুত্র। ইনি মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতামহের মৃত্যুর পর মণিপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জ্জুন অশ্বরক্ষকরূপে সৈন্যসহ মণিপুরে উপস্থিত হন। অর্জ্জুনের ভর্ৎসনায় ও বভ্রুবাহনের বিমাতা নাগকন্যা উলুপীর উত্তেজনায় বভ্রুবাহন পিতার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অর্জ্জুন পুত্রহস্তে নিহত হন। চিত্রাঙ্গদা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পুত্র বভ্রুবাহনকে ও সপত্নী উলুপীকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন এবং স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে কৃতনিশ্চয় হন। বভ্রুবাহনও প্রাণত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। উলুপী ইঁহাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবনীমণি স্মরণ করিলেন; স্মরণ করিবামাত্র উক্ত মণি নাগনন্দিনী উলুপীর সমীপে উপস্থিত হইল। উলুপীর উপদেশ অনুসারে বভ্রুবাহন সঞ্জীবনীমণি অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন। মণির সংস্পর্শে অর্জ্জুন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। বভ্রুবাহন জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপী সহ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুন অন্যায়রূপে ভীষ্মকে বধ করিয়াছিলেন। এজন্য গঙ্গার অনুমতি লইয়া বসুগণ তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন। উলুপী এই অভিশাপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় পিতাকে বলেন। নাগরাজ বসুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে শাপ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বসুগণ নাগরাজের অনুনয়ে দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন যে, ভীষ্মের বধে অর্জ্জুনের পাপ সঞ্চিত হইয়াছে। স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার এই পাপের ক্ষয় হইবে। এইজন্য অর্জ্জুনের মঙ্গল কামনায় উলুপী বভ্রুবাহনকে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

বরাহ—ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। ইঁহার উৎপত্তি ও কার্য্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ও কালিকাপুরাণের মত নিম্নে দেওয়া গেল।

মহাপ্রলয় সময়ে পৃথিবী জলমগ্না হইলে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট থাকিবার স্থান প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি পূর্ব্বে একবার সকল জল পান করিয়াছি, আবার অকস্মাৎ ঐ জল কিরূপে উৎপন্ন হইল! এই জলমধ্যে নিমগ্ন পৃথিবীকে কি প্রকারে উদ্ধার করি? অথবা আমার চিন্তায় কি ফল? আমি যে ভগবানের হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি তিনিই এ বিষয়ে আমার যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা নির্ণয় করিবেন।" ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে সহসা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একটী বরাহ নির্গত হইল।

এই বরাহ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সমক্ষেই আকাশস্থ হইয়া ক্ষণমধ্যে এক হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার প্রাপ্ত হইল। সেই বরাহের গর্জ্জনে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ; সত্যলোক, জনলোক ও তপোলোকবাসী মুনিগণ বেদমন্ত্রদ্বারা এই বরাহকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই বরাহ জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়া দন্তাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণপূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত করিলেন। দেবগণ ঋষিগণ এই বরাহরূপী বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। (শ্রীমদ্ভা-৩য়স্ক-১৩ অঃ)

কালিকাপুরাণে বরাহঘটিত বৃত্তান্ত এইরূপ :—বরাহরূপী বিষ্ণু পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া তদুপরি বিচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ধরিত্রী বরাহের ভার সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না ; তিনি মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব বিষ্ণুকে স্বীয় বরাহশরীর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। বরাহ মহাদেবের বাক্যানুসারে স্বীয় দেহত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন যে, তিনি লোকহিতের জন্য পুনর্ব্বার বরাহদেহ ধারণ করিবেন। এই বলিয়া বরাহ অন্তর্হিত হইলেন এবং লোকালোক পর্ব্বতে যাইয়া বরাহরূপিণী ধরিত্রীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গমের ফলে ধরণীর গর্ভে সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর নামে তিনটী মহাবলশালী পুত্রের উৎপত্তি হয়। এখন পুত্রপরিবৃত বরাহের ভারে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। দেবগণ বরাহের নিকট তাঁহার স্বীয় ভয়ঙ্কররূপ সংহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বরাহরূপী বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ধরিত্রীর দুঃখের কারণ স্ববংশ। এই বরাহদেহ আমি ত্যাগ করিব কিন্তু সুখাসক্ত এই ভোগবর্দ্ধিত দেহকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না।" এই বলিয়া তিনি মহাদেবকে ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত করিবার জন্য ব্রহ্মাকে আদেশ করিলেন। মহাদেব শরভরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা ও অপর দেবগণ শরভরূপী মহাদেবে স্বীয় স্বীয় তেজঃ সঞ্চারিত করিলেন। বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত শরভরূপী মহাদেবের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে বরাহ নিহত হইলেন এবং বরাহের পুত্র-পৌত্রগণও শরভের দন্তাঘাতে বিনষ্ট হইলেন। বিষ্ণু সুদর্শন-চক্রদ্বারা সেই বরাহের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই বরাহদেহের এক এক খণ্ড হইতে এক এক যজ্ঞের উৎপত্তি হইল। ইঁহার ভ্রূদ্বয় ও নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ হইতে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের, ইঁহার চরণসন্ধি হইতে অশ্বমেধ, নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাবিধায়ক যজ্ঞসমূহের এবং পৃষ্ঠসন্ধি হইতে রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের উদ্ভব হইল। এইরূপে বরাহদেহ হইতে আট হাজারেরও অধিক যজ্ঞ উৎপন্ন হইল। বরাহের শ্রোত্র হইতে স্রুক্, নাসিকা হইতে স্রুব, দন্ত হইতে যূপ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইল। বরাহের পুত্র সুবৃত্তের দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নি, কনকের দেহ হইতে গার্হপত্যাগ্নি এবং ঘোরের দেহ হইতে আহবনীয় অগ্নির উদ্ভব হইল। (কালিকাপুরাণ)। বরাহমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে :—মুখের বিস্তার অষ্টকলা, কর্ণ দ্বিগোলক, হনু সপ্তাঙ্গুল, সৃক্কণী দ্ব্যঙ্গুল, বদন সপ্তাঙ্গুল, দশনদ্বয় দেড়কলা, নাসিকা বিবর তিন যব, নেত্রদ্বয় যবহীন, মুখ ঈষদ্দাস্যযুক্ত, কর্ণযুগল রন্ধ্রদ্বয়-বিশিষ্ট সম ও আয়ত, কর্ণের মধ্য ভাগ চারিকলা ও উচ্চে দুই কলা, গ্রীবাদেশ অষ্টাঙ্গুল, অবশিষ্ট অঙ্গ সকল নৃসিংহদেবের ন্যায় হইবে। (হরিভক্তি বিলাস ১৮ বিং)

বরুণ—পশ্চিমদিক্‌পাল ও জলাধিপতি। অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে এই দেবতার উৎপত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভৃগু ও বাল্মীকি ইঁহার পুত্র। চর্ষণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে এই পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দেবতার পূজা আর্য্য-ভারতে প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদে এই দেবতা প্রবল পরাক্রমশালী বিমানচারী রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র যেরূপ বজ্র, ইঁহারও তদ্রূপ প্রধান অস্ত্র পাশ, এজন্য এই দেবতার অপর নাম পাশী।

বলরাম—বসুদেবের তনয়। ইনি তদীয় পত্নী রোহিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দৈবকীর সপ্তম গর্ভ-সময়ে কংস রক্ষক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু মায়া সেই গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। রক্ষিগণ এই ব্যাপার অবগত হইতে না পারিয়া কংসকে বলিল যে, গর্ভস্রাব হইয়া সন্তান নষ্ট হইয়াছে। গর্ভ আকর্ষণ করিয়া উহা অন্য গর্ভে স্থাপন করাতে রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। (ব্রহ্মবৈ-শ্রীকৃষ্ণ খণ্ড-৭ম অ)

ইঁহার পত্নীর নাম রেবতী (রেবতী দেখ)। বলরাম গদাযুদ্ধে মগধাধিপতি জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বধ করেন নাই। দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ংবরে শ্রীকৃষ্ণনন্দন শাম্ব কৌরবগণকর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হন। (লক্ষ্মণা দেখ)। বলরাম ইহা অবগত হইয়া কৌরবগণের নিকট গমন করেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুতেই শাম্বকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন বলরাম ক্রোধে কৌরবপুরী গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করিবার মানসে লাঙ্গলাগ্র উক্ত নগরীর প্রাকার-ভিত্তিতে সংলগ্ন করিলেন। হস্তিনা নগর ঘূর্ণিত হইল ; দুর্যোধন ইহা দেখিয়া অবিলম্বে শাম্বসহ লক্ষ্মণাকে বলরামের হস্তে অর্পণ করেন এবং তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মহাবীর বলরাম ভাণ্ডীরবনে এক মুষ্টি প্রহারে প্রলম্বনামক অসুরকে নিহত করেন। তিনি গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুরকে পর্ব্বতশীর্ষে নিক্ষেপ করিয়া বধ করেন। এই হলধারী বলদেব স্বীয় হলাকৃষ্টপদবীতে সমুদ্রগামিনী যমুনা নদীকে স্বনগরাভিমুখে দ্রুতবেগে প্রধাবিত করিয়াছিলেন।

বলি—দানবপতি। ইনি বিরোচনের পুত্র ও প্রহ্লাদের পৌত্র। বলির একশত পুত্র ; এই পুত্রগণের মধ্যে বাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রবলপরাক্রান্ত দানবপতি বলিকে দমন করিবার জন্য ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বলি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞান্তে স্নান সমাপনপূর্ব্বক যখন বলি দানকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তখন বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বামনরূপী বিষ্ণু বলিকে নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া স্বীয় ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বামনরূপী বিষ্ণুকে চিনিতে পারিলেন ; তিনি বলিকে বামনের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে নিষেধ করিলেন ; তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, বিষ্ণু বামনরূপে তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু বলি গুরুর উপদেশ শুনিলেন না ; তিনি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি যথারীতি বামন ক অর্চ্চনা করিয়া উদকস্পর্শপূর্ব্বক ভূমিদান করিলেন। দান করিবামাত্র বামনরূপ আশ্চর্য্যভাবে বর্দ্ধিত হইল ; তিনি এক পদে বলির সকল ভূমি, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ ব্যাপ্ত করিলেন ; তৃতীয় পদ স্থাপনের আর স্থান রহিল না। বলির অনুচরগণ ইঁহাকে মায়াবী মনে করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ইঁহাকে বধ করিতে ধাবিত হইল ; কিন্তু ইহারা অবিলম্বেই বিষ্ণুর অনুচরগণকর্ত্তৃক নিহত হইল। বলি অনুচরদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বিষ্ণুর অভিপ্রায়ানুসারে গরুড়পাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। বিষ্ণু অপর পদ রাখিবার জন্য বলির নিকট স্থান চাহিলেন। বলি তৃতীয় পদ মস্তকে ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। বিষ্ণু তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করিলে, দৈত্যরাজ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর ভক্ত ও বলির পিতামহ প্রহ্লাদ তথায় উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু বলির বন্ধন মোচন করিলেন। বিষ্ণু প্রহ্লাদকে বলিলেন, "বলিরাজ বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াও নিজের সত্য পালন করিয়াছে, এজন্য আমি ইহাকে দেবতাদিগের দুষ্প্রাপ্য স্থান দিতেছি। ইনি সাবর্ণি মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন। যতদিন এই মন্বন্তর না আসে, ততদিন ইঁহাকে সুতলে গিয়া বাস করিতে হইবে। আমি কৌমোদকী গদা লইয়া তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ইঁহাকে রক্ষা করিব।" ভগবান বিষ্ণুর আদেশানুসারে বলি পাতালে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। (শ্রীমদ্ভা—৮স্ক ও বামন পুঃ)

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানসপুত্র। এই মহর্ষি সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম। কর্দ্দমকন্যা অরুন্ধতী ইঁহার পত্নী। ইঁহার একশত পুত্র রাক্ষসভাবাপন্ন অযোধ্যাপতি কল্মাষপাদকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় (কল্মাষপাদ দেখ)। মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে আকুল হইয়া নদীজলে নিমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে আপনাকে পাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী একনদীতে ঝম্পপ্রদান করিলেন ; কিন্তু নদী মহর্ষির পাশচ্ছেদন করিয়া দিল এবং তাঁহাকে স্থলে উত্থাপিত করিল। মহর্ষি পাশবিমুক্ত হইয়া ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া এই নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। আর তিনি হৈমবতী নাম্নী অপর এক স্রোতস্বতীতে ঝম্পপ্রদান করেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মৃত্যু হয় না। সরিদ্ব ব্রাহ্মণকে অগ্নিতুল্য তেজস্বী দেখিয়া শতধা বিদ্রুত হইল। তদবধি এই নদী শতদ্রুনামে

খ্যাত হইল। মহর্ষি আত্মহত্যাসাধনে অসমর্থ হইয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। পথে তাহার পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী তাঁহার অনুসরণ করে। পশ্চাতে বেদাধ্যয়ন শব্দ শুনিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অদৃশ্যন্তী বলিলেন, "আমি আপনার পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী। আমার গর্ভে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তি্র এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; এই পুত্র আমার গর্ভে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ অবস্থিত হইয়া ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতেছে। আপনি ইহারই উচ্চারিত বেদমন্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন।" অদৃশ্যন্তী এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠ মরণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বংশরক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া তিনি আহ্লাদিত হইলেন। এই পুত্র প্রসূত হইলে বশিষ্ঠ ইহার নাম পরাশর রাখিলেন। (মহাভা—আদি—১৭৭—৮ম)

বসু—(১) গণদেবতা বিশেষ। বসুনামে আট জন গণদেবতা প্রসিদ্ধ, যথা ;—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। এই আটজন গণদেবতা অষ্টবসু নামে খ্যাত। মহাভারতের এক স্থানে "বিষ্ণু" স্থানে "সাবিত্র" দেখা যায়। অগ্নিপুরাণে "ধর" স্থানে "আপ" নামক বসুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে বসুগণ পৃথিবীতে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের অনুরোধে সরিদ্বরা গঙ্গা মহারাজ শান্তনুর ভার্য্যা হইলে ইঁহারা তাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সন্তান জন্মিবামাত্র গঙ্গাদেবী তাঁহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিতেন, সন্তানগণও শাপমুক্ত হইয়া বসুরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিতেন। সাতটী সন্তান এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইলে শান্তনু পুত্রশোকে কাতর হইয়া পত্নীকে ভর্ৎসনা করেন। পত্নী স্বামীকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং বসুগণের শাপঘটিত বৃত্তান্ত বলিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অষ্টম সন্তান দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বাস করিয়া ভীষ্ম নামে প্রথিত হন। বশিষ্ঠ অভিশাপ দেওয়ার পর বসুগণের অনুনয়ে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, বসুগণের মধ্যে যিনি নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিলেন কেবল তাঁহাকেই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বাস করিতে হইবে অপর বসুগণ প্রতি সংবৎসরই শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইবেন। (মহাভা—আদি)

(২) চেদি দেশের অধিপতি। ইনি পুরুবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ইন্দ্রের অনুগ্রহে চেদি রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। কিয়ৎকাল পরে বসুরাজ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টবচনে ইঁহাকে তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্য শাসন বিষয়ে মনোযোগী হইতে পরামর্শ দিলেন। ইনি ইন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। ইন্দ্র ইঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন; ইনি ভূলোকে থাকিয়াই দেবরাজের প্রিয়সখা হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইঁহাকে আকাশগামী বিমান দান করেন; এই বিমানে উঠিয়া ইনি আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন; এজন্য ইনি "উপরিচর" নামে খ্যাত হন। (মহাভা-আদি)

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের জনক। যুধিষ্ঠিরাদির জননী কুন্তীদেবী ইঁহার ভগিনী। ইঁহার পিতার নাম শূর ও মাতা মহিষী। ইঁহার ১৪টী পত্নী। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা পত্নী রোহিণী বাহ্লীকের কন্যা ও বলরামের মাতা এব সর্ব্বকনিষ্ঠা দেবকী দেবকের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের জননী। (আহুক ও কংস দেখ)।

বসুমান—রাজা হর্য্যশ্বের পুত্র ও মহারাজ যযাতির দৌহিত্র। (অষ্টক ও গালব দেখ)।

বাণ—দৈত্যপতি। ইনি দৈত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার রাজধানীর নাম শোণিতপুর। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ ইঁহার কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। (অনিরুদ্ধ দেখ)।

বাতাপী—প্রহ্লাদবংশীয় ধনাঢ্য দানব। (অগস্ত্য দেখ)।

বামন—বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। (বলি দেখ)।

বালখিল্য—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষাট হাজার ঋষি। ইঁহাদের তপঃপ্রভাবে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। একদা প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মহর্ষি কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও বালখিল্য মুনিদিগকে যজ্ঞকাষ্ঠাহরণে

নিযুক্ত করেন। বালখিল্যগণ সকলে মিলিত হইয়া বহুকষ্টে একটী পত্র বহন করিয়া আনিতেছিলেন। তাঁহারা অতি খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বল; তাঁহারা জলপূর্ণ এক গোষ্পদে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন। বলদৃপ্ত পুরন্দর ইহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বালখিল্যগণ এইরূপে অবমানিত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহারা এই ইন্দ্র হইতে অধিক বলশালী কামগামী কামবীর্য্য অপর এক ইন্দ্র প্রার্থনা করিয়া এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইহা জানিতে পারিয়া কশ্যপের শরণাগত হইলেন। কশ্যপ বালখিল্য-ঋষিদিগকে বলিলেন, "দেখ, ব্রহ্মার নিয়োগে ইনি দেবরাজ ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা আবার অপর ইন্দ্র প্রর্থনা করিতেছ; ইহা করিলে ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা হইবে; কিন্তু তোমাদের সঙ্কল্প মিথ্যা হয় ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছে, তিনি পতগেন্দ্র হউন।" বালখিল্যগণ কশ্যপের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই সময়ে কশ্যপপত্নী দক্ষসুতা বিনতা ঋতুস্নান করিয়া স্বামী সন্নিধানে আগমন করিলে মহর্ষি কশ্যপ বলিলেন "দেবি, অদ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্পবলে তোমার গর্ভে ভুবন-বিজয়ী দুই বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে; এই দুই কামরূপী পুত্র সমস্ত বিহঙ্গজাতির উপর ইন্দ্রত্ব করিবে।" বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড়ের জন্ম হইয়াছিল। (মহাভা আদি), (গরুড় ও অরুণ দেখ)।

বালি (বালী)—কপিপতি; ইঁহার রাজধানীর নাম কিষ্কিন্ধ্যা।

একদা মেরুপর্ব্বতে যোগাসনে আসীন ব্রহ্মার নেত্র হইতে সহসা অশ্রুবিন্দু পতিত হয়। এই অশ্রুবিন্দু হইতে এক বানর উৎপন্ন হইল। একদা এই বানর রমণীয় নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ে এই নারীকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইলেন। ইন্দ্র এই রমণীকে লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহার মস্তকে রেতস্খলন করিয়া নিবৃত্ত হইলেন; সূর্য্যদেব তদীয় গ্রীবায় বীজ নিক্ষেপ করিলেন। এই মস্তকে নিষিক্ত বাসবের বীজ হইতে বালি ও গ্রীবায় নিষিক্ত সূর্য্যের বীজ হইতে সুগ্রীবের জন্ম হইল। কিয়ৎকাল পরে এই রমণী পুনরায় বানররূপ পরিগ্রহ করিয়া এই দুই পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মা বালিকে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া রাজত্ব করিতে আদেশ দেন। বালি এই নগরীতে বানরগণের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। বালির মহিষীর নাম তারা এবং সুগ্রীবের পত্নীর নাম রুমা।

একদা এক মায়াবী দৈত্যকে বধ করিতে বালি পাতালে গমন করেন। সুগ্রীব ভ্রাতার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় করিলেন এবং পাতাল দ্বারে এক খণ্ড প্রস্তর চাপা দিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বালির মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিলেন। মন্ত্রিগণ সুগ্রীবকেই রাজা স্থির করিলেন। সুগ্রীব রাজাসনে আসীন হইয়া বালির পত্নী তারার সহিত মিলিত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বালি দৈত্যকে বিনাশ করিয়া পাতালদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং এক পদাঘাতে প্রস্তর স্থানচ্যুত করিয়া স্বনগরে উপস্থিত হইলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সুগ্রীব তৎপত্নী তারাকে উপভোগ করিতেছেন। তিনি সুগ্রীবকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সুগ্রীব প্রাণভয়ে রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন। বালি স্বীয় পত্নী তারাকে ফিরিয়া পাইলেন এবং বেশীর ভাগ ভ্রাতৃবধূ রুমাকেও প্রাপ্ত হইলেন। রামকৃত বালি বধের পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যের অধিপতি হইলেন এবং স্বীয় পত্নী রুমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ তারাকেও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন।

(রামা-কিষ্কিন্ধ্যা ও উত্তর কাণ্ড), (রাম দেখ)।

বাল্মীকি—বিখ্যাত রামায়ণ রচয়িতা মহামুনি। ইনি বরুণের পুত্র (বরুণ দেখ)। এই মহর্ষি অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের সমসাময়িক লোক, তবে বয়সে রাম অপেক্ষা অনেক বড়। রামের পিতা দশরথ ইঁহার সমবয়স্ক ছিলেন। অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্গা প্রবাহিত। গঙ্গার দক্ষিণ তীর হইতে অনার্য্যগণের অধিকৃত বনবিভাগ। এই বনের মধ্যদিয়া তমসা নদী প্রবাহিত হইত; এই তমসার তীরে বাল্মীকির তপোবন অবস্থিত। এই তমসার তীরবর্ত্তী আশ্রমে বসিয়া মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার অতুলনীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি স্বীয় রামায়ণের প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া স্পষ্টই

বোধ হয় যে রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পর এই বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। "রাম না জন্মিতে রামায়ণ" এই প্রবাদ বাক্যটি বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়াই লোকে জনসমাজে প্রচার করিয়াছে, কিন্তু মূল রামায়ণ পাঠক জানেন যে এ প্রবাদ ভিত্তিহীন। কেহ কেহ বাল্মীকির আশ্রম অযোধ্যা হইতে মথুরার মধ্যে কোন স্থানে নির্দ্দেশ করেন। রঘুবংশেও দৃষ্ট হয় যে শত্রুঘ্ন লবণকে বিনাশ করিতে গমন করিবার সময় পথে বাল্মীকির আশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন। বাল্মীকিই ভারতের আদি কবি এবং তৎকৃত রামায়ণই আদি কাব্য।

"আদি কাব্য মিদঞ্চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।" (রামায়ণ)

বাল্মীকি সশিষ্য তমসাতীরে গমনপূর্ব্বক ব্যাধবাণে বিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুন দর্শন করেন এবং করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া ব্যাধকে অভিশপ্ত করেন।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"
(রামা-আদি-২য় সর্গ)

"রে নিষাদ, তুই কামার্ত্ত ক্রৌঞ্চমিথুনকে বধ করিলি, এই জন্য তুই আর প্রতিষ্ঠা পাইবি না।"

এইরূপে ব্যাধকে অভিশপ্ত করিয়া শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এমন সময় ব্রহ্মা তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হন। যে শ্লোকে মহর্ষি নিষাদকে অভিশপ্ত করেন ঐ শ্লোকটী অনুষ্টুপচ্ছন্দে রচিত। ব্রহ্মার অনুরোধে বাল্মীকি এই অনুষ্টুপচ্ছন্দে রামায়ণ রচনা করেন। ভারতের যে সময় সূত্রপ্রধান এবং যে কালে কর্ম্মকাণ্ডের বড় বাড়াবাড়ি সেই সময়ে বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বাল্মীকি যে দস্যু ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বের নাম যে রত্নাকর ছিল, ইহা আর্ষ রামায়ণে নাই।

বাসুকি—সর্পরাজ। ইনি প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার ভগিনীর নাম জরৎকারু। সর্পকুলধ্বংস নিবারণের জন্য ইনি স্বীয় ভগিনী জরৎকারুকে জরৎকারুমুনির সহিত বিবাহ দেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে এই বিবাহসমুদ্ভূত সন্তান হইতে সর্পকুল ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষিত হইবে। যথাকালে জরৎকারুর গর্ভে আস্তীকের জন্ম হইল। আস্তীক মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সর্পধ্বংস নিবারণ করেন (আস্তীক দেখ)। দেবাসুরকৃত সমুদ্রমন্থন কালে বাসুকি মন্থন রজ্জুর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বহু—অযোধ্যাধিপতি। ইনি বিখ্যাত রাজা সগরের জনক। (রামায়ণ)

বিকুক্ষি—সূর্য্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। (রামায়ণ)

বিচিত্রবীর্য্য—মহারাজ শান্তনুর পুত্র। কাশীরাজকন্যা অম্বালিকা ও অম্বিকা ইঁহার সহিত বিবাহিত হন। অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। (কাশীরাজ ও ধৃতরাষ্ট্র দেখ)।

বিজয়—বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক। (জয় দেখ)।

বিদুর—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকার পরিচারিকার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। ইনি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যখন পাণ্ডবদিগকে বারণাবতনগরে প্রেরণ করিয়া তথায় জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিতে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, তখন বিদুরের পরামর্শে তাঁহারা রক্ষা পান। পাণ্ডবদিগের বিবাহের পর ইনি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পঞ্চাল রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করেন। ভারত যুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তির পর ইনি পঞ্চদশ বৎসর পাণ্ডবদিগের সহিত হস্তিনায় বাস করেন। তৎপর ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমন করিয়া তথায় যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ইনি পূর্ব্বজন্মে যম ছিলেন, অণীমাণ্ডব্যের শাপে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। (অণীমাণ্ডব্য ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখ)।

বিদুলা—সৌবীররাজমহিষী। ইনি বীর মহিলা ও বীর্য্যবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রবল শত্রুর আক্রমণে ইঁহার পুত্র সঞ্জয় প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে মাতার উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া আক্রমণকারী সিন্ধুরাজকে পরাজয়পূর্ব্বক স্বীয় পৈতৃকরাজ্য রক্ষা করেন। (মহাভারত)

বিনতা—প্রজাপতি কশ্যপের পত্নী ও পক্ষিকুলের মাতা। অরুণ ও গরুড় নামে ইঁহার দুই পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। প্রতিজ্ঞায় হারিয়া ইনি ৫০ বৎসর কাল সপত্নী কদ্রুর দাসত্ব করিয়াছিলেন। (অরুণ ও গরুর দেখ)

বিভীষণ—লঙ্কেশ্বর রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাবণকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ইনি রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহারই পরামর্শে রাম রাবণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাবণবধের পর রাম ইঁহাকে লঙ্কার সিংহাসনে স্থাপিত করেন। (রাম দেখ)।

বিরাট—মৎস্যদেশাধিপতি। পাণ্ডবগণ ইঁহারই ভবনে ছদ্মবেশে এক বৎসর অতিবাহিত করেন। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও প্রবল শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। ইঁহার শ্যালক কীচক ইঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কীচক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী; তিনি ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করেন। সুশর্ম্মা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে হস্তিনায় বসতি করিতেছিলেন। ভীম নিশাকালে মল্লযুদ্ধে কীচককে বধ করেন। কীচকের বধ বৃত্তান্ত চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে সুশর্ম্মা কৌরব সৈন্যের সাহায্যে বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করেন। বিরাট সুশর্ম্মার সম্মুখীন হন। সুশর্ম্মা বিরাটকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে ভীম বিরাটের উদ্ধার সাধন করে। অনন্তর দুর্য্যোধন বহু সৈন্য ও ভীষ্মকর্ণাদিসেনাপতিগণ সহ বিরাটের উত্তর গোগৃহ অক্রামণ করন। অর্জ্জুন সমুদয় কুরুসৈন্য বিমথিত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। অজ্ঞাতবাস কালের অবসানে পাণ্ডবগণের সহিত বিরাটের পরিচয় হয়; সুভদ্রাগর্ভজাত অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু বিরাট তনয়া উত্তরাকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিরাট সৈন্যসহ পাণ্ডবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণহস্তে ইনি নিহত হন। (মহাভা—বিরাট-বন)

বিরাধ—রাক্ষস বিশেষ। বনবাসকালে রামের হস্তে এই রাক্ষস নিহত হয়। (রাম দেখ)।

বিশ্রবা—কুবের ও রাবণাদির জনক। এই মুনি মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র। (কুবের দেখ)।

বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। ইনি পবন দেবের তনয়। সূর্য্যদেব ইঁহার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে পুত্র যম ও কন্যা যমুনার উৎপত্তি হয়। (ছায়া দেখ)।

বিশ্বামিত্র—বিখ্যাত মহর্ষি। বিশ্বামিত্র রাজবংশসম্ভূত; তিনি গাধিরাজের পুত্র। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কঠোর সাধনায় ঋষিধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। (ঋচিক ও পরশুরাম দেখ)।

একদা রাজা বিশ্বামিত্র বহুসংখ্যক সৈন্যসহ মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠ হোমধেনু শবলার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য দিয়া সসৈন্য গাধিরাজ তনয়ের সন্তোষ সম্পাদন করেন। রাজা বিশ্বামিত্র হোমধেনু শবলার ঈদৃশ গুণ দেখিয়া ঋষিবর বশিষ্ঠের নিকট উহা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন। রাজা বলপূর্ব্বক শবলাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। বশিষ্ঠের আদেশে হোমধেনু অসংখ্য সেনা সৃষ্টি করেন; এই সেনা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্র পরাভূত হন। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ ঋষির প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহার যোগবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বিশ্বামিত্র রাজবল অপেক্ষা যোগবলের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া এক পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক দৈবাস্ত্র লাভের জন্য বনে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় কঠোর তপস্যায় মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র এইরূপে মহাদেবের নিকট অস্ত্রলাভ করিয়া বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন যোগবলের নিকট অস্ত্রবল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য তিনি রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দক্ষিণাভিমুখে

গমন করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষিত্ব দান করেন। এই সময়ে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গ গমনের অভিলাষে গুরু বশিষ্ঠের নিকট গমন করেন; গুরুকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি গুরুপুত্রগণের নিকট স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন। গুরুপুত্রগণও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর তিনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট আগমন করেন। রাজর্ষি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। এই ব্যাপার লইয়া দেবগণের সহিত বিশ্বামিত্রের বিবাদ হয়। এই বিবাদে বিশ্বামিত্র কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ত্রিশঙ্কুকে অর্দ্ধপথে নক্ষত্র মণ্ডলে থাকিতে হইল। (ত্রিশঙ্কু দেখ)। এইরূপে দক্ষিণে তপস্যার বিঘ্ন হইল দেখিয়া তিনি পশ্চিমদিকে গমন করেন। এখানে শুনঃশেফ ঘটিত ব্যাপারে তিনি স্বীয় পুত্রগণকে অভিসম্পাত করেন। (শুনঃশেফ দেখ)। অতঃপর ব্রহ্মার বরে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহর্ষিত্ব লাভের জন্য উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ঔরসে স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। (শকুন্তলা দেখ)। অজিতেন্দ্রিয়তা হেতু তপস্যার ক্ষয় হওয়াতে তিনি দুঃখিতচিত্তে এই দিক ত্যাগ করিয়া উত্তরদিগ্বিভাগে গমন করেন। এখানে হিমালয়ের পাদদেশে কৌশিকী নদীতটে তিনি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। এখানে ব্রহ্মার বরে তিনি মহর্ষিত্ব লাভ করেন। এখানে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনের জন্য দেবরাজ অপ্সরা রম্ভাকে প্রেরণ করেন। বিশ্বামিত্রের শাপে রম্ভা বহুকাল প্রস্তরে পরিণত হইল। শাপদানহেতু তপস্যার ক্ষয় হইল দেখিয়া তিনি এইদিক ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করেন। এখানে তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। ব্রহ্মা দেবগণ-সহ আগমন করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দান করেন। অনন্তর বশিষ্ঠের সহিত তাঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হইল। ইনি অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে অশেষ ক্লেশে পাতিত করিয়াছিলেন। (হরিশ্চন্দ্র দেখ)। বিশ্বামিত্র যজ্ঞবিঘ্ন নাশের জন্য রাক্ষস বধার্থ মহারাজ দশরথের নিকট রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা করেন। দশরথের সম্মতিক্রমে ইনি রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাড়কা রাক্ষসীর বনে গমন করেন। মহর্ষি রাম লক্ষ্মণকে "বলা" ও "অতিবলা" মন্ত্র দান করেন। এই মন্ত্রবলে রাম লক্ষ্মণ তাড়কার বিনাশ সাধন করেন। তাড়কাবধের পর মহর্ষি রামলক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলাধিপতি জনকের ভবনে গমন করেন। তথায় ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রাম সীতাকে লাভ করেন। (দশরথ দেখ)। (মহাভারত ও রামায়ণ)

বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব্বরাজ। (প্রমদ্বরা দেখ)।

বিষ্ণু—হিন্দুর তিনজন প্রধান দেবতার মধ্যে ইনি অন্যতম। ইঁহার উপর সৃষ্ট জগতের পালনভার অর্পিত আছে। এই দেবতা প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার দুইটী ভার্য্যা; একের নাম লক্ষ্মী ও অপরা সরস্বতী। ইনি সৃষ্টির কল্যাণার্থ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুরাণে ইঁহার দশ অবতারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দশ অবতার, যথা—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি।

বেদে সূর্য্যদেবের অপর নাম বিষ্ণু।

বীতহব্য—হৈহয়রাজ্যের অধিপতি। ইনি বারাণসীর রাজা দিবোদাসকে পরাজিত করিয়া কাশী অধিকার করেন কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইঁহাকে পরাজিত করেন। বীতহব্য প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বীরভদ্র—মহাদেবের প্রিয় অনুচর। ইনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া মহাদেব ক্রুদ্ধ হন এবং জটা ছিঁড়িয়া ভূতলে নিক্ষেপ করেন। এই ভূতলক্ষিপ্ত জটা হইতে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়।

বুধ—চন্দ্রের পুত্র। (তারা, ইলা ও পুরূরবা দেখ)।

বৃত্র—প্রবল পরাক্রান্ত অসুর। ইনি ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে তাড়াইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। মহর্ষি দধীচির অস্থিতে নির্ম্মিত বজ্রদ্বারা ইন্দ্র ইঁহাকে বিনাশ করেন। (মহাভা) (দধীচি দেখ)।

বৃন্দা—(১) শ্রীরাধার সখী।

(২) জলন্ধরের পত্নী। (জলন্ধর দেখ)।

বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। (কর্ণ দেখ)।

বৃহদ্রথ—মগধাধিপতি বিখ্যাত জরাসন্ধের পিতা।

বৃহদ্বল—সূর্য্যবংশীয় একজন নৃপতি। ইনি ভারতযুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। (রাম দেখ)।

বৃহস্পতি—দেবতাদিগের গুরু এবং মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। (অঙ্গিরা ও তারা দেখ)।

বেণ—ইনি অঙ্গরাজের পুত্র; ইঁহার জননীর নাম সুনীথা। ইনি স্বীয় রাজ্যমধ্যে বলি ও দেবার্চ্চনা নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে তদীয় আদেশ প্রত্যাহার করিতে বলেন, কিন্তু বেণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রপূত কুশদ্বারা রাজার বিনাশ সাধন করেন। অনন্তর তাঁহারা বেণের মৃতদেহের দক্ষিণ বাহুতে কুশাগ্র ঘর্ষণ করিতে থাকেন। এইরূপ ঘর্ষণ করাতে শবের দক্ষিণ বাহু হইতে পৃথুরাজের উৎপত্তি হইল। ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে বেণের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ)।

বেদবতী—রাজা কুশধ্বজের তনয়া। রাজা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ইঁহার কন্যাকে তিনি বিষ্ণুর সহিত বিবাহ দেন কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। দৈত্যপতি শুম্ভের হস্তে অকালে কুশধ্বজ হত হন। রাজার সহিত রাণী সহমৃতা হইলেন। বেদবতী মাতাপিতৃহীন হইয়া দুঃখে পতিত হইলেন কিন্তু যাহাতে তাঁহার পরলোকগত পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, এজন্য তিনি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে লঙ্কেশ্বর রাবণ একদিন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বেদবতী সরলভাবে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাবণের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। বেদবতী আসন্ন বিপদ দেখিয়া জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করেন। বেদবতী অগ্নি প্রবেশের সময় রাবণকে বলিয়া গেলেন যে তিনি পরজন্মে রাক্ষসবংশের ধ্বংসের হেতু হইবেন। বেদবতী জন্মান্তরে সীতারূপে মিথিলার রাজবংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রিয় শিষ্য। ইনি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় সভাতে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ইঁহার শিষ্য। (মহাভারত)

ব্যাসদেব—বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষি। (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেখ)।

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা। মহাপুরুষ প্রথমে জল সৃষ্টি করেন; এই জলমধ্যে তদীয় বীজ নিক্ষিপ্ত হয়; এই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হয় এবং ইহার মধ্যে মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রহ্মার অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইলে, ইঁহার একভাগ হইতে আকাশ ও অপরভাগে পৃথিবী সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মা ৯ জন প্রজাপতি ঋষি সৃষ্টি করেন, যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতুঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ। এই সমুদয় প্রজাপতিঋষি হইতে জগতের সমুদয় জীবজন্তু উৎপন্ন হইয়াছে। দেবর্ষি নারদও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সৃষ্টিব্যাপার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘাতক মনে করিয়া এই কর্ম্মে মন দিলেন না; ইহাতে ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া শাপ দিলেন। এই শাপের ফলে নারদকে গন্ধর্ব্ব ও নরযোনি প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম সাবিত্রী। ইঁহার দুই কন্যা—দেবসেনা ও দৈত্যসেনা (মহাভা, বিষ্ণু ও হরিবং)। একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। মহাদেব মধ্যবর্ত্তী হন। মহাদেব ব্রহ্মার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় মস্তক ছিন্ন করেন; পরে প্রীত হওয়াতে মস্তক সংযোজিত হয়। (শিবপু—বিদ্যেশ্বর সংহিতা—৬ষ্ঠ অধ্যায়)



ভগদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা। নরকরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া তদীয় পুত্র ভগদত্তকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। (শ্রীকৃষ্ণ ও নরক দেখ)। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ইনি ৮ দিন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অবশেষে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ভারতযুদ্ধে ইনি

কৌরবপক্ষে থাকিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, বিরাট, সাত্যকি প্রভৃতির সহিত ঘোর যুদ্ধ করেন। ইনি কৌরবপক্ষে একজন প্রধান বীর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। দ্রোণের সেনাপতিত্বে ইনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। অর্জ্জুনকে বধ করিতে তিনি বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ এই অস্ত্র স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। (মহাভা-সভা ও দ্রোণ)

ভগীরথ—দিলীপের পুত্র ও অংশুমানের পৌত্র। (অংশুমান দেখ)। মহারাজ দিলীপ ভগীরথের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয় শিখরে তপস্যার্থ গমন করেন। এখানে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভগীরথ রাজ্য লাভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন "কিরূপে স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করা যাইতে পারে।" ভগীরথ প্রজারঞ্জনপরায়ণ ও ধর্ম্মাত্মা নরপতি ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। তিনি মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গানয়নার্থ বহির্গত হইলেন। তিনি হিমালয়ের অন্তর্গত গোকর্ণতীর্থে গমনপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ভগীরথের সহস্রবর্ষব্যাপী তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরদান করিতে আগমন করিলেন। ভগীরথ নিম্নলিখিত দুই বর প্রার্থনা করেন:—(১) কপিল শাপে ভস্মীভূত আমার ষষ্টিসহস্র প্রপিতামহ গঙ্গাসলিলে পূত হইয়া স্বর্গে গমন করুন। (২) সন্তানের অভাবে যেন আমার বংশলোপ না হয়। ব্রহ্মা প্রথমবরপ্রার্থনায় উত্তরে বলিলেন "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, কিন্তু গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না; মহাদেব ধারণ না করিলে আর কেহ তাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব যাহাতে মহেশ্বর গঙ্গাধারণে সম্মত হন, তজ্জন্য তুমি তাঁহার তপস্যা কর।" দ্বিতীয় বর প্রর্থনার উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন "তোমার বংশের রক্ষা হইবে।" ব্রহ্মার বচনে ভগীরথ তপস্যায় নিযুক্ত হন এবং এক বৎসর কঠোর তপস্যার পর তাঁহার নিকট মহাদেব উপস্থিত হন। মহাদেব বলিলেন "তোমার অভিপ্রায়ানুসারে আমি গঙ্গাকে ধারণ করিব।" গঙ্গা মহাদেবের মস্তকে অতি বেগে পড়িতে লাগিলেন। গঙ্গার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে তিনি তীব্রস্রোতে মহাদেবকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করেন কিন্তু ভগবান হর গঙ্গার এই গর্ব্ব ভাব অবগত হইয়া তাঁহার জটামণ্ডলেই সহস্রবৎসর গঙ্গাকে ধারণ করিলেন। ভগীরথ গঙ্গাকে মহাদেবের মস্তক হইতে বহির্গত হইতে না দেখিয়া পুনরায় মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব গঙ্গাকে জটামণ্ডল হইতে বাহির করিয়া দিলেন। গঙ্গা মহাদেবের মস্তক হইতে সপ্তস্রোতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামক তিনটী প্রবাহ পূর্ব্বদিকে প্রসৃত হইল; বঙ্কু, সীতা ও সিন্ধু নামক তিনটী স্রোত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল এবং অপর প্রবাহটী ভগীরথ প্রদর্শিত পথে চলিল। ভগীরথ পদব্রজে গঙ্গার অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইবেন এজন্য তাঁহাকে একখানা রথ দেওয়া হইল। ভগীরথের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ভগীরথপ্রদর্শিত মার্গে আগত গঙ্গাস্রোতটী ভাগীরথী নামে খ্যাত হইল। (রামায়ণ)

মহাত্মা ভগীরথ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান সময়ে গঙ্গা জলৌঘ আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেইদিন হইতে ভগীরথের কন্যা ভাগীরথী নামে খ্যাত হইলেন; তিনি পুত্রের ন্যায় ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের উরুদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইস্থান উর্ব্বশী তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

(মহাভা—দ্রোণ—৬১ অ)।

ভরত—(১) অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র। ইনি রাণী কৈকেয়ীর গর্ভসম্ভূত। (দশরথ ও রাম দেখ)।

(২) ইনি জড় ভরত নামে খ্যাত। (জড় ভরত দেখ)।

(৩) রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে জাত। কেহ কেহ বলেন ইঁহার নাম হইতেই ইঁহার অধিকৃত রাজ্য ভারতবর্ষ নামে খ্যাত।

ভরদ্বাজ—বিখ্যাত প্রাচীন আর্য্যঋষি। উতথ্যের পত্নী মমতার ক্ষেত্রে ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর দেবগুরু

বৃহস্পতির ঔরসে ইঁহার জন্ম। মমতার সসত্ত্বাবস্থায় বৃহস্পতি গোপনে ইঁহার সহিত সঙ্গত হন। গর্ভস্থ শিশু (দীর্ঘতমা) এই অবৈধ সঙ্গমে আপত্তি করাতেও বৃহস্পতি নিরস্ত হইলেন না। শিশু ক্রুদ্ধ হইয়া পদদ্বারা শুক্রের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করেন। শুক্র ভূমিতে পতিত হইল। বৃহস্পতির শাপে গর্ভস্থ শিশু অন্ধভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘতমা নামে খ্যাত হইলেন। (উতথ্য ও দীর্ঘতমা দেখ)। ভূপতিত শুক্র হইতে একপুত্র উৎপন্ন হইল। মমতা এই পুত্রকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে মমতাকে নিষেধ করিয়া তাহাকে "ভরণ" করিতে বলিলেন। ইহাতে বৃহস্পতির সহিত মমতার বিবাদ হয়; বিবাদের ফলে উভয়েই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অনন্তর মরুৎগণ ইঁহাকে পালন করেন। এই পুত্রই ভরদ্বাজ নামে খ্যাত হন। মরুৎগণকর্ত্তৃক ভৃত হইয়াছিলেন বলিয়া "ভর" এবং দুইয়ের দ্বারা উৎপন্ন এইজন্য "দ্বাজ" (অর্থাৎ সঙ্কর) হন; এই হেতু এই মুনি ভরদ্বাজ নামে অভিহিত হন। ইহার অপর নাম বিতথ। (মহাভা—আদি, শ্রীমদ্ভা ও বিষ্ণুপু)। একদা গঙ্গায় স্নানকালে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া ভরদ্বাজের রেতঃস্খলন হয়। এই রেত দ্রোণমধ্যে রক্ষিত হইলে ইহা হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র দ্রোণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণিগণের দুঃখ দূরীকরণের জন্য ইনি মুনিগণের অনুরোধে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া দেবরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট লিঙ্গৌষধ, রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং তাহার ঔষধজ্ঞাপক সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন এবং ঋষিদিগকে শিক্ষা দেন। তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন।　　　(ভাব প্রকাশ)।

ভীম—(১) তৃতীয় পাণ্ডব। ইনি পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি কুন্তীর গর্ভে ও পবনদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। (কুন্তী দেখ)। ভীম ও ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধন সমবয়স্ক; উঁহারা একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভীম অত্যন্ত বলশালী ছিলেন; দুর্য্যোধনাদি কেহই তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে সমকক্ষ ছিলেন না; এজন্য দুর্য্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন এবং ভীমের বধের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। একদিন গোপনে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন; জলস্রোতে নাগলোকে নীত হইয়া ভীম রক্ষা পান। নাগলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধনের দুষ্কৃত বর্ণন করিলেন। দুর্য্যোধন ভীমের সহিত অপর পাণ্ডবদিগকে বারণাবত নগরীতে জতুগৃহে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ভীম দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ পুর্ব্বক মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণসহ পলায়ন করিয়া দ্রুপদরাজ্যে উপস্থিত হন। দ্রুপদরাজ্যে গমনের পুর্ব্বে হিড়ম্ব রাক্ষসকে বধ করিয়া ভীম তদীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের ঘটোৎকচ নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। (ঘটোৎকচ দেখ) পঞ্চালনগরে দৌপদী লাভের পর ভীম যুধিষ্ঠিরাদির সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন। এখানে যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভীম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত মগধরাজ্যে গমন করিয়া জরাসন্ধকে বধ করেন। (জরাসন্ধ দেখ)। দুর্য্যোধন কপট দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া সভাস্থলে দ্রৌপদীর অবমাননা করিয়াছিলেন। ভীম দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধের জন্য সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি দুর্য্যোধনকে সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নিধন করিবেন, দুঃশাসনের বক্ষের রক্ত পান করিবেন এবং গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভঙ্গ করিবেন। ভীম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান কালে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুনের পতনের পর ভীম ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন "তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করিয়া নিজে অপরিমিত আহার করিতে এবং আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই পাপে ভূতলে পতিত হইলে।"　　　(মহাভারত)

(২) বিদর্ভরাজ। ইনি দময়ন্তীর জনক।　　　(দময়ন্তী দেখ)।

ভীষ্ম—মহারাজ শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন হন। শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করিবার সময় এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি পত্নীর কোন কার্য্যে বাধা দিতে পারিবেন না অথবা তাহাকে কটুবাক্য কহিতে

পারিবেন না। গঙ্গার গর্ভে ৮টী পুত্র জন্মে। ক্রমে ৭ জনকে গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করেন; শান্তনু পত্নীবিচ্ছেদভয়ে তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। ৮ম গর্ভে ভীষ্ম উৎপন্ন হইলে শান্তনু শেষ পুত্র রক্ষার জন্য পত্নীর প্রতি কটুবাক্য ব্যবহার করেন। গঙ্গা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তৎক্ষণাৎ শান্তনুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হন। (বসু ও শান্তনু দেখ)। শান্তনু পুত্রের নাম গাঙ্গেয় ও দেবব্রত রাখিলেন। অতঃপর শান্তনু এক দিবস যমুনা তীরে গমন করিয়া দাসরাজ বসুর কন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। সত্যবতীর পিতা বলিলেন যে যদি তাহার কন্যার গর্ভজাত সন্তান রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয় তবে এই বিবাহে তিনি সম্মতি দিতে পারেন। শান্তনু দাসরাজ বসুর প্রস্তাবে সম্মতি দিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। কথা গোপন রহিল না। অনতিবিলম্বেই এই বিষয় দেবব্রত অবগত হইলেন। তিনি দাসরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি বিবাহ করিবেন না এবং সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই রাজা হইবেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ দেবব্রতের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া ভীষ্ম নামে অভিহিত হন। ভীষ্মের অনুরোধে শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করেন। (বসু ও পরাশর দেখ)। শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম বিমাতা সত্যবতীর মতানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। বিচিত্রবীর্য্য বালকমাত্র ছিলেন। ভীষ্ম কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে আনয়নপূর্ব্বক বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেন। (কাশীরাজ দেখ)। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীষ্ম কৌরবপক্ষে থাকিয়া প্রত্যহ দশ সহস্র পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। ১০ দিন যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শরে আহত হইয়া ভীষ্ম শরশয্যাশ্রয় করিলেন। কিন্তু তখন দক্ষিণায়ন ছিল বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ্মের নিকট ধর্ম্ম, অর্থাদি সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ লাভ করেন। সমস্ত শান্তিপর্ব্বে এই উপদেশমালা বর্ণিত হইয়াছে। (মহাভারত)।

ভীষ্মক—বিদর্ভরাজ্যের রাজা। ইনি রুক্মিণী দেবীর জনক। (রুক্মিণী দেখ)।

ভূরিশ্রবা—চন্দ্রবংশীয় রাজা সোমদত্তের পুত্র। (শিনি দেখ)।
ভারতযুদ্ধে ভূরিশ্রবা কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেন। অর্জ্জুন হস্তে ছিন্নবাহু হইয়া তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন এমন সময়ে সাত্যকি আসিয়া খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করেন। (মহাভা-দ্রোণ-১৪৩ অ)।

ভৃগু বিখ্যাত মুনি। প্রাচীনকালে রুদ্র বারুনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে দেবপত্নী ও দেব কন্যাগণ সমবেত হন। এই সময়ে ব্রহ্মা যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন। দেবকন্যাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মা কামাতুর হন এবং তাহার রেতঃস্খলন হয়। অনন্তর সূর্য্য সেই রেত করদ্বারা গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেন। এই রেতঃ অগ্নিতে পতিত হইবামাত্র অগ্নিশিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তখন বারুণীমূর্ত্তিধারী মহাদেব বলিলেন যে যখন যজ্ঞ আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তখন ইঁহারা আমারই পুত্র। অগ্নি বলিলেন যে যখন ইঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া আমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন ইঁহারা আমারই পুত্র। ব্রহ্মা বলিলেন যে যখন ইঁহারা আমার বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন ইঁহারা আমারই পুত্র। এইরূপে তিন দেবতায় বিবাদ আরম্ভ করিলে দেবগণ মধ্যস্থ হইয়া তিন জনকে তিন পুত্র দিলেন। ভৃগু মহাদেবের, অঙ্গিরা অগ্নিদেবের এবং কবি ব্রহ্মার পুত্র হইলেন। (মহাভা অনুশা-- ৮৫ অ)

ম

মনিগ্রাব—ধনাধিপতি কুবেরের পুত্র।

মণিমান্---কুবেরের কর্ম্মচারী। মোহবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করাতে মুনি ইঁহাকে মনুষ্য হস্তে নিহত হইবার অভিসম্পাত করেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থান কালে ইনি তৃতীয় পাণ্ডব ভীমের হস্তে নিহত হন। (মহাভারত)।

মতঙ্গ—ঋষ্যমূক পর্ব্বতস্থ মুনি বিশেষ। কপিপতি বালিকর্ত্তৃক অসুর দুন্দুভি নিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে তদীয় শবদেহ হইতে রক্তবিন্দু এই মুনির শরীরে পতিত হয়। ইহাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বালীকে শাপ দেন যে "এখানে আসিলে তোমার মৃত্যু হইবে।" তদবধি বালী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইতেন না। এইজন্য সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা হইতে তাড়িত হইয়া বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (রামায়ণ)

মৎস্য—বিষ্ণুর প্রথম অবতার। ভাগবতে লিখিত আছে যে প্রলয়কালে ভূপ্রভৃতি সমস্ত লোক জলে নিমগ্ন হইলে মহাসমুদ্রে শয়ান বিধাতার মুখ হইতে বেদ সকল নির্গত হয়। হয়গ্রীব সেই সকল বেদ হরণ করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু ইহা অবগত হইয়া বেদ উদ্ধারের জন্য মৎস্যরূপ ধারণ করেন। একদা বিবস্বানের পুত্র সত্যব্রত নামে রাজর্ষি নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক শফরী তাঁহার অঞ্জলিতে উঠে। সত্যব্রত তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী বলিল যে, সে মকর নক্রাদি হইতে ভয় পাইয়া তাঁহার অঞ্জলিতে আশ্রয় লইয়াছিল, এবং যাহাতে তাহাকে পুনরায় জলে যাইতে না হয় তদ্বিষয়ে রাজর্ষির নিকট অনুনয় করিতে লাগিল। ভগবান বিষ্ণু সত্যব্রতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যব্রত ইহা জানিতেন না। যাহা হউক সত্যব্রত মৎস্যের অনুনয়ে তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া এক কলসীতে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মৎস্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কলসীর সমস্ত মধ্যভাগ অধিকার করিয়া বসিল। অনন্তর মৎস্যের প্রার্থনায় সত্যব্রত তাহাকে সরোবরে স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে ইহাতেও তাহার শরীর ধরিল না। অনন্তর রাজর্ষি মৎস্যটিকে এক হ্রদে নিক্ষেপ করেন। কিছুকাল পরে ইহাতেও তাহার শরীর ধরিল না দেখিয়া রাজর্ষি তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মৎস্যরূপী বিষ্ণু সত্যব্রতের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে স্বীয় পরিচয় দিলেন। বিষ্ণু বলিলেন "অদ্য হইতে ৭ দিবস মধ্যে ত্রিভুবন প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন হইবে, সমুদয় জলনিমগ্ন হইলে আমি এক বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করিব। তুমি যাবতীয় ওষধি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বীজ এবং সমুদয় প্রাণী লইয়া সপ্তর্ষিগণের সহিত এই নৌকা আশ্রয় করিবে। যখন প্রচণ্ড বায়ু নৌকাকে আন্দোলিত করিবে, তখন আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব। তুমি মহাসর্পরূপী রজ্জুদ্বারা ঐ নৌকা আমার সঙ্গে বন্ধন করিবে। যাবৎ ব্রহ্মার নিশাবসান না হয়, তাবৎ আমি নৌকা আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সহিত সমুদ্রে বিচরণ করিব। মৎস্যরূপী বিষ্ণু রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ৭ দিন পরে মৎস্যরূপী বিষ্ণুর কথামত প্রলয়াদি ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। সত্যব্রত দেখিলেন এক সুবৃহৎ নৌকা তাহার নিকট উপস্থিত। তিনি যাবতীয় বীজ, প্রাণী ও সপ্তর্ষিদিগকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনন্তর মহাসাগরের মধ্যে অযুতযোজনবিস্তৃত এক স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হইল। রাজর্ষি সত্যব্রত এক সর্প রজ্জুদ্বারা মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। মৎস্যরূপী বিষ্ণু এই সময়ে সত্যব্রতকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। রাজা সত্যব্রত ঋষিগণের সহিত নৌকাতে উপবেশন করিয়া ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্ব ও সনাতন বেদ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর প্রলয়ের অবসানে মৎস্যরূপী বিষ্ণু হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রত্যর্পণ করেন। রাজর্ষি সত্যব্রত বিষ্ণুর অনুগ্রহে বৈবস্বত মনু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মহাভারতে মৎস্যাবতার সম্বন্ধে প্রস্তাবটি প্রায় এইরূপই। ইহাতে লিখিত আছে যে বৈবস্বত মনু মৎস্যটিকে ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে উঠাইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন এবং তথা হইতে ইহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এই প্রকাণ্ড মৎস্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে মনুর কোন কষ্ট হয় নাই। ইহাতে লিখিত আছে যে মনু মৎস্যরূপী বিষ্ণুর আদেশে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেই এক নৌকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই নৌকা প্রলয়জলে ভাসমান হইলে বিষ্ণু এক শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে নৌকার সমীপে আগমন করেন। মনু এক রজ্জুদ্বারা এই নৌকা মৎস্যরূপী বিষ্ণুর শৃঙ্গে বন্ধন করেন। মনু কেবল সপ্তর্ষিগণের সহিত নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ বীজ লইয়া এই নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। অন্য কোন প্রাণী তাহার সঙ্গে ছিল না। বহু বর্ষ গত হইলে মৎস্যের আদেশে মনু হিমালয় শৃঙ্গে এই নৌকা বন্ধন করেন। অদ্যাপি এই

হিমালয়শৃঙ্গ "নৌকাবন্ধন শৃঙ্গ" নামে খ্যাত। (মহাভা—বন ১৮৭ অ)। মৎস্যাবতার সত্যযুগের ঘটনা। এই অবতারের নাভির অধোদেশ রোহিত মৎস্যের ন্যায় এবং আকণ্ঠ মনুষ্যাকার; বর্ণ শ্যাম, বাহু চারিটি; চারি বাহু শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম সুশোভিত। মস্তক শৃঙ্গধারী মৎস্যতুল্য, বক্ষস্থলে লক্ষ্মী বিরাজিত, সর্ব্বাঙ্গে পদ্মের চিহ্ন।

মৎস্যগন্ধা—রাজা উপরিচরের কন্যা। এই রাজার অপর নাম বসু। এই রাজা কঠোর তপস্যা করেন। দেবরাজ ইঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত হন। ইন্দ্রের অনুরোধে ইনি তপস্যাপ্রতিনিবৃত্ত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে স্ফটিকময় আকাশগামী রথ ও বৈজয়ন্তী মালা অর্পণ করেন। বসুর পত্নীর নাম গিরিকা। মৃগয়াকালে কামপীড়িত বসুর রেতস্খলন হয়। এই রেতঃ বসুরাজ এক শ্যেনপক্ষী দ্বারা মহিষী গিরিকার নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন কিন্তু এই শ্যেনপক্ষী অপর একটী শ্যেন কর্ত্তৃক পথে আক্রান্ত হয় এবং তাহার তুণ্ড হইতে রেতঃ যমুনা জলে পতিত হয়। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপে যমুনা জলে অবস্থান করিতেছিলেন। এই রেতঃ পতিত হইবা মাত্র মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা তাহা পান করেন। এই রেতঃ হইতে মৎসী গর্ভবতী হয়। মৎস্যজীবীরা এই মৎস্যকে ধরিয়া রাজা বসুর নিকট অর্পণ করেন। ইঁহার উদরে একটী পুত্র ও একটী কন্যা পাওয়া গেল। পুত্রটি পরে মৎস্যনামে রাজা হইয়াছিলেন। নৃপতি বসু কন্যাটিকে ধীবরদের হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ ছিল বলিয়া ইনি মৎস্যগন্ধা নামে খ্যাত হইলেন। (পরাশর দেখ)।

মদালসা—সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শিনী বিদুষী রমণী। (অলর্ক দেখ)।

মধু—দৈত্য বিশেষ। (কৈটভ দেখ)।

মধুমতী—ইক্ষ্বাকুবংশোৎপন্ন হর্য্যশ্ব নামক নৃপতির ভার্য্যা এবং মধুনামক দৈত্যের তনয়া। এই মধুমতীর গর্ভে যদু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। এই যদুর নামানুসারেই ইঁহার বংশের নাম হয়। এইরূপে ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে যদুবংশ নির্গত হইয়াছে। (হরিবংশ—৯৩ অ)।

মনসা—বাসুকির ভগিনী ও জরৎকারু মুনির পত্নী। ইঁহার গর্ভে আস্তীকের জন্ম হয়। ইঁহার অপর নাম জরৎকারু। (জরৎকারু ও আস্তীক দেখ)।

মনু—(১) ব্রহ্মার পুত্র। অনেকের মতে ইনি মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ। প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইঁহাদের নাম যথা;—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। এখন সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। ৮ম হইতে ১৪শ মনুর অধিকার পরে আসিবে। (শ্রীমদ্ভা ৮।১ অ) মৎস্যপুরাণে মনুদিগের নাম একটু স্বতন্ত্র। ১ম মনু স্বায়ম্ভুব; ইনি ব্রহ্মা ও গায়ত্রী হইতে সমুদ্ভুত। দ্বিতীয় স্বারোচিষ; তৃতীয় ঔত্তমি, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ, সপ্তম বৈবস্বত মনু, অষ্টম সাবর্ণি মনু, নবম রৌচ্য, ইনি রুচি প্রজাপতির পুত্র। দশম ভৌত্য; ইনি ভূতি মনু নামক প্রজাপতির পুত্র। একাদশ মেরুসাবর্ণি, ইনি, ব্রহ্মার পুত্র। দ্বাদশ মনু ঋভু, ত্রয়োদশ ঋতুধামা, চতুর্দ্দশ বিষ্বক সেন। (মৎস্য পু—৯—২১ অ)।

(২)—কশ্যপের পত্নী। রামায়ণের মতে ইনি মানবগণের আদি মাতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও হরিবংশে এই প্রজাপতি ঋষির ত্রয়োদশ পত্নীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (কশ্যপ দেখ)। ইঁহাদের মধ্যে মনু অন্যতমা। আর্ষরামায়ণেও কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে মনুর নাম দৃষ্ট হয়। মহর্ষি বাল্মীকির মতে কশ্যপ পত্নী মনুই মানবগণের আদি মাতা। কশ্যপ পত্নী দনু হইতে যেমন দানব, দিতি হইতে যেমন দৈত্য, অদিতি হইতে আদিত্য (দেবতা), সেইরূপ "কশ্যপ পত্নী মনু হইতে মানবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।"

"অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনুমপিচ কালকাং।
তাম্রাং ক্রোধবশাঞ্চৈব মনুঞ্চাপানলামপি॥"

(রামায়ণ—অরণ্য—১৪ অ—১১ শ্লোক)

"মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥"

(রামায়ণ – অরণ্য—১৪ অ—২৯ শ্লোক)

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কশ্যপ পত্নী মনু হইতে মানবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহা হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে দানব, মানব, আদিত্য (দেবতা), প্রভৃতি সকলে এক পিতার সন্তান কিন্তু বিভিন্ন মাতৃগর্ভ-প্রসূত। সম্পর্কে ইহারা একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

মনোরমা—হৈহয়পতি মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যের মহিষী। পরশুরামের সহিত কার্ত্তবীর্য্যের যুদ্ধ আরব্ধ হইলে ইনি স্বামীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করেন। (ব্রহ্মবৈ পুঃ)

মন্থরা—দশরথের মহিষী কৈকেয়ীর দাসী। ইহারই পরামর্শে চালিত হইয়া কৈকেয়ী রামবনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য দশরথের নিকট দুই বর প্রার্থনা করেন। (রামায়ণ)

মন্দপাল—ধার্ম্মিক তপঃপরায়ণ ও বেদপারগ মহর্ষি। বহুদিবস তপস্যার পরাকাষ্ঠা উত্তীর্ণ হইয়া ইনি পিতৃলোকে গমন করেন। সন্তানোৎপাদন না করাতে ঈপ্সিত লোক প্রাপ্ত হন নাই; তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি অল্পকাল মধ্যে বহু অপত্য উৎপাদন করিবার মানসে বহুপ্রসবশালী বিহঙ্গম মণ্ডলে গমন করিয়া শর্ঙ্গক মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক জরিতা নাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে ৪টী ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করেন। খাণ্ডব দাহকালে ইহাদের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইলে মন্দপাল অগ্নির স্তব করেন। অগ্নি স্তবে তুষ্ট হইয়া মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়কে রক্ষা করেন। (মহাভা—আদি—২৩৪—৪ অধ্যায়)

মন্দোদরী—লঙ্কেশ্বর রাবণের মহিষী। ময়দানবের ঔরসে ও হেমা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। রাবণের বিখ্যাত পুত্র মেঘনাদ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (রামায়ণ)

ময়দানব—শিল্পী। ইনি মন্দোদরীর পিতা। (মন্দোদরী দেখ)। ইঁহার দুই পুত্র :—মায়াবী ও দুন্দুভি। দুন্দুভি কপিরাজ বালীর হস্তে নিহত হন। (মতঙ্গ দেখ)।

মরীচি—ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম।

মরুৎ—দিতির গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে এই দেবতার উৎপত্তি। দিতির পুত্র দৈত্যগণ দেবতাদিগের হস্তে নিহত হইলে, দিতি স্বামীর নিকট দেবতাদের অজেয় এক পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপের বরে দিতির গর্ভে এই পুত্র উৎপন্ন হইল। দেবরাজ ইহা জানিতে পারিয়া গর্ভে থাকা সময়েই ইহাকে স্বীয় বজ্রদ্বারা ৪৯ ভাগে বিভক্ত করেন; কিন্তু গর্ভ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইলেও কশ্যপের বরে ইঁহাদের বিনাশ হইল না। এই হেতু ইহারা ৪৯ মরুৎ নামে বিদিত হইলেন। (বিষ্ণুপু), (পবন দেখ)।

মহাদেব—ইনি হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব এই তিন দেবতাই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তির স্বরূপ, বিষ্ণু পালনীশক্তির ও মহাদেব সংহার শক্তিস্বরূপ। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল এবং তাঁহার ধনুকের নাম পিনাক। তাঁহার অপর বিখ্যাত অস্ত্রের নাম পাশুপত। তিনি অর্জ্জুনকে এই অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিপুর বিনাশ করিয়া ত্রিপুরারি নামে খ্যাত হইয়াছেন। (ত্রিপুর দেখ)। তিনি সমুদ্রমন্থন-জাত বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত হন। বিখ্যাত পরশুরাম তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। (অজমুখ ও দক্ষ দেখ)। তাঁহার দুই পুত্র :—কার্ত্তিকেয় ও গণেশ। (কার্ত্তিকেয় ও গণেশ দেখ)। এবং ইঁহার তিন স্ত্রী গঙ্গা, সতী ও পার্ব্বতী। (গঙ্গা ও পার্ব্বতী দেখ)। কোন কারণে মহাতপা ভৃগুমুনি তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন। (শিব দেখ)।

মাণ্ডবী—কুশধ্বজ জনকের তনয়া ও ভরতের পত্নী। ইঁহার গর্ভে তক্ষ ও পুষ্কর নামে ভরতের দুই পুত্র জন্মে (রামায়ণ)। ভরত তক্ষকে তক্ষশীলাপুরীতে এবং পুষ্করকে পুষ্করাবতী নগরীতে স্থাপন করেন। (বায়ু পুরাণ)

মাতঙ্গী—নবম মহাবিদ্যা। ইঁহার চারি হাত ও তিন নেত্র ; কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বর্ত্তমান এবং পরিধানে রক্তবস্ত্র। খড়্গ, চর্ম্ম, পাশ ও অঙ্কুশ এই অস্ত্রগুলি ইনি চারিহস্তে ধারণ করিয়াছেন।

মাতলি—দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি। ইঁহার কন্যা গুণকেশী সুমুখনামক নাগের সহিত বিবাহিত হন। (সুমুখ দেখ)।

মাতৃকা—যোগেশ্বরী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি অষ্ট মাতৃকা। (অন্ধক দেখ) ইহাদের মধ্যে কাম যোগেশ্বরী, ক্রোধ মাহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবী, মদ ব্রাহ্মণী, মোহ কৌমারী, মাৎসর্য্য ঐন্দ্রানী, পৈশুন্য দণ্ডধারিণী এবং অসূয়া বারাহী নামে খ্যাত।

মাদ্রী—পাণ্ডুর মহিষী ও মদ্রদেশাধিপতির তনয়া। ইঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি পতির সহিত সহমৃতা হন। (পাণ্ডু দেখ)।

মাধব—(১) বিষ্ণুর নামান্তর। মা শব্দে লক্ষ্মী বুঝায়। লক্ষ্মীর পতি বলিয়া বিষ্ণুর এই নাম।

মান্ধাতা—সূর্য্যবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র। রাজা যুবনাশ্বের পুত্র না হওয়াতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋষিগণের আশ্রমে গমন করেন এবং মুনিদিগকে তাঁহার নিমিত্ত এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করেন। ঋষিগণ রাজার অনুরোধে এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। রাত্রির মধ্যভাগে যজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে মুনিগণ মন্ত্রপূত জলসমন্বিত কলস বেদীর মধ্যভাগে রাখিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণাতুর হইয়া ঐ বেদিমধ্যস্থ কলস হইতে মন্ত্রপূত জল পান করেন। প্রভাতে উঠিয়া মুনিগণ অনুসন্ধানে জানিলেন যে, যে জল যুবনাশ্বের পত্নীর নিমিত্ত রাখা হইয়াছিল, তাহা রাজা স্বয়ংই পান করিয়াছেন। মন্ত্রপূত জলপ্রভাবে রাজার গর্ভসঞ্চার হইল। কালক্রমে রাজার কুক্ষি ভেদ করিয়া এক কুমার নির্গত হইল ; কিন্তু ইহাতে রাজার কোন অনিষ্ট হইল না। এখন প্রশ্ন হইল, এই বালক কাহার স্তন্যপান করিয়া জীবন রক্ষা করিবে? এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া বলিলেন "এই বালক আমাকে ধারণ করিবে" (মাং ধাস্যতি)। তদবধি ইঁহার নাম মান্ধাতা হইল। অনন্তর ইন্দ্র ঐ বালকের মুখে এক অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। বালক ঐ অঙ্গুলি চুষিয়া এক দিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মান্ধাতা রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু পুঃ)

"যাবৎ সূর্য্য উদেতিস্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তৎ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥"

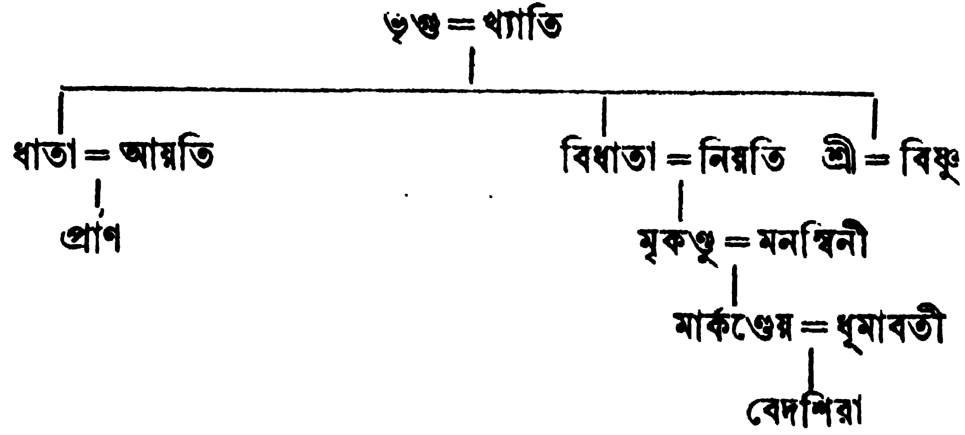
মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন এবং এই পত্নীর গর্ভে মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও ৫০টী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। (পুরুকুৎস দেখ) (বিষ্ণু পুঃ - ৪।২ অ)।

মায়াবতী—রতিদেবী জন্মান্তর গ্রহণপূর্ব্বক শম্বরাসুরের গৃহে মায়াবতীরূপে আবির্ভূত হন। (প্রদ্যুম্ন দেখ)।

মায়াবী—অসুর বিশেষ। দুন্দুভির পুত্র। এই অসুরও পিতার ন্যায় কপিরাজ বালির হস্তে নিহত হয়।

মারীচ—তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র ও লঙ্কেশ্বর রাবণের জনৈক সেনাপতি। ইনি স্বয়ং মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক রাবণকে সীতাহরণে সাহায্য করিয়া মাতৃবধের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। (রামা—অরণ্য)

মার্কণ্ডেয়—মৃকণ্ডুমুনির পুত্র। ইঁহার পত্নী ধূমাবতী। ধূমাবতীর গর্ভে ইঁহার বেদশিরা নামে এক পুত্র জন্মে। ইঁহার বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ-৫২ অ)।



মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া চিরজীবী হইয়াছিলেন। নরসিংহপুরাণে মার্কণ্ডেয়ের দীর্ঘজীবন লাভের বৃত্তান্ত এইরূপ :—মার্কণ্ডেয়ের জন্ম হইলে মৃকণ্ডু জানিতে পারিলেন যে পুত্রটী দ্বাদশবর্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। মার্কণ্ডেয়ের পিতামাতা ইহাতে সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন। মার্কণ্ডেয় পিতামাতার মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মৃকণ্ডু সরল ভাবে তাহার হ্রস্বজীবনের কথা বলিলেন। মার্কণ্ডেয় পিতাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে তিনি যমকে জয় করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন। এই কথা বলিয়া মার্কণ্ডেয় বনে গমন পূর্ব্বক তথায় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কঠোর তপস্যা করেন এবং তপোবলে মৃত্যুকে জয় করিয়া চিরজীবী হন। (নরসিংহ পুঃ)

পদ্মপুরাণে দীর্ঘায়ুলাভ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী অন্যরূপ। মার্কণ্ডেয়ের উপনয়নের পর একদিন সপ্তর্ষিগণ তদীয় পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় সপ্তর্ষিগণকে অভিবাদন করিলে তাহারা "দীর্ঘায়ু হও" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে মার্কণ্ডেয় হ্রস্বায়ু। তাঁহারা মার্কণ্ডেয়কে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মার বরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মার্কণ্ডেয় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। (পদ্মপু সৃষ্টিখং-৩০ অ)

মালী—রাক্ষস বিশেষ। ইঁহার ভ্রাতা সুমালী লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতামহ। (কুবের দেখ)। বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে ইনি হত হন।

মাল্যবান্—রাক্ষস বিশেষ। ইনি মালী ও সুমালীর ভ্রাতা। (কুবের দেখ)। ইহার পিতা সুকেশ নামক রাক্ষস এবং মাতা গন্ধর্ব্ব কন্যা বেদবতী।

মুচুকুন্দ—মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। (মান্ধাতা দেখ)। কথিত আছে যে ইনি দেবতাদিগের পক্ষ হইয়া অসুরদিগকে বিনাশ করেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বর দিতে চাহেন। তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিলে তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবা মাত্র সেই ব্যক্তি ভস্মে পরিণত হইবে। তাঁহার নিদ্রাবিঘ্ন উৎপাদন করিয়া কালযবন ভস্মীভূত হন। (কালযবন দেখ)।

মেঘনাদ—লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রজিৎ নামে খ্যাত হন। ইনি লঙ্কাসমরে রামলক্ষ্মণকে দুইবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। অবশেষে ঘোর যুদ্ধে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন।

মেনকা—(১) অপ্সরা বিশেষ। ইনি দেবরাজ কর্ত্তৃক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য প্রেরিত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। (শকুন্তলা দেখ)।

(২) পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের পত্নী। ইনি মেনা নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহার পুত্র মৈনাক পর্ব্বত এবং কন্যা গঙ্গা ও উমা।

মৈনাক—হিমালয়ের পুত্র। মেনকার গর্ভে ইহার জন্ম। দেবরাজ বজ্রাঘাতে পর্ব্বত সমূহের পাখা কর্ত্তন করেন। মৈনাক পবনদেবের সাহায্যে সমুদ্রে পলায়ন করিয়া সমুদ্রে ডুব দিয়া ইন্দ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা পান।

য

যদু—মহারাজ যযাতির পুত্র। ইনি দেবযানীর গর্ভসম্ভূত। শুক্রাচার্য্যতনয়া দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। (দেবযানী দেখ)। যদুই যযাতির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হন। যযাতির অনুনয়ে শুক্রাচার্য্য বলেন "তুমি অপরের অভিমতানুসারে এই জরা তাহাতে সংক্রামিত করিতে পারিবে।" যযাতি প্রথমে যদুকে জরা গ্রহণে অনুরোধ করেন। যদু উহা গ্রহণে অসম্মত হন। ইহাতে যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে "তুমি আমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াও আমাকে স্বীয় বয়স দান করিলে না, এই হেতু তোমার বংশে কেহ রাজা হইবে না।" (মহাভা-আদি) এই যদুবংশে যাদবগণের উৎপত্তি হয়, এই বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই যাদবগণকে ধ্বংস হইতে দেখেন। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)।

যম—সূর্য্যের পুত্র; সংজ্ঞার গর্ভে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। (ছায়া দেখ)।

যমলোক মনুষ্যলোক হইতে ৮৬০০০ যোজন দূরে অবস্থিত। (গরুড়পুরাণ) যমরাজের পুরী ৪ হাজার যোজন দীর্ঘ এবং ২ হাজার যোজন বিস্তৃত। উচ্চ স্বর্ণময় প্রাচীরদ্বারা এই পুরী বেষ্টিত; এখানে সকল নদীই বিমলজলা; দীর্ঘিকা সকল পদ্মপূর্ণা। (বরাহ পুরাণ)। যম পুণ্যবান লোকদিগকে দেখিলে স্বয়ং নারায়ণরূপে প্রকাশিত হন; এই সময় তিনি চতুর্ভুজ, শ্যামকলেবর, শঙ্খচক্রগদাধারী ও গরুড়বাহন কিন্তু পাপাত্মাদিগের নিকট তাহার রূপ ভয়ঙ্কর। ইহাদের নিকট তাহার শরীর ৩০ যোজন দীর্ঘ, লোচন বাপীসদৃশ, বর্ণ ধূসর এবং তাহার ধ্বনি প্রলয়কালের মেঘগর্জ্জনবৎ। (পদ্ম-পু-ক্রিয়াযোগসার) স্মৃতিতে ১৪শ যমের নাম দৃষ্ট হয়, যথা—যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত। এই চতুর্দ্দশ যমকে তিলযুক্ত তিন অঞ্জলি জলদ্বারা তর্পণ করিলে সম্বৎসরকাল পাপ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে নদীতে যম তর্পণ বিশেষ প্রশস্ত। যমুনা যমের ভগিনী। যমুনা নদীতে যম-তর্পণ করিলে পাপ ক্ষয় হয়। (তিথিতত্ত্ব)

যযাতি—চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র। ইঁহার দুই ভার্য্যা—দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা ও শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার তনয়া। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে পুত্রদ্বয় এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে পুত্রত্রয় জন্মগ্রহণ করে। শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হন এবং এই জরা কোন পুত্রে সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা করিয়া একে একে সকল পুত্রকেই জরা গ্রহণে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেবযানীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয় এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত দ্রুহ্যু ও অনু জরাগ্রহণে অসম্মত হন। অবশেষে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার আদেশে তদীয় জরা গ্রহণে সম্মত হন। যযাতি আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া পুরুতে জরাসংক্রামিত করিলেন এবং তাহার যৌবন নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিলেন "আমি তোমার যৌবন দ্বারা কিছুকাল বিষয় ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া আমি পুনরায় জরা গ্রহণ করিব।" (দেবযানী দেখ)। যযাতি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সহস্র বৎসর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্ভোগ করিলেন, পরে পুরুকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন "দেখ, আমি সহস্র বৎসর বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছি, তথাপি আমার বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হইতেছে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেরূপ উহা নির্ব্বাণ না হইয়া বরং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তদ্রূপ কাম্য বস্তর উপভোগ দ্বারা বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায়। অতএব আমি আর বিষয় ভোগ করিব না।" এই বলিয়া স্বীয় যৌবন পুত্রে সংক্রামিত করিয়া তাহাকে রাজ্য অর্পণপূর্ব্বক নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলে স্বর্গ লাভ করিয়া তথায় কিছুকাল সুখে অবস্থিতি করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল স্বর্গভোগের পর দেবরাজ ইন্দ্রের শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হন। তিনি অন্তরীক্ষপথে নিম্নদিকে আসিতে আসিতে আকাশের যে স্থানে তদীয় দৌহিত্র অষ্টক শিবি প্রভৃতি অবস্থান করিতেছিলেন তথায় পতিত হইলেন। দৌহিত্রগণ মাতামহ যযাতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তাহাদের পুণ্যবলে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। এইরূপে রাজা যযাতি দৌহিত্রগণদ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। (অষ্টক দেখ) (মহাভা-আদি)

যশোদা—নন্দঘোষের পত্নী। ইনি গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে পালন করেন। বসুদেব মধ্যরাত্রে ব্রজে আগমনপূর্ব্বক যশোদার অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নিকট রাখিয়া তদীয় গর্ভজাত যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় প্রতিগমন করেন। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)।

সতী পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিলে দক্ষ ও প্রসূতি পুনর্ব্বার ভগবতীকে লাভ করিবার জন্য বহুকাল হিমালয় প্রস্থে তপস্যা করেন। দেবী ভগবতী উভয়ের তপস্যায় প্রীত হইয়া বলিলেন "আমি দ্বাপরের শেষভাগে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইব কিন্তু আমি কন্যারূপে তোমাদের গৃহে থাকিতে সমর্থ হইব না।" এই বর দিয়া ভগবতী অন্তর্হিত হইলে দক্ষ, নন্দরূপে ও প্রসূতি যশোদারূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেলেন। (মহাভাগবত পুরাণ)

বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তদীয় পত্নী ধরা ভগবানের দর্শনপ্রাপ্তির জন্য গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান বলিলেন যে তোমরা জন্মান্তরে শ্রীহরির দর্শন পাইবে। অতঃপর দ্রোণ নন্দরূপে ও ধরা যশোদারূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণঃ শ্রীকৃষ্ণ খণ্ড)

যাজ্ঞবল্ক্য—ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষি বিশেষ। ইঁহার প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

যুধিষ্ঠির—চন্দ্রবংশীয় স্বনামখ্যাত রাজা। ইঁহার এক রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ও অপর রাজধানী হস্তিনাপুর। পাণ্ডবগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মহারাজ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠাপত্নী কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের জন্ম হয় এবং অপরা ভার্য্যা মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত বর প্রভাবে কুন্তী ধর্ম্মের সহযোগে যুধিষ্ঠিরকে গর্ভে ধারণ করেন। (কুন্তী দেখ)। যুধিষ্ঠিরের জন্ম সময়ে দৈববাণী হইল "পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্র ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, সত্যবাদী, ভূমণ্ডলের একচ্ছত্রাধিপতি, ত্রিলোকবিশ্রুত, যশস্বী, তেজস্বী ব্রতপরায়ণ এবং যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত হইবেন।" অনন্তর মৈথুনধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া মুনির অভিশাপফলে মহারাজ পাণ্ডু দেহত্যাগ করেন। (পাণ্ডু দেখ)। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা পিতার মৃত্যুর পর হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মের অভিভাবকতায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই পাণ্ডব ও কৌরবগণ অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ হইয়া উঠিলেন যুধিষ্ঠির রথিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পিতার ব্যবহারে ঈর্ষ্যান্বিত দুর্য্যোধন অসন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্য ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক বারণাবত নগরে কুন্তীর সহিত পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাদের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। পাণ্ডবগণ জননীর সহিত এক নিবিড় বনে কিছুকাল বাস করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর কালে দরিদ্রব্রাহ্মণের বেশে দ্রুপদরাজ্যে উপস্থিত হন। নিবিড় বনে অবস্থান কালে ভীম হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া তদীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। হিডিম্বার গর্ভে ভীমের ঘটোৎকচ নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। (ঘটোৎকচ দেখ)। দ্রৌপদীস্বয়ংবরে অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং জননীর আদেশানুসারে পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। (দ্রৌপদী দেখ) প্রত্যেক ভ্রাতা দুই দিন করিয়া দ্রৌপদীর গৃহে থাকিতেন ; কিন্তু বনবাস ও অজ্ঞাতবাস কালে কেহই দ্রৌপদীর গৃহে গমন করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ কৌরবগণ শুনিতে পাইলেন যে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে পাণ্ডবেরা প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মন্ত্রী. তাহার উপর তাঁহারা পঞ্চালরাজ দ্রুপদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে রাজ্য না দিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং অচিরে কৌরবরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। দ্রোণ ও ভীষ্ম উভয়ে বিদুরের বাক্য সমর্থন করিলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার সস্নেহ কুশলপ্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত ধনরত্ন প্রদান করিলেন। বিদুর দ্রুপদকে বলিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা এই বিবাহ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন ; কৌরবগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন অতএব তাহাদের ইচ্ছা পাণ্ডবগণ হস্তিনায় গমন

করেন। দ্রুপদের সম্মতিক্রমে ও শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও কুন্তীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরের সহিত হস্তিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য পূজনীয় জনগণের পাদবন্দনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে বলিলেন "তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।" পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ গমন করিলেন। তাহাদের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত হইল। পাণ্ডবগণ তথায় ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক নগর স্থাপন করিয়া তাহা সুরম্য হর্ম্মারাজিতে সুশোভিত করিলেন। এখানে এক দিবস নারদ উপস্থিত হইয়া সুন্দ উপসুন্দের বৃত্তান্ত বলিয়া যাহাতে দ্রৌপদীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, তৎ সম্বন্ধে এক নিয়ম সংস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। (সুন্দ উপসুন্দ দেখ)।

নারদের বাক্য অবসান হইলে তাঁহার সমক্ষে পাণ্ডবেরা নিয়ম করিলেন যে তাঁহাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবেন তখন অন্যজন তথায় যাইতে পারিবেন না। যে এই নিয়ম উলঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ নারদের সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সুখে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের শাসনে প্রজাগণ সুখে বাস করিতে লাগিল; পৃথিবী ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। একদিন একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে অস্ত্র শস্ত্র থাকিত; অর্জ্জুন দস্যুভয় দমনার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিতে যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে সহসা প্রবেশ করেন; তথায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত আসীন ছিলেন। নিয়ম ভঙ্গ করাতে অর্জ্জুনকে দ্বাদশ বর্ষ বনে যাইতে হইল। যুধিষ্ঠির বনগমন সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন পিতার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠের পিতৃতুল্য এরূপ অবস্থায় তাঁহার গৃহ প্রবেশে অর্জ্জুনের কোন পাপ হয় নাই। কিন্তু অর্জ্জুন বিনীতভাবে জ্যেষ্ঠের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করেন অর্জ্জুন বানপ্রস্থ হইতে ফিরিয়া আসিলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হইলে দিগ্বিজয় করা প্রয়োজন হয়। দিগ্বিজয় কালে মগধরাজ জরাসন্ধ পাণ্ডবগণের অধীনতা স্বীকারে অসম্মত হওয়াতে তিনি কৃষ্ণের কৌশলে ভীমের হস্তে নিহত হন। (জরাসন্ধ দেখ) রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য দেখিয়া দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যান্বিত হন। তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ করিবেন শকুনি ও কর্ণের সহিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডবদিগকে অপমানিত করা ইহাই তাহাদের স্থির হইল। অন্ধমহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে এ ক্রীড়ায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহা শুনিলেন না। স্থির হইল যে যুধিষ্ঠির শকুনির সহিত অক্ষে লিপ্ত হইবেন; পণে শকুনির ধনরত্ন যত আবশ্যক হয় তাহা দুর্য্যোধন দিবেন। এইরূপে দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া শকুনি যুধিষ্ঠিরের সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির শকুনির দাস হইলেন। যুধিষ্ঠির পণে দ্রৌপদীকেও হারাইলেন; তিনিও শকুনির দাসী হইলেন। দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের মধ্যে দ্রৌপদীর অপমানে গোলমাল উপস্থিত হইল। কথা অচিরেই ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণে গেল। দ্রৌপদী সভায় নীত হইয়া লাঞ্ছিত হইলেন; দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় উরুর বস্ত্র অপসরণ করিলেন। ভীম দ্রৌপদীর অপমানে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

বৃদ্ধ মহারাজ দ্রৌপদীকে সমীপে আনয়নপূর্ব্বক নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া বর দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বরে স্বামিগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন এবং নিজেও মুক্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় পুত্রগণের দুর্ব্যবহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং এই সমুদয় বিষয় ভুলিয়া যাইতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের শক্তি, ভাবী উন্নতি ও

কৌরবপক্ষের ভাবী বিপদের কথা বলিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এবার তিনি যুধিষ্ঠিরের ধন, রত্ন ও রাজ্য গ্রহণের চেষ্টা করিবেন তাহাও ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করিলেন। এইবার যুধিষ্ঠির রাজ্য, ধন, রত্ন সমস্ত হারাইলেন। সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ পণে হারিয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা দরিদ্রের বেশে হস্তিনাপুর হইতে বনে চলিলেন। বনে অবস্থানকালে দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করেন, কিন্তু ভীমকর্ত্তৃক পথে পরাজিত ও ধৃত হইয়া জয়দ্রথ অপমানের একশেষ প্রাপ্ত হন। অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজ্যের অধিপতি বিরাটের রাজভবনে ছদ্মবেশে ছিলেন। বিরাটের ভবনে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ানিপুণ ব্রাহ্মণের বেশে, ভীম সূপকাররূপে, অর্জ্জুন ক্লীবরূপী নর্ত্তকীবেশে, নকুল অশ্বচিকিৎসকরূপে, সহদেব গো-পালকরূপে এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপে অবস্থিত ছিলেন। এই অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটের শ্যালক ও তদীয় সেনাপতি কীচককর্ত্তৃক সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদী অপমানিত হন। ভীম বিরাটরাজ্যের নাট্যশালায় কীচককে রাত্রিকালে বধ করিয়া দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ লন। বিরাটের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি কীচকের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে দুর্য্যোধন বিরাটের গোগৃহ আক্রমণ করিতে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। সুশর্ম্মা বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করিয়া বহু গোধন লইয়া যাইতেছিলেন, বিরাট এই সংবাদ গোপাধ্যক্ষের মুখে শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সসৈন্যে সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করেন। সুশর্ম্মা বিরাটকে দ্বৈরথযুদ্ধে পরাজিত করিয়া এবং তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া নিজ নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন; যুধিষ্ঠির ইহা শুনিয়া ভীমসেনকে বিরাটের উদ্ধারার্থ প্রেরণ করেন। ভীম সুশর্ম্মাকে বন্দী করিয়া নানাপ্রকার অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁহাকে মুক্ত করেন। বিরাটরাজ প্রত্যুপকার স্বরূপ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে মৎস্যরাজ্য দান করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন কর্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণসহ বিরাটের উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করিয়া তদীয় ৬০ হাজার গো অপহরণ করিতেছিলেন; বিরাট এই সংবাদ পাইয়া তদীয় পুত্র উত্তরকে কৌরব সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সুশর্ম্মার সহিত বিরাটের যুদ্ধে বিরাটের সারথি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উত্তর উপযুক্ত সারথির অন্বেষণ করিতেছিলেন। সৈরিন্ধ্রীর পরামর্শে এবং বিরাটকন্যা উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন উত্তরের সারথ্য স্বীকার করেন। উত্তর কুরুসৈন্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া সৈন্যসমুদ্র নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রাণভয়ে রথত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হইলেন। অর্জ্জুন উত্তরের নিকট নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং রথী হইলেন এবং উত্তরকে সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কুরুসৈন্যমধ্যে রথ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন কুরুসৈন্য মথিত করিয়া এবং দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করিলেন। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ সকলেই অর্জ্জুনকে চিনিয়া ফেলিলেন। এখন প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে পাণ্ডবগণের দ্বাদশবর্ষ জ্ঞাত বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হইল কি না? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং পুনরায় দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য। ভীষ্ম গণনা করিয়া বলিলেন যে, পাণ্ডবদের ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইয়া আরও পাঁচমাস ৬ দিন অধিক হইয়াছে। অর্জ্জুন জয়লাভ করিয়া উত্তরসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুনের পরামর্শে উত্তর প্রচার করিলেন যে তিনিই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। রাজভবনে প্রত্যাগত হইলে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিরাটের পরিচয় হয়। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ দ্রুপদরাজের ন্যায় আরও একটী সহায় পাইলেন। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঞ্চালরাজের পুরোহিতকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। দূত কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ কৌরবদিগকে জানাইলেন যে পাণ্ডবগণ সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন না; তাঁহারা লোকহিংসা ব্যতিরেকে রাজ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না; পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই

বাধ্য সামন্তনৃপতিগণ সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী ও পাণ্ডবপক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হইল। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য প্রভৃতি বীরগণ ও পাণ্ডবপক্ষে দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ, চেকিতান প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। অর্জ্জুনের এই সময়ে বিবেক উপস্থিত হইল। তিনি রাজ্যের জন্য এতগুলি প্রাণীর হত্যা ও এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিগণের বিনাশ সাধন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করেন। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ একস্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আছে; উহা ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ। এই ভারতযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের একমাত্র বীরত্বের নিদর্শন তৎকর্ত্তৃক শল্যরাজের পরাজয়। পাণ্ডবপক্ষে ভীম, অর্জ্জুন ও অভিমন্যু এবং কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। দ্রোণবধের সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সত্যের অপলাপ করিতে হইয়াছিল। (অশ্বত্থামা দেখ)। এই পাপে তাঁহাকে অল্প সময়ের জন্য নরকদর্শন করিতে হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও রাণী গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে সসম্মানে রাখিয়া তিনি কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করেন। তৎপর তিনি এক বৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী বন গমন করেন; সঞ্জয় ও ইঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই বনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সঞ্জয় অতিকষ্টে পলায়নপূর্ব্বক দাবানল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন (ধৃতরাষ্ট্র দেখ)। পাণ্ডবগণ ইঁহাদের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হন এবং গঙ্গাতীরে যাইয়া ইঁহাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান করেন। যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ গমনের সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা অর্জ্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া হিমালয় প্রদেশে মহাপ্রস্থান করেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী, ইঁহারা সকলেই কর্ম্মফলে হিমালয় বক্ষে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন; কেবল যুধিষ্ঠিরই দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (মহাভারত) কলির ৬১৫ বৎসর গতহইলে কুরুপাণ্ডবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী)।

যুযুৎসু—ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (মহাভারত)।

যুবনাশ্ব—একজন সূর্য্যবংশীয় রাজা। ইঁহার পিতার নাম প্রসেনজিৎ ও মাতা গৌরী। বিখ্যাত রাজা মান্ধাতা ইঁহার পুত্র। (অগ্নিপুরাণ)।

র

রঘু—সূর্য্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা। অযোধ্যানগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহার নামানুসারে এই বংশের নাম রঘুবংশ হইয়াছে। ইঁহার পিতা মহারাজ দিলীপ এবং পুত্র অজ; অজের পুত্র দশরথ ও দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। মহারাজ দিলীপ কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশে রাণী সুদক্ষিণার সহিত তদীয় আশ্রমে গমনপূর্ব্বক স্বর্গগবী সুরভিতনয়া নন্দিনীর সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক এই পুত্রলাভ করেন। দিলীপ এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; এই যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষণের ভার রঘুর উপর পতিত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র এই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করেন। রঘু দেবরাজকে পরাস্ত করিয়া এই অশ্ব আনয়ন করেন। মহারাজ রঘু রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই দিগ্বিজয়ের সময় রঘু ভারতের দক্ষিণে কেরলরাজ্য (বর্ত্তমান কানাড়া, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর), উত্তর পশ্চিমে কাম্বোজ, কাশ্মীর ও পারসিকদিগের রাজ্য, পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্গত কামরূপ ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সন্নিহিত

প্রদেশ সকল জয় করিয়াছিলেন। এই দিগ্বিজয় করিয়া যে প্রভূত ধনরাশি লাভ করেন তদ্দ্বারা "বিশ্বজিৎ" নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। (রঘুবংশ)।

রতি—কন্দর্পের পত্নী। মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে কন্দর্প ভস্মীভূত হইলে রতিদেবী কন্দর্পের রক্ষার্থ মর্ত্ত্যলোকে মায়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (কন্দর্প দেখ)।

রম্ভা—স্বর্গের প্রসিদ্ধ অপ্সরা, অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবতী ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিনী। একদা রম্ভা কান্তার্থিনী হইয়া নলকুবরের নিকট যাইতেছিল, পথে লঙ্কেশ্বর রাবণ তাহাকে আক্রমণ করেন। (রামায়ণ-উত্তর) (নলকুবর দেখ)।

রাজরাজেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ।

রাধা—বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী প্রেমময়ী রাধার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিকা এক সখীর নির্দ্দেশ আছে মাত্র। বিবিধ পুরাণে শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে শ্রীরাধা গোলোকধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে উদ্ভূত হন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং নিজ শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা। শ্রীরাধা আবির্ভাবমাত্রই ষোড়শবর্ষবয়স্কা ও নবযৌবনসম্পন্না হইলেন। শ্রীরাধা আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক সহাস্যবদনে রত্নসিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে আসীন হইলেন। এই সময়ে শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে লক্ষ কোটি গোপাঙ্গনা ও তদনুরূপ গোপগণ এবং স্থিরযৌবনসম্পন্ন নানাবর্ণে চিত্রিত গোসমূহ আবির্ভূত হইল। এই গোলোকোদ্ভবা শ্রীরাধাই সুদামের শাপে শ্রীবৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একদা ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ রম্যবনে রমণ করিতে অভিলাষ করিলেন। ইচ্ছা হইবামাত্রই তাঁহার দেহ হইতে শ্রীরাধা উৎপন্ন হইলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হরিপ্রিয়া নিজপতিকে কামাতুর দর্শনে তৎপ্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাধানামে অভিহিত হইয়াছেন। 'রা' শব্দের অর্থ লাভ করা—মুক্তিপদ লাভকরা; এবং 'ধা' শব্দের অর্থ ধাবমান হওয়া—হরির পদে ধাবমান হওয়া। ভক্তগণ 'রা' শব্দ উচ্চারণ মাত্রে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন এবং 'ধা' শব্দের উচ্চারণে হরিপদে ধাবমান হন। ত্রিলোকখ্যাত মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার বামভাগ হইতে উৎপন্ন এবং এই মহালক্ষ্মী চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রিয়তমা; এই মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে বাস করেন। মহালক্ষ্মীর অংশরূপিনী রাজলক্ষ্মী রাজগণের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেন, রাজলক্ষ্মীর অংশরূপিনী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী মর্ত্ত্যে প্রতি মনুষ্যের গৃহে বাস করেন। স্বয়ং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর বাস করেন। একদা রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বৃন্দাবনস্থিত শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতের একদেশে বিরজানাম্নী গোপীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। শ্রীরাধিকার ৪ জন দূতী এই সংবাদ শ্রীরাধাকে জানাইলেন। শ্রীরাধা দূতীমুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কণ্ঠহার দূরে নিক্ষেপ করিয়া সখীগণসহ গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদাম শ্রীরাধার আগমন বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া স্বয়ং গোপগণের সহিত পলায়ন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভয়ে বিরজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। বিরজা ক্রোধে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় নদীরূপে প্রবাহিত হইলেন। এদিকে শ্রীরাধা তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে একদিন শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন। সুদাম শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধাকে তিরস্কার করেন, ইহাতে শ্রীরাধা ক্রুদ্ধ হইয়া সুদামকে শাপ দিলেন "তুমি ক্রূর অসুরযোনি লাভ কর।" সুদামও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীরাধাকে শাপ দিলেন "তুমি গোলোক হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হও এবং গোপগৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শতবৎসর অসহ্য কৃষ্ণবিরহ দুঃখ ভোগ কর। ভগবান্ ভূভার-হরণের জন্য তোমার সহিত মিলিত হইবেন।" শ্রীরাধার অভিশাপে সুদাম অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচূড় নামে খ্যাত হইলেন এবং সুদামের শাপে শ্রীরাধা বৈশ্যবর বৃষভানুর কন্যারূপে গোকুলে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এইরূপদ্বয়ে বিভক্ত। দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্বামী এবং চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের নিকট মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী ইঁহারা প্রিয়তমা। [ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুঃ—প্রকৃতিখণ্ড]।

রাবণ—লঙ্কার অধিপতি। (কুবের দেখ)। ভগিনী শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ লইতে গিয়া রাবণ বনবাসী রামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করেন রাম সীতার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বানরপতি সুগ্রীবের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। রাম বানরেন্দ্রের সাহায্য পাইয়া বানরসৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হন এবং ৬ মাস কাল রাবণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া রাবণকে সবংশে সংহারপূর্ব্বক সীতার উদ্ধার সাধন করেন। (রাম দেখ)। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয় সনকাদি মুনিগণের শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে আবির্ভূত হন। (জয় দেখ)।

রাম—(রামচন্দ্র) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার আজ্ঞায় রাম পত্নী সীতাদেবী বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ ১৪ বৎসরের জন্য বনগমন করেন। রামের বনগমনের পর দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন। ভরত মাতুলালয় হইতে আগমনপূর্ব্বক পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। (দশরথ দেখ)। ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জননী কেকয়ীই রামের বনগমনের হেতু। তিনি জননীকে তিরস্কার করিলেন। মন্ত্রিগণ ভরতকে রাজ্যশাসন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি অসম্মত হইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সসৈন্যে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে চীরপরিহিত রামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ-সহ রথারোহণে অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তী গুহের (গুহকের) রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। নিষাদরাজ গুহক দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রিয়সুহৃদ্ রামচন্দ্রের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এজন্য রামচন্দ্র গুহের প্রদত্ত কিছুই গ্রহণ করিলেন না; রাম অশ্বদিগের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রিয়সুহৃদ্ গুহককে অনুরোধ করিয়া নিজেরা তিন জনে জলপান করিয়া অনাহারে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সুমন্ত্র সাশ্রুলোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং লক্ষ্মণের অনুরোধে গুহ নৌকা আনয়ন করিলে রাম তাহাতে গঙ্গা পার হইলেন। এইস্থান হইতেই বনবাসের আরম্ভ। প্রথম দিন ও রজনী ভয়ানক ক্লেশে তাঁহারা কণ্টকাকীর্ণ বনপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে বনবাস ক্লেশে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে চিত্রকূট পর্ব্বতের সানুদেশে আগমন করিয়া তথায় পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। একদিন মহাসৈন্য-কোলাহল শ্রবণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ শালবৃক্ষচূড়ায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন, ভরত সসৈন্যে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছেন। লক্ষ্মণ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্রকে ভরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ভরতের কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অল্পসময় পরেই ভরত রামসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নানাপ্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাম প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে কিছুতেই অযোধ্যায় ফিরিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভরতকে স্নেহসম্ভাষণে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিতে বলিলেন, কিন্তু ভরত তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি নিরাশ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাম তাহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিলেন। বশিষ্ঠ ও জাবালী প্রভৃতি ঋষিগণ রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। জাবালীর লোকায়তিক উপদেশ শুনিয়া রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং তাঁহার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী মনে করিয়া তাঁহাকে একটু ভৎর্সনা ও করিলেন (চার্ব্বাক দেখ)। যাহা হউক বহুযুক্তিতর্কের পর স্থির হইল যে, রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না; ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাগ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পাদুকারই প্রতিনিধি হইয়া ১৪ বর্ষ রাজ্যশাসন করিবেন; রামচন্দ্র ভরতকে স্বীয় পাদুকা প্রদান করিলেন; ভরত বিমর্ষের সহিত পাদুকাগ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। রামচন্দ্র দেখিলেন, চিত্রকূট (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড) অযোধ্যার অনতি-দূরে অবস্থিত, এখানে অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে, এজন্য তিনি চিত্রকূট প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ভরতের উদ্দেশ্য যতই উন্নত হউক না কেন দশরথের বৃদ্ধাবস্থায় রাজবাটীতে দুইটী পক্ষ হইয়াছিল; একটী কেকয়ীর

ও অপরটী কৌশল্যার পক্ষ। কেকয়ী রূপযৌবনসম্পন্না; তিনি রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

চিত্রকূট রামায়ণের সময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ; কিন্তু মহাভারতের সময় উহা ভোজরাজ্যের অন্তর্গত। রামের সময় দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থান বনাকীর্ণ এবং আদিম অধিবাসীদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল। এই সমুদয় অনার্য্য আদিম অধিবাসী রামায়ণে রাক্ষস, বানর, গোলাঙ্গুল, ঋক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। বাল্মীকি অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত পথ সুন্দররূপে ও অভ্রান্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু চিত্রকূটের দাক্ষিণবর্ত্তীস্থান তদ্রূপ করেন নাই; কোন জনপদের উল্লেখ মাত্র করেন নাই। রাম চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত পঞ্চবটীতে উপনীত হইলেন এবং তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ও ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তুসমাকুল বনপ্রদেশের মধ্য দিয়া বাল্মীকি রামকে পঞ্চবটীতে উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে লঙ্কেশ্বর রাবণের কামার্দ্দিতা ভগিনী শূর্পণখার নাসাকর্ণ-চ্ছেদনের পর রাক্ষসগণের সহিত রামের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাবণের সেনাপতি খর দূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্যসহ রাক্ষসরাজের বিস্তৃতসাম্রাজ্যের প্রান্তসীমারক্ষায় নিযুক্ত ছিল; ইহারা সকলেই রামের হস্তে নিহত হইল। ভগিনীর দুর্দ্দশা এবং জনস্থানের রক্ষিসৈন্যগণের নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া লঙ্কেশ্বর রাবণ পরিব্রাজকবেশে রামের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে একাকিনী পাইয়া হরণ করিলেন। মারীচ রাক্ষসের মৃত্যুকালের উক্তি শুনিয়া রামচন্দ্রের মনে রাক্ষসগণের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা উদিত হইয়াছিল; পথে লক্ষ্মণকে একাকী আসিতে দেখিয়া তাঁহার সেই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে দ্রুতবেগে কুটীরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। বিলাপ করিতে করিতে দুই ভাই সীতান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মৃতকল্প জটায়ুর দর্শন পাইলেন। জটায়ু বলিলেন "আমি সীতাকে রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই; সীতাদেবী ও আমার প্রাণ উভয়ই রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে; এই যে ভগ্ন রথচ্ছত্র ও দণ্ড দেখিতেছেন, ইহা রাবণের, তাহার সারথিকেও আমি বিনাশ করিয়াছি, কিন্তু আমি ক্লান্ত হইয়া পড়াতে সে খড়্গদ্বারা আমার পক্ষচ্ছেদন করিয়া গিয়াছে। দুরাত্মা রাবণ সীতাকে অপহরণপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে; রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা।" এই কথা বলিতে বলিতে জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলেন। রামলক্ষ্মণ জটায়ুদেহের শেষসংস্কার বিধানপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণোপকূলের সমীপবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর ভয়ঙ্কর শ্বাপদসঙ্কুল ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় কবন্ধ নামক রাক্ষসকে বধ করেন। (কবন্ধ দেখ)। কবন্ধ মৃত্যুর পূর্ব্বে রামচন্দ্রকে পম্পাসরোবরের তীরবর্ত্তী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীস্থাপনের পরামর্শ দান করিল। অনন্তর রামচন্দ্র বৃদ্ধা তাপসী শবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শবরী চিরাকাঙ্ক্ষিত রামলক্ষ্মণের দর্শন পাইয়া তাঁহাদিগের যথাশক্তি পরিচর্য্যা করিলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষেই যজ্ঞাগ্নিতে নিজ দেহ আহুতি দিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। রামলক্ষ্মণ শবরীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বতে উপনীত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়কে আগমন করিতে দেখিয়া ভীত সুগ্রীবের আদেশে হনুমান ভিক্ষুবেশে তাঁহাদের সহিত বিশুদ্ধ ভাষায় আলাপ করেন। উভয়ের পরিচয় পাইয়া হনুমান তাহাদিগকে পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট সীতার উত্তরীয় ও অলঙ্কার প্রাপ্ত হইলেন। উভয়ের মৈত্রী সম্পন্ন হইলে রামচন্দ্র বালি-বধে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি সুগ্রীবের নিকট আত্মবলের পরিচয় দিতে যাইয়া একবাণে সপ্ততাল ভেদ করেন। রামলক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেন। রামের পরামর্শে সুগ্রীব বালির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন; রাম বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া মল্লযুদ্ধে রত বালিসুগ্রীবের রণ দেখিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন ঘোর যুদ্ধে সুগ্রীব বালির সহিত আর প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছেন না, প্রতিপদে সুগ্রীব অপদস্থ হইতেছেন, তখন রাম বৃক্ষান্তরাল হইতে এক শর নিক্ষেপ করিয়া বালিকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। বালি গুপ্তঘাতক রামের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রাম

বালির প্রযুক্ত কটূক্তির এইরূপ উত্তর দিলেন "আমি তোমাকে বধ করিয়া অন্যায় করি নাই, বরং উচিত কার্য্যই করিয়াছি। আমি তোমার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডই দিয়াছি। শাস্ত্রে আছে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, জনক ও বিদ্যাদাতা ইঁহারা পিতৃতুল্য এবং কনিষ্ঠভ্রাতা, ঔরসজাত তনয় ও ছাত্র ইহারা পুত্রপদবাচ্য। তুমি কনিষ্ঠভ্রাতাকে তাড়াইয়া দিয়া তদীয় পত্নী রুমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ। রাজাই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের রক্ষাকর্ত্তা; যে প্রজা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য করে, রাজা তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূগমন করিয়া পুত্রবধূগমনরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে তোমার এই পাপে প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত; আমি সেই শাস্তিই তোমার প্রতি বিধান করিয়াছি। এই শৈলকানন শোভিতা বসুন্ধরা ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের রাজ্য। আমরা ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি; আমার কনিষ্ঠভ্রাতা ভরত অযোধ্যায় থাকিয়া এই রাজ্য শাসন করিতেছেন; তুমি প্রকৃতপক্ষে ভরতের প্রজা; আমি ভরতের আজ্ঞানুসারে পাপের দণ্ড দিতে নিযুক্ত আছি; অতএব আমাদ্বারা বিহিত দণ্ডই রাজদণ্ড বলিয়া মনে করিবে। যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে তাহার প্রতি ক্ষাত্রধর্ম্মানুমোদিত সম্মুখ যুদ্ধের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছেনা।" বালি প্রাণত্যাগ করিল; তাহার শব গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত করিয়া চন্দনকাষ্ঠে অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করা হইল। বালি বধের পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন; রামলক্ষ্মণ অদূরবর্ত্তী মাল্যবান্ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। মাল্যবান্ পর্ব্বতে কিষ্কিন্ধ্যার গীতবাদিত্র ধ্বনি শ্রুত হইত। সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইলেন; হৃতরাজ্য ও হৃতপত্নীক সুগ্রীব অত্যন্ত সুখে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। দিবারাত্রি রমণী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এবং সুরাপানে মত্ত থাকিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল; তিনি সীতান্বেষণের কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে রাম সীতার চিন্তায় আকুল; বর্ষার ৪টী মাস তাঁহার নিকট শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইল; বর্ষা অতীত হইয়া শরৎ আগত হইল; এখনই সীতার অন্বেষণে ও তাহার উদ্ধারে সুগ্রীবের মনোযোগ দেওয়ার কথা; কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠাইলেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর অপূর্ব্বশ্রী সন্দর্শন করিলেন; এই নগরী সুশোভন প্রাসাদরাজি সমাকীর্ণ; ইহা নানা পুষ্পফলসমন্বিত উদ্যানরাজি বিশিষ্ট; এখানে তিনি আসিয়া হনুমান প্রভৃতির রম্য গৃহ দর্শন করিলেন। তিনি সপ্ত কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া একবারে সুগ্রীবের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। এখানে সুগ্রীব বহুসংখ্যক রূপযৌবনগর্ব্বিত রমণী বেষ্টিত হইয়া নানাপ্রকার সুখসম্ভোগ করিতেছিলেন; সেখানে নানাপ্রকার বাদ্য-যন্ত্র হইতে সুমধুর ধ্বনি উদ্গত হইতেছিল। রমণীগণ উত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া সঙ্গীতে মগ্ন ছিল; তাহাদের নূপুরধ্বনি ও নিতম্বলগ্নমেখলার শব্দ শুনিয়া লক্ষ্মণ একটু লজ্জিত হইলেন, কিন্তু পরে ক্রোধবেগে জ্যাস্ফালন করাতে রমণীগণের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল; রমণীগণ লক্ষ্মণকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইল। তারা লক্ষ্মণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া নানা মিষ্টবচনে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিলেন। লক্ষ্মণ প্রশান্ত হইলে পর সুগ্রীব তাঁহার সহিত ধীরভাবে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামের সমীপে গমন করিলেন। রামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সুগ্রীব সীতান্বেষণার্থ হনুমানাদিকে দক্ষিণ দিকে, সুষেণাদিকে পশ্চিম দিকে, শতবলিকে উত্তরে এবং বিনত নামক বানরপতিকে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন। হনুমান ব্যতীত অপর বানর পতিগণ সীতার উদ্দেশ না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতির মুখে রাবণের আবাসস্থান অবগত হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। অপার সাগর দেখিয়া বানরগণ ভীত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল; হনুমান সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া স্বীয় শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং এক লম্ফে সমুদ্রস্থ মৈনাক পর্ব্বতে এবং মৈনাক পর্ব্বত হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক লঙ্কায় উপনীত হইলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবাদি বানরগণের বিবরণ, তাঁহার রাজধানীর বর্ণন ও বানর-রমণীগণের আচার ব্যবহার পাঠ করিয়া ইহাদিগকে, লাঙ্গুলধারী বানর জাতি বলিয়া বোধ হয় না; পক্ষান্তরে ইহাদিগকে সুসভ্য মানব বলিয়াই বোধ হয়। ভারতবর্ষ অনার্য্যগণের দেশ; আর্য্যগণ আগন্তুক। আর্য্যেরা জেতা, অনার্য্যগণ বিজিত। সকল দেশে সকল সময়ই বিজেতৃগণ বিজিতদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিজেতা আর্য্যবংশোদ্ভব ঋষি বিজিত অনার্য্য রাজগণের বৃত্তান্ত-

লিখিতে যাইয়া তাহাদিগকে বানর, ভল্লুক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিবেন, অসম্ভব নহে। কিন্তু সুগ্রীবাদির বৃত্তান্ত পাঠে তাঁহাদের প্রতি বাল্মীকির কোন ঘৃণার ভাব লক্ষিত হয় না। এ বিষয়ের একটা মীমাংসা আছে। বর্ত্তমান সময়ে সাঁওতালদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র, গৃধ্র, সুপারি প্রভৃতি গোত্র দেখা যায়। যে যে গোত্র সে সেই গোত্রবোধক প্রাণী বা বস্তু হিংসা করেনা বা কোনরূপ ব্যবহার করেনা; বরং ইহাদের প্রতি সম্মানই দেখাইয়া থাকে। ইহা হইতে বোধ হয় এই রীতি প্রাচীনকালে দ্রাবিড়ীয় অনার্য্য জাতীয় লোকদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। যে বস্তু বা প্রাণীর নামে মনুষ্যগণ অভিহিত হয় ইংরেজীতে তাহাদিগকে "টোটেম" (Totem) কহে। এই টোটেম পূজা পৃথিবীর অনেক অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির মধ্যে এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে সীতার দর্শন পাইলেন। রাক্ষসস্ত্রীগণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হনুমান বিস্মিত হইয়াছিলেন। মন্দোদরীকে দেখিয়া তাহার সীতা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। হনুমান নন্দনকাননসদৃশ রাবণের প্রমোদবন ভগ্ন করেন। বনভঙ্গের সংবাদ পাইয়া রাবণ হনুমানকে ধরিবার জন্য রাক্ষস ও সেনাপতিগণকে আদেশ করিলেন। হনুমানের হস্তে বহু রাক্ষস সৈন্য ও জাম্বুমালি, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি সেনাপতিগণ বিনষ্ট হইল। অবশেষে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা হনুমানকে বন্ধন করিয়া রাবণের নিকট উপস্থিত করিলেন। রাবণ প্রথমে হনুমানকে বধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিভীষণের পরামর্শে তাহার লাঙ্গুলে দাহ্য পদার্থ বন্ধন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক ছাড়িয়া দেন। হনুমান লাঙ্গুলসংলগ্ন অগ্নিতে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া সীতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অরিষ্ট পর্ব্বতে আরোহণ করেন। অরিষ্ট পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করেন এবং তথা হইতে বানরগণ সহ রামসকাশে উপনীত হন। রাম তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। হনুমান লঙ্কাপুরীর যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও সুদৃঢ়ত্ব বর্ণন করিলেন তাহাতে ইন্দ্রের অমরাবতী [ও বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধের মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থিত আর্থার বন্দরের সুদৃঢ় দুর্গের] কথা মনে পড়ে। হনুমানের নিকট লঙ্কাপুরীর দুরধিগম্যত্ব অবগত হইয়া রাম ভীত হন নাই; তিনি সুগ্রীবের প্রবল সেনাবাহিনী সঙ্গে করিয়া পার্ব্বত্যপথে সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। রাবণের গুপ্তচরগণ বন্য ফল বিষাক্ত করিয়া দিয়া থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় রাম সৈন্যদিগকে পরীক্ষা না করিয়া বন্যফলাস্বাদন করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময়ে রাবণকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিভীষণ রামের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুগ্রীবাদি বানরপতিগণ এই অজ্ঞাতশীল রাক্ষসকে শিবিরে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাম শরণাগতকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রাম সমুদ্রের বেলা ভূমিতে গমনপূর্ব্বক সাগরের বিশালতা দর্শন করিলেন এবং বাহুমূলে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক কুশে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে সাগর উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া সাগরের উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হয় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন, নয় প্রাণ ত্যাগ করিবেন। যখন দেখিলেন তাহার উপাসনায় কোন ফল হইল না; সমুদ্র আসিল না, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রশোষণার্থ তাহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর রামশরে সমুদ্রের মীনমকরাদি প্রাণিচয় ব্যথিত হওয়াতে সমুদ্র ভীত হইয়া রামসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মার পুত্র কপিসেনাপতি নলদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিতে রামকে পরামর্শ দিয়া প্রস্থান করিলেন। নল বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপরিভাগে এক সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। নলের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া বানরগণ শিলা ও বৃক্ষাদি দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিল। সেতু নির্ম্মিত হইলে রাম সসৈন্যে সেতু পার হইয়া লঙ্কাবরোধ করিলেন। সুগ্রীব ও রামে ভেদ জন্মাইবার নিমিত্ত শুকনামক এক গুপ্তচর রাবণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু রাবণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই; শুক বানরগণকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিগৃহীত হইল। ইত্যবসরে রাবণ সীতাকে বশে আনিবার জন্য তাঁহার নিকট রামনিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন এবং সীতার বিশ্বাসের জন্য বিদ্যুজ্জিহ্বনামক রাক্ষসের মায়াবলে সৃষ্ট রামের মস্তক ও ধনু প্রদর্শন করেন। রামের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া সীতা বিলাপ করিতে লাগিলেন, এমন সময় বিভীষণের পত্নী সরমা

আসিয়া সীতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। সরমা সীতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, রাম নিহত হন নাই, রামের মস্তকাদি যাহা কিছু দেখান হইয়াছে তাহা মায়াবিদের মায়াসম্ভূত। অতঃপর উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কপিরাক্ষস সৈন্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইল। একদিন অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে পরাজিত করিলেন। তৎপর ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন; অনন্তর গরুড়ের স্পর্শে রামলক্ষ্মণ নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধে রাক্ষসসৈন্য ও রাক্ষস সেনাপতিগণ একে একে রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসসেনাপতিগণ নিহত হইলেন। অনন্তর রাবণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সুগ্রীবাদির সহিত রাবণের যুদ্ধ হইল; তৎপর রামের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল; রামের হস্তে রাবণ পরাজিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুম্ভকর্ণের সহিত রামের যুদ্ধ হয়; ঘোর যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের পতন হয়। আর্ষ-রামায়ণের কোথাও প্রমীলা ও বীরবাহুর নাম দৃষ্ট হয় না। অনন্তর অতিকায়ের পতন ও নিকুম্ভিলানামক চৈত্যভূমিতে ইন্দ্রজিতের হোম সম্পাদন। যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধে জয় লাভ। তৎপর মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধক্ষেত্রে মকরাক্ষের পতন। ইন্দ্রজিৎ মায়া সীতাবধ করেন; সীতা বধ দেখিয়া রাম বিলাপ করিতে আরম্ভ করেন। বিভীষণ রামকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, এ সমুদয়ই মায়া; সীতাবধ ব্যাপার সর্ব্বৈব মিথ্যা। অনন্তর বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা বনের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিভীষণ দূর হইতে লক্ষ্মণকে উক্ত বনের এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন যে ইন্দ্রজিৎ এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণ ইঁহার শরীরে লাগে না, কাজেই মেঘনাদ অনায়াসে যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে আজ ইন্দ্রজিৎ ন্যগ্রোধ কোটরে প্রবিষ্ট না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিভীষণের এই উপদেশ পাইয়া লক্ষ্মণ অবিলম্বে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিলেন এবং ন্যগ্রোধের অন্তরালে যাওয়ার পূর্ব্বেই ঘোর যুদ্ধে তাহাকে বধ করিলেন। পুত্রবধ বৃত্তান্ত শুনিয়া রাবণ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং পুত্রহন্তা লক্ষ্মণকে বিনাশ করিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। পুত্রশোক কাতর রাবণের শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণ পতিত হইলেন। অন্যতম বানর সেনাপতি সুষেণ বিশল্যকরণীনামক মহৌষধি আনয়ন করিতে হনুমানকে মহোদয় নামক ওষধি পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। হনুমান সুষেণনির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের দক্ষিণশিখরে গমন করিলেন; কিন্তু বিশল্যকরণী চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিলম্বে কার্য্য ক্ষতি মনে করিয়া একবারে গিরির শিখর উৎপাটনপূর্ব্বক সুষেণ সমীপে আনয়ন করিলেন। ঔষধপ্রয়োগে লক্ষ্মণের মোহাপগম হইল। অনন্তর রাম রাবণের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দ্বৈরথ যুদ্ধে রাম রাবণকে বিনাশ করিলেন। তিনি রাবণের মৃতদেহের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন; অগুরু ও চন্দনকাষ্ঠে অগ্নিসংযোগে রাক্ষসরাজের শব ভস্মীভূত হইল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের প্রতি রাক্ষসসেনা ও সেনাপতিগণের যেরূপ ভক্তির বর্ণনা আছে, আর্ষরামায়ণে তাহার কিছুই নাই। বিভীষণপুত্র তরণীসেনের নাম আর্ষরামায়ণে দৃষ্ট হয় না। রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষেকের পর হনুমান রামের আদেশে অশোক বনে গমনপূর্ব্বক সীতাকে তাঁহাদের বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। শুভ সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদে সীতার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল; তিনি কতকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। সীতা হনুমানের নিকট স্বামিদর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। হনুমান সীতার অভিপ্রায় রামচন্দ্রকে বলিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন যে, সীতার কেশকলাপ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে সুন্দররূপে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া আনা হউক। বিভীষণ স্বয়ং রামের আদেশ সীতাকে জ্ঞাপন করিলেন। সীতা অমার্জ্জিত দেহেই যাইতে ইচ্ছা করিলেন; তিনি বলিলেন "আমি এই অস্নাত অবস্থাতেই যাইয়া স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু বিভীষণ বলিলেন "রামচন্দ্র যেরূপ আদেশ করিয়াছেন সেরূপ কার্য্য করাই সঙ্গত।" অনন্তর সীতার জটিল কেশকলাপ মার্জ্জিত হইল; তিনি বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বামিসকাশে উপনীত হইলেন। সীতাকে দর্শন করিয়া রাম বলিলেন "অদ্য আমার শ্রম সফল হইল। আমি মানাকাঙ্ক্ষী; রাবণ আমার মানে আঘাত করিয়াছিল, আমি তাহার প্রতিশোধ

লইয়াছি; পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব রক্ষা করিতে আমি রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিয়াছি। তুমি রাক্ষসগৃহে ছিলে, আমি তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি; রাবণের অঙ্কক্লিষ্টা তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার কলঙ্ক হইবে; আমি তোমার জন্য যুদ্ধ করি নাই, বৈর নির্য্যাতন মানসেই করিয়াছি, এখন তুমি যথা ইচ্ছা তথা গমন করিতে পার।" রামের পরুষ বাক্য শুনিয়া সীতাদেবী প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন; সীতার আদেশে লক্ষ্মণ চিতাসজ্জা করিলেন; অগ্নিতে স্বর্ণপ্রতিমা ঝম্পপ্রদান করিলেন; অশ্রুপূর্ণনেত্রে রাম অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন অগ্নিদেব সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষস ও সুগ্রীবপ্রমুখ বানরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া পুষ্পকারোহণে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বনগমনের ঠিক ১৪শ বর্ষ পরে রামচন্দ্র প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। সেখানে শুনিতে পাইলেন যে ভরত পাদুকার উপর রাজছত্র ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ নন্দিগ্রামে রাজ্য শাসন করিতেছেন। হনুমান রামচন্দ্রের আদেশে অগ্রেই ভরতের নিকট যাইয়া তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিলেন। যথাসময়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন; শুভদিনে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে রামায়ণের ফলশ্রুতি বিষয়ক ১৮টী শ্লোক লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ-ভাগে গ্রন্থপাঠের ফল বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, লঙ্কাকাণ্ডই মহর্ষি বাল্মীকিরচিত রামায়ণের শেষকাণ্ড; উত্তরকাণ্ড পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়া বাল্মীকিরামায়ণের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। সত্যবটে যে উত্তরকাণ্ডের শেষেও ফলশ্রুতি বিষয়ক কয়েকটী শ্লোক আছে কিন্তু উভয়ফলবর্ণনায় পার্থক্য অনেক। লঙ্কাকাণ্ডের শেষের শ্লোকগুলি আধ্যাত্মিকতা ও পারমার্থিকতা পূর্ণ, কিন্তু উত্তরকাণ্ডের শেষের শ্লোকগুলিতে ঐহিক ভোগ সুখেরই আভাস পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত শ্লোকগুলি ব্রাহ্মণদিগের অবনতির সময় লিখিত হইয়া সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ ইহাতে কুরুক্ষেত্র শব্দের উল্লেখ থাকাতে শ্লোকগুলির প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতেছে না। রামের পরবর্ত্তী সূর্য্যবংশের দ্বাত্রিংশৎ রাজা বৃহদ্বল। ইনি মহাভারতীয় ঘটনার সময়ে কোশলে রাজত্ব করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের সময় ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহাকে পরাজিত করেন। "কোশলাধিপতিঞ্চৈব বৃহদ্বল মরিন্দমঃ" (মহা-সভা-দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে .০ম অ)। ভারতযুদ্ধে ইনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। "তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রো ব্যচরদ্রণে।" (মহা-দ্রোণ-৪৬ অ)

কুশীলব যে রামায়ণ গাইতেন তাহাতে উত্তরকাণ্ড থাকা অসম্ভব, যেহেতু সে কাণ্ডের বর্ণিত বিষয়—সীতার পাতাল গমন, লক্ষ্মণবর্জ্জন—ইত্যাদি—তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে দৃষ্ট হয়, "আদি কাব্য মিদঞ্চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।" এই শ্লোকার্দ্ধ নিশ্চয়ই বাল্মীকি লিখেন নাই; ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বাল্মীকির অনেক পরে কোন ব্যক্তি এই কয়েকটী শ্লোক ও পরবর্ত্তী ফলশ্রুতির শ্লোকগুলি রচনা করিয়া বাল্মীকিরচিতরামায়ণের সহিত সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

লোকাপবাদভয়ে অন্তর্ব্বত্নী সীতার বিসর্জ্জন, বাল্মীকির তপোবনে কুশীলবের জন্ম, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কুশীলবসহ বাল্মীকির আযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞে আগমন, কুশীলবকৃত রামায়ণ গান, কুশীলবের পরিচয়, সীতার আনয়ন ও তাঁহার পাতালে গমন, লক্ষ্মণবর্জ্জন ও রামাদির বৈকুণ্ঠে গমন, এই সমুদয়ই উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত প্রধান ঘটনা। এতদ্ব্যতীত বহু অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা এই কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। আর্ষরামায়ণের বালকাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্থ সর্গের প্রথম চারিটী শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, এই বৃহৎ গ্রন্থে ৬ কাণ্ড ও ৫০০ সর্গ আছে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় যে, ইহাতে ৭ কাণ্ড ও ৬৬০ সর্গ আছে। সুতরাং একটী কাণ্ড ও ১৬০ সর্গ যে প্রক্ষিপ্ত তৎসম্বন্ধে সন্দেহ রহিতেছে না। ইহা হইতে এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি রচিত নহে। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান প্রাচীন অযোধ্যা সূর্য্যবংশের শেষ রাজা সুমিত্রের পরলোক প্রাপ্তির পর জীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকায় সমাবৃত হইয়া অরণ্যে পরিণত হয়। খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে রাজা বিক্রমজিৎ এই নগর পুনর্ব্বার হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত করেন।

রাহু—চন্দ্রসূর্য্যপ্রমর্দ্দনকারী অসুর বিশেষ। বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে ইহার জন্ম। সমুদ্রমন্থনের পর দেবগণের অমৃতপানসময়ে এক অসুর দেবতাদের দলে বসিয়া অমৃত পান করিতে থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্য ইহা লক্ষ্য করেন এবং বিষ্ণুকে সংবাদ দেন। বিষ্ণু চক্রদ্বারা এই অসুরের মস্তকচ্ছেদন করেন। মস্তকভাগ রাহু ও শরীর কেতু নামে পরিচিত হইল। রাহু এই ক্রোধে চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। (শ্রীমস্তা—৮৯অ)

যখন রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং যখন সূর্য্যকে গ্রাস করে, তখন সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। এই রাহু ও কেতুকে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নোড্‌স্ (Nodes) বলিয়া থাকেন। হিন্দু পঞ্জিকায় রাহু রাক্ষস মুখাকারে ও কেতু ফণধর সর্পাকারে চিত্রিত হইয়া থাকে।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। ইনি লক্ষ্মীর অবতার। (লক্ষ্মী দেখ)। ইঁহার ভ্রাতা রুক্মী। রুক্মিণী যৌবনের প্রারম্ভে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর রূপগুণের বিষয় অবগত হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত হন; এবং রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতা রুক্মীর প্রতিকূলতায় পিতা একার্য্যে সম্মতি দিলেন না। রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন।

এদিকে মগধাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ দমঘোষের পুত্র শিশুপালের জন্য রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়া বিদর্ভ-পতি ভীষ্মকের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ভীষ্মক জরাসন্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চেদিরাজ দমঘোষ ও মগধাধিপতি জরাসন্ধ একবংশসম্ভূত। দমঘোষতনয় শিশুপাল জরাসন্ধের নিকট থাকিয়া পুত্রবৎ লালিত পালিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের জামাতা কংসকে বিনাশ করেন; এজন্য শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষ্টা। কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মীর পরামর্শে ভীষ্মক জরাসন্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইলে ভীষ্মকের রাজধানী কুণ্ডীনগরে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পিতৃস্বসৃতনয়; এজন্য তাঁহারা পিতৃস্বসার প্রীতিসম্পাদনার্থ বৃষ্ণিবংশীয়-দিগকে লইয়া কুণ্ডীনগরে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন রুক্মিণী দেবপূজার্থ রথারোহণপূর্ব্বক দেবমন্দিরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ের চক্ষু উভয়ে পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত পরামর্শ করিয়া রুক্মিণীহরণে সঙ্কল্প করিলেন। দেবার্চ্চনা করিয়া যখন রুক্মিণী গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে নিজরথে আরোহণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া, জরাসন্ধ, শিশুপাল, রুক্মী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রুক্মী পিতার সমীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ ও ভগিনীকে উদ্ধার না করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে জরাসন্ধ, শিশুপাল, রুক্মী প্রভৃতি বীরগণ পরাজিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরপ্রহারে রুক্মী মূর্চ্ছিত হইলেন; রুক্মিণীর প্রার্থনায় তিনি রুক্মীকে বধ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। রুক্মী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না; বিদর্ভদেশের এক প্রান্তে এক নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন এবং তথায় যথাবিধি তাঁহাকে বিবাহ করেন। রুক্মিণীই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুষেণ প্রভৃতির দশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রুক্মিণী-তনয় প্রদ্যুম্ন রুক্মীর তনয়া শুভাঙ্গীকে বিবাহ করেন। (হরিবংশ)।

রুক্মী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক। (রুক্মিণী দেখ)

রুদ্র—এই দেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে কূর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা সৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যা করেন, কিন্তু তপস্যায় কোন ফলই হইল না; তিনি কিছুতেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হয়, ক্রোধবেগে তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। এই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূতপ্রেতাদির উদ্ভব হইল। অনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাণময় রুদ্রদেব আবির্ভূত হইলেন। এই রুদ্রদেব কোটী সূর্য্যসমপ্রভ ও প্রলয়কালীন

অগ্নিসদৃশ। রুদ্রদেব আবির্ভূত হইয়াই রোদন করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা বলিলেন "তুমি রোদন করিও না।" জন্মিবা-মাত্রই রোদন করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি রুদ্রনামে আখ্যাত হন (কূর্ম্মপুরাণ)। পদ্মপুরাণমতে ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে রুদ্রের উৎপত্তি। এই পুরাণমতে ইরাবতী, দীক্ষা, ধৃতি প্রভৃতি পত্নীর গর্ভে ভূতপ্রেতাদির সৃষ্টি করেন। কূর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে যে, যদি কেহ বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রতি ভেদবুদ্ধিতে দৃষ্টি করেন, তবে তাহার নরকে গমন হইয়া থাকে এবং উক্ত দেবদ্বয়কে অভেদবুদ্ধিতে দেখিলে, তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে রুদ্র ও অগ্নি অভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে (ঋগ্বেদ ১। ২৭। ১০ দেখ)। এই বেদে বহুস্থানে রুদ্রদেবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কোথাও তিনি বরুণ-রূপে গৃহীত হইয়াছেন।

রুমা—কপিপতি সুগ্রীবের ভার্য্যা।

রুরু—মহর্ষি চ্যবনের পৌত্র ও প্রমতির পুত্র। প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইহার উৎপত্তি। রুরুর পত্নীর নাম প্রমদ্বরা। প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর শুনক নামে এক পুত্র জন্মে। প্রমদ্বরার মৃত্যু হইলে রুরু স্বীয় আয়ুর অর্দ্ধেক দিয়া তাহাকে জীবিত করিয়াছিলেন। মহর্ষি শুনক বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, তপোনিরত, ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা নৈমিষারণ্যস্থ কুলপতি শৌনক এই শুনকের প্রপৌত্র।

রেণুকা—পরশুরামের জননী। (কামলী দেখ)

রেবত—রোহিণীনন্দন বলরামের শ্বশুর। ইনি একজন রাজা। কুশস্থলীনামক নগরী ইঁহার রাজধানী। ইঁহার কন্যা রেবতী অনুপম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। কন্যা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে ইনি তাঁহার বিবাহের জন্য উপযুক্ত বর অনুসন্ধান করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত পাত্র না পাওয়াতে তিনি স্বর্গে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মার উপদেশানুসারে তিনি পৃথিবীতে আগমন করিয়া বলরামের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। (হরিবংশ)।

রেবতী—কুশস্থলীর রাজা রেবতের কন্যা। (রেবত দেখ)। রেবতীর গর্ভে বলরামের নিশঠ ও উল্মুক নামে দুই পুত্র জন্মে। যদুবংশ ধ্বংসের পর বলরাম দেহত্যাগ করিলে রেবতী সহমৃতা হন। সহমরণ প্রথা রামায়ণের সময় দৃষ্ট হয় না, কিন্তু মহাভারতে স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামের জননী সাধ্বী কৌশল্যা মৃতপতির সহিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন নাই, কিন্তু পাণ্ডুর চিতায় পতিপরায়ণা মাদ্রী আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রেবতীও পতির অনুগমন করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন।

রোমপাদ (বা লোমপাদ)—অঙ্গদেশের অধিপতি। (ঋষ্যশৃঙ্গ দেখ)।

রোহিণী—(১) দক্ষকন্যা ও চন্দ্রের পত্নী। (২) বসুদেবের পত্নী ও বলরামের মাতা। ইনি কংসভয়ে বলরামকে লইয়া গোকুলে বসুদেবের সখা নন্দঘোষের গৃহে বাস করেন। যদুবংশধ্বংস হইলে পর বসুদেব দেহত্যাগ করেন এবং রোহিণী পতির চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করেন।

ল

লক্ষ্মণ—অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র ও শ্রীরামচন্দ্রের বৈমাত্রের ভ্রাতা। লক্ষ্মণ সুমিত্রা রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামের সহিত বনগমন করিয়া দুঃসহ বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি সরযূতে দেহবিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করেন। (দশরথ ও রাম দেখ।)

লক্ষ্মণা—দুর্য্যোধনের কন্যা। ইঁহার বিবাহের জন্য দুর্য্যোধন স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেন। স্বয়ংবর সভা হইতে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ইহাকে হরণ করেন, কিন্তু শাম্ব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কৌরবগণের হস্তে বন্দী হন। অবশেষে বলরাম ইঁহাকে মুক্ত করেন। অতঃপর শাম্বের সহিত লক্ষ্মণার যথাশাস্ত্র পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

লক্ষ্মী—সৃষ্টির পূর্ব্বে রাসমণ্ডলস্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মী দেবী উৎপন্না হন। এই দেবী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না; ইঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব বিশাল। ইনি স্থির-যৌবনা; ইঁহাকে দেখিলে দ্বাদশবর্ষীয়া বলিয়া বোধ হয়। এই দেবী উৎপন্ন হইয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুইরূপে বিভক্ত হইলেন। এই দুই মূর্ত্তি বয়সে, আকারে, ভূষণে, প্রভায়, স্বরমাধুর্য্যে ঠিক সমান। এক মূর্ত্তির নাম লক্ষ্মী ও অপর মূর্ত্তির নাম রাধিকা। লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাধিকা ভগবানের দক্ষিণাংশ জাতা। শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মূর্ত্তির অভিলাষ পূর্ণ করিতে দক্ষিণাংশজ দ্বিভুজমূর্ত্তি রাধিকাকে এবং বামাংশজ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকান্ত এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপগোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকেই রহিলেন; কিন্তু চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য। লক্ষ্মী অপরাপর দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হইলেন। বৈকুণ্ঠধামই তাঁহার আবাসস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। এই দেবী স্বর্গে ইন্দ্রের সম্পত্তিরূপিণী স্বর্গলক্ষ্মী রূপে, পাতালে ও মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, গোগণের প্রসূতি সুরভিরূপে, ক্ষীরোদ সাগরের কন্যারূপে, পদ্মিনীতে শ্রীরূপে এবং চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলে, বিভূষণে, রত্নে, ফলে, নৃপপত্নীতে, সমস্ত শস্যে, বস্ত্রে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, হীরকে, চন্দনে, নূতন মেঘে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। লক্ষ্মীদেবীই একমাত্র শোভার আধার; যেখানে লক্ষ্মী বর্ত্তমান নাই, সেই স্থান শোভাশূন্য হইয়া পড়ে।

একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠ হইতে কৈলাসশিখরে গমন করিতেছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন; দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে এক পারিজাত পুষ্পের মালা উপহার দিলেন। ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমত্ততা হেতু উক্তমালা স্বীয় হস্তী ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন করেন; হস্তী ঐ মালা ভূমিতলে নিক্ষেপ করে। ইহা দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত ইন্দ্রকে শাপ দিলেন, "তোমার রাজ্য অচিরে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হউক, আমি আরও বলিতেছি, ঐ পুষ্প যাহার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহারই সর্ব্বাগ্রে পূজা হইবে, এজন্য শিবের শিশুসন্তানের মস্তকচ্ছিন্ন হইলে ঐ হস্তীর মস্তক তাহাতে যোজিত হইবে।" মহর্ষির শাপে স্বর্গ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইল। স্বর্গ লক্ষ্মী রুষ্টা হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্ব্বক মহালক্ষ্মীতে লীনা হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লইলেন; ব্রহ্মা, দেবেন্দ্র ও দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীনারায়ণবিরাজিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট দুর্ব্বাসার শাপজনিত দুর্দ্দশার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে পুনর্ব্বার লক্ষ্মী প্রদানের আশা দিয়া বলিলেন, "হে দেবগণ, তোমরা ভীত হইও না, তোমাদিগকে ঐশ্বর্য্যশালিনী শ্রী পুনর্ব্বার দান করিব।" এই বলিয়া কোন্ কোন্ স্থানে লক্ষ্মী, অবস্থান করেন এবং কোথায় করেন না তৎসম্বন্ধে দেবতাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "যে স্থানে শঙ্খাদির বাদ্য, তুলসী পত্রদ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা এবং ভূদেব ব্রাহ্মণগণের ভোজন না হয়, সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী অবস্থান করেন না। যে স্থানে আমার ভক্তগণের কিম্বা আমার নিন্দা হয়, লক্ষ্মীদেবী পরমক্রোধে সেই স্থান ত্যাগ করেন। যে মূর্খ আমার প্রতি অভক্তিপূর্ব্বক হরিবাসর একাদশী তিথিতে এবং আমার জন্মদিনে ভোজন করে, তাহার গৃহ হইতে মহালক্ষ্মী পলায়ন করেন। যে ব্যক্তি পণগ্রহণপূর্ব্বক আমার নাম বিক্রয় করে, পণগ্রহণ করিয়া কন্যাবিক্রয় করে এবং যথাসময়ে উপস্থিত অতিথিকে যথাসাধ্য সম্মান না করে, আমার প্রিয়তমা তাহার গৃহত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া দরিদ্রতাপ্রযুক্ত শূদ্রশব দাহন করে, কমলালয়া ক্রোধপূর্ব্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ হইয়া যে শূদ্রগণের সূপকার কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং হলচালনা করে, তাহার জলপানভয়েই লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া যবনের সেবা করে, কিম্বা দেবমূর্ত্তির পূজাদি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে অথবা শূদ্রগণের পৌরোহিত্য কার্য্য করে, তাহার জলস্পর্শভয়েই লক্ষ্মী তাহার গৃহত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ বিশ্বাসঘাতক, মিত্রদ্রুহ, নরঘাতী, কৃতঘ্ন বা অগম্যা-গমনকারী লক্ষ্মী তাহার গৃহত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ ব্রত উপবাস সন্ধ্যাদিবিহিত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুচি অবস্থায় অবস্থান করে এবং

হরিভক্তি বিহীন হয়, লক্ষ্মী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে স্থানে শঙ্খধ্বনি, তুলসীদ্বারা শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা হয় তথায় লক্ষ্মী বাস করেন। যেস্থানে শিবলিঙ্গের পূজা, শুভকর শিবনাম কীর্ত্তন, দুর্গার আরাধনা এবং গুণগান হয় সেইস্থানে লক্ষ্মী বাস করেন।" শ্রীকৃষ্ণ দেবগণকে এই কথা বলিয়া নিজপ্রিয়া লক্ষ্মীকে এক অংশে ক্ষীরোদসাগরে জন্ম গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং ব্রহ্মাকে ক্ষীরোদার্ণব মন্থনপূর্ব্বক লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়া দেবগণকে প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। দেবগণ দীর্ঘকালে ক্ষীরোদার্ণবতীরে উপস্থীত হইলেন এবং মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড, কূর্ম্মদেবকে পাত্র এবং অনন্ত নাগকে মন্থনরজ্জু করিয়া সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। এই মন্থনের ফলে সমুদ্রহইতে ধন্বন্তরি, সুধা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, সুদর্শন চক্র এবং ক্ষীরোদাত্মজা লক্ষ্মীর উদ্ভব হইল। লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত এবং পূজিত হইয়া ব্রহ্মশাপ মোচনের জন্য দেবগণের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলেন। লক্ষ্মী অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবগণের প্রতি বর প্রদান করিলে, তাঁহারা নিজ লক্ষ্মী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। (ব্রহ্মবৈঃ পুঃ—প্রকৃতি খণ্ড)।

লব—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পুত্র। রামচন্দ্র ইঁহাকে উত্তরকোশলের অন্তর্গত শ্রাবস্তী (শরাবতী) নগরীতে স্থাপনপূর্ব্বক সেই স্থানের অধিপতি নিযুক্ত করেন। (ইতিহাস)

•লবণ—মধু রাক্ষসের পুত্র। এই রাক্ষস রাবণের মাতৃস্বসা কুম্ভীনসীর গর্ভজাত। (কুম্ভীনসী দেখ)। পিতৃদত্ত শূলপ্রভাবে এই অসুর দেবনরের অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত রাজা মান্ধাতা সসৈন্যে ইহার হস্তে নিহত হন। মুনিগণ ইহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র ঋষিগণের লবণভীতি-প্রশমনার্থ শত্রুঘ্নকে তাঁহাদের সহিত প্রেরণ করেন। বীরবর শত্রুঘ্ন ঋষিগণের পরামর্শে শূলহীন অবস্থায় লবণাসুরকে আক্রমণ করিয়া বধ করেন। (রামায়ণ)

লোমশ—বিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি। একদা এই ব্রহ্মর্ষি দেবরাজসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অর্জ্জুন বাসবের অর্দ্ধাসনে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া লোমশ মনে মনে চিন্তা করিলেন, "অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে ইন্দ্রাসনে উপবেশন করিয়াছেন," তাঁহার মনের ভাব জ্ঞাত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন "ব্রহ্মর্ষে! যে প্রশ্ন আপনার মনে উদিত হইয়াছে, তাহার উত্তর শ্রবণ করুন। এই কৌন্তেয় কেবল মানব নহেন, ইঁহাতে দেবত্বও আছে। আমার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছে। এখানে কোন কারণ বশতঃ অস্ত্রলাভের আশায় আসিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি এই পুরাতন ঋষিকে জানেন না! হৃষীকেশ ও ধনঞ্জয় এই পুরাতন ঋষিদ্বয় ত্রিলোকে নর নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত; ইঁহারা কার্য্যবশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বদরী নামক আশ্রমপদ এই বিষ্ণু ও জিষ্ণুর নিবাস স্থান। ইঁহারা পৃথিবীর ভার অপনীত করিবেন।" ইন্দ্র এই বলিয়া লোমশমুনিকে কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতে বলিলেন। যুধিষ্ঠির যেন অর্জ্জুনের জন্য ব্যাকুল না হন ইহা তাঁহাকে বলিবার জন্য ইন্দ্র মুনিবরকে কাম্যকবনে প্রেরণ করেন। দেবরাজের আজ্ঞানুসারে দেবর্ষি লোমশ কাম্যকবনে গমন করিয়া ইন্দ্রের নির্দেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন।

(মহাভা-বন ৪০ অ ও ১৭৬ অ)।

লোপা (লোপামুদ্রা)—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী। (অগস্ত্য দেখ)।

লোমহর্ষণ—বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি; ইঁহার পিতার নাম সূত। সূত, ভগবান বেদব্যাসের শিষ্য। ব্যাসদেব পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়া সূতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কল্কিপুরাণে লিখিত আছে যে, বলরামকর্ত্তৃক ইনি হত হইয়াছিলেন।

"তথাক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ॥
বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষ্যেভূৎস্ববাঞ্ছয়া॥"

(কল্কিপুঃ ২৭ অ)

———

শ

শকুনি—গান্ধার রাজ সুবলের পুত্র ও দুর্য্যোধনের মাতুল। (যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন দেখ)।

শকুন্তলা—পৌরববংশীয় বিখ্যাত রাজা দুষ্মন্তের (দুষ্যন্ত) মহিষী। ইনি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মমাত্র মেনকা ইহাকে মালিনী নদীর তীরে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। মহর্ষি কণ্ব ইহাকে প্রতিপালন করেন। মহাকবি কালিদাস ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তল" রচনা করেন। (দুষ্মন্ত ও কণ্ব দেখ)

শক্তি—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র। (পরাশর দেখ)

শঙ্কু—ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞানবলে দেহ হইতে ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত বেদবেদাঙ্গবিৎ তপস্যানিরত পুত্রগণের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের নাম :—অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রতু, বশিষ্ঠ, বোঢ়ু, কপিল, আসুরি, কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ ও প্রচেতা।

শঙ্খ—ব্রহ্মার পুত্র (শঙ্কু দেখ)। যে কয় জন মুনি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তন্মধ্যে ইনি অন্যতম।

শঙ্খচূড়—অসুর বিশেষ। এই অসুর মহাদেবের হস্তে নিহত হয়। ইহার পত্নীর নাম তুলসী। (তুলসী দেখ)।

শচী—দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী। ইনি দানবপতি পুলোমার কন্যা। (মহাভারত)।

শতানন্দ—মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি অহল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যখন রামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গের নিমিত্ত মিথিলাপতি সীরধ্বজ জনকের ভবনে উপস্থিত হন, তখন শতানন্দ বিদেহরাজের পুরোহিত ছিলেন।
(রামা-আদি-৪৯-৫১ সর্গ)

শতানীক—(১) মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের কনিষ্ঠভ্রাতা। (মহাভা—বিরাট)।
(২) চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের পুত্র। ইনি দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতযুদ্ধের শেষ দিবস রাত্রিতে অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে হত্যা করেন।

শত্রুঘ্ন—অযোধ্যাপতি দশরথের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। সুমিত্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি লক্ষ্মণের সহোদর ও রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইনি কুশধ্বজ জনকের কন্যা শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করেন। শত্রুঘ্ন মধুরাক্ষসের পুত্র লবণকে শূলহীন অবস্থায় আক্রমণপূর্ব্বক বধ করেন এবং মধুবন ধ্বংস করিয়া তথায় মথুরা বা মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করেন। নবনির্ম্মিতপুরীতে পুত্রদ্বয়কে স্থাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন এবং রামের সহিত সরযূতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন।

শনি—(শনৈশ্চর)—সূর্য্যের তনয়। সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম। (ছায়া দেখ)। ইঁহার দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডচ্ছিন্ন হয়। (গণেশ দেখ)।

শবরী—তপস্বিনী। রাম সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। ইনি সযত্নে রামের পরিচর্য্যা করেন এবং তাঁহারই অনুমতি লইয়া যজ্ঞাগ্নিতে দেহবিসর্জ্জন করেন। (রাম দেখ)

শমীক—এক ক্ষমাশীল তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ঋষি। মহারাজ পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া শরবিদ্ধ এক মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে এই ঋষির নিকট উপস্থিত হন এবং ইঁহাকে পলায়িত মৃগসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। মৌনাবলম্বী ঋষি প্রশ্নের কোন উত্তর না দেওয়াতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া এক মৃত সর্প ইঁহার গলে অর্পণ করেন। এইরূপ অবমানিত হইয়াও ক্ষমাশীল ঋষি রাজাকে কিছু বলিলেন না। এই সময়ে শমীকের পুত্র শৃঙ্গী সমবয়স্ক বালকদিগের নিকট তাঁহার পিতার দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন। শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন, "যে আমার পিতার গলে মৃতসর্প দিয়াছে, আজ হইতে ৭ম দিনে সে সর্পরাজ তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করিবে।" শমীক এই শাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে

ভর্ৎসনা করিলেন এবং নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন; কিন্তু পুত্র কিছুতেই শাপ প্রত্যাহার করিলেন না। শমীক পুত্রের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে এই দুঃসংবাদ দিলেন এবং তক্ষকের দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাকে উপদেশ দিলেন এবং সতর্ক থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; নির্দ্দিষ্টদিনে তক্ষকের দংশনে রাজা পরীক্ষিৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। (পরীক্ষৎ ও কাশ্যপ দেখ)।

শম্বর—অসুর বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের হস্তে ইঁহার নিধন হয়। (প্রদ্যুম্ন দেখ)

শম্বুক—ত্রেতাযুগের শূদ্র জাতীয় তাপস বিশেষ। শূদ্রের তপস্যার অধিকার নাই, এজন্য এই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করাতে রামের রাজত্ব সময়ে এক ব্রাহ্মণতনয় অকালে কালকবলে পতিত হয়। এই অকাল মৃত্যুর কারণ নিরাকরণার্থ রাম রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া এই তপশ্চরণশীল শম্বুকের দেখা পান এবং খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। (রামা ও রঘু ১৫শ স)।

শরভঙ্গ—যে সমস্ত আর্য্যঋষি অরণ্যানী পরিবৃত দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ইনি অন্যতম। (রামায়ণ)

শর্ম্মিষ্ঠা—দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা। (দেবযানী ও যযাতি দেখ)।

শর্য্যাতি—নৃপবিশেষ। ইঁহার কন্যা সুকন্যাকে মহর্ষি চ্যবন বিবাহ করেন।

শল্য—মদ্ররাজ। ইঁহার ভাগিনী মাদ্রী পাণ্ডুর পত্নী। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর কালে ইনি ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের ১৫শ ও ১৭শ দিবসে ইনি মহাবীর কর্ণের সারথ্য করিয়াছিলেন। কর্ণের মৃত্যুর পর যুদ্ধের ১৮শ দিবসে ইনি সেনাপতি হন এবং যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন। (মহাভারত)।

শাণ্ডিল্য—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

শান্তনু—ভারতযুদ্ধের বিখ্যাত মহাবীর ভীষ্মের পিতা। শান্তনুর পিতার নাম প্রতীপ। গঙ্গাদেবী শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহার গর্ভে শান্তনুর ভীষ্মনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে (বসু দেখ)। শান্তনু, বসুরাজের কন্যা সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বসুরাজ বৃদ্ধ শান্তনুকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তবে যদি শান্তনু প্রতিজ্ঞা করেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র রাজসিংহাসন পাইবে, তাহা হইলে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। বৃদ্ধ শান্তনু এই কথা শুনিয়া একটু দোলায়মানচিত্ত হইলেন, কিন্তু ভীষ্ম ইহা অবগত হইয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পিতাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। নিজে বিবাহ করিবেন না এবং রাজত্ব গ্রহণ করিবেন না এতৎ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। ভীষ্ম জীবনে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হন নাই। সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করেন।

শান্তা—অযোধ্যাপতি দশরথের কন্যা ও মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী। দশরথ শান্তাকে স্বীয় সখা অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদের নিকট পোষ্যপুত্রিকারূপে অর্পণ করেন। (ঋষ্যশৃঙ্গ দেখ)।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি জাম্ববতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করেন। (লক্ষ্মণা দেখ)।

শাল্ব—প্রবল প্রতাপ নরপতিবিশেষ। কাশীরাজের কন্যাত্রয় হরণকালে ভীষ্মের সহিত ইঁহার যুদ্ধ হয়। ভীষ্ম ইহাকে পরাজিত করিয়া কন্যাত্রয় হরণ করেন। কন্যাত্রয়মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অম্বা শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম অম্বাকে পরিত্যাগ করিলেন। অম্বা শাল্বরাজের নিকট গেলেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন। (কাশীরাজ ও শিখণ্ডী দেখ)।

শিখণ্ডী—দ্রুপদরাজের নপুংসকভাবাপন্ন পুত্র। এই ক্লীবরূপী শিখণ্ডীকে রথাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া অর্জ্জুন ভারত যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের বধ সাধন করেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি কোন স্ত্রীর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ

করিবেন না। মহারথ ভীষ্মের বধসাধনের জন্য অর্জ্জুন এই স্ত্রীভাবাপন্ন দ্রুপদ তনয়ের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কূটনীতি অবলম্বন না করিলে ভীষ্মের পরাজয় অসম্ভব হইত।

শিখণ্ডী পূর্ব্বজন্মে অম্বানামে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। অম্বা শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মকর্ত্তৃক স্বয়ংবর সভা হইতে অপহৃত হওয়াতে শাল্বরাজ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। (কাশীরাজ দেখ)। অম্বা শাল্বরাজকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রতিহিংসায় দগ্ধ হৃদয়ে গভীর অরণ্যে তপস্যার্থ গমন করেন। তথায় মুনিগণের পরামর্শে কঠোর তপস্যা করেন এবং অবশেষে ইষ্টদেবতার নিকট হইতে এই বর লাভ করিলেন যে, তিনি জন্মান্তরে ভীষ্মকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। বরলাভের পর তিনি দেহত্যাগ করিয়া দ্রুপদগৃহে শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

দ্রুপদ এই নপুংসকভাবাপন্ন পুত্রকে দশার্ণদেশের রাজকন্যার সহিত বিবাহিত করেন। বিবাহের পরে শিখণ্ডীর ক্লীবভাব প্রকাশ পাওয়াতে তিনি লজ্জায় বনে প্রবেশ করেন। তথায় কুবেরের এক অনুচরের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার নিকট আত্মবৃত্তান্ত প্রকটিত করেন। কুবেরানুচর অনুকম্পাপুরঃসর শিখণ্ডীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্বীয় পুরুষত্ব শিখণ্ডীকে প্রদান করিয়া তদীয় স্ত্রীত্ব নিজে গ্রহণ করিলেন। শিখণ্ডী হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কাল অতিবাহিত করিলেন।

ভারতযুদ্ধের শেষ দিবস পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামাকৃত নৈশ হত্যাকাণ্ডে শিখণ্ডী অশ্বত্থামার হস্তে হত হন।

(মহাভারত)।

শিনি—যদুবংশীয় বিখ্যাত বীরপুরুষ। ইনি বসুদেবের সহিত বিবাহ দিবার জন্য দেবকের কন্যা দেবকীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। এই উপলক্ষে সোমদত্তের সহিত শিনির যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে সোমদত্ত পরাজিত হন। ইঁহার পুত্র সত্যক ও পৌত্র মহাবীর সাত্যকি।

শিব—হিন্দুর দেবতাগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অতি উচ্চ আসন। ইঁহার এক পত্নী সতী ও অপরা গঙ্গা। সতী পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পর্ব্বতরাজ-কন্যা পার্ব্বতী (উমা) শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করেন। ইহার এক পুত্র কার্ত্তিকেয় ও অপর পুত্র গণেশ। (পার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ দেখ)।

মহাদেব কিজন্য লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ৭০ অধ্যায়ে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—

দেবাদিদেব মহাদেব ভার্য্যার সহিত এই বিগর্হিতরূপ কেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহারাজ দিলীপ মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে, পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মন্দরপর্ব্বতে ঋষিগণ এক দীর্ঘ সত্রের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে সকল মুনি সমাগত হইলে মুনিগণ পরস্পর আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-দিগের কোন্ দেবতা পূজ্য। তখন ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "আমাদের এই সংশয়চ্ছেদ করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তাঁহাদিগকে অবলোকন ও প্রণাম করিলে যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তিনিই আমাদের পূজনীয় হইবেন।" তখন ঋষিগণ সমবেত হইয়া প্রথমে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ঋষিগণ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ। নন্দি দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছেন। তখন ঋষিগণ নন্দিকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র গিয়া মহাদেবকে আমাদের আগমন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কর; আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।" নন্দী তখন পরুষবাক্যে অবজ্ঞার সহিত অমিততেজা ঋষিদিগকে কহিলেন, "তোমাদের যদি জীবনের ভয় থাকে, তাহা হইলে এখনই প্রস্থান কর, দেবাদিদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।" নন্দী এই কথা বলিলে, ঋষিগণ বহু দিন তথায় অবস্থান করিলেন, তথাপি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইল না। তখন প্রবল তপোদৃপ্ত মহর্ষি ভৃগু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে

নিম্নোক্তরূপ শাপ প্রদান করিলেন, "হে শঙ্কর! তুমি নারীসঙ্গমে প্রমত্ত হইয়া আমাদিগকে অবমাননা করিয়াছ, এজন্য তোমার মূর্ত্তি যোনিলিঙ্গস্বরূপ হইবে। তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, এইজন্য তোমাতে নিবেদিত জল, অন্ন, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি সকলই অগ্রাহ্য হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ তোমার পূজা করিবেন না; যদি পূজা করেন, তাহা হইলে অব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইবেন।" ভৃগু এইরূপ শাপ দিয়া মুনিদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

লিঙ্গপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেবর্ষি নারদ রুদ্রদেবের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সমূহ সন্দর্শন করিয়া তত্তৎ স্থানে লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলেন। (লিঙ্গপু—১।১২)। ঐ লিঙ্গ কি এবং কেনই বা তাহা সংসারে সকলের পূজ্য হইয়াছে তাহা সূতের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। (লিঙ্গপু—পূর্ব্বখ-১। ১৮-২৩ দেখ)। এই লিঙ্গ সাধারণতঃ দুই প্রকার। নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ শিব অলিঙ্গ এবং জগৎকারণস্বরূপ শিবই লিঙ্গ। এই অলিঙ্গ শিব হইতে লিঙ্গ শিবের উৎপত্তি; তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, জন্মরহিত, মহাভূতস্বরূপ, বিশ্বরূপ ও জগৎকারণ। (লিঙ্গপু ৩।১)

শক্তি বিনা শিব পূজা করিতে নাই। একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজায় শিব ও শক্তি উভয়েরই পূজা বলিয়া পুরাণে ও তন্ত্রে তৎপূজাবিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তন্ত্র শিবোক্ত শাস্ত্র। এই শাস্ত্র পার্ব্বতীর প্রতি কথাচ্ছলে মহাদেবের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত:—আগম, যামল ও তন্ত্র। যামলাদি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র পৃথিবীতে ফলদায়ক। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন:—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতি প্রিয়ে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তঃ পুরা শিবে।
আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥

অনুবাদ:—প্রিয়ে, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। শিবে, আমি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে, কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন।

এই তন্ত্রের অন্যত্র বলা হইয়াছে:—

"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

অনুবাদ:—কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য মার্গে গমন করে, সত্য সত্যই বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই তাহার সদগতি হয় না।

এই তন্ত্রের অপর একস্থলে লিখিত হইয়াছে:—

"নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগাইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকাইব॥
কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥"

অনুবাদ:—এখন বৈদিক মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে।

শিবি—রাজা উশীনরের পুত্র ও মহারাজ যযাতির দৌহিত্র। (গালব ও অষ্টক দেখ)।

শিশুপাল—চেদি দেশের রাজা। ইনি চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষস্থতনয়। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম দন্তবক্র। (জয় দেখ)। শিশুপালের জননী সুপ্রভা অবগত হইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইবে ; এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার পুত্রের একশত অপরাধ যেন ক্ষমা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষসার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বহুবার শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করায় তিনি শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। (রুক্মিণী দেখ)।

শুকদেব—বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পুত্র। একদা বেদব্যাস হোমের নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অভিপ্রায়ে দুইখানা অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) ঘর্ষণ করিতেছিলেন ; এমন সময়ে ঘৃতাচীনাম্নী এক অপ্সরা তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। মহর্ষি ব্যাস ধৈর্য্যসহকারে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দমনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়ের বেগ বশতঃ তাঁহার বীর্য্য অরণি মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অপ্সরা ঘৃতাচী ব্যাসদেবকে তদবস্থ দেখিয়া ভীতচিত্তে শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। ব্যাসদেব পূর্ব্ববৎ অরণি মন্থন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শুকদেব স্বকীয় তেজে বহির্গত হইলেন। পুত্রের জন্মসময়ে ব্যাস শুকরূপিণী অপ্সরাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম শুকদেব রাখিলেন। মহাদেব স্বয়ং শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করেন ; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কমণ্ডলু ও দেবাসন প্রদান করেন। শুকদেব সেই স্থানেই সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ শুকদেব পিতার নিকট মোক্ষধর্ম্ম অধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন। কিছুদিন পরে ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন যে, যদি মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার কিছু সন্দেহ থাকে, তবে তিনি যেন তাঁহার যজমান মিথিলাধিপ জনকের নিকট গমনপূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আইসেন। পিতার আদেশানুসারে শুকদেব মিথিলায় জনকের নিকট গমন করিয়া মোক্ষধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি হিমালয় প্রদেশে ব্যাসাশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও দেবর্ষিগণের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে আলাপে শুকদেব বহুবর্ষ অতিবাহিত করেন। অনন্তর ব্যাসদেব পুত্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য আদেশ করেন। অতঃপর শুকদেব সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর দেহ বিসর্জন করিয়া আত্মাকে পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাপুরুষের দেহত্যাগ-সময়ে উল্কাপাত, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্লক্ষণ জগতের অশুভ সূচনা করিয়াছিল। (মহাভা-শান্তি)।

শুক্রাচার্য্য—দৈত্যগুরু। ইনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। ইঁহার কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা (দেবযানী দেখ)। ষণ্ড ও অমর্ক নামে ইঁহার দুই পুত্র জন্মে। (প্রহ্লাদ দেখ)। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ ইঁহার নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন। (কচ দেখ)।

শুনঃশেফ—মহর্ষি ঋচীকের মধ্যমপুত্র। ইনি মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বলিদানার্থ নীত হইতেছিলেন ; পথিমধ্যে ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হন। বিশ্বামিত্র করুণাপরবশ হইয়া ইঁহাকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দেন। ইঁহার স্তবে অগ্নিদেব প্রীত হন এবং ইনি অক্ষতদেহে যজ্ঞাগ্নি হইতে বহির্গত হইয়া আসেন। পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করেন। (বিশ্বামিত্র দেখ)।

শুম্ভ—দানবরাজ। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিশুম্ভ। চণ্ডীর হস্তে এই উভয় ভ্রাতা নিহত হন। (চণ্ডী দেখ)।

শুষেণ (সুষেণ)—বানররাজ। কপিপতি বালি ইঁহার কন্যা তারাকে বিবাহ করেন। শুষেণের পরামর্শে হনুমান বিশল্যকরণী আনয়ন করেন এবং এই ঔষধের প্রয়োগে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ হয়।

শূর (শূরসেন)—শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ ও বসুদেবের পিতা। (কুন্তি-ভোজ দেখ)।

শূর্পণখা—লঙ্কেশ্বর রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনিই লঙ্কাযুদ্ধের মূল কারণ। (কুবের ও রাম দেখ)।

শৈব্যা—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মবুদ্ধি, আত্মত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা পরীক্ষার্থ ইঁহাদিগকে নানা কষ্টে পাতিত করেন। মহিষী শৈব্যা এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রীত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায়

তাঁহার এক মাত্র পুত্র রোহিতাশ্ব প্রাণত্যাগ করেন। মৃতপুত্রের শব শ্মশানক্ষেত্রে রাখিয়া শৈব্যা আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে থাকেন। এই শ্মশানে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ডোমের কার্য্য করিতেছিলেন। অনতিবিলম্বে পতিপত্নীর মিলন হইল। বিশ্বামিত্র ইঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। রোহিতাশ্ব পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। ইঁহারা পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

শৌনক—এক তপোবলসম্পন্ন ঋষি। ইনি নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। (রুরু দেখ)।

শ্রুতকীর্ত্তি—শত্রুঘ্নের পত্নী ও সাঙ্কাস্যার রাজা কুশধ্বজ জনকের তনয়া। ইঁহার দুই পুত্র—সুবাহু ও শত্রুঘাতী। (শত্রুঘ্ন দেখ)।

শ্বেতকি—ধর্ম্মপরায়ণ ও যাগশীল নৃপতি। ইনি শতবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। শিবাংশজাত মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। অগ্নিদেব এই যজ্ঞে অপরিমিত হবির্ভক্ষণ করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার শরণাগত হইলে তিনি রোগশান্তির জন্য অগ্নিকে খাণ্ডববন ভক্ষণ করিতে পরামর্শ দেন। অগ্নি সাত বার খাণ্ডব দগ্ধ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হন, কারণ বনস্থিত বড় বড় জন্তু জল বহন করিয়া আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলে। অনন্তর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন ভক্ষণ করিতে সমর্থ হন। (অর্জ্জুন দেখ)।

শ্বেতকেতু—মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র। (উদ্দালক দেখ)।

ষ

ষণ্ড—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র। (প্রহ্লাদ দেখ)।

স

সংজ্ঞা—সূর্য্যের পত্নী ও বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। (ছায়া দেখ)।

সগর—সূর্য্যবংশীয় নরপতি বিশেষ। সগর অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন; তিনি ধর্ম্মাত্মা ও প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তিনি বিদর্ভ-রাজকন্যা কেশিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম সুমতি; এই দুই পত্নীসহ সগর হিমালয় পর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করেন। সগরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভৃগু তাহাকে বর দেন, "তোমার এক পত্নীর গর্ভে বংশকর পুত্র হইবে এবং অপর পত্নীর গর্ভে মহাবল ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" প্রথমা পত্নী কেশিনীর প্রার্থনাতে তাঁহার গর্ভে অসমঞ্জ নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র পুরোবাসীদিগকে অত্যন্ত পীড়া দেওয়াতে, সগর তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অসমঞ্জের পুত্রের নাম অংশুমান্ (অংশুমান্ দেখ)। সগরের দ্বিতীয়া পত্নী সুমতি তুম্বক ফলাকার এক মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। এই মাংসপিণ্ড ঘৃতকুম্ভের মধ্যে রাখিয়া দিলে পর তাহা হইতে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়।

একদা সগর এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র রাক্ষস-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র অশ্বান্বেষণে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পাতালে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহাদের যজ্ঞীয় অশ্বটীকে এক তপোমগ্ন মুনির পার্শ্বে দেখিতে পান। মুনি আর কেহ নহেন, ইনি সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিল। কপিলকে অশ্বাপহারক মনে করিয়া সগরসন্তানগণ তাঁহার অত্যন্ত অবমাননা করেন। মুনি ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি অভিশাপ দ্বারা সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্রকে ভস্মে পরিণত করিলেন। পুত্রদিগের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সগর স্বীয় পৌত্র অংশুমানকে তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করেন। অংশুমান্ পাতালে যাইয়া মুনির সন্দর্শন পান এবং নানাপ্রকার অনুনয়ে তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করেন। কপিল অংশুমানকে অশ্ব লইয়া যাইতে অনুমতি করেন; এখানে তিনি পক্ষিরাজ গরুড়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিরূপে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে অংশুমানকে

গরুড় উপদেশ দান করেন। অশ্বসহ অংশুমান অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সগর অশ্বমেধ সমাপন করিয়া ৩০০০০ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। এই বংশে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া গঙ্গাকে পাতালে আনয়নপূর্ব্বক পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন করেন।

সঞ্জয়—গবল্গণ নামক মুনির পুত্র। ইনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শদাতা ছিলেন; ইনি ব্যাসদেবের বরে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণন করেন। ভারতযুদ্ধের অবসানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সহিত, যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে, হস্তিনাপুরে বাস করেন এবং পরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর সহিত বনগমন করেন। কিয়ৎকাল বনবাসের পর একদিন বনে প্রবল দাবানল জ্বলিয়া উঠে। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী এই দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; সঞ্জয় পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন। অনন্তর তিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

সত্যবতী—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জননী ও বসুরাজের কন্যা।

(পরাশর, বসু, শান্তনু, ভীষ্ম ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখ)।

সত্যবান্—শাল্বদেশের রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম শৈব্যা। দৈবদুর্ব্বিপাকে দ্যুমৎসেন অন্ধ হইয়া পড়েন এবং কূটচক্রী মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত হইয়া পত্নী ও শিশুপুত্র সত্যবানের সহিত অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা মদ্রদেশাধিপতি স্বীয় কন্যা সাবিত্রীসহ এই বনে আগমন করেন। এখানে রূপযৌবনসম্পন্না সাবিত্রী মাতাপিতৃভক্ত সত্যবানের গুণে ও ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। সত্যবান্ অল্পায়ু ছিলেন; অচিরেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। পতিপরায়ণা সাবিত্রী যমরাজকে পাতিব্রত্যে বিমোহিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটী বর গ্রহণ করেন। বরগুলির প্রভাবে স্বামী সত্যবান্ পুনর্জ্জীবন লাভ করেন, শ্বশুর দ্যুমৎসেন চক্ষু ও রাজ্য লাভ করেন। অনন্তর দ্যুমৎসেন যথাকালে সত্যবানের উপর রাজ্যভার দিয়া পত্নীসহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। (দ্যুমৎসেন দেখ)।

সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ও সত্রাজিতের কন্যা। (কৃষ্ণ দেখ)।

সত্রাজিৎ—শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর ও সত্যভামার জনক। (অক্রূর দেখ)।

সনৎকুমার—ব্রহ্মজ্ঞ মহাতপা ঋষি। ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র।

সনাতন—ব্রহ্মার মানস পুত্র। (জয় দেখ)।

সম্পাতি—অরুণের পুত্র ও জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই দুই ভ্রাতা সূর্য্যকে জয় করিবার জন্য তৎপ্রতি ধাবিত হন। সূর্য্যের প্রখর তেজে জটায়ুর পক্ষ দগ্ধপ্রায় হইলে সম্পাতি তাহাকে স্বীয় পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে গিয়া সম্পাতি নিজেই সূর্য্যকিরণে দগ্ধপ্রায় হন। তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে পতিত হন। চৈতন্যলাভ হইলে তিনি নিশাকর মুনির উপদেশে এই পর্ব্বতেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। সীতান্বেষণকারী বানরদিগকে সীতাপহারক রাবণের বৃত্তান্ত বলিয়া দেওয়াতে তাঁহার পক্ষোদ্গম হয়। (রামায়ণ)।

সম্বরণ—চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত নৃপতি। ইনি সূর্য্যতনয়া তপতীকে বিবাহ করেন। তপতীর গর্ভে ইঁহার পুরু নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। (মহাভারত)

সম্বর্ত্ত—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র ও দেবগুরু বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞে পৌরোহিত করিয়াছিলেন। (মহাভারত)

সরমা—রামায়ণপ্রসিদ্ধ বিভীষণের পত্নী। পতিব্রতা ও ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্না বলিয়া ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী। দুরন্ত চেড়ী-পরিবৃতা অশোকবনস্থিতা সীতার সরমাই একমাত্র হিতৈষিণী ছিলেন। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ শৈলষুর কন্যা। রাবণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে স্থাপন করেন। সরমা রাজপত্নী হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। (রামায়ণ)

সরস্বতী—ধর্ম্মের মুখ হইতে এই দেবীর উৎপত্তি হয়। ইনি শুক্লবর্ণা, বীণা-পুস্তকধারিণী, শরৎপঙ্কজলোচনা বাগধিষ্ঠাত্রী।

সর্ব্বকর্ম্মা—অযোধ্যাপতি সৌদাসের (কল্মাষপাদ) ক্ষেত্রজ পুত্র।

* **সহদেব** (১) পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। মাদ্রীর গর্ভে ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ইঁহার জন্ম। দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসেন নামে ইঁহার এক পুত্র জন্মে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সহদেব দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী ভূপালগণের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিরাটরাজভবনে অজ্ঞাতবাসকালে ইনি তন্ত্রিপাল নামধারণপূর্ব্বক গোরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রস্থানকালে ইনি সুমেরুশিখরে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

(২) জরাসন্ধের পুত্র। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন।

সাত্যকি—যদুবংশীয় বিখ্যাত যোদ্ধা। ইনি যুযুধান নামেও আখ্যাত হইয়া থাকেন। ইঁহার পিতার নাম সত্যক; পিতামহ শিনি এবং ইহার পুত্র অঙ্গদ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষে ছিলেন। ইঁহার হস্তে কৌরবপক্ষীয় বীর ভূরিশ্রবা নিহত হন। ইনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। যদুকুলের ধ্বংসের সময় ইনিও নিহত হন। (মহাভা-হরি)

সান্দীপনি (সন্দীপনি) শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরু। (শ্রীকৃষ্ণ-দেখ)।

সাবিত্রী—সত্যবানের পত্নী। ইনি মদ্র-দেশাধিপতি অশ্বপতির তনয়া। সাবিত্রী বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে পিতা অশ্বপতি তাঁহাকে উপযুক্ত পতি মনোনীত করিতে অনুমতি করেন। ইনি পিতা ও বৃদ্ধ মন্ত্রিগণসহ বহুস্থান পর্য্যটন করিয়াও উপযুক্ত বর পাইলেন না; অবশেষে যে অরণ্যে সত্যবান্ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করেন। অশ্বপতি মহর্ষি নারদের নিকট সত্যবানের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া তাঁহার পরামর্শে কন্যাকে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী বলিলেন যে, এক জনকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করা হইয়াছে, এখন অপর পতি গ্রহণ করিলে তাঁহাকে দ্বিচারিণীভাবাপন্ন হইতে হইবে। দ্বিচারিণী হওয়া অপেক্ষা অকালবৈধব্য অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া সাবিত্রী পিতার অনুরোধ বিনয়ের সহিত উপেক্ষা করিলেন। সাবিত্রীকে আজপর্য্যন্তও হিন্দুমহিলাগণ পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সাবিত্রীর পাতিব্রত্য নৈতিকজগতে হিন্দুর গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। (মহাভারত)

সিংহিকা—(১) প্রজাপতি ঋষি কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা। ইঁহার গর্ভে গন্ধর্ব্বগণের জন্ম হয়।

(২) রাহুর মাতা। এই রাক্ষসী লঙ্কার সন্নিহিত সমুদ্রে বাস করিত। হনুমান্ সীতান্বেষণার্থ লঙ্কায় যাওয়ার কালে ইহাকে বধ করেন।

সিন্ধু—অন্ধমুনির পুত্র। মহারাজ দশরথ মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া মৃগভ্রমে শব্দবেধী বাণে ইঁহাকে বধ করেন। (অন্ধ দেখ)।

সীতা—বিদেহরাজ সীরধ্বজ জনকের তনয়া ও অযোধ্যাপতি রামের পত্নী। সীতা পতির সহিত রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করেন। বনবাসের ১৩শ বর্ষে তিনি লঙ্কেশ্বর রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হন। রাম বানরসৈন্য লইয়া লঙ্কা বেষ্টন করেন; ৬ মাস ঘোর যুদ্ধের পর রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। রাম প্রথমে সীতার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সীতা ক্ষুব্ধ হইয়া অগ্নিতে দেহত্যাগ করিবার মানসে চিতানলে প্রবেশ করেন; কিন্তু অগ্নিদেব বিশুদ্ধচরিত্রা সীতাদেবীকে গ্রহণ না করিয়া রামকে ফিরাইয়া দেন। রামচন্দ্র অগ্নিপরীক্ষিতা সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া ভরতের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সীতা অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। রাম সীতাচরিত্রের বিশুদ্ধতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। রাম প্রজাগণের মনোভাব অবগত হইলেন। বিশুদ্ধচরিত্রা জানিয়াও রাম প্রজারঞ্জনার্থ তাঁহাকে

ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সীতা বাল্মীকির তপোবনের সন্নিকটে তমসা নদীর তীরস্থিত অরণ্যে রামের আদেশে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। বাল্মীকি সীতাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। এখানে যথাসময়ে সীতা দুই যমজ সন্তান প্রসব করেন। বাল্মীকি ইহাদের নাম কুশ ও লব রাখিলেন। বাল্মীকি ইহাদের জাতকর্ম্ম সমুদয় সম্পন্ন করিয়া স্বকৃত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করাইলেন। এই সময়ে রাম এক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কুশীলব বাল্মীকির সহিত এই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া রামায়ণ গান করেন। রাম বাল্মীকির মুখে কুশীলবের পরিচয় পাইয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাল্মীকি শিষ্য প্রেরণ করিয়া সীতাকে সভাসম্মুখে আনয়ন করিলেন। সীতা সভাসম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যদি আমার বাক্য, মন ও কর্ম্মে পতির প্রতি ব্যভিচার হইয়া না থাকে, তবে হে জননি ধরিত্রি, তুমি আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দান কর।" এই কথা বলিবা মাত্র ভূমি ভেদ করিয়া একখানি সিংহাসন উত্থিত হইল এবং ধরণীদেবী সীতাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।

সীতা নির্ব্বাসন হইতে সমস্ত ঘটনা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত। উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকি-রচিত নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (দশরথ ও রাম দেখ)।

সুকন্যা—মহারাজ শর্য্যাতির তনয়া ও মহর্ষি চ্যবনের পত্নী। (চ্যবন দেখ)।

সুকেশ—রাক্ষসবিশেষ। লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতামহ; সুমালী ইঁহার পুত্র। (কুবের দেখ)।

সুগ্রীব—কপিরাজ। পর্ব্বতবেষ্টিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরী রাজধানী। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার পত্নী রুমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়া ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ইঁহারই সাহায্যে রাম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। বৃদ্ধাবস্থায় সুগ্রীব জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র অঙ্গদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত সরযূতে দেহত্যাগ করেন। (রাম দেখ)। ইনি সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। (বালি দেখ)।

সুন্দ—নিকুম্ভ দৈত্যের পুত্র। ইহার কনিষ্ঠভ্রাতার নাম উপসুন্দ। (উপসুন্দ ও তিলোত্তমা দেখ)।

সুবর্ণষ্ঠীবী—সৃঞ্জয়ের পুত্র। (সৃঞ্জয় দেখ)।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পত্নী। সুভদ্রা বসুদেবের ঔরসে ও রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্জ্জুন ইঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভজাত পুত্র অভিমন্যু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সপ্তরথীকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অন্যায় সমরে হত হন।

সুমালী—লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতামহ। (কুবের দেখ)।

সুমিত্রা—অযোধ্যাপতি দশরথের মহিষী। ইঁহার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মলাভ করেন। (রামায়ণ)

সুমুখ—নাগবিশেষ। ইন্দ্রের সারথি মাতলি ইঁহার সহিত স্বীয় কন্যা গুণকেশীর বিবাহ দেন। পক্ষিরাজ গরুড় সুমুখকে ভক্ষণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; এই বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়াতে তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ইনি ইন্দ্র ও বিষ্ণুর নিকট গমনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া স্বীয় বলবত্তা প্রকাশ করেন। বিষ্ণু স্বীয় হস্ত গরুড়ের উপর স্থাপন করেন। হস্তভরে পীড়িত হইয়া গরুড় বিনীত হইলেন। তদবধি গরুড় ও সুমুখের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল। (মহাভারত)

সুরভি (সুরভী)—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা। ইঁহার গর্ভে গো-মহিষাদির উৎপত্তি হয়। (কশ্যপ-দেখ)।

সুশর্ম্মা—ত্রিগর্ত্তরাজ। মৎস্য দেশাধিপতি বিরাট ইঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ইনি রাজ্যচ্যুত হইয়া দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে বসতি করিতেছিলেন। এই সময়ে কীচক বিরাটরাজের সেনাপতি ছিলেন; তাঁহার ভয়ে দুর্য্যোধন বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। কীচকের মৃত্যুর পর দুর্য্যোধন ইঁহাকে সৈন্যসহ বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। সুশর্ম্মা দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করিলে স্বয়ং বিরাট ধেনুগণ রক্ষার্থ তাঁহার সহিত

যুদ্ধ করেন; কিন্তু সুশর্ম্মা তাহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া স্বরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন। পাণ্ডবগণ এই সময়ে বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া বিরাটের উদ্ধার সাধন করেন। (মহা-বিরাট)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৮শ দিবসে ইনি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন।

* **সুসেন (সুষেণ)** বালির শ্বশুর। (সুষেণ-দেখ)।

সূর্য্য—প্রজাপতি ঋষি কশ্যপের পুত্র। অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বতমনু ও যম নামে দুই পুত্র এবং যমুনা নামে এক কন্যা জন্মে। ইঁহার অপরপত্নীর নাম ছায়া। ছায়ার গর্ভে শনি নামে পুত্র ও তপতী নামেকন্যা জন্মগ্রহণ করে। (ছায়া দেখ)। কপিরাজ সুগ্রীব ও বীরবর কর্ণ ইঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। পক্ষিরাজ গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ ইঁহার সারথি।

সৃঞ্জয়—মহারাজ শিত্যের পুত্র। মহর্ষি পর্ব্বত ও দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। এই মুনিদ্বয় এক দিবস রাজা সৃঞ্জয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে, তদীয় এক অবিবাহিতা কন্যা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। নারদের প্রার্থনায় এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কন্যাটীকে রাজা সৃঞ্জয় নারদের হস্তে তদীয় ভার্য্যারূপে অর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বতও কন্যাটীকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি নারদকে অভিসম্পাত করিলেন এবং নারদও পর্ব্বতকে অভিশাপ দিলেন। উভয়ের শাপে এই ফল হইল যে, একে অন্যকে ছাড়া স্বর্গে গমন করিতে পারিবেন না। সৃঞ্জয়ের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কন্যা নারদে সমর্পিত হইল।

সৃঞ্জয় বহুকাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি নারদের বরে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন এবং ইঁহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ সমুদয়ই কাঞ্চনময়। দস্যুগণ সুবর্ণ প্রাপ্তির আশায় রাজসদনে প্রবেশপূর্ব্বক বলপ্রয়োগ করিয়া রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে হরণ করিল এবং অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল। কিন্তু ইহাতে দস্যুগণের কোন অর্থলাভই হইল না। তখন দস্যুগণ ক্রোধে একে অন্যকে বধ করিয়া নরকে গমন করিল। মহর্ষি নারদ সৃঞ্জয়কে নানা উপদেশ দিলেন, কিন্তু রাজার কিছুতেই শান্তি হইল না। অবশেষে নারদ সুবর্ণষ্ঠীবীকে পুনর্জ্জীবন দান করেন। (মহাভা দ্রোণ-৫৫-৭১ অঃ)

সোমদত্ত—কৌরবপক্ষীয় বীর বিশেষ। ভারতযুদ্ধের ১৪ দিবসে ইনি সাত্যকির হস্তে নিহত হন। দেবক-রাজের কন্যা দেবকীর স্বয়ংবরকালে যখন যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের বিবাহের নিমিত্ত দেবকীকে হরণ করেন, তখন সোমদত্ত তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। শিনি সর্ব্বসমক্ষে সোমদত্তকে পদাঘাত করেন। উভয়ে তুমুল যুদ্ধ হইল; শিনি দেবকীকে বলপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান করিলেন। (শিনি দেখ)। ইঁহার পুত্রের নাম ভূরিশ্রবা।

সৌভরি—তপোবল-সম্পন্ন ঋষি। ইঁহার সংসারী হইবার বাসনা হয়। এজন্য তপোবলে মনোহর দেহ ধারণ-পূর্ব্বক সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া স্বীয় তপোবনে আনয়ন করেন। ইঁহাদিগকে লইয়া মুনিবর বহুকাল গৃহস্থধর্ম্ম পালন করেন। এই পত্নীগণের গর্ভে সৌভরির বহু সন্তান জন্মে। অতঃপর মুনি, বিষয়ে বিরক্ত হইয়া পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হন।

সৌদাস—ইঁহার অপর নাম কল্মাষপাদ। (কল্মাষপাদ দেখ)।

স্বাহা—অগ্নিদেবের ভার্য্যা। বৈদিক মন্ত্রের সহিত ইঁহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক যজ্ঞে কোন দেবতার উদ্দেশে হবিঃ আহুতি দিলে, সেই দেবতা হবিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হ

হংস—ডিম্বকের ভ্রাতা। (ডিম্বক দেখ)।

হনুমান্—রামচন্দ্রের পরমভক্ত কপিবীর। পবনদেবের ঔরসে ও অঞ্জনার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনিই প্রথমে লঙ্কায় গমন করিয়া সীতার সন্ধানপ্রাপ্ত হন। লঙ্কা-সমরে ইনি অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। (রাম দেখ)।

হরিশ্চন্দ্র—(রাজা) এই রাজা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক নানা দুর্দ্দশায় পাতিত হন। (বিশ্বামিত্র দেখ)।

হর্য্যশ্ব—(১) ইনি অযোধ্যার রাজা। ইনি মহারাজ যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে বসুমান নামে পুত্র উৎপাদন করেন। (গালব দেখ) (২) পঞ্চালের অধিপতি। ইঁহার পঞ্চপুত্রের দ্বারা রাজ্য শাসিত হইত বলিয়া রাজ্যের নাম পাঞ্চাল হইয়াছে।

হারীত—বিখ্যাত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা। ইঁহার প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ "হারীত সংহিতা" নামে প্রসিদ্ধ।

হিড়িম্ব—রাক্ষস বিশেষ। পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে এই রাক্ষস ভীমের হস্তে নিহত হয়। ভীম ইহাকে বধ করিয়া ইঁহার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন।

হিড়িম্বা—ভীমের পত্নী (হিড়িম্ব দেখ)। ইঁহার গর্ভে ঘটোৎকচ জন্মগ্রহণ করেন। ঘটোৎকচ ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে ঘোর যুদ্ধ করিয়া কর্ণের হস্তে নিহত হন। (ঘটোৎকচ দেখ)।

হিরণ্যকশিপু—দৈত্যপতি। নৃসিংহরূপী বিষ্ণু ইহাকে বধ করেন। (প্রহ্লাদ দেখ)।

হিরণ্যাক্ষ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা। বরাহরূপী বিষ্ণু ইঁহাকে বধ করেন। (বরাহ দেখ)।

হেমা—স্বর্গের এক অপ্সরা। ইঁহার গর্ভে ময়দানবের ঔরসে লঙ্কেশ্বর রাবণের মহিষী মন্দোদরীর জন্ম হয়।

হৈহয়—একজন পরাক্রান্ত রাজা। (কার্ত্তবীর্য্য দেখ)।

চরিতাভিধান।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ঐতিহাসিক যুগ—ভারতবর্ষ

অ

অক্ষয়কুমার দত্ত—বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত; মাতার নাম দয়াময়ী। বিখ্যাত গদ্যপ্রবন্ধ লেখক, গ্রন্থকার ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া ইনি বঙ্গে সর্ব্বত্র আদৃত ছিলেন। ১২২৭ সালে (ইং ১৮২০ খৃঃ) শ্রাবণ মাসে নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী চুপীগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১০ বৎসর বয়সের সময় স্বীয় গ্রামে গুরু মহাশয়ের নিকট তিনি সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু পার্শীও পড়েন। তৎকালে পার্শী ভাষাই আদালতের প্রচলিত ভাষা ছিল। ১৩শ বৎসর বয়সে তাঁহার ইংরেজী পড়িবার ইচ্ছা হইল এবং তিনি পিতা ও আত্মীয়গণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে এক পাদ্রির স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ১৭শ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তিনি কলিকাতা গিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি হন, কিন্তু দুই বৎসর পরেই পিতৃবিয়োগ হেতু তাঁহাকে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর অন্বেষণে বাহির হইতে হইল। অল্প বেতনে কাজ করিয়া তাঁহাকে অতিকষ্টে বহুদিন পর্য্যন্ত সংসার চালাইতে হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ইনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় মাসিক ৮৲টাকা বেতনে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন; এই পদে পরে তাঁহার মাসিক ১৪৲ টাকা বেতন হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তিনি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তিনি দারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পত্রিকার সম্পাদকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বালীগ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই রুগ্ন অবস্থাতেই তিনি "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক বৃহৎ গ্রন্থ লিখেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির ভাষা ও ভাব অতি বিশুদ্ধ। রচনার বিশুদ্ধতার জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি চিরকাল বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আদৃত থাকিবে। তিনি ১২৯৩ সালে (ইং ১৮৮৬ খৃঃ) ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি অতি বিনয়ী ও প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত উপাদেয় গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন:—(১) বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, (২) চারুপাঠ ৩ ভাগ, (৩) পদার্থবিদ্যা, (৪) ধর্ম্মনীতি, (৫) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২ ভাগ।

অক্ষয়কুমার সেন (রায় বাহাদুর)—ইঁহার পিতা লক্ষ্মীকান্ত সেন কুমিল্লা কালেক্টরীতে একাউণ্টেণ্ট ছিলেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে রাজকার্য্যে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সে কালে রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে ইঁহার নাম সুপরিচিত ছিল। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী রূপঠা গ্রামে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপঠা পদ্মানদীর গর্ভস্থ হওয়ার পর মূলচর গ্রামে আসিয়া নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার বাল্য জীবন কুমিল্লায় অতিবাহিত হয়। কুমিল্লা জিলা

স্কুল হইতে জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উভয় পরীক্ষায়ই ইনি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া ইনি প্রথমে কাশীমবাজারের জমিদার রায় অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। পরে ঢাকার স্বনামখ্যাত জমিদার নবাব সার আসানুল্লা বাহাদুর কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার ইংরেজি ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখান হইতে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে বগুড়া জেলাস্কুলে অস্থায়ী হেড্‌মাষ্টার পদে নিযুক্ত হন। পরে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নতি লাভ করেন। কিছুকাল পরে ডেপুটী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হন। ইনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ৪০ বৎসর কাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সন লাভ করেন। তাঁহার চাকুরির অধিকাংশ সময়ই ঢাকাতে অতিবাহিত হইয়াছে। রাজকার্য্যে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাখরগঞ্জের বন্যার স্পেসিয়ালওয়ার্কে ও রংপুরের দুর্ভিক্ষের কার্য্যে ইঁহার প্রতিভা রাজপুরুষদিগের নিকট সুপরিচিত হওয়ায়, বাখরগঞ্জে ১৮৭১ সালের দশ আইন প্রচলন করিবার নিমিত্ত, ইনি বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত হন। এই কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে ইঁহাকে অনেক জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। ইনি অত্যন্ত শ্রমশীল, পাঠানুরক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। ইঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়ে বিক্রমপুর মূলচর গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার চারিটি পুত্র একটি কন্যা। দ্বিতীয় পুত্র সবডেপুটী কালেক্টর, তৃতীয় পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

অচ্যুত গোস্বামী—অদ্বৈত গোস্বামীর ৮টী সন্তানের মধ্যে ইনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইনি অতি সদাচারপরায়ণ ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইঁহার অপর সাতটী ভাই নিতান্ত কুলাঙ্গার; তাহাদের দুর্ব্যবহারে অদ্বৈত প্রভু শেষ জীবনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া গিয়াছেন।

অচ্যুত রায়—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজা। ইনি কৃষ্ণদেব রায়ের পুত্র এবং নরসিংহদেব রায়ের পৌত্র। ইনি ১৫৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অজাত শত্রু—মগধের একজন প্রাচীন নৃপতি। ইঁহার পিতার নাম বিম্বিসার। ইনি ৪৮৫ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধে রাজত্ব আরম্ভ করেন। বিম্বিসার ৫৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

অদ্বৈত ন্যায়রত্ন—বিক্রমপুরের বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত। (কালীচরণ তর্কালঙ্কার দেখ)।

অদ্বৈতাচার্য্য—বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইঁহাকে অদ্বৈত প্রভু বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে প্রভু তিন জন:—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ইনি ১৩৫৬ শকে (ইংরেজী ১৪৩৪ খৃঃ) মাঘীসপ্তমী তিথিতে নাভা দেবীর গর্ভে কুবের তর্কপঞ্চাননের ঔরসে শ্রীহট্ট জিলার সুনামগঞ্জ উপবিভাগীয় নগরীর ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী নবগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নবগ্রাম তদানীন্তন লাউড় রাজ্যের রাজধানী; এখন উহা বনাকীর্ণ হইয়াছে। অদ্বৈত প্রভুর পিতা গঙ্গাতীরে শান্তিপুর নামক স্থানে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কুবের তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে সময়ে সময়ে এই বাটীতে আসিতে হইত। অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে যে, কুবের পণ্ডিতের বহুসন্তান অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, তিনি বিষয়ে নির্ম্মম হইয়া গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে সস্ত্রীক বাস করেন। এখানে তাঁহার পত্নী নাভা দেবীর গর্ভচিহ্ন প্রকাশ পায় এবং এই সময়ে তিনি নবগ্রামের রাজার অনুরোধে পত্নীসমভিব্যাহারে শান্তিপুর পরিত্যাগ করিয়া নিজ বাটীতে চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার পুত্র অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন। অদ্বৈত প্রভু মৃতপ্রায় বৈষ্ণবধর্ম্মে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিয়া সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ভক্তিরসে প্লাবিত করেন। তাঁহার প্রভাবে শান্তিপুর একটী পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হয়। অদ্বৈত প্রভুর ৮টী পুত্রের মধ্যে অচ্যুত ব্যতীত সকলেই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন, এজন্য প্রভুপাদ অদ্বৈত, অচ্যুতকে বড় স্নেহ করিতেন। শান্তিপুরের অধিকাংশ গোস্বামিগণই এই অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। এইবংশে বহু জ্ঞানিলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনঙ্গপাল—তোমরবংশীয় জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি ৭৩৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীনগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

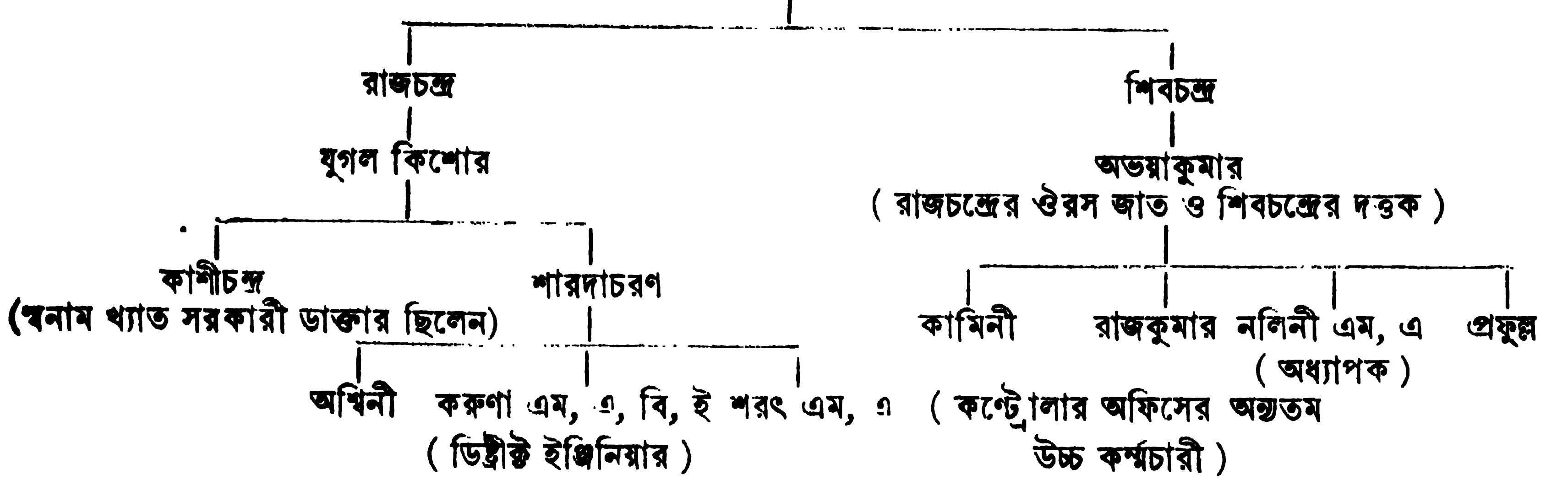
অনঙ্গভীম—উড়িষ্যার একজন প্রাচীন রাজা। প্রবাদ এই যে, বর্ত্তমান শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দির ইঁহার নির্ম্মিত। ইনি ১০৯৬ শকে (১১৭৪ খৃঃ) রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বহুবিধ পুণ্যকার্য্য করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ইনি ৬০টী দেবমন্দির নির্ম্মাণ, ৪০টী কূপ খনন ও ১৫২টী জলাবতরণিকা প্রস্তরনির্ম্মিত করিয়াছিলেন এবং শতাধিক গ্রাম ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা হাইকোর্টের দেশীয় বিচারপতি। ইনি ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃঃ) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন, পরে একজন মুন্সী নিযুক্ত করিয়া পার্শী শিখেন। কলেজে পড়া শেষ করিয়া তিনি হাওড়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে নাজিরের পদে নিযুক্ত হন। ১২ বৎসর নাজিরি করার পর তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এখানে সরকারী উকীল রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁহাকে ব্যবসায়ে কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিভাবলে অল্প সময়ের মধ্যে ওকালতি ব্যবসায়ে অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৯০ শকে (১৮৬৮ খৃঃ) তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান সরকারী উকীলের পদ প্রাপ্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উকীল সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন করিয়া তুলিল। ১৭৯২ শকে (১৮৭০ খৃঃ) কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হওয়াতে, উকীল সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য অনুকূলচন্দ্র উক্ত পদ লাভ করেন। ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি বলিয়া হাইকোর্টে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছিলেন এবং বঙ্গের ছোট লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ শকের ৩২শে শ্রাবণ (১৮৭১ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট) তারিখে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি মাত্র ৮ মাস কাল হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

অভয়কুমার দাস—বিখ্যাত ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট। ঢাকার বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত ইঁহার যোগছিল, এজন্য ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি (তৈলচিত্র) এই নগরের নর্থব্রুকহলে রক্ষিত হইয়াছে। ইঁহার নিবাস ফরিদপুর জিলায় দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত লোনসিংহ গ্রাম। ইঁহার বংশে বহু ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, এজন্য ইঁহার বাড়ী ডেপুটীবাড়ী নামে পরিচিত। ইঁহার চেষ্টায় নিজগ্রামে একটী উচ্চ ইংরেজীস্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

অভয়াকুমার দত্ত গুপ্ত—বিক্রমপুরের অন্যতম খ্যাতনামা দেশহিতৈষী কর্ম্মবীর। অধ্যবসায়বলে মানুষ কত বড় হইতে পারে অভয়াকুমারের জীবনী তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। ইনি ১৭৩৮ শকে (ইং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) ২৩শে ফাল্গুন বুধবার জৈনসার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাজচন্দ্র দত্ত ইঁহার জনক। রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর শিবচন্দ্রের কোন সন্তান না থাকাতে তিনি অভয়াকুমারকে দত্তক গ্রহণ করেন। তদবধি অভয়াকুমার শিবচন্দ্রের পুত্ররূপেই পরিচিত। অভয়াকুমার প্রথমে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং পরে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া আইন শিক্ষা করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট তিনি প্রথমে মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হন। পরে রাজকার্য্যে যোগ্যতা দেখাইয়া তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হন। হাইকোর্টের বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় পরলোক গমন করিলে পর, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ৬ জন লোককে ঐ পদের জন্য নির্ব্বাচিত করেন। অভয়াকুমার ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি শম্ভুনাথের স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরে তিনি একজন বিচারদক্ষ লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বিচার কার্য্যেই আপনার সমস্ত চেষ্টা বদ্ধ রাখিতেন না; কিরূপে দেশের উন্নতি হইবে তাহা তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। তিনি নিজ বাটীতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে একটী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে একটি দাতব্য

চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি এক হাজার টাকা মূল্যের একখানি তালুক ক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় জৈনসার হইতে ইছাপুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল; একার্য্যে মোট তিন হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, এতন্মধ্যে তিনিই এক হাজার টাকা দেন। তাঁহারই যত্নে "পল্লীগ্রাম" নামক একখানা মাসিক পত্র তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাই বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্র। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ১৮৯২ শকে (ইংরেজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) ২৬শে ভাদ্র শনিবার ৫৪ বৎসর বয়সে ইনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। ইঁহার বংশাবলী নিম্ন প্রদত্ত হইল।



অভিমন্যু—কাশ্মীরের রাজা। ইনি খৃষ্টের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার সময়ে কাশ্মীর রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি কাশ্মীরে অভিমন্যুপুর নামে একটী নগর নির্ম্মাণ করেন।

অমরসিংহ—(১) উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একরত্ন। ইনি অমরকোষনামক সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন। অমরসিংহ এই একখানি মাত্র গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে শঙ্করাচার্য্য ইঁহার প্রণীত অমরকোষ ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থ দগ্ধ করেন। এজন্য অনেকের ধারণা যে, ইনি বৌদ্ধ ছিলেন। গয়ার প্রধান বৌদ্ধ মন্দির ইঁহার নির্ম্মিত বলিয়া ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি জৈনদিগের ন্যায় ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন।

(২) রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের রাজপুতকুলগৌরব প্রতাপসিংহের পুত্র। ইনি শৈশবাবধি পিতার সন্নিকটে থাকিয়া প্রতাপের মহনীয় চরিত্র অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমরসিংহ যৌবনের মধ্যভাগে মিবার রাজ্যের শাসনদণ্ড হস্তে পাইলেন। ইনি পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বলশালী ছিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই রাজ্যশাসনে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(৩) বিখ্যাত গুর্খাসেনাপতি। ইনি ১৮১৪-১৫ খৃঃ অব্দে নেপাল যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি অক্টারলোনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিলাসপুরের রাজা অক্টারলোনীকে সাহায্য করায় ইনি নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন, যুদ্ধেরও অবসান হয়।

(পণ্ডিত) অযোধ্যানাথ—পণ্ডিত কেদারনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পণ্ডিত কেদারনাথ আগ্রার একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বণিক্ ছিলেন এবং তিনি কিছুকাল জাফরের নবাবের প্রধান মন্ত্রিত্বও করিয়াছিলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ১৭৬২ শকে (ইং ১৮৪০ খৃঃ) আগ্রানগরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে আরবি ও পার্শি শিখিতে আরম্ভ করেন এবং তৎপরে আগ্রা কলেজে ইংরেজী শিক্ষা করিতে প্রবেশ করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রখর স্মৃতিশক্তিবলে তিনি ২২ বৎসর বয়সেই কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৭৮৪ শকে (ইং ১৮৬২ খৃঃ) তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইল; অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আগ্রার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল হইয়া উঠিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার বড়লোক হইবার বলবতী ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই ইচ্ছা ফলবতী করিতে তিনি কখনও অসদুপায় অবলম্বন করেন নাই। ১৭৯১ শকে (ইং ১৮৬৯ খৃঃ) অযোধ্যানাথ আগ্রা কলেজের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি আগ্রায় "ভিক্টোরিয়া কলেজ" স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। যখন আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালত এলাহাবাদে উঠিয়া আসে, তখন অযোধ্যানাথও আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসেন। এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অনতিবিলম্বে আগ্রার ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। এখানে তিনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন এবং এই উপার্জ্জিত অর্থরাশি জনহিতকর কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে থাকেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সকল জনহিতকর কার্য্যেই পণ্ডিত অযোধ্যানাথের যোগ ছিল। একদিকে অসাধারণ প্রতিভা অপরদিকে লোকপ্রিয়তা, এই উভয় গুণে তিনি তৎপ্রদেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০১ শকে (ইং ১৮৭৯ খৃঃ) অযোধ্যানাথের যত্নে এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড" নামে এক খানি দৈনিক পত্রিকা বাহির হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। ১৮১২ শকে (ইং ১৮৯০ খৃঃ) তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান নামে আর একখানি পত্রিকা বাহির করেন; এই পত্রিকা তৎকালে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল-বাসীদিগের মুখপত্র ছিল। তিনি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির কমিশনর ও এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটীর ফেলো হইয়াছিলেন। এই উভয় কার্য্যেই তিনি দেশের প্রভূত উপকার করেন। ১৮১৪ শকে (ইং ১৮৯২ খৃঃ) তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নক্‌স সাহেব (Justice Knox) তাঁহার শবাধার সুশোভিত করিতে এক ছড়া ফুলের মালা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চান্সালার তাঁহার শোকসভায় বলিয়াছিলেন "অযোধ্যানাথের ন্যায় লোক যে কোন দেশের, যে কোন জাতির গৌরব"। তিনি যেমন তেজস্বী তেমনি মেধাবী ছিলেন। সৎ ও সাধুকার্য্যে তাঁহার ন্যায় অনুরাগ অতি অল্প লোকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি জাতীয় মহাসমিতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন দেশীয় লোক ঐ প্রদেশের লাট সাহেবের সভায় আসীন হন নাই।

অর্জ্জুন মিশ্র—ইনি মহাভারত ও কুসুমাঞ্জলির টীকাকার। ইঁহার রচিত মহাভারতের টীকার নাম "ভাবদীপ"। ভক্তমাল গ্রন্থে জয়দেবের পরে ইঁহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অশোক—এই বিখ্যাত মৌর্য্যসম্রাট বিন্দুসারের পুত্র ও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণের মধ্যে পৈতৃকরাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিয়া অশোক ২৫ বৎসর বয়সের সময় সিংহাসন অধিকার করেন। অশোকের অপর নাম প্রিয়দর্শী। অভিষেকের পর ৮ম বৎসরে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী ও এক লক্ষ সৈন্য হত হয়। অশোক, রাজত্বের প্রথম অবস্থায় হিন্দু ছিলেন এবং তিনি সময়ে সময়ে বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। প্রবাদ এই যে, তাঁহারই আদেশে বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুম কর্ত্তিত হয় এবং তিনিই কপিলাবস্তুর সন্নিহিত বুদ্ধের ৮টী স্মারক স্তূপের মধ্যে ৭টাই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। অশোক ২৬৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বের ৭ম বৎসরে অর্থাৎ ২৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অশোক, রাজত্বের ১৪শ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতেরপ্রায় দশ আনা অংশ অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন সম্রাট এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশস্থ জঙ্গলাকীর্ণ তিরাই প্রদেশ, দক্ষিণে গোদাবরী নদী, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে আরব সাগর। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলা প্রদেশদ্বয় এক একজন রাজবংশীয় কুমারের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি নানাস্থানে কূপখনন ও পান্থশালা

নির্ম্মাণ করেন এবং বহুস্থানে ধর্ম্মমন্দির বা বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন. এজন্য তাঁহার রাজ্য অদ্যাপি বিহার বা ধর্ম্মমন্দির নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, তিনি ষষ্টি সহস্র বৌদ্ধ যাজকের ভরণ পোষণ করিতেন এবং বৌদ্ধ যাজক সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেন। সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করা তিনি জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয়। তিনি প্রস্তরফলকে ধর্ম্মাজ্ঞা ক্ষোদিত করিয়া রাজ্যমধ্যে বিস্তার করিতেন। ২৩৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

অহল্যাবাই—মালবদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১৬৫৭ শকে (ইং ১৭৩৫ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। মলহর রাও হোলকারের একমাত্র পুত্র কুন্দ রাওর সহিত অল্প বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার এক পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম মল্ল রাও এবং কন্যা মুক্তাবাই। অহল্যাবাইর বয়স যখন ১৯ বৎসর তখন তাঁহার স্বামী কন্দ রাও কোন শত্রুদুর্গ অবরোধ করিতে যাইয়া নিহত হন। শ্বশুরের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত অহল্যাবাইর রাজ্যসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। তিনি হিন্দুকুলবধূর ন্যায়ই অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া পুত্রকন্যাগণের লালনপালন করিতেন। তাঁহার ৩০ বৎসর বয়সের সময় শ্বশুর মলহর রাওর পরলোক প্রাপ্তি হয়। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মল্লরাও সিংহাসনে আসীন হন কিন্তু ৯ মাসকালের মধ্যেই মল্লরাও পরলোক গমন করেন। পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে অহল্যাবাই সর্ব্বদাই মর্ম্মপীড়া পাইতেন। পুত্রের মৃত্যুর পর অহল্যাবাইর স্কন্ধে সমস্ত রাজ্যভার পড়িল। রাজ্যভার-গ্রহণের পর হইতে তিনি লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক স্বহস্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন এবং তৎপর কিছু আহার করিয়া মধ্যাহ্নে রাণীর বেশে রাজসভায় আসিতেন। মন্ত্রী ও পারিষদ্বর্গে বেষ্টিত হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরবার করিতেন এবং সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় রাত্রিতে দরবারে বসিতেন। রাজপুরোহিত গঙ্গাধর যশোবন্তের ইচ্ছা ছিল যে, অহল্যাবাই দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন এবং নিজে তাহার মন্ত্রী হইয়া রাজ্য শাসন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঙ্গাধর নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু অহল্যাবাইর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সকলই ব্যর্থ হয়। অবশেষে রাণী অহল্যাবাই গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন এবং তকাজী হোলকার নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। হোলকার বংশের আশ্রিত সামন্তবর্গের সহিত অহল্যাবাই অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বে ইন্দোর একটী সামান্য গ্রাম ছিল; অহল্যাবাই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই এই স্থানটীকে সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করেন। তিনি দানশীলা, অতিথিপরায়ণা এবং দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। ভারতবর্ষের তীর্থস্থান সমূহে অহল্যাবাইর কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মহীশুর ও মালবপ্রদেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক ধর্ম্মশালা, দেবমন্দির ও কূপ এখনও বর্ত্তমান আছে। গয়াক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবালয় আছে। গয়াতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপদ মন্দির বিচিত্র কারুকার্য্যসমন্বিত ও নয়নানন্দবৰ্দ্ধক।

অহল্যাবাইর নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার সেনাপতি তকাজী হুলকার জয়পুরের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে গমন করেন, কিন্তু মাধোজী সিন্ধিয়ার সেনাপতি জিউবাদাদার প্ররোচনায় জয়পুররাজ দেয় টাকা দিতে কাল বিলম্ব করিতে থাকেন। এদিকে জিউবাদাদা সহসা তকাজীকে আক্রমণ করেন। তকাজী হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইলেন এবং অনতিদূরবর্ত্তী এক দুর্গে আশ্রয় লইয়া অহল্যাবাইয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অহল্যাবাই তকাজীর সাহায্যার্থ ১৮ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। জিউবাদাদা তকাজীর নিকট পরাজিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইহাতে যুদ্ধের অবসান হয়। অহল্যাবাই দান ধ্যান পরায়ণা হইয়া প্রায় ৩০ বৎসর কাল সুখে রাজ্য শাসন করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একটী শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। একমাত্র কন্যা মুক্তাবাই বৈধব্যদশাগ্রস্তা হন এবং মাতার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া পতির সহিত সহমৃতা হন। এই দুর্ঘটনায় অহল্যাবাইর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। কন্যার চিতার উপরে এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া পতিগতপ্রাণাতনয়ার স্মৃতিরক্ষা করেন। শোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া অনতিবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণা অহল্যাবাই স্বর্গারোহণ করেন।

আ

আওরঙ্গজেব—বিখ্যাত মোগল সম্রাট্। ইঁহার প্রকৃত নাম মহি উদ্দীন আলমগির। ইনি সম্রাট্ শাহজাহানের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আমেদ নগরে ইঁহার মৃত্যু। ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণের রক্তে ধরণী কলুষিত করিয়া এবং বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন; ইঁহার গোড়ামি হিন্দুবিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, আকবরের সাম্যনীতি যেরূপ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইঁহার ভেদনীতি সেইরূপ এই দুই জাতির মধ্যে ঘোর বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত করিয়াছিল। এই সমুদয় লোক বলেন, ইনি ছলে বলে কৌশলে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহারই অদূরদর্শিতা ও হিন্দুবিদ্বেষ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়াছিল। দক্ষিণে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এবং পূর্ব্বে কুচবিহার ও আসামের কিয়দংশ তিনি স্বীয় সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। অনেক মুসলমান আওরঙ্গজেবকে একজন ধর্ম্মপ্রাণ, শাস্ত্রজ্ঞ, ঈশ্বরভক্ত ও বিশ্বাসী মুসলমান বলিয়া মনে করেন। তাঁহার চিঠিপত্র পড়িলে তাঁহাকে এরূপই বোধ হয়। তিনি নিজে কোরাণ শরিফ লিখিয়া উহার বিক্রয়লব্ধ-অর্থদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সাম্রাজ্যের আয়ে তিনি পার্থিব দেহের পুষ্টি সাধন করিতেন না। তাঁহার কন্যা চিরকুমারী জেব উন্নিসা, পরম বিদুষী, স্বধর্ম্মানুরাগিনী ছিলেন (জেব্ উন্নিশা দেখ)। আওরঙ্গজেব "ফতেয়া এ আলমগিরি" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণের আচার ও রীতি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন; এই নিয়মগুলি ভক্ত মুসলমানগণ অতি যত্নের সহিত পালন করিয়া থাকেন। রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে কুমার অবস্থায় ২৬শ বর্ষ বয়সে তিনি একবার সংসার পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গমন করেন এবং তথায় সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে থাকেন; কিন্তু স্নেহবান্ পিতা শাহজাহান তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। আওরঙ্গজেব শেষবয়সে নিরন্তর ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং বিলাস ও আমোদ ত্যাগ করিতে লোক দিগকে উপদেশ দিতেন। জয় সিংহকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ এবং হীরাবাইকে (যিনি জৈনাবাদী নামে পরিচিত ছিলেন) পত্নীরূপে গ্রহণ, এই দুই ঘটনা তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে বিচারকার্য্য কোরাণের নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হইত। হায়দারাবাদের প্রথম নিজামের পিতা ঘিয়াসুদ্দিন খাঁ ফিরোজ জাঙ্গ বাহাদুর সম্রাট আওরঙ্গজেবের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। জুলফিকার খাঁ ওরফে নসরৎজঙ্গ বাহাদুর সম্রাটের অপর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই উভয় সেনাপতি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। একদা প্রথমোক্ত সেনাপতি কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিতে যাইয়া কোরাণের নিয়ম লঙ্ঘন করেন। এজন্য সম্রাট প্রধান মন্ত্রী আসাদ খাঁ দ্বারা তাঁহার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করান। যত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীই হউন না কেন কোন ত্রুটি করিলে, এমন কি দরবারের সামান্য আদব কায়দা লঙ্ঘন করিলে, তাহাকে সম্রাট ভৎর্সনা করিতে ছাড়িতেন না। একদা অন্যতর সেনাপতি জুলফিকার খাঁ ওরফে নসরৎজঙ্গ বাহাদুর দরবারের সামান্য রীতি লঙ্ঘন করাতে অপমানিত হইয়াছিলেন; সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে চক্ষে চস্‌মা দিয়া দরবারে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। সম্রাট কাহাকেও খাতিরে পদোন্নতি দান করিতেন না; তাঁহার শাসন কালে একমাত্র যোগ্যতাই কর্ম্মচারিগণের উন্নতি লাভের উপায় ছিল।

আকবর—(জালাল উদ্দীন মহম্মদ আকবর) বিখ্যাত দিল্লীর সম্রাট্। ইনি ১৪৬৪ শকে (ইং ১৫৪২ খৃঃ) অমরকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সপরিবারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অমরকোটের রাজার আশ্রয়ে গমন করেন; এখানে আকবরের জন্ম হয়। হুমায়ুন ১৪৭৮ শকে (ইং ১৫৫৬ খৃঃ) দিল্লী ও আগ্রা পুনরায় অধিকার করেন; এই সময়ে আকবর ১৪শ বৎসরের বালক মাত্র। দিল্লীর

সিংহাসন লাভের ৬ মাস পরেই হঠাৎ হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর সময়ে আকবর রাজধানীতে ছিলেন না ; তিনি পঞ্জাবে সেকেন্দর শাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। আকবরের নিকট এই দুঃসংবাদ গেলে পর, সমবেত আমীর ওমরাহগণ তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁকে নবাভিষিক্ত সম্রাটের অভিভাবকপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে প্রবলঝঞ্ঝা বহিতেছিল। পরাজিত শূরবংশীয় শেষ সম্রাটের সেনাপতি হিমু (হেমচন্দ্র) দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণের জন্য প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্রাট্ আকবরের মস্তক হইতে মুকুট খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। আকবর তার্দিবেগ নামক একজন সেনাপতির উপর দিল্লীরক্ষার ভার দিয়া পঞ্জাবে প্রস্থান করেন। হিমু তার্দিবেগকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে আকবর ও তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁ ১৪৭৮ শকে (ইং ১৫৫৬ খৃঃ) পানিপথক্ষেত্রে হিমুকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে হিমু বন্দীকৃত হন এবং নিষ্ঠুর বৈরাম খাঁর আদেশে ছিন্নমস্তক হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আকবর পুনর্ব্বার দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এতদিনে দিল্লীর সিংহাসন নিরাপদ হইল। এখন হইতে তিনি সাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে কাবুলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হাকিম বিদ্রোহী হইলেন। আকবর ১৪৭৮ শকে (ইং ১৫৫৬ খৃঃ) কাবুল আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। হাকিম পরাজিত হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং উদারচেতা আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। ১৪৮৩ শক হইতে ১৪৯৮ শকের (ইং ১৫৬১ —১৫৭৬ খৃঃ) মধ্যে তিনি প্রায় সমস্ত রাজপুতনার রাজাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। হিন্দু ও মুসলমানে বিবাহসম্পর্ক সংস্থাপন করিয়া এই উভয় জাতির মধ্যে একতা স্থাপন করিতে আকবর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। যোধপুরের রাজা মল্লদেবের পৌত্রী যোধবাইর সহিত আকবর স্বীয়পুত্র সলিমের বিবাহ দেন। উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপসিংহ কিছুতেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য আকবর যুবরাজ সেলিমকে, সেনাপতি মানসিংহ ও মহবৎ খাঁর সহিত প্রেরণ করেন। মানসিংহ সলিমের শ্যালক। মুসলমানের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক থাকা হেতু মহারাণা প্রতাপ মানসিংহের প্রতি অপমানসূচক ব্যবহার করিয়াছিলেন। মানসিংহ অবমাননার প্রতিশোধ বাসনায় প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহারাণা প্রতাপ সসৈন্যে হলদিঘাটনামক গিরিসঙ্কটে সলিম, মানসিংহ ও মহবৎ খাঁর অধীন মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হয় ; অবশেষে প্রতাপ পরাজিত হন ; প্রতাপের প্রিয় অশ্ব চৈতক আহত প্রভুকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর আকবর গুজরাট, কাশ্মীর ও বঙ্গদেশ জয় করেন এবং দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। আকবর সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সুশাসনে রাখিবার ও বন্দোবস্ত করেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যটী নিম্নলিখিত ১৫শ সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। (১) এলাহাবাদ (২) আগ্রা (৩) অযোধ্যা (৪) আজমীর (৫) গুজরাট (৬) বাঙ্গলা (৭) বিহার (৮) দিল্লী (৯) লাহোর (১০) কাবুল (১১) মুলতান (১২) মালব (১৩) বেরার (১৪) খান্দেশ (১৫) আমেদনগর। প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসনকর্ত্তা বা সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুবাদারের কার্য্য নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল :—(১) সৈনিক বিভাগ (২) বিচার ও শাসন বিভাগ (৩) রাজস্ব বিভাগ। আকবরের রাজস্ববন্দোবস্ত তদীয় উজীর তোডরমল কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। আকবর সর্ব্বদাই হিন্দুরাজগণের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে চেষ্টা করিতেন এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদারদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। আকবর হিন্দুদিগের গ্রন্থাবলী ও ধর্ম্মে অনুরাগ দেখাইতেন, এজন্য গোঁড়া মুসলমানগণ তাঁহার নিন্দা করিতেন। ভগবান দাসের ভগিনী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। এই হিন্দু মহিলা যুবরাজ সলিমের গর্ভধারিণী। প্রসিদ্ধ ফকির সেথ সলিম চিস্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে আকবর বাদশাহের যমজপুত্রদ্বয়ের মৃত্যুর পর এক পুত্রজন্মে। বাঁদশাহ ফকিরের নামানুসারে এই পুত্রের নাম সলিম রাখেন। আকবরের মৃত্যুর পর সলিম জাহাঁগীর নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে

আরোহণ করেন। সম্রাট আকবর আগ্রার ২৪ মাইল দূরে ফতেপুর শিক্রি নামক স্থানে এই ফকিরের জন্য এক দরগা প্রস্তুত করেন। আগ্রার ন্যায় এখানেও দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, বীরবল প্রাসাদ, যোধাবাই প্রাসাদ প্রভৃতি হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। শেষাবস্থায় পরিজনবর্গের ষড়যন্ত্রে ও যুবরাজ সলিমের দুর্ব্ব্যবহারে আকবরের জীবন কষ্টময় হইয়া উঠে। সম্রাটের আদেশে তাঁহার একজন প্রধান বয়স্য আবুল ফাজল্, আইন-ই-আকবরিনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে সাম্রাজ্যের আয় ব্যয়ের সমস্ত হিসাব, সম্রাটের সভা ও দৈনন্দিনকার্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সলিমের চক্রান্তে এই বিখ্যাত সদস্য আবুল ফাজল্ হত হন। প্রিয় সদস্যের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে আকবর দুই দিবস পর্য্যন্ত অন্নজল গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দুই পুত্র মোরাদ ও দানিয়াল অত্যধিক পানাসক্তিহেতু অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। এই সমুদয় কারণে সম্রাটের হৃদয় ভগ্ন হইল; তিনি সাংসারিক শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া ১৫২৭ শকে (১৬০৫ খৃঃ) মানবলীলা সংবরণ করেন।

কর্ণেল টড্ ও হুইলার নামক দুইজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের গ্রন্থে আকবরের নিন্দা দৃষ্ট হয়। কর্ণেল টড্ আকবরের নৈতিক চরিত্রে কামজদোষ আরোপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে আকবর অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন। হুইলার সাহেব বলেন, যে আকবর ভাল লেখাপড়ি জানিতেন না, এজন্য তাঁহার মতে আকবর অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য ছিলেন। টড্ সাহেবের ইতিবৃত্তের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। তৎকালীন হিন্দুগণ সম্রাট আকবরকে লক্ষ্য করিয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই সম্ভ্রমসূচক উক্তি করিতেন। একজন দুশ্চরিত্র সম্রাটের সম্বন্ধে এরূপ উক্তি কি সম্ভব? হুইলার সাহেবের উক্তির উত্তরে এই বলা যায়, যে যিশুখৃষ্ট, শিবাজী, হায়দরআলী ইঁহারা সকলেই সামান্য লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু কে সাহস করিয়া ইঁহাদিগকে অসভ্য বলিবে?

আচাক নারায়ণ (রাজা)—ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের রাজা ছিলেন। আইন-ই-আকবরিতে লিখিত আছে, যে ত্রিপুরার রাজাদের সামন্ত নৃপতিগণ "নারায়ণ" এই শব্দ স্ব স্ব নামের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। আচাক-নারায়ণের রাজ্যে "ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে একটি সড়ক ছিল; ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আছে। ফলতঃ তিনি ত্রৈপুর নৃপতিগণের একজন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। আচাকনারায়ণ গৌড়গোবিন্দের সমসাময়িক লোক এবং উভয়েই একরূপ কাজ করিয়া রাজ্য হারান। তাঁহার রাজ্যে কাজি নুরুদ্দিন নামে জনৈক মুসলমান প্রজা গোবধ করাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নুরুদ্দিনের ভ্রাতা এবিষয় দিল্লীর সম্রাটের গোচরীভূত করে। সে যাহা হউক, শাহ্ জালাল কর্ত্তৃক গৌড়গোবিন্দ পরাভূত হইলে, সেনাপতি নসিরুদ্দিন তরফ জয়ার্থ যাত্রা করেন। আচাক নারায়ণ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ বা যুদ্ধ করা ব্যতীত সন্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, এই উত্তর পাইয়া তিনি ত্রিপুরায় গমন করেন। ত্রৈপুররাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিলেও তৎপক্ষে যুদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই। আচাকনারায়ণ কিছু দিন ত্রিপুরায় থাকিয়া বৃন্দাবন গমন করেন; তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। (গৌড়গোবিন্দ দেখ)।

আণ্টুনি ফিরিঙ্গি—বিখ্যাত কবিওয়ালা। ইনি জাতিতে খৃষ্টান কিন্তু একজন ব্রাহ্মণরমণীতে আসক্ত হওয়াতে ইঁহার আচার ব্যবহার অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হয়। নিম্নোদ্ধৃত গানটী হইতেই বিখ্যাত কবিওয়ালার ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়:—রামবসু ও আণ্টুনি সমসাময়িক কবিওয়ালা ও একে অন্যের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিন রামবসু আণ্টুনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —

সাহেব, মিথ্যা তুই কৃষ্ণ পদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর　　পাদ্রি সাহেব শুন্‌তে পেলে গালে দিবে চূণ কালি॥

আণ্টুনি উত্তরে বলিলেন:—

"খৃষ্ট আর কৃষ্ট কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।

শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে,
এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে ;
ঐ দ্যাখ হরি দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই ॥"

আদিশূর—বঙ্গের সেনরাজগণের আদি রাজা। ("অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূতো আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ"—দেবীবর ঘটক কারিকা) ইঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন ; ইনি সেনবংশের আদি রাজা বলিয়া লোকে আদিশূর নামে পরিচিত। ইঁহার রাজধানী গৌড়নগর ; মফঃস্বলে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে ইঁহার অপর একটী রাজধানী ছিল। কুলাচার্য্যদের মিশ্রগ্রন্থে লিখিত আছে, যে আদিশূর পুত্রেষ্টিযাগের জন্য মিথিলা হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। আদিশূর দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। আদিশূরের রাজত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে :—(১) ৯৮৬ খৃঃ হইতে ১০০৬ খৃঃ (রাজেন্দ্র লাল মিত্র), (২) ৭০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন (জেনারেল কনিংহাম), (৩) ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন (বেণী সংহারের শেষভাগে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর), (৪) ৯৯৯ শকে কান্যকুব্জে দূত প্রেরণ করেন। (বিদ্যাসাগর প্রণীত বহু বিবাহ)। এই সময়ে সমুদয় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এদেশে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য আদিশূর কান্যকুব্জ (বর্ত্তমান কনোজ) হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

"ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ ॥
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতিস্মৃতঃ ॥" মিশ্রগ্রন্থ

প্রবাদ এই, যে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ অনার্য্য জাতীয়দের ন্যায় গায়ে জামা ও পায়ে জুতা পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে রাজদ্বারে উপনীত হন। ইহা দেখিয়া উহাদের প্রতি রাজার অভক্তি হয় ; তিনি পুনঃপুনঃ সংবাদ পাওয়াতেও বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণদের সহিত দেখা করিলেন না। ব্রাহ্মণেরা রাজার বিলম্ব দেখিয়া আশীর্ব্বাদীয় ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি একটী নিকটবর্ত্তী খুটার (হস্তিবন্ধন স্তম্ভের) উপর রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। আশীর্ব্বাদীয় ফুল, বেলপাতা ইত্যাদির প্রভাবে খুটাটি পল্লবিত হইয়া উঠিল। প্রবাদ এই, বর্ত্তমান রামপাল নামক স্থানে যে প্রকাণ্ড গজারি গাছ দেখা যায়, তাহা ঐ পল্লবিত খুটা হইতে পরিণত হইয়াছে। এখনও নানা শ্রেণীর অজ্ঞ লোকেরা এই গজারি গাছের পূজা করিয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ হইতে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ও পাঁচ ভৃত্য হইতে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি কনোজরাজ বীরসিংহকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্ ॥

(এখানে "পুনরপি" লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহারাজ আদিশূর পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে একবার কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন ; এই পুত্রেষ্টি যাগে দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন হইয়াছিল)।

রাজা বীরসিংহ তদুত্তরে এইরূপ পত্র লিখিয়া সদার-সভৃত্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন :—

"মহারাজ রাজাদিশূরোমহাত্মা ত্বয়া বীরসিংহস্য মেহস্ত্বাদিসখ্যম্।
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্॥"

পঞ্চ সহচর সহ বিপ্রগণ বিক্রমপুরে উপস্থিত। মহারাজ আদিশূর প্রথমে তাঁহাদের সহিত কেন সাক্ষাৎ করেন নাই তদ্বিবরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ; পরে যখন তিনি বিপ্রগণের যোগবল অবগত হইলেন, তখন তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। উদারহৃদয় বিপ্রগণ রাজার স্তবে তুষ্ট হইয়া "মহারাজের মঙ্গল হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎকালে আদিশূরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে কায়স্থেরা নিম্নলিখিতরূপে স্ব স্ব পরিচয় দিয়াছিলেন ও আগমনের কারণ বলিয়াছিলেন :—

"ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ নামগোত্রকে॥
কাশ্যপেচৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্যদাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালিনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্।
তস্যদাস মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ॥
কালিদাসো ইতিখ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
বাৎস্য গোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতিসংজ্ঞিতঃ॥
মৌদগল্যগোত্রজোদত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণ পাঁচ গোত্রে বিভক্ত, যথা—সৌকালিন গৌতম, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও মৌদগল্য গোত্র। সৌকালিন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ বরিশাল জিলাস্থ গাভার দস্তিদারগণের এবং দৌলতপুর, কাশীপুর, নরোত্তমপুর ও ভরাকৈর প্রভৃতি গ্রামের ঘোষদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। মকরন্দ ঘোষের বংশধরগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ ঘোষই ক্রিয়াকাণ্ডে প্রধান ; ইনি মকরন্দ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ সদানন্দ ঘোষের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র। সদানন্দের পুত্র কংসারি, তৎসুত হলায়ুধ, তৎসুত বাণীনাথ, তৎসুত রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র রামকৃষ্ণ দিল্লীর বাদশাহ জাহাঁগীরের সময়ে বঙ্গের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন ; এজন্য নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বনাম দস্তখতের ক্ষমতা দান করেন। দস্তের অর্থাৎ হাতের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি দস্তিদার নামে খ্যাত হন। তদবধি গাভার ঘোষবংশীয় কুলীন কায়স্থগণ দস্তিদার আখ্যা পাইয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহারা পর্য্যায় কুলীন কায়স্থ বলিয়া সমাজে পরিচিত।

"নবাবি আমলে ঘোষ নিজের দেওয়ান।
অন্দরে বাহিরে ছিল বড়ই সম্মান॥

কাজে তুষ্ট হইয়া বাদশা দিলেন পুরস্কার।
তদবধি রঘুনাথ হইলেন দস্তিদার ॥

প্রোক্ত সদানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদাশিব যশোহরের অন্তর্গত দৌলতপুরের ঘোষদের পূর্ব্বপুরুষ এবং তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মনাভ বরিশাল জিলার কাশীপুর, ভাতশালা ও নরোত্তমপুরের ঘোষদের এবং বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকৈরের ঘোষদের পূর্ব্ব পুরুষ। গৌতম গোত্রীয় দশরথ (নামান্তরে পুষণ) বসু বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখাঁনগরের বসু বংশীয় কুলীনগণের পূর্ব্বপুরুষ। দশরথ বসুর বংশধরগণের মধ্যে গোপাল বসু প্রসিদ্ধি লাভ করেন; ইনি নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। গোপাল বসুর বংশধরগণ এক্ষণে বরিশাল জিলার অন্তর্গত নাথুল্লাবাদ গ্রামে এবং ফরিদপুর জিলায় ওলপুরে বাস করিতেছেন। কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাটগুহ বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাঁচাবালিয়া ও বানরিপাড়া গ্রামের গুহগণের পূর্ব্ব পুরুষ। বিরাটগুহের বংশধরগণের মধ্যে চাঁদগুহ ও নয়ান গুহ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চাঁদগুহের বংশধরগণ বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাঁচাবালিয়া ও উজিরপুরে এবং নয়ান গুহের (ওরফে নয়ান সরকারের) বংশধরগণ উক্ত জিলায় বানরিপাড়া গ্রামে বর্ত্তমান আছেন। বানরিপাড়ার গুহগণ, গুহ ঠাকুরতা উপনামে খ্যাত; অন্যান্য স্থানের গুহগণের মধ্যে কেহবা সরকার, কেহবা রায় এবং অপর কেহবা বিশ্বাস উপনামে খ্যাত। বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস (নামান্তরে তারাপতি) মিত্র বরিশাল জিলাস্থ মাধবপাশার মিত্রগণের পূর্ব্ব পুরুষ। মিত্রবংশ প্রথমে ঘোষ, বসু ও গুহের সমকক্ষ কুলীন ছিলেন. কিন্তু পরবর্ত্তিকালে দোষযুক্ত হওয়াতে এই বংশ উক্ত তিন শ্রেণীর কুলীন কায়স্থ অপেক্ষা সমাজে কিঞ্চিৎ নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত বরিশাল জিলার দেহের গাতি ও রাকুদিয়া গ্রামের এবং বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁঠালিয়া গ্রামের দত্ত বংশীয় কায়স্থগণের পূর্ব্ব পুরুষ। উক্ত পুরুষোত্তম দত্ত আদিশূরের সভায় ধৃষ্টতা প্রকাশ করাতে পরবর্ত্তিকালে তদ্বংশীয়েরা অপর চারি শ্রেণীর কুলীন কায়স্থ অপেক্ষা নিম্নতর স্থান প্রাপ্ত হইয়া মধ্যল্য বা অর্দ্ধ কুলীন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা নবগুণ সম্পন্ন তাঁহারা আর্য্য, তদপেক্ষা হীনগুণ বিশিষ্টেরা মধ্যল্য (মধ্যম) এবং মধ্যল্য অপেক্ষা হীনগুণ সম্পন্ন কুলীন কায়স্থেরা মহাপাত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের কুলকর্ম্ম ছিল না তাঁহারা অচল সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। আদিশূরের যজ্ঞের হোতা বেণীসংহার প্রণেতা ভট্টনারায়ণ সভামধ্যে এই পঞ্চ কায়স্থের বিবরণ দিয়াদিলেন। মকরন্দ ঘোষ ভট্টনারায়ণের, দশরথ বসু দক্ষের, বিরাট গুহ শ্রীহর্ষের এবং কালিদাস মিত্র ছান্দড়ের শিষ্য ও সেবক বলিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বিনীতত্বের জন্য তাঁহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং তত্তদ্বংশীয় কায়স্থেরা শ্রেষ্ঠ কুলীন হইয়াছিলেন; কিন্তু পুরুষোত্তম দত্তের ব্যবহারে বিনয়ের অভাব সূচিত হইয়াছিল, এজন্য তদ্বংশীয়েরা মধ্যল্য বা মধ্যম কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চবিপ্র ও তৎসহচরগণের কুলবিবরণ এবং বাসস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্রাহ্মণ	গোত্র	বংশ	রাজদত্তগ্রাম	কায়স্থ	গোত্র	কুল
ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	বন্দ্য	পঞ্চকোটি	মকরন্দ	সৌকালিন	ঘোষ
শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	মুখটী	কঙ্কগ্রাম	বিরাট	কাশ্যপ	গুহ
দক্ষ	কাশ্যপ	চট্ট	কামকোটি	দশরথ (পুষণ)	গৌতম	বসু
ছান্দড়	বাৎস্য	ঘোষাল কাঞ্জিলাল পূতিতুণ্ড	হরিকোটি	পুরোষোত্তম	মৌদ্‌গল্য	দত্ত
বেদগর্ভ	সাবর্ণ	গাঙ্গুলী	বটগ্রাম	কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র

মহারাজ আদিশূর আর্য্যজাতির গৌরব জানিতেন, তিনি উহা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং এই গৌরব কিসে রক্ষা হয় তাহার উপায় বিধানও তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। আদিশূরের মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁহার বংশের লোপ হয়। তাঁহার মৃত্যুর এক শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল পরে তদীয় দৌহিত্র কুলের ৯ম পুরুষে জাত মহারাজ বল্লালসেনকে আমরা বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

আনন্দগিরি—বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি শঙ্করদিগ্বিজয়নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এতদ্ব্যতীত উপনিষদের ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করেন।

আনন্দচার্লু—(P. Ananda Charlu Rai-Bhadur, C. I. E.)—মান্দ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা উকীল এবং বড় লাট সাহেবের কাউন্সিলের বিখ্যাত বে-সরকারী সভ্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কিঞ্চিদধিক ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বোপকূলে ইঁহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল। তিনি মান্দ্রাজ সহরে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায়ই বাস করিতেন। ওকালতিতে তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও তেলুগু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; বঙ্গে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিদ্যাবিনোদ উপাধিতে ভূষিত করেন। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" ও "সি. আই. ই" উপাধি দান করিয়া ইঁহার গুণের সমাদর করেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গিয়া নাইড়, রঙ্গানন্দ মুদালিয়ার, রামস্বামী মুদালিয়ার, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি যে কয়জন লোক দাক্ষিণাত্যে উদ্ভূত হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, আনন্দ চার্লু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে একাধিকবার স্বীয় সভার মেম্বর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার করেন। তিনি মন্দ্রাজে "মহাজন সভা" স্থাপন করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করেন। তিনি মন্দ্রাজ "মিউনিসিপালিটীর" সদস্য হইয়া নগরের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন এবং "পিপ্‌লস মেগাজিন" নামক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত ও সম্পাদিত করিয়া জনসাধারণের প্রভূত হিতসাধন করেন। তিনি আজীবন ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে নাগপুরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সভাপতি করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি হেলেনা কাব্য লিখিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। হেলেনা কাব্য ব্যতীত তিনি মিত্রপাঠ, কবিতাসার, পদ্যসার ও ভারতমঙ্গল নামে আরও ৪ খানি ক্ষুদ্রকাব্য লিখেন। পিতার নাম বঙ্গচন্দ্র মিত্র; মাতা কালীতারা। ১৩১০ সনে (ইং ১৯০৩ খৃঃ) পৌষ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

আনন্দমোহন বসু—বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন। ইনি ১৭৬৯ শকে (ইং ১৮৪৭ খৃঃ) ময়মনসিংহ জিলায় জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পদ্মলোচন বসু, মাতা উমাকিশোরী। ইনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র। আনন্দমোহন যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক তখন তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। পিতা সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন; মাতা সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়া আনন্দমোহনের অধ্যয়নের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার মাতা অতি পুণ্যবতী রমণী ছিলেন; সম্পত্তি সম্পর্কীয় দৈনন্দিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি যে সময়টুকু পাইতেন, তাহা ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। আনন্দমোহন তাঁহার মাতার হৃদয়ের সমস্ত গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি ৬ বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন; ৯ বৎসর বয়সে মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৭৮৪ শকে (ইং ১৮৬২ খৃঃ) এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৮৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৭৮৬ শকে (ইং ১৮৬৪ খৃঃ) ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্‌ এ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বপ্রথম হন এবং ১৭৮৯ শকে (ইং ১৮৬৭ খৃঃ) তিনি বি. এ.

পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। তিনি এই পরীক্ষায় গণিতে এত অধিক নম্বর পান, যে তাহার উত্তরের কাগজ দেখিয়া পরীক্ষক সাহেবগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর জুলাই মাসে তিনি বিবাহ করেন। ১৭৯০ শকে (ইং ১৮৬৮ খৃঃ) তিনি এম্, এ, পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথমস্থান লাভ করেন; ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। চরিত্র ও বিদ্যাবত্তায় তিনি কলেজের অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফ সাহেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই অধ্যাপকপদ গ্রহণের সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর ছিল; এই পদে থাকিয়াই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া উক্ত বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তির টাকা লইয়া তিনি ১৭৯২ শকে (ইং ১৮৭০ খৃঃ) বিলাত গমন করেন এবং ১৭৯৬ শকে (ইং ১৮৭৪ খৃঃ) কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিতের পরীক্ষায় ৯ম স্থান প্রাপ্ত হইয়া রেঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এই গৌরবজনক উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এই পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। বিলাতের অধ্যাপকগণ তাঁহার গণিতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৭৯৬ শকে (ইং ১৮৭৪ খৃঃ) তিনি বিলাতের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৭৯১ শকে (ইং ১৮৬৯ খৃঃ) ৬ই ভাদ্র তিনি ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অপর কয়েকজন যুবকের সহিত স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আনন্দমোহন ধর্ম্মগত প্রাণ ছিলেন; ভক্তি ও বিনয় তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। লেখাপড়ায় উন্নতি তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষের তুলনায় সামান্য। তিনি সংযমী ও অকৃত্রিম স্বদেশসেবক বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের নিকট পরিচিত, আদৃত ও সম্মানিত। এমন বিনয়ী, এমন শিষ্ট, এমন সাধুলোক অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। ১৮২০ শকে (ইং ১৮৯৮ খৃঃ) যখন তিনি শেষবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন দেশীয় লোক তাঁহাকে কলিকাতা টাউনহলে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দনপত্রের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া তিনি হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হন। এই তাঁহার সাংঘাতিক ব্যাধির প্রথম সূত্রপাত। তিনি জনক জননীর পরম ভক্ত সন্তান, সন্তানগণের নিকট স্নেহবান্ পিতা এবং জন্মভূমির একান্ত অনুরক্ত সেবক। স্বদেশের উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় না করিলে তিনি লক্ষাধিক টাকা সঞ্চিত করিয়া একজন সম্পত্তিশালী লোক হইতে পারিতেন। ১৮২০ শকে (ইং ১৮৯৮ খৃঃ) তিনি মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হন। এই সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ৬১৪ জন প্রতিনিধি সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুব্বারাও পাণ্টলু অভ্যর্থনা সভার সভাপতিরূপে সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে সসম্মানে গ্রহণপূর্ব্বক আপ্যায়িত করেন। আনন্দমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে দুইবার ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। গুণগ্রাহী লর্ড রিপণ তাঁহাকে শিক্ষা কমিশনে ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচন করেন। নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি, স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের সহিত মিলিত হইয়া বালীগঞ্জে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইঁহারা উভয়ে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করিতেন। এই বিদ্যালয় কিছুকাল পরে বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে বেথুন স্কুলটীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইলে, এই স্কুলটীকে বেথুন কলেজে পরিণত করেন। ১৮০১ শকে (ইং ১৮৭৯ খৃঃ) আনন্দমোহন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণের সহিত মিলিত হইয়া সিটিস্কুল স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে এই স্কুলটীকে কলেজে উন্নীত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই সিটি স্কুলের প্রথম শিক্ষক, শিবনাথ প্রথম সম্পাদক ও আনন্দমোহন ইহার প্রধান পরিপোষক হন। কিয়ৎকাল পরে সুরেন্দ্র ও শিবনাথ এই কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করেন; আনন্দমোহন আজীবন ইহার পশ্চাতে রহিয়াছিলেন; তিনি মৃত্যুর অল্প কাল পূর্ব্বে কলেজের কর্ত্তৃত্ব কতিপয় ট্রষ্টির উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ১৮২৭ শকের (ইং ১৯০৫ খৃঃ) মাঘমাস হইতে তিনি উৎকট বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। উক্ত সনের ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) তারিখে অখণ্ড বঙ্গভবনের (Federation Hall) ভিত্তিস্থাপন করেন; এই সভাতে রোগশয্যা হইতে তাঁহাকে অতিকষ্টে

উঠাইয়া আনা হইয়াছিল। ১৮২৮ শকের ২রা ভাদ্র (ইং ১৯০৬ খৃঃ ২০শে আগষ্ট) অপরাহ্ণ ৬½ ঘটিকার সময় এই কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হয় ; আনন্দমোহনের অমর আত্মা অমরধামে চলিয়া যায়।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন—ইনি ১৭৫১ শকে (ইং ১৮২৯ খ্রীঃ) ৭ই আশ্বিন আসামের অন্তর্গত গৌহাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শিখিবার জন্য কলিকাতা গমন করেন এবং তথায় "হিন্দু কলেজে" ভর্ত্তি হন। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি উক্ত ভাষাদ্বয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি কিছুকাল গৌহাটীতে সদর আমীনের কার্য্য করিয়া নগাঁও জিলার এসিষ্টাণ্ট কমিশনরের পদ লাভ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে উক্ত জেলার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। পূর্ব্বে আসামের আফিস আদালতে বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল। ফুকন মহাশয় সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে আসামী ভাষা প্রচলিত করিতে যত্নবান্ হন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। আসাম গবর্ণমেণ্ট আসামের স্কুলকলেজ ও আদালতে আসামী ভাষা প্রচলনের আদেশ দেন। ফুকন মহাশয় আসামের স্কুলপাঠ্য বহু পুস্তক লিখেন, তন্মধ্যে অসমীয়া লরার মিত্র (Asamiya Lorar mitra) নামকগ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইংরেজী ভাষায় ফুকন মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার ছিল এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি গবর্ণমেণ্টকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মিল্‌স্ রিপোর্টে (Mills Report on Assam, 1854 A. D.) তাঁহার রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা, শিক্ষাবিষয়ে মতামত ও ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদানীন্তন কমিশনার কর্ণেল হপকিন্‌সন্ ফুকন মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন এবং আসামের আনন্দরাম একই শ্রেণীর লোক।"

ফুকন মহাশয় রাজা রামমোহনের অল্প পরবর্ত্তী লোক। অতি অল্পবয়সে অর্থাৎ ৩০ বৎসর পূর্ণ না হইতেই, এই প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন। বর্ত্তমান সময়ে আসামে যে সেট্‌ল্‌মেণ্টের নিয়মাদি চলিতেছে তাহার ভিত্তি ফুকন মহাশয়ই স্থাপন করিয়াছিলেন।

আনন্দ রাম বড়ুয়া—(I. C. S, Bar-at-Law) এই প্রতিভাশালী স্বনামধন্য পুরুষ আসামের বিখ্যাত জমিদার বড়ুয়াবংশীয় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গর্গ রায় বড়ুয়া, জননী দুর্লভেশ্বরী। আনন্দরাম ১৭৭২ শকে (ইং ১৮৫০খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠমাসে উত্তর গৌহাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং গৌহাটী গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি এ পাশ করিয়া "ষ্টেট্ স্কলারশিপ" ও "গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি" লইয়া বিলাতে গমন করেন। তথায় তিন বৎসর কাল থাকিয়া সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ভারতবর্ষে ৫ম সিভিলিয়ান। তিনি সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ২য় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মাননীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত, বিহারী লাল গুপ্ত, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতি মহাত্মগণ বিলাতে বড়ুয়া মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি ফরাসী ভাষা এমন সুন্দররূপে শিখিয়াছিলেন, যে তদ্দেশবাসীরা তাঁহার বাক্যালাপ শুনিয়া চমৎকৃত হইত। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে একটি বিশেষ পরীক্ষা দেন এবং এই পরীক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া দুই হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। তিনি আসামের অন্তর্গত শিবসাগরের এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন এবং কিয়ৎকাল পরে বঙ্গদেশে বদলী হন। বঙ্গদেশে তিনি নানা স্থানে জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া অবশেষে নোয়াখালী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। উচ্চ রাজকীয় পদে আসীন থাকিয়াও তিনি সাহিত্যচর্চ্চা হইতে বিরত হন নাই। তিনি বহুপুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে "ইংরেজী হইতে সংস্কৃত অভিধান" খানি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণ, মহাবীর চরিতের জানকীরাম ভাষ্য, অমর কোষের টীকা, ভবভূতি নামক ইংরেজী গ্রন্থ, ধাতুরূপ প্রভৃতি তাঁহাকে অমরকীর্ত্তির অধিকারী করিয়াছে। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে ধাতুরূপ, শব্দরূপ,

অলঙ্কার প্রভৃতি ১২টি ভাগে বিভক্ত করিয়া একখানা ব্যাকরণ লিখিতে সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু দুরন্তকাল তাঁহাকে অকালে পৃথিবী হইতে অবসৃত করিল। প্রায় দুই বৎসর পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইয়া চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দেহত্যাগ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। বিবাহের প্রস্তাব উল্লিখিত হইলেই তিনি স্বীয় পুস্তকাগারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন "দেখুন আমার ভার্য্যা দেখুন, আমার বিবাহের প্রয়োজন কি?"

আবুল্ ফজল্—ইঁহার পূর্ণনাম সেখ আবুল্ ফজল্ বিন্ মুবারক। "বিন্ মুবারক" ইহার অর্থ মুবারকের পুত্র। অনেক পারস্যদেশবাসী গ্রন্থকার বোম্বাইবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় স্বীয় নামের পর পিতার নাম যোজনা করিয়া থাকেন। ইঁহার জেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজি সুকবি ছিলেন এবং সম্রাট আকবরের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। আবুল্ ফজল্ ১৪১৩ শকে (ইং ১৪৯১খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন শেষ করেন। ফৈজি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সহোদরকে অনায়াসে সম্রাটের নিকট পরিচিত করিতে পারিতেন, কিন্তু আবুল্ ফজলের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি এরূপ সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন নাই। অবিলম্বেই আবুল্ ফজলের বিদ্যার খ্যাতি ও যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আকবর আবুল্ ফজলকে সভায় আহ্বান করিলেন; এই সময়ে আবুল্ ফজলের বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। গুণগ্রাহী আকবর প্রথমে তাঁহাকে সেনা বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন, পরে কালক্রমে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই শেষোক্ত পদে তিনি ২৮ বৎসর প্রতিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া সম্রাটের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। আবুল্ ফজলের মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্রাট তাঁহার প্রতি স্নিগ্ধ-বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। যুবরাজ সলিমের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আবুল্ ফজলের কুমন্ত্রণাতেই সম্রাটের দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়াছিল। কুমার সলিমের চক্রান্তে যখন ১৫২৫ শকে (ইং ১৬০৩ খৃঃ) আবুল্ ফজল্ হত হন, তখন হইতেই আকবরের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। আবুল্ ফজলের হত্যার বিষয় যখন আকবরের কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি দুই দিন দুই রাত্রি আহার পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে মুরাদ ও দানিয়াল নামক কুমারদ্বয় অতিরিক্ত পান-দোষে অকালে কাল-কবলে পতিত হন। পুত্রদ্বয়ের অকাল-মৃত্যুতে ও সলিমের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া আকবর ১৫২৭ শকে (ইং ১৬০৫ খৃঃ) দেহ ত্যাগ করেন। আবুল্ ফজলের উদার ধর্ম্মমত সম্রাট আকবরে সংক্রান্ত হইয়াছিল; ইহাতে অনেক গোঁড়া মুসলমান আবুল্ ফজলের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। তিনি আকবরের নিকট যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সুখ-সৌভাগ্যের সহিত দিন কাটাইতে ছিলেন, তাহা অনেক অসূয়াপরায়ণ মুসলমানের নিকট ভাল লাগে নাই। ১৫০৭ শকে (ইং ১৫৮৫ খৃঃ) আবুল্ ফজল্ একহাজারী মনসবদার ও দিল্লী প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৫১৪ শকে (ইং ১৫৯২ খৃঃ) তিনি দুই হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হন। এই সময় হইতেই তিনি শ্রেষ্ঠ ওমরাহদের সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। ১৫১৫ শকের ১৮ই ভাদ্র (ইং ১৫৯৩ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর) ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ইহার দুই বৎসর পর ১৫১৭ শকে (ইং ১৫৯৫ খ্রীঃ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ফৈজি পরলোক গমন করেন। ফৈজকে সম্রাট এত ভালবাসিতেন, যে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গভীর রাত্রিতে সম্রাট তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন এবং আবুল্ ফজলকে প্রবোধ দিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর আবুল্ ফজল আড়াই হাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে কুমার মুরাদের সাহায্যার্থ যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কুমার মুরাদের মৃত্যু হয়। তিনি দাক্ষিণাত্যে নৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়া বিজিত রাজ্য-রক্ষণের সুবন্দোবস্ত করেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার কৃতকার্য্যতার দরুণ সম্রাট তাঁহাকে ৪ হাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমনের সময়, সেলিমের উত্তেজনায় বুন্দেলখণ্ডের অধিপতি বীরসিংহ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন এবং তাঁহার ছিন্নমুণ্ড সলিমের নিকট প্রেরণ করেন। সলিম ঐ মুণ্ড অযোগ্যস্থানে নিক্ষেপ করিয়া নীচাশয়তার পরিচয় দেন। আবুল ফজলের সাত ভাই ও চারি ভগিনী ছিল। নিরামিষ ভোজন, একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপবাস ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁহার ও সম্রাট

আকবরের চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন ছিল। আবুল ফজলের হত্যার পর বীরসিংহ আকবরের সৈন্যকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জঙ্গলে লুক্কায়িত ছিলেন; সম্রাটের মৃত্যুর পর সলিম তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সলিম সম্রাট হইয়া জাহাঁগীর নাম ধারণ করেন এবং আবুল ফজলের মৃত্যুর অনুশোচনাবশতঃ তদীয় পুত্র আবদর রহমান আফজল খাঁকে বেহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন।

আব্দুলগণি—(খাজা, নবাব বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই)—এই দানশৌণ্ড ধার্ম্মিক নবাব বাহাদুর ১৭৩৫ শকের ১৫ই শ্রাবণ (ইং ১৮১৩ খৃঃ ৩০শে জুলাই; বঙ্গাব্দ ১২২০ সনে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম খাজা আলিমুল্লা। খাজা আলিমুল্লা সাহেব সামান্য ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ মৌলবী আবদুল্লা বহু বৎসর হইল কাশ্মীর হইতে ঢাকায় আসিয়া বসতি করেন। ১৮৪২ খৃঃ ১লা সেপ্টম্বর নবাব সাহেব বিবাহ করেন। বিবাহের চারি বৎসর পরে ইঁহার পুল নবাব আসানুল্লা সাহেব ১৮৪৬ খৃঃ ২২শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। দানশীলতার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে নানা উপাধিতে ভূষিত করেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খৃঃ সি. এস্ আই উপাধি দেন। ১৮৭৫ খৃঃ ইনি ব্যক্তিগত ভাবে "নবাব" উপাধি প্রাপ্ত হন; ১৮৭৭ খৃঃ এই "নবাব" উপাধি উত্তরাধিকারগত ভাবে লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কে. সি. এস. আই উপাধিতে ভূমিত করেন এবং ১৮৯১ খৃঃ তিনি নবাব বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। এই দানশৌণ্ড নবাব ৮৩ বর্ষ বয়সে ১৮১৮ শকের [illegible]ই ভাদ্র সোমবার (ইং ১৮৯৬ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট, বঙ্গাব্দ ১৩০৩ সনে) স্বর্গে গমন করেন। ইনি ২১৫ স্থানে দান করেন; এই সমুদায় স্থানে মোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় আট লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত গোপনে যে কত টাকা দান করিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। তিনি প্রত্যহ ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা গরীবদিগকে দান করিতেন। অশ্বারোহণে নগরে বাহির হইবার সময় তিনি পকেট হইতে সিকি, দুয়ানি পথের দুই পার্শ্বে বৃষ্টি করিয়া যাইতেন। তিনি গৃহনির্ম্মাণ, পুত্র কন্যাগণের বিবাহ ইত্যাদি বাবদে দেওয়ান ৺চন্দ্রকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয়কে ২৫ হাজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দপ্রসাদ দাস মহাশয়কে অন্যূন ১৩ হাজার টাকা দান করেন। ইঁহার অবদান কর্ম্মের এক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল; ইহা হইতে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণতার বিষয় উপলব্ধ হইবে।

১। ঢাকায় জলের কলের প্রতিষ্ঠার জন্য	২০০০০৲
২। মক্কাতে বিখ্যাত হারুনুল-রসিদের পত্নীর নামে যে "নওহরে জোবায়দা" নামক খাল আছে, তাহার সংস্কারের জন্য	৪০০০০৲
৩। ১৮৬৭ খৃঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ	১০০০০৲
৪। ১৮৭৪ খৃঃ দুর্ভিক্ষে দান	১০০০০৲
৫। ১৮৮৫ খৃঃ জলপ্লাবনে	১০০০০৲
৬। মানিকজীর হস্তে প্রদত্ত নানাবিধ দানকর্ম্মে	৩৮০০০৲
৭। বুড়ীগঙ্গা নদীর ধারে বকলণ্ড রাস্তা ও ঘাট	৩৫০০০৲
৮। মিটফোর্ড হাসপাতালে স্ত্রীলোকদের জন্য ওয়ার্ড	২৫২৪৫৲
৯। ১৮৭৭ খৃঃ রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে আহত ও পীড়িত সৈন্যের জন্য	২০০০০৲
১০। কশ্মীরের ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যকল্পে	১৫০০০৲
১১। লেডি ডফরিন ফণ্ড	১০০০০৲
১২। ১৮৬৪ খৃঃ ঝড়ে প্রপীড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে	৫০০০৲
১৩। ১৮৬৭ খৃঃ ঝড়ে	৫০০০৲
১৪। বরিশাল সহরের উন্নতিকল্পে ১৮৭৭ খৃঃ	৫০০০৲
১৫। ঐ হাসপাতালের জন্য ১৮৭১ খৃঃ	৪০০০
১৬। ঐ দুর্ভিক্ষে ১৮৭৪ খৃঃ	৫০০০৲
১৭। ঐ ঝড়ে ১৮৭৬ খৃঃ	৫০০০৲
১৮। ঐ জিলাস্কুল ১৮৮০ খৃঃ	২০০০৲
১৯ ডিউক অব এডিনবরার ভারতে আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য	১২০০০৲

২০।	কলিকাতা আলিপুরে জু-বাগান	১১৩০০৲	৪৫।	আয়র্লণ্ড-ডবলিনের মেয়রের হস্তে দুর্ভিক্ষ বাবদ	৩০৯০৲
২১।	ঐ সর্পের ঘর নির্ম্মাণ	২০০০৲	৪৬।	ঢাকা ক্লাবঘরে পাঠগৃহ নির্ম্মাণ	৪০০০৲
২২।	কুমিল্লা রামচন্দ্রপুরে মসজিদ ও ঘাট	১০০০০	৪৭।	পারস্যে দুর্ভিক্ষবাবদ দান	৩০০০৲
২৩।	ঢাকার টর্ণেডো পীড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে	১০০০০৲	৪৮।	বুলগেরিয়ায় দুর্ভিক্ষে দান	৩০০০৲
২৪।	কুমিল্লা সহরে আলো দিবার জন্য	৫০০০৲	৪৯।	কুমিল্লা হাসপাতালে স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ড	৩০০০৲
২৫।	চারিবারে ১৫৫ জন লোককে মক্কা-তীর্থে প্রেরণ	৩৩৮০০৲	৫০।	ইটালীর ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্য	৪১০০৲
২৬।	একজন হিন্দু জমিদার মহিলার ঋণের টাকা মাপ	১০৯৪৪৲	৫১।	আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষবাবদ ডচেচ্ অব মার্লবারোর হস্তে	৩০৯৯৲
২৭।	লালবাগের মসজিদে	৩০০০০৲	৫২।	কলিকাতায় পানীয় জলের জন্য ফোয়ারা	১০০০৲
২৮।	ডফরিন হাসপাতাল	৩৫০০৲	৫৩।	১৮০৩ খৃঃ সুন্দা-প্রণালীতে ভূমিকম্প পীড়িত লোকদের জন্য	৩০০০৲
২৯।	রিপণ-বৃত্তি	৩০০০৲	৫৪।	১৮৯৭ খৃঃ তুরস্কের দুর্ভিক্ষ বাবদ	১০০০৲
৩০।	জুবিলি স্মরণার্থ	৫০০০৲	৫৫।	ময়মনসিংহ-আটিয়া পরগণার প্রজাগণের উপকারার্থ	১০০০০৲
৩১।	কাবুল-যুদ্ধে প্রপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে	১০০০৲	৫৬।	ইটালীর ওলাউঠা-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ	২০০০৲
৩২।	লর্ড মেওর স্মৃতিরক্ষার্থ	১০০০৲	৫৭।	যুবরাজের আগমনোপলক্ষে দিল্লীর ঘোড়দৌড় বাবদ	২০০০৲
৩৩।	খাজে আবদুল হামিদের মস্‌জিদে দান	৪০০৲	৫৮।	আমেদাবাদে দুর্ভিক্ষে সাহায্য	১০০০৲
৩৪।	সার ষ্টুয়ার্ট বেলির স্মৃতিরক্ষা	২০০০৲	৫৯।	বীরভূমের দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যকল্পে	১০০০৲
৩৫।	ইডেন সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির জন্য	১০০০৲	৬০।	পাবলিক স্বাস্থ্যসমিতি	৩০০০৲
৩৬।	ডফরিনের স্মৃতিরক্ষা	২০০০৲	৬১।	বৰ্দ্ধমানে দুর্ভিক্ষ ১৮৮৫ খৃঃ	১০০০৲
৩৭।	মান্দ্রাজে ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল	২০০০৲	৬২।	বৰ্দ্ধমানের পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ ১৮৭২ খৃঃ	২৩০০৲
৩৮।	কুমিল্লায় একটী মুসলমান মহিলাকে প্রদত্ত	৬৪৪০৲	৬৩।	ঐ লুইস্ সাহেবের হস্তে প্রদত্ত	২০০০৲
৩৯।	নারায়ণগঞ্জ হাসপাতাল	২০০০৲	৬৪।	ফরাসী-জর্ম্মণ যুদ্ধে আহত লোকদের সাহায্যার্থ	৫০০০৲
৪০।	সাহা আলীর দরগায় দান	২৫০০৲			
৪১।	বম্বে-পুণাতে দুর্ভিক্ষে দান	১০০০৲			
৪২।	লেঙ্কেসায়রের দুর্ভিক্ষে দান	৩০০০৲			
৪৩।	কোন দুর্ভাগ্য পীড়িত রাজাকে দান	৫০০০৲			
৪৪।	রাজকন্যা এলিসের স্মরণার্থ	২০০০৲			

এক সহস্র মুদ্রার নিম্নে দান সংখ্যা বহু।

টাঙ্গাইলে নবাব সরকারের একজন মোক্তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দয়ালু নবাব আব্দুল গণি ইহা অবগত হইয়া উক্ত পুত্রের সমস্ত শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। এই পুত্র এখন একজন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

আব্দুল লতিফ—(নবাব সি. আই. ই)—ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী রাজাপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ইনি ১৭৪০ শকে চৈত্র মাসে (ইং ১৮২৮ খৃঃ মার্চ্চ মাসে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কলিকাতা সদর

দেওয়ানী আদালতের উকিল ছিলেন। ইনি কলিকাতা মাদ্রাসার কয়েক বৎসর ইংরেজী, উর্দ্দু ও পার্শী শিক্ষা করেন। তৎপর মাদ্রাসা পরিত্যাগ করিয়া ১৭৬৮ শকে (ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে) সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। ১৭৭১ শকে (ইং ১৮৪৯ খৃঃ) ইনি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়। আলিপুর, সিয়ালদহ, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৮৩ শকে (ইং ১৮৬১ খৃঃ) তিনি ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন ; ইহার পর ১৮৯২ শকে (ইং ১৮৭০ খৃঃ) পুনরায় উক্ত সভার সভ্য নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কাজ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. এবং নবাব বাহাদুর উপাধি দান করেন। ১৮০৬ শকে (ইং ১৮৮৪ খৃঃ) ইনি আরো একবার ছোট লাট সাহেবের সভার সভ্য হন। অতঃপর সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ৩৩ বৎসর সরকারী চাকরী করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট পদে প্রতিনিধি ছিলেন। ১৮০৮ শকে (ইং ১৮৮৬ খৃঃ) তিনি ভূপাল রাজ্যের মন্ত্রী নিযুক্ত হন ; এই রাজ্যে নানা বিষয়ে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। সর্ব্বপ্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে তাহার উৎসাহ দেখা যাইত। তিনি মুসলমান সাহিত্যচর্চ্চাসমিতি স্থাপন করেন। ১৮১৫ শকে (ইং ১৮৯৩ খৃঃ) তিনি পরলোক গমন করেন ; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। সচ্চরিত্রতা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

আর্য্যভট্ট—বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ইঁহার প্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থের নাম আর্য্যসিদ্ধান্ত। ইনি কুসুমপুর নামক স্থানে ৩৯৭ শকে (ইং ৪৭৫ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভারতবর্ষে সৌরকেন্দ্রিক মত প্রবর্ত্তন করেন ; ইনি প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সৌরজগতে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইনি একখানি বীজগণিতও প্রণয়ন করিয়াছেন।

আলীবর্দ্দি খাঁ (নবাব)—১৭৪১ খ্রীঃ হইতে ১৭৫৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তখন মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না; তিন কন্যা ছিল। এই তিন কন্যার সহিত তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটিবেগম ঢাকার নবাব নোয়াজেস মোহাম্মদের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। মধ্যমা কন্যার গর্ভজাত পুত্র শওকত জঙ্গ। শওকত জঙ্গের পিতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁ পুর্ণিয়ার নবাব ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যা আমেনাবেগম বিখ্যাত সিরাজদ্দৌলার জননী। সিরাজদ্দৌলার পিতা জইন উদ্দিন পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সিরাজের কনিষ্ঠ এক ভ্রাতা ছিল। তাঁহাকে নিঃসন্তান ঘেসেটিবেগম পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এই পোষ্যপুত্র নবাব আলিবর্দ্দির জীবদ্দশাতেই এক পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘেসেটিবেগমের মন্ত্রী মহারাজ রাজবল্লভের ইচ্ছা ছিল, যে এই পোষ্যপুত্র-তনয়কে নবাব আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পর বাঙ্গলার নবাব করেন। কিন্তু উক্ত নবাব মৃত্যুর প্রাক্কালে দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাওয়াতে মহারাজ রাজবল্লভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। (জানকীরাম দেখ)।

আলীবর্দ্দি তুর্কবংশীয় ছিলেন। তিনি বাঙ্গলার দেওয়ান মুর্শিদ কুলিখাঁর জামাতা উড়িষ্যার নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিনের অনুগ্রহে উড়িষ্যার নবাব সরকারে মাসিক এক শত টাকা বেতনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত হন ; পরে স্বীয় কার্য্যকুশলতায় ও বুদ্ধিমত্তায় এক বিভাগের ফৌজদারের কর্ম্মে উন্নীত হন। মুর্শিদ কুলিখাঁর মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদের নবাব হন। মুর্শিদ কুলিখাঁপ্রবর্ত্তিত নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত নবাব সুজাউদ্দিনের সময় পাকা হয়। সুজাউদ্দিন বাঙ্গলার নবাব হইয়া পুত্র সরফরাজ খাঁকে দেওয়ানী পদ দেন। অতঃপর বেহারের শাসন কর্ত্তার মৃত্যু হইলে সরফরাজ খাঁকে ঐ পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু সরফরাজ খাঁর জননী তাঁহাকে দূরদেশে পাঠাইতে ইচ্ছা না করায়, নবাব সুজাউদ্দিনের অনুগ্রহলালিত আলীবর্দ্দি খাঁকেই উক্ত পদ দেওয়া হয়। আলীবর্দ্দি বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া বঙ্গের দিকে সলোভ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অল্পকাল নবাবী করিয়া সুজাউদ্দিন পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলার নবাবী পদে আসীন হন। এই সময়ে সরফরাজকে পদচ্যুত করিবার জন্য বাঙ্গলায় এক ষড়যন্ত্র হয়। ষড়যন্ত্র-কারিগণ

আলীবর্দ্দিকে বাঙ্গলায় আমন্ত্রণ করেন। আলীবর্দ্দি সসৈন্যে বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরফরাজ খাঁ অগ্রসর হইয়া আলীবর্দ্দির সৈন্যের সম্মুখীন হইলে গিরিয়া নামক স্থানে উভয় সেনার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। আলীবর্দ্দি বাঙ্গলা অধিকার করেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে তিনি অচিরেই নবাবী সনন্দ লাভ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গলার নবাব হন।

আলীবর্দ্দি বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে তিনটি প্রধান ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। (১) উড়িষ্যার বিদ্রোহ, (২) বর্গীর হাঙ্গামা, (৩) আফগান জায়গীর দারগণের বিদ্রোহ। উড়িষ্যার বিদ্রোহে পরলোকগত নবাব সুজাউদ্দিনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খাঁ উড়িষ্যার জমিদারদিগের সহিত যোগ দেন। নবাব আলীবর্দ্দি ৫ হাজার সৈন্য লইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন এবং ২য় মুর্শিদ কুলিখাঁর সহিত সমবেত উড়িষ্যার রাজাদিগকে ও জমিদারবর্গকে পরাভূত করেন। উড়িষ্যা জয় করিয়া নবাব আলীবর্দ্দি মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে উড়িষ্যার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আসেন। এই সময়ে নাগপুরের মহারাষ্ট্র সেনার নায়ক ভাস্কররাম ওরফে ভাস্কর পণ্ডিত ৪০ হাজার সৈন্য লইয়া চৌথ আদায়ের জন্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। আলীবর্দ্দি মাত্র ৫ হাজার সৈন্য লইয়া দ্রুতগতিতে বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হন এবং বর্গীদের গতিরোধ করেন। বর্গীসেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বলিয়া পাঠাইলেন যে ১০ লক্ষ টাকা পাইলে তিনি বাঙ্গলায় উৎপাত না করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিবেন; কিন্তু আলীবর্দ্দি এই টাকা দিতে অসম্মত হইলেন। ঘোর যুদ্ধ হইল; বর্গীগণ নবাব সৈন্য বেষ্টন করিল; বহুকষ্টে নবাব বর্গীসৈন্য ভেদ করিয়া কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন। নবাবের সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদ হইতে সৈন্য আসিল। এদিকে বর্ষাকাল আগত দেখিয়া বর্গীগণ চিন্তিত হইল; তাহারা কাটোয়ায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করিল। বর্ষাপগমে ভাস্কর পণ্ডিত সসৈন্যে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে ভাস্কর পণ্ডিতের পরাজয় হয় (১৭৪২ খৃঃ)। তৎপর আফগান বিদ্রোহ। নবাব আলীবর্দ্দি কোন কারণে সমসের খাঁ ও সরদার খাঁ নামক দুইজন আফগান সরদারকে পদচ্যুত করেন। এই পদচ্যুত আফগান সরদারদ্বয় পাটনায় গমন করিয়া স্বীয় স্বীয় জায়গীরে বাস করিতে থাকেন। আলীবর্দ্দির কনিষ্ঠ জামাতা নবাব জইন উদ্দিন তখন পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি উক্ত আফগান সরদারদ্বয়কে স্ববশে আনিবার জন্য তাঁহাদিগকে স্বীয় দরবারে আমন্ত্রণ করেন। সরদারদ্বয় নবাব জইন উদ্দিনকে দরবার গৃহে অভিবাদন করিবার ছলে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া নিহত করেন এবং পাটনা অধিকার করেন। জইন উদ্দিনের মৃত্যুর পর তদীয় পিতা ও পত্নী (সিরাজ-জননী) আমেনাবেগম আবগান শিবিরে অবরুদ্ধ হন। কারাগারে জইন উদ্দিনের পিতা প্রাণত্যাগ করেন। কন্যাকে উদ্ধার করিতে ও জামাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে নবাব আলীবর্দ্দি যুদ্ধযাত্রা করেন। পাটনার নিকটবর্ত্তী বার নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আফগান সরদারদ্বয় পরাজিত ও নিহত হন।

আসানুল্লা (খাজা, নবাব, কে, সি, আই, ই)—ঢাকার বিখ্যাত দানশীল নবাব। ইনি খাজা সার আব্দুল গণি কে, সি, এস, আই নবাব বাহাদুরের পুত্র। নবাব আসানুল্লা ১৭৬৮ শকে ৪ঠা ভাদ্র (ইং ১৮৪৬ খৃঃ ২২শে আগষ্ট) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পৈত্রিক ভূসম্পত্তির ন্যায় পিতার গুণাবলীরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। পিতা যেমন দান-শৌণ্ডতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, পুত্রও বদান্যতার জন্য তদনুরূপ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতা পুত্রের খ্যাতিতে আজ জননী বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। নবাব আসানুল্লা, দুর্ভাগ্যবশতঃ সাংসারিক জীবনে তত সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা হাফিজুল্লা খাঁ সাহেব সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ১৮৮৪খৃঃ জুলাই মাসে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। পত্নীবিয়োগের জন্য ও তাঁহাকে অশেষ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। নবাব আসানুল্লা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর (১৩০৮ বঙ্গাব্দ ১লা পৌষ) পরলোক গমন করেন। এই দান-শীল নবাব ঢাকায় বৈদ্যুতিক আলোক দান করিয়া নগরবাসীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বৈদ্যুতিক আলোকের জন্য নবাব সাহেব ৪,০০,০০০৲ টাকা দান করেন। গবর্ণমেণ্ট যে দিবস কলিকাতায় প্লেগের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা

করেন তৎপর দিবস (১৮৯৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে) পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নবাব সাহেব এক লক্ষ টাকা দান করেন, কিন্তু প্লেগের আক্রমণ না হওয়ায় এই টাকা ঢাকাসহরের উন্নতিকল্পে দেওয়া হইয়াছে। তিনি লেডি ডফারিন ফণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন এবং বহুসংখ্যক মুসলমানকে মক্কা-তীর্থে প্রেরণের জন্য আশী হাজার টাকা দান করেন। নবাব আসানুল্লা গৃহনির্ম্মাণ ও পুত্রকন্যাগণের বিবাহাদি বাবদ তদীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ৺ গোবিন্দ প্রসাদ দাস মহাশয়কে অন্যূন ১২ হাজার টাকা এবং দেওয়ান ৺ চন্দ্রকান্ত গাঙ্গুলীকে ও অপর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বহুসহস্র টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত উভয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে পাঁচশত টাকা মূল্যের ঘড়ি পুরস্কারস্বরূপ দান করিয়াছেন। এই দানশীল নবাবের অবদান কর্ম্মের এক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ঢাকা সহরে তাড়িতালোক বাবদ	৪০০০০০৲
*২। ঢাকা সহরবাসীদিগের স্বাস্থ্যেরদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সহরের উন্নতিকল্পে দেওয়া হয়	১০০০০০৲
৩। ঢাকার ইমামবারা সংস্কার বাবদ	১০০০০০৲
৪। ডফারিন স্মরণার্থ তহবিল	৫০০০০৲
৫। ঢাকায় ভিক্টোরিয়া উদ্যান নির্ম্মাণ	১২০০০৲
৬। ঢাকার নিকটবর্ত্তী নদীসমূহের সংস্কার	১৫০০০৲
৭। ভিক্টোরিয়া স্ত্রী বিদ্যালয়	১০০০০৲
৮। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও ত্রিপুরা জিলাস্থ জমিদারীতে কূপ ও পুষ্করিণী খনন	৪০০০০৲
৯। ত্রিপুরা—চাঁদপুরে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ	৫০০০৲
১০। ঢাকা জিলার বেগুণবাড়ীর সন্নিহিত খাল সংস্কার	৮০০০৲
১১। রিপণ বৃত্তি	৮০০০৲
১২। বরিশালে সাহেবদের বিশ্রামগৃহ	৩৯০০৲
১৩। দুর্ভিক্ষে দান	[illegible]৲
১৪। ঢাকা নর্থব্রুক হল	২০০০৲
১৫। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল সংস্কার	২০০০৲
১৬। লর্ড এলগিনের আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য চাঁদপুরে টাউন হল নির্ম্মাণ	৫০০০৲
১৭। ঢাকা ঘোড়দৌড়ের মাঠের উন্নতিকল্পে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে দেওয়া হয়	১৬০০০৲
১৮। পাটুয়াখালী বেগম হাসপাতাল	৮০০০৲
১৯। কলিকাতা ইলিয়ট মাদ্রাসা	১০০০০৲
২০। এলগিন টাউন হল	৫০০০৲
২১। ঢাকাইডেন ফিমেল স্কুল	১০০০৲
২২। সাময়িক দান	১৭৫৬৫৲
২৩। আলিগড় কলেজ	২০০০৲
২৪। আলিগড় কার্জ্জন হাসপাতাল	১০০০৲
২৫। লালবাগের মসজিদ মেরামত	৩০০০৲
২৬। চট্টগ্রামের ঝড়ের জন্য	১০০০৲
[illegible]	[illegible]৲

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সংখ্যাই নাই। সর্ব্বসমেত দানের পরিমাণ এগার লক্ষেরও অধিক।

এই বিখ্যাত নবাব পিতা সার আবদুল গণি নবাব বাহাদুরের মৃত্যুর স্মরণার্থ ৫০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের একখানা তালুক খরিদ করিয়া ট্রাষ্টিগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই অর্থ ঢাকা নগরবাসী গরীব লোকদের উপকারার্থ ব্যয় করিবার জন্য অর্পিত হইয়াছে।

আহ্‌মদ নিজাম শাহ বাহ্‌রি—দাক্ষিণাত্যের অহ্‌মদ নগরের নিজামশাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম নরপতি। ইঁহার পিতা নিজাম-উল্-মুল্‌ক্‌বাহ্‌রি সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্ বাহ্‌মনির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি আহ্‌মদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার পুত্র বুর্‌হান নিজাম শাহ্ (১ম) আহ্‌মদ নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজবংশের নৃপতিগণ ১০৮ বৎসর কাল আহ্‌মদ নগরে রাজত্ব করেন। মালীক

* এই টাকা প্রথমে ঢাকায় প্লেগের আশঙ্কায় প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্লেগ ঢাকায় আইসে নাই।

আম্বর নামে একজন আবিসিনীয় দাস দাক্ষিণাত্যে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া এই রাজবংশের ধ্বংস সাধন করেন। (১৫৭৮ খৃঃ)। এই বংশের নৃপতিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহ্‌মদ নিজাম শাহ্‌—(১ম) ১৪৯০ খৃঃ; বুর্‌হান নিজাম শাহ্‌ ১৫০৮ খৃঃ; হোসেন নিজাম শাহ্‌ (১ম) ১৫৫৩ খৃঃ; মূর্ত্তজা নিজাম শাহ্‌ (১ম) ১৫৬৫ খৃঃ; মিরান হোসেন নিজাম শাহ্‌ ১৫৮৭ খৃঃ; ইসমাইল নিজাম শাহ্‌ ১৫৮৯ খৃঃ; বুর্‌হান নিজাম শাহ্‌ (২য়); ইব্রাহিম নিজাম শাহ্‌—১৫৯৪ খৃঃ; আহ্‌মদ নিজাম শাহ্‌ (২য়)—১৫৯৪ (ইনি শাহ্‌ তাহিরের পুত্র); বাহাদুর নিজাম শাহ্‌—১৫৯৫; মূর্ত্তজা নিজাম শাহ্‌ (২য়) ১৫৯৮।

ই

ইউসুফ আদিল শাহ্‌—ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজাপুরের আদিলশাহি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদাবাদের বাহ্‌মনি বংশের নৃপতি ২য় মোহম্মদ শাহের রাজসভার একজন সম্ভ্রান্ত সভ্য ছিলেন। সুলতান ২য় মোহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে ইউসুফ আদিল সপরিবারে আহ্‌-মদাবাদ হইতে প্রস্থান করেন এবং বিজাপুরে স্বীয় জমিদারীতে গমন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইনি ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ২১ বৎসর রাজত্বের পর ৭৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের বিখ্যাত হাস্যরসোদ্দীপক কবি। ইনি বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। বর্দ্ধমান জিলার গঙ্গাটিকরি নামক গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইঁহার পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। ইন্দ্রনাথ ১৭৭১ শকে (১৮৪৯ খৃঃ) ২রা জ্যৈষ্ঠ পাণ্ডুগ্রামে মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হন এবং ১৮৩২ শকে (১৯১১ খৃঃ) ৯ই চৈত্র নৈহাটীতে গঙ্গাতীরস্থ "পুলিনপুরী" নামক নিকেতনে দেহত্যাগ করেন। ইনি কলিকাতা ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছুকাল শিক্ষকতার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে পূর্ণিয়াতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। অনন্তর মুন্সেফী গ্রহণ করেন, কিন্তু এ কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দিনাজপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এখানেও সুবিধা না হওয়াতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন এবং কিয়ৎকাল পর এখান হইতে বর্দ্ধমানে চলিয়া যান। বর্দ্ধমানই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র ছিল। ক্রমাগত ১০ বৎসর কাল তিনি বিখ্যাত বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রাণ ছিলেন। এই পত্রিকায় "পঞ্চানন্দ" নামে যে শ্লেষ ও রসিকতাপূর্ণ লেখা বাহির হইতে তাহা ইন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত। তিনি কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ রচিত ভারতোদ্ধার, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম ও পাঁচুঠাকুর, তাঁহাকে বঙ্গীয় সুধী সমাজে অমর করিয়া রাখিবে। প্রসিদ্ধ হিতবাদী পত্রিকায় ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যাহা লিখিত হইয়াছিল নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল, ইহা হইতেই ইন্দ্রনাথের গুণগ্রাম ও শক্তি সামর্থ্য উপলব্ধ হইবে। "বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরের আর একটি দিব্য দীপ নিবিল, বঙ্গবাণীর পদ্মবনের আর একটি সোণার কমল শুকাইল। মাতৃভাষার সুধী সেবক, রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ লেখক, তেজস্বী ও মনস্বী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। তিনি গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে স্বজন, সুহৃৎ এবং গুণানুরাগী ভক্তমণ্ডলীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। সেই পরিহাসপটু ইন্দ্রনাথ,—বন্ধু ও শরণাগতবৎসল ইন্দ্রনাথ—সেই স্পষ্টভাষী ও প্রিয়ংবদ ইন্দ্রনাথ এতদিনে নামশেষ ও ভস্মশেষ হইলেন। যিনি প্রথম যৌবনে পরিহাসরসের তরল জ্যোৎস্না ছড়াইয়া বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন, যিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়া সুধী ও সজ্জনগণের তুষ্টি ও তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; যাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষের নির্ঝর ধারায় বাঙ্গালার সাহিত্য কানন স্নিগ্ধ সরস শ্যাম শোভায় বিভূষিত হইয়াছিল তিনি মহাকালের আহ্বানে লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। * *ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না। তাহার ন্যায় প্রতিভাশালী লেখক বাঙ্গালায় জন্মিতে পারে—জন্মিবেও। কিন্তু

তাঁহার মত সমাজতত্ত্বদর্শী পুরুষকে আমরা বুঝি আর পাইব না। তিনি বাঙ্গালা দেশকে জানিতেন, বাঙ্গালীকে চিনিতেন. বাঙ্গালীর রোগ ধরিতে পারিতেন এবং "রোজা" সাজিয়া রোগের মত ঔষধও দিতে পারিতেন। তিনি অজস্র ব্যঙ্গ কবিতা ও ছড়া রচনা করিয়া বিলতী বাতিকগ্রস্ত বাবুদিগকে যে ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের রোগ সারিয়া গিয়াছে সমাজ দেহের অনেক ব্যাধি ব্রণ ভাল হইয়াছে। * * ইন্দ্রনাথ কেবল রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ লইয়াই ছিলেন না, রাজনীতির আলোচনাও তিনি করিয়াছিলেন, দেশের সুখ দুঃখের ভাবনা ভাবিয়া নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মত দেশের দুঃখ নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।"

ঈ

ঈশাখাঁ।—দ্বাদশ ভৌমিকের (বার ভূঁইয়ার) অন্যতম। ইনিই সুবর্ণগ্রামের প্রাধান্যের হেতু। সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব কালে কালিদাস গজদানী নামক জনৈক অযোধ্যাবাসী বিষয়কার্য্য উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। কথিত আছে, প্রতিদিন সুবর্ণহস্তী দান করিতেন বলিয়া তাঁহার নামের সহিত "গজদানী" উপাধি যুক্ত হয়। যাহা হউক, এদেশে আগমন করিবার পর তিনি কোনও কারণে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খাঁ নামে অভিহিত হন। কেহ কেহ বলেন, কালিদাস গজদানীর পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ও সুলেমান খাঁ নাম ধারণ করেন। ভৌমিক ঈশাখাঁ উক্ত সুলেমান খাঁর পুত্র। পূর্ব্ববঙ্গ শাসনের জন্য তখন প্রতি পরগণায় এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইত। স্বকীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে ঈশাখাঁ সুবর্ণগ্রাম (সোণার গাঁ) পরগণায় আধিপত্য প্রাপ্ত হন। অনুমান খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সুবর্ণগ্রাম শাসনের নিয়োগ পত্র প্রাপ্ত হন। ঈশাখাঁ রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া খিজিরপুরে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। খিজিরপুর সুবর্ণ গ্রামের অন্তর্গত; উহা নারায়ণগঞ্জের পার্শ্বদিয়া প্রবহমাণা শীতলক্ষা নদীর অপর তীরবর্ত্তী বন্দর নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত। সম্রাটের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়া ঈশাখাঁ সরকার সোণার গাঁ ও সরকার বাজুহার শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন; ইহাতে তদীয় অধিকার উত্তরে ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করিবার জন্য সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত কলাগাছিয়া, হাজিগঞ্জ ও ত্রিবেগ (ত্রিবেণী) নামক স্থানে তিনটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রাচীন একডালা ও এগার সিন্ধুর দুর্গ সুসংস্কৃত করেন। ঈশাখাঁ ক্রমে অর্থ ও বল সঞ্চয় করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিলেন। সম্রাট আকবর প্রথমতঃ শাহ্ বাজখাঁকে ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৫৮৫ খৃঃ)। ঈশাখাঁ মোগল সৈন্যের আক্রমণে পরাভূত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করেন। শাহ্ বাজ খাঁ খিজিরপুর বিধ্বস্ত করিয়া ঈশাখাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ঈশাখাঁ চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি শাহ্ বাজ খাঁ ঈশাখাঁর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন উহা শাহ্‌বাজপুর (শাবাজপুর) নামে বর্ত্তমানেও বিদ্যমান আছে। এখানে অসতর্কতা হেতু শাহ্ বাজ খাঁ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া ঈশাখাঁর নিকট পরাজিত হন। ঈশা খাঁ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া খিজিরপুরের বিধ্বস্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণ গ্রামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। অনন্তর ময়মনসিংহ অধিকার করিয়া তত্রত্য জঙ্গলবাড়ী-নামক স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি কামরূপের প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটিয়া অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ এবং ময়মনসিংহের উত্তরে অবস্থিত দশকাহনিয়াতে (সেরপুরে) অপর এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। শাহ্‌বাজ খাঁর পরাজয়ের দশ বৎসর পরে সম্রাট আকবর মহারাজ মানসিংহকে ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মানসিংহের সহিত ঈশাখাঁর ঘোর যুদ্ধ হইল; অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। মানসিংহ ঈশাখাঁকে লইয়া সম্রাট আকবরের নিকট উপস্থিত হইলেন। আকবর ঈশাখাঁর বীরত্ব ও গুণগ্রাম অবগত হইয়া তাহাকে "দেওয়ান" ও মসনদ-ই-আলী উপাধি এবং দ্বাবিংশ পরগণার আধিপত্য প্রদান করেন।

ঈশা খাঁ বিক্রমপুরের বিখ্যাত ভৌমিক চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোণামণিকে হরণ করেন। সোণামণি ঈশাখাঁর অন্তঃপুরে "বিবি আলিনেয়ামত" নামে পরিচিত হইলেন। সাধারণ্যে সোণামণি "সোণাবিবি" নামে পরিচিত। নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্বদিকে শীতলক্ষার পর পারে অবস্থিত "সোণাকান্দা" নামক স্থান সোণাবিবির স্মৃতি আজও বহন করিতেছে। এই ঘটনার পর হইতেই ঈশাখাঁর পতন আরম্ভ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর অন্ত্যভাগে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার শাসনকালে টাকায় তিন চারি মণ চাউল বিক্রীত হইত। জমির খাজানা প্রতি কানিতে চৌদ্দ পয়সা মাত্র ছিল!

ঈশান নাগর—এই মহাত্মা বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তাঁহার শিষ্য-পর্য্যায়ভুক্ত। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত লাউড় দেশে নবগ্রাম নামক স্থানে ব্রাহ্মণকুলে ১৪১৪ শকে (ইং ১৪৯২খ্রীঃ) ঈশানের জন্ম হয়। অদ্বৈত প্রভুও এই গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন (অদ্বৈতাচার্য্য দেখ)। ঈশানের পিতা দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল না। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ঈশানের পিতৃবিয়োগ হয়। দুঃখিনী ঈশানজননী অপোগণ্ড শিশু লইয়া সংসার-সাগরে ভাসমানা হইলেন। ঈশানের পিতা অদ্বৈত প্রভুর প্রতিবাসী ছিলেন। বিধবা ঈশানজননী নিরুপায় হইয়া অদ্বৈতের কথা মনে করিলেন। অদ্বৈত প্রভু দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরবাসী হইয়াছিলেন। যখন ঈশানজননী অদ্বৈতকে মনে করিতে ছিলেন, তখন তিনি বঙ্গে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। লাউরবাসিগণের নিকট তাঁহার মহিমা অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈত প্রভু ঈশানের জননীর প্রার্থনায় ঈশানকে লইয়া শান্তিপুরে গমন করেন। যে দিন তিনি অদ্বৈতের গৃহে উপস্থিত হন, সে দিন অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ তনয় অচ্যুতানন্দের বিদ্যারম্ভোৎসব হইতেছিল। এইরূপে ঈশান অদ্বৈতের দিগন্তপ্রসারিণী দয়া লাভ করিয়া তদীয় গৃহে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। অদ্বৈত প্রভু পুত্রের সহিত ঈশানকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে নিজ শিষ্য করিয়া লইলেন। ঈশান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রায় সকল সময়েই অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন। চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যখন অদ্বৈত প্রভু সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখন ঈশানও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঈশানকে অদ্বৈত বড়ই স্নেহ করিতেন। তিনি এক সময় ঈশানকে বলিয়াছিলেন "বৎস, আমার অবর্ত্তমানে তুমি জন্মভূমি শ্রীহট্টে গিয়া গৌরনাম প্রচার করিও।" যথাকালে ঈশান গুরুর আদেশানুসারে শ্রীহট্টে আগমন করিতে উদ্যত হইলে, অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী তাহাকে দুইটি অনুরোধ করেন; (১) শ্রীহট্টে গিয়া বিবাহ করিবে, (২) অদ্বৈতচরিত্র বর্ণন করিবে। ঈশান শ্রীহট্টে আসিয়া মহোৎসাহে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং গুরুপত্নী সীতাদেবীর আদেশানুসারে অদ্বৈত প্রভুর চরিত্র-বিষয়ক "অদ্বৈত প্রকাশ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৯০ শকে (ইং ১৫৬৮ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে খাসিয়াগণ লাউড় আক্রমণ করে। লাউড়বাসিগণ প্রাণ লইয়া নানা স্থানে পলায়ন করে। এই সময়ে ঈশান নাগরের বংশধরগণ পলায়নপূর্ব্বক গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী ঝালপাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। তদ্বংশীয়গণ এখনও তথায় বর্ত্তমান আছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বঙ্গের বিখ্যাত কবি। ইনি কাঁচরাপাড়া-নিবাসী ৺ হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১৭৩৩ শকে (ইং ১৮১১ খৃ) ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কুলক্রমাগত চিকিৎসাব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগ্রামে এক সামান্য পাঠশালাতে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১০ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি রীতিমত শিক্ষা কিছুই প্রাপ্ত হন নাই, ইংরেজী কিছুই শিখেন নাই, বাঙ্গালাও নিজের যত্নে যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন। নিজের চেষ্টায় কিরূপে বড় হইতে পারা যায়, ইনি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহুযত্নে—নানাপ্রকার প্রতিকূল ঘটনার মধ্যদিয়া বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা তিনি ভাবিজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অনতি-বিলম্বেই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। তিনি ৺ যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহ পাইয়া ১৭৫২ শকে (ইং ১৮৩০ খৃঃ) সংবাদ-প্রভাকর নামে একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন। এই পত্রের সম্পাদকতায় তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্দ্র এদেশের একজন প্রধান লোকের মধ্যে গণ্য হইলেন। 'সংবাদ-প্রভাকর'

১৭৬০ শকের আষাঢ় মাস হইতে দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৭৭৫ শকে তিনি "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে অপর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ৺ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্তৃক প্রচারিত "রসরাজ" নামক পত্রিকার সহিত কবিতাযুদ্ধ করিবার জন্য এই পত্রের জন্ম। এই পত্রিকাদ্বয়ে নিতান্ত অভদ্রোচিত ভাষায় গ্লানিপূর্ণ কবিতা লিখা হইত। পরবর্ত্তী বৎসরেই "পাষণ্ডপীড়ন" উঠিয়া যায়। ইনি ১৭৭৭ শকে আষাঢ় মাসে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্বলিত তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করেন এবং ১৭৭৯ শকে "প্রবোধ-প্রভাকর" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৭৮০ শকে উৎকট জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ১২ই মাঘ তারিখে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি বঙ্গের বিখ্যাত হাস্যরসোদ্দীপক কবি; যমক ও অনুপ্রাসের ছটায় তাঁহার রচনা অতি মধুর হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার রচনার নমুনা দেওয়া গেল।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভাবে প্রভা পায় প্রভাকর॥"
"পৃথিবীটা কার বশ, পৃথিবী টাকার বশ।"
"হাঁসী বলে হাঁসা হাঁসা, হাঁসা বলে হাঁসী।
এ বলিয়া হাঁসা হাঁসী, করে হাসাহাসি॥"
"বকী বলে বকা বকা, বকা বলে বকী।
এ বলিয়া বকা বকী, করে বকাবকী॥"
"চড়ী বলে চড়া চড়া. চড়া বলে চড়ী।
এ বলিয়া চড়া চড়ী, করে চড়াচড়ী॥"

ঈশ্বরপুরী—ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সি, আই, ই, এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ১৭৪২ শকে (বঙ্গাব্দ ১২২৭ সাল; ইংরেজী ১৮২০ খৃঃ) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমায় অবস্থিত। ইঁহার পিতামহ ৺ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়; পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। পিতা ঠাকুরদাস কলিকাতায় মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন; এই অল্প বেতনে কাজ করিয়াও তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ যত্নের ক্রটী করেন নাই। তিনি ১৭৫১ শকের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮২৯ খৃঃ ১লা জুন) পুত্রকে পটলডাঙ্গার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। একাদশ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হয়; পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে তিনি অলঙ্কারের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। স্বর্গগত বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় তৎকালে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৭৬০ শকে (ইং ১৮৩৮ খৃঃ) ঈশ্বরচন্দ্র একখানি সংস্কৃত গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়া ১০০৲ টাকা, তৎপর সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া ১০০৲ টাকা, তারপর দর্শন শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ লিখিয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সপ্তবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন ও স্মৃতিবিভাগে পাঠ সমাপন করিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক বাহির হন। ১৭৬৩ শকে (ইং ১৮৪১ খৃঃ) ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৫০৲ বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন; ১৭৬৮ শকে (ইং ১৮৪৬ খৃঃ) তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। কার সাহেব স্বীয় পদদ্বয় টেবিলের উপর রাখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

সহিত আলাপ করেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবের এই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া কলেজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পর একদিন এই কার সাহেব কোন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবকে আসিতে দেখিয়াই চটি জুতা পরিহিত পা দুখানি স্বীয় টেবিলের উপর উঠাইয়া দিলেন এবং এই অবস্থাতেই সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। কার সাহেব একজন দেশীয় পণ্ডিতের এই দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে এই ঘটনা জানাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ব্যাপার উপলক্ষে যে উত্তর দেন তাহাতে কার সাহেব লজ্জিত হইয়াছিলেন। ১৭৭২ শকে (ইং ১৮৫০ খৃঃ) বিদ্যাসাগর মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হন এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইহার অল্পকাল পরে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী পদ উঠাইয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন ৩০০৲ টাকা করিয়া দেন। ১৭৭৭ শকে (ইং ১৮৫৫ খৃঃ) গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জিলার স্পেশাল ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে এই ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যও করিতে হইত; এই উভয় কার্য্যে তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; তিনি সমৃদ্ধির কোলে লালিত হন নাই; বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। অসামান্য অধ্যবসায় ও অনন্যসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতাবলে তিনি উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন থাকিয়া তিনি নিম্নলিখিত সংস্কার সাধন করেন; (১) প্রাচীন গ্রন্থগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ, (২) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য জাতীয়ের জন্য কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটন, (৩) ছাত্রদের বেতন গ্রহণ রীতির পরিবর্ত্তন, (৪) দুই মাসের জন্য গ্রীষ্মাবকাশ প্রথা প্রবর্ত্তন, (৫) সংস্কৃতের সহিত ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন। এক অভাবনীয় কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই উন্নত পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত শিক্ষাসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করেন এবং চাকরী করিতে অসম্মত হইয়া কার্য্যত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। তদানীন্তন ছোট লাট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আহ্বান করিয়া তাঁহার কর্ম্মত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, কিন্তু তেজস্বী বিদ্যাসাগর লাটসাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি ১৭৮০ শকে (ইং ১৮৫৮ খৃঃ) মাসিক ৫০০৲ বেতনের কলেজের অধ্যক্ষতা ও স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরী পদ পরিত্যাগ করেন। এই কার্য্য পরিত্যাগ তাঁহার মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল; এখন হইতে তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করেন। তিনি ১৭৬৯ শকে (ইং ১৮৪৭ খৃঃ) সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরী স্থাপন করিয়াছিলেন; এক্ষণ হইতে সুশৃঙ্খলার সহিত সংস্কৃত প্রেসে পুস্তক মুদ্রিত এবং সংস্কৃত ডিপজিটরীতে নিজের ও অপরের পুস্তক বিক্রীত হইতে লাগিল। ১৭৯২ শকে (ইং ১৮৭০ খৃঃ) তিনি মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক বিশেষ লাভজনক হয় নাই, কিন্তু ইহার রচনা অতি পরিপাটী হইয়াছিল। ১৭৮৩ শকে (ইং ১৮৬১ খৃঃ) "সীতার বনবাস" প্রকাশিত হয়। এই উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তিনি চারিদিনে (রাত্রি ২২ ঘটিকা হইতে পরদিন বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত খাটিয়া) এই পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ মহাকবি ভবভূতিকৃত "উত্তরচরিত" নামক নাটক অবলম্বনে লিখিত। অতঃপর ইংরেজ কবি সেক্‌সপীয়ারের "কমেডি অব এরারস্‌" নামক নাটক অবলম্বনে "ভ্রান্তিবিলাস" রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন; বর্ণপরিচয় দুই ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বেতাল-

পঞ্চবিংশতি, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী ৪ ভাগ, ঋজুপাঠ ৩ ভাগ, সটীক মেঘদূত, উত্তরচরিত, শকুন্তলা, সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, বিধবাবিবাহবিচার ও বহুবিবাহ বিচার। শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত অপর সকলগুলিই বহুবর্ষ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের স্কুল ও কলেজসমূহে পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত ছিল এবং এখনও কোন কোন পুস্তক পাঠ্য আছে। এই সমুদয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভূত অর্থাগম হইত। এই সমুদয় পুস্তকই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পত্তি। এই গ্রন্থ সমূহের বিক্রয়লব্ধ ধন তিনি নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাতে এই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তজ্জন্য তিনি ১৭৯৭ শকের ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৮৭৫ খৃঃ ১৩ই জুলাই) তারিখে এক উইল বা চরমপত্র সম্পাদন করিয়া যান। এই চরমপত্রে মাসিক বৃত্তির পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রথম শ্রেণীর মাসিক বৃত্তি:—পিতৃদেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০৲, মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ৪০৲, তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৪০৲, কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৲, জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোমোহিনী দেবী ১০৲, মধ্যমা ভগিনী দিগম্বরী দেবী ১০৲, কনিষ্ঠা ভগিনী মন্দাকিনী দেবী ১০৲, পত্নী দীনময়ী ৩০৲, জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী ১৫৲, মধ্যমা কন্যা কুমুদিনী দেবী ১৫৲, তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবী ৫৲, কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবী ১৫৲, পুত্রবধূ ভবসুন্দরী দেবী ১৫৲, পৌত্রী মৃণালিনী দেবী ১৫৲, জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৫৲, কনিষ্ঠ দৌহিত্র যতীশচন্দ্র সমাজপতি ১৫৲, দৌহিত্রী রাজরাণী দেবী ১৫৲, ইত্যাদি; নিম্ন বৃত্তি ২৲ পর্য্যন্ত, মোট ৪৮২৲ টাকা। এই শ্রেণীর মধ্যে বিখ্যাত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মাতার প্রতি মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক বৃত্তি ১০৲ হইতে নিম্ন ২৲ পর্য্যন্ত মোট ৮০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে মাসিক ১০০৲, ঐ স্থানে স্থাপিত চিকিৎসালয়ে মাসিক ৫০৲, গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোকদিগের সাহায্যার্থ মাসিক ৩০৲ এবং বিধবাবিবাহের সাহায্যার্থ মাসিক ১০০৲, মোট ৮৪২৲ মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া এককালীন দানেরও ব্যবস্থা আছে। তিনি কত দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্র ও অর্থ দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি বৎসরে দুইবার বাড়ী যাইতেন; প্রত্যেক বারে গরীবদিগকে দিবার জন্য নগদ ৫০০৲ ও ৫০০৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র লইয়া যাইতেন। বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিলাতে অবস্থান কালে অত্যন্ত অর্থাভাবে প্রপীড়িত হন; তিনি বিলাত হইতে স্বীয় দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সকরুণ ভাষায় বিদ্যাসাগরের নিকট পত্র লিখিয়া অর্থযাচ্ঞা করেন। পত্র পাঠে বিদ্যাসাগরের হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি তৎক্ষণাৎ ঋণ করিয়া ৬০০০৲ টাকা মাইকেল দত্তের নিকট প্রেরণ করেন। এই অর্থসাহায্য না পাইলে অন্নাভাবে বিখ্যাত কবির বিদেশে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক মাইকেল দত্ত বিলাতে বসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে গাহিয়াছেন:—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে,
করুণার সিন্ধু তুমি" ইত্যাদি।

১৭৮৮ শকের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৬৬ খৃঃ মে, জুন ও জুলাই মাসে) দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগর স্বীয়গ্রামে ও সমীপবর্ত্তী ১০।১২ খানা গ্রামে অন্নসত্র স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগরের জননী এই অন্নসত্রে প্রত্যহ ৪।৫ শত লোককে অন্নদান করিতেন। ৮ মাস এই অন্নসত্রের কাজ চলিয়াছিল। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কার্ম্মটার নামক স্থানে তাঁহার এক বাসা ছিল; তিনি স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য মাঝে মাঝে তথায় যাইতেন। তিনি দারিদ্র্যপীড়িত সরলা সাঁওতাল বালিকাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং অন্নবস্ত্র ও অর্থদানে তাহাদিগকে তুষ্ট করিতেন; সাঁওতাল রমণীরা বিদ্যাসাগরকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিত। তিনি অযাচিতভাবেও

অনেক দান করিয়াছেন। একদা এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা ঋণ করেন; ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে ঋণদাতা সুদে আসলে ২৪০০৲ টাকা ব্রাহ্মণের উপর ডিক্রী করেন। ঘটনাক্রমে একস্থানে এই ব্রাহ্মণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণের মুখে তাঁহার এই বিপদের কথা শুনিলেন; ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে চিনিতেন না। মোকদ্দমার দিন ব্রাহ্মণ দেখিলেন তাহার সমস্ত টাকা কোন সহৃদয় ব্যক্তি দাখিল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বহুচেষ্টায়ও বিদ্যাসাগরের নাম জানিতে পারিলেন না, কারণ বিদ্যাসাগর কাছারীর আমলাদিগকে তাহার নাম গুপ্ত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বহুলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে চাকরী পাইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইহাদের অনেকেই বিদ্যাসাগরের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন "আমি যাহার যত উপকার করিয়াছি, সে আমার তত নিন্দা করিয়াছে।" বিদ্যাসাগর পরসেবাই ব্রত বলিয়া মনে করিতেন; তিনি ভিক্ষার্থীকে অর্থ দিয়া, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান করিয়া, দীন দুঃখীকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী বিদ্বেষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম. এ এম. ডি, পরিশেষে হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর ঘোর পক্ষপাতী হইয়া পরিণামে যশস্বী হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ১৭৮৬ শকে (ইং ১৮৬৪ খৃঃ) মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউশন নামক উচ্চ শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে কোন এদেশীয়ের চেষ্টায় এইরূপ উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয় নাই। মেট্রপলিটন কলেজ বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বর্ত্তমান আছে।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্ব ৫০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন; তিনি ইহা বেশী দিন রাখিতে পারেন নাই। ইহা অচিরেই বিদ্যাসাগরের হস্তে পড়ে। বিদ্যাসাগর বিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে ইহার সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতাতেই কৃষ্ণদাস পালের এত মান, মর্য্যাদা ও পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর চিরকালই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বেথুন স্কুলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; তিনি অনেক সময় বেথুন কলেজের মেয়েদের পারিতোষিক দিয়াছেন। তিনি বেথুন স্কুলকমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ১৭৯১ শকে (ইং ১৮৬৯ খৃঃ) তিনি এই সেক্রেটরী পদ ত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গের প্রধান সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি বালবিধবাগণের দুঃখমোচনের জন্য শাস্ত্রীয় বিধির বলে হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা পান। এজন্য তাঁহাকে সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দয়াময়ী মাতৃদেবীর অনুরোধে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণে অগ্রসর হন; ১৭৭৬ শকের ১০ই মাঘ (ইং ১৮৫৪ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী) তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকা প্রকাশ হইলে দেশে আন্দোলনের তরঙ্গ উঠে। তৎপরবর্ত্তী বৎসর ১৭৭৭ শকের কার্ত্তিক মাসে বিধবা-বিবাহ সমর্থক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বহু প্রতিবাদকারীর মত খণ্ডিত হয়। বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্রের ফলে ১৭৭৮ শকের ১২ই শ্রাবণ (ইং ১৮৫৬ খৃঃ ২৬শে জুলাই) বিধবা-বিবাহ রাজবিধিসম্মত হইল; ইহা ইংরেজী ১৮৫৬ সনের ১৫ আইন নামে খ্যাত। এই আইনবলে বিধবাগণ পুনর্ব্বিবাহের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্ব পতির সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইতে পারিবেন না। ১৭৪৬ শক হইতে ১৭৮৭ শকের মধ্যে ২৭টী বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭৯১ শকে (ইং ১৮৬৯ খৃঃ) বীরসিংহগ্রামে আরও একটী বিধবার পাণিগ্রহণবিধি সম্পন্ন হয়। তৎপর নানা স্থানে বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুসমাজের বহুলোকের, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতিবাদে এই বিবাহবিধি হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইতে পারিল না। এখনও মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইতেছে, এরূপ শুনা যায়। এই বিধবাবিবাহ প্রচার করিতে

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল; ইহাতে তাঁহার অন্যূন ৪০ হাজার টাকা ঋণ হয়। বিদ্যাসাগর স্বীয় পুত্রের সহিত এক বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার পর তিনি কুলীন কন্যাগণের দুঃখ মোচনের অভিপ্রায়ে ১৭৯৩ শকের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৭১ খৃঃ জুলাই মাসে) বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি এক আত্মীয়ের কন্যায় কষ্ট অনুভব করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৭ শকের ১৩ই পৌষ (ইং ১৮৫৫ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বহুবিবাহ রহিত করিবার জন্য বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ লইয়া বিব্রত থাকাতে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অবসর পান নাই। ১৭৯১ শকের চৈত্র মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বীরসিংহ গ্রামস্থ পৈতৃকভবন অগ্নিতে ভস্মসাৎ হয়। ১৭৯২ শকে (ইং ১৮৭০ খৃঃ) বিদ্যাসাগর স্বীয় জননী দেবীকে ৺বারাণসীধামে প্রেরণ করেন; দুই মাস কাশীতে বাস করিয়া জননী চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে কাশীপ্রাপ্ত হন। ইহার ৬ বৎসর পর ১৮৯৮ শকে (ইং ১৮৭৬ খৃঃ পিতা ঠাকুরদাস কাশীপ্রাপ্ত হন। ১৮১৩ শকের (ইং ১৮৯১ খৃ, বঙ্গাব্দ ১২৯৮ সাল) আষাঢ় মাসে বিদ্যাসাগর উৎকট রোগে আক্রান্ত হন। কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এই সনের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটে এই মহৎ জীবনের অবসান হয়। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত লোক শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিমতলাঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; নিমতলা-ঘাটে আর লোক ধরে না; সমাগত লোকসমূহের দর্শনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে ও শবদেহের ফটোগ্রাফ তুলিতে সৎকারে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। বাঙ্গালীর অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন হইল। শবদেহে অগ্নি সংযোগ করা হইল; দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালীর পিরামিড্ ভস্মসাৎ হইয়া গেল; রহিল কেবল অনন্ত কীর্ত্তি, আর রহিল সেই উদারহৃদয়, বিশ্বপ্রেমিক দয়ার সাগরের অনন্ত-স্মৃতি।



উডা (রাণা)—ইনি জনসাধারণের নিকট "রাণা উডা হাতিয়ারো" অর্থাৎ "পিতৃহন্তা রাণা উডা" নামে পরিচিত। মিবারের বিখ্যাত রাণা কুম্ভ ইঁহার পিতা। এই দুরাকাঙ্ক্ষ নৃপতি পিতার দীর্ঘজীবন সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্যলাভাশয়ে গোপনে ১৩৯১ শকে (ইং ১৪৬০ খৃঃ) পিতৃহত্যা সাধন করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছেন। "পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ" এই বিখ্যাত শ্লোকাংশ এই পাষণ্ড নৃপতি সার্থক করিয়াছেন। ইনি মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, যে সমুদয় ব্যক্তি তাঁহাকে রাজ্যপ্রাপ্তি ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই রাজ্য-লোলুপ। তিনি সামন্ত রাজগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা অপেক্ষা দিল্লীর সম্রাটকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করা অধিকতর পৌরুষ মনে করিলেন। এইরূপে তিনি কলঙ্কিত-জীবনে গাঢ়তর কালিমা লেপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও রাজত্ব করিতে পারিলেন না। যে দিন তিনি দিল্লী সম্রাটকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, সেই দিনই বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল; পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

উদয়নাথ (ত্রিবেদী—কবীন্দ্র)—ইনি দোয়াবের অন্তর্গত আমেঠীর রাজা গুরুদত্ত সিংহের সভাপণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের জন্য রাজা ইঁহাকে "কবীন্দ্র" উপাধিতে ভূষিত করেন। "রামচন্দ্রোদয়" নামে একখানি হিন্দীগ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

উদয়নাচার্য্য—বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ এই যে জনার্দ্দন বৌদ্ধদিগের নাশের জন্য মিথিলায় উদয়নাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কুসুমাঞ্জলি। এতদ্ব্যতীত তিনি বাচস্পতিমিশ্র বিরচিত ন্যায়শাস্ত্রের একখানি টীকাও লিখিয়াছিলেন।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী—বারেন্দ্র শ্রেণীতে পরিবর্ত্তমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। রাজেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে ইনিই প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ "কুসুমাঞ্জলির" প্রণেতা। রাজসাহীর অন্তর্গত নিসিন্দা গ্রামে উদয়নাচার্য্যের বাসভূমি ছিল বলিয়া এক পক্ষ বলেন, দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের প্রসিদ্ধ বালিয়াটীগ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। বালিয়াটীতে এখনও "ভাদুড়ী ভিটা" নামে একটী উচ্চভূমি উদয়নাচার্য্যের বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। বঙ্গের নানাস্থানে উদয়নাচার্য্যের বংশধরগণ এখনও বাস্তব্য করিতেছেন। ঘটককারিকামতে উদয়নাচার্য্যের দুই পত্নী; প্রথমার গর্ভে তাঁহার উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রপতি, চণ্ডীপতি ও রুদ্রাণীপতি নামে ছয়পুত্র এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে। এতদ্ব্যতীত লীলাবতী নামে তাঁহার এক বিদুষী কন্যাও ছিল। ঐ কন্যা-জামাতার নাম বল্লভাচার্য্য। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যুর পর লীলাবতী শোকাবেশ বশতঃ করুণরসাশ্রিত একখানি কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। উপরিউক্ত মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত থল্লিগ্রামবাসী উদয়নাচার্য্যের উত্তরপুরুষ ভট্টাচার্য্যদিগের গৃহে ঐ শোকবাক্যের অনুলিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উদয়নাচার্য্য রাঢ়ীয় কুলীন সমাজের অনুকরণে বারেন্দ্র সমাজে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, কুলীনেরা পরস্পর আদান প্রদান করিবেন এবং শ্রোত্রীয়কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিতে পারিবেন না। এই আদান প্রদানের নাম পরিবর্ত্ত প্রথা। এই সময় বর্ত্তমান রাজসাহী নিবাসী মনুসংহিতার টীকাকার প্রসিদ্ধ কুল্লূক ভট্ট, ময়ূর শতকের গ্রন্থকার ময়ূর ভট্ট ও মঙ্গল ওঝা নামক তিনজন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় উদয়নাচার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ তদীয় ঊর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ ক্রতুভাদুড়ী মহারাজ বল্লাল সেনের সমসাময়িক এবং বল্লাল হইতে কৌলিন্য মর্য্যাদালাভ করিয়াছিলেন।

উদয়সিংহ (রাণা)—বিখ্যাত মিবারের রাণা; চিতোর ইঁহার রাজধানী। ইনি রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠপুত্র। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর ক্রমে তাঁহার দুই পুত্র, রাণা রত্ন ও রাণা বিক্রমজিৎ চিতোরে রাজত্ব করেন। বিক্রমজিতের ব্যবহারে মন্ত্রিগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং বনবীর সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে চিতোরের সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই সময়ে রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহের বয়স ৬ বৎসর মাত্র ছিল। মন্ত্রিগণের ইচ্ছা ছিল যে, উদয়সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে বনবীরের স্থলে রাণা সঙ্গের বংশধর উদয়কে বসাইবেন। মন্ত্রিগণের অভিপ্রায় বনবীর অচিরেই জানিতে পারিলেন। তিনি একদিন তরবারিহস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উদয়সিংহের ধাত্রী পান্নাকে উদয়ের অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধাত্রী পান্না পূর্ব্বেই বনবীরের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া উদয়কে একটী বিশ্বস্ত নাপিতের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিয়াছিল এবং উদয়ের পালঙ্কে স্বীয় পুত্রকে শায়িত করিয়া রাখিয়াছিল। বনবীর পান্নার নিকট উদয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, পান্না পালঙ্কে শায়িত স্বীয় পুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বনবীরের তরবারির আঘাতে পান্নার পুত্রের শরীর দ্বিধা বিভক্ত হইল। অলৌকিক স্বার্থত্যাগের জন্য, অপূর্ব্ব প্রভুভক্তির নিমিত্ত ইতিহাসে ধাত্রী পান্নার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। ধাত্রী পান্না রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাপিতের সহিত মিলিত হইল। শিশু উদয়সিংহকে ক্রোড়ে করিয়া পান্না একে একে অনেক সামন্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু কেহই বনবীরের ভয়ে পান্না ও উদয়কে আশ্রয় দিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে পান্না আরাবল্লী পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া কমলমীর নামক নগরে আশাসাহ নামক সামন্তরাজের হস্তে উদয়কে অর্পণ করিলেন। সাহজী দেপ্রাজাতীয় ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী; তিনি তাঁহার মাতার অনুরোধে উদয়কে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উদয়সিংহ সাহজীর ভাগিনেয়রূপে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কালক্রমে সকলেই এই সংবাদ অবগত হইলেন। মিবারের সমস্ত সামন্তরাজ ধাত্রী পান্না ও নাপিতকে সঙ্গে লইয়া কমলমীরে উপনীত হইলেন। উদয় যে রাণা সঙ্গের পুত্র তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। এক মন্ত্রিসভা গঠিত হইল; তাঁহারা উদয়কে রাণা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চিতোরের রাজসভার মন্ত্রিগণ পূর্ব্বেই বনবীরের ব্যবহারে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহারা উদয়কে রাণা

বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং বনবীরকে ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া মিবার হইতে প্রস্থান করিতে অবসর দিলেন। বনবীর মিবার পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া গেলেন। এদিকে মহাসমারোহে ১৪৬৪ শকে (ইং ১৫৪২ খৃঃ) উদয়সিংহ মিবারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। উদয়সিংহের রাজত্বে দিল্লীর সম্রাট আকবর মিবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। কাপুরুষ উদয় চিতোর হইতে পলায়ন করিয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের উপত্যকায় উদয়পুর নামক নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি উদয়পুর মিবারের রাজধানী হইল। ১৪৯৪ শকে (ইং ১৫৭২ খ্রীঃ) উদয়সিংহ পরলোক গমন করেন।

উদ্ধারণ দত্ত—ইনি চৈতন্তের একজন প্রধান ভক্ত। পিতার নাম শ্রীকর দত্ত; মাতা ভদ্রাবতী, জাতিতে স্থবর্ণ বণিক। ইনি ত্রিবেণীর তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম নামক স্থানে ১৪০৩ শকে (ইং ১৪৮১খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সাংসারিক বিষয় কর্ম্ম পুত্র শ্রীনিবাসের হস্তে অর্পণ করিয়া ইনি বিবেকী হন।

উপগুপ্ত—ইনি একজন বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। ইনি জাতিতে শূদ্র। ১৭শ বর্ষ বয়সে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বহুসংখ্যক লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। প্রবাদ এই যে, ইনি মহারাজ অশোকের দীক্ষা গুরু ছিলেন।

উমাপতিধর—ইনি বঙ্গের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার নাম জয়দেবের গীত গোবিন্দে দৃষ্ট হয়। ইনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। পদ্যাবলী ও বৈষ্ণবতোষিণীতে ইঁহার রচিত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

উমেশচন্দ্র দত্ত—ইনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ সাধুপুরুষ ছিলেন; ইনি নীরবে সংসারের অনেক হিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন। চব্বিশপরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ১৭৬২ শকে (ইং ১৮৪০ খ্রীঃ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরমোহন দত্ত; মাতা সর্ব্বমঙ্গলা। দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়া ইনি এফ, এ পর্য্যন্ত পাশ করেন, তৎপর শিক্ষকতা গ্রহণপূর্ব্বক বি, এ পড়িতে থাকেন এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ বি, এ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কোন্নগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে, বেথুন কলেজে এবং হরিনাভি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে কাজ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্রই তিনি সসম্মানে ও সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন; গ্রামের রক্ষণশীল হিন্দুগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, এমন কি মাতার মৃত্যু হইলে কেহই সংস্কার করিতে আসেন নাই। উমেশ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বহস্তে কুঠারদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণা মাতার শবদেহের অগ্নিসংস্কার করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকা, ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজের জন্য তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা সিটিকলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন ছিলেন। ১৮২৮ শকের ১৮ই জ্যেষ্ঠ (ইং ১৯০৭ খৃঃ ১লা জুন) তিনি বাঙ্গালী জাতির বন্ধু হেয়ার সাহেবের বার্ষিক স্মৃতি সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাই জনসাধারণের সক্ষমে তাঁহার পবিত্র জীবনের শেষ কাজ। বহুমূত্র রোগে ১৮২৯ শকের ১১ই আষাঢ় তারিখে এই কর্ম্মী পুরুষ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (এম এ. বি. এল)—এই মহাত্মা হুগলী জেলায় খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে ১৭৭৪ শকে ভাদ্র মাসে (ইং ১৮৫২ খৃঃ, বঙ্গাব্দ ১২৫৯ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতা প্রসন্নকুমারী দেবী। ইনি রাধানগর উচ্চ ইংরেজী-স্কুল হইতে ১৭৯০ শকে (ইং ১৮৬৮ খৃঃ) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৭৯৪ শকে (ইং ১৮৭২ খৃঃ) সংস্কৃত কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৭৯৬ শকে (ইং ১৮৭৪ খৃঃ) এম. এ. ও তৎপরবর্ত্তী বৎসর বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ শকে (ইং ১৮৭৬ খৃঃ) প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মাওয়েটপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট পদ লাভ করেন। ইহার দশ বৎসর পরে ষ্টাটুটারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। নানা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৮২০ শকের ১লা শ্রাবণ (ইং ১৮৯৮ খৃঃ, বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সাল) অকালে মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স কিঞ্চিদূন ৪৬ বৎসর হইয়াছিল।

অকালে এই প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের তিরোভাব দেশের মহা দুর্ভাগ্যের কারণ বলিতে হইবে। নম্রতা ও গর্ব্বাভাব তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছিল। বেদের উপর বটব্যাল মহাশয়ের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকায় যে সকল গবেষণা ও মৌলিকতাপূর্ণ বৈদিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। সকল দর্শন অপেক্ষা তিনি সাংখ্যদর্শন অধিক ভালবাসিতেন; এই দশনসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি "সাধনা" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। তিনি মহাভারতকে জগতের অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে সময় বা অর্থের দিকে চাহিতেন না। সাহিত্য ও সাধনায় মুদ্রিত তাঁহার প্রবন্ধ সমুদয় বাঙ্গলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সামগ্রী।

উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার)—এই বিখ্যাত মহাত্মা ১৮৪৪ খৃঃ কলিকাতা খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বড় এটর্নি ছিলেন এবং একজন সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। উমেশচন্দ্র বাল্যকালে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতেন না। নাটকের অভিনয় করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। ইঁহাকে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে নাটকের অভিনয় করিতে দেখা যাইত। পিতা, উমেশচন্দ্রের পাঠে অমনোযোগিতা দেখিয়া তাঁহাকে তদানীন্তন বিখ্যাত এটর্নি ডব্লু পি ডাউনিং সাহেবের কেরাণীপদে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই পদে থাকিয়া কার্য্য করাতে তাঁহার আইনের প্রতি একটা প্রবল আসক্তি হয়। তিনি বিলাত যাইয়া আইন শিক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ৮৬৪ খৃঃ জেমসেটজি রস্তমজি জিজিভয় বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাতে আইন শিক্ষা করিতে চলিলেন। এই বৃত্তিপরীক্ষায় তিনি সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিলাতের ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা আগমন করেন এবং দীর্ঘকাল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টে কমই ছিল।

সুবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালত-অবমাননার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীকে সমর্থন করিয়া যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তজ্জন্য তিনি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ১৮৮৫ খৃঃ বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। ১৮৮৮ খৃঃ তিনি বিলাতে গমন করেন এবং তথায় নানাস্থানে ভারতবর্ষ বিষয়ে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তিনি দাদাভাই নৌরজী ও ডিগবী সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া বিলাতে কংগ্রেস-কমিটি নামে এক রাজনৈতিক সভা স্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় লণ্ডনস্থ বহু ইংরেজের মনোযোগ ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি লণ্ডন নগরের উপকণ্ঠে ক্রয়ডন নামক স্থানে এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করেন। এই বাটীর নাম "খিদিরপুর ভিলা"। জীবনের শেষকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শেলি বেনার্জ্জিকে কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করিতে রাখিয়া তিনি বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারী করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি ক্রয়ডনে খিদিরপুর ভিলায় অবস্থান করেন। এই বাটীতেই ১৯০৬ খৃঃ ১৯শে জুলাই তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।



একনাথ স্বামী—মহারাষ্ট্র দেশীয় প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক পুরুষ। ইনি ৫৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্র জাতির ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া উক্ত জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে মহারাষ্ট্র দেশ পবিত্র হইয়া গিয়াছে।



ওয়াজেদ আলী শাহ্—অযোধ্যার শেষ নবাব। ইঁহার পিতার নাম নবাব আমজাদ আলী শাহ্। পিতার মৃত্যুর পর ওয়াজেদ আলী ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হয়।

(১৮৫৬ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী)। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি উর্দ্দু ভাষায় তিনখানি দেওয়ান রচনা করিয়া ছিলেন। তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পাইতেন। কলিকাতায় তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি গীতবাদ্যে নিপুণ ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি লক্ষ্ণৌ-ঠুংরির আবিষ্কর্ত্তা।

ক

কচুরায়—ইঁহার প্রকৃত নাম রাঘব রায়; ইনি রাজা বসন্তরায়ের পুত্র এবং যশোহরের বিখ্যাত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যপুত্র। রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় দুই সহোদর; বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় বা কচুরায়। মাতা রাঘবকে ক্রোড়ে লইয়া প্রাণরক্ষার্থ কচুবনে লুক্কায়িত ছিলেন, এজন্য ইনি কচুরায় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কোন পারিবারিক কলহহেতু মহারাজ প্রতাপাদিত্য সহসা তরবারি হস্তে আক্রমণ করিয়া পিতৃব্য বসন্ত রায়কে তাঁহার সাতপুত্রসহ নিধন করেন। রাজা বসন্তরায় "গঙ্গাজল" নামে এক তীক্ষ্ণধার তরবারি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তরবারি হস্তে তাঁহাকে বধ করিতে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া বসন্তরায়-ভৃত্যকে তাড়াতাড়ি "গঙ্গাজল" আনিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভৃত্য প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তরবারির পরিবর্ত্তে এক ঘটী গঙ্গাজল আনিয়া উপস্থিত করিল। বসন্তরায় আর আত্মরক্ষার অবসর পাইলেন না; প্রতাপাদিত্যের তরবারির আঘাতে হত হইলেন। রাজা বসন্তরায়ের মহিষী স্বামী ও পুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া ঝটিতি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাঘব রায়কে ক্রোড়ে করিয়া কচুবনে লুক্কায়িত হইলেন। এইরূপে রাঘবের প্রাণরক্ষা হইল। কচুরায় পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রূপরামের সহিত পলাইয়া অতিকষ্টে দিল্লীর সম্রাট জাহাঁগীরের নিকট উপস্থিত হন। এদিকে প্রতাপাদিত্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট দেয় কর বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সম্রাট আকবরপ্রেরিত মোগল সৈন্যদিগকে নানাস্থানে বহুবার পরাজিত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র জাহাঁগীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই প্রতাপাদিত্যের সমুচিত শাস্তিবিধানার্থ সেনাপতি মানসিংহকে বঙ্গদেশে গমন করিতে আদেশ দেন। এমন সময় কচুরায় রূপরামের সহিত মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের গৃহচ্ছিদ্র অবগত হইতে পারিবেন আশা করিয়া কচুরায়কে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। প্রতাপকে বন্দী করিয়া কচুরায় সহ মানসিংহ দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; পথিমধ্যে বারাণসী ক্ষেত্রে প্রতাপ দেহত্যাগ করেন। সম্রাট জাহাঁগীর কচুরায়কে যশোহরজিৎ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক যশোহরের রাজপদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন।

কন্দর্প নারায়ণ রায়—চন্দ্রদ্বীপের প্রতাপশালী বঙ্গীয় নরপতি; ইনি বার ভূঞার মধ্যে অন্যতম। (প্রতাপাদিত্য দেখ)। ইনি কান্যকুব্জ হইতে আগত দশরথ বসুর বংশধর। ইঁহার পিতামহ পরমানন্দ বসু রায় দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গের কায়স্থ সমাজের নেতা ছিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কন্দর্প নারায়ণ বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। ইঁহার পিত্তলনির্ম্মিত কামান এখনও চন্দ্রদ্বীপে বর্ত্তমান আছে। এই কামান দৈর্ঘ্যে ৭¾ ফুট, চুঙ্গির গোড়ার বেড় ২¼ ফুট, গোলা বাহির হইবার মুখ ১৯½ ইঞ্চি। ইনি মাধবপাশা, ক্ষুদ্রকাটি ও বাসুরিকাটি নামক নগরত্রয় স্থাপন করেন। ইনি হোসেনপুরে মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের ক্ষমতা বহুপরিমাণে হ্রাস করেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বাকলায় উপস্থিত হইয়া ইঁহার যেরূপ বর্ণনা করেন, তাহাতে বুঝা যায়, যে ইঁহার সময়ে বাকলার অবস্থা অতি উন্নত ছিল। ইঁহার পুত্র রাজা রামচন্দ্র যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন।

কবিচন্দ্র—ইনি ১৫৮৩ শকে রত্নাবলী নামক এক বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করেন।

কবিরাজ—রাঘবপাণ্ডবীয়নামক কাব্য রচয়িতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন "কবিরাজ" ইঁহার উপাধি মাত্র, প্রকৃত নাম নহে। কবিরাজ ব্যতীত ইঁহার অপর কোন নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নির্দ্দেশ করেন নাই।

কবীর—ইনি এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কবীর বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু রামানন্দের শিষ্য। বঙ্গে যেরূপ শ্রীচৈতন্য, দাক্ষিণাত্যে যেরূপ রামানুজ, আর্য্যাবর্ত্তে সেইরূপ রামানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার করেন। রামানন্দের দ্বাদশজন শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে কবীর প্রধান। কবীর তদানীন্তন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতাবলম্বীরা কবীরপন্থী নামে খ্যাত। কবীরপন্থীরা সকল দেবতার অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকার করেন। কবীরের জাতি ও জন্ম সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। মুসলমানেরা বলেন কবীর জাতিতে মুসলমান ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি একজন ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার গর্ভসম্ভূত। এই বিধবা কন্যা পিতার সহিত পিতৃ-গুরু রামানন্দের দর্শনে গিয়াছিলেন। গুরু কন্যাটীর ভক্তি দেখিয়া তাহাকে "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গুরুর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে; কন্যা গর্ভবতী হইল, কিন্তু সে লোক-লজ্জাভয়ে নবপ্রসূত সন্তানটীকে এক নিভৃত স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। এক জোলা ও তাহার পত্নী শিশুটীকে পাইয়া লালন পালন করে। তদবধি তন্তুবায় পুত্র বলিয়া কবীর জগতে পরিচিত হইলেন। কবীরপন্থীরা এই গল্পের প্রথমার্দ্ধ অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, এক জোলা ও তাহার পত্নী নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কোন স্থানে যাইবার সময় পথে এক সদ্যোজাত শিশু দেখিতে পায়; তাহারা তাহাকে গৃহে আনিয়া লালন পালন করে। তন্তুবায়পুত্র কবীর রামানন্দের শিষ্য হইতে অভিলাষ করেন। রামানন্দের শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে উপহাসপূর্ব্বক তাড়াইয়া দেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি রামানন্দের অন্বেষণে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পান না; অবশেষে এক ব্রাহ্মণ রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া দিলেন। কবীর শেষ রাত্রিতে রামানন্দের গৃহদ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন; প্রত্যুষে গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় রামানন্দের পদ কবীরের গাত্রসংলগ্ন হইল। ম্লেচ্ছের শরীরে পাদস্পর্শ হইল মনে করিয়া রামানন্দ "রাম রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীর এই রামনাম গুরুপ্রদত্ত মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া রামানন্দকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। কবীর কেবল একজন ভক্ত সাধু ছিলেন এমন নহে, তিনি পরম দয়ালু ছিলেন। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। কবীরের বদান্যতা শ্রবণে নানাদিক হইতে প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইত। একদিন অতিথির সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তিনি গৃহান্তরে গমনপূর্ব্বক নিভৃতে ভাবিতেছেন "আমি দরিদ্র, কিরূপে এত লোককে আজ অন্ন দিব?" এদিকে ভগবান স্বয়ং কবীরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোকদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইলেন।

একদা কবীর তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া মথুরা দর্শন পূর্ব্বক দিল্লীতে উপনীত হন। এখানে দুষ্টলোকেরা সম্রাট সেকেন্দর লোদীর নিকট বলিল যে, কবীরনামে একজন ধূর্ত্ত সন্ন্যাসী নগরবাসীদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছে। সম্রাট তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া কবীরের প্রাণবধের আদেশ দেন। তাঁহাকে প্রথমতঃ যমুনায়, তৎপরে অগ্নিতে ও অবশেষে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে ঐ সকল সঙ্কটে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়; তাঁহার কোন অনিষ্টই হয় না। ইহা দেখিয়া সম্রাট তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দিল্লী হইতে কবীর কাশীতে গমন করেন; এখানেও তাঁহার অতিমানুষিক কার্য্য দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট বহুলোক প্রত্যহ সমাগত হইয়া দীক্ষিত হইতে লাগিল। একদিন কবীর শিষ্যদিগকে বলিলেন যে তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র নানাস্থান হইতে লোকসকল তাঁহার নিকট সমবেত হইতে লাগিল। কবীর তাঁহাদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তাঁহার শেষ বক্তব্য বলিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শবের সমাধি লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদ হওয়ার উপক্রম হয়; এমন সময় কবীর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শিষ্যদিগকে শবের আবরণ বস্ত্র উত্তোলন করিতে বলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই আবরণ উন্মোচন করিতে সাহস করিল না, পরিশেষে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে একজন আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা গেল যে, মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে, কতকগুলি ফুলমাত্র শবাধারে পতিত আছে। কাশীর রাজা বীরসিংহ এই পুষ্পরাশির অর্দ্ধেক লইয়া দগ্ধ করিলেন এবং এই দগ্ধ পুষ্পের ভস্ম একস্থানে মহাসমারোহে সমাহিত করিলেন; এইস্থান কবীর-চৌর নামে খ্যাত হইয়াছে। কবীরের দোঁহাবলী ধর্ম্মগ্রন্থের অমূল্য রত্ন। তাঁহার একটী দোঁহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বাম্‌হন টামন মূরখ ভয়ে শূদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ ঠগর বন্দ আচ্ছা খাবে তুঃখ পাবে পণ্ডিতা ॥
সাংচাকো মারে লাঠা ঝুঠা জগৎ পিতায়।
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বেকায় ॥
সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান পহরে খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই তুনিয়াকা তামাসা ॥"

অর্থ—ব্রাহ্মণ মূর্খ হয়, অথচ শূদ্র গীতা পড়ে। শঠ ও প্রবঞ্চকেরা উত্তম আহার্য্য বস্তু খায়, অথচ পণ্ডিতেরা কষ্ট পায়। লোকে ভাল বস্তুটী পরিত্যাগ করে (লাঠি মারিয়া দূর করে), অথচ খারাপটী আদর করে (পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করে), গোদুগ্ধ (গোরস) পথে পথে পর্য্যটন করিয়া লোককে বিক্রয় করিতে হয়, অথচ মদ্য একস্থানে থাকিয়াই বিক্রীত হইয়া যায়। সতীনারীর বস্ত্র মিলে না, অথচ ভ্রষ্টারা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করে। কবীর বলেন, ভাই, পৃথিবীর কেমন তামাসা দেখ!

ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্যভাগে কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের বহুলোক বাস করেন। মহাত্মা কবীর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাতুর্ভূত হইয়াছিলেন। কবীরপন্থীদের মতে কবীর ৩০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়)।

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করেন। ফরিদপুর জিলায় কলারগাও গ্রামে বাস ছিল।

কমলাকান্ত সর্ব্বভৌম—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকা পণ্ডিত। বিক্রমপুরের কাঠাদিয়া গ্রামের অধিবাসী।

কমলাদেবী—বীরবর পুত্তের পত্নী (পুত্তদেখ)।

কর্ণবতী—বীরবর পুত্তের কনিষ্ঠা ভগিনী (পুত্তদেখ)।

কর্ম্মদেবী—বীরবর পুত্তের জননী (পুত্তদেখ)।

কহ্লন—ইনি কাশ্মীরের রাজগণের ইতিহাস লিখিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম রাজতরঙ্গিণী। ইনি ১০৭০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন।

কাত্যায়ন—বিখ্যাত প্রাচীন বৈয়াকরণ। ইনি পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিক রচনা করেন। ইনি কাত্যায়ন-বররুচি নামে খ্যাত। কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনা করিয়া পাণিনি সূত্রের দোষ সংশোধন করেন। পাণিনির যে সমুদয় সূত্র অনায়াসে বোধগম্য হয় না অথবা যাহা পাণিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ইনি লিখিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম সোমদত্ত। সোমদত্ত জাতিতে ব্রাহ্মণ; তিনি বৎসরাজধানী কৌশাম্বী নগরে বসতি করিতেন। কাত্যায়ন-বররুচি এই সোমদত্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক অতীব যত্নের সহিত লালিত পালিত হন; ইনি প্রখর ধীশক্তিবলে ব্যাকরণ শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি পূর্ব্বজন্মে মহাদেবের পুষ্পদন্ত নামে এক অনুচর ছিলেন; গৌরীর-শাপে মনুষ্যযোনিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ যোগানন্দের মন্ত্রী হন এবং মহাদেবের ক্রোধশান্তির জন্য পাণিনি অধ্যয়ন করেন। (কথাসরিৎসাগর)।

কান্তবাবু—কাশীম বাজারের পরলোকগত মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর পূর্ব্ব পুরুষ। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরজেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংশ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের গবর্ণরের আফিসে কেরাণীর পদগ্রহণ করিয়া প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন। তুই বৎসর কার্য্য করিয়া তিনি এই পদ ত্যাগ করেন এবং কাশিমবাজারের ইংরেজদিগের রেশমের কুঠীর অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এই পদে ৪ বৎসর থাকিয়া তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার কোপে পতিত হন। ১৭৫৬

খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠী অধিকার করেন। হেষ্টিংশ বন্দী হইয়া নবাবের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই সময়ে ইংরেজেরা নবাবের ভয়ে পল্‌তায় পলায়ন করিয়াছিলেন। হেষ্টিংশ নবাবের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া পল্‌তায় গমনপূর্ব্বক ইংরেজদিগকে নবাব সরকারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাপন করেন। কারাগার হইতে পলায়মান হেষ্টিংশকে ধরিবার জন্য নবাবের সৈন্য চারি দিকে ছুটিতে থাকে। হেষ্টিংশ ধরা পড়িবার আশঙ্কায় এক মুদীর দোকানে প্রবেশ করেন। এই মুদীর নাম কান্তমুদী। ইনি পরবর্ত্তিকালে কান্তবাবু নামে খ্যাত হইয়াছেন। হেষ্টিংশের পলায়ন সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বাক্য আছে :—

"হাতীপর হাওদা, ঘোড়েপর জীন।
জল্‌দি চল্ জল্‌দি চল্ ওয়ারেন হেষ্টিং॥"

কথিত আছে যে, কান্তমুদী হেষ্টিংশকে একটি মট্‌কির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং অতি যত্নসহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

কালক্রমে এই হেষ্টিংশ সাহেব ভারতের গবর্ণরজেনারেল হন। এই পদ লাভ করিয়া তিনি কান্তমুদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হন। তিনি কান্তমুদীকে রাজা করিতে চাহিলেন। কান্ত বলিলেন যে, রাজপদ লাভ করিলে লোকে তাহাকে উপহাস করিবে। হেষ্টিংশ কিছুতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে কান্ত বলিলেন যে, যদি বংশানুক্রমে তাঁহাকে রাজপদ দেওয়া হয়, তবে তিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। হেষ্টিংশ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি কান্তমুদীকে রংপুর জিলার অন্তর্গত বাহেরবন্দ পরগণা অর্পণ করিয়া "রাজা" উপাধি দেন। তদবধি কান্তমুদী "রাজা রামকান্ত নন্দী" বলিয়া পরিচিত হইলেন। রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর লোকনাথ নন্দী রাজা হন। লোকনাথ বহরমপুর জেলায় জায়গীর প্রাপ্ত হন। লোকনাথের পুত্র রাজা হরিনাথ, হরিনাথের পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথ বিখ্যাত মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী। (স্বর্ণময়ী দেখ)।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এই প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জয়পুর মহারাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার মন্ত্রিত্বে জয়পুরের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হয়। ইনি রাজস্ব ও শাসন বিভাগে জয়পুরের অশেষ উন্নতি বিধান করেন। বাঙ্গালী যে বিচারকার্য্যের ন্যায় শাসন কার্য্যেও পটু তাহা কান্তিচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন। ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে ১৭৫৫ শকে (ইং ১৮৩৩ খৃঃ, বঙ্গাব্দ ১২৪০ সন) জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্রতাহেতু তাঁহার পিতা তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমতঃ ২৪ পরগণার অন্তর্গত "জনাই" উচ্চইংরেজী স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং কিয়ৎকাল পরে ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশীয়রাজ্যের ভাবী মন্ত্রীকে এইপদে অধিককাল থাকিতে হয় নাই। এই পদ হইতে তিনি জয়পুর মহারাজের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে গমন করেন। স্কুলটীকে কলেজে পরিণত করিবার সময় মহারাজ কান্তিচন্দ্রকে কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৯৯ শকে (ইং ১৮৭৭ খৃঃ) মহারাজ রামসিংহ তাঁহাকে জয়পুর দরবারে অন্যতম সভ্য নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমান মহারাজ যখন নাবালক ছিলেন, তখন কান্তিচন্দ্র রাজপ্রতিনিধি সভার প্রধান সভ্য হন। তৎপর মহারাজ সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক ইঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। কান্তিচন্দ্র ২০ বৎসরেরও অধিককাল প্রধান মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি রাজপক্ষ ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি দান করেন। তিনি ১৮২৩ শকে (ইং ১৯০১ খৃঃ) ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কামন্দক—ইনি চাণক্যের শিষ্য। ইঁহার প্রণীত নীতি গ্রন্থের নাম "কামন্দকীয় নীতিসার"।

কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার—বিক্রম পুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পাঠক। ইনি ভাগবতের বহুশ্লোকের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। 'কিশোরীভজন' নামক উপাসনা প্রণালীর ইনি প্রতিষ্ঠাতা; উহা "কালাচাঁদীমত" নামে কথিত হয়।

কালিদাস—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি এবং উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার প্রধান রত্ন। এই নবরত্নের মধ্যে কালিদাস ও ঘটকর্পর কবি, বররুচি বৈয়াকরণ, অমরসিংহ আভিধানিক, ক্ষপণক ও শঙ্কু দার্শনিক, বেতালভট্ট ঐতিহাসিক, ধন্বন্তরি চিকিৎসক এবং বরাহমিহির জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এই মহাকবির কোন প্রামাণিক জীবনবৃত্ত পাওয়া যায় না। ইঁহার জীবনী কতকগুলি কিম্বদন্তীর উপর স্থাপিত। কালিদাস অসামান্য প্রতিভাশালী কবি ছিলেন; তাঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া লোকে তৎসম্বন্ধে অনেক গল্প প্রস্তুত করিয়াছে। একটী গল্প এই যে, কালিদাস প্রথমে অতি মূর্খ ছিলেন; তিনি এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে শাখায় উপবিষ্ট ছিলেন সেই শাখার মূলদেশ কুঠারে কর্ত্তন করিতেছিলেন। তদ্দেশীয় রাজকন্যা কমলার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া কয়েকজন কূটবুদ্ধি পণ্ডিত ঐ বৃক্ষের পার্শ্ব দেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা কালিদাসের কার্য্য দেখিয়া উঁহাকে মহামূর্খ মনে করিলেন এবং নিজেদের পরাজয়ের প্রতিশোধ কামনায় রাজকুমারীর সহিত এই মূর্খের বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা কালিদাসকে পণ্ডিতবেশে রাজসভায় উপস্থিত করিলেন। পণ্ডিতেরা কালিদাসকে অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিয়াছিলেন। রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তরে কালিদাস বিবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গভঙ্গীগুলি কূটবুদ্ধি পণ্ডিতগণদ্বারা নানারূপে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত বিচার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন; অবশেষে রাজনন্দিনী পরাজিত হইয়া কালিদাসের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। বাসর ঘরেই কালিদাসের বিদ্যা প্রকাশ পাইল। একটা উষ্ট্র শব্দ করাতে রাজকন্যা কালিদাসের নিকট একটী শ্লোক শুনিবেন আশা করিয়া উষ্ট্র সম্বন্ধে একটী শ্লোক রচনা করিতে ইঙ্গিত করেন; কিন্তু কালিদাস শ্লোক রচনা করা দূরে থাকুক "উষ্ট্র" শব্দটীও শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না; তিনি একবার বলিলেন "উষ্ট" আর একবার বলিলেন "উট্র"। রাজনন্দিনী কমলা কপালে করাঘাত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন:—

কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কিং ন দদাতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রেলুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা॥

বিদুষী রমণী ঘৃণায় লজ্জায় মর্ম্মাহত হইয়া কালিদাসকে কক্ষ হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। কালিদাস পত্নী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বনে গমন করেন, তথায় সরস্বতী কুণ্ডে স্নান করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বাগ্দেবীর নিকট বর গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পত্নীর সমীপে উপস্থিত হন। রাজনন্দিনী কমলা কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ানা ছিলেন; কালিদাস কবাটে করাঘাত করিলে কমলা কক্ষাভ্যন্তর হইতে বলিলেন "তুমি কে, কি চাও?" কালিদাস উত্তরে বলিলেন "অস্তি কশ্চিদ্বাগ্বিশেষঃ।" অনতিবিলম্বেই পতি পত্নীতে পরিচয় হইল; কমলা দেখিলেন পতি অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া আসিয়াছেন। কিয়ৎকাল বিশ্রম্ভালাপের পর কমলা তাঁহার প্রথমোচ্চারিত অস্তি, কশ্চিৎ, বাক্ ও বিশেষঃ, এই শব্দচতুষ্টয়দ্বারা চারিখানি কাব্য লিখিতে স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস পত্নীর অনুরোধে "অস্তি," "কশ্চিৎ" ও "বাক্" এই তিন শব্দ দ্বারা ক্রমে কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ আরম্ভ করেন। "বিশেষ" শব্দটী দ্বারা যে কাব্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

কালিদাস সম্বন্ধে আর একটী গল্প এই—

কর্ণাট প্রদেশের রাজা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে প্রচুর পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিতেন। বল্লন পণ্ডিত নামে এক কবি এই কর্ণাটরাজ্যের রাজকবি ছিলেন। যাঁহারা তোষামোদ দ্বারা বল্লন কবিকে

সন্তুষ্ট করিতে না পারিতেন, তাঁহাদের পক্ষে রাজদর্শন অসম্ভব হইত। বড় বড় পণ্ডিত রাজদর্শনে বিফল মনোরথ হইতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্ডিতদিগকে বল্লন কবি রাজার নিকট উপস্থিত করিতেন; বল্লন তাহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া রাজার নিকট নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইতেন এবং পণ্ডিতদিগকেও যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। কিন্তু কোন বড় পণ্ডিত উপস্থিত হইলে বল্লন কবি নানাপ্রকার চতুরতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন, তাঁহার ভাগ্যে আর রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিত না। এই সংবাদ উজ্জয়িনীর নবরত্ন সভায় আসিলে কালিদাস ও বররুচি এই রত্নদ্বয় কর্ণাট রাজসভায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কালিদাস পণ্ডিতভাবে এবং বররুচি তাঁহার ভৃত্যভাবে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে তাঁহারা বল্লন কবির নিকট উপস্থিত হইলেন। বল্লন কবিদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কালিদাস চতুরতাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রভাত বর্ণন করিলেন :—

"প্রাতরুত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয়স্বটঃ।
নগরে ভাষতে কুক্কু চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি॥"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে প্রথম চরণের শেষবর্ণ "টঃ" দ্বিতীয় চরণের "কুক্কু" এই শব্দাংশের সহিত অন্বিত হইতেছে এবং দ্বিতীয় চরণের শেষার্দ্ধ কতকগুলি অব্যয় শব্দ দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে।

বল্লন কবি দেখিলেন, এ নিরেট মূর্খ; তিনি কালিদাসকে রাজদর্শনের আশা দিলেন। পরে রাজদর্শনের জন্য প্রস্থান করিলে, পথে একটী বৃষ দেখিয়া তাহার বর্ণন করিতে কালিদাসকে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস পুনর্ব্বার চতুরতা অবলম্বনে বৃষ বর্ণন করিলেন :—

"গোরপত্যং বলীবর্দ্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে তস্য শৃঙ্গঞ্চাপিচ বর্ত্ততে॥"

ইহা শুনিয়া বল্লন কবি মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মনে করিলেন এই মূর্খ পণ্ডিতটাকে উপস্থিত করিয়া রাজার নিকট নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবেন। বল্লনকবিদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কালিদাস এই শ্লোক দুইটী কাগজে লিখিয়া দিলেন। রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা বল্লন কবিকে তাঁহার হস্তস্থিত কাগজ খানির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বল্লন বলিলেন "এই কাগজে এই কবির রচিত দুইটী শ্লোক আছে।" রাজা শ্লোকদ্বয় পাঠ করিতে বল্লন কবিকে অনুরোধ করিলেন। যেমন বল্লন কবি শ্লোক পাঠ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি কালিদাস তাঁহার হস্ত হইতে কাগজখানি আকর্ষণ করিয়া উহারদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ৬টী শ্লোকে রাজাকে বর্ণন করিলেন। নিম্নে ঐ ৬টীর মধ্যে প্রথম শ্লোকটী উদ্ধৃত করা গেল।

"শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী বাণী নরীনৃত্যতে
তদ্দৃষ্ট্বা কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধাগুণৈঃ।
কীর্ত্তিশ্চন্দ্রকরীন্দ্রকুন্দকুমুদক্ষীরোদনীরোপমা
ত্রাসাদম্বুনিধিং বিলঙ্ঘ্য ভবতো নাদ্যাপি বিশ্রামাতি॥

অর্থ—"হে রাজন্ আপনার মুখে সরস্বতী পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতেছেন; তাহা দেখিয়া (ঈর্ষান্বিত সপত্নী) লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেও আপনার গুণে (পক্ষে রজ্জুতে) আবদ্ধ হইয়া আছেন। লক্ষ্মীকে রজ্জুবদ্ধ দেখিয়া শুভ্রকীর্ত্তি (পাছে তাঁহাকেও আপনি রজ্জু-বদ্ধ করেন, এজন্য) ভয়ে সমুদ্র পার হইয়া ধাবিত হইতেছে, আজ পর্য্যন্তও থামে নাই।" এই পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপূর্ণ শ্লোক শ্রবণ করিয়া রাজা ও বল্লন কবি বিস্মিত হইলেন। ইহার পর রাজার অভিপ্রায় অনুসারে আর একটী শ্লোক তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া পাঠ করেন; এই শ্লোকের শেষচরণের শেষাংশ কালিদাস তাঁহার ভৃত্যকে পূর্ণ করিতে বলাতে ভৃত্যরূপী বররুচি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন। রাজা এবং বল্লন কবি ভৃত্যের কবিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

অতঃপর সকলের পরিচয় হইলে রাজা অতি সম্মানের সহিত নবরত্ন সভার পণ্ডিতদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিলেন এবং প্রচুর পুরস্কার দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশব্যতীত মহাকবি কালিদাস "ঋতুসংহার" ও "নলোদয়" নামক কাব্য, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী নামক নাটক এবং "শ্রুতবোধ" নামে একখানা ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন। "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামে অপর একখানা নাটকও এই কালিদাস বিরচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। বাস্তবিক তাহা নহে; ইহা ভোজরাজের সভাপণ্ডিত অপর এক-কালিদাস কৃত। যে কালিদাস মহাকাব্য শিরোভূষণ রঘুবংশের প্রারম্ভে "ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্প-বিষয়া মতিঃ।" ইত্যাদি শ্লোকে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদশন করিয়াছেন, তিনি "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক একখানা দ্বিতীয়শ্রেণীর নাটক লিখিয়া কি এরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে পারেন যে—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥"

(মালবিকা গ্নমিত্র)।

ইহার ভাবার্থ এই—যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল নহে, এবং যাহা কিছু নূতন সবই মন্দ এরূপ বলা যায় না; ভাল লোকে ভাল মন্দ বিচার করিয়া একটা অবলম্বন করেন, কিন্তু মূঢ়েরা পরের মুখে অন্ন চাকে।

রাজকন্যা কমলা ঘটিত কিম্বদন্তী অবলম্বনে কেহ কেহ অনুমান করেন, কালিদাস এক দিনেই পণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা এই মহাকবির কাব্য নাটকাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। কালিদাস নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; একদিনে এতগুলি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। তাঁহার রচনায় ব্যাকরণদুষ্টপদ অতি বিরল। রঘুবংশে তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্যার এবং কুমারসম্ভবে তাঁহার সাংখ্যদশনে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষদের সম্বন্ধে এরূপ গল্প সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে।

কালীকান্ত ন্যায় পঞ্চানন—বিক্রমপুরের ইছাপুরা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

কালীকান্ত শিরোমণি—বিক্রমপুরের পুরাপাড়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত।

কালীকুমার (দাতা)—এই সদাশয়, দানশীল, পরদুঃখকাতর মহাত্মার পূর্ণ নাম কালীকুমার দত্ত। নিবাস ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত কুকুটিয়া গ্রাম। ইঁহার পিতার নাম রামলোচন দত্ত। কালীকুমার ময়মনসিংহের সদর আমিনী আদালতে উকীল ছিলেন। এই ব্যবসাতে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং সমুদয়ই পরোপকারে ব্যয় করিতেন। দানশীলতার জন্য সর্ব্বসাধারণে তিনি "দাতা কালীকুমার" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি জীবনে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সমুদয়ই দান করিয়া গিয়াছেন। ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে এক পয়সাও তাঁহার সঞ্চিত ছিল না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জন্ম; ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু।

কালীচরণ তর্কালঙ্কার—বিক্রমপুরের বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। জন্ম ১৭৪১ শকে (বঙ্গাব্দ ১২২৬ সন, ১৮১৯ খ্রীঃ) মৃত্যু ১৮১৪ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৯৯, ১৮৯২ খ্রীঃ) বিগত শতাব্দীতে যে কয়জন পণ্ডিত বিক্রমপুরে স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করেন তন্মধ্যে ইনি তৃতীয় স্থানীয়। প্রথম পুরাপাড়া নিবাসী কালীকান্ত শিরোমণি, তৎপর ফুরসাইল নিবাসী জগৎ সার্ব্বভৌম; সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুর পর কালীচরণ বিক্রমপুরে প্রাধান্যলাভ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনিধি তর্কসিদ্ধান্ত। ২১ বৎসরের সময় কালীচরণের পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি কালীপাড়া নিবাসী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট ব্যাকরণ, বটেশ্বর নিবাসী কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কারের নিকট বাদার্থ এবং কালীপাড়া নিবাসী স্মার্ত্তপণ্ডিত রামকানাই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যয়ন করিয়া

নবদ্বীপ চলিয়া যান; তথায় প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তর্কালঙ্কার উপাধি লাভ করেন। এই সাত বৎসরে তাঁহার বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাঁহার মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি অর্থাভাবে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যালয়ে থাকিতে বাধ্য হন। ২৯ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বৃহৎ টোল সংস্থাপন করেন। তাঁহার টোলে ২৫। ২৬ জন ছাত্রও সময়ে সময়ে রহিয়াছে। ১৭। ১৮ জন ছাত্র সর্ব্বদা রহিয়াছে; তিনি তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন। পরোপকার, সাধুতা ও নম্রতা তাঁহার চিরসহচর ছিল। বজ্রযোগিনী নিবাসী শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি বহুছাত্র তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার ৪টী পুত্র উহারা সকলেই পিতার উপযুক্ত সন্তান। উহাদের মধ্যে দুই জন এম, এ, উপাধিধারী। কালীচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর অদ্বৈত ন্যায়রত্ন বিক্রমপুরের স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড, এম, এ, বি, এল্)—এই মহাত্মা ১৮৪৭ খৃঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধ্যভারতে জব্বলপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ কুলীন বংশে কালীচরণের জন্ম। পিতা হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলী জিলার অন্তর্গত থল্লিয়ান গ্রাম। হরচন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে জব্বলপুরে থাকিতেন। কালীচরণ অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এম্, এ, পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন; তৎপর তিনি বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বঙ্গাকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন; তিনি বাঙ্গালীর গৌরব। ১৮৬৩ খৃঃ ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তরুণ বয়স হইতেই সাহেবদের সংস্রবে থাকিলেও তিনি কখনও দেশীয় ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বিলাতে না গিয়াও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সাহেবদের ন্যায় ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তিনি সুরাপানের বিরোধী ছিলেন এবং বাঙ্গালীর নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য বঙ্গদেশে সুরাপাননিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার উদ্যোগে বঙ্গদেশে কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য সভা স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃঃ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ নিবারণে তিনি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়াও ইংরেজদিগের প্রিয় ছিলেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি এবং জেনারেল এসেম্বি ও ফ্রিচার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যাপকতা করিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার ছিলেন। সাহেবেরা শতমুখে তাঁহার জ্ঞানের ও চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। সাধুতা ও নম্রতা দেখিয়া সাহেবেরা তাঁহাকে "ধার্ম্মিক খৃষ্টান" আখ্যা দিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই পারিবারিক শোকে ও দৈহিকরোগে ক্লেশ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯০৭ খৃঃ ৬ ফেব্রুয়ারী ইঁহার দেহত্যাগ হয়। কলিকাতার অধিকাংশ খ্যাতনামা ব্যক্তি ইঁহার শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি স্থল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; স্বয়ং ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার ইঁহার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

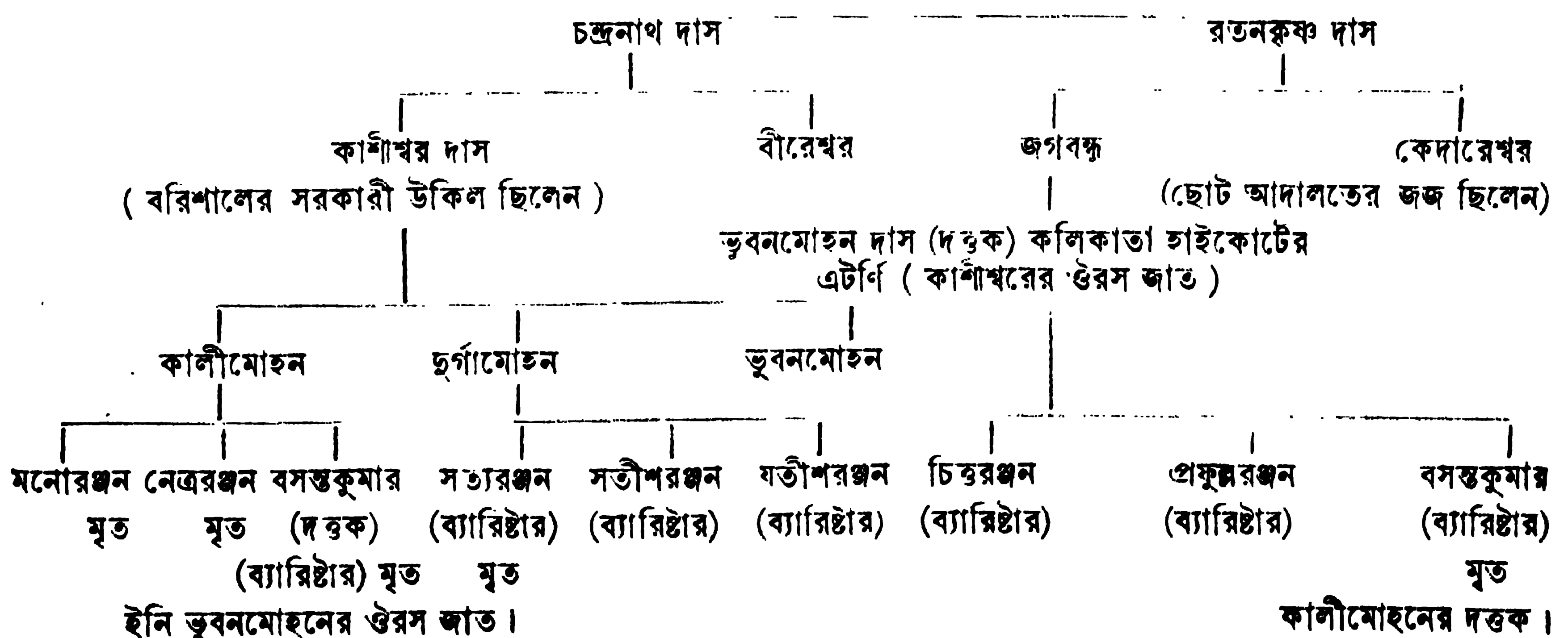
কালীনারায়ণ রায় (রাজা)—ঢাকা জিলার ভাওয়াল পরগণার রাজা। ইঁহার রাজধানী জয়দেবপুর। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৭৪০ শকে ২৫শে শ্রাবণ (১৮১৮ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১২২৫ সন) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮২ সনে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্তহন। পিতা গোলোকনারায়ণ রায় বঙ্গাব্দ ১২৬৩ সনের পৌষ মাসে পরলোক গমন করেন; তৎপর ইনি জমিদারীর ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। বঙ্গাব্দ ১২৮৫ সনে ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৭৮০ শকে (১৮৫৮ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১২৬৫ সনে) আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি "রাজাবাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন। ইনি ১৩০৮ সনের ১৩ই বৈশাখ অকালে পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—(রায়বাহাদুর, সি. আই. ই.)—বঙ্গভাষায় সুপ্রতিষ্ঠ লেখক। ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে বঙ্গাব্দ ১২৫০ সনে (১৮৪৩ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৭ বঙ্গাব্দ ১২ই শ্রাবণ (১৯১০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই) রাত্রি প্রায় ৪½ ঘটিকার সময় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ-

গুলি লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। (১) প্রভাতচিন্তা, (২) নিভৃতচিন্তা, (৩) নিশীথচিন্তা, (৪) প্রমোদলহরী, (৫) ভ্রান্তিবিনোদ, (৬) ভক্তিরজয়, (৭) মা না মহাশক্তি, (৮) সীতার অগ্নি পরীক্ষা, (৯) ছায়াদর্শন, (১০) কোমল কবিতা, (১১) বর্ণপাঠ, (১২) আদর্শ। এই সকল পুস্তকই তাঁহাকে বঙ্গভাষাভাষীর নিকট অমর করিয়া রাখিবে। কালীপ্রসন্ন কর্ত্তৃক পরিচালিত বান্ধব নামক মাসিক পত্র বাঙ্গালীর অতিশয় আদরের সামগ্রী ছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—ইনি কলিকাতার যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহবংশীয় জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। ইনি সংস্কৃত বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি বাঙ্গালাতে সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। তৎপ্রণীত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা" নামক ব্যঙ্গকাব্য বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহা পাঠ করিলে কলিকাতার তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইনি ধনীর সন্তান, নিজে ধনী; এই বিদ্যোৎসাহী জমিদার অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি নিজ ব্যয়ে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ পূর্ব্বক বাঙ্গালীজাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের অনুবাদকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই কার্য্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রভূত অর্থ বাহির হইয়া যায়। নিজের অমিতব্যয়িতার জন্য ইনি শেষ জীবনে অর্থাভাবে পতিত হইয়া কষ্ট পান। ঋণের দায়ে ইঁহার জমিদারীর অনেক অংশ নিলাম হইয়া যায়।

কালীমোহন দাস—ইনি বিখ্যাত দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর। (দুর্গামোহন দাস দেখ)। ইনিও কনিষ্ঠের ন্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল ছিলেন। ১৭৬০ শকে ১৭ই শ্রাবণ (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কালীমোহন অসাধারণ স্বদেশহিতৈষী ও পরোপকারপরায়ণ ছিলেন। তিনিও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গামোহনের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু পরে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে গৃহীত হন। তিনি বিক্রমপুরে তেলীরবাগের বাড়ীতে মহাদেব স্থাপন করিয়া গ্রামের অধিকাংশ সম্পত্তি এই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। আজ পর্য্যন্ত এই দেবতার নামে তাঁহার বাড়ীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তিনি চরমপত্রে (উইলে) একটি চিকিৎসালয়, একটি বিদ্যালয় এবং একটি অতিথিশালার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তেলিরবাগে এখনও এই সকল বর্ত্তমান থাকিয়া এই মহাত্মার উদারহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। চন্দ্রনাথ দাস ও রতনকৃষ্ণ দাস নামে দুই সহোদর তেলিরবাগে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বৈদ্যবংশে যে সমুদয় লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, নিম্নে প্রদত্ত বংশাবলী পত্র পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে।



কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ (সি, আই, ই)—বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি। ইনি গাউদ সারস্বত নামক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৭৭২ শকের ১৩ই ভাদ্র (১৮৫০ খৃঃ ৩০শে আগষ্ট ; বঙ্গাব্দ ১২৫৭ সন) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বাপু রামচন্দ্র তেলাঙ্গ ; ইনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ত্রিম্বক রামচন্দ্র তেঙ্গাল ইঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। কাশীনাথ ১৮৬৪ খৃঃ বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন ; ১৮৬৬ খৃঃ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর ১৮৬৭ খৃঃ তিনি এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজের ফেলো হন। তিনি পাঁচ বৎসর এই কলেজে ফেলো থাকেন ; এই অবস্থায় তাঁহাকে কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত পড়াইতে হইত। ১৮৬৮ খৃঃ তিনি এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর "ভগবান দাস পুরুষোত্তম দাস বৃত্তি" লাভ করেন। ১৮৭০ খৃঃ তিনি এল,এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত হাইকোর্টে ওকালতীর শিক্ষানবিশী করেন। ১৮৭২ খৃঃ তিনি এড্‌ভোকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন। ওকালতি করিয়াও তিনি সংস্কৃত সাহিত্যচর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই ; তিনি সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকের টীকা বাহির করেন। তিনি যেমন আইনজ্ঞ ছিলেন তেমনি বাগ্মী ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ খৃঃ "লাইসেন্স্‌ ট্যাক্স" সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ সভায় তীব্র বক্তৃতা করেন। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি তুলা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। গুণগ্রাহী বড়লাট রিপণ তাহাকে ১৮৮২ খৃঃ শিক্ষা কমিশনের সভ্য নিযুক্ত করেন এবং এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধি দান করেন। তিনি বোম্বাই টাউন হলে "ইলবার্ট বিল" সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন। ১৮৮৫ খৃঃ তিনি ও বিখ্যাত দেশহিতৈষী ফিরোজ সা মেটা "বোম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন" নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপন করেন। এ, ও, হিউম সাহেবের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া তিনি ১৮৮৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির গঠন করেন। ১৮৮৯ খৃঃ বোম্বাই হাইকোর্টের দেশীয় জজ নানাভাই হরিদাসের মৃত্যুর পর কাশীনাথ উক্ত হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। তিনি দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃঃ তিনি "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি"র বম্বে শাখার সভাপতি নিযুক্ত হন। এই পদে আর কোন ভারতবাসী পূর্ব্বে আসীন হন নাই। এই বৎসর বম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাইস্‌ চ্যান্সেলার" পদে নিযুক্ত করেন। হাইকোর্টের জজপদে আসীন থাকিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকিলেও তিনি সর্ব্বদা জাতীয় মহাসমিতির প্রতি স্নেহদৃষ্টি করিতেন। ১৮৯২ খৃঃ শেষভাগে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং কয়েক মাস ক্লেশ পাইয়া ১৮৯৩ খৃঃ ১লা সেপ্টেম্বর অকালে ৪৩ বৎসর মাত্র বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইংরেজ ও দেশীয় জজগণ সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন। বম্বের গবর্ণর লর্ড হেরিশ তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ টাউন হলে সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে সভাপতিত্ব করেন ; এই শোকসভায় সার চার্লস্‌ সার্জেণ্ট প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ও বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দেশীয় সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে উৎসাহ দান করিতেন।

কাশীরাম দাস—মহাভারতের বিখ্যাত অনুবাদক। ইঁহার মহাভারত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বর্ত্তমান। কাশীরাম বর্দ্ধমান জিলায় সিঙ্গিনামক গ্রামে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লোকান্তর গমন করেন। ১৫২৬ শকে (১৬০৪ খৃঃ) তিনি বিরাটপর্ব্ব লিখেন। তিনি মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই ; আদি, সভা ও বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ ও বিরাট পর্ব্বের কতক অংশ লিখিয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত, তিনি পিতার মধ্যমপুত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদর কৃষ্ণদাস ও কনিষ্ঠ গদাধর উভয়েই কবি ছিলেন এবং উভয়েই সুন্দর কাব্য লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। পুত্র নন্দরাম ; তিনিও পিতার কবিশক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কাশীদাসের অনুবাদ আর্ষ মহাভারতের অনুযায়ী হয় নাই, উহার ছায়া মাত্র। মধ্যে মধ্যে পুরাণের গল্পও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, পুরাণপাঠকদের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাঁহার এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

কাসেম বারিদ শাহ্—ইনি দাক্ষিণাত্যের বারিদশাহি সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি একজন সামান্য দাসরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন, পরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়াতে দাক্ষিণাত্যের নরপতি সুলতান ২য় মোহাম্মদশাহের প্রধান উজীরের পদ লাভ করেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে নিজেই এই রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পর এই বংশের ৬ জন সুলতান আহ্মদাবাদ-বিদরে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় আমির বারিদ শাহ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র ধ্বজসিংহ (রাজা)—মণিপুরের রাজগণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আধুনিক রাজগণের মধ্যে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র (বা চন্দ্রকীর্ত্তি) বিশেষ খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গম্ভীর সিংহ। ইনিই কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের বিনাশ সাধন করেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন; তখন তাঁহার বয়স অল্প; নরসিংহনামক সেনাপতিই রাজকার্য্য চালাইতেন। দশ বৎসর পরে নরসিংহ স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপর রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন এবং নরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র চৌবা সিংহকে যুবরাজ পদে স্থাপন করেন, যেহেতু চৌবা সিংহ রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র মণিপুরের বাণিজ্য শিল্পাদি সম্বন্ধে প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোহিমা অধিকার কালে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া কে. সি. এস্ আই. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র রাজা হইলেন। ইহাতে চৌবা সিংহ দুঃখিত হইলেন, যেহেতু রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহাকে যুবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করাতে রাজার মৃত্যুর পর নিয়মানুসারে তাঁহারই সিংহাসন পাওয়ার কথা। চৌবা সিংহ সিংহাসন লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে শূরচন্দ্রের সঙ্গে তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। শূরচন্দ্র তাড়িত হন এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কুলচন্দ্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন। এতদ্বিষয়ে বিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপরোধ পালিত না হওয়ায় আসামের তদানীন্তন চিফ কমিশনর কুইণ্টন সাহেব ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মণিপুর গমন করেন এবং সেখানে পাত্রমিত্র সহ নিহত হন। ইহাতে মণিপুরযুদ্ধ ঘটে। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন এবং কুলচন্দ্র নির্ব্বাসিত হন। রাজা নরসিংহের পৌত্র চূড়াচাঁদ সিংহ নামে একটী পঞ্চম বৎসরের বালক ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মণিপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

কুতুব-উদ্দিন-আইবেক্—দিল্লীর সম্রাট। ইনি ঘোর ও গজনীর সুলতান সাহেব-উদ্দিন ঘোরীর একজন সামান্য দাস ছিলেন। সুলতানের প্রিয় হওয়াতে ইনি সেনা বিভাগে উচ্চকর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাওকে পরাভূত করিয়া সুলতান সাহেব-উদ্দিন ঘোরী ইঁহাকে ভারতবর্ষে তদীয় রাজ্য শাসন করিতে অনুমতি দিয়া যান। কুতুব-উদ্দিন এই বৎসরেই দিল্লী ও মিরাট জয় করিয়া ক্রমে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সাহেব-উদ্দিন ঘোরীর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গিয়াস-উদ্দিন মোহম্মদ কুতুব-উদ্দিনকে সুলতান উপাধি দিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট করিয়া দেন। এই সনের ২৭শে জুন কুতুব দিল্লীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন। এই রাজবংশ দিল্লীর দাস-রাজবংশ নামে খ্যাত। কুতুব-উদ্দিনের পর এই বংশের ১০ জন সুলতান দিল্লীতে রাজত্ব করেন।

কুনাল—(কুণাল) বিখ্যাত রাজা অশোকের পুত্র। রাজমহিষী পদ্মাবতীর গর্ভে কুনালের জন্ম। কুনাল কাঞ্চনমালা নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সৌন্দর্য্যেই তিনি লক্ষীবান্ ছিলেন। তাঁহার নয়নের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিমাতা তিষ্যরক্ষা তাঁহার প্রতি আসক্ত

হন এবং একদিন তাঁহার নিকট অসদভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ধর্ম্মভীরু কুনাল কামপরবশা বিমাতার প্রস্তাব ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করেন। বিমাতা তিষ্যরক্ষা ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প করেন যে, কুনালের যে সুন্দর নয়নদ্বয় তাঁহার পরিতাপের কারণ হইয়াছে তাহা তিনি নষ্ট করিবেন। কুনাল পিতার আদেশে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনের জন্য গমন করিলে, বিমাতা তিষ্যরক্ষা সাতদিনের জন্য অশোকের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিষ্যরক্ষা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই কুনালের চক্ষু উৎপাটনের জন্য তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ প্রদান করেন। তিষ্যরক্ষার আদেশ পুত্র কুনালের হস্তে পতিত হইল, কিন্তু কুনাল ইহা রাজাজ্ঞা মনে করিয়া নিজ চক্ষু উৎপাটন করাইলেন; পরিশেষে বড় কষ্টে সাধ্বী পত্নী কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষুকবেশে রাজধানীতে উপনীত হইলেন। পিতার সহিত পরিচয় হইলে, অশোক তিষ্যরক্ষার প্রাণবধের আদেশ দেন, কিন্তু কুনাল পিতাকে স্ত্রী হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন। কুনাল বলিলেন যে, তাঁহার চর্ম্মচক্ষু নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি মানসচক্ষু লাভ করিয়াছেন। সভাস্থ লোক কুনালের ক্ষমাগুণ দেখিয়া তাঁহাকে দেবতা মনে করিলেন।

(বুদ্ধদেব চরিত্র)

কুমারিল ভট্ট—বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও বেদের ভাষ্যকার। ইনি প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। ইনি মীমাংসাবার্ত্তিক ও তন্ত্রবার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। ইনিই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকৃত করিয়া বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন এবং ইঁহার পরে শঙ্করাচার্য্যের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম নির্জ্জিত ও বৈদিকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। (শঙ্করাচার্য্য দেখ)। কুমারিল ভট্ট তর্কস্থলে বৌদ্ধদিগকে বলিয়াছিলেন "বুদ্ধশাস্ত্র মানবকল্পিত কিন্তু বেদ নিত্য; মানবকল্পিত শাস্ত্রের উপর কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।" তিনি বেদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা লিখেন। বৌদ্ধেরা কুমারিলের সহিত তর্কে বৈদিক দেবতাদিগের চরিত্রদোষ উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিলে, কুমারিল যুক্তিদ্বারা তাহা সমর্থন করেন। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা গমন করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র গুরুপত্নী গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুমারিল বলেন যে ঐ সমুদয়ের অর্থ বৌদ্ধেরা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলেন প্রজাপালন করেন বলিয়া প্রজাপতি শব্দে সূর্য্য বুঝিতে হইবে; এবং ব্রহ্মা সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। সূর্য্যার্ঘ প্রদানকালে লোকে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে :—

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে,
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।"

অর্থ—"ব্রহ্ম প্রভাযুক্ত বিষ্ণু তেজোময় জগৎ প্রসবিতা শুচি কর্ম্মফলদায়ী সবিতা বিবস্বৎকে নমস্কার।" (দেবতত্ত্ব)।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। কুমারিল বলেন যে, অরুণোদয় সময়ে উষার উৎপত্তি হয়; এজন্য উষাকে সূর্য্যের দুহিতা বলা হইয়াছে। উষার সহিত সূর্য্যের তেজঃ সংযোগ ঘটে এজন্য উষা ও সূর্য্যের সংযোগকে স্ত্রীপুরুষ সংযোগরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গুরুপত্নী অহল্যাতে ইন্দ্রের উপগত হওয়া সম্বন্ধে কুমারিল বলেন যে, ইন্দ্র শব্দ সূর্য্যবোধক। "তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতু ইন্দ্রপদবাচ্য। অহনি (অর্থাৎ দিনে) লয় হয় বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্রকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নহে।" (দেবতত্ত্ব)। এইরূপে কুমারিল পরস্ত্রীসতীত্বনাশের অপবাদ হইতে ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কুম্ভ (রাণা)—ইনি মিবারের রাণা মুকুলের পুত্র। রাণা মুকুল ষড়যন্ত্রকারীদের হস্তে অকস্মাৎ নিহত হইলে তদীয় পুত্র রাণা কুম্ভ ১৩৪১ শকে (১৪১৯ খৃঃ) মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে মিবার অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার বাহুবলে মিবাররাজ্যের পরিসর দৃশদ্বতী নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি শত্রুর প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেন; নৃশংসাচার তাঁহার সেনামধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার

সময়ে মালব ও গুজরাট রাজাদ্বয় অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; মালবাধিপতি মামুদ গুজরাটের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া এই উভয় রাজ্যের সেনা পরিচালনপূর্ব্বক মিবার রাজ্য আক্রমণ করেন। কুম্ভ একলক্ষ অশ্বারোহী ও ১৪ হাজার হস্তী লইয়া মামুদের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে মামুদ পরাজিত ও বন্দী হয়। বন্দী মামুদকে রাণা কুম্ভ সদয় ব্যবহারে মুক্তিপ্রদান করেন এবং তাঁহাকে বহুমূল্য রত্নাভরণ উপহার স্বরূপ অর্পণ করেন। মামুদ ৬ মাস কাল চিতোরের কারাগারে বন্দী ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে দিল্লীর সম্রাটের সহিত যখন কুম্ভের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন মামুদ রাণা কুম্ভের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বজাতীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। ৫০ বৎসর রাজত্বের পর তিনি স্বীয় পুত্র উডা কর্ত্তৃক ১৩৯১ শকে (১৪৬৯ খৃঃ) হত হন।

কুলি কুতুব শাহ্ (সুলতান)—ইনি গোলকুণ্ডার কুতুব শাহি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতা কুতুব-উল্-মুল্ক তুরস্ক হইতে অর্থোপার্জ্জনের আশায় দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সুলতান মোহাম্মদ শাহ্ বাহমনির কর্ম্মচারী হন। এই কার্য্য হইতে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়া একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক হইয়া উঠেন। বাহমনি সুলতান বংশের পতনের পর ইনি ১৫১২ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ৩২ বৎসর রাজত্বের পর ইনি ইঁহার পুত্রের প্ররোচনায় এক দাসকর্ত্তৃক নিহত হন (১৫৩১ খ্রীঃ ২রা সেপ্টেম্বর)। ইঁহার পর ৬ জন সুলতান গোলকুণ্ডায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কুল্লূট ভট্ট—মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার। ইনি "মন্বর্থ মুক্তাবলী" নামে মনুসংহিতার টীকা রচনা করিয়া ভারতে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম দিবাকর ভট্ট এবং নিবাস গৌড়ের অন্তর্গত বর্ত্তমান রাজসাহী জিলায় নন্দনা নামে গ্রাম। ইনি বরেন্দ্রশ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রজ ব্রাহ্মণ। ইনি কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং তথায় অবস্থান কালে উক্ত বিখ্যাত টীকা প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম পুরুষোত্তম বেদান্তী। তাহেরপুরের বর্ত্তমান রায়বংশীয় রাজগণ এই পুরুষোত্তমের বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি গোবিন্দরাজ বিরচিত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া নিজ ভাষ্য রচনা করেন এবং নিজভাষ্যের বহুস্থানে গোবিন্দমত খণ্ডন করেন।

কুসুমদেব—ইনি "দৃষ্টান্ত শতক" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইনি উজ্জয়িনীর রাজা ভর্ত্তৃহরির সভাসদ্ ছিলেন।

কৃত্তিবাস—বঙ্গের বিখ্যাত প্রাচীন কবি। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ অবলম্বনে স্বীয় কাব্যখানি লিখিয়াছেন, কিন্তু এই কাব্যে বর্ণিত অনেক ঘটনা আর্ষ রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলী হইতে পৃথক্ ও পৃথক্‌ভাবে বিন্যস্ত। কৃত্তিবাস নিজ কবিশক্তি ও উদ্দাম কল্পনাবলে তৎপ্রণীত রামায়ণের ঘটনাবলী এরূপ জীবন্তভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যে ইহা পড়িয়া মনে হয় ইহা যেন বাস্তবিকই বাল্মীকি রামায়ণের অবিকল অনুবাদ।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—বঙ্গের বিখ্যাত গীতিকাব্য-লেখক। ইনি নদীয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার এলাকায় ভাজনঘাট গ্রামে ১৭৩২ শকে (১৮১০ খৃঃ) এক বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুরলীধর ঠাকুর, মাতা যমুন দেবী। পিতা তাঁহাকে ৭ বৎসরের সময় বৃন্দাবনে লইয়া যান; এখানে একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে অভিলাষ করায়, মুরলীধর পুত্রকে লইয়া বৃন্দাবন হইতে প্রস্থান করেন। কৃষ্ণকমল ১৩ বৎসর বয়সের সময় বাড়ী আসিয়া নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই টোলে অধ্যয়নের সময় তিনি "নিমাই সন্ন্যাস" নামক প্রসিদ্ধ যাত্রার পালা রচনা করেন; নবদ্বীপবাসিগণ এই পালা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি ১৮৩৫ খৃঃ বিবাহ করেন এবং বিবাহের পর এক ধনী শিষ্যের সঙ্গে ঢাকায় আসেন। এই সময় ঢাকা সঙ্গীতচর্চ্চার কেন্দ্রভূমি ছিল। এই স্থানই কৃষ্ণকমলের কার্য্যক্ষেত্র হইল। পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে কৃষ্ণকমলের গান গীত হইত; তাঁহার গীতি

শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নয়ন প্রেমাশ্রুতে আপ্লুত হইত। ঢাকায় আসিয়া তিনি "স্বপ্নবিলাস" "দিব্যোন্মাদ" (রাই উন্মাদিনী), ও "বিচিত্রবিলাস" রচনা করেন। এই গীতি কাব্যগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে; এই সমুদয় পালা যাত্রাগানে এখনও পূর্ব্ববঙ্গে গীত হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে আর কেহ এইরূপ সুললিত পদাবলী লিখিতে পারেন নাই। ১৮১০ শকে (১৮৮৮ খৃঃ) ১২ ই মাঘ ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক—এই বিখ্যাত পুরাণ পাঠক দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত কাসাভোগ গ্রামে অনুমান ১২২৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কাসাভোগ গ্রাম এখন পদ্মার দক্ষিণ পাড়ে ও ফরিদপুর জিলায় অবস্থিত। পিতার নাম রামসুন্দর পাঠক। "জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।" ইত্যাদি গানটি পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের নিকট সুপরিচিত। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—এই বিখ্যাত বঙ্গীয় কবি খুলনা জিলায় সেনহাটি গ্রামে এক বিখ্যাত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অরবিন্দ-বংশের নরহরিদাস তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। বাল্যবয়সে তিনি পার্সী পড়েন। তিনি সুবিখ্যাত পারসিক কবি হাফেজের কবিতা অনুবাদ করিয়া সম্ভাবশতক নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; বঙ্গের মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে এই পুস্তক বহুবর্ষকাল পাঠ্য ছিল। বঙ্গীয় পাঠক অবগত আছেন যে এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ কবিতাগুলি কত মধুর ও কত উপদেশপ্রদ—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥

ইত্যাদি কবিতা যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি ঢাকায় আসিয়া "ঢাকা প্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন; এই পত্রিকা তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি যশোহর জিলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করিতেন; সধুতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য তিনি যশোহর নগরের সকল শ্রেণীর লোকের ভক্তিভাজন ছিলেন। তাঁহার সাধুতার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনা যায়; তন্মধ্যে দুইটী নিম্নে লিখিত হইল। যশোহর জিলাস্কুলে হেড্ পণ্ডিতী করিবার সময় একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া পুরাতন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত টাকাতে সংসারের ব্যয় সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় কি না? ভৃত্য বলিল যে তৎপ্রদত্ত টাকাতে সংসারের ব্যয় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে, কোন কষ্ট হয় না। কৃষ্ণচন্দ্র স্কুলে আসিয়া প্রধান শিক্ষককে বলিলেন যে, তিনি বেতনবৃদ্ধি প্রার্থনা করেন না, যেহেতু তাঁহার বর্ত্তমান বেতনেই সংসার সুন্দররূপে চলিয়া যাইতেছে; তিনি বিনা প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। এরূপ স্বার্থত্যাগ কয়জনের আছে? আর একদিন কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরের বাজারে কোন বস্তু ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। বিক্রেতাকে উচিত মূল্য বলিতে বলায়, বিক্রেতা যাহা চাহিল, তিনি তাহাই দিয়া বস্তুটী গ্রহণপূর্ব্বক বাসায় আসিতেছিলেন। ইত্যবসরে বিক্রেতা হৃদয়ে এক বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল; সে উচিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য চাহিয়াছিল; ইহাতে তাহার মনে হঠাৎ একটা অশান্তির ভাব উদয় হয়। বিক্রেতা উর্দ্ধশ্বাসে কৃষ্ণচন্দ্রের বাসার অভিমুখে ছুটিল। কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট গিয়া সে যে মূল্য অধিক গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ফেরত দিতে চাহিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন 'যাহা দিয়াছি তাহা ফেরত লইব না।' এই বলিয়া তাহাকে ভবিষ্যতে সতর্ক হইতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। এই ঘটনার পর আর কোন বিক্রেতা তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিত না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি একদিন কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের

বাসায় গমন করিয়া তাঁহার নিকট পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য বিচারপ্রার্থী হইলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভক্তিভাজন পণ্ডিত মহাশয়কে বিচারপ্রার্থী হইতে দেখিয়া মহা বিপদে পড়িলেন; পণ্ডিত কিছুতেই ছাড়িতেছেন না; অগত্যা তিনি এক টাকা জরিমানা করিলেন। পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র উহা ডেপুটীর হস্তে অর্পণ করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করেন। পরদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ টাকার সহিত ৪০৲।৫০৲ টাকা দিয়া সহরের গণ্য মান্য কয়েকজন লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের সাধুতার বিষয় অবগত ছিলেন। এরূপ ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বরপরায়ণ লোক সংসারে অতি দুর্লভ।

কৃষ্ণচন্দ্র (মহারাজ)— নবদ্বীপের বিখ্যাত রাজা। ইনি রঘুপতি রায়ের পুত্র। ১৬৩২ শকে (১৭১০ খৃঃ) ইঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য রামগোপালেরই রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কৌশল ক্রমে তিনি পিতৃব্যকে বঞ্চিত করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর নিকট হইতে নবদ্বীপের রাজসনদ লাভ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আলীবর্দ্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার নবাব হন। সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর পর এই চতুর নৃপতি বাঙ্গলার নবাব মীরকাশিমের বিষনয়নে পতিত হন। মীরকাশিম কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করেন এবং ইঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন; কিন্তু এই চতুর রাজা তদীয় পুত্র শিবরামের সহিত এক বৃহৎ পূজার ছল করিয়া সে যাত্রায় রক্ষা পান। সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর পর ইংরেজেরা ইঁহাকে প্রভুত উপঢৌকন দান করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁহার একটী গুণ উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান ছিল; তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তদানীন্তন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের সহিত তিনি স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে আলাপ করিতেন। তাঁহার রাজসভায় পণ্ডিতগণ যথেষ্ট আদর ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন উভয়েই কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ঋণী। উভয়েরই উন্নতি ও খ্যাতির মূলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র; তাঁহারই সাহায্যে ও উৎসাহে ইঁহারা সংসারের চিন্তা বিরহিত হইয়া উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়নে যশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পরিবার ভরণপোষণের জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন; তাঁহারই অনুগ্রহে রামপ্রসাদ ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি ভারতচন্দ্রকে "রায়গুণাকর" এবং রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭০২ শকে (১৭৮০ খৃঃ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন। নবদ্বীপের রাজবংশ কেশরকুণি শ্রোত্রিয়। কেশরকুণি একটী গ্রাম; এই গ্রাম বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। গ্রামী শব্দের অপভ্রংশে গাঁই। এজন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গাঁই কেশরকুণি। আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশীয়গণের ভরণ পোষণের জন্য তদানীন্তন হিন্দু রাজা ৫৬ খানি গ্রাম দান করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায়গণের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণের ১৬টী পুত্র। এই ১৬টী পুত্র বন্দ্যগ্রাম, গড়গড়ি, কেশরকুণি, কুসুমকুলী, কুলভী, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলা, বড়াব, মাসচটক, কুশারি প্রভৃতি ৩২ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। উক্ত ১৬টী পুত্রের মধ্যে নিপ নামক পুত্র কেশরকুণি গ্রাম লাভ করেন। এই কেশরকুণি গ্রাম হইতে কেশরকুণি গাঁই সৃষ্ট হইয়াছে। বড়া হইতে বড়ালগাঁই হইয়াছে। কেশরকুণিগণ ভবানন্দের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—ইনি "লালাবাবু" নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত। ইঁহার ভার্য্যা দানশীলা রাণী কাত্যায়নী। ওয়ারেন হেষ্টিংশের বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইঁহার পিতামহ। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি উড়িষ্যার করদমহল-সমূহের দেওয়ান হইয়া গমন করেন। এই সরকারী কর্ম্মে তাঁহাকে বহুদিন থাকিতে হয় নাই। তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জমিদারীর সুব্যবস্থায় মনোযোগ দেন। এক দিন জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক গৃহস্থ বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন এমন সময় শুনিলেন যে, গৃহস্থ কন্যা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "বাবা বেলা ত গেল, বাস্‌নায় আগুন দেও।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের বৈরাগ্য আসিল। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছে তথাপি সংসারে পূর্ণ মাত্রায় আসক্তি রহিয়াছে। গৃহস্থ কন্যার "বাস্‌নায় আগুনে" কৃষ্ণচন্দ্রের

আন্তরিক বাসনা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তিনি পূর্ণ যৌবন সময়ে ৩০ বৎসর বয়সে সংসারত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি সাধারণতঃ মথুরাতেই থাকিতেন। তিনি বৃন্দাবনে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক প্রস্তর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে "কৃষ্ণচন্দ্রমা" নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দির "লালাবাবুর কুঞ্জ" নামে বিখ্যাত। এই কুঞ্জের সংলগ্ন এক অন্নসত্র আছে; ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক প্রায় দুই হাজার টাকার বরাদ্দ আছে। এত ঐশ্বর্য্য থাকিতেও তিনি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি অমরধামে চলিয়া যান। ধর্ম্মপ্রাণতা, নিরহঙ্কার ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তিনি ভারতের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—বঙ্গভাষায় বিখ্যাত "চৈতন্য চরিতামৃত" লেখক। শ্রীচৈতন্যের জীবনী লেখকগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদলাভের অধিকারী। ১৪৩৯ শকে (১৫১৭ খ্রীঃ) বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ঝামাটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম ভগীরথ। কৃষ্ণদাসের ৬ বৎসরের সময় তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। পিতৃ বিয়োগের অল্পকাল পরেই তিনি মাতৃহীন হন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। তৎকৃত বঙ্গভাষায় লিখিত "চৈতন্য চরিতামৃত" একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ; এই গ্রন্থের রচনা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতাদোষে দুষ্ট নহে। এই পুস্তকে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যের উপদেশ অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা শিখদিগের গ্রন্থ-সাহেবের ন্যায় চরিতামৃতকে অত্যন্ত ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত, আদিখণ্ডে দশ পরিচ্ছেদ ও ২৫০০ শ্লোক; মধ্যখণ্ডে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ এবং শেষ খণ্ডে বিংশ পরিচ্ছেদ ও ৬৫০০ শ্লোক। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত-লোক ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ জীবনের ঘটনাবলী চৈতন্যভাগবতে বিশেষভাবে বর্ণিত নাই দেখিয়া বৃন্দাবনস্থিত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন বিস্তারিতরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণদাসের বয়স ৮০ বৎসরেরও অধিক। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বন্ধুগণের অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ৯ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১৬১৫ খ্রীঃ ইহা সম্পূর্ণ করেন। পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া তিনি বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ে প্রেরণ করেন, কিন্তু পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুগণ ইহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। এই সংবাদে কৃষ্ণদাস শোকে অভিভূত হইলেন। যে পবিত্র কার্য্যে তাঁহার শেষ জীবন নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা এইরূপে নষ্ট হইল দেখিয়া হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে অনতিবিলম্বে দেহত্যাগ করেন। "চৈতন্য চরিতামৃত" সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ এই:—জীবগোস্বামী দেখিলেন যে, এই গ্রন্থ সকলের আয়ত্ত হইলে কেহ আর তদীয় পিতৃব্য রূপ সনাতনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে না; এই আশঙ্কায় তিনি হস্তলিখিত গ্রন্থখানি যমুনার জলে ফেলিয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হইয়া মথুরায় গমন করিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র খেদ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের শিষ্য মুকুন্দ চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময় প্রত্যেক অধ্যায়ের নকল রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসকে দুঃখিত দেখিয়া সেই নকল পুস্তকখানি তিনি গুরুকে দিলেন। কৃষ্ণদাস যেন তাতে স্বর্গ পাইলেন; তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এদিকে যমুনায় নিক্ষিপ্ত গ্রন্থ ভাসিতে ভাসিতে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। জীবগোস্বামী সেখানি তুলিয়া কুঠরীতে আবদ্ধ করিলেন। কবিকর্ণপুর বৃন্দাবনে আসিলে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে চৈতন্য চরিতামৃতের কথা বলেন, কর্ণপুর তাহা জীবগোস্বামীকে বলাতে জীব কুঠরী হইতে গ্রন্থখানি বাহির করিয়া দেন। কৃষ্ণদাস মুকুন্দের নকল পুথিখানা বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন; স্বহস্ত লিখিত পুথিখানি এখনও বৃন্দাবনে। এই প্রবাদে বিখ্যাত ভক্ত বৈষ্ণব কবি জীবগোস্বামীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা বিশ্বাস করিতে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রবাদ একবারে অগ্রাহ্য করা যায় কিনা তাহাও বিচার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণদাস কখনও বিবাহ করেন নাই; তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও দরিদ্রতার পীড়নে অভিভূত হন নাই।

কৃষ্ণদাস পাল—বিখ্যাত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা নগরীতে এক তিলি বংশে ১৭৬০ শকে (১৮৩৮ খৃঃ) কৃষ্ণদাস পাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র পাল। ঈশ্বরচন্দ্র দুরবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। কৃষ্ণদাস তাঁহার একমাত্র পুত্র। ১০ বৎসর বয়সে ১৮৪৮ খৃঃ কৃষ্ণদাস গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (বর্ত্তমান ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে) ভর্ত্তি হন। তিনি ১৮৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যয়ন করেন; তৎপর "হিন্দু মেট্রপলিটন" নামক একটী নূতন কলেজে দুই বৎসর পাঠ করেন। পড়া ছাড়িয়া কৃষ্ণদাস পিতার কষ্টের লাঘবের জন্য চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইলেন, কিন্তু সহজে কোথাও চাকরী জুটিল না। তিনি ইংরেজী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "হিন্দু-পেট্রিয়ট" নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণদাস এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এখন হইতে লোকে তাঁহার নাম জানিল; ক্রমে লোকে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় অবগত হইল। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণদাস বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার" সহকারী সম্পাদক হন। এই কাজ পাইয়া তিনি রাজনীতি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন; ক্রমে তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইলেন; সকলে রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর "হিন্দু-পেট্রিয়ট" নানা হাত ঘুরিয়া আসিয়া অবশেষে কৃষ্ণদাসের হাতে পড়িল। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে এই পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সম্পাদকতাদ্বারা তাঁহার নাম দেশবিদেশে খ্যাত হইল। এই কাগজের প্রবন্ধ সমূহ বড়লাট ও ছোটলাট বাহাদুর মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। এইরূপে কৃষ্ণদাস দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভ্য হইলেন। বড়লাট বাহাদুর কৃষ্ণদাসকে তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সমুদয় গৌরবজনকপদ তিনি অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে তিনি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৮৪ খৃঃ ২৪শে জুলাই তারিখে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতাবাসিগণ কলিকাতা সহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণপান্তী—ইনি রাণাঘাটের পালচৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁহাদের সম্পত্তি, নাম, মান ও সম্ভ্রমের মুলাধার। এই বিখ্যাত ধনী ও সদাশয় ব্যক্তি নদীয়া জেলার রাণাঘাটগ্রামে ১৬৭১ শকে (১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ—বঙ্গাব্দ ১১৫৬ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সহস্ররাম পান্তী অতি দরিদ্র ছিলেন। ইঁহার জাতীয় উপাধি "পাল"। পিতা সহস্ররাম পাণ বিক্রয়দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন বলিয়া পান্তী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। পিতার পাণ বেচা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্র জীবিকার্জ্জনের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করেন। তিনি কোন স্থানে কোন জিনিষ সস্তা শুনিলেই তাহা ক্রয় করিতেন এবং স্থানান্তরে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিতেন। সাধারণতঃ তিনি ছোলা, মটর, যব, গম ইত্যাদিই বিক্রয় করিতেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে ছোলা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। কলিকাতার এক মহাজন ছোলা ক্রয় করিতে নৌকযোগে মফস্বলে বাহির হন এবং ঘটনাক্রমে রাণাঘাটে কৃষ্ণপান্তীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণপান্তী তাঁহাকে ছোলা যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন; উভয়ের মধ্যে লেখাপড়া হইল। এই সময়ে রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আরাংঘাটায় "যুগলকিশোর" নামে এক দেববিগ্রহ বর্ত্তমান ছিল। দেব মন্দিরের মোহন্তের নাম গঙ্গারাম। এক দিবস গঙ্গারাম ঠাকুর দেখিলেন তাঁহার পাঁচ গোলা ছোলায় পোকা ধরিয়াছে; তিনি সমুদয় ছোলা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় উহা বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণপান্তী মোহন্তের নিকট উপস্থিত। মোহন্তের অভিপ্রায় জানিয়া কৃষ্ণপান্তী ছোলা ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতি অল্প মূল্যে ছোলা ক্রয় করিয়া উহা উক্ত মহাজনের নিকট বিক্রয় করাতে কৃষ্ণপান্তীর ৭৭৫০৲ টাকা লাভ হইল। এই টাকাগুলি কারবারে খাটাইয়া কৃষ্ণপান্তী প্রভূত ধনলাভ করেন। এই অর্থদ্বারা তিনি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। তিনি বহু পরগণা হস্তগত করিয়া দেশের মধ্যে একজন ধনী লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন। কৃষ্ণনগরের রাজারা তাঁহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইতেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজ শিবচন্দ্র এই উপকারের প্রতিদান স্বরূপ কৃষ্ণপান্তীকে "চৌধুরী" উপাধি দান করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ময়রা মফস্বলে বাহির হইয়া রাণাঘাটের নিকট কয়েক দিন থাকেন। কৃষ্ণপান্তী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। লর্ড ময়রা তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিতে চাহেন, কিন্তু কৃষ্ণপান্তী পূর্ব্বেই কৃষ্ণনগরের মহারাজের নিকট হইতে "চৌধুরী" উপাধি পাইয়াছিলেন; তিনি ইংরেজ প্রদত্ত "রাজা" উপাধি কৃষ্ণনগরের মহারাজ-প্রদত্ত উপাধি হইতে অধিক সম্মানজনক মনে করিলেন না। তিনি "রাজা" উপাধি গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, লর্ড ময়রা তাহাকে "পাল" উপাধি দান করিয়া যান। তদবধি তিনি "পাল চৌধুরী" উপাধিতে সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। কথিত আছে, কৃষ্ণপান্তীর জননী তাঁহাকে একখানা আধুলি মাত্র প্রথমে কারবারের জন্য দিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় এই আধুলি হইতে তিনি এই অতুল সম্পত্তি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণপান্তী মুখে যাহা বলিতেন কাজেও তাহাই করিতেন, কথনও কথার অন্যথা করিতেন না। একদা তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিতে ছিলেন; পথে এক দস্যুদল তাঁহার নৌকা আক্রমণ করে। তিনি দস্যুদিগকে বলিলেন, "তোরা আমার গদিতে যাস্, বক্সিস দিব, এখন আমার নৌকা ছাড়িয়া দে।" ডাকাতেরা জানিত কর্ত্তাবাবু সত্যবাদী। তাহারা তাঁহার নৌকা লুঠ করিল না; পরদিন তাহাদের দলপতি তাঁহার গদিতে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপান্তী তাহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। একদিন তিনি এক ব্রাহ্মণকে একখানা তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া ছিলেন। উহা ক্রয় করিয়া দান করিবার সময় তদীয় পুত্র বাধা দিয়া বলে যে, এই তালুকে অনেক আয় হইবে, ইহা দান করা উচিত নয়। কিন্তু সত্যবাক্ পিতা বলিলেন যে, যখন তিনি উহা একবার দিবেন বলিয়াছেন, তখন আর তাহার অন্যথা হইবেন না। তিনি পুত্রের কথা অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে তালুক দান করিলেন। কৃষ্ণপান্তী সামান্য লেখাপড়া জানিতেন ও সর্ব্বদা সামান্যবেশে চলাফেরা করিতেন। তাঁহার সদাশয়তা, ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা ও কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করিয়া ছিলেন। এক সময়ে যিনি পান্তাভাত খাইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, ছোলার বোঝা বলদের পিঠে চাপাইয়া ব্যবসা করিতে নানা স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন, তিনিই পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও সত্যনিষ্ঠার বলে অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াছিলেন; নদীয়া জেলায় তাঁহার তুল্য ধনী আর তৎকালে কেহ ছিল না। তিনি ১২০৬ সালে (১৭৯৯ খৃঃ) রাণাঘাট ক্রয় করেন। তাঁহার দান গ্রহণের লোভে নানা স্থান হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণগণ রাণাঘাটে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি চুর্ণী নদীর অপর পারে আসিয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। আবাস বাটী, উদ্যান বাটী, ঠাকুর বাড়ী, গোশালা, মহিষশালা প্রভৃতি সমস্তই অট্টালিকাময় হইল। তিনি চারি পুত্র ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র রাখিয়া ১৭৩১ শকে (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ ও বাঙ্গাব্দ ১২১৬ সালে) পরলোক গমন করেন। বঙ্গীয় কবি শ্যামা বিষয়ক একটি সঙ্গীতে লোকের ভাগ্য পরিবর্ত্তন বর্ণন করিতে যাইয়া কৃষ্ণ পান্তীর সৌভাগ্যের বিষয় উল্লেখে গাইয়াছেন :—

"নদের রাজা গিরিশচন্দ্র, তাঁরে কল্লি লণ্ড ভণ্ড,
কৃষ্ণ পান্তী পাণ বেচে খায়, তারে দিলি জমিদারী,
তোমার বিচার এই বটে মা, ওগো মা শ্যামা সুন্দরি।"

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোধ্যায় (রেভারেণ্ড)—বহুভাষাভিজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি ১৮১৩ খৃঃ কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে, নিজ মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রামজয় বিদ্যাভূষণ যোড়াশাঁকোর বিখ্যাত ধনী শান্তিসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শান্তিসিংহ, মহাভারত প্রকাশক বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ। কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত নবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। জীবনকৃষ্ণ উচ্চ কুলীন বংশসম্ভূত ছিলেন; তিনি উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরালয়েই থাকিতেন। কৃষ্ণমোহনের দুইভাই ও এক ভগিনী। পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

পাওয়াতে জীবনকৃষ্ণ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস করেন এবং অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শ্রীমতীদেবী সংসারের নিয়মিত কাজ করিয়া যে টুকু অবসর পাইতেন, ঐ সময়ে পৈতার সুতা প্রস্তুত করিতেন এবং তদ্বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা স্বামীর আনুকূল্য বিধান করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ কৃষ্ণমোহন কালীতলায় স্থাপিত হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহে অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ১৮২৮ খৃঃ কৃষ্ণমোহনের পিতার ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। ১৮২৯খৃঃ কৃষ্ণমোহন হিন্দু-কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ডেভিড হেয়ার তাঁহাকে নিজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৩১ খৃঃ তিনি "ইন্‌কোয়ারার" নামে একখানা ইংরেজী সংবাদপত্র বাহির করেন। এই কাগজে তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণমোহন ডফ্ সাহেব ও ডিয়ালট্রি সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যাইতেন এবং ডিরোজিও ও অন্যান্য খৃষ্টানের বাড়ীতে গিয়া পানাহারাদি করিতে লাগিলেন। হিন্দুকলেজ কমিটির সভ্যগণ হিন্দুসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডিরোজিও সাহেবকে আর অধিক দিন কাজে রাখা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; এজন্য তাঁহারা এক সভা আহ্বান করিয়া অধিকাংশের মত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। কৃষ্ণমোহন সমাজের আচার ব্যবহারের বিরোধী হওয়াতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ১৮৩২ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর কৃষ্ণমোহনের জীবনে সংগ্রাম চলিতে লাগিল; এই জীবন সংগ্রামে তিনি ক্রমোন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ তিনি খৃষ্টীয় আচার্য্য পদে বৃত হইলেন। ১৮৩৯ খৃঃ তাহার কনিষ্ঠ সহোদর কালীমোহনও খৃষ্টান হইলেন। এই সময়ে তাঁহার জন্য হেদুয়া দীঘির কোণে এক ভজনালয় নির্ম্মিত হইল; তিনি এখানে খৃষ্টধর্ম্মানুযায়ী সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এখানে অবস্থান কালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৭৪৫ খৃঃ তিনি "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" নামে একখানি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫২ খৃঃ তিনি "বিশপস্ কলেজে"র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬১-৬২ খৃঃ তিনি হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ তাহার পত্নী বিন্ধ্যবাসিনীর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক "হুইলার" সাহেবের সহিত কৃষ্ণমোহনের কন্যা মনোমোহিনীর পরিণয় হয়। শ্রীমতী মনোমোহিনী তৎপরে মনোমোহিনী হুইলার নামে পরিচিত হইলেন। ইনি বঙ্গের স্ত্রীবিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা পদে বহুকাল কার্য্য করিয়াছেন। মনোমোহিনী হুইলারের গর্ভজাত পুত্র হুইলার সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯১ খৃঃ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ১৮৬৭-৬৮ খৃঃ কৃষ্ণমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন; ১৮৭৬ খৃঃ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডাক্তার" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৮ খৃঃ তিনি "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে"র সভাপতি হন। ১৮৮০ খৃঃ তিনি মিউনিসিপালিটির কমিশনার হন এবং ১৮৮৫ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণমোহন সত্যনিষ্ঠ লোক বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের তিনি একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ত্রয়োদশটী ভাষায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল। কৃষ্ণমোহনের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা একজন যথার্থ সুসন্তান হারাইয়াছেন।

কৃষ্ণবিহারী সেন—বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ সহোদর। ১৮৪৭ খৃঃ ৩০শে নবেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। কলিকাতার কলুটোলার সেনবংশের একটী সুসন্তান। কৃষ্ণবিহারী কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গুণানুসারে প্রথম দশস্থানের মধ্যে একতম স্থান অধিকার করেন এবং এফ এ, পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। কৃষ্ণবিহারী, নামের ভিখারী ছিলেন না; তিনি অলক্ষিতভাবে দেশের হিতকর কাজ করিতে ভাল বাসিতেন। অগাধ জ্ঞান ও সাধুতার জন্য তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত তিনি "মিরার" ও "লিবারেল" পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। কেশবচন্দ্রের উপর তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল। কেশবচন্দ্র যেমন বিখ্যাত বক্তা, কৃষ্ণবিহারী তেমনি বিখ্যাত প্রবন্ধলেখক ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল; এতদ্ব্যতীত তিনি

ফরাসী, জর্ম্মান ও পালিভাষাও সুন্দর রূপ জানিতেন। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি "এলবার্ট কলেজের" "রেক্টর" পদে আসীন ছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে ১৮৯৫ খৃঃ ২৯শে মে দেহত্যাগ করেন। তিনি যেমন জ্ঞানের ঔন্নত্যে, তেমনি চরিত্রের নির্ম্মলতায় ও স্বভাবের মধুরতায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

কেদার রায়—(চাঁদরায় দেখ)।

কেদারনাথ রায়—বিখ্যাত বাঙ্গালী জজ। ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রঘুনাথপুরে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মহেশচন্দ্র রায়। পৈতৃক নিবাস উক্ত জিলার সুয়াপুর গ্রামে। বাল্যকালে সুয়াপুরের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। অনন্তর ঢাকা পোগোজ স্কুলে ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। পত্নীর নাম সৌদামিনী। ঢাকায় শিক্ষালাভ কালে তাঁহার একবার ওলাউঠা রোগ হয়। রোগমুক্ত হইয়া তিনি পিতৃসন্নিধানে রামপুর-বোয়ালিয়াতে যান। এখানে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর ঢাকায় আসিয়া তত্রত্য কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণে তাঁহার পিতা মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দুধর্ম্মে পুনর্ব্বার গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। মহেশচন্দ্র ভগ্নমনোরথ হইয়া বৃদ্ধ বয়সে ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি মাতা ও পত্নীকে ঢাকায় আনয়ন করেন। তিনি তখন ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন। ঢাকায় আনিয়া পত্নী সৌদামিনীকে স্ত্রী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে অতিকষ্টে তাঁহাদের দিনপাত হইতে লাগিল। একদিন অভাবের তাড়নায় উঠানের কচিঘাস সংগ্রহ করিয়া উহা শাকের ন্যায় পাক করিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে হইয়াছিল! জীবনের এই দুঃখের কথা তিনি ভবিষ্যবংশীয়গণের শিক্ষার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেদারনাথ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এক অধস্তন শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাহার বেতন ৪০৲ টাকা হয়; এই বৎসরই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ২য় পুত্রের জন্ম হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কেদারনাথ এম্, এ, ও পরবর্ত্তী বৎসর বি, এল, পাশ করেন। তিনি রঙ্গপুরে গিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। জজ বেভারিজের সহায়তায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তিনি স্থায়ী মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হন। ১০ বৎসর কাল নানা স্থানে মুন্সেফী কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথমে কৃষ্ণনগরের এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও তৎপর আলীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কর্ম্ম করিয়া জিলার জজপদে উন্নীত হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী পরলোক গমন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে তিনি বিখ্যাত মুন্সেফ ও ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা সুলেখিকা স্ত্রীকবি শ্রীমতী কামিনী সেনজার পাণিগ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পত্নীই তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুইপুত্র জন্মে, উভয়েই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু দ্বিতীয়টি স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট না পাওয়াতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন, অপরটি এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে এখন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হইয়াছেন। কেদারনাথ স্বীয় আয়ের অধিকাংশ অর্থ এই পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যে দিন তিনি দ্বিতীয় পুত্রের স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট লাভে অপারগতার সংবাদ পাইয়াছিলেন, সে দিন কেবল বিলাতে টেলিগ্রাফেই ১৮০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ভারত সচিব কেদারনাথের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া দ্বিতীয় পুত্রটিকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকমাসের শেষ সপ্তাহের (নবেম্বর ১৯০৯) এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শ্রমশীল মহাশয় ব্যক্তি পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে যে উইল বা চরমপত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই ইঁহার হৃদয়ের উদারতা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি উইলে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার পত্নীর ও সন্তানগণের শিক্ষা ও আবশ্যক ব্যয় (বিলাসিতানহে) নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যয়িত হইবে। উদ্বৃত্ত টাকা যদি কিছু থাকে, তাহা সাধারণের হিতকরে ও ভগবানের সেবায় ব্যয় করিতে হইবে।

কেশবকাশ্মীর—একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। নবদ্বীপে গমন করিয়া ইনি তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সময় নবদ্বীপ বঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। নিমাই পণ্ডিতের (শ্রীচৈতন্তের) সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া ইনি তথা হইতে পলায়ন করেন। এইরূপে নবদ্বীপের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিল।

কেশবচন্দ্র সেন—বিখ্যাত নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। কেশবচন্দ্রের জন্মস্থান কলিকাতা। হুগলী জিলার অন্তর্গত গরিফা গ্রাম ইঁহার পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের বাসস্থান। রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন কেশবচন্দ্রের জনক। ১৮৩৮ খৃঃ ৫ই অগ্রহায়ণ রামকমল সেনের কলুটোলাস্থ ভবনে কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়। প্যারীমোহন পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; তিনি শান্তমূর্ত্তি ও শান্তস্বভাব ছিলেন; তিনি সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিতেন। কেশবচন্দ্রের ৬ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতামহ রামকমল সেনের মৃত্যু হয় এবং ১১ বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতৃহীন হন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ৭ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোন অভাবনীয় কারণে তাঁহাকে পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়। অতঃপর তাঁহার মনে ধর্ম্মলাভের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। এই ধর্ম্মলাভের পিপাসাই তাঁহাকে ভাবিজীবনে এত উন্নত করিয়াছিল। ১৮৫৬ খৃঃ তিনি সুবিখ্যাত পাদ্রী "লঙ্" সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসায়িটী" নামে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভার সংশ্রবে তিনি নিজবাটীতে একটী নৈশ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন এবং এতদুপলক্ষে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের নেতা বিখ্যাত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইহার পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া উক্ত সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্রের পিতা দেবেন্দ্রনাথের যৌবন-সুহৃদ ছিলেন। এই সময় হইতে কেশব ও দেবেন্দ্রনাথ একযোগে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের যত্নে ব্রাহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; এই বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র কলেজের ছাত্রদিগের নিকট বাঙ্গলাতে ও ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। ১৮৬০ খৃঃ সঙ্গত-সভা নামে এক ধর্ম্মালোচন-সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সহিত সিংহল গমন করেন। সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিলে কেশবচন্দ্রের অভিভাবকগণ তাঁহাকে একটা কাজ লইয়া বসিতে বাধ্য করেন। "বেঙ্গলব্যাঙ্কে" মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে একটী কাজ খালি ছিল; কেশবকে ঐ কাজ গ্রহণ করিতে হইল। ১৮৬১ খৃঃ কেশবচন্দ্র বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। এই বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যার বিবাহ হয়; ইহাই ব্রাহ্ম বিবাহের প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৮৬২ খৃঃ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বৃত হন এবং তিনি "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন এবং তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটী প্রধান সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এপর্য্যন্ত উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে বসিয়া উপাসনা করিতেন; কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই নিয়ম রহিত করিয়া দুইজন উপবীতত্যাগীকে উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে আগমন করেন এবং এই প্রচারকার্য্য উপলক্ষে তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে যে মাঘোৎসব হয়, তাহাতে ব্রাহ্ম মহিলাগণ যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন; তদুপলক্ষে যে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইল তাহাতে বঙ্গীয় সমাজে ঘোষিত হইল।

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার॥"

১৮৭০ খৃঃ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ৬।৭ মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সমুদয় বক্তৃতা শুনিয়া ইংরেজগণ কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে সামান্য পাদ্রী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; স্বয়ং মহারাণী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ ব্রাহ্ম-বিবাহ সংক্রান্ত আইনের আন্দোলন হয়; ১৮৭২ খৃঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হয়; এই আইন ১৮৭২ খৃঃ ৩ আইন নামে খ্যাত। ১৮৭৭ খৃঃ কেশবচন্দ্র তাঁহার কলুটোলাস্থ পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া একটী নবনির্ম্মিত বাটীতে গমন করেন; এই বাটীর নাম "কমলকুটীর" রাখিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের তিনটী চুক্তি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মবিরোধী ছিল:—(১) কেশবচন্দ্র জাতিচ্যুত বলিয়া কন্যাকর্ত্তার কাজ করিতে পারিবেন না, (২) রাজপুরোহিতগণ পৌরোহিত্য করিবেন, (৩) এই বিবাহে ব্রাহ্ম-উপাসনা হইতে পারিবে না। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং কোচবিহারে গিয়া এই বিবাহ সম্পন্ন করেন। বিবাহান্তে কেশবচন্দ্রকে আচার্য্য পদ হইতে অবসৃত করিবার চেষ্টা করা হয়; অধিকাংশ ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রও কয়েক জন ব্রাহ্ম লইয়া নববিধান নামে নূতন সাধনভজনাদি লক্ষণাক্রান্ত এক সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৭৮ খৃঃ—৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি এই নববিধানের উন্নতিকল্পে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উক্ত রোগে অশেষ ক্লেশ পাইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

কেশবদেব (রাজা)—শ্রীহট্টে অধুনা যে স্থান ভাটেরা বলিয়া প্রসিদ্ধ তথায় পূর্ব্বে একটি রাজ্য ছিল। আধুনিক কেহই ইহার সংবাদ রাখিত না, কিন্তু সংপ্রতি দুই খানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হওয়ায় দেখা গেল যে, ঐ রাজ্য বেশ সমৃদ্ধ ছিল; তথাকার রাজারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। নিকটবর্ত্তী মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণও চন্দ্রবংশীয়। এই রাজ্যের রাজা কেশব দেব শ্রীহট্টনাথ বটেশ্বর মহাদেবকে বহুভূমি দান করেন। এই তাম্রফলকে পাণ্ডবকুলাদিশালাব্দ ২০২৮ লিখা আছে; কিন্তু সহস্রের অঙ্কটি মলিন। এখন যুধিষ্ঠিরাব্দ ৮৪৪৭। ইঁহার পুত্র ঈশান দেব "সং ১৭" অব্দে নারায়ণের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দুই খণ্ড ভূমিদানপূর্ব্বক একখানি তাম্রফলক প্রদান করেন। ইহাতে দেখা যায় যে, রাজা কেশব দেব এক পাষাণময় বিষ্ণুমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। দুই খানি তাম্রশাসনে এই বংশাবলী সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নবগীর্ব্বাণ দেব (১)
|
গোকুল দেব (২)
|
নারায়ণ দেব (৩)
|
কেশব দেব (৪)
(অন্য নাম গোবিন্দ)

ঈশান দেব (৫)

কেশব মিশ্র—শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাণিয়াচঙ্গ একটি সুবৃহৎ পরগণা; ইহার প্রধান নগর বাণিয়াচঙ্গ একটি জনবহুল নগর; লোক সংখ্যা ২৮৮৮৩; ইহাতে এখন নগরের সমুদয় লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। এত বড় গ্রাম সমস্ত বঙ্গদেশে আছে কিনা সন্দেহ। কেশব মিশ্র বাণিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে যে, তিনি বাণিজ্যব্যপদেশে এদেশে আগমন করেন। তাঁহার কর্ম্মচারী জনৈক বণিক এবং নৌকাচালক চঙ্গজাতীয় ব্যক্তির যুগ্ম নামানুসারে তাঁহার প্রথম

অবতরণক্ষেত্রের নাম বাণিয়াচঙ্গ হয়। চতুর্দ্দিকে জলপূর্ণ এইস্থান টুকুতে অবতরণপূর্ব্বক তিনি নিজ ইষ্টদেবী কালীর পূজা করিয়াছিলেন। কেশব মিশ্রের পর হইতে তদীয় বৃদ্ধ প্রপৌত্র পদ্মনাভ পর্য্যন্ত সকলেই বাণিয়াচঙ্গ নগরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। ইঁহারা কাত্যায়ন গোত্রীয় কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ। কালক্রমে স্বগোত্রীয় বহুলোক বাণিয়াচঙ্গে আসিয়া বসতি করিতে থাকেন। পদ্মনাভ প্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণার্থ সহস্রসংখ্যক দীঘি খনন করাইয়া দিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "কর্ণ খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। যাঁহারা দীর্ঘিকা খনন করাইয়া জলকষ্ট নিবারণ করিতেন. প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে" "খাঁ" উপাধি দেওয়া হইত। পদ্মনাভ দাতা কর্ণের ন্যায় দানশীল ছিলেন; এজন্য তাঁহার "কর্ণ খাঁ" উপাধি সার্থক হইয়াছিল। পদ্মনাভের ৭ পুত্রের মধ্যে গোবিন্দ খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া সমস্ত লাউড় রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত জগন্নাথপুরে বিজয়সিংহ নামে একজন রাজা ছিলেন। বিজয়সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহের সহিত বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি গোবিন্দ খাঁর বিবাদ হয়। জয়সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লীতে অভিযোগ করেন। এই অভিযোগের ফলে তাঁহার প্রতি দিল্লীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ হয়। কিন্তু গোবিন্দ খাঁ সে আদেশ অগ্রাহ্য করেন। তখন তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য দিল্লী হইতে সৈন্যসহ এক সেনাপতি প্রেরিত হন। সম্রাটপ্রেরিত সেনাপতি সম্মুখ যুদ্ধে গোবিন্দ খাঁর হস্তে পরাজিত হইলেও, অবশেষে তিনি ছলক্রমে গোবিন্দ খাঁকে ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দ খাঁ দিল্লীতে নীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন; কিন্তু দণ্ডের অবধারিত দিবসে ভ্রমবশতঃ গোবিন্দের পরিবর্ত্তে জয়সিংহকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই ভ্রমের বিষয় অবশেষে সম্রাটের গোচরীভূত হইলে, সম্রাট, গোবিন্দের প্রাণবধ না করিয়া জাতিনষ্ট করিতে আদেশ দেন। গোবিন্দ জাতিচ্যুত হইয়া হবিব খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। গোবিন্দ মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক দেশে আসিলেন, কিন্তু জয়সিংহের ভ্রাতা রাজা বিজয়সিংহ তাঁহার ঘোরতর শত্রুরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিজয়সিংহ অবশেষে গোবিন্দ খাঁ ওরফে হবিব খাঁর নিয়োজিত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। হবিব খাঁ জগন্নাথপুর অধিকার করিয়া তথায় আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সময়ে হবিব খাঁর (গোবিন্দ খাঁর) বার্ষিক আয় ৭ লক্ষ টাকা। বাণিয়াচঙ্গের অধিপতিগণ বহুকাল স্বাধীনতা সম্পদ ভোগ করিয়াছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বার্ষিক কর দিতে হয় নাই; বার্ষিক করের পরিবর্ত্তে ৪৮খানা কোষনৌকা বা রণতরী যোগাইতে হইত। কেশব মিশ্রের বংশের একটি হিন্দুশাখা এখনও বাণিয়াচঙ্গে আছে; কেশব মিশ্র হইতে ঐ শাখার ত্রয়োদশ পুরুষ চলিতেছে। অপর হবিব খাঁর বংশধরগণ এখনও বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান নামে খ্যাত আছেন। এই শাখার দেওয়ান আজমান রজা এখন বর্ত্তমান আছেন। এই দেওয়ান বংশ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে মান, মর্য্যাদায় ও প্রসিদ্ধিতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি—বর্ত্তমান সময়ের এক বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৮ কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। ইনি উক্ত পুণ্যধামে থাকিয়া ষড়দর্শন অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহার প্রকৃতি সরল ও মধুর, পাণ্ডিত্য অগাধ এবং সাংসারিক বিপদে ধৈর্য্য অসাধারণ ছিল। ইনি নবদ্বীপের গোলোক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র। উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে দুই শত ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ সকল ছাত্রের আহার যোগাইতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। ছাত্রেরা পড়িবার তৈল নিজেরাই সংগ্রহ করিতেন। সকল দিন ছাত্রদের ভাগ্যে মৎস্য যুটিয়া উঠিত না; যেদিন মাছ পাওয়া যাইত সেদিন ছাত্রগণ নিজদের পড়িবার তৈলে তাহা ভাজিয়া লইতেন। ইহাতে সে রাত্রিতে পড়িবার তৈলের অভাব হইত। ছাত্রগণ সুপারি কিম্বা নারিকেলের শুষ্ক পত্র জ্বালাইয়া লইতেন এবং আলোতে অধ্যয়ন করিতেন।

ক্ষ

ক্ষপণক—উজ্জয়িনীরাজ বিদ্যোৎসাহী বিখ্যাত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন।

ক্ষীরস্বামী—অমরকোষের বিখ্যাত টীকাকার। ইনি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সময়ে ৭০০ শকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষেমরাজ—কাশ্মীর-দেশীয় জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি রাজানক ক্ষেমরাজ নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষেমেন্দ্র ব্যাস-দাসের ন্যায় ইনিও অভিনব গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। তিনি স্পন্দনির্ণয়, স্পন্দসন্দোহ প্রভৃতি ৭ খানি গ্রন্থ এবং স্বীয় অধ্যাপকের ৫ খানি গ্রন্থের ৫ খানি টীকা লিখেন। এই গ্রন্থ গুলি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল।

ক্ষেমানন্দ—(১) জনৈক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম ন্যায়রত্নাকর ও তত্ত্বসমাসব্যাখ্যা। ইঁহার পিতার নাম রঘুনন্দন; নিবাস ইষ্টিকাপুর।

(২) মনসার ভাসান রচয়িতা, ইনি কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বীয় গ্রন্থরচনায় কেতকা দাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রাদুর্ভাব কালনির্ণয় করা কঠিন। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে কেতকাদাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিপ্রদাস ১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে) স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন সুতরাং কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ এই সময়ে পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ক্ষেমীশ্বর—চণ্ডকৌশিক নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা। নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি লিখিতেছেন যে, মহীপালদেবের আদেশে এই নাটকের অভিনয় হইতেছে। সেনবংশের পূর্ব্বে পালবংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। কনিংহাম সাহেব ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে মহীপাল ১০১৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। এতদ্দ্বারা আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের প্রাদুর্ভাবকাল নির্ণীত হইতেছে।

ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস—কাশ্মীর দেশীয় বিখ্যাত হিন্দু কবি। এই কবি ধর্ম্মে হিন্দু হইলেও অনেক পরিমাণে বৌদ্ধভাবাপন্ন। ইনি বুদ্ধচরিত, অমৃততরঙ্গ, নীতিকল্পতরু, দশাবতার, মুনিমতমীমাংসা, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা প্রভৃতি ৩৬ খানি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন। শেষোক্ত তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা কঠিন যে, তিনি হিন্দু কি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম প্রকাশেন্দ্র; পিতামহ সিন্ধু; তিনি ত্রিপুরশৈলশিখরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অভিনব গুপ্তের শিষ্য। ভাগবতাচার্য্য সোমপাদের নিকট ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

খ

খনা—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবতী মহিলা। ইনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতমরত্ন মিহিরের (বরাহ মিহিরের) পত্নী। এই নবরত্ন সভার অপর রত্ন বররুচির পুত্রের নামও মিহির। খনার স্বামী মিহির তাহা হইতে ভিন্ন; ইঁহার পিতার নাম বরাহ; এই নিমিত্ত খনার পতি বরাহমিহির নামে পরিচিত। বরাহও বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, মিহির জন্মগ্রহণ করিলে পর বরাহ গণনা করিয়া জানিলেন যে, ইহার আয়ু অল্প। একমাত্র পুত্র চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না, এজন্য তিনি শিশু পুত্রকে নয়নপথের বাহিরে রাখিতে সংকল্প করিলেন। বরাহ পুত্রটীকে এক পাত্রে স্থাপন করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। মিহির ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কায় গিয়া উপস্থিত হন। তথায় রাক্ষসীরা শিশুটীকে সমুদ্রতীর হইতে গৃহে লইয়া লালন পালন করিতে থাকে। এখানে খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হয়। রাক্ষসদের নিকট খনা ও মিহির জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যখন মিহির ও খনা সমুদ্রপথে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন একটী

সদ্যোজাত গোবৎসের বর্ষগণনা সম্বন্ধে ভুল হইল মনে করিয়া মিহির আপন জ্যোতিষ গ্রন্থগুলি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু গণনা যে ঠিক হইয়াছিল তাহা খনা তাঁহাকে প্রদর্শন করিলেন। তখন বহু চেষ্টায় খনা ও মিহির জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলি সমুদ্র জল হইতে উত্তোলন করেন ; কিন্তু পাতাল গণনা সংক্রান্ত পুস্তক খানার উদ্ধার হইল না, উহা সমুদ্রের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এজন্য এখনও পাতাল গণনা হয় না। মিহির খনার সহিত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে বরাহের সহিত পরিচয় হয় ; বরাহ পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে আনয়ন করেন। স্বামীর আয়ুঃ গণনায় যে ভুল হইয়াছিল তাহা খনা শ্বশুরকে প্রদর্শন করেন। খনার জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভাব অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল ; ইহাতে শ্বশুরের খ্যাতি কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইল। একদিন বিক্রমাদিত্য বরাহ পণ্ডিতকে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যা গণনা করিতে আদেশ করেন। বরাহ নক্ষত্রগণনায় অসমর্থ হইয়া বিষণ্নমনে বসিয়া ছিলেন। পুত্রবধূ খনা তাঁহার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া অনায়াসে নক্ষত্র গণনা করিয়া দিলেন। বিক্রমাদিত্য বরাহের নিকট খনার বিদ্যাবত্তার বিষয় অবগত হইলেন। এই বিদ্যাবতী রমণীকে সর্ব্বসমক্ষে পুরস্কৃত করিবার জন্য তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিতে বরাহের প্রতি আদেশ দিলেন। বরাহ পুত্রবধূকে রাজসভায় নেওয়া অপমানজনক মনে করিলেন। পুত্রবধূর বিদ্যাই অপমানের হেতু মনে করিয়া তিনি পুত্রকে খনার জিহ্বা কর্ত্তনের জন্য আদেশ দিলেন। পুত্র পিতার আদেশ পালনে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, কিন্তু খনা গণনাদ্বারা তাঁহার মৃত্যু আসন্ন অবগত হইয়া স্বামীকে জিহ্বা কর্ত্তনে অনুরোধ করেন মিহি: খনার জিহ্বাচ্ছেদন করিলে অবিলম্বে খনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গালীর ঘরে খনার বচনগুলির সর্ব্বদা আবৃত্তি হইয়া থাকে।

খাফি খাঁ।—বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইঁহার পূর্ব্ব নাম মোহাম্মদ হাসিম। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "তারিখ খাফি খাঁ।" "মুন্তাখিব্-উল্-লাবাব" নামেও এই গ্রন্থ পরিচিত। এই গ্রন্থে দিল্লীর সম্রাট বাবর হইতে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ পর্য্যন্ত সকল সম্রাটের শাসন কালের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়া মোহাম্মদ শাহের শাসন কালের ১৪শ বৎসর পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ইহা প্রকাশ করেন নাই, এজন্য তাঁহার নাম খাফি খাঁ (বা গোপনকারী) হইয়াছে। ইহা এক খানি প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—বিখ্যাত ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান ও পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্ম্মপ্রাণ, ত্যাগী, বিখ্যাত লালাবাবু ইঁহার পৌত্র। (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেখ)। তিনি এই কার্য্যে থাকিয়া নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি এই উপার্জ্জিত অর্থে বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে। নবদ্বীপের মহারাজ শিবচন্দ্র এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ যে দক্ষযজ্ঞ"। গঙ্গাগোবিন্দ সহাস্যে বলিলেন, ইহা তদপেক্ষাও বৃহৎ, যেহেতু দক্ষযজ্ঞে 'শিব' উপস্থিত হন নাই, একার্য্যে হইয়াছেন।

গঙ্গাদাস—ছন্দোমঞ্জরী নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত তিনি অচ্যুতচরিত ও গোপালশতক নামক গ্রন্থদ্বয়ও রচনা করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে মুরারি মিশ্রের অনর্থরাঘব হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গঙ্গাধর—বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত। ইনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান :—কাত্যায়ন-সূত্রটীকা, আধানপদ্ধতি, পাকযজ্ঞপদ্ধতি, প্রয়োগপদ্ধতি, স্মার্ত্তপদার্থ সংগ্রহপদ্ধতি ও সংস্কারপদ্ধতি।

গঙ্গাধর কবিরাজ—বঙ্গের অসাধারণ প্রতিভাপন্ন বৈদ্যকশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। গঙ্গাধর ১৭২০ শকে (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ ১২০৫ সাল) ২৫শে আষাঢ় শুক্রবার কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে দিবা ৬ দণ্ড ৫০ পল সময়ে যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায় ; মাতা অভয়া দেবী।

গঙ্গাধর কুলপুরোহিত গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট পঞ্চমবর্ষ বয়সে বিদ্যারম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি গোপীকান্ত ঠাকুরের পাঠশালার পড়া শেষ করেন। অনন্তর গঙ্গাধর পিতৃষস্বতনয় নন্দকুমার সেনের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করেন এবং অবশিষ্ট ভাগ নাটোরের মাণিক্যচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট অধ্যয়ন করেন। তৎপর যশোহর জেলার অন্তর্গত বারুইখালি গ্রামের রামরত্ন তর্কচূড়ামণির নিকট অভিধান, সাহিত্য, অলঙ্কার সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল অধ্যয়ন করিলে চূড়ামণি মহাশয় গঙ্গাধরের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাঁহাকে অন্যান্য ছাত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করেন। একাদশী তিথি হইতে প্রতিপদ্ পর্য্যন্ত টোলে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; এই অনধ্যায় কালে গঙ্গাধর বাড়ী যাইতেন এবং দ্বিতীয়ার পূর্ব্বাহ্নে টোলে উপস্থিত হইতেন। এই অনধ্যায় সময়ে তিনি ধীরে ধীরে মুগ্ধবোধের স্ত্রীত্ব কারক, সমাস ও তদ্ধিতের টীকা লিখিতেন। চূড়ামণি মহাশয় গঙ্গাধরের প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত সুখ অনুভব করিতেন। চূড়ামণি মহাশয়ের টোলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাধর বেলঘরিয়া গ্রামনিবাসী বিখ্যাত বৈদ্য রামকান্ত সেনের নিকট আয়ুর্ব্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। রামকান্ত অচিরেই গঙ্গাধরের প্রতিভার পরিচয় পাইলেন এবং অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরও পরিশ্রম এবং যত্নসহকারে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। গুরু ও সতীর্থবর্গ গঙ্গাধরের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় গঙ্গাধর অতি দ্রুত ভোজন করিতেন, এজন্য গুরু রামকান্ত তাঁহাকে সময়ে সময়ে ভৎর্সনা করিতেন। গঙ্গাধর বৃদ্ধবয়সে ছাত্রদিগকে দ্রুত ভোজনের দোষ বলিতে যাইয়া স্বীয় বালচাপল্যের বিষয় ও তদুপলক্ষে গুরু রামকান্তের মধুর উপদেশের উল্লেখ করিতেন। রামকান্তের টোলে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাধর নাটোরে পিতৃসন্নিধানে গমন করেন। তাঁহার পিতা ভবানীপ্রসাদ রায় নাটোরের মহারাজের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। এখানে তিনি বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত পরিচিত হইলেন, কিন্তু তিনি এখানে ব্যবসা চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবল স্রোত চলিতেছিল; ইহার ফলে চিকিৎসাব্যাপারেও সকলে ডাক্তারি চিকিৎসারই আদর করিতেছিল; কাজেই সেখানে তাঁহার সুবিধা হইল না। তিনি বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমন করেন। মুর্শিদাবাদ তখনও সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল; এজন্য তথায় দেশীয় চিকিৎসার দিকেই লোকের আসক্তি ছিল।' এখানে অবস্থিতি করিয়া প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের সহিত বাদানুবাদ করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করায় এবং চিকিৎসা নৈপুণ্যে তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র। ইনি ছাত্রাবস্থায় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে টীকা লিখেন তাহাতে দশহাজার শ্লোক ছিল। কিন্তু তাহার প্রধান গ্রন্থ চরকসংহিতার টীকা; এই টীকার নাম "জল্পকল্পতরু"। এই টীকা ৬০,০০০ হাজার শ্লোকে রচিত। এই টীকা প্রণয়নে তাঁহাকে ২০ বৎসর কাল অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই টীকাই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। চক্রদত্ত চরকসংহিতার টীকা রচনা করেন; গঙ্গাধর, চক্রদত্ত রচিত টীকায় যে যে স্থানে দোষ আছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গঙ্গাধর ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকখানার নাম দেওয়া গেল :—

ঈশ্বরীগীতা ও ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যান, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ুর্ব্বেদের ভাষ্য, শাণ্ডিল্যসূত্র ব্যাখ্যা, কুসুমাঞ্জলি টীকা, চৈতন্যাষ্টক, রাধাকৃষ্ণবর্ণন, ত্রিকাণ্ডশব্দশাসন, মনুসংহিতার টীকা।

তিনি সামাজিক বিষয়েও বহুচর্চ্চা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন গঙ্গাধর তাঁহার তীব্রভাষায় প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রচার করেন।

পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামনিবাসী পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র তিনপুরুষ গঙ্গাধরের ছাত্র ছিলেন। ১৮০৭ শকে (১৮৮৫ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১২৯২ সাল) ১৯শে জ্যেষ্ঠ গঙ্গাধর গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করেন।

গঙ্গেশোপাধ্যায়—"চিন্তামণি" নামক বিখ্যাত নব্য ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রণেতা।

গণেশ (রাজা)—রাজা গণেশ রায় বঙ্গের বিখ্যাত দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে অন্যতম (প্রতাপাদিত্য দেখ)। ইনি দিনাজপুরের জমিদার ছিলেন। বঙ্গের সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিনের পৌত্রকে নিহত করিয়া ইনি বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন (১৪০৫ খৃঃ)। ইঁহার সময়ে রাজধানী পাণ্ডুয়াতে বহু দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। কথিত আছে যে, ইঁহারই আদেশে কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন।

গদাধর ভট্টাচার্য্য—নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ইঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য। পাবনা জিলার লক্ষীচাপড়া গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইনি শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং মিথিলা হইতে পাঠ সমাপন করিয়া আসিয়া এখানেই টোল স্থাপন করেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার ইঁহার সমসাময়িক। ইনি অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ও মেধাবী ছিলেন; তাঁহার যশঃ অচিরেই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। গদাধরের সময় মিথিলা সংস্কৃতের শিক্ষা কেন্দ্র ছিল; গদাধরের চতুষ্পাঠী স্থাপনাবধি লোক মিথিলায় না যাইয়া তাঁহার টোলেই অধ্যয়ন করিতে লাগিল। মিথিলাতে পাঠ সমাপন না হইলে মৈথিল পণ্ডিতগণ উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে অধীত গ্রন্থ আনয়ন করিতে দিতেন না। গদাধরের পাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহার অধ্যাপকও তাঁহার গ্রন্থগুলি রাখিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু গদাধর অধীত গ্রন্থগুলি সমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া গুরু তাঁহাকে গ্রন্থগুলি পুনঃ প্রদান করিলেন। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন।

(১) ব্রহ্মনির্ণয় (বেদান্ত গ্রন্থ), (২) কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, (৩) মুক্তাবলী টীকা, (৪) তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি, (৫) তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতির গাদাধরী ব্যাখ্যা।

গাদাধরী নব্যন্যায়ের অপূর্ব্ব গ্রন্থ; এই গ্রন্থ গদাধরকে ন্যায়জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইনি নবদ্বীপে হরিরাম তর্কবাগীশের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গদাধর সিংহ—স্বর্গদেব গদাধর সিংহ আসামের ইন্দ্রবংশীয় আহোম রাজবংশের অন্যতম রাজা। ইঁহার পূর্ব্বনাম গদাপাণি। ইঁহার পত্নী জয়মতী কুঁরকীর অতুলনীয় কীর্ত্তিকাহিনীতে আসামের জাতীয় ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত আহোমরাজ্যে একটি ভীষণ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। মন্ত্রিসমাজ (অর্থাৎ ১৩ জন মন্ত্রী যথা—বুড়া গোঁহাই, বড় গোঁহাই ও বড় পাত্র গোঁহাই প্রভৃতি) রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সিংহাসনে বসাইতে বা সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। ৮।৯ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ছয় জনকে সিংহাসনে অধিরোহণ করাইয়া তন্মধ্যে ৪ জনকে নিহত করেন; একজন মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করেন; কেবল এক জনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। নিহত রাজাদের বংশীয়েরা এবং যে সকল রাজবংশের বিভিন্ন শাখার কুমারেরা সিংহাসন লাভের যোগ্যতা রাখিতেন, তাঁহারা সকলেই সিংহাসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এই সময়ে লরারাজা সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি সকল রাজকুমারের অঙ্গই ক্ষত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আসামে প্রথা ছিল যে, যাহার শরীরে ক্ষত আছে, সে সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে না। লরারাজা মনে করিলেন যে, সিংহাসনলোলুপ কুমারগণের অঙ্গ ক্ষত করিলে তাঁহার আর প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ থাকিবে না। তুঙ্গখুঙ্গী শাখার কুমার গদাপাণি শৌর্য্যাদি গুণে সিংহাসন লাভের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র ছিলেন। তিনি লরারাজার বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। লরারাজা তাঁহার প্রাণ বিনাশের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। গদাপাণি এই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া প্রাণরক্ষার্থ নাগাপর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য লরারাজা তাঁহার পত্নী সাধ্বী জয়মতীর প্রতি নানারূপ অত্যাচার করেন। কিন্তু পতীব্রতা জয়মতী কিছুতেই পতির সন্ধান বলিয়া দেন নাই। গদাপাণি শুনিলেন, পত্নীর উপর অত্যাচার হইতেছে, তিনি ছদ্মবেশে পত্নীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে তিনবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সতী জয়মতী কিছুতেই সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; তিনি পতিকে চিনিতে

পারিয়া অবিলম্বে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে ১৬ দিন বেত্রাঘাত, লগুড়াঘাত প্রভৃতি অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করিয়া সাধ্বী জয়মতী দেহত্যাগ করেন। গদাপাণি নানাস্থানে পলায়নপূর্ব্বক অবশেষে কামরূপ জেলায় এক গারোজাতীয় স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত হন। কামরূপের অধিপতি গদাপাণির ভগিনীপতি। তিনি গদাপাণির অনুসন্ধান লইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে আনয়ন করেন। তদবধি তিনি গদাপাণির সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এদিকে লরারাজার উৎপীড়নে প্রজাকুল উত্যক্ত হইয়া গদাপাণির অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

গদাপাণি লরারাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। গদাপাণি আহোম নাম সুপাটফা এবং হিন্দু নাম গদাধর সিংহ গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পলায়িত অবস্থায় প্রজাগণের অবস্থা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন, এজন্য রাজা হইয়াই তিনি প্রজাগণের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করেন। তিনি রাজপদে আসীন হইয়াই জমি জরিপের কার্য্য আরম্ভ করেন; এই কার্য্য তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কার্য্যের জন্য তিনি বঙ্গদেশ হইতে কতিপয় কর্ম্মচারী আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, রাজা হইয়া তাঁহাদিগকে তিনি ভুলেন নাই; তিনি তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন; দ্রুতগতি হস্তীর দাঁত ধরিয়া তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেন। তিনি ১৪ বৎসর ১০ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করিয়া ১৬১৭ শকে (১৬৯৫ খ্রীঃ) ১৩ই ফাল্গুন কৃষ্ণাচতুর্থীতে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার সময় হইতেই আহোম রাজগণ মধ্যে দেবালয় নির্ম্মাণ, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর প্রদান প্রভৃতি সদনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। গদাধর সিংহের আদেশে উমানন্দ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র রায় (রাজা)—শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা; ইনি শ্রীহট্ট সহরের অন্তর্গত রায়নগরের জমিদার। ইনি একজন উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন; নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এতাদৃশ মুক্তহস্ত ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইঁহার মাতামহ লালা মুরারিচাঁদ একজন মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। রাজা গিরিশচন্দ্র স্বীয় মাতামহের স্মরণার্থ মুরারিচাঁদ কলেজ স্থাপন করিয়া শ্রীহট্টে উচ্চশিক্ষার পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এই কলেজ ও ইহার সংলগ্ন উচ্চইংরেজী স্কুল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে চূর্ণ হইয়া যায়। রাজা গিরিশচন্দ্রের বাড়ী ঘরও রক্ষা পায় নাই। কিন্তু তিনি নিজের বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ঋণ করিয়া কলেজ ও স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উদরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ১৮৩০ শকে (১৯০৮ খ্রীঃ) এই মহাত্মা দেহত্যাগ করেন।

গুণাভিরাম বড়ুয়া (রায় বাহাদুর)—যে সকল মহাত্মা আসামের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ইংরেজী শিখিবার জন্য কলিকাতা গমন করেন, কিন্তু তাঁহার হিতৈষী আত্মীয় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের অকালমৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়। উক্ত ফুকন মহাশয়ের বিধবা পত্নী ও পুত্রকন্যাগণের ভরণ পোষণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদে নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই পদের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং রায়বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিরহঙ্কার, অমায়িক, কৌতুকপ্রিয় ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। তৎপ্রণীত "বুরঞ্জী" (Buranji) অর্থাৎ আসামের ইতিহাস আসাম সাহিত্যভাণ্ডারকে সম্পদশালী করিয়া রাখিয়াছে। ১৮১৬ শকে (১৮৯৪ খ্রীঃ) তিনি দেহত্যাগ করেন।

গুরুগোবিন্দ সিংহ—শিখদিগের দশম গুরু। ইঁহার পিতার নাম তেগ বাহাদুর। ইনি ১৬৬২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিখদিগের ধর্ম্মে বহু পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং খাল্‌সা প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অনুগামীদিগকে খাল্‌সা অর্থাৎ পবিত্র বলা হইত। ১৬৭৫ খৃঃ ইনি গুরুপদে বৃত হন এবং শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, 'গ্রন্থসাহেব' প্রণয়ন করেন; শিখগণ এই গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকেন। সমস্ত শিখজাতিকে একজাতিতে পরিণত করাই খাল্‌সা প্রথা প্রবর্ত্তনের

উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মের অন্যান্য অংশে খাল্‌সাগণ নানকমতাবলম্বী। ১৭০৮ খৃঃ দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীতীরে একজন পাঠান গুপ্ত ঘাতকের হস্তে ইনি নিহত হন। ইঁহার সমাধির উপর ঐস্থানে এক শিখমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি অর্থে বীতস্পৃহ ছিলেন। কথিত আছে যে, জনৈক শিষ্যকর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণখণ্ড নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি অর্থে নির্লোভতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গুরুপ্রসাদ সেন—এই প্রতিভান্বিত পুরুষ ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১২৪৯ সন) দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ডোমসার গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাশীচন্দ্র সেন, মাতা সারদাসুন্দরী। ডোমসার গ্রাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত হইলেও এখন পদ্মার দক্ষিণতীরে পড়িয়াছে। ইহা এখন ফরিদপুর জিলায় অবস্থিত। সাধারণতঃ বিক্রমপুর বলিতে ঢাকা জিলার অন্তর্গত ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী স্থলই বুঝায়। এই বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে গুরুপ্রসাদের মাতুলালয়। গুরুপ্রসাদ, মাতুল রাধানাথ সেনের বাড়ীতে থাকিয়া লালিত পালিত ও শিক্ষিত হন। রাধানাথ ময়মনসিংহের জজ আদালতের উকীল ছিলেন। কাঁচাদিয়া গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইলে গুরুপ্রসাদ বিক্রমপুরে পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত কামারখাড়া গ্রামে যাইয়া বসতি করেন। তাঁহার চেষ্টায় এই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "স্বর্ণগ্রাম" হয় এবং এখানে তিনি মাতুল রাধানাথের নামে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাধানাথের পুত্রসন্তান ছিল না; তিনি ভাগিনেয়দিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সনের ২৮শে আশ্বিন গুরুপ্রসাদ পরলোক গমন করেন। গুরুপ্রসাদের সময়ে বিক্রমপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। তিনিই বিক্রমপুরের প্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি ঢাকা কলেজ হইতে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, ও এম্, এ, পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কোন কারণে মতভেদ হওয়াতে তিনি এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক নিঃস্ব দরিদ্র সন্তানকে অন্নদান ও শিক্ষাদান করিয়া প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বাঁকিপুরে "বিহার ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েসন" (Behar Londholders' Association) নামে পাটনা অঞ্চলের ভূস্বামিবর্গের এক রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। তিনি জীবনের শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ছোটলাটের সভায় সভ্য হইয়াছিলেন।

গোকুলদাস তেজপাল—ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কচ্ছপ্রদেশে এই উদারহৃদয় দানশীল মহাত্মার পিতা তেজপাল ১৭১৭ শকে (১৭৯৫ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বম্বে সহরে দিনের বেলায় নানাবিধ জিনিষপত্র ফিরি করিয়া এবং রাত্রিতে প্রহরীর কার্য্য করিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নানজি বয়সে তদপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। ২০ বৎসর বয়সের সময় তেজপাল নিজে এক কারবার দেন; এই কারবারে তিনি অনতি-কাল মধ্যে ৩০,০০০ টাকা সঞ্চয় করেন। এই টাকা তিনি মৃত্যুর সময় ১৮৩৩ খৃঃ তাহার একমাত্র পুত্র গোকুলদাস তেজপালকে দিয়া যান। ১৮ ২ খৃঃ গোকুলদাস তেজপাল জন্মগ্রহণ করেন; পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার ১১ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠতাত লালজি নিঃসন্তান ছিলেন। এই মহাত্মা মৃত্যুর সময় গোকুলদাস তেজপালকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া যান। অল্পবয়সে এতগুলি টাকা তাঁর হাতে পড়িল। তাঁহার মাতা অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন; তাঁহারই যত্নে গোকুল দাস একজন বড় ব্যবসায়ী হইয়া উঠেন। গোকুলদাস আজীবন ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি কল কারখানা করেন নাই, কেবল বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করিয়াই প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। স্বজাতীয় লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এত বড় ধনী হইলেও তিনি পোষাকে ও চাল চলনে কখনও জাকজমক করিতেন না। বদান্যতার জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং অর্থরাশির সদ্ব্যয়ে তিনি অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৪ খৃঃ তিনি জন্মভূমি দর্শনে গমন করেন, এবং স্বজাতীয়দের উন্নতিকল্পে তিনি একলক্ষ টাকা দান করিয়া আসেন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর তিনি তীর্থভ্রমণে যাত্রা করেন; এই ভ্রমণের সময় তিনি নানাস্থানে

পুষ্করিণী খনন, ধর্ম্মশালা স্থাপন, পুরাতন মন্দির সংস্কার ইত্যাদি কার্য্যে দুইলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আসেন। তীর্থস্থান হইতে বম্বে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এই নগরে গুজরাটী ব্যবসায়ীদিগের সন্তানগণের ইংরেজী শিক্ষার্থ দুইটী স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭০ খৃঃ তিনি গরীবদিগের জন্য এই নগরে নিজ নামে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করেন; এই চিকিৎসালয়ের নাম গোকুলদাস-তেজপাল হাসপাতাল। ১৮৬৮ খৃঃ এই মহাত্মা অকালে মাত্র ৪৫ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৭ খৃঃ তিনি এক চরমপত্র (উইল) সম্পাদন করেন। এই চরমপত্রের মর্ম্ম এই—"আমার কারবারে যৎকিঞ্চিৎ ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিয়া অর্থগুলি নিম্নলিখিতরূপে ব্যয় করিতে হইবে"।

(১) বর্ত্তমান ও পুরাতন ভৃত্যদিগকে, যে পুরোহিত আমার মৃত্যুসময়ে সংস্কার কার্য্য করিবেন তাঁহাকে, এবং আমার পাচকব্রাহ্মণ জীবা মাধোজীকে দিতে হইবে— ৪৬,০০০৲

(২) দুইটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস ও পুষ্করিণী এবং একটী ধর্ম্মশালা স্থাপনের জন্য —১,১৫,০০০৲

(৩) নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য—স্কুল, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা ইত্যাদি স্থাপন ও রক্ষার জন্য— ৭,৯০,০০০৲

(৪) কলেজ, স্কুল, ধর্ম্মশালা ইত্যাদি রক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন সেক্রেটারী ও দুইজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে; ইঁহাদের বেতন বাবদ— ৭৫,০০০৲

(এই টাকার সুদ হইতে বেতন দিতে হইবে)

তাঁহার মাতা, পত্নী ও নিজের শ্রাদ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট টাকা নির্দ্ধারিত হইল। তিনি ২৭ লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পুত্র সন্তান না থাকাতে তাঁহার পত্নীর প্রতি এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। এই উইলের মোকদ্দমা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইতে কিয়ৎকাল বিলম্ব হয়; এই সময়ে উক্ত প্রদত্ত টাকা সুদে ও আসলে ১৫ লক্ষ টাকা হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বম্বে নগরে দুইটী সংস্কৃত কলেজ, একটী উচ্চ ইংরেজী স্কুল, দুইটী মধ্যম শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয়, গোকুলদাস তেজপাল হাসপাতাল এবং কচ্ছ প্রদেশে ৬টী স্কুল ও চিকিৎসালয় এবং বিভিন্নস্থানে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালাসমূহের ব্যয় এই টাকা হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

গোপা—সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেবের পত্নী। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের সংসারে অনাসক্তি নিরীক্ষণ করিয়া কপিলবস্তুর অদূরবর্ত্তী কলিরাজ্যের অধীশ্বরের কন্যা গোপার সহিত তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করেন। গোপার গর্ভে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন। গোপা বুদ্ধিমতী ও বিদুষী রমণী ছিলেন; তিনি স্বামীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন; সিদ্ধার্থ গোপার গুণে মুগ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। গোপা অবগুণ্ঠনের পক্ষপাতিনী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "যাঁহাদের লজ্জা নাই, আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, তাঁহারা শতগুণ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াই বা কি করিবে? আর যাঁহাদের পতিই একমাত্র প্রাণ, যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখিয়াছেন, সেই নারীগণ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বসমক্ষে গেলেই বা দোষ কি? যাঁহারা আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা করে, তাঁহারা সুরক্ষিতা, আর যাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে জানে না, তাঁহারা অন্তঃপুরের মধ্যে প্রাচীর বেষ্টিতা হইয়াও অরক্ষিতা।" (ললিতবিস্তর ১২শ অ) (বুদ্ধদেব চরিত)। সিদ্ধার্থ দেখিলেন, তিনি ধীরে ধীরে ঘোর সংসারজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন; কিরূপে তিনি সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিবেন, ভাবিতেছেন; এমন সময় গোপা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সিদ্ধার্থ দেখিলেন আর একটী মায়ার বন্ধন উপস্থিত; তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সংসারত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন, তখন মধ্যরাত্র; গোপা আলুলায়িত কেশে এক হস্ত সন্তানের মস্তকতলে রাখিয়া ও অপর হস্তে শিশুটীকে জড়াইয়া সূতিকাগৃহে নিদ্রায় অচেতন ছিলেন। সিদ্ধার্থের ইচ্ছা ছিল, শিশুটীকে একবার বক্ষে ধারণ করেন, কিন্তু গোপার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় তাহা করিলেন না। পুত্র ও পত্নীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ইহার পর সিদ্ধার্থ তপঃসিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধ নামে খ্যাত হইলেন। ক্রমে ক্রমে শুদ্ধোদনের সমস্ত পরিবারের সমস্ত পুরুষই বুদ্ধের পথাবলম্বী হইয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের বৈমাত্রের ভ্রাতা নন্দ, বিবাহ ও রাজ্যাভিষেকের দিন সংসার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধসঙ্ঘে মিলিত হইলেন। তৎপর সিদ্ধার্থের একমাত্র পুত্র রাহুল ৭ বৎসর বয়সের সময় জননী গোপার পরামর্শে সন্ন্যাসীবেশধারী বুদ্ধের পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধসঙ্ঘে মিলিত হইলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইলে গোপাকে নেত্রীর পদে স্থাপিত করিয়া বুদ্ধদেব রাজপুরীর মহিলাদিগকে লইয়া এক সন্ন্যাসিনী দল গঠন করেন। (বুদ্ধদেব চরিত)।

গোপাল উড়ে—ইনি বিখ্যাত গীতরচক। উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক জিলায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসুন্দর ও রাধাকৃষ্ণের বিষয় অবলম্বনে ইনি মধুর গীতাবলী রচনা করেন; কিন্তু ইঁহার রচনা দাশুরায়ের (দাশরথি রায়) কবিতার ন্যায় অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। ইনি প্রথমে কলিকাতার বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা রাধারমণ বাবুর যাত্রার দলে প্রবেশ করেন, পরে উক্ত রাধারমণের মৃত্যুর পর নিজেই এক যাত্রারদল গঠন করেন। কৈলাস বাড়ুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় নামক দুইজন বিখ্যাত কবিওয়ালা এই গোপাল উড়ের শিষ্য। (দীনেশ সেন)

গোপালভট্ট গোস্বামী—মহাপ্রভুর ছয়জন ভক্ত গোস্বামীর মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি হরিভক্তিবিলাস নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। ইনি দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ; ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কটভট্ট। বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী (প্রবোধানন্দ) ইহার পিতৃব্য। ইনি কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা এবং বৃন্দাবনযমক গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবর্দ্ধনাচার্য্য—ইনি আর্য্যা সপ্তশতী নামক কাব্যের রচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম নীলাম্বর। ইঁহার নাম জয়দেবের গীতগোবিন্দে দৃষ্ট হয়।

গোবিন্দরাজ—ইনি মনুসংহিতার অন্যতম টীকাকার। ইঁহার টীকা অবলম্বন করিয়াই বিখ্যাত টীকাকার কুলূকভট্ট "মন্বর্থ মুক্তাবলী" নামে মনুসংহিতার টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম মাধব। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।

গোবিন্দ মাণিক্য—ত্রিপুরার রাজা। ইনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

(রাজা) গোবিন্দ চন্দ্র—ইনি কাছাড়ের শেষ রাজা। কাছাড়ের রাজগণ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের পত্নী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং তাঁহাদের রাজ্য হেড়ম্ব দেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। ঘটোৎকচ হইতে গোবিন্দ চন্দ্র পর্য্যন্ত বংশাবলী তাঁহাদের আছে। এই রাজবংশের রাজধানী পূর্ব্বে ডীমাপুর নামক স্থানে ছিল। এই ডীমাপুরে (হিড়িম্বাপুরে) অনেক দীর্ঘিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভাবলী দৃষ্ট হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজধানী ডীমাপুর হইতে মৈবাং নামক স্থানে পরিবর্ত্তিত হয়। এখানেও একটি প্রাচীরের চিহ্ন এবং কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি দেখা যায়। একটি ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট পর্ব্বতক্ষোদিত গৃহ এই স্থানে আছে; ইহা ১৬৮৩ শকে নির্ম্মিত বলিয়া লিখিত আছে। তৎকালে রাজা হরিশচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। তিনিই আবার রাজধানীটি খানপুরে পরিবর্ত্তিত করেন। সর্ব্বশেষে রাজা গোবিন্দ চন্দ্র হরিটিকর নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। এই খানেই তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুররাজ গম্ভীর সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপর উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আইসে।

গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ক্রোরীয়ান্)—বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার রাজস্ব-সম্বন্ধীয় প্রধান কর্ম্মচারীকে ক্রোরীয়ান বলা হইত। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এই উচ্চপদ লাভ করিয়া বঙ্গে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নাম মাত্র বাঙ্গালার নবাবের অধীন থাকিয়া কাজ করিতে হইত। গোবিন্দ অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের নিকটে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে কামারকুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে তাঁহার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন; তখন গোবিন্দ ৮ম বর্ষের শিশু মাত্র। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রবল প্রতাপে সাম্রাজ্য

গোরক্ষনাথ—বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ও ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এই সাধু প্রাদুর্ভূত হন। ইনি মহাত্মা কবিরের সমকালীন লোক। ইঁহার বহুসহস্র শিষ্য ছিল; শিষ্যেরা ইঁহাকে গুরু গোরক্ষনাথ বলিত। ইনি একজন যোগী; ইঁহার মতে যোগীরাই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইনি সার্ব্বভৌম ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সকল শ্রেণীর লোককেই ইনি স্বীয় ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতেন। উদার ধর্ম্মমত প্রচার করাতে রাজা হইতে নিরন্ন দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। ইনি গোরক্ষ সংহিতা প্রভৃতি যোগ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

গোলোক সার্ব্বভৌম—(১) ফরিদপুর জিলায় কাত্তিকপুরনিবাসী প্রধান স্মার্ত্ত। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন বর্ত্তমানে প্রধান স্মার্ত্ত মধ্যে পরিগণিত। (২) বিক্রমপুরের চিত্রকরাবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত।

গৌড়গোবিন্দ (রাজা)—শ্রীহট্ট পূর্ব্বে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল,- গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া (জয়ন্তী)। এই তিন খণ্ডই তিন ভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত হইত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গোবিন্দনামক এক নৃপতি-কর্ত্তৃক গৌড়খণ্ড শাসিত হইয়াছিল; এই নিমিত্ত গোবিন্দ, সাধারণো গৌড়গোবিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীহট্ট জিলায় ইহার নাম অতি প্রসিদ্ধ। গৌড়গোবিন্দ সাতগাঁও ও লাখাই দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে যে, রাজার উদরাভ্যন্তরে একটি ফোড়া হইয়াছিল; উহা কেহই আরোগ্য করিতে পারে নাই। রাণী ভবিষ্যৎ বৈধব্য চিন্তায় ব্যাকুল হন এবং প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ "চক্রদত্ত" প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীহট্টে আনিতে যত্ন করেন। কিন্তু চক্রপাণি দত্ত তখন স্থবির; তিনি মৃত্যুর দিন গণিতেছিলেন; সুতরাং সেই বয়সে গঙ্গা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিলেন না। দূত ফিরিয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়া রাণী ম্রিয়মাণ হইলেন ও নিজে স্বীয় গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দূতদ্বারা তাহা ভিষগ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাণী দূতের মুখে তাঁহাকে জানাইলেন যে, যদি রাজার মৃত্যুঘটে, তবে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, আর এ অলঙ্কার ধারণের প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মভীরু চক্রপাণি এবার প্রমাদ গণিলেন; নারী বধের পাপটা তবে কি তাঁহারই মাথায় পড়িবে? বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ধর্ম্মভয় ও দয়াপরিচালিত হইয়া অগত্যা নিজ মধ্যম পুত্র মহীপতিকে সঙ্গে লইয়া কিছুদিনের জন্য গঙ্গাতীর হইতে যাত্রা করিলেন ও যথাকালে শ্রীহট্টে আসিয়া পহুঁছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় রাজা আরোগ্য লাভ করেন। রাজার প্রার্থনায় চক্রপাণি স্বীয় পুত্র মহীপতিকে শ্রীহট্টে রাখিয়া পুনরায় গঙ্গাতীরে গমন করেন। সাতগাঁও ও লখাইর দত্তবংশীয়গণ এই মহীপতি দত্তের বংশোদ্ভব। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, চক্রপাণি দত্ত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক (চক্রপাণি দত্ত দেখ)। ইহা সত্য হইলে সময়ের অত্যন্ত বৈষম্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গৌড়গোবিন্দ সম্বন্ধে এরূপ কথাও শুনা যায় যে, ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। মধ্যভারতের রাজা "ভোজ" ও "বিক্রমাদিত্যের ন্যায় এ নাম ও অনেকেই ধারণ করিয়াছিলেন। যদি তাহা হয়, তবে আর কোন অসঙ্গতিই থাকে না।

গৌড়গোবিন্দ বীরপুরুষ ছিলেন। একদা তিনি কোন অপরাধে বুরহান্-উদ্দিন নামক এক মুসলমানের হস্তচ্ছেদন ও তদীয় নবজাত শিশুপুত্রের প্রাণবিনাশ করেন। বুরহান্-উদ্দিন প্রতিশোধ পরায়ণ হইয়া সুবর্ণগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সামস্-উদ্দিন ইলিয়াসের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যাচারের কাহিনী বর্ণন করেন। সামস্-উদ্দিন ব্যথিত হইয়া স্বীয় পুত্র সুলতান সেকান্দরকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। সেকান্দর প্রথমে কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে গৌড়গোবিন্দের নিকট পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। সেকান্দরের পরাজয়ের পর বুরহান্-উদ্দিন দিল্লীতে গমন করিয়া সম্রাটের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হন। তোগলক বংশীয় তদানীন্তন সম্রাট আলাউদ্দিন ফেরোজ শাহ্ নিজ ভাগিনের সেকান্দর গাজীকে সৈন্যসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। তাঁহার অবস্থাও পূর্ব্ববৎই হয়। অনন্তর সম্রাট, শাহ্ জালালের সহিত অপর এক সেনাপতিকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। গৌড়গোবিন্দ শাহ্ জালালের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া পেঁচাগড় নামক দুর্গে চলিয়া যান। শাহ্ জালালের শ্রীহট্ট বিজয় ১৩৮৪, খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। (শাহ্ জালাল দেখ)

গৌতম—বুদ্ধদেবের নামান্তর। ইনি নেপালের দক্ষিণে অবস্থিত কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। শৈশবকালে ইনি সিদ্ধার্থনামে অভিহিত হইতেন। ইঁহার মাতা মায়াদেবী ৪৫ বৎসর বয়সের সময় ইঁহাকে প্রসব করেন, কিন্তু প্রসবের ৭ দিন পরেই মায়াদেবী পরলোক গমন করেন। রাজপুত্রের জন্মহেতু সর্ব্বত্র আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু অচিরেই রাজধানীর আনন্দরোল বিমথিত করিয়া রাজমহিষীর মৃত্যুসংবাদ নগরে প্রচারিত হইল; বিষাদের ছায়া রাজভবন আচ্ছন্ন করিল। সিদ্ধার্থ মাতার একমাত্র সন্তান। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীশোক নিবারণ করিলেন। মায়াদেবীর মৃত্যুর পর শুদ্ধোদন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই পত্নীর নাম গৌতমী। সিদ্ধার্থের প্রতিপালনেরভার গৌতমীর উপর ন্যস্ত হইল। গৌতমী দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত। গৌতম ব্যতীত সিদ্ধার্থের বহু নাম আছে, যথা:- সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, সমন্তভদ্র, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন, ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা, শাক্যমুনি, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু ও মায়াদেবীসুত। ইঁহার পত্নীর নাম গোপা। গোপার গর্ভে গৌতমের রাহুল নামে একমাত্র পুত্র জন্মে। রাহুল মাতার পরামর্শে ৭ বৎসর বয়সের সময় পিতার অনুগামী হইয়া বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধ সঙ্ঘে মিলিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক তাঁহারা আদি বুদ্ধ মানেন; নাস্তিকদল জড়শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ মানেন। ইহা ত্রিরত্ন নামে অভিহিত। বুদ্ধ—শাক্যসিংহ, ধর্ম্ম—তাঁহার বিধি এবং সঙ্ঘ—সম্প্রদায়। ইহার অপর অর্থও আছে, যথা—বুদ্ধ প্রাণশক্তি, ধর্ম্ম জড়শক্তি ও সঙ্ঘ জগৎ। বুদ্ধদেব কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধেরা এক আদি বুদ্ধ স্বীকার করেন। এই আদি বুদ্ধ স্বেচ্ছায় পঞ্চবুদ্ধের সৃষ্টি করেন। বৈরচন, অক্ষোভ, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ এই পঞ্চ বুদ্ধ। ইঁহাদের সহিত আদি বুদ্ধের জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ। এই পঞ্চ বুদ্ধ হইতে বোধিসত্ত্বগণের উদ্ভব হইয়াছে। এই বোধিসত্ত্বগণের উৎপত্তির পর পঞ্চ বুদ্ধ আদিবুদ্ধে লীন হইয়াছেন। বোধিসত্ত্বগণের নাম, যথা -সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি, ঘণ্টাপাণি। এই পঞ্চবোধিসত্ত্বই সাক্ষাৎসম্বন্ধে জগতের কর্ত্তা। পঞ্চ বুদ্ধ ব্যতীত সাত জন মানবীয় বুদ্ধ আছেন; ইঁহাদের মধ্যে শাক্যসিংহ শেষবুদ্ধ। পঞ্চ বুদ্ধ দেবতা বা দেববুদ্ধ কিন্তু এই সাত জন দেবতা নহেন।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—ইটা পরগণাস্থিত পঞ্চগ্রাম (পাঁচগাঁও) শ্রীহট্ট সহর হইতে দক্ষিণে দশক্রোশ এবং গোলঘী বাজার হইতে উত্তর পূর্ব্বাংশে চারিক্রোশ ব্যবধানের অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে মনুনদী এবং উত্তরে সার্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে কুশিয়ারা (বা ক্রোশিরা) নদী প্রবাহিত। মনুক্রোশিরার পবিত্র সলিল বিধৌত পঞ্চগ্রামে ১৭১৭ শকে (ইং ১৭৯৫ খ্রীঃ) গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী। ইনি কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের ব্রাহ্মণ। গৌরীশঙ্কর বাল্যকালে পঞ্চগ্রামেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৈশোরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর গৌরীশঙ্কর সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে চলিলেন। তখন নবদ্বীপ বঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। কিন্তু পথ অতি দুর্গম। গৌরীশঙ্কর নানা বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হইলেন। অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে গৌরীশঙ্কর অচিরেই ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া "তর্কবাগীশ" উপাধি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি কলিকাতায় গমন করেন এবং তথায় শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের আনুকূল্যে ১২২৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮২২ খ্রীঃ) 'সংবাদ ভাস্কর' নামক এক সংবাদ পত্র প্রচার করেন। ইহাই বঙ্গের দেশীয় সংবাদ পত্রের আদিম অনুষ্ঠান। বঙ্গদেশে ভাস্করের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এই পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১২৲ ছিল; মূল্য এত অধিক হইলেও ইহার গ্রাহক সংখ্যা অল্প ছিল না। এই পত্রিকার মুখবন্ধ (motto) এইরূপ:—

"শ্রীগৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্কর। অর্থাৎ গৌরীশঙ্করস্বরূপ পূর্ব্বদেশস্থ পর্ব্বতের মুখ হইতে "ভাস্কর" উদিত হইতেছেন।" "সংবাদ প্রভাকর" নামক পত্রিকার সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহার সঙ্গে সতত

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। গৌরীশঙ্কর "রসরাজ" নামক পত্রিকা প্রকাশিত করিলে, ঈশ্বর গুপ্ত "পাষণ্ড পীড়ন" লিখিয়া সংবাদপত্রে কবির লড়াইর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌরীশঙ্কর মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবী মাহাত্ম্যের এক খানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে গৌরীশঙ্কর দেহত্যাগ করেন।

ঘ

ঘটকর্পর—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। ইনি মহাকবি কালিদাসের অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইঁহার প্রণীত কোন মহাকাব্য দৃষ্ট হয় না; তবে "নীতিসার" নামে ইঁহার ২১টী নীতিবিষয়ক উপাদেয় শ্লোক আছে; এবং ২২টী শ্লোক সমন্বিত একটী যমক বহুল ক্ষুদ্র কাব্য এখনও বর্ত্তমান আছে। নীতিসারে তিনি মহাকবি কালিদাসকেও আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই।

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্য দোষো গুণরাশি নাশী॥" (নীতিসারঃ)

অর্থ—গুণবাহুল্যের মধ্যে একটি দোষ চন্দ্রকলঙ্কের ন্যায় নিমজ্জিত থাকে, একথা যে কবি বলিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই দেখেন নাই যে, দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিকে নষ্ট করে। ঘটকর্পর একটু দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যমকালঙ্কার বিশিষ্ট ২২টী শ্লোক রচনা করিয়া গর্ব্বপ্রকাশপূর্ব্বক শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ।"

অর্থ—যিনি যমকালঙ্কার রচনায় আমাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, আমি ঘটকর্পর দ্বারা (কলসের খণ্ডদ্বারা) তাঁহার উদক বহন করিব।

কথিত আছে যে, কালিদাস ইহার উত্তরস্বরূপ নলোদয় নামক যমকালঙ্কার বিশিষ্ট এক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ঘটকর্পর উদক বহন করিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই।

ঘনরাম—বিখ্যাত বঙ্গীয় কবি। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

ঘনশ্যাম—বৈষ্ণব কবি। ইনি "গোবিন্দরতি মঞ্জরী" রচনা করেন। ইনি দিব্যসিংহের পুত্র এবং বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের পৌত্র।

চ

চক্রপাণিদত্ত—বৈদ্যবংশজ বিখ্যাত চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণেতা। ইনি চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া উহা স্বীয় নামে প্রথিত করেন। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম "চক্রদত্ত"। বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্য সমাজে দত্তবংশ সামাজিক মর্য্যাদায় অতি হীন বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু চক্রপাণি বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত আধুনিক কৌলীন্যসৃষ্টির বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চক্রপাণির সময়ে দত্তবংশীয়গণ বৈদ্যসমাজে কুলীন বলিয়াই গৃহীত হইতেন।

চক্রপাণি বঙ্গের পালবংশীয় রাজা নরপালের রাজত্বে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নারায়ণ কবিরাজ রাজা নরপালদেবের পাকশালার মন্ত্রী ছিলেন। এই কৃতী লেখক স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভাবী চিকিৎসকগণের পথ সুগম করিয়া অশেষ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "চক্রদত্ত" দেশের ও সমাজের যে উপকার করিয়াছে তাহাতে তাঁহার পবিত্র নাম ভারতবাসীর হৃদয়পটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। (গৌড়গোবিন্দ দেখ)।

চণ্ড—মিবারের রাণা লাক্ষের পুত্র। ইনি রাণা চণ্ড নামে রাজপুতনার ইতিহাসে খ্যাত। ইঁহার স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে রাজস্থান গৌরবান্বিত। মারবারের রাজা রণমল্ল মিবারের রাজপুত্র চণ্ডের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং কৌলিক প্রথানুসারে একটি নারিকেলফলসহ দূত প্রেরণ করেন। রাণা লাক্ষ সাদরে বিবাহ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। চণ্ড রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না; রাণা লাক্ষ চণ্ডকে রাজসভায় আসিতে আদেশ দিয়া দূতকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইত্যবসরে রাণা লাক্ষ কৌতুকচ্ছলে দূতকে বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আমার মত শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের জন্য আপনারা এরূপ খেলার সামগ্রী প্রেরণ করেন না", রাণার এই কৌতুকোক্তি শুনিয়া সভাস্থ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল এবং আনন্দের রোল প্রবাহিত হইল। চণ্ডের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছিল, তিনি আসিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেই, দূতকে মঙ্গল সমাচারসহ প্রেরণ করা যাইতে পারে। অনতিবিলম্বে চণ্ড সভায় উপস্থিত হইয়া পিতার কৌতুকোক্তি অবগত হইলেন এবং ইহা শুনিয়াই গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, পিতা কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া যে কন্যাকে মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার বলিয়া ভাবিয়াছেন, তাহাকে পুত্র কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। এই কূট চিন্তা করিয়া চণ্ড বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পিতার উপদেশ, স্নেহবচন, অনুরোধ, আদেশ এবং অবশেষে ভীতি-প্রদর্শন কিছুতেই চণ্ডকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না; তিনি কিছুতেই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। রাণা লাক্ষ মারবারপতি রণমল্লের অপমান মনে করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন; তিনি পুত্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং অবশেষে রণমল্লকে অপমান হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিজেই সেই কন্যা গ্রহণ করিলেন। ভবিতব্যতার গূঢ় লিখন কে খণ্ডন করিতে পারে? দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা পঞ্চাশবর্ষীয় বৃদ্ধের হস্তে সমর্পিত হইল। এই কন্যার গর্ভে মুকুলজি জন্মগ্রহণ করিলেন। মুকুলের যখন পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স, তখন রাণা লাক্ষকে যুদ্ধোপলক্ষে গয়াতে যাইতে হইল। যুদ্ধে যাইবার সময় রাণা লাক্ষ চণ্ডকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারি, তবে মুকুলের উপজীবিকা কি হইবে?" তেজস্বী চণ্ড ধীরভাবে বলিলেন, "চিতোরের সিংহাসন।" এই উত্তরে পাছে পিতার কোন সন্দেহ হয়, এজন্য তাঁহার গয়াযাত্রার প্রাক্কালেই চণ্ড মুকুলকে চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। চণ্ডের দৃঢ় সঙ্কল্প ও মহৎ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া রাজ্যের সমস্ত লোক বিস্মিত হইল। মুকুলকে অভিষিক্ত করিয়া বীরবর চণ্ড পঞ্চমবর্ষীয় ভ্রাতার নিকট অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই স্বার্থত্যাগের প্রতিদান স্বরূপ তাঁহাকে মন্ত্রিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া হইল এবং ইহাও বিধিবদ্ধ হইল যে, কোন সামন্তকে ভূমি বৃত্তিদান করিতে হইলে, দান পত্রে রাণার স্বাক্ষরের শিরোভাগে চণ্ডের ভল্লচিহ্ন অঙ্কিত থাকিবে। তিনি মিবাররাজ্যের উন্নতিকল্পে অক্লান্তভাবে শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল অতীত হইলে মুকুলজীর মাতা চণ্ডের ক্ষমতা দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। বিমাতার এই ঈর্ষ্যাভাব লক্ষ্য করিয়া চণ্ডের উদার হৃদয় অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইল। তিনি রাজক্ষমতা বিমাতার হস্তে ন্যস্ত করিয়া মান্দুরাজ্যে গমন করিলেন। মান্দুরাজ চণ্ডের স্বার্থত্যাগের বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন; তিনি চণ্ডকে ভূ-সম্পত্তি দিয়া নিজ রাজ্যমধ্যে রাখিলেন। চণ্ড যাইবার সময় বিমাতাকে বলিয়া গেলেন, "দেখিবেন, শিশোদীয় কুলের গৌরব যেন নষ্ট না হয়"। বিমাতার আত্মীয়গণ রাজ্যমধ্যে নানাকাজে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা স্বার্থপরায়ণ, অর্থলোলুপ ও অকর্ম্মণ্য। অচিরেই মিবার রাজ্যে শাসন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। মুকুলজীর মাতামহ রণমল্ল চণ্ডের স্থলে মুকুলজীর অভিভাবক হইলেন। রণমল্ল ক্রমে ক্রমে রাজক্ষমতা কন্যার হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন; অবশেষে তিনি দৌহিত্রকে বিনাশ করিয়া চিতোরের সিংহাসন গ্রহণের ষড়যন্ত্র করিলেন। একজন প্রাচীনা ধাত্রী মুকুলের মাতাকে এই দুরভিসন্ধির বিষয় জ্ঞাপন করিলে, রাণীমাতা পুত্রের রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া চণ্ডের নিকট গোপনে দূত প্রেরণ করেন। চণ্ডের কৌশলে ও অসীম সাহসিকতায় রণমল্ল ও

ষড়যন্ত্রকারিগণ নিহত হইলেন; রণমল্লের পুত্র যোধরাও পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এইরূপে মুকুলের প্রাণরক্ষা করিয়া এবং তাঁহাকে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া চণ্ড যথাকালে পরলোক গমন করেন। চণ্ডের দুই পুত্র ছিল, কিন্তু উভয়েই রণমল্লের পুত্র যোধরাওর সহিত যুদ্ধে নিহত হয়। রণমল্লের পুত্র যোধরাও স্বীয় নামানুসারে যোধপুর নগর স্থাপন করেন। জীবনের শেষভাগে চণ্ড কোন রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই; কেবল পরোপকার ও ধর্ম্মচর্য্যায় দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (রাজস্থান)

চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার—প্রথিত নামা ন্যায়দর্শী পণ্ডিত। নিবাস ফরিদপুর জিলায় কানার গাঁ। উহা এখন পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস—বিখ্যাত পদাবলীরচক। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি। বীরভূম জিলার অন্তর্গত নান্নুরগ্রামে ১৩৩৯শকে (১৪১৭ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক কবি জয়দেব ও এই বীরভূম জিলায় জন্মিয়াছিলেন। এই উভয় প্রেমিককবির জন্মে বীরভূমের নামটি পবিত্র হইয়াছে। দুর্গাদাস বিশালাক্ষী (বাশুলী) দেবীর পূজক ছিলেন; এখনও নান্নুরগ্রামে বাশুলী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস বাশুলী দেবীর পূজার ভার গ্রহণ করেন। এই দেবমন্দিরের সেবিকা রামতারা ওরফে তারাধোবানীর সহিত চণ্ডীদাসের আসক্তি ছিল। চণ্ডীদাস আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। রামতারা চণ্ডীদাসে বিশুদ্ধপ্রেম সঞ্চারিত করে। রজকিনীর সহিত সংসর্গহেতু গ্রামের লোক ইহাকে সমাজচ্যুত করে, কিন্তু গ্রামের একটী বৰ্দ্ধিষ্ণুলোক চণ্ডীদাসের ধর্ম্মভাব দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার প্রভাবে চণ্ডীদাস পুনরায় সমাজে গৃহীত হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্বসামগ্রী। চণ্ডীদাস রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার পদাবলী এত মধুর যে, উহা হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকল পদাবলীলেখকই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী। চণ্ডীদাস ১৩৯৯ শকে (১৪৭৭ খৃঃ) ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি বিনয়ী ছিলেন; লোকদিগকে তিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। (দীনেশচন্দ্র সেন)।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (মহামহোপাধ্যায়)—পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজের এক অসাধারণ পুরুষ। ইঁহার পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগরিমা ও প্রতিভায় কেবল বঙ্গ নয়, ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র ইয়োরোপ এবং আমেরিকার জ্ঞানিজনগণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শত বর্ষেও এরূপ বড় লোকের অভাব পূর্ণ হয় না। গ্লাড্‌ষ্টোন গিয়াছেন, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন তাঁহাদের স্থান এ পর্য্যন্ত পূর্ণ হইল না; আজ আবার চন্দ্রকান্ত চলিয়া গেলেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের অধিবাসী হইলেও ইনি সমুদয় বাঙ্গালী জাতির গৌরব ছিলেন। ইনি ১২৪৩ সনের (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) ১৯ শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ জিলার সেরপুর নামক স্থানে বন্দ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নাম রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। চন্দ্রকান্ত বাল্যকালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত পুরাপাড়া গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন; পরে তদানীন্তন কালের সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্র ভূমি নবদ্বীপে গমন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন এবং ২৩ বৎসর বয়সে তর্কালঙ্কার উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখিনী ছিল। তিনি সেরপুর নিজবাটীতে টোল করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে তিনি গোভিলগৃহসূত্রের ভাষ্য লিখেন ইহা পাঠ করিয়া কলিকাতার পণ্ডিতসমাজ মুগ্ধ হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গুণগ্রাহী মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়গণের আগ্রহাতিশয়ে তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। এই পদেই তাঁহার প্রতিভার অধিকতর স্ফূর্ত্তি হয়; তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী বর্ষে ইনি "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করেন। তিনি কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শনাদি বিষয়ে যে সমুদয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার এক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর

মাসে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীগোপল বসুমল্লিক প্রদত্ত বৃত্তিলাভের জন্য নানাবিধ দর্শনশাস্ত্রের গভীর গবেষণাপূর্ণ লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই সমুদয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা হারে পঁচিশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই সমুদয় প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করিতেছে। ম্যাক্সমূলর, বেবর, কাউয়েল প্রভৃতি সংস্কৃতাভিজ্ঞ ইয়োরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থনিচয় পাঠ করিয়া সসম্মানে তাহার নিকট পত্র লিখিতেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ২০শে মাঘ বুধবার বারাণসীধামে এই বিখ্যাত পণ্ডিত ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তর্কালঙ্কার প্রণীত গ্রন্থাবলী:——

দর্শন—
(১) ফেলোসিপ লেক্‌চার অর্থাৎ শ্রীগোপাল বসুমল্লিক প্রদত্ত বৃত্তি লাভের জন্য লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধ—৫খণ্ড।
(২) মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য।
(৩) কুসুমাঞ্জলির টীকা।
(৪) তত্ত্বাবলী।

স্মৃতি—
(৫) গোভিল গৃহ্য সূত্রের ভাষ্য।
(৬) শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্য।
(৭) গৃহ্যসংগ্রহ ভাষ্য।
(৮) উদ্বাহ চন্দ্রালোক।
(৯) শুদ্ধ চন্দ্রালোক।

খণ্ডকাব্য—
(১০) প্রবোধ-ষটক।
(১১) যুবরাজ প্রশস্তি।
(১২) আনন্দ তরঙ্গিণী।
(১৩) ভাব-পুষ্পাঞ্জলি।

মহাকাব্য—(১৪) চন্দ্রবংশ।

অলঙ্কার—(১৫) অলঙ্কার সূত্র।

নাটক—
(১৬) সতীপরিণয়।
(১৭) কৌমুদী সুধাকর।

ব্যাকরণ—(১৮) কাতন্ত্র ছন্দ প্রক্রিয়া।

বাঙ্গালা—
(১৯) সত্যবতী চম্পূ।
(২০) শিক্ষা।

এতদ্ব্যতীত বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে; আশা করা যায় ঐ সকল গ্রন্থ শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

চন্দ্রগুপ্ত—প্রাচীন ভারতের একজন প্রবল পরাক্রান্ত মৌর্য্য সম্রাট। চন্দ্রগুপ্তের সময় নিরূপণ করা দুরূহ। প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে মগধে নন্দনামক রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই রাজবংশে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন; কেহ কেহ এই সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে মহানন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মন্ত্রীর নাম রাক্ষস। সর্ব্বার্থসিদ্ধির দুই পত্নী; এক জনের নাম মুরা, অপরা সুনন্দা। মুরার গর্ভে মৌর্য্য নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সুনন্দার নয়টী পুত্র; ইহারা নবনন্দ নামে অভিহিত হইত। রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি বার্দ্ধক্যে নবনন্দের উপর রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক মৌর্য্যকে তাহাদের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত করিয়া বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মন্ত্রী মৌর্য্যের বহু পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত অন্যতম। মৌর্য্যপুত্রগণ অতি বীর্য্যবান ছিলেন, এজন্য নবনন্দ তাহাদের উপর ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া মৌর্য্যকে পুত্রগণ সহ কারারুদ্ধ করেন। ঘটনাক্রমে নবনন্দ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্ত যেমন দৈহিক বলে বলীয়ান, তেমনি শারীরিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিলেন। মানসিক বলও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তাঁহার হৃদয় উদারতার জন্য প্রশস্ত ছিল। এই গুণবাহুল্যে তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। নবনন্দ এই জন্য তাঁহার প্রাণ বধের চেষ্টা করেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রাণরক্ষার্থ চিন্তিত হইলেন; কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রাণ রক্ষা হয়, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। একদিন পথি মধ্যে তিনি দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ পায়ে কুশবিদ্ধ হইয়া ক্রোধে কুশ উৎপাটন করিতেছেন এবং কুশের গোড়ায় তক্র ঢালিয়া মূলসহ কুশবিনাশের চেষ্টায় আছেন। চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ব্রাহ্মণের নাম চাণক্য। তিনি ভাবিলেন যে, এইরূপ অধ্যবসায়শালী লোকের সাহায্য গ্রহণ করিলেই তিনি রক্ষা পাইতে পারিবেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং কোন কৌশলক্রমে একদিন তাহাকে ভোজনালয়ে নন্দের আসনে বসাইয়াছিলেন। ইহাতে নন্দগণ ক্রুদ্ধ হইয়া চাণক্যকে বলপূর্ব্বক আসন হইতে উঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া মস্তকের শিখা উন্মোচন পূর্ব্বক বলিয়া গেলেন যে, যতদিন না নন্দবংশের উচ্ছেদ হইবে ততদিন তিনি শিখা বন্ধন করিবেন না। চন্দ্রগুপ্ত

নগর ছাড়িয়া চাণক্যের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপ পর্ব্বতরাজকে আহ্বান করিলেন। নির্দ্ধারিত হইল যে, যদি যুদ্ধে জয় লাভ করা যায়, তবে ম্লেচ্ছাধিপ অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। ম্লেচ্ছাধিপ সসৈন্যে নবনন্দের রাজ্য আক্রমণ করিলেন; একে একে নবনন্দ নিহত হইলেন; নন্দমন্ত্রী রাক্ষস উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে কৌশলক্রমে নগর হইতে বাহির করিয়া অরণ্যে পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত রাজধানী অধিকার করিলেন। মন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের জন্য এক বিষময়ী কন্যা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের পরামর্শে উহা ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতকে অর্পণ করেন; ইহাতে তাহার মৃত্যু হয়। অতঃপর চাণক্য পর্ব্বতরাজের পুত্র মলয়কেতুকে প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। মলয়কেতু ভীত হইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করেন। তৎপর চাণক্যের কৌশলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাক্ষস মলয়কেতুর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। চাণক্য রাক্ষসের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাহাকেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত করেন। চাণক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষভুক্ত করিতে না পারিলে তাহার সিংহাসন নির্ব্বিঘ্ন হইবে না। বিশাখদত্ত এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মুদ্রারাক্ষস নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়াছেন।

কাহারও মতে চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বার্থসিদ্ধির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি দাসীগর্ভসম্ভূত বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বিদ্বেষনয়নে পতিত হইলেন। সর্ব্বার্থসিদ্ধির দুই মন্ত্রী ছিল; রাক্ষস ও শকটার। কোন কারণে শকটার নৃপতি-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন, এজন্য তিনি রাজবংশ ধ্বংস করিতে সঙ্কল্প করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ শকটার চাণক্যকে পথে দেখিতে পাইলেন। রাজবাড়ীতে কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রাদ্ধীয় পাত্র গ্রহণের জন্য চাণক্যকে আনয়ন করা হয়; চাণক্য রাজার আসনে উপবেশন করিলে রাজার ইঙ্গিতক্রমে অনুচরেরা তাহাকে শিখা ধরিয়া নামাইয়া দেয়; ইহাতে চাণক্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাজবংশ ধ্বংস করিতে সঙ্কল্প করেন।

বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত তাহার নিজ মাতুল ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করিয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথ বসু—(এম. এ.) বঙ্গ-সাহিত্যের বিখ্যাত চিন্তাশীল ও মনস্বী লেখক। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন বঙ্গাব্দ ১৩১৭ সনের ৬ই আষাঢ় সোমবার অপরাহ্ন ৪½ ঘটিকার সময় ৬৮ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি দীর্ঘকাল বঙ্গের ছোটলাটের আফিসে অনুবাদকের কার্য্য করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ইঁহার নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(১) হিন্দুত্ব, (২) সাবিত্রীতত্ত্ব, (৩) ত্রিধারা, (৪) শকুন্তলাতত্ত্ব ইত্যাদি।

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন—ফরিদপুর জিলার ধানুকা নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইঁহার কৃত ন্যায়ের টিপ্পনী সমূহ "চান্দীপাইতা" নামে প্রসিদ্ধ। তৎপুত্র ৺রাধাকান্ত তর্কশিরোমণি মহাশয়ও অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। রাধাকান্তের পোষ্যপুত্র শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত তর্করত্ন বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ—(১) ইদিলপুর পরগণার মূলগ্রাম নিবাসী; এস্থান ফরিদপুরের অন্তর্গত। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া ইনি সর্ব্বত্র প্রথিত ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস্তব্য করিতেছেন।

(২) ফরিদপুর জিলার জপসা গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

চড়ক—বিখ্যাত বৈদ্যকগ্রন্থ চরকসংহিতার প্রণেতা। অনন্তদেব চররূপে (গুপ্তবেশে) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, মানবমণ্ডলী নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। মানবের এই দুর্দ্দশা অবলোকনে তাহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি ষড়ঙ্গ বেদবেত্তা ঋষিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মানবের ব্যাধিজনিত দুঃখ দূর করিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করেন। চররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া অনন্তদেব চরকনামে খ্যাত হন। ইনি অত্রিপুত্র ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

চাঁদকবি—ইনি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সভার রাজকবি। পৃথ্বীরাজ ইঁহাকে কবীশ্বর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত কবির যশঃ ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহার গ্রন্থের নাম "পৃথ্বীরাজ রায়সা"। এই গ্রন্থে কবি প্রতিপালক পৃথ্বীরাজের জীবনী ও তৎসাময়িক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া গজনীতে লইয়া যান; তথায় ইঁহাকে অন্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। চাঁদ প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গজনীতে গমন করেন, কিন্তু বহুচেষ্টায়ও বন্দী রাজার সহিত দেখা করিতে পারেন নাই; অবশেষে কারাধ্যক্ষকে গানে মুগ্ধ করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পৃথ্বীরাজকে অন্ধ দেখিয়া ইনি মর্ম্মে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। উপকারী রাজার প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার দর্শনে কবি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া কৌশলক্রমে মহম্মদ ঘোরীকে বধ করেন এবং প্রতিপালকের সহিত নিজে আত্মহত্যা করেন। এইরূপে রাজা ও তাঁহার অনুরক্ত সেবক সংসারজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। (ইতিহাস)

চাঁদকুমারী—পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্রবধূ ও খড়্গসিংহের মহিষী। রণজিৎ সিংহ মৃত্যুসময়ে মন্ত্রী ধ্যানসিংহের হস্তে পুত্র খড়্গসিংহের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া যান, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী প্রভুর আদেশের অবমাননা করিয়া সিংহাসনের লোভে খড়্গসিংহ ও তৎপুত্র নেহাল সিংহের হত্যা সম্পাদন করেন। রাণী চাঁদকুমারী ধ্যানসিংহকে স্বামিপুত্রহত্যার কারণ মনে করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং উত্তম সিংহকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রী ধ্যানসিংহ সেনাপতি গোলাপসিংহের সহায়তায় রাণী চাঁদকুমারীকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং রণজিৎ সিংহের এক রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সেরসিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাণী চাঁদকুমারী সেরসিংহকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। সেরসিংহ রাজপদে আসীন হইয়াই চাঁদকুমারীকে হস্তগত করিয়া বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু রাণী চাঁদকুমারী সেরসিংহের প্রস্তাব অতি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। রাণীকে হস্তগত করিতে না পারিয়া উৎকোচবলে তাঁহার পরিচারিকাগণের দ্বারা তাঁহার হত্যা সম্পাদন করেন। রাণী চাঁদকুমারী অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। এই চরিত্রবলসম্পন্না বুদ্ধিমতী বীরললনার জীবন বিষাদময়; তিনি অকালে পতিপুত্র-বিহীনা, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিনিচয়ের ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত এবং অবশেষে এক ঘৃণিত উপায়ে অর্থলোলুপ পরিচারিকাগণের হস্তে নিহত হন। (ধ্যানসিংহ দেখ) (ইতিহাস)

চাঁদবিবি—ইনি চাঁদসুলতানা নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধা। ইনি দাক্ষিণাত্যের আহাম্মদ নগরের অধীশ্বর হুসেন নিজাম সাহেবের কন্যা। এই বীরবালার মধ্যে অশেষ গুণরাশি বিদ্যমান ছিল। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরের সুলতান আলী আদিল শাহ্ ইঁহার রূপগুণশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে বিবাহ করেন। এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনীর কপালে ভাগ্যসম্পদ্ বিরূপ ছিল। বিবাহের অল্পদিন পরেই ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিধবা হন। যাহাতে পতির মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য ইনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃত পতির ভ্রাতুষ্পুত্র নবমবর্ষীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক, নিজে তাঁহার অভিভাবিকা-পদবর্ত্তিনী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। চাঁদবিবির অভিভাবকতায় সুলতান ইব্রাহিমের রাজত্ব ঘটনাপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তর্ব্বিদ্রোহে বিজাপুর বিধ্বস্ত হইতেছিল; গোলকুণ্ডা ও বিদরের রাজগণ এই সময়ে সুযোগ পাইয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু চাঁদবিবির বুদ্ধিবলে ও যুদ্ধকৌশলে সকলেই পরাস্ত হইলেন। বিজাপুরে শান্তি স্থাপিত হইল। বিজাপুরে শান্তি স্থাপন করিয়া চাঁদবিবি পৈতৃক রাজ্য আহাম্মদাবাদে আসিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট আকবর দুইবার আহাম্মদনগর আক্রমণ করেন। প্রথমবার সম্রাটপুত্র মোরাদের সেনাপতিত্বে মোগলসৈন্য পরাভূত হয়; এই যুদ্ধে চাঁদবিবি স্বয়ং যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া সমস্ত রাত্রি নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। মোগলসৈন্য এবার পরাভূত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বিতীয়বারের আক্রমণে চাঁদবিবি নগররক্ষা করিতে পারিলেন না। নগর শত্রুহস্তগত হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বিশ্বাসঘাতক অনুচরের হস্তে নিহত হন। এই বীর্য্যবতী রমণীর সাহসিকতা জগতে অতুলনীয়। (ইতিহাস)

চাঁদরায়—বঙ্গের দ্বাদশ ভূঁইয়ার মধ্যে অন্যতম। ইঁহার পুত্র কেদার রায়। ইনি পদ্মাতীরে বিক্রমপুরের

অন্তর্গত শ্রীপুরের ভূম্যধিকারী। ইনি দে উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ নিমরায় কর্ণাট প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীপুরে অবস্থিতি করেন। নিমরায় বঙ্গের প্রথম ভূঁইয়া বলিয়া অভিহিত হইতেন। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ঈশা খাঁ ইঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন ঈশা খাঁ শ্রীপুরের চাঁদরায়ের গৃহে অতিথি হইলেন; চাঁদরায় সম্ভ্রান্ত মিত্রের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীপুরে অবস্থানকালে, চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ী, ঈশা খাঁর নয়নপথে পতিত হন। ঈশা খাঁ, স্বর্ণময়ীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে ছলে বলে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, অবশেষে শ্রীমন্ত খাঁ নামক চাঁদরায়ের একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক স্বর্ণময়ীকে ঈশা খাঁর হস্তে অর্পণ করেন। ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীকে লইয়া নিজরাজ্যে, সুবর্ণগ্রামে (সোনারগাঁ) প্রস্থান করেন। মুসলমানকর্ত্তৃক কন্যার অপহরণে চাঁদরায় লজ্জায় ও অপমানে ম্রিয়মাণ হইয়া শয্যাগত হইলেন এবং অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করিলেন। পিতৃবিয়োগের পর কেদার রায় এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন এবং মোগলের অধীনতাপাশচ্ছেদনপূর্ব্বক নিজকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। কেদার রায় ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাঠানরাজত্বে ভূঁইয়া ছিলেন, এখন মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে কেদার ইচ্ছা করিলেন না। শ্রীপুরের দক্ষিণে পদ্মানদীতে সনদ্বীপ (সন্দ্বীপ) মোগল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কেদার রায় অসীম বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক এই দ্বীপ আক্রমণ করেন এবং ইহা মোগলরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন (১৬০২ খৃঃ)। এই যুদ্ধে কেদারের পর্টুগিজ জাতীয় সেনাপতি কার্ভেলো অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কেদার এই সেনাপতির হস্তে সন্দ্বীপের শাসনভার অর্পণ করেন। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে উপস্থিত হইয়া কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। এই সময়ে কেদার রায়ের ৫০০ রণতরী ছিল। মোগল সেনাপতির সহিত যুদ্ধে প্রথমে কেদার রায় জয়লাভ করেন, কিন্তু অবশেষে আহত হইয়া বন্দী হন এবং মানসিংহের সমীপে নীত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রাণত্যাগ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মানসিংহ কেদার রায়কে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁহার হত্যা সাধন করেন। কেদার রায়ের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে, তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং মানসিংহ অল্প আয়াসেই শ্রীপুর অধিকার করিয়া ফেলেন। (ইতিহাস)

চাণক্য—বিখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। ইনি চণকবংশে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া চাণক্যনামে অভিহিত। ইঁহার প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। চণকও একজন প্রাচীন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। চাণক্য-প্রণীত সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র হিন্দুর ঘরে ঘরে বর্ত্তমান। চাণক্যের অপর একটী নাম কৌটিল্য। "কূট" অর্থাৎ ধান্যপূর্ণ কুম্ভ যাঁহারা সঞ্চয় করেন, তাঁহাদিগকে "কুটল" বলে। যাঁহারা একবৎসরের জীবিকার উপযোগী ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, তাদৃশ গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরা "কূটল" বা "কুম্ভীধান্য" নামে অভিহিত হইতেন। চাণক্যের পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত প্রকার গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তিনি কৌটিল্যনামে খ্যাত হইয়াছেন। বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ রিজ্ ডেভিস্ (Rhees Davis) সাহেবের মতে চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যে অভিষিক্ত হন; অতএব চাণক্যও সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার বুদ্ধিবলে চন্দ্রগুপ্ত নবনন্দদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পুরাণাদি হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া "চাণক্যসারসংগ্রহ" নামে একখানি নীতিগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি অতি উপাদেয়। রাজতরঙ্গিণীর মতে পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, গুণাঢ্য, চাণক্য, নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, ইঁহারা সমসাময়িক ব্যক্তি। (চন্দ্রগুপ্ত দেখ)

চিন্ কুলি খাঁ—(নিজাম উল মুলুক আসফ জা)—ইনি হায়দরাবাদের নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমতঃ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে মালব প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পর তদীয় দুই পৌত্র ২য় শিবাজী ও শাহুর মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইলে গৃহবিচ্ছেদানল প্রজ্জ্বলিত হয়। চিন্ কুলি খাঁ শাহুর পক্ষ অবলম্বন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর পরাক্রম ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে,

চিন্ কুলি খাঁ মালব প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন নরপতি হইতে চেষ্টা করেন। ইনি একাধিকবার মোগল সৈন্তকে পরাস্ত করেন; অবশেষে সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সহিত ইঁহার বিবাদ মীমাংসা হয়। ইনি দিল্লীর সম্রাটের স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে লাগিলেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হায়দরাবাদ নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ২২শে মে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে ইনি মহারাষ্ট্রপতি বাজী রাওর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। (ইতিহাস)

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য—বর্দ্ধমান জিলায় গুপ্তিপাড়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি "বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী" ও "মাধবচম্পু" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম বামদেব। ইনি ষোড়শ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার পিতা রাজেন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ এবং পিতামহ কাশীনাথ। ইনি কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

চৈতন্য—বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইনি ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। ইঁহার নামকরণের নাম বিশ্বম্ভর, বাল্যকালের ডাক নাম নিমাই, সন্ন্যাসের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্য, চৈতন্য, মহাপ্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ এই নামে তদীয় ভক্তগণ তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টনিবাসী এবং শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মাতার নাম শচীদেবী। শচীদেবীর গর্ভে জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র ও আট কন্যা জন্মে। কন্যাগণ অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পাছে দ্বিতীয় পুত্র নিমাই জ্ঞানলাভ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করে, এজন্য জগন্নাথ নিমাইর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; কিন্তু পিতার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নিমাই কালক্রমে ঘটনাচক্রে নবদ্বীপে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং পিতা যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, নিমাইর ভাবী জীবনে তাহাই ঘটিল। নিমাই নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র। টোলে অধ্যয়নসময়েই নিমাইর যশঃ নবদ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ছাত্রের প্রতিভা ও প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি নবদ্বীপেই অধ্যাপকতা আরম্ভ করেন। তিনি গয়াতে যান এবং তথায় ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষিত হইবামাত্রই তাঁহাতে মহাভাবের প্রকাশ হয়। এই সময় কেশব কাশ্মীর নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে উপস্থিত হন। নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিচার হয়; বিচারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন; নবদ্বীপের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। তৎপর নিমাই প্রথমে লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি মাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। এই পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত নবদ্বীপবাসীকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়া তুলেন। জগাই মাধাই নামে দুই দুরন্ত পাপাচারী হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধী ছিল, এমন কি তাহারা শ্রীচৈতন্যের উপরও উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন। অতঃপর ২৪ বৎসর বয়সে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে (১৪৩১ শকে) তিনি কাটোয়া গ্রামে গমন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন। মাতা শচীদেবী পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণে বিলাপ করেন। জগতের হিতের জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তিনি মাতা ও পত্নীকে প্রবোধচ্ছলে উপদেশ দিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা করেন কিন্তু মাতার অনুরোধে তিনি নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে (পুরীতে) বাস করেন। পরবর্ত্তী বৎসর, ১৪৩২ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) ৭ই বৈশাখ শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন এবং ১৪৩৩ শকে (১৫১১ খৃঃ) ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ভ্রমণ ব্যাপারে তাঁহার এক বৎসর আট মাস ছাব্বিশ দিন লাগিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধবটেশ্বর নামক স্থানে সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নাম্নী দুই গণিকা তাঁহাকে

যৌবনজালে বদ্ধ করিয়া প্রতারিত ও বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং তাহারা শ্রীচৈতন্যের পদে শরণ লইয়া উদ্ধার পায়। ইহার পর পূর্ণনগরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নারোজী নামক ব্রাহ্মণ দস্যুকে সন্ন্যাস গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করেন; পরে ঘোষা নামক গ্রামে যাইয়া বারমুখী নাম্নী বেশ্যাকে উদ্ধার করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরে মহাপ্রভু কাশীধামে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তৎকালে কাশীতে প্রকাশানন্দসরস্বতী নামে এক বিখ্যাত সন্ন্যাসী বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যের সংসর্গে আসিয়া এই সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন এবং তদবধি প্রবোধানন্দনামে পরিচিত হন। মাতার আজ্ঞায় মহাপ্রভু নীলাচলেই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেইখানেই অবস্থিতি করিতেন। উৎকলের বহু বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত শ্রীচৈতন্যের দারুময়ী মূর্ত্তি এখনও ভক্তিভাবে পূজিত হইয়া থাকে। নবদ্বীপ পরিত্যাগের সময় তাঁহার স্নেহময়ী মাতা শোকাকুলা হইয়া দ্বাদশ দিন অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী বৈরাগী শ্রীচৈতন্য হরিনামে উন্মত্ত হইয়া মাতার চক্ষুজলে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে উৎকলে বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত এবং দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর তীর্থে এক যোগমার্গাবলম্বী পণ্ডিতের সহিত দর্শনশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। উক্ত উভয় পণ্ডিতই বিচারে পরাস্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪৫৪ শকে (১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়।

চোর কবি (১)—ইঁহার প্রকৃত নাম সুন্দর। ইনি প্রথম চোরকবিনামে পরিচিত। ইনি দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুর নগরের অধিপতি গুণসিন্ধুর পুত্র এবং বর্দ্ধমানরাজ বীরসিংহের জামাতা। ইনি রাজা বীরসিংহের বিদুষী তনয়া বিদ্যার মন্দিরে সুরঙ্গপথে উপস্থিত হন এবং গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহার রচিত চোরপঞ্চাশৎশ্লোক অতি প্রসিদ্ধ। (২)—ইঁহার প্রকৃত নাম বিহ্লন। ইনি দ্বিতীয় চোরকবিনামে পরিচিত। কনকাদ্রির উত্তরে মহাপঞ্চাল দেশে লক্ষ্মীমন্দির নামক নগরের রাজা মদনাভিরাম। এই রাজার মহিষী মন্দারমালা এবং তনয়া যামিনী-পূর্ণতিলকা। রাজা মদনাভিরাম ও রাণী মন্দারমালা পরামর্শ করিয়া বিহ্লনকে তনয়া যামিনীপূর্ণতিলকার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বিহ্লন অতি সুশ্রী যুবা পুরুষ। যাহাতে রাজতনয়া ও বিহ্লনের সাক্ষাৎ না হয় অথচ শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে এরূপ এক কৌশল করা হইল। রাজতনয়ার প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি অন্ধকে দর্শন দিবেন না এবং বিহ্লনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে দেখিবেন না। অতএব ইঁহাদিগকে বলা হইল যে রাজকন্যা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা এবং কবি বিহ্লন অন্ধ। কাজেই উভয়ের মধ্যে যবনিকা পতিত হইল। যবনিকার অন্তরাল হইতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য চলিতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যে রাজতনয়া পরম বিদুষী হইয়া উঠিলেন। একদা বিহ্লন কবি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নভোমণ্ডলের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণন করিলেন :—

"নেদং নভোমণ্ডল মম্বুরাশি
নৈতাশ্চতারা নবফেন ভঙ্গাঃ।
নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো
নাসৌ কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ ॥"

এই শ্লোকটি সাহিত্য-দর্পণে অপহ্নুতি অলঙ্কারের দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজতনয়া এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, একজন অন্ধ কিরূপে নভোমণ্ডলের এইরূপ চমৎকার বর্ণনা করিতে পারেন! তাঁহার ধারণ হইল যে, কবি অন্ধ নহেন। অনতিবিলম্বেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। এই দর্শনে উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ের গোপনে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইল। কথা বেশীদিন গোপন রহিল না। রাজা রাণী শুনিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া চোর-

কবির প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন কিন্তু পরিশেষে কবির প্রণয়াধিক্য ও কবিত্ব স্মরণ করিয়া দণ্ডরহিত করেন এবং স্বীয় তনয়ার সহিত মহাড়ম্বরে তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন।



জখনাচার্য্য (রাজা)—বিখ্যাত শিল্পী। দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কোর ও মহীসুরের রাজবংশ শিল্পনৈপুণ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কোরের রাজবংশীয় রাজা রবিবর্ম্মা শিল্পকর্ম্মে জগতে যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মহীসুরের রাজবংশীয় রাজা জখনাচার্য্যও তদ্রূপ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে মহীসুরের প্রধান দেবালয়গুলি রাজা জখনাচার্য্যের নির্ম্মিত।

জগৎচন্দ্র সার্ব্বভৌম—ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফুল্লশালী (ফুরশাইল) গ্রামে ১৭৫৭ শকের (ইং ১৮৩৫ খ্রীঃ বঙ্গাব্দ ১২৪২ সন) প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী। মাতা যশোদা দেবী। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত স্মার্ত্ত কালীকান্ত শিরোমণির পরলোক গমনের পরেই বিক্রমপুরে ইনি প্রাধান্য লাভ করেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণকেশরী পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ইনি ব্যাকরণ ও বাদার্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর নবদ্বীপ গমন করিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তত্রত্য বিখ্যাত পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট "সার্ব্বভৌম" উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে টোল স্থাপন করেন নানাস্থান হইতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জ্যৈষ্ঠ বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ইনি পরলোক গমন করেন। (কালীচরণ তর্কালঙ্কার দেখ)

জগৎশেঠ (ফতেচাঁদ জগৎশেঠ)—মুর্শিদাবাদনিবাসী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধনকুবের। ইঁহার প্রকৃত নাম ফতেচাঁদ; "জগৎশেঠ" উপাধি মাত্র। "জগৎশেঠ" শব্দের অর্থ জগতের মধ্যে প্রধান শ্রেষ্ঠী বা ধনী। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট ফতেচাঁদকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মারবার হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রায় উদয়চাঁদ এবং মাতা ধনবাই। ধনবাইর সহোদর মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন; মাণিকচাঁদ তদানীন্তন কালের একজন বিখ্যাত ধনী। অপুত্রক মাণিকচাঁদ শেঠ স্বীয় ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তদবধি ফতেচাঁদ ধনিশ্রেষ্ঠ মাণিকচাঁদের পুত্ররূপে পরিচিত হইলেন। যে সমুদয় লোক নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া দেশে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফতেচাঁদ জগৎশেঠ অন্যতম। সিরাজের পদচ্যুতি ও হত্যার পর মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব পদে আসীন হন, কিন্তু তাঁহার কপালে এ সৌভাগ্য ভোগ অধিককাল ঘটে নাই। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মিরজাফর পদচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার স্থানে তদীয় জামাতা মীর কাসেম বাঙ্গালার নবাব হইলেন। মীর কাসেম পূর্ব্বাবধিই ফতেচাঁদ জগৎশেঠের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফতেচাঁদ জগৎশেঠ মিরকাসেমের হস্তে বন্দী হইলেন। ইংরেজেরা তাঁহার মুক্তির জন্য মিরকাসেমকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নবাব মীরকাসেম তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ক্রোধে ফতেচাঁদ জগৎশেঠকে বিনাশ করেন। ফতেচাঁদের অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশও একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। জগদীশ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; বাল্যকালে ইঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। ইনি বাল্যে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। একদিন তিনি পক্ষিশাবক ধরিতে তালগাছে উঠিয়া যেমন পক্ষিকোটরে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছিলেন, অমনি এক বিষধর সর্প তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। জগদীশ প্রত্যুৎপন্নমতিবলে হাত দিয়া সর্পের ফণা ধরিয়া ফেলিলেন। সর্প দংশন করিতে অবসর না পাইয়া জগদীশের হাত লাঙ্গুল দিয়া বেষ্টন করিল এবং তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। জগদীশ তালবৃন্তে হস্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক সর্পকে খণ্ড খণ্ড

করিয়া ফেলিলেন। এক সন্ন্যাসী জগদীশের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নির্ভীকতা লক্ষ্য করিতেছিলেন। জগদীশ অক্ষতদেহে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলে সন্ন্যাসী তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং তাহাকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে জগদীশের বয়স অষ্টাদশবর্ষ। তিনি অত্যন্ত গরীব ছিলেন; বহু কষ্টে তিনি বিদ্যার্জ্জন করেন। ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ভবানন্দ বিদ্যাবাগীশের টোলে প্রবেশ করেন। ভবানন্দের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া জগদীশ "তর্কালঙ্কার" উপাধি লাভ করেন। ইহার পর চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপকতা কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার অধ্যাপনাগুণে নানাস্থান হইতে বহু ছাত্র সমাগত হইতে লাগিল। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের দীধিতি গ্রন্থের প্রাঞ্জল টীকা লিখেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ন্যায়শাস্ত্র সংক্রান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন।

১। গাঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত "অনুমান ময়ূখ" নামক গ্রন্থের ভাষ্য।
২। পক্ষতা।
৩। কেবলান্বয়ী।
৪। কেবল ব্যতিরেকী।
৫। অন্বয় ব্যতিরেকী।
৬। অবয়ব।
৭। চতুষ্টয় তর্ক।
৮। সিদ্ধান্ত লক্ষণ।
৯। ব্যাপ্তি পঞ্চক।
১০। উপাধিবাদ।
১১। পূর্ব্বপক্ষ।
১২। অনুমান দীধিতির তর্ক।
১৩। সিংহ ব্যাঘ্রী।
১৪। অবচ্ছেদক নিরুক্তি।

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ—বিক্রমপুরের একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৭৫৮ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৪৩ সন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) ৮ই শ্রাবণ তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত পুরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেরপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ঠিক এই বর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিও পুরাপাড়ায় আগমন করিয়া তত্রত্য অন্যতম পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন। (চন্দ্রকান্ত দেখ)। জগদ্বন্ধু তদীয় পিতৃব্য নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের টোলে অধ্যয়ন করেন। ৬ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ১৯শে বৈশাখ ৬৮ বৎসর বয়সে রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় ছোট বড় ৩০ খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ ইহাদের অধিকাংশই মুদ্রিত হইতে পারে নাই।

জগন্নাথ বড়ুয়া (রায়বাহাদুর)—এই মহাত্মা আসামের অন্তর্গত যোরহাটে ১৭৭৩ শকে (ইং ১৮৫১ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ তিনি এণ্ট্রেন্স পাশ করেন এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই উপর আসামের (upper assam) প্রথম গ্রাজুয়েট; এজন্য সেখানকার লোকেরা তাহাকে বি, এ, জগন্নাথ বলিত। তিনি রায়বাহাদুর অপেক্ষা বি, এ, জগন্নাথ নামে সাধারণের নিকট অধিক পরিচিত। তিনি যে বৎসর বি, এ, পাশ করেন সেই বৎসরেই তিনি দেশীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সব ডেপুটী পদ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা জগন্নাথ উহা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি পৈতৃক ১০০ বিঘা জমিতে চা-বাগান করেন। এই চা-এর ব্যবসাতে এত উন্নতি লাভ করেন যে ২০ বৎসর কালের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ চাবাগানের স্বত্বাধিকারী হইয়া একজন সম্পত্তিশালী লোক বলিয়া গণ্য হন। তিনি ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু মাননীয় মাণিকচন্দ্র বড়ুয়া স্বদেশের উন্নতিকল্পে যাহা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। পরলোকগত জগন্নাথ বড়ুয়াকে বুঝিতে হইলে মাণিকচন্দ্র বড়ুয়াকে বুঝিতে হয়। মাণিকচন্দ্র বড়ুয়া এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার জীবনী লখার সময় এখনও আসে নাই। রায়বাহাদুর জগন্নাথ যোরহাটের সার্ব্বজনিক সভার সভাপতি ছিলেন। আসামের

সর্ব্ববিধ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি ইংরেজীতে সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। বিলাতের একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, শতকরা ৯৯ জন ইংরেজ এরূপ সুন্দর ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে পারেন না। তিনি সর্ববাদিসম্মতরূপে আসামবাসিগণের নেতা ছিলেন। তিনি উদারপ্রকৃতি ও উন্নতমনা লোক ছিলেন। তিনি সম্রাটের গত রাজ্যাভিষেকের সময় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। আসামবাসীদিগকে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করিতে ইনি ও ইঁহার বন্ধু মাণিকচন্দ্র বড়ুয়াই শিক্ষা দেন। ১৮২৯ শকে (ইং ১৯০৭ খ্রীঃ) এই মহাত্মার মৃত্যু হয়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—এই বিখ্যাত পণ্ডিত ১৬১৭ শকে (ইং ১৬৯৫ খৃঃ, বঙ্গাব্দ ১১০২ সনে) ত্রিবেণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয়পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ সুপণ্ডিত হইলেও দরিদ্রতা-নিবন্ধন বহুকষ্টে তাঁহাকে পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে হইত। কর্ম্মকাণ্ডের নিমন্ত্রণে ও শিষ্য-যজমানের নিকট হইতে যাহা লব্ধ হইত, তাহাদ্বারা অতিকষ্টে সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতেন। জগন্নাথ বাল্যকালে অতি দুষ্ট ছিলেন। তিনি বাল্যকালে যেরূপ দুঃশীল ছিলেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তেমনি শান্তস্বভাব হইয়াছিলেন। ৮ম বর্ষ বয়সে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়; বৃদ্ধ পিতা অতি যত্নে তাহাকে লালন পালন করেন। মাতৃহীন শিশু সাধারণতঃ অত্যন্ত আদুরে হইয়া থাকে; জগন্নাথও তাহাই হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব পরিবর্ত্তন করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই এক অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পিতার নিকট বিদ্যারম্ভ করেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ অভিধানপ্রভৃতি প্রথম পাঠ্যপুস্তকগুলি সমাপ্ত করিয়া বাঁশবেড়িয়ানিবাসী জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। যখন তিনি স্মৃতিশাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশবর্ষ মাত্র! পাঠক দেখিবেন কি অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা লইয়া জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে তিনি বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ কামালপুরনিবাসী রঘুদেব বাচস্পতির টোলে গমন করেন। বাচস্পতি মহাশয় অতি সমাদরে ও যত্নের সহিত ইঁহাকে শিক্ষা দেন। ইনি অনতিবিলম্বে ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করেন। তিনি পূর্ব্বেই স্মৃতিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। দুইটি শাস্ত্রেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। চতুর্ব্বিংশবর্ষ বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। যাহা কিছু জিনিষ পত্র ঘরে ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কোনরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। এখন সংসারের ভার তাঁহার উপর পড়িল। অধ্যাপক তাঁহাকে "তর্কপঞ্চানন" উপাধি দান করিলেন। তিনি বাড়ীতে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে নানা দিগেদশ হইতে ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার টোলে আসিতে লাগিল। দেশের ধনী দরিদ্র; পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্স ও বড়লাট সার জন শোর মহাশয়গণের অনুরোধে তিনি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে তিনি বিবাদভঙ্গার্ণব নামক বিখ্যাত দায়-সংক্রান্ত বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই সমুদয় কার্য্যের জন্য, কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি মাসিক ৮০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে অধ্যাপনা কার্য্যে উৎসাহী করিবার জন্য সাতশত বিঘা ভূমি দান করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ তাঁহার পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং ত্রিবেণীতে একটি পুষ্করিণী দান করেন। তর্কপঞ্চাননের ব্যবস্থাবলে পুঁটিয়ার রাজা একটি মোকদ্দমায় জয় লাভ করেন এজন্য রাজা তাঁহাকে বহু অর্থ দান করেন। পিতার মৃত্যুর পর তর্কপঞ্চাননের দশবিঘা নিষ্কর ভূমি ও একখানা মাত্র খড়ের ঘর ছিল; কিন্তু মৃত্যুকালে পণ্ডিত তর্কপঞ্চানন অন্যূন একলক্ষ টাকা নগদ ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা আয়ের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া যান। তর্কপঞ্চানন মহাশয় উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব শ্যামাপূজাদি যথারীতি সম্পন্ন হইত। তাঁহার অতিথেয়তাও ছিল। বোধ হয় অতিথিসেবা স্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইত এজন্য একটি ঘটনায় তাঁহার একটু দুর্ণামও হইয়াছিল। গল্পটি এই:—একদিন একটি অতিথি মধ্যাহ্নে তর্কপঞ্চাননের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বাড়ীর ভিতর হইতে কিছু তণ্ডুল একটি কীটদষ্ট ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু ব্রাহ্মণ অতিথির নিকট প্রেরিত হয়। ব্রাহ্মণ চাউল চুল্লীতে উঠাইয়া এবং

বেগুণটি পোড়াইয়া খাইবার জন্য আগুণে দিয়া স্নানে গেলেন ও স্নান করিয়া আসিয়া বেগুনটিকে চুল্লী হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া উহা উঠাইতে পারিলেন না, বেগুনটি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বিরক্তির সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেওয়ালে লিখিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই তর্কপঞ্চাননের গৃহত্যাগ করিলেন।

"কীটাকুলিতবার্ত্তাকুরেকাখুবৃষণোপমা।
পঞ্চাননাদ্বিনিষ্ক্রান্তা ন নিষ্ক্রান্তা হুতাশনাৎ॥"

অর্থ—ইন্দুরের বৃষণতুল্য ক্ষুদ্র কীটদষ্ট বার্ত্তাকু যদি বা পঞ্চানন হইতে বাহির হইল, কিন্তু অগ্নি হইতে বাহির হইল না।

তর্কপঞ্চাননের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। একদা তিনি ত্রিবেণীর ঘাটে বসিয়া গঙ্গামৃত্তিকায় দেহ চর্চিত করিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। সেই সময়ে দুইজন গোরা (নিম্ন শ্রেণীর সাহেব) বজরা হইতে নামিয়া পরস্পর গালাগালি ও মারামারি করে। ঘটনাটি আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাদের কোন সাক্ষী আছে কি না। তাহারা বলিল যে, ঘটনার সময় মাত্র একটি লোক ঘাটে ছিল, সে গায়ে মাটি মাখিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কি করিতেছিল। বিচারপতি ত্রিবেণীতে লোক পাঠাইয়া বহু অনুসন্ধানে তর্কপঞ্চাননকে বাহির করিলেন এবং তাঁহাকে আদালতে যাইয়া সাক্ষ্য দিতে বলিলেন। তর্কপঞ্চানন ইংরেজী জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বলে গোরা দুইটি হাত মুখের ভঙ্গী করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি সেই সমুদয় শব্দ অবিকল উচ্চারণ করিয়া হাতমুখের ভঙ্গী দেখাইলেন। বিচারপতি তর্কপঞ্চাননের শক্তি দেখিয়া অবাক্। তিনি তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। তদনন্তর তাঁহার উপর সংস্কৃত ব্যবস্থা শাস্ত্রের অনুবাদ করিবার ভার অর্পিত হয়। জাতীয় ধর্ম্মে ও কর্ম্মকাণ্ডে তর্কপঞ্চাননের দৃঢ়বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আত্মশ্লাঘা বিবর্জ্জিত ও পূতচরিত্র ছিলেন। তর্কপঞ্চানন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭২৮ শকে (ইং ১৮০৬; বঙ্গাব্দ ১২১৪ সালে) ১১১ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন।

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীচৈতন্যের জনক। (চৈতন্য দেখ)।

জনার্দ্দন কর্ম্মকার—মুর্শিদাবাদের "জাহানকোষা" নামক সুবৃহৎ কামান এই বিখ্যাত কর্ম্মকারকর্ত্তৃক হিজরী ১০৪৭ সালে ১১ই জমায়দিয়সশানি মাসে (১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কামানটি ওজনে ২১২ মণ এবং ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত ও ব্যাস ৩ হাতের অধিক। ইহা দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য কালে জাহাঁগীরনগরে (ঢাকায়) ইশলাম খাঁর শাসনকালে দারোগা সের মহম্মদ এবং কর্ম্মচারী হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে উক্ত কর্ম্মকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নিবাস শ্রীহট্ট জিলায়; উক্ত জিলার পাঁচগাও নামক স্থানের কর্ম্মকারগণ এখনও "জনার বংশ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতার সন্নিহিত উত্তর পাড়ার বিখ্যাত জমিদার। ইনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ভারতের ১৪শ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যদলের মুৎসুদ্দি ছিলেন। ভরতপুরের দুর্গাবরোধকালে পিতা সৈন্যদলের সহিত ভরতপুর গিয়াছিলেন; পুত্র জয়কৃষ্ণও পিতার সহিত ভরতপুরে গিয়াছিলেন। এই দুর্গ ইংরেজের অধিকৃত হইলে পিতাপুত্রে যে অর্থ লাভ করেন তদ্দ্বারা তাঁহারা দেশে বহু আয়ের সম্পত্তি ক্রয় করেন। অল্পকালের মধ্যেই জয়কৃষ্ণ হুগলী জিলায় একজন বড় জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেন। ইনি ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইঁহার পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। রাজা প্যারীমোহন বঙ্গে শিক্ষিত জমিদারগণের অগ্রণী; ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, বি, এল, উপাধিধারী। রাজা প্যারীমোহন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে আসীন ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সি, এস, আই, ও রাজা উপাধি দান করিয়া ইঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছেন।

জয়গোবিন্দ সোম (এম, এ, বি, এল)—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল। তিনি শ্রীহট্টের উপকণ্ঠস্থ আখালিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রথম এম, এ,। অনন্তর বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টান হইলেও তাঁহাতে জাতীয়ভাব প্রবল ছিল। দেশীয় খ্রীষ্টানগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় পত্রিকা লিখেন। এই পত্রিকার নাম "আর্য্যদর্পণ"। তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্কছিল; দেশের সর্ব্ব প্রকার হিতকর কার্য্যে তিনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। বঙ্গদেশে ও আসামে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনার্থ যত প্রাচীন সম্মিলনী আছে, তন্মধ্যে "শ্রীহট্ট সম্মিলনী" অন্যতম। জয়গোবিন্দ এই সম্মিলনীর আমরণ সভাপতি ছিলেন। খ্রীষ্টান হইলেও হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। ১৮২২ শকে (ইং ১৯০০খ্রীঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

জয়চাঁদ—(জয়চন্দ্র) কনোজের শেষরাজা। ইঁহার পিতার নাম বিজয়চন্দ্র। ইনি দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের দৌহিত্র। আজমীররাজ সোমেশ্বর অনঙ্গপালের অপর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভে পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ উভয়েই দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের দৌহিত্র। অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজকেই অধিকতর স্নেহ করিতেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকাতে, দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকেই দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অনঙ্গপাল পরলোক গমন করেন। ইহাতে জয়চাঁদের হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল। তিনি পৃথ্বীরাজকে অপদস্থ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। জয়চাঁদ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি; তিনি বাহুবলে দক্ষিণে নর্ম্মদানদী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর উপলক্ষে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। নানাস্থানের নৃপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া এই যজ্ঞে আগমন করেন, কিন্তু দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও তদীয় ভগিনীপতি সমরসিংহ এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। জয়চাঁদ ইঁহাদিগকে অবমানিত করিবার জন্য, ইঁহাদের স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তিকে দৌবারিকবেশ পরিহিত করাইয়া, যজ্ঞাগারের দ্বারদেশে স্থাপন করেন। বিধাতার এমনি বিধান যে, এই জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তা দৌবারিকবেশপরিহিত পৃথ্বীরাজের সুবর্ণপ্রতিমায় গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ ইহা অবগত হইয়া সসৈন্যে কনোজ উপস্থিত হইলেন এবং যজ্ঞস্থল হইতে সংযুক্তাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়চাঁদ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করেন। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য গজনীর অধিপতি সাহেবুদ্দীন ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। সাহেবুদ্দীন ঘোরী ১১৯১ খৃঃ দিল্লী আক্রমণ করিতে ভারতে প্রবেশ করেন। পাণিপথের নিকটবর্ত্তী তিরৌরী ক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের সহিত ঘোরীর যুদ্ধ হইল; এবার ঘোরী পরাজিত হইলেন। দুই বৎসর পরে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ঘোরী পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেন। এবারও ঐ স্থানে যুদ্ধ হয়, কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্ট ভাঙ্গিল, তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। দিল্লী মুসলমানের হস্তগত হইল। জয়চাঁদ অচিরেই এই দেশদ্রোহিতার প্রতিফল পাইলেন। মুসলমানেরা কিয়ৎকালের পর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; পলায়নের সময় নদী পার হইতে যাইয়া নৌকাসহ জলমগ্ন হন ও অবলিগে প্রাণত্যাগ করেন। জয়চাঁদের দেশদ্রোহিতায় ভারতের ইতিহাসে যে কলঙ্ককালিমা পড়িয়াছে, তাহা আর অপনীত হইল না। জয়চাঁদের পৌত্র শিবাজী কনোজ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজপুতনায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য মারবারনামে খ্যাত। (ইতিহাস)

জয়দেব—গীতগোবিন্দনামক সুললিত সংস্কৃত গীতিকাব্যের প্রণেতা। এই গীতিকাব্যে কবি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সুমধুর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। গোবিন্দের প্রেমলীলা এই গীতিকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে; এজন্য এইকাব্য গীতগোবিন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতা রামাদেবী। বীরভূম জিলায় কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলি) গ্রাম এই বিখ্যাত কবির জন্মস্থান। ইনি কিছুকাল গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সভায় রাজকবি ছিলেন; তৎপর তিনি উৎকল রাজের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ জয়দেবকে ইহার বহুপরবর্ত্তিকালের লোক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে জয়দেব খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগের বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক।

ভক্তমালগ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি অল্প বয়সেই বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। একদা নিঃসন্তান এক ব্রাহ্মণ, জগন্নাথ দেবের আরাধনার ফলে পদ্মাবতী নামে এক কন্যা লাভ করেন। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে, ব্রাহ্মণ তাহাকে জগন্নাথ দেবের চরণে উৎসর্গ করিতে আনয়ন করিলেন। জগন্নাথ দেব এই কন্যাকে তাঁহার পরমভক্ত জয়দেবের হস্তে অর্পণ করিতে ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে আদেশ করেন। ভগবান্ জগন্নাথের আদেশে কন্যাসহ ব্রাহ্মণ জয়দেবের সমীপে উপস্থিত হন, কিন্তু সংসারত্যাগী জয়দেব আর দারপরিগ্রহ করিতে চাহিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণের কথা বিশ্বাস না করাতে, ব্রাহ্মণ কন্যাটীকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কন্যাকে বলিলেন "তোমার বাপ গিয়াছেন, তুমিও যাও; অথবা বল তোমাকে কোথায় রাখিয়া আসিব ?" কন্যা জয়দেবকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অন্যত্র যাইতে চাহিলেন না। অগত্যা জয়দেব পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলেন। তিনি সংসারী হইলেন এবং স্বগৃহে রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। জয়দেব সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া তাঁহার বিখ্যাত গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন। গীতগোবিন্দের এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মানভঞ্জনের জন্য তাঁহার পা ধরিতে যাইতেছেন এরূপ বর্ণনা আছে। এই বিষয়টী লিখিবার সময় জয়দেবের কলম চলিতেছিল না; তাঁহার আরাধ্যদেবতা অপরের পাদস্পর্শ করিবেন ইহা তিনি কিছুতেই লিখিতে চাহিলেন না। বেলা অধিক হইলে তিনি কলম রাখিয়া স্নানার্থ নদীর ঘাটে গেলেন; ইত্যবসরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া অসম্পূর্ণ চরণটী পূর্ণ করিয়া লিখিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্।" পদ্মাবতী জয়দেবকে এত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; পাছে ইহা ভুলিয়া যাই, এজন্য লিখিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।" শ্রীকৃষ্ণের গমনের অল্প পরেই জয়দেব স্নান সমাপন করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর পদ্মাবতীর মুখে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া জয়দেব স্বীয় গ্রন্থের পত্র উদ্ঘাটন করিলেন; দেখেন, তাহাতে চরণার্দ্ধপূর্ণ করিয়া লিখা হইয়াছে' "দেহি পদপল্লবমুদারম্।" জয়দেব ভক্তিগদ্গদভাবে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন; তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। তিনি পদ্মাবতীকে বলিলেন, "তোমারই জীবন সার্থক, তুমি পরমসৌভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি স্বচক্ষে প্রভুর দর্শন পাইলে।" আর একদিন জয়দেব রৌদ্রে বসিয়া স্বীয় কুটীরের চাল ছাইতে ছিলেন; ভক্তবৎসলের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তিনি নিম্নদিক হইতে বেত বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। জয়দেব মনে করিলেন, যে পদ্মাবতী তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিবার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু চাল হইতে অবতরণ করিয়া দেখেন, নিম্নে কেহই নাই। তাঁহার দৃষ্টি রাধামাধবের মূর্ত্তির দিকে আকৃষ্ট হইল; তিনি দেখিলেন ঐ দেবমূর্ত্তির হস্তে ঘরের ঝুল ও ময়লা লাগিয়া আছে। জয়দেব ইহা দেখিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীহরির নিকট নানাপ্রকার বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর এক দিবস শ্রীহরি জয়দেবরূপ ধারণ করিয়া পদ্মাবতীর হস্তের অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়াছিলেন। জয়দেব জীবনের শেষভাগে জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলি) গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং এখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এখানে তাঁহার স্মরণার্থ প্রতিবৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে এক মেলা হইয়া থাকে; এই মেলায় বহুলোকের সমাগম হয়। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কেন্দুলি গ্রাম হইতে ১৮ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। একদিন ঘটনাক্রমে গঙ্গায় যাইতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন। গঙ্গাদেবী ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া স্বয়ংই কল কল নাদে কেন্দুলি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। জয়দেবপ্রণীত গীত-গোবিন্দ বহুভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত তাহার বহুসংস্করণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার

"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥

ইত্যাদি শ্লোক কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুদাদিপুর গ্রামে ১৭২৬ শকে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দ ; বঙ্গাব্দ ১২১১ সন) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। জয়নারায়ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের মধ্যেই পিতৃসন্নিধানে ব্যাকরণ, অমরকোষ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঐ সমুদয় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৩০ খৃঃ তাঁহার অধ্যাপক খ্যাতনামা পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তিনি শালিখায় টোল স্থাপন করেন। অধ্যাপনায় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে, নানাস্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আগমন করিতে লাগিলেন। একদা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক নিমচাদ শিরোমণির সহিত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বিচার হয় ; বিচারে শিরোমণি মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়কেই স্বীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নিমচাদ শিরোমণি মহাশয় পেন্সন গ্রহণ করিলে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জয়নারায়ণ তাঁহার স্থলে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেন। সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়াও তিনি চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করেন নাই। কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রধান এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রধান। ২৯ বৎসর কাজ করিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পেন্সন গ্রহণপূর্ব্বক কাশীতে বাস করেন। এখানে দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি নানাবিধ সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। তিনি ৬৯ বর্ষ বয়ঃক্রমে ১২৮০ সালে (ইং ১৮৭৩ খৃঃ) কাশীধামে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি সংস্কৃত ষড়দর্শন বঙ্গভাষায় সঙ্কলন করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

জয়পাল—(১) লাহোরের বিখ্যাত হিন্দু রাজা। ইঁহার পুত্রের নাম অনঙ্গপাল। ইনি ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি সবক্তগিনকর্ত্তৃক পরাজিত হন। সবক্তগিন পেশওয়ার অধিকার করিয়া ৫০ টী হস্তী ও ১০ লক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর ১০০১ খৃষ্টাব্দে তদীয়পুত্র মামুদ জয়পালের রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করেন ; জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন, কিন্তু বার্ষিক কর দিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে মুক্তি লাভ করেন। দুইবার শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি পুত্র অনঙ্গপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন এবং অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন।

(২) অনঙ্গপালের পুত্র এবং প্রথম জয়পালের পৌত্র। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতার মৃত্যুর পর লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০২২ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মামুদ ইহাকে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। ইহাই ভারতবর্ষে ভাবী মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

জয়মল—(১) বিখ্যাত রাজপুত বীর। ইনি বেদনোরের রাজা। বেদনৌর মিবারের একঁ প্রধান সামন্ত রাজ্য। রাণা সঙ্গের পুত্র কাপুরুষ উদয়সিংহ আকবরের ভয়ে চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলে, জয়মল ও বীরবর পুত্ত আকবরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বহু যুদ্ধে ইহারা মোগল সৈন্যের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন, কিন্তু অবশেষে অসংখ্য মোগল সৈন্যের সহিত আর আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে জয়মল দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। আকবর অতি ঘৃণিত উপায়ে ইহাদের প্রাণ বধ করিলেও তিনি এই বীরদ্বয়ের শৌর্য্য প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং সম্মানার্থ তাঁহাদের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীতে নিজ প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) ভক্তমাল গ্রন্থে এক জয়মলের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইনি অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি প্রত্যহ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ্ণু বিগ্রহ পূজা করিতেন। এক দিন কোন রাজা, জয়মল বিষ্ণুপূজায় আসীন হইলে, সুযোগ পাইয় তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়মল উপস্থিত বিপদেও বিগ্রহের পূজা পরিত্যাগ করিলেন না। স্বয়ং বিষ্ণু মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক যোদ্ধৃবেশে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া শত্রু পক্ষের সমুদয় সৈন্য ধ্বংস করেন ; আক্রমণকারী রাজা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন জয়মল পূজা সমাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। যে অলৌকিক উপায়ে

তাঁহার সমুদয় সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রতিপক্ষ রাজা সবিস্তরে জয়মলের নিকট বর্ণন করেন এবং জয়মলের কথা শুনিয়া আক্রমণকারী রাজাও বিষ্ণুভক্ত হইয়া পড়েন।

জয়মতী কুঁরুকী—স্বর্গদেব গদাধর সিংহের (গদাপাণির) পত্নী। (গদাধরসিংহ দেখ)। তাঁহার পুত্র রুদ্র সিংহ। মাতার নির্য্যাতন ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া ১২০ বিঘা জমিতে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই দীঘির নাম "জয়সাগর"। এতদপেক্ষা বৃহৎ দীঘি এতদ্দেশে দৃষ্ট হয় না।

জয়ানন্দ—বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা। ইঁহার রচনায় সাম্প্রদায়িকতা থাকিলেও ইহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। জয়ানন্দ ১৫১২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলায় আমাইনপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অভিরাম গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র।

জানকীরাম (রাজা)—ইনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহার পুত্র রায়দুর্ল্লভ। সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য যে সমুদয় লোক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, মহারাজ রায়দুর্ল্লভ তাঁহাদের অন্যতম। রায়দুর্ল্লভ উড়িষ্যার সুবাদার হইয়াছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধের পর বাঙ্গলার সিংহাসন আলীবর্দ্দীর হস্তগত হইলে জানকীরাম তাঁহার সমর সচিবের পদ প্রাপ্তহন এবং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে জানকীরামের মৃত্যুর পর রায়দুর্ল্লভ উক্ত পদ লাভ করেন। (ইতিহাস)

জাফর আলী খাঁ—ইনি জনসাধারণের নিকট মীরজাফর নামে পরিচিত। ইনি নবাব আলীবর্দ্দির বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর পরামর্শে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হন। এই কুলাঙ্গারের কৃত কার্য্যের বিবরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়াছে। সিরাজের মৃত্যুর পর ইনি বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু বিলাসিতা ও অকর্ম্মণ্যতা হেতু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ ইঁহাকে পদচ্যুত করেন। ইঁহার জামাতা মীর কাসেম আলী খাঁ (মীর কাসেম) ইঁহার পদচ্যুতির পর বাঙ্গালার নবাব হন। (জগৎশেঠ দেখ)।

জাহাঁগীর—ভারতের বিখ্যাত মোগল সম্রাট্। ইনি ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর সম্রাট আকবরের মহিষী জয়পুর রাজকন্যা ম্যারিয়ম্ জমানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম সলিম। আকবরের মৃত্যুর পর সলিম "জাহাঙ্গীর" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। সলিমের চক্রান্তে আকবরের প্রিয় সুহৃদ্ ও মন্ত্রী আবুলফজল হত হন। প্রিয় সুহৃদের মৃত্যুতে আকবর দুইদিন দুইরাত্রি অনাহারে ছিলেন। (আকবর ও আবুলফজল দেখ)। সলিম ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে অম্বরপতি ভগবান দাসের কন্যা ও রাজা মানসিংহের ভগিনী যোধবাইকে বিবাহ করেন। যোধবাইর গর্ভে খসরু জন্মগ্রহণ করেন। খসরুর সহিত জাহাঁগীরের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। মনোবাদ এত তীব্র হইয়া উঠে যে, খসরু সম্রাটের বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। যোধবাই পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া অপরিমিত অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করেন। সলিম মিবারের মহারাণা বিখ্যাত প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; হলদীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের হস্তে তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছিল। (প্রতাপ সিংহ দেখ)। জাহাঁগীরের চরিত্র দূষিত ছিল এবং তাঁহার দুর্ব্বৃত্ততার জন্য আকবর শেষকালে কষ্ট পাইয়াছিলেন আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই অক্টোবর ৩৮ বর্ষ বয়সে জাহাগীর আগ্রাদুর্গে সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। সম্রাট জাহাঁগীর শুল্ক আদায়ের রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া সুপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তমঘা ও মীরবাড়ী নামক করদ্বয় রহিত করেন; দস্যু তস্করের ভয় নিবারণের জন্য ও পথিকদিগের সুবিধার জন্য রাজপথের স্থানে স্থানে সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে মাদক দ্রব্যের বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি অপরাধীদিগের নাসাকর্ণচ্ছেদন প্রথা রহিত করেন। তিনি প্রধান প্রধান নগরে চিকিৎসালয়স্থাপন করেন। তাঁহার অভিষেক দিবসে (প্রতি বৃহস্পতিবার) ও তাঁহার পিতার জন্মদিনে (প্রতি রবিবার) পশুহত্যা নিবারিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতার কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশকেই তিনি স্বস্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে জাহাঁগীর মীর্জা গয়াসবেগের অপূর্ব্বরূপ লাবণ্যবতী কন্যা মেহেরুন্নিসাকে

(নূরমহাল বা নূরজাহান) বিবাহ করেন। এই রমণীকে বিবাহ করিবার জন্য সলিম সাম্রাজ্যলাভের পূর্ব্বেই চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু পিতার প্রতিকূলতায় তাহা পারিয়া উঠেন নাই। সম্রাট আকবরের আদেশে মেহেরুন্নিসা অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হন। সলিম সাম্রাজ্য হস্তে পাইয়াই এক দল সেনা প্রেরণ করিয়া ইঁহার পতির হত্যাসাধন করেন এবং ইঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক বিবাহ করেন। জাহাঁগীর মেহেরুন্নিসার নাম নূরজাহান ও নূরমহাল রাখিয়াছিলেন। নূরজাহান জাহাঁগীরের উপর প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন করিতেন।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ২২ বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া ৫৯ বৎসর বয়সে হাঁপানি কাশে জাহাঁগীর প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সাম্রাজ্যকালে সার টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বরের দূতরূপে তাঁহার দরবারে আগমন করেন। (টমাস্ রো দেখ)। সম্রাট জাহাঁগীর ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাট, আহাম্মদাবাদ ও কাম্বে নগরে কুঠী স্থাপন করিতে অনুমতি দেন, (১৬১২ খৃঃ)।

জাহান-আরা-বেগম—দিল্লীর সম্রাট শাহ জাহানের কন্যা। ইনি বিখ্যাত বেগম মমতাজ মহলের গর্ভে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নানাগুণ বিভূষিতা অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার ভগিনী রোশন-আরা-বেগম যেমন দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন, ইনি তেমনি তাহার ঠিক বিপরীত স্বভাবা ছিলেন। রোশন-আরা স্বীয় বৃদ্ধ পিতাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ভ্রাতা আওরঙ্গজেবকে পরামর্শ দেন, কিন্তু জাহান-আরা স্বীয় স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ কারারুদ্ধ পিতার সহিত আগ্রায় বাস করিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমন করেন। তিনি অতি পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতা যাহাতে কারাগারে ক্লেশ না পান, তজ্জন্য তাঁহার শুশ্রূষা করিতে জাহান-আরা স্বেচ্ছায় পিতার সহিত কারাগারে গিয়াছিলেন। সম্রাট শাহ্জাহান যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তখন একদিন জাহান-আরার বস্ত্রে আগুন ধরে; তিনি লজ্জায় কাহাকেও ডাক দেন নাই; পাছে লোকজন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিবস্ত্রা দেখে ও তাঁহার গায়ে হাত দেয় এজন্য তিনি চীৎকার করেন নাই। তাঁহার শরীর অগ্নিদগ্ধ হইল; সুরাট হইতে ইংরেজ চিকিৎসক ডাক্তার বৌটনকে (Gabrial Boughton) আনা হইল। তাঁহার চিকিৎসায় জাহান-আরার জীবন রক্ষা হইল। কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্যের অনেকটা হানি হইল। এই চিকিৎসা কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ডাক্তারের প্রার্থনায় সম্রাট শাহ্জাহান ইংরেজদিগকে আপন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। জাহান-আরা চিরকুমারী ছিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

জীবগোস্বামী—বিখ্যাত ভক্ত বৈষ্ণব রূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ভাগবত সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি রূপ ও সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের রচিত গ্রন্থ সকলের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

জীমূত বাহন—বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।

জেব্ উন্নিসা—সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা। ইনি ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পারস্য ও আরবী ভাষা সুন্দররূপে জানিতেন এবং ইঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। এই মহিলা সমগ্র কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং কোরাণের একখানা টীকাও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। এই অবিবাহিত অবস্থায় ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জেমসেট্জি জিজিভাই (সার)—বিখ্যাত পার্সী সদাগর। ইনি বরদা রাজ্যে নভশ্রী নামক স্থানে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই ইহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। ইনি বোম্বাই সহরে থাকিয়া শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হন। কিছুদিন শ্বশুরের কারবারে শিক্ষানবিশী করিয়া তিনি এই কারবারে প্রবেশ করেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশীয়দের সহিত কারবার না করিলে ধনবৃদ্ধি হয় না, এজন্য তিনি

১৬শ বর্ষ বয়সে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ১২০৲ টাকা মাত্র সঙ্গে লইয়া চীনে চলিলেন। কিছু দিন চীনে থাকিয়া আবার বোম্বাই নগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্বশুরের জাবিনীতে ৩৫০০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া ব্যবসা করিতে চীনে চলিলেন। জাহাজে যাতায়াতে তিনি অনেক সময় বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত সম্পত্তি করিয়া ফেলিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, ২৮ বৎসর কারবার করিয়া তিনি দুই কোটি টাকা সঞ্চয় করিলেন। তিনি দানশীলতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদারতার জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন। তিনি এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম এই সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটী সুবর্ণ পদক প্রদান করেন তিনি এদেশীয় জনসাধারণের হিতের জন্য ১৫ লক্ষ টাকারও অধিক দান করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে জলপ্লাবনের সময় তিনি পাঁচশত পাউণ্ড দান করেন। এই বৎসরে বোম্বাই লাট লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এক সভা আহ্বান করিয়া জিজিভাইর প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। ৪০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০০০০৲ টাকা ব্যয়ে তাঁহার এক প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি বোম্বাই টাউনহলে রাখা হইয়াছে। তাঁহার পত্নীরও বদান্যতা কম ছিল না। বোম্বাই একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ; এই সহরে যাইতে হইলে পূর্ব্বে নৌকায় একটী অপ্রশস্ত প্রণালী পার হইতে হইত। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২০ খানি নৌকা এই প্রণালী পার হইতে যাইয়া ঝড়ে জলমগ্ন হয়। এই সংবাদ শুনিয়া জিজিভাইর পত্নী ঐ প্রণালীর উপর এক পুল নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত হন। এই পুল নির্ম্মাণ করিতে ৬৭০০০ হাজার টাকা আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ এই টাকা দিয়া ফেলেন। কিন্তু ঐ পুল প্রস্তুত করিতে এক লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় পড়ে; তিনি বাকী টাকাও আহ্লাদের সহিত দিয়া ফেলেন। তিনি পার্সী জাতীয় বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহাকে "বেরনেট" উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। এতদপেক্ষা উচ্চতর উপাধি আর এদেশীয়দিগকে দেওয়া হয় নাই। (১৮৫৯ খৃঃ) ৭৬ বৎসর বয়সে জেমসেটজি জিজিভাই দেহত্যাগ করেন।

জ্ঞানদাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ও পদকর্ত্তা। ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার অনুকরণে বহু সুমিষ্ট পদাবলী রচনা করেন। চণ্ডীদাস নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন। কাহারও মতে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য। তিনি ভক্তকবি বৃন্দাবন দাসের সমকালীন লোক ছিলেন। বীরভূম জিলায় কাঁদড়া নামক গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। জ্ঞানদাস সংসারে অনাসক্ত ছিলেন এবং অবিবাহিত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানদেব—দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত সাধু। ইঁহার পিতার নাম বিটলপন্থ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিবৃত্তি, কনিষ্ঠভ্রাতার নাম সোপান ও কনিষ্ঠাভগিনীর নাম মুক্তাবাই। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদেব জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানদেবের পিতা বিটলপন্থ যৌবনকালেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু পত্নীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এজন্য তাঁহাকে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন লৌকিক প্রথাবিরুদ্ধ হওয়াতে স্বগ্রামবাসীরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করে। নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব ও সোপান সকলেই যোগশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবই ধর্ম্মজগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমাজচ্যুতিদোষ কিছুতেই অপনীত হইল না, এজন্য নিবৃত্তির উপনয়নে বিলম্ব হইতে লাগিল। বিটল স্বীয় আবাসগ্রাম ত্যাগ করিয়া মাতুল কৃষ্ণাজীপন্থের বাটীতে গমন করিলেন এবং তথায় সমাজে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলও বিপরীত হইল। পৈঠা নিবাসী কৃষ্ণাজীপন্থ সমাজচ্যুত বিটল ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি স্বয়ংই সমাজচ্যুত হইলেন। ইহার পর কৃষ্ণাজী পন্থের পিতার শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। কৃষ্ণাজী শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাড়ীতে আসিবেন না, তখন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানদেব কৃষ্ণাজী পন্থকে বলিলেন,

যে তিনি স্বয়ংই পৌরোহিত্য করিবেন। জ্ঞানদেবের পরামর্শে কৃষ্ণাজী পাচ জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন, কিন্তু কেহই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জ্ঞানদেব যোগবলে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরলোকগত পিতৃগণকে আহ্বান করিয়া আহার করাইলেন। এ সংবাদ সকলের গোচর হইলে, সকলে জ্ঞানদেবের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। ইহার পর ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধিপত্র দিয়া তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানদেব পার্ব্বতী বাই নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর মনোবেদনার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার পরস্ত্রীপরায়ণ পতিকে নানা উপদেশ দিয়া দুষ্ক্রিয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। প্রত্যহ বহুশত লোক তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিতে যাইত। অতঃপর তিনি ভ্রাতৃদ্বয় ও ভগিনী মুক্তাবাইকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। নানাতীর্থ ভ্রমণে তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর জ্ঞানদেব সমাধিগ্রহণে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় নানাদিগ্দেশ হইতে সাধু সন্ন্যাসিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি এক বৃক্ষমূলে সমাধিস্থ হইতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে এক গুহা প্রস্তুত হইল। আত্মীয় স্বজন ও উপস্থিত সাধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

টি

টিপু সুলতান—মহীসুরের বিখ্যাত সুলতান হায়দর আলীর পুত্র। হায়দর আলীর মৃত্যুর পর টিপু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর মহীসুরের সুলতানপদে অভিষিক্ত হন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হায়দর আলীর সহিত ইংরেজদের বহুকাল যুদ্ধ হয়; ইংরেজগণ হায়দর আলীর যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ১৭৮২ খৃঃ হায়দর আলীর মৃত্যু হইলে ইংরেজেরা মহীসুর আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু টিপুর যুদ্ধ কৌশলে তাঁহাদিগকে সে সঙ্কল্প কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হয়। ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথু ৫ মাস কাল বেদনোর নামক স্থানে টিপুর সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন, অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। টিপু বেদনোর হইতে মঙ্গলোরে যাইয়া ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ ইংরেজগণ টিপুর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধিতে নির্দ্ধারিত হইল যে, পরস্পরের মধ্যে আর বিবাদ থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে উভয়ে আর যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না। এই সন্ধির পর ১৮০ জন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী ৯০০ ইংরেজ সৈন্য, ১৬০০ দেশীয় সৈন্য মুক্তিলাভ করিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর টিপু ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। ইংরেজেরা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করাতে ইংরেজদিগের সহিত টিপুর পুনর্ব্বার বিরোধ উপস্থিত হয়। মান্দ্রাজের ইংরেজ সেনাপতি মেডোজ ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া টিপুর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরেজের সহিত যোগদিল। হায়দরাবাদের নিজামও ইংরেজদিগকে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে লাগিলেন। স্বয়ং বড় লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ যুদ্ধের নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। টিপু চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টমের অনতিদূরে আরিকেরা নামক স্থানে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল টিপুর সহিত সমবেত ইংরেজ মহারাষ্ট্র ও নিজাম সৈন্যের ঘোর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল সন্ধি স্থির হইল। এই সন্ধিতে টিপু রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। টিপুর অর্দ্ধরাজ্য ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে বিভক্ত হইল। ইহারপর ৪।৫ বৎসর একপ্রকার শান্তিতে কাটিয়া গেল। টিপু এই সময়ে রাজ্যের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে টিপু ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এই সময়ে ইয়োরোপে ইংরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। ভারতবর্ষীয় ফরাসীগণ টিপুকে বহুসহস্র সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তদানীন্তন বড় লাটের কনিষ্ঠ সহোদর আর্থার ওয়েলেসলি

(ভাবী ডিউক অব ওয়েলিংটন) ৩১ হাজার সৈন্য লইয়া টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৬ই এপ্রিল সদাশিব নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে টিপুর দুই হাজার সৈন্য হত হয়। ইংরেজেরা অগ্রসর হইয়া টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টম আক্রমণ করেন। ভয়াবহ যুদ্ধের পর রাজধানী অধিকৃত হইল; টিপুর মৃতদেহ সৈনিকগণের শবস্তূপে পাওয়া গেল। এইযুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হত হইয়াছিল। ইংরেজেরা ভারতে পদার্পণ করিয়া এরূপ ভয়ানক যুদ্ধ আর করেন নাই।

টোডরমল (রাজা)—সম্রাট আকবরের বিখ্যাত রাজস্ব সচিব। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়; পঞ্জাবের লাহোর নগরে ইঁহার জন্ম। ইনি যুদ্ধকার্য্যে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ইনি আকবরের সেনানীগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি গীতবাদ্যে দক্ষ ও কবিতারচনায়ও নিপুণ ছিলেন; গণিতে ইঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও ইঁহার অসাধিক অধিকার ছিল। তিনি জনসাধারণের নিকট রাজস্বসচিব বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, বীরত্বে ও তাঁহার যশঃসৌরভ কম বিকীর্ণ হয় নাই। টোডরমলের পূর্ব্বে সাম্রাজ্যের যাবতীয় হিসাব হিন্দীতে লিখা হইত, টোডরমল নিয়ম করেন যে, অতঃপর পারস্যভাষায় সাম্রাজ্যের হিসাব পত্র রাখিতে হইবে। ২৭শ বর্ষ বয়সে তিনি এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের দেওয়ান পদে আসীন ছিলেন। তিনি কর সংগ্রহের যে নূতন নিয়ম করেন, তাহাতে তাঁহার যশঃ সাম্রাজ্যমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। আকবরের সাম্রাজ্যমধ্যে টোডরমলের ন্যায় হিসাবপরীক্ষক আর দ্বিতীয় ছিলনা। তিনি সামান্য মুহুরীর পদ হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে রাজস্ব সচিবের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।



ঠাকুর বাণী—শ্রীহট্টের দিনারপুর নামক স্থানে ইঁহার জন্ম। জন্মাবধি ইঁহার বিষয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। ইনি একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া সমাজে গণ্য হইয়াছিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব সমাজের বহু ব্যক্তি ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার বংশীয়েরা "বাণীর বংশ" নামে শ্রীহট্টের সর্ব্বত্র সম্মানিত।



তাতা—(জেমসেটজি নসেরওয়ানজি)। এই বিখ্যাত উদারচেতা পার্সী বণিকের পূর্ণ নাম "জেমসেটজি নসেরওয়ানজি তাতা।" ইনি ভারতের এক খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও ধনকুবের ছিলেন। ধনী বলিয়া ইনি যত খ্যাতি উপার্জ্জন না করিয়াছিলেন, উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ দিয়া, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ব্বক এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইনি ততোধিক খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। ৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বাইর এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে ৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপন-পূর্ব্বক পিতার সওদাগরি আফিসে প্রবেশ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি "তাতা এণ্ড কোম্পানি" নামে এক সওদাগরি আফিস স্থাপন করেন। চীন, জাপান এবং আমেরিকার কোন কোন স্থানে এই কোম্পানির শাখা বর্ত্তমান আছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার স্থাপিত কোম্পানি বোম্বাইর কারবারে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে যখন আবিসিনিয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তিনি কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য গ্রহণ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। এখন হইতে তিনি আবার সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পান। তিনি ভারতের নানাস্থানে কল স্থাপন করিতে লাগিলেন:—কোথাও বা তৈলের কল, কোথাও সূতার কল, কোথাও বা কাপড়ের কল ইত্যাদি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নাগপুরে "এম্প্রেসমিল" নামে একটী কাপড়ের কল স্থাপন করেন। তাঁহার জীবন কর্ম্মময়। তিনি শিক্ষিত লোকদিগকে নিজের ব্যবসারে

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। ফলে যে সকল মজুর খাটে তাহাদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া ছিল। দীর্ঘকাল কাজ করিলে তিনি ইহাদের বেতন কিছু কিছু বাড়াইয়া দিতেন এবং বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ কর্ম্মচারীদিগকে পেন্সন দিতেন। তাঁহার কলগুলিতে এখন ২৫০০ তাঁতের কাজ চলিতেছে। মহীসুরে যে উন্নত প্রকারের রেশমের চাষ চলিতেছে তিনিই তাহার প্রবর্ত্তক। যাহাতে দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডে গিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি এক ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। এই টাকা হইতে "তাতার বিশ্ববিদ্যালয়" (Tata's University) নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় মহীসুরে স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের নাম হইবে "বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার" (Research Institute)।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, উদারচেতা তাতা তাঁহার সাধের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হইতে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। যখন এই বিদ্যালয় সংস্থাপন সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি চলিতেছিল, তখন নির্ম্মম কাল তাঁহাকে এই পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়াছে। তাতা এই শিল্পবিজ্ঞান গবেষণালয়ে বার্ষিক সওয়ালক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়াছেন। মহীসুর গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৭৭৫০০৲ টাকা গ্রাণ্ট্‌ইন্‌-এইড্‌ দিতে সম্মত হইয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, এই গবেষণালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য বার্ষিক দুইলক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা আয় নির্দ্ধারিত করা হইল। যদি তাতার প্রদত্ত সম্পত্তিতে কোন বৎসরে কোন কারণে বার্ষিক সওয়ালক্ষ টাকার কম আদায় হয়, তাঁহার পুত্রগণ এই ক্ষতি-পূরণের জন্য বার্ষিক আট হাজার টাকা আয়ের একটী "সিকিউরিটী ফণ্ড" (Security fund) করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। গবেষণালয়ের বাড়ী ও সাজসরঞ্জামের জন্য মহীসুর গবর্ণমেণ্ট পাঁচলক্ষ টাকা এবং ভারতগবর্ণমেণ্ট আড়াইলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা (ম্যানেজিং কমিটী) স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞ লোক মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতের বড়লাট বাহাদুর ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ব্যতীত ইহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটী সাধারণ সভাও গঠিত হইয়াছে; ইহাতে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ মেম্বর আছেন :—

(১) ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একজন প্রতিনিধি।

(২) যে সমুদয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটের সাহায্য করেন তাঁহাদের এক এক জন করিয়া প্রতিনিধি।

(২) কৌন্সিলের মেম্বরদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত বিজ্ঞানাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রতিনিধি।

(৪) যাঁহারা বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এই ইনৃষ্টিটিউটের সাহায্যকল্পে দান করিবেন তাঁহাদের এক এক জন প্রতিনিধি।

বিলাতের রাজকীয় পণ্ডিতসভা (Royal Society) এই বিদ্যালয়ের জন্য অধ্যাপক নিয়োগ ও পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাতা বোম্বাই বন্দরের উপর এক বিচিত্র কারুকার্য্যসমন্বিত বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পান্থনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। তাতা উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। যাহাতে এদেশীয় যুবকগণ বিলাতে যাইয়া পাঠ সমাপন করিতে পারেন, তদর্থে তিনি এক ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে ইয়োরোপের অন্তর্গত জর্ম্মনির এক স্বাস্থ্যনিবাসে এই কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হয়। তাতা যে স্বার্থত্যাগ, সদাশয়তা ও জনহিতৈষণার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা বর্ত্তমান ভারতে অতুলনীয়।

সংপ্রতি তাঁহার দুই যোগ্য পুত্র লৌহ ও ইস্পাতের এক যৌথকারবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এই কোম্পানির নাম "দি তাতা আইরন এণ্ড ষ্টিল কোম্পানি লিমিটেড" (The Tata Iron and Steel Company limited)। এই কোম্পানি

লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভারতের নানা স্থানে বিক্রয় করিবেন। এই কোম্পানির পরিচালকগণ (Directors) সকলেই ভারতবর্ষীয়।

তাঁতিয়া টোপী—সিপাহী যুদ্ধের বিখ্যাত নায়ক, নানা সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। ইনিও নানা সাহেবের ন্যায় সিপাহী বিদ্রোহে বিখ্যাত হইয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ইঁহার বীরত্বকাহিনীতে পূর্ণ। ইংরেজ সেনাপতি মেজর মিডের হস্তে বন্দীভূত হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তাঁতিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তাঁতিয়া ভিল—বিখ্যাত ভিল দস্যু। ইহার পিতার নাম ভাও সিংহ। এই দস্যু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিরদা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। তাঁতিয়া দস্যুবৃত্তিতে যে অর্থলাভ করিত তাহার সমুদয়ই দরিদ্রদিগকে দান করিত। শুনা যায়, যে তাঁতিয়া কখনও ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক বা বালকের উপর অত্যাচার করে নাই। সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বনের পূর্ব্বে তিন চারি বার জেল খাটিয়াছে, দুইবার জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে এবং একবার হাজত ঘরের ভিত্তিতে সিঁদ কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ বহুচেষ্টা করিয়াও তাঁতিয়াকে ধরিতে পারে নাই, অবশেষে এক ব্যক্তির কৌশলে পুলিশকর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

তান সেন—বিখ্যাত সম্রাট আকবরের সভার হিন্দীগায়ক। ইনি প্রথমে রাজা রামচাঁদের সভায় গায়ক ছিলেন, পরে সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে রাজা ইঁহাকে তাঁহার সভায় প্রেরণ করেন। আকবরের সাম্রাজ্যের ৩৪শ বৎসরে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—বিখ্যাত শব্দশাস্ত্রার্থদর্শী ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের পণ্ডিত। ইঁহার প্রণীত বাচস্পত্যাভিধান সংস্কৃত সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থ সঙ্কলনে বার বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং ইহার মুদ্রাঙ্কনের জন্য ৮০০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। এই বিখ্যাত পণ্ডিত বর্দ্ধমান জেলার কালনা গ্রামে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস ভট্টাচার্য্য। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বাচস্পতি উপাধি লাভ করেন। ইনি উপাধি লাভের পর স্বগ্রামে টোল করিয়া অধ্যাপনা করিতে ছিলেন, কিয়ৎকাল পরে বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এইপদে তাঁহার ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হইয়াছিল। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনয়ন করিয়া বিক্রয় করিতেন; ইহাতে তাঁহার প্রথম প্রথম বিশেষ লাভ হইয়াছিল কিন্তু সংস্কৃত কলেজের কার্য্য গ্রহণের পর আর ব্যবসায়ে তেমন মনোযোগ দিতে না পারায় তাঁহার বহু অর্থ ক্ষতি হয়। তিনি ঋণ পরিশোধের জন্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। "বাচস্পত্য" অভিধান ব্যতীত তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ধাতুরূপাদর্শ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "শব্দস্তোম মহানিধি" নামে একখানি সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী ৫২৬ পৃষ্ঠা সমন্বিত অভিধান প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মুদ্রারাক্ষস নাটক ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী ব্যাকরণের টীকা রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থগুলিতে জনসাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। তিনি বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন (৭ই আষাঢ়) বারাণসী ধামে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগরও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

তারাবাই (১)—রাজ পুতনার আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশস্থ বেদনুরের বিখ্যাত বীরবালা। ইনি সোলাঙ্কী-রাজ রাও সুরতানের কন্যা। ইনি পৃথ্বীরাজের পত্নী। তারাবাইর পিতা সুরতানের পূর্ব্ব পুরুষগণ তোঙ্ক থোড়ায় রাজত্ব করিতেন। লয়লা নামক আফগান এই থোড়া অধিকার করেন। সুরতান পলায়ন করিয়া আরাবল্লীর পাদদেশে বেদনুরে বাস করিতে লাগিলেন। তারাবাই তখন যুবতী; তিনি সর্ব্বদাই যুদ্ধসাজে থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি থোড়া আফগানদের নিকট হইতে উদ্ধার করিবে তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ

করিবেন। মিবারের রাণা রায়মল্লের পুত্র পৃথ্বীরাজকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন। পতি পত্নীতে মিলিত হইয়া রাজপুত সৈন্ত সহ হঠাৎ থোড়া আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন। ভগিনীপতি প্রভুরাও এর বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথ্বীরাজ প্রাণত্যাগ করিলে, তারাবাই পতির সহিত সহমৃতা হন।

(২) বিখ্যাত শিবাজীর পুত্রবধূ এবং রাজারামের পত্নী। ১৭০০ খৃঃ পতির মৃত্যু হইলে তারাবাই আওরঙ্গজেবের সৈন্তের আক্রমণ হইতে সিংহগড় রক্ষার্থ স্বয়ং যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সিংহগড় তিন বৎসর অবরোধের পর আওরঙ্গজেবের হস্তগত হয়; কিন্তু আওরঙ্গজেব তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই তারাবাইর আদেশে উহা আবার অধিকৃত হয়। নানা মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে ও রাজনীতিতে তারাবাইর প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ১৭৫৩ খৃঃ তারাবাই পরলোক গমন করেন।

তুকাজী হুলকার—ইন্দোরের রাজা। ইনি ভারতপ্রসিদ্ধা অহল্যা বাইর সেনাপতি। অহল্যাবাই এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ সেনাপতিকে রাজসম্ভ্রমসূচক "হুলকার" উপাধি দান করিয়াছিলেন। (অহল্যাবাই দেখ)

তুকারাম—ইনি এক জন মহারাষ্ট্রদেশীয় সাধু। ১৫৮৮ খৃঃ পুণার নিকটবর্ত্তী দেহুক নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে শূদ্র হইলেও দাক্ষিণাত্যের সকল শ্রেণীয় লোকই ইঁহাকে সমান আদরের চক্ষে দেখিতেন। বিংশতি বৎসর বয়সে মাতাপিতৃহীন হন এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদাসীন হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। তুকারাম ৫শ বর্ষ বয়সে বিবাহিত হন, কিন্তু শৈশব হইতেই ইহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। ভ্রাতার সংসার ত্যাগের পর হইতে তিনি সংসারে বীততৃষ্ণ হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় এবং বহু লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুই ঘটনায় তাঁহার মন সংসারে একবারে অনাসক্ত হইয়া পড়ে এবং তিনি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনায় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। তুকারামের কবিতাগুলির নাম "অভঙ্গ"। তিনি আট হাজারেরও অধিক অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। এই অভঙ্গ রচনা দ্বারা তিনি সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে ধর্ম্মভাব প্রবাহিত করেন। নানা দিগ্দেশ হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক সমাগত হইতে লাগিল। শিবাজী ইঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আগমনার্থ লোক প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি অতি বিনীতভাবে মহারাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অতঃপর শিবাজী স্বয়ং তাঁহার কুটীরে গমন করেন। ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া মহারাজ শিবাজী সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বনগমনপূর্ব্বক নিয়ত ধর্ম্ম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মহারাজের এই অবস্থা দর্শন করিয়া রাজমাতা জিজাবাই ইঁহার নিকট যাইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করেন। পরে শিবাজী তুকারামের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি সারগর্ভ উপদেশ দিয়া পুনরায় মহারাজকে সংসার ধর্ম্মে নিয়োজিত করেন। ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকই ইঁহার কবিতা ভক্তির সহিত আবৃত্তি করেন। তিরোভাবের সময় তুকারাম পত্নী অবলাইকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভে পরমভক্ত সন্তান হইবে এবং তাহার নাম নারায়ণ রাখিতে হইবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। শিবাজী এই শিশুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং এই পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য একখানা গ্রাম জায়গীর দিয়াছিলেন। তুকারাম বণিক শ্রেণীর শূদ্র ছিলেন; বণিগ্বৃত্তিই তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের জীবনোপায়ের অবলম্বন ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তুকারামের ব্যবসা চলা কঠিন হইয়া উঠিল। দারিদ্র্য পীড়নে তিনি পরিবার সহ কষ্ট ভোগ করিতেন। কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া টাকা ধারও দিত না। তাঁহার দুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রী দরিদ্রের কন্যা ও রুগ্না ছিলেন, অপর স্ত্রী ধনীর কন্যা নাম অবলাই। জ্যেষ্ঠা পত্নী রুগ্না ছিলেন বলিয়াই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তুকারামের জ্যেষ্ঠ সহোদর শান্তজী বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তুকারামের ১৮ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ পরলোক গমন করেন। ইহার পর হইতেই শান্তজী সংসারত্যাগী হইলেন। ভ্রাতৃবধূর মৃত্যু ও শান্তজীর সংসার ত্যাগ এই দুই ঘটনা তাঁহাকে সংসারে উদাসীন করিয়া ফেলিল। অবলাই অবস্থাপন্ন লোকের মেয়ে কিন্তু দরিদ্রতার পীড়নে তাঁহার প্রকৃতি একটু কঠোর হইয়াছিল। তিনি কোন উপায়ে কিছু টাকা ধার করিয়া

তুকারামকে ব্যবসা চালাইতে দেন। এবার তুকারামের কিছু লাভ হইল কিন্তু বাড়ীতে ফিরিবার সময় এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট তাহার দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন সমস্তই তাঁহাকে দিয়া রিক্তহস্তে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অবলাই ইহা অবগত হইয়া অতিশয় উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তুকারামের প্রথমা স্ত্রী বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, অনাহারে কষ্ট পাইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোজীও প্রাণত্যাগ করে। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে, পত্নী বিয়োগে, দারিদ্র্যের পীড়নে কষ্ট পাইয়া তুকারাম সংসার ত্যাগ করেন। তুকারাম মনে করিলেন যে, সংসারে সুখ নাই; তিনি সুখের আশায় বহু চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ক্রমশঃ দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি বুঝিলেন সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অনেক অধিক; দুঃখের তুলনায় সুখ নাই বলিলেই হয়। তিনি কায়মনোবাক্যে বিঠল দেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। বহুদূর হইতে লোক সকল তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণের জন্য আসিতে লাগিল। তুকারাম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ দেন ইহা কোন কোন ব্রাহ্মণের অসহ্য হইয়াছিল এবং তাঁহারা তুকারামকে কিছু কষ্টও দিয়াছিল। কিন্তু তুকারামের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেশের সকলেই বুঝিল তুকারাম একজন প্রকৃত সাধু, ভগবানের ভক্ত। তুকারাম কোথায় কি অবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করেন তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তবে আনুষঙ্গিক ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়, যে তিনি ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে অমর ধামে চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে বিষ্ণুর বিমানে আরোহণ করিয়া তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

তুলসীদাস—ভারতের বিখ্যাত ভক্ত কবি। ইনি জাতিতে কনোজ ব্রাহ্মণ। ইনি গঙ্গা যমুনার অন্তর্বর্ত্তী দোয়াবের অন্তর্গত তরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রণীত হিন্দিভাষায় লিখিত আধ্যাত্মিক রামায়ণ "তুলসীদাসী রামায়ণ" নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে যিনি "রাম" নামে উক্ত হইয়াছেন তিনি বাস্তবিক শঙ্করাচার্য্যের "ব্রহ্ম।" কথিত আছে ভগবান রামচন্দ্র স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে রামায়ণ প্রণয়ন করিতে বলেন। তিনি দার্শনিক মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। রামানন্দের ন্যায় ইনিও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। কথিত আছে যে, তুলসীদাস অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন; একদিন তাঁহার পত্নী রত্নাবলী দেবী স্বামীর অজ্ঞাতসারে পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন, তুলসীদাস ইহা অবগত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে পথে ধরিলেন। ইহাতে পত্নী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমার এই অস্থিচর্ম্মসার দেহে তোমার যেরূপ আসক্তি দেখা যাইতেছে, ইহার তুল্যপ্রীতি যদি ভগবান রামের উপর থাকিত, তবে তোমার ভবভীতি থাকিত না।" তুলসীদাসের চেতনা হইল; তিনি আর পত্নীর দিকে না চাহিয়া তখনই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন। রত্নাবলী বুঝিতে পারেন নাই যে, তাহার সামান্য কথাতেই স্বামীর এরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। তিনি স্বামীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আহারাদির জন্য কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। ইনি বারাণসী, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরুষোত্তম তীর্থ ভ্রমণ করেন। তুলসী বহুবর্ষ তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; এখন আর তাঁহার বাড়ী, ঘর, শ্বশুরবাড়ী, স্ত্রীর কথা মনে নাই। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত। বৃদ্ধা রত্নাবলী অতিথি সৎকারে নিযুক্ত হইলেন; তিনিও স্বামীকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। কিছুকাল আলাপের পর চিনিতে পারিয়া আত্মগোপন করিয়া স্বামীর রন্ধনাদির সাহায্য করিতে লাগিলেন। তুলসী বৈষ্ণব ছিলেন; তিনি নিজে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে মরিচ আনিয়া দিব? তুলসী বলিলেন যে উহা তাঁহার ঝুলিতে আছে। তৎপর একটু কর্পূর দেওয়ার অনুমতি চাহিলে তুলসী বলিলেন উহাও তাঁহার ঝুলিতে আছে। রত্নাবলী স্বীয় পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, যখন খড়ি মরিচ হইতে কর্পূর পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষ ঝুলিতে স্থান পাইল তখন তাঁহার পত্নী পরিত্যাগ উচিত নহে। তুলসীর জ্ঞান হইল, তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার পত্নী অধিক জ্ঞানসম্পন্না। তুলসী শেষ সম্বল ঝুলিটী ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া আবার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সম্বরাধিপতি অমরসিংহ প্রভৃতি হিন্দুরাজগণ সর্ব্বদা তুলসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তুলসীদাসের শ্বশুর

দীনবন্ধু পাঠক। তাঁহার পত্নী বাল্যকালে পিতৃগৃহে থাকিয়া সমাগত সাধুদিগের সেবা করিতেন এবং যৌবনে স্বামীর সেবায় নিরত ছিলেন। তুলসীদাস মূলা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই অশুভ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণের ফল অবিলম্বেই ফলিল; তুলসীর জন্মদিবসেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতৃপরিত্যক্ত অশুভক্ষণেজাত বালককে কোন প্রতিবেশীই লইতে চাহিল না; অবশেষে একজন সাধু তাঁহাকে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন।

কথিত আছে, ভগবান রামচন্দ্র তুলসীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া রামায়ণ লিখিতে আদেশ করেন। এই আদেশ পাইয়া তুলসী ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় থাকিয়া রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করেন। বালকাণ্ড রচনা সম্পূর্ণ হইলে তাঁহার সহিত বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়, এজন্য তিনি অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া বারাণসী গমন করেন এবং তথায় উক্ত রামায়ণ পরিসমাপ্ত করেন। তুলসীদাস কাশীর যে স্থানে নদীতীরে থাকিতেন সেই স্থানের নাম এখনও তুলসীঘাট বলিয়া পরিচিত। তুলসীর একটী উপাদেয় কবিতার অর্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"কেহ কাণা কড়ি লইতে চাহে না, কারণ তাহা দ্বারা কোন কাজ হয় না। কিন্তু দীনবৎসল রাম কাণা কড়ির তুল্য তুলসীকে মহার্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন। তুলসী এক সময়ে ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, এক্ষণে ভূপতিবর্গ আসিয়া তাহার চরণপূজা করিতেছে। ইহার কারণ কেবল এই, তুলসী তখন রামরহিত ছিল, এখন রাম সেই তুলসীর সহায় হইয়াছেন।"

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে তুলসী কাশীধামে পরলোক গমন করেন। গ্রাউজ সাহেব তুলসীদাসী রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন।

তুলারাম সেনাপতি—কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তুলারাম নামে একজন চাপরাশি ছিল। তাহার পিতা কাচাদিন উত্তর কাছাড়ের পর্ব্বতে বিদ্রোহীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। এজন্য রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাহাকে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তুলারাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধার্থ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মদেশের রাজাকে কাছাড় আক্রমণে সহায়তা করে। তৎকালে (১৮২৪ খ্রীঃ) ব্রহ্মরাজ কাছাড় আক্রমণ করেন। এই সুযোগে তুলারাম উত্তরকাছাড় পর্ব্বতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকে। কাছাড়রাজ গোবিন্দচন্দ্র তিনবার যুদ্ধ করিয়াও তুলারামকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগবর্ণমেণ্টও রাজা তুলারামকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। উত্তরকাছাড় সেই সময় "তুলারাম সেনাপতির রাজ্য" বলিয়া পরিচিত হয়। তুলারাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৮টী হাতী দিতেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র নকুলরাম ও ব্রজনাথ উত্তর কাছাড়ের রাজা হয়। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নকুলরামের মৃত্যু হওয়ায় উত্তরকাছাড় ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়।

তেগবাহাদুর—শিখদিগের নবম গুরু। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজেবের আদেশে ইঁহার মস্তক ছিন্ন হয়। ইঁহার পিতা শিখদিগের ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দ, মাতার নাম নানকী। মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের আদেশে তেগ বাহাদুর বন্দিদশায় দিল্লীতে নীত হন। তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উৎপীড়ন করা হয়। তিনি একখানা কাগজ গলায় ঝুলাইয়া সম্রাটকে বলিলেন যে, আমার গলায় যে মন্ত্র আছে তাহাতে কাটামুণ্ড জোড়া লাগে। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করাইলেন। মুণ্ড জোড়া লাগিল না। কাগজ পড়িয়া দেখা গেল "শির দিয়া, সর নাহি দিয়া" অর্থাৎ মাথা দিলাম তথাপি মনের কথা দিলাম না।

তোদরমল—টোডরমল দেখ।

ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার—ঢাকা জিলায় বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীদ্বয়ের মধ্যে পারজোয়ার পরগণা। এই পরগণায় শাক্তা নামে এক প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রাম পণ্ডিত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্মদ্বারা ধন্য হইয়াছে। এই বিখ্যাত বৈয়াকরণ ১৭৫৯ শকে (ইং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ১২৪৪ সন) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা

৺ ভৈরবচন্দ্র পঞ্চানন এবং মাতা ৺ অম্বিকা দেবী। তর্কালঙ্কার মহাশয় দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন এবং তদবধি মাতার ও পিতৃব্য ৺ রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হন। তিনি বাল্যকালে তদীয় অপর পিতৃব্য ৺ কৃষ্ণনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ১৪শ বর্ষ বয়সে বিক্রমপুরের অন্তর্গত পুরাপাড়ানিবাসী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের টোলে গমন করেন এবং তথায় ৪ বৎসরে কলাপ ব্যাকরণ সম্পূর্ণ করিয়া উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে তর্কালঙ্কার উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করেন। উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বিক্রমপুরের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ৺ জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনিও প্রতিভান্বিত পণ্ডিত ছিলেন। অনতিকালের মধ্যেই তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জিলা হইতে ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ আসিত। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়া তিনি ১৮১৯ শকে (ইং ১৮৯৭ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সন) ৭ই আশ্বিন বুধবার মধ্যরাত্রে পরলোকগমন করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঢাকাবাসিগণের গৌরবের সামগ্রী ছিলেন। তিনি মনোদূত নামক কাব্য ও পরিশেষরত্ন নামক কলাপব্যাকরণ সম্বন্ধীয় টীকা রচনা করেন। এই টীকায় কলাপপরিশিষ্ট ও তট্টীকা গোপীনাথের সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় মৃত্যুকালে চারি পুত্র রাখিয়া যান, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধ্যাপক ৺ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বৈয়াকরণ-কেশরী সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত পীতাম্বর বিদ্যাভূষণের ছাত্র ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইছাপুরা নিবাসী পণ্ডিত তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র, পুরাপাড়া নিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত্ত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র এবং উক্ত পুরাপাড়াবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ত্রৈলিঙ্গস্বামী—এই মহাত্মা দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিজানাগ্রাম জিলায় হেলিয়া নগরে ১৫২৯ খৃঃ পৌষমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা নৃসিংহধর অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন। নৃসিংহধরের দুইপত্নী ছিল; জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে ত্রৈলিঙ্গধর ও অপরাভার্য্যার গর্ভে শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন। ত্রৈলিঙ্গধর পরবর্ত্তীকালে ত্রৈলিঙ্গস্বামী নামে ভারতে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেন। যাত্রিগণ বিশ্বেশ্বরের সমভক্তিভাবে ত্রৈলিঙ্গস্বামীকে দর্শন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিত। যখন ত্রৈলিঙ্গের বয়স ৪০ বৎসর তখন তাঁহার পিতা নৃসিংহধর পরলোক গমন করেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি নানাগুণসম্পন্না মাতার নিকট নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করেন। ত্রৈলিঙ্গের ৫২ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার মাতা স্বর্গগত হন। মাতার শবদেহের অগ্নিসংস্কারের পর আর ত্রৈলিঙ্গ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীধর তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে নানা প্রকারে অনুনয় করিলেন কিন্তু ত্রৈলিঙ্গ সংসার অশেষ দুঃখের আকর মনে করিয়া স্নিগ্ধ ভ্রাতার অনুনয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীধর অকৃতকার্য্য হইয়া সমস্ত গ্রামবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া ত্রৈলিঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পৈতৃকসম্পত্তি স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে আদেশ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাসযোগ্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই স্থানে যোগাভ্যাসে রত থাকিয়া ২০ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ভগীরথস্বামী নামে এক সুপ্রসিদ্ধযোগীর সহিত ত্রৈলিঙ্গধরের পরিচয় হয়। ত্রৈলিঙ্গ ভগীরথের সহিত পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া তথায় দীর্ঘকাল বাস করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে ত্রৈলিঙ্গ ভগীরথের নিকট যোগের গূঢ়তত্ত্ব সমুদয় অবগত হন। ইনি ভগীরথের নিকট দীক্ষিত হন; ভগীরথ ইঁহাকে গণপতিস্বামী নাম দেন; কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে কাশীধামে অবস্থান কালে তথাকার অধিবাসিগণ ইঁহাকে ত্রৈলিঙ্গস্বামী নামেই অভিহিত করিতেন। পুষ্করতীর্থে গুরু ভগীরথ দেহত্যাগ করিলে পর ত্রৈলিঙ্গস্বামী নানাতীর্থ পর্য্যটন করেন; অবশেষে সেতুবন্ধ রামেশ্বরতীর্থে উপনীত হন। এখান

হইতে স্বামীজী আরও দক্ষিণে সুদামাপুরীতে গমন করেন; সেখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার বরে ধন ও পুত্রলাভ করেন। এখানে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাদর্শনে লোকে নানাবিধ কামনা সহকারে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিল। তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে নেপালরাজ্যে গমন করেন এবং তথায় কিয়ৎকাল নিবিষ্টমনে যোগাভ্যাস করেন। কিন্তু এখানেও লোকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে থাকে; ইহাতে তিনি এই স্থান ত্যাগ করিয়া প্রথমে তিব্বতে ও তৎপর মানসসরোবরে যাইয়া উপস্থিত হন। এখানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া যোগরত থাকেন। অনন্তর তিনি হিমময় মানসসরোবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতের মধ্যপ্রদেশে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে উপনীত হন। এখানে বহুযোগী, সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই আশ্রমে খাকীবাবা নামে এক যোগী বাস করিতেন; তিনি একদিন মধ্যরাত্রে নর্ম্মদাতীরে যোগার্থ যাইতেছিলেন এমন সময়ে দেখিলেন যে, নদী দুগ্ধরূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলিঙ্গের নিকট উপস্থিত; ত্রৈলিঙ্গ আনন্দ সহকারে সেই দুগ্ধপান করিতেছেন। কিন্তু খাকীবাবা তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র নর্ম্মদা দুগ্ধরূপ ত্যাগ করিয়া নদীরূপ গ্রহণ করিল। এই অলৌকিক ঘটনাদর্শনে খাকীবাবা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। খাকীবাবার মুখে আশ্রমস্থ সকল ঋষি এই ঘটনা অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এখান হইতে তিনি ৺কাশী-ধামে আসিয়া উপনীত হন। এখানে তিনি প্রথমে আসিয়া তুলসীদাসের বাগানে কিয়ৎকাল গুপ্তভাবে বাস করেন; তৎপর তথা হইতে বেদব্যাসের আশ্রম ও তৎপর হনুমান ঘাটে অবস্থিতি করেন। তুলসীদাসের বাগানে অবস্থান কালে এক জন্মাবধি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি স্বামীজীর কৃপায় রোগমুক্ত হয়। হনুমান ঘাটে অবস্থান কালে এক মহারাষ্ট্র দেশীয় রমণীকর্ত্তৃক উলঙ্গ স্বামীজী নির্লজ্জতা হেতু ভর্ৎসিত হন; কাশীর বিশ্বেশ্বর এই রমণীকে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য স্বামীজীর নিকট গমন করিতে স্বপ্নে আদেশ করেন। পতিব্রতা রমণী স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধিনির্ম্মুক্তির জন্য বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরের আদেশে উলঙ্গ স্বামীজীকে স্তবে তুষ্ট করিয়া পতির রোগমোচনের বর লাভ করেন। তিনি যোগবলে শীতাতপদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়াছিলেন। তীব্র শীতের সময় তাঁহাকে গঙ্গায় ভাসিয়া থাকিতে দেখা যাইত; আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁহাকে কখন কখন অনাবৃত স্থানে শয়ান দেখা যাইত। তিনি যাচ্ঞা করিয়া কিছুই আহার করিতেন না; যাত্রিগণ ভক্তিসহকারে নানাবিধ আহার্য্য বস্তু তাঁহার মুখে তুলিয়া দিত; ইহাতে তাঁহার জাতি বিচার ছিল না। একদা এক দুর্ব্বৃত্ত কতকগুলি চূণ তাহার মুখ বিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়; স্বামীজী উহা অম্লানবদনে খাইয়া ফেলেন ও তাহার সমক্ষেই মূত্রত্যাগ করিয়া চূণগুলি বাহির করিয়া দেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কাপড় পরিয়া চলিতে আদেশ করেন; ইহাতে স্বামীজী স্বীকৃত না হওয়ায় সাহেব পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি স্বামীজীকে তাঁহার খানা খাওয়াইয়া দিবেন। ইহার উত্তরে স্বামীজী বলেন যে, যদি সাহেব তাঁহার খানা খান, তবে তিনিও সাহেবের খানা খাইবেন। সাহেব স্বামীজীর খানার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী তাঁহার সমক্ষেই মলত্যাগ করিয়া উহা খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাহেবের চৈতন্য হইল; তিনি বুঝিলেন যে এক জন নির্ব্বিকারচিত্ত মহাপুরুষকে তিনি উৎপীড়িত করিতে যাইতেছিলেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় পরমহংসের নিকট বিষ্ঠা মূত্র ও সুমিষ্ট খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যে কোন পার্থক্য ছিল না। একদা এক দেশীয় নৃপতি সপরিবারে কাশীতে আসিয়া গঙ্গার তীরে বাসা করেন ও নিজ আবাসস্থল হইতে গঙ্গা-পর্য্যন্ত সমস্তস্থান সুসংবৃত করেন। রাজা পত্নীসহ গঙ্গায় স্নান করিয়া বাসায় আসিতেছিলেন, এমন সময় উলঙ্গ ত্রৈলিঙ্গ-স্বামীকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীজীকে নানাপ্রকার কটূক্তি করিলেন এবং কিরূপে তথায় আসিলেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী মৌনাবলম্বী ছিলেন; তিনি রাজার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিলেন না। দেখিতে দেখিতে তথায় রাজার পারিষদ্‌বর্গ উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা ত্রৈলঙ্গস্বামীকে চিনিতেন। তাঁহারা রাজাকে স্বামীজীর যোগবিভূতির বিষয় অবগত করিলেন কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না;

তিনি স্বামীজীকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন; রাজার অনুচরেরা তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিল। রাত্রিতে রাজা এক বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করেন। তিনি দেখিলেন এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত ত্রিশূলধারী দিব্যপুরুষ বেত্রদণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে কাশীধাম ত্যাগ করিতে আদেশ করিতেছেন। রাজা স্বপ্নে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; পরিজনবর্গ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি অচেতন; বহু চেষ্টায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। সমস্ত রাত্রি আর রাজার নিদ্রা হইল না। প্রভাতে নৃপতি স্বয়ং ত্রৈলিঙ্গস্বামীর নিকট যাইয়া বহু স্তবস্তুতিতে তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করেন। স্বামীজী প্রীতিসূচক ইঙ্গিতে রাজাকে বিদায় করিলেন। লোকে অনেকবার তাঁহাকে যোগবলে অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছে। একদা এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী অদূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে নৌকায় কাশীতে আসিতেছিলেন। নৌকা খানি মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এই সময়ে ত্রৈলিঙ্গস্বামী গঙ্গাজলে ভাসিতেছিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারী স্বামীজীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে নৌকাস্থিত তাঁহার সহকারী দেশীয় কর্ম্মচারী স্বামীজীর যোগবিভূতির বিষয় তাহাকে বলেন। সাহেবের অনুরোধে ও বাঙ্গালী বাবুটীর অনুনয়ে স্বামীজী নিরাপত্তিতে গঙ্গাবক্ষ হইতে নৌকায় উঠিলেন। নৌকায় উঠিয়া সাহেবের হস্তস্থিত তরবারি খানা দেখিতে চাহিলেন। সাহেব নির্ব্বিকার যোগীর হস্তে তরবারি দিতে আপত্তি করিলেন না। স্বামীজী তরবারি খানা হস্তে লইয়াই উহা নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া স্বামীজীকে শাস্তি দিতে সঙ্কল্প করিলেন; তিনি নৌকা তীরে যাওয়ার অপেক্ষা করিতেছিলেন; দেশীয় বাবুটী দেখিয়া অবাক্। তিনি সাহেবকে বলিলেন যে ডুবুরি দিয়া তিনি তরবারি খানা উঠাইয়া দিবেন। কিন্তু ইহাতেও সাহেবের ক্রোধ প্রশমিত হইল না। নৌকা মণিকর্ণিকার ঘাটে সংলগ্ন হইল; সাহেব স্বামীজীকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। স্বামীজী বাঙ্গালী বাবুটীর হৃদয়ের ভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি জলে হস্তদেওয়া মাত্র তিন খানি তরবারি তাঁহার হস্তে আসিল। তিন খানিই স্বামীজী সাহেবের হাতে দিলেন; তিন খানিই এক-রূপ; সাহেব স্বীয় তরবারি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। স্বামীজী তরবারি গুলি লইয়া সাহেবের তরবারিখানি উঁহাকে দিয়া বাকী দুই খানি জলে নিক্ষেপ করিলেন। সাহেব স্বামীজীর ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং স্বীয় ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানি বোধ করিতে লাগিলেন। অনুতাপের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইঙ্গিতে রাজপুরুষের প্রতি সন্তোষজ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বামীজী পুনর্ব্বার গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। বঙ্গদেশীয় একটী ব্রাহ্মণের অল্প বয়স্ক পুত্রের পদস্খলন হেতু পঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়; বহুচিকিৎসাতেও বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না। ইহারা স্বামীজীর শরণ লয়; স্বামীজী কৃপা করিয়া একটু মৃত্তিকা বালককে খাইতে দেন। ইহাতেই বালক প্রকৃতিস্থ হয়। অপর এক সময় একটী ভদ্রলোক দুই তিন মাইল দূর হইতে প্রত্যহই স্বামীজীর আশ্রমে ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনায় মনের অশান্তি দূর করিতে আসিতেন। একদিন ভয়ানক বর্ষাপাত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাসমাগত হইল; কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নাই। সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন, এই ভদ্রলোকটী কিরূপে বাসায় যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। তিনি দুইবার প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন, দুইবারই স্বামীজী তাঁহাকে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন। অবশেষে স্বামীজী তাঁহাকে দুইটী এলাচ খাইতে দিলেন এবং তাঁহাকে পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। বাহির হইয়াই দেখেন একটী আলো তাঁহার অগ্রগামী হইতেছে, উপর হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পাত হইতেছে, কিন্তু তাঁহার শরীরে বৃষ্টি পড়িতেছে না। আলোক লক্ষ্য করিয়া তিনি দ্রুত পদসঞ্চারে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু উহা কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বেই তিনি গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আর আলো দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন তাঁহার গাত্রবস্ত্র একটুও আর্দ্র হয় নাই। কেবল পদদ্বয় সিক্ত হইয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিলেন। স্বামীজীর অনুগ্রহের বিষয়ীভূত হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন এবং নিজকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। স্বামীজী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন; সুখদুঃখের অতীত হইয়া তিনি পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৮০৯ শকে (১৮৮৭ খৃ) পৌষমাসে শুক্লাএকাদশীর সায়ংকালে এই মহাত্মা কাশীধামে যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ২৮০ বর্ষ বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।



দণ্ডী—বিখ্যাত কবি ও আলঙ্কারিক। ইঁহার প্রণীত দশকুমারচরিতনামক গদ্য কাব্য ও কাব্যাদর্শনামক অলঙ্কার গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাব্যাদর্শে মৃচ্ছকটিক হইতে "লিম্পতীবতমোঙ্গানি" এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় ইনি মৃচ্ছকটিক রচয়িতার পরবর্ত্তিকালের লোক। শূদ্রক খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (শূদ্রক দেখ)। কেহ কেহ বলেন, "দণ্ডী" ইঁহার প্রকৃত নাম নহে, তিনি দণ্ডগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করেন বলিয়া দণ্ডী নামে অভিহিত হইতেন।

দয়ানন্দ স্বরস্বতী—ইনি একজন সন্ন্যাসী। গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার প্রদেশে মর্ভিনামক এক রাজ্য আছে; এই রাজ্যের প্রধান নগর মর্ভি। দয়ানন্দ এই মর্ভি নগরে ১৮২৪ খৃঃ উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ানন্দ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় ভারতভূমি বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ। তখন ইংরেজের সহিত মহারাষ্ট্র শক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠগীর অত্যাচারে দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি জন্মিয়াছিল। এই সময়ে ভারতের চিতাসমূহে শত শত অবলার জীবন্ত দেহ পুড়িয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইতেছিল। এই সময়ে অপধর্ম্মে ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ভারতবর্ষ ডুবিয়াছিল। এই অপধর্ম্ম ও অজ্ঞানতা এবং নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কেবল বঙ্গে রাজা রামমোহন আন্দোলন করিতেছিলেন।

দয়ানন্দের পিতা একজন বিশিষ্ট শিবোপাসক ছিলেন। পিতার চরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্রে সংক্রান্ত হইয়াছিল। মাতা অতি কোমলহৃদয়া কামিনী ছিলেন। দয়ানন্দ পাঁচ বৎসরে বর্ণশিক্ষা শেস করিয়া বেদের মন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহু স্থান অভ্যাস করিলেন। অষ্টম বৎসরে তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। তৎপর যজুর্ব্বেদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বেই ব্যাকরণ, সমগ্র যজুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য বেদের অনেক অংশ শিক্ষা করিয়া পাঠ কার্য্য একরূপ শেস করিলেন।

একটী ঘটনায় তাঁহার জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একদিন অর্দ্ধরাত্রে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার পুরোবর্ত্তী বৃষভবাহন-পুরুষ যিনি ভোজন করেন, নিদ্রিত হন, পান করেন, হস্তে ত্রিশূল ধারণ করেন, তিনিই কি মহাদেব? ইনিই কি সেই পুরাণকথিত কৈলাসপতি পরমেশ্বর?" এই সব চিন্তায় বিচলিত হইয়া তিনি নিদ্রিত পিতাকে জাগাইয়া তাঁহাকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন। পিতা বলিলেন, "তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?" দয়ানন্দ বলিলেন, এই মূর্ত্তিই যদি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তবে তিনি আপনার গাত্রে মূষিকস্পর্শনিমিত্ত অপবিত্রদেহ হইয়াও কোন প্রতিবাদ করেন না কেন? ইহার উত্তরে পিতা যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার সংশয় বিদূরিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইল। এই সময় তিনি মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পিতার ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। ইহার কয়েকদিন পরে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ভগিনী সাংঘাতিক পীড়ায় দুই ঘণ্টার মধ্যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যু যন্ত্রণা তিনি এই প্রথম দর্শন করিলেন। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে মুক্তি-পিপাসা প্রবল হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িলেন। পিতা, দয়ানন্দের এই পরিবর্ত্তন দর্শনে তাঁহাকে জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু দয়ানন্দ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তাঁহার পিতা ইহা দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা দেখিলেন; দয়ানন্দ বাধা দিলেন, কিন্তু পিতা মাতা শুনিলেন না। কাজেই দয়ানন্দ নিরুপায় হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কয়েক দিন নিরুদ্দেশ থাকার পর পিতা তাঁহার সন্ধান করিয়া তাঁহাকে এক মঠে ধরিয়া ফেলিলেন। দয়ানন্দ পিতার সহিত গৃহে ফিরিলেন। পিতা পুত্রকে বাড়ীতে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। একদিন অর্দ্ধরাত্রিতে প্রহরীরা নিদ্রিত হইলে দয়ানন্দ আবার গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আহাম্মদাবাদ, বরদা প্রভৃতি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে

লাগিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গেলেন। ইহাতে অনেক লোক তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। দয়ানন্দ ভারতের প্রায় সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করাতে তাঁহার প্রাণসংহারের জন্য বহু লোক সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। দয়ানন্দের সুবিস্তৃত ভ্রমণকাহিনী বহুঘটনায় পূর্ণ। পরমানন্দ পরমহংসের নিকট তিনি বেদান্তসারাদি গ্রন্থ পাঠ করেন এবং পূর্ণানন্দ পরমহংসের নিকট সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হন। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যে সকল সাধু সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে ব্যাসাশ্রমের যোগানন্দ, বারাণসীর সচ্চিদানন্দ, কেদার ঘাটের গঙ্গাগিরি এবং জোয়ালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরির নাম উল্লেখযোগ্য। দর্শন ও যোগ শাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গেই থাকিত। তিনি অবসর কাল গ্রন্থ পাঠে ও যোগাভ্যাসে কাটাইতেন। তদনন্তর মথুরাতে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিত বিরজানন্দের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। ৮১ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের পাণ্ডিত্য দেখিয়া ৩৫ বৎসর বয়স্ক যুবক সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ও শৈব উভয় ধর্ম্মমতের বিরোধী ছিলেন। দয়ানন্দ ফরক্কাবাদে একটী বৈদিক পাঠশালা স্থাপন করেন। পঞ্জাবের নানা স্থানে আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। বিখ্যাত লাজপত রায় ও সরলা দেবীর স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী উভয়ই আর্য্য সমাজের সভ্য। লাজপত রায় মাংসাশী দলের নেতা এবং রামভজ নিরামিশভোজী দলের নেতা।

দয়ানন্দের মতে বেদোক্ত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ১৮৬৯ খৃঃ ১৭ই নবেম্বর (কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশীতে) মহাদেবের ত্রিশূল-রক্ষিত বারাণসী ধামে মূর্ত্তি-পূজা সমর্থনের নিমিত্ত এক মহা সভা হয়। এই সভায় কাশীর মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহন করেন। এই সভায় দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের বিচার হয়। এই বিচারে কাশীর পণ্ডিতগণ অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেন নাই। অবশেষে একটা গোলমাল হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। পণ্ডিতগণ কোলাহল করিয়া বলেন যে, দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন। এই বিচারবিষয়ে যে বিভিন্ন মত বাহির হয় তাহাতে দেখা যায় যে, পণ্ডিতগণ বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং বিচারনীতি অসম্মানিত করিয়া দয়ানন্দের অমূলক পরাজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার পর যতবার দয়ানন্দ কাশীতে গিয়াছিলেন তত বারই পণ্ডিতগণকে বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে তিনি বৈদিক ধর্ম্মের বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের মহোৎসব হইতে ছিল। তিনি "ঈশ্বর ও ধর্ম্ম" বিষয়ে কলিকাতায় এক বক্তৃতা দেন, তৎপর বরাহনগরে এক বক্তৃতা দেন। তৎপর যোধপুর, সাহাপুর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে যান; তথাকার মহারাজগণ ইঁহার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করেন। দয়ানন্দ একেশ্বরবাদের পক্ষে এবং জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতায় অবস্থান কালে ১৮৮১ সনের জানুয়ারী মাসে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতির উদ্যোগে সেনেট্‌হলে এক সভা হয় তাহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে, দয়ানন্দের সমস্ত সিদ্ধান্তই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি ১৮৮২ খৃঃ যোধপুরে রোগাক্রান্ত হন। ১৮৮২ খৃঃ ১৫ই অক্টোবর রোগযন্ত্রণায় দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তদীয় দেহ দগ্ধ করা হয়।

দয়াল সিংহ (সর্দ্দার)—ইহার পূর্ণনাম সর্দ্দার দয়াল সিংহ মজীথিয়া। ইনি পঞ্জাবের এক সম্ভ্রান্ত শিখ পরিবারে ১৮৪৯ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। এই মজীথিয়া শিখ পরিবার দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। ইঁহার পিতামহ সর্দ্দার দেশাসিংহ এক জাঠ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। জাঠ শিখগণ যুদ্ধকুশলতার জন্য বিখ্যাত। পঞ্জাবকেশরী বিখ্যাত মহারাজা রণজিৎ সিংহ সর্দ্দার দেশাসিংহকে, তাঁহার সমর নিপুণতা ও অন্যান্য গুণাবলিতে মুগ্ধ হইয়া, অমৃতসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। দয়ালের পিতা সর্দ্দার লেহনা সিংহ খালসা সেনার অধিনায়ক ছিলেন। লেহনা সিংহও পিতার মৃত্যুর পর অমৃতসরের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ খৃঃ লেহনা সিংহ বার্দ্ধক্যে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে দয়াল সিংহের

বয়স মাত্র ৫ বৎসর। পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে মাতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যান। নাবালক সর্দার দয়ালের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে আসে। অল্প বয়সেই সর্দার দয়াল সিংহ ইংরেজীতে ও পার্শি ভাষায় অভিজ্ঞ হন। সাবালক হইয়া তিনি সম্পত্তি নিজহস্তে গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া ইংরেজদের চালচলন দর্শন করেন। সম্ভ্রান্ত শিখদের মধ্যে ইনিই প্রথমে বিলাত যান, এজন্য সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সমাজে তাঁহার আদর ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইয়াছিল। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি দর্শন শাস্ত্র পড়িতে ভাল বাসিতেন। দয়াল সিংহ দানশীলতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন. তাঁহার অর্থ উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হইত এবং সর্ব্ব প্রকার জনহিতকর কার্য্যে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তিনি পঞ্জাবের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনিই পঞ্জাবের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা "ট্রিবিউন" এর প্রতিষ্ঠাতা ; বহুকাল পর্য্যন্ত বিক্রমপুরনিবাসী ৺শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি একটী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টাতে পঞ্জাবে নেশনেল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সর্দার মৃত্যু সময়ে এক চরম পত্র বা উইল করিয়া এক সাধারণ পুস্তকাগারের জন্য ৬০ হাজার টাকা ও একটী বড় বাড়ী দিয়া গিয়াছেন এবং কলেজ স্থাপনের জন্য যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। ইনি কংগ্রেসের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারই সাহায্যে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ১৩০৫ সনে এই মহাত্মা দেহত্যাগ করেন।

দলীপ সিংহ—পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৩৮ খৃঃ ৪ বৎসর বয়সের সময় দলীপ সিংহাসনে স্থাপিত হন। ১৮৪৯ খৃঃ শিখযুদ্ধের অবসানে ডালহৌসী পঞ্জাব অধিকার করেন। (ডালহৌসী দেখ) দলীপ একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রহিলেন। দলীপ সাবালক হওয়ার পর দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ দলীপ খ্রীষ্টান্ হন ; ১৮৫৪ খৃঃ ১৯শে এপ্রিল দলীপ ইংলণ্ডে গমন করেন ; মাতা ঝিন্দন বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ ২৩শে অক্টোবর পারিশের হোটেলে দলীপের মৃত্যু হয়।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—বঙ্গের একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। ইনি বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার পূর্ণতা সাধনপূর্ব্বক মৃণ্ময়ী নামক উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মৃণ্ময়ী ব্যতীত তাঁহার বহু উপন্যাস আছে, তন্মধ্যে "অমরাবতী", "ললিত মোহন," ও "সপত্নী" উল্লেখযোগ্য। তিনি সরলহৃদয় ও বন্ধুবাৎসল্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুদর্শনে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। গীতোক্ত ধর্ম্মই তিনি জীবনের সার করিয়াছিলেন। দামোদর বাবু উপন্যাস-রত্নাবলী নামক গ্রন্থে অনেক ইংরেজী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ বাহির করেন ; এতদ্দ্বারা ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গালী ইংরেজী উপন্যাসের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর ছিলেন। বিবিধ প্রকারে দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া ১৯০৭ সনের ১৬ই আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

দারাশেকো—(Dara Shikoh) সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি সম্রাটের অতিপ্রিয় ছিলেন। শাহজাহানের বৃদ্ধাবস্থায় তদীয় সিংহাসন লইয়া ৪ পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আওরঙ্গজেব অপর তিন ভ্রাতাকে পরাস্ত এবং পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। ইনি আরওঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইয়া তাঁহার আদেশে হত হন। নুরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উজীর আসফখাঁর কন্যা আর্জুমন্দ (মমতাজমহল) ইঁহার জননী। দারা শেকো অত্যন্ত বিদ্বান ছিলেন ; তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেন। এই গ্রন্থের নাম সফিনাৎ-উল-আউলিয়া (Safinat-ul-Aulia), তিনি আরও একখানি গ্রন্থ লিখেন। উহাতে তিনি কোরাণের নানা স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত মুসলমানে প্রভেদ নাই। তিনি পারস্য ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ ইংরেজী অনুবাদ সহ এখনও লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে বর্ত্তমান আছে, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার আসক্তি দেখিয়া তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে কাফের বা বিধর্ম্মী বলিত। এইজন্য তিনি আওরঙ্গজেবের বিরাগভাজন হইয়া তৎকর্ত্তৃক নৃশংস ভাবে হত হন।

দাশরথি রায়—বিখ্যাত গীতরচক। ইনি দাশুরায় নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলায় "পীলা" নামক গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। দাশুরায় প্রথমে কোন নীলের কুঠীতে কেরাণীগিরি করেন, পরে এই কাজ পরিত্যাগ করিয়া এক কবির দল গঠন করেন। মাতার ভৎর্সনায় কবির দল ত্যাগ করিয়া তিনি এক পাঁচালীর দল গঠন করেন। এই পাঁচালী রচনাতে বঙ্গে দাশুরায়ের এত নাম—এত মান। প্রভাস, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি অনেক পালা রচনা করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচনা শ্রুতিসুখাবহ হইলেও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট।

দিনকর রাও—(সার, রাজা, কে, সি, এস্, আই)। এই মহাত্মা বোম্বাই প্রদেশে রত্নগিরি জেলায় দেবরত (Devaroot) নামক স্থানে ১৮১৯ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম রাঘব দাদু (Raghoba Dadu)। তিন চারি পুরুষ যাবৎ দিনকর রাও এর পুর্ব্ব পুরুষ গোয়ালিয়র রাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছেন। তথায় ইঁহারা সকলেই উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারশী ভাষা শিখিয়া ছিলেন। দিনকর একজন গোঁড়া ধার্ম্মিক হিন্দু ছিলেন, তিনি প্রত্যহ যথানিয়মে সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার উত্তম অধিকার ছিল। দিনকর ১৫ বৎসর বয়সে রাজ সরকারে একাউন্টেন্ট (accountant) পদে নিযুক্ত হন এবং একার্য্যে খুব যোগ্যতা দেখান। কিছুদিন পরে তিনি, তাঁহার পিতারমৃত্যুর পর তাঁহারই স্থানে এক প্রদেশের সুবাদার পদে উন্নীত হন। ১৮৪৪ খৃঃ রাজপরিবারে নানারূপ কলহ এবং মহারাজ অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া রাজ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্যে যথানিয়মে খাজানা আদায় হয় না, রাজকোষ শূন্য। খন্দজাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এখন একজন যোগ্য লোকের কর্তৃত্ব আবশ্যক হইল। ১৮৫২ খৃঃ মন্ত্রিপদ শূন্য হওয়াতে দিনকর রাও এইপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি নিজের মাসিক বেতন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার স্থলে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা হ্রাস করিয়া অন্যান্য দিকেও ব্যয় সংক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই ব্যয় হ্রাস ব্যাপারে তিনি চমৎকার স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ইহার পর খাজানা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিলেন। করসংগ্রহ কার্য্যে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে নিয়মানুসারে কার্য্য করাইবার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন করেন; এই আইনের বলে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়া সুচারুরূপে শাসন চলিতে লাগিল। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহ হয়, এই সময়ে দিনকররাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট উপকার করেন। দিনকর রাওর পরামর্শে সিন্ধিয়া এক বিন্দুও বিচলিত হন নাই। যখন বিদ্রোহী সৈন্যেরা গোয়ালিয়রের মধ্য দিয়া যাইত তখন দিনকর রাও নিজ সৈন্যদিগকে বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিতে নিষেধ করিতেন। বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৯ খৃঃ বড়লাট আগ্রায় দরবার করিয়া দিনকররাওকে ধন্যবাদ দেন এবং কাশী জেলায় একটা বড় জমিদারী তাঁহাকে দান করেন। এই বৎসর তিনি গোয়ালিয়রের মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন; তৎপর ঢোলপুর রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) হন। ১৮৬১ খৃঃ তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কে, সি, এস্, আই, উপাধি দেন। তৎপর তাঁহাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয়। লর্ড ডফরিণ এই রাজা উপাধি তাঁহার বংশগত করিয়া দেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৬ খৃঃ জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যৌবনে দেখিতে খুব সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, মুখ প্রতিভা-দ্যোতক ছিল। তিনি সরল, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন এবং ইংরেজী রীতিতে চলিতেন।

দিব্য সিংহ (রাজা)—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যে রাজা দিব্য সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুর প্রবাসী প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন রাজা দিব্য সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। (অদ্বৈতাচার্য্য দেখ)। রাজা দিব্য সিংহের একমাত্র পুত্র, মন্ত্রিতনয় অদ্বৈতের সমবয়স্ক ছিলেন; উভয়ে একত্র বিদ্যাভ্যাস করিতেন, খেলা করিতেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অদ্বৈত শান্তিপুরে প্রেরিত হন ও তথায় বাস করেন।

বৃদ্ধ বয়সে রাজা দিব্যসিংহ রাজ্যভার পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া কাশী যাত্রা করেন। তখন শান্তিপুরে অদ্বৈতের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত; তিনি তখন মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত। রাজা দিব্যসিংহ পথে মন্ত্রিতনয়কে দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া শান্তিপুরে উপনীত হন। অদ্বৈতের মহিমায় রাজার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি শান্তিপুরেই থাকিলেন। কাশীতে গেলেন না। অদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দিব্যসিংহ শাক্ত ও বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন। অদ্বৈতের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরম ভক্ত হন এবং কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হন। "অভিরাম লীলামৃত" গ্রন্থে "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" নামে রাজা দিব্যসিংহকেই অভিহিত করা হইয়াছে। দিব্যসিংহ "বাল্যলীলাসূত্রম্" নামে অদ্বৈতের লীলাত্মক এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা এবং বিষ্ণুপুরিকৃত "বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" গ্রন্থের পয়ার ছন্দের অনুবাদ করেন।

দীননাথ সেন (রায় সাহেব)—পূর্ব্ববঙ্গ চক্রের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর। দীননাথ ১৭৬১ শকে (ইং ১৮৩৯ খৃঃ) ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ উপবিভাগে বায়রা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ গোকুল চন্দ্র সেন (গোকুল মুন্সি) মাতা ৺ দয়াময়ী দেবী। মাণিকগঞ্জের উপবিভাগের অন্তর্গত দাসরা গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। দীননাথ কুমিল্লা জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া "জুনিয়র" (Junior) বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তৎপর ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন। এখান হইতে তিনি বি, এ, পরীক্ষা দেন কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এই বৎসরেই বি, এ, পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তৎপর বহুকাল ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি আপন বুদ্ধিবলে কাপড়ের কল স্থাপন করেন। কিন্তু তাহাতে ভাল কাপড় প্রস্তুত না হওয়াতে তিনি কল বন্ধ করিয়া দেন। নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ হইতে তিনি ক্রমে আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, জয়েণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ও পরিশেষে ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ চক্রের ইন্‌স্পেক্টরী পদ হইতে কিছুকালের জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তিনি ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রিপদে কার্য্য করেন। এই পদে তিনি অধিক দিন ছিলেন না। তিনি পুনরায় ইন্‌স্পেক্টর পদে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি নিম্নলিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি লিখেন—শিক্ষাদান প্রণালী, মানসিক গণনা, বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৮২০ শকে (ইং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ ১৩০৫) তিনি পরলোক গমন করেন। দীন বাবু ও পরলোকগত অভয়কুমার দাসের যত্নে ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তাঁহার নিজ মতের পরিবর্ত্তন হয়। দীনবাবু প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন; তিনি অনেক নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি গানের স্বরলিপির উদ্ভাবন, উপনিষদের বঙ্গানুবাদ, নূতন প্রকারের প্রদীপ নির্ম্মাণ, কাপড়ের কল স্থাপন, গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি বহুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র (রায়বাহাদুর)—বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণপ্রণেতা। ১২৩৬ সালে ১৮২৯ খৃঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আড়বেলিয়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি কষ্টে ইংরেজী শিক্ষা করেন। রাঁধুনী বামনের অভাবে তাঁহাকে পালা করিয়া পাক করিতে হইত। পিতৃপ্রদত্ত নাম 'গন্ধর্ব্ব নারায়ণ মিত্র', কিন্তু তিনি কলিকাতা স্কুলে পড়িবার সময় নাম বদলাইয়া দীনবন্ধু লিখান। নীলদর্পণ তাঁহার স্বগৃহীত নামের সার্থকতা করিতেছে। দীনবন্ধু অত্যন্ত গরিব ছিলেন; স্কুলের বেতন দুইটাকা তাঁহাকে চাঁদা করিয়া তুলিতে হইত। তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা পাশ করিয়া বৃত্তি পান। দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের হিতপ্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। ১৮৫৫খ্রীঃ তিনি ডাক বিভাগে চাকুরী পান। এই বিভাগে শীঘ্রই উন্নত পদে উঠিয়াছিলেন। ১৮৭১খ্রীঃ লুসাই যুদ্ধ ঘটে; এই যুদ্ধে ডাকের সুবন্দোবস্তের জন্য দীনবন্ধুকে যুদ্ধস্থানে যাইতে হইয়াছিল। লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করার পর গবর্ণমেণ্ট হইতে রায়বাহাদুর উপাধি পান। তিনি ১৮ বৎসর মাত্র চাকুরী করিয়াছিলেন। যদি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত না হইতেন তবে বঙ্গে ডাক বিভাগে সর্ব্বোচ্চপদে উঠিতে পারিতেন। লুসাই যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি মণিপুর, কাছার প্রভৃতি স্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং তাহারই ফলে তিনি শেষ নাটক "কমলে কামিনী" লিখেন। "নীলদর্পণ" নাটকই তাঁহার কীর্ত্তি স্তম্ভ।

এই একখানা নাটকের অভিনয়ে ও প্রচারকলে বঙ্গে নীলকরের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। নীলকরকৃত দীনদুঃখী প্রজাসাধারণের অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া এই বিখ্যাত নাটক লিখেন। ১২৮০ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি বড়ই কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন এবং ছোট বড় সকলের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার চমৎকার ক্ষমতা ছিল।

তিনি একদা এক বিবাহোৎসবযুক্ত বাড়ীর নিকট দিয়া পাল্কী চড়িয়া যাইতে ছিলেন; সেই বাড়ীর সম্মুখে নামিয়া বেহারাদিগকে বিদায় দিয়া বৈঠকখানায় গম্ভীরভাবে বসিয়া কাজ করিতে লাগিলেন এবং আহারের সময় উপস্থিত হইলে আহার করিলেন। তৎপর গৃহস্বামীর সহিত পরিচয় হয়। নিমন্ত্রণে পাকের বিলম্ব থাকিলে আহারের পূর্ব্বে গল্প আরম্ভ করিয়া দিতেন। তিনি সাতখানি নাটক ও দুইখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। নাটক যথা—(১) নীলদর্পণ (২) কমলেকামিনী (৩) নবীন তপস্বিনী (৪) বিয়ে পাগলা বুড়ো (৫) সধবার একাদশী (৬) লীলাবতী (৭) জামাই বারিক। কাব্য যথা;—১। সুরধুনী কাব্য। ২। দ্বাদশ কবিতা।

দীনেশ চরণ বসু—পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা কবি। ইনি ঢাকা জিলায় মাণিকগঞ্জ উপবিভাগে শ্রীবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; পিতার নাম ৺ অভয়া চরণ বসু। ইনি নিম্নলিখিত ৪ খানি কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্য জগতে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। (১) মহাপ্রস্থান কাব্য (২) কবি কাহিনী (৩) কুলকলঙ্কিনী (৪) মানব-বিকাশ। তাঁহার রচনা অতি সরল ও মধুর। "কবি কাহিনী" হইতে নিম্নে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল, ইহা হইতেই তাঁহার কবিত্বের উপলব্ধি হইবে।

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি দেখিবি তার ? অন্য কেহ দেখে না ;
যে জন অন্তর যামী, তিনি আর জানি আমি,
এ বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা ?
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?"

"এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয়লো !
বিধবার চিত্ত হায় ঘোর মরুভূমি প্রায়,
বারিশূন্য, ছায়াশূন্য, সদা ধূ ধূ করে লো !
এক দিন, দুই দিন, নহে শ্যামা চিরদিন,
যত দিন ধূলায় না এ দেহ মিশায় লো !
এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো !"

"কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা' বুঝিবি ?
কেন দেখি অন্ধকার শূন্যময় এ সংসার,
বুঝায়ে বলিলে তোরে বুঝিতে কি পারিবি ?
নাহিক ঔষধ যার, নাহি তার প্রতীকার,
এরূপ রোগের কথা শুনিয়া কি করিবি ?
কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা বুঝিবি ?"

ইঁহার জন্ম ১২৫৭ বঙ্গাব্দ ১২ই ফাল্গুন ও মৃত্যু ১৩০৫ বঙ্গাব্দ ২৪শে আশ্বিন।

দুর্গসিংহ—কলাপ ব্যাকরণের বিখ্যাত বৃত্তি ও টীকাকার।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র। ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা রচনা করেন।

দুর্গামোহন দাস—ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় তেলিরবাগ গ্রামে ১৭৬৩ শকে (১২৪৮ সালে) ইং ১৮৪১ খৃঃ ৩রা অগ্রহায়ণ বৈদ্যবংশে দুর্গামোহন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাশীশ্বর দাস বরিশালের উকীল ছিলেন। বাল্যকালে তিনি কলিকাতা কালীঘাটে খুল্লতাতের বাসায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন, পরে বরিশালে যখন জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তথায় পিতার নিকট যাইয়া বরিশাল জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি জিলা স্কুল হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। পরে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালের আদালতে যাইয়া ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসাতে তাঁহার বাগ্মিতা ও আইনে অসাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ হওয়ায় তিনি অল্পদিনেই খ্যাতি লাভ

করেন। অতঃপর বরিশাল হইতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। এই ব্যবসাতে তিনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। ধর্ম্মমতে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন; বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্ত তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া অনেক বিধবার বিবাহ দেন। নিজের বিমাতাকেও সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে সহায়তা করেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি নিজেও বিধবা বিবাহ করেন। বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের বিখ্যাত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস্, সি (Dr. P. K. Ray) তাঁহার এক জামাতা এবং ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে বিখ্যাত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি, আই, ই তাঁহার অপর জামাতা। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র চিত্তরঞ্জন দাস (Mr. C. R. Das) কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। ১৩০৪ সনের ৪ঠা পৌষ ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বহু অসাধারণত্ব দেখা যায়। তিনি দয়াশীল এবং পরোপকারী; সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে তিনি অদ্বিতীয় সারথী। তিনি দরিদ্রের প্রতি অসাধারণ দয়া দেখাইতেন। ইঁহার বাড়ীতে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

দুর্গাবতী—(১) চিতোরের রাণা সঙ্গের কন্যা। বেসিনের রাজা শিলোটীর সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর সাহ ১৫৩১ খৃঃ শিলোটীকে বন্দী করিয়া বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শিলোটীর সহোদর লক্ষ্মণ কিয়ৎকাল ঘোর যুদ্ধ করিয়া বেসিনের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু অগণিত মুসলমান সেনার সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিয়া মুসলমানদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজা শিলোটীর মহিষী দুর্গাবতী মুসলমানদিগের হস্তে পড়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়া জহরব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ৭০০ শত রাজপুত রমণীসহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

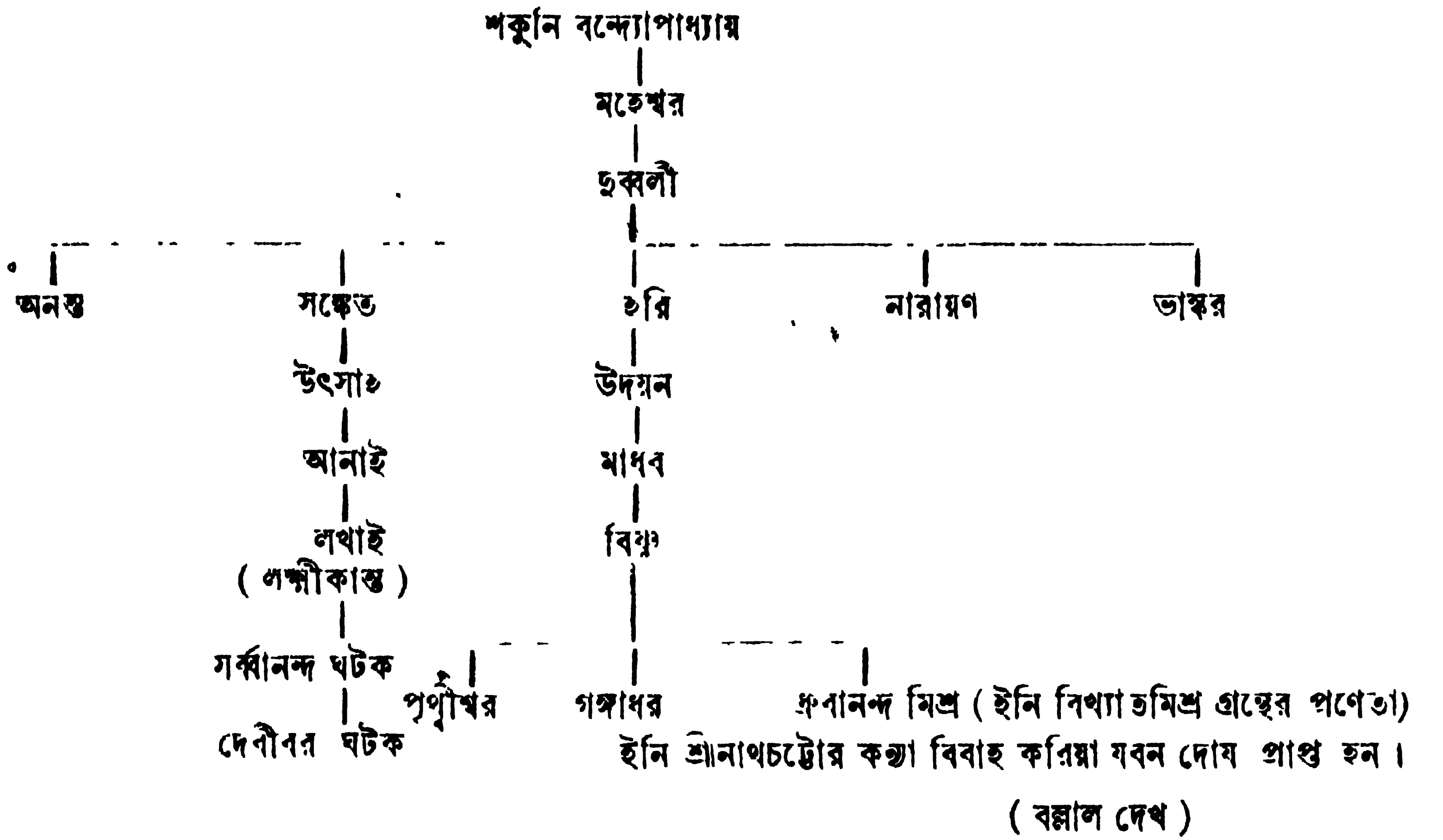
(২) চন্দেল রাজপুতবংশীয় মাহোবা রাজের কন্যা। মাহোবা হামিরপুর জেলার প্রধান নগরি। ইঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও অসাধারণ গুণপণার বিষয় অবগত হইয়া গৌররাজপুত বংশীয় দলপৎসা তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুর্গাবতীর পিতা এ বিবাহে সম্মতি দেন না। দলপৎ সসৈন্যে দুর্গাবতীর পিতাকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। দুর্গাবতীর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল; ৪ বৎসর পরই তিনি বিধবা হইলেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। ৩ বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্রের অভিভাবিকারূপে তিনি গড়মণ্ডল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। দুর্গাবতীর বুদ্ধিবলে রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চিত হইল। তাঁহার সুশাসনে সমস্ত প্রজা সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। বিধবা রাণী দুর্গাবতী এ সুখ সৌভাগ্যও বেশীদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের কর্ণগোচর হইল। আকবরের মধ্যভারতস্থ সেনানী আসফ খাঁ ১৮০০০ সৈন্য লইয়া গড়মণ্ডলের রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ করেন। এখানে প্রথম যুদ্ধে রাণী দুর্গাবতী জয়লাভ করেন কিন্তু দ্বিতীয়-দিনের যুদ্ধে হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থিতা রাণী আহত হইলেন; একটী শর তাহার চক্ষুতে বিদ্ধ হইল; অপরটী তাহার গণ্ডদেশ ভেদ করিল; সৈন্যগণ তাঁহাকে আহত দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধজয়ের কোন আশা নাই দেখিয়া রাণী দুর্গাবতী মাহুতের হস্ত হইতে ছুরিকা গ্রহণপূর্ব্বক উহা বক্ষে বিদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

দেবদামোদর—ইনি ১৪১০ শকে (ইং ১৪৮৮ খ্রীঃ) নগাওঁর অন্তর্গত নলবা গ্রামে গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সদানন্দ, মাতা সুশীলাদেবী; তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। দামোদর চিরকৌমারব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ৩৯ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। শঙ্করদেবই তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন; তিনিই দামোদর নাম রাখেন। শঙ্করদেব ও দামোদরদেব উভয়েই একমনপ্রাণ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হন। দামোদরদেবের যদিও কোনপ্রকার গ্রন্থাদি নাই তথাপি তিনি যে একজন ভক্ত, ভাগবতোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশিষ্টপ্রচারক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি আসামে অনেক সত্র স্থাপন করেন। তন্মধ্যে আউনি আটি, গড়ৈমুড়ি, কুরুয়াবাহি ও দক্ষিণাপাট এই চারি সত্র প্রধান। কামরূপে বেহকুটি আদি সত্রও সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত।

তিনি ১৫০২ শকে (ইং ১৫৮০ খ্রীঃ) কোচবেহারের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে ৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি প্রধান শিষ্য ভট্টদেবকে তাঁহার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। (শঙ্করদেব দেখ)।

দেবীপ্রসাদ (মুন্সী)—ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সি ছিলেন। মুন্সী দেবীপ্রসাদের জন্মস্থান শ্রীহট্ট সহরের নিকটবর্ত্তী আথালিয়া গ্রাম। তিনি নানাভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচিত "পলিগ্লট গ্রামার" (Polyglot Grammar) বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচায়ক। ইহাতে ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী, পারসী, বাঙ্গলা, হিন্দী ও উর্দ্দু এতগুলি ভাষার একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

দেবীবর ঘটক—রাঢ়ীয় কুলীনগণের মেলবন্ধনকর্ত্তা। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। রোষাকর নামে জনৈক কুলীনকে দেবীবর "নিস্কুল" করেন এবং ইহাতে রোষাকর ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীবরকে শাপ দেন "তুমি নির্ব্বংশ হইবে"। রোষাকরের অভিশাপ সফল হইয়াছিল। দেবীবরের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশলতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই মহাত্মা ১৭৩৯শকে (১৮১৭ খৃঃ) ৩রা জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৫১ শকাব্দে (১৮২৯ খৃঃ) ১১ই মাঘ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর তিনি বিলাত গমন করেন। এই সময়ে দেবেন্দ্র নাথ বালক মাত্র। তিনি বাল্যাবস্থায় রাজার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। এই বালকের প্রতিভা দেখিয়া রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, "এই শিশুই আমার গদি অধিকার করিবে।" রাজার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। তৎকালে "ডিরোজিও" নামে এক ছাত্রপ্রিয় ও শিক্ষাপ্রণালীতে অভিজ্ঞ সাহেব হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন; ইনি নাস্তিক ছিলেন, তাঁহাদ্বারা ছাত্রগণ চালিত হইত। উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইলেও ধর্ম্মহীনতার দরুণ উক্ত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ডিরোজিওর মনোভাব তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে সংক্রান্ত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের সৌভাগ্য যে ডিরোজিওর পদচ্যুতির পর তিনি উক্ত কলেজে প্রবেশ করেন; তাহা না হইলে তিনি ধর্ম্মজগতে এত খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তিনি স্বরচিত জীবনচরিতে লিখিয়াছিলেন "প্রথম বয়সে উপনয়নের পর যখন আমি প্রতিনিয়ত গৃহে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসর যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর চাহিতাম, তখন

মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।” অনন্ত আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার এইভাব দূরীভূত হয়। তিনি মনে করিলেন, এই অগণিত তারকা-মণ্ডলীর, এই চন্দ্রসূর্য্যগ্রহউপগ্রহাদির কোন স্রষ্টা আছেন; এই সমুদয় নিশ্চয়ই এই ক্ষুদ্র শিলা বা মৃণ্ময়মূর্ত্তির কার্য্য নহে। ১৭৬০ শকে কোন ঘটনায় এক শ্মশান ক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত হন। এই অবস্থায় তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। রাজার বিলাত গমনের পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর ব্রাহ্মসমাজের ভার পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ শ্মশানবৈরাগ্যের পর এই বিদ্যাবাগীশের নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া উপনিষদাদি গ্রন্থে বর্ণিত একেশ্বরবাদসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন তারিখে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ও দেবেন্দ্রনাথ “তত্ত্ববোধিনী” সভা স্থাপন করেন। এই সভা প্রথমে দেবেন্দ্রনাথের নিজ বাটীতেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আহুত হইত। এই সভায় প্রথমে ১০ জন মাত্র সভ্য ছিলেন, প্রত্যেকে আয়ের টাকায় তিন পয়সা দিতেন, তাহাতেই খরচ চলিত। এই বৎসরই বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্য হন; ইহার অল্পকাল পরে ৺অক্ষয়কুমার দত্তও এই সভার সভ্য হইলেন। ১৭৬৩ শকে এই সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হয়। ১৭৬৫ শকে এই সম্মিলিত সভাদ্বয়ের কার্য্যবিবরণীতে ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ও অপর ১৯ জন সভ্য এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন; আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। রাজা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবাদ প্রচার করিতেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মসমাজে দ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সময়ে পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য আদেশ করেন। বিষয়কর্ম্মে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মন ছিল না। এই শক হইতে ১৭৬৭ শক মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ৩।৪ জন পণ্ডিতকে নিজ ব্যয়ে কাশীধামে প্রেরণ করিয়া বেদ শিক্ষা করাইয়া আনিলেন। এই সময়ে ডফ্ সাহেব হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার করিতেছিলেন; কেহ কেহ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা করেন; ডফের যুক্তি তর্ক ব্যর্থ হয়, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের বেগ প্রশমিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব এই কার্য্যের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, “He is the defender of the national religion” ইনিই জাতীয় ধর্ম্মের রক্ষক। বিখ্যাত সাহিত্যজ্ঞ ও চিন্তাশীল লেখক ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের সহায় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা দুইখণ্ডে বিভক্ত:—উপনিষদখণ্ড ও অনুশাসন খণ্ড। ১৭৬৯ শকে তিনি পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ঋগ্বেদ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করেন; এই অনুবাদ শেষ হয় নাই।

১৭৭৭ শকে (১৮৫৫ খৃঃ) দেবেন্দ্রনাথ সংসারের গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া নিবিষ্টমনে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিলেন; তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের এক নিভৃত স্থানে যাইয়া যোগমগ্ন হইলেন; তাঁহার বাড়ীর লোকেরাও জানিতেন না তিনি কোথায় ছিলেন। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের আন্দোলনে দেশ তোলপাড় হইতেছিল। এই আন্দোলনের তরঙ্গ হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া যোগাসনাসীন দেবেন্দ্রনাথকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ১৭৮০ শকে (১৮৫৮ খৃঃ) বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এই নিয়োগের বিষয় তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। এই সময়ে ৺কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন; এই বিবাহে হিন্দু সমাজে প্রচলিত পৌত্তলিক আচার রীতিনীতি অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্র তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশনে “প্রধান আচার্য্য” পদে নিযুক্ত হন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ তিনি কেশবচন্দ্রকে “ব্রহ্মানন্দ” উপাধি দিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। ইহার কিছুকাল পরে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্র নব্য ব্রাহ্মদের নেতা; তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, উপবীত ধারণ করিয়া কোন ব্রাহ্মণ আচার্য্যের কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ এ

মতের বিরোধী। এই উপবীত অবলম্বনে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বিরোধ হয়। ১৭৮৬ শকে (১৮৬৪ খৃঃ) দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনকে সমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বলেন; ইহাতে বিরোধ আরও ঘনীভূত হয়। ১৭৮৭ শকে কেশবপ্রমুখ নব্য সম্প্রদায় উপবীতধারীদিগকে আচার্য্যপদ হইতে অবসৃত করিবার অভিপ্রায়ে প্রধান উপাচার্য্যের হস্তে এক আবেদন পত্র দেন; ইহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, তিনি উপবীতধারী বা উপবীতত্যাগী কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই মত নব্য সম্প্রদায়ের প্রীতিকর না হওয়াতে তাহারা ১৭৮৯ শকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন. পৃথক্ সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথ নব্যদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া হৃদয়ে শান্তিলাভাশায় অবিলম্বে পুনরায় হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে গমনপূর্ব্বক যোগরত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি বীরভূম জেলায় বোলপুর নামক স্থানে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। এই আশ্রম ১৮০৯ শকের ফাল্গুন মাসে সাধারণের ব্যবহারার্থ অর্পণ করেন। এই আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তিও দান করেন। এখন এই আশ্রমে প্রতিবৎসর ৭ই পৌষ তারিখে দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণ দিবসে এক উৎসব হইয়া থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপদেশপূর্ণ বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে এই গ্রন্থসমূহের এক তালিকা প্রদত্ত হইল। (১) আত্মতত্ত্ববিদ্যা, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, (৩) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, (৪) পরলোক ও মুক্তি। এতদ্ব্যতীত "প্রবন্ধ সংগ্রহ" "স্তুতিমালা" নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে।

দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। গীতা, উপনিষদ্ ও হাফেজের কবিতাগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনায় মগ্ন হইতেন, এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় দুইঘণ্টা অতিবাহিত হইত। তাহার পর সাংসারিক কর্ম্ম সম্বন্ধে যদি তাঁহার কোন আদেশ অপেক্ষা করিত, তবে তাহা দিতেন এবং মধ্যাহ্নে অন্ন, দুগ্ধ ও ফল আহার করিয়া কিছুকাল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তৎপর অপরাহ্ণ ৪টার সময় নৌকাযোগে নদীবক্ষে এদিক ওদিক যাইতেন; তখন তাঁহাকে প্রায়শঃই নীরবে ধ্যানমগ্ন দেখা যাইত। অতঃপর সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা সমাপনপূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছিল, তাঁহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে দুগ্ধই তাঁহার প্রধান আহার্য্য বস্তু ছিল। তিনি সংসারে থাকিয়াও যোগী; বিষয় কখনও তাঁহাকে কবলিত করিতে পারে নাই। পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর District Charitable Societyতে একলক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু দান করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দেবেন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিতার এই প্রতিশ্রুত অর্থদান করিয়া সত্যরক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার আট পুত্র ও পাঁচকন্যা। পুত্রগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পেন্সনপ্রাপ্ত জজ এবং অপর পুত্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের বিখ্যাত কবি। তিনি ১৮২৭ শকের ৬ই মাঘ (ইংরেজী ১৯০৫ খৃঃ জানুয়ারী, বঙ্গাব্দ ১৩১১ সনের ৬ই মাঘ) পরলোক গমন করেন।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী—ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে ইংরেজী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালের) ৯ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণপ্রাণ গাঙ্গুলী ও মাতা উদয়তারা দেবী। ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত কালীপাড়া উচ্চইংরেজী স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কোন কোন মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারি করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান; উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও তিনি বাঙ্গালাতে সুলেখক ও সুকবি ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগো জাগো গো ভগিনী
হও বীর জায়া বীর প্রসবিনী।

গানটী বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে বর্ত্তমান। তিনি স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গমন করিয়া "অবলাবান্ধব" নামে এক মাসিকপত্র বাহির করেন। তিনি "কবিগাথা"; "কবিতা-কুসুম" নামক দুইখানি কবিতাপুস্তক এবং "সুরুচির কুটীর" নামে একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস রচনা করেন। ইঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বিখ্যাত ভারতসভা স্থাপিত হয়। আজীবন তিনি এই সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মমত গ্রহণ করেন। তিনি বি, এ, উপাধিধারিণী কাদম্বিনী বসুজাকে বিবাহ করেন। এই রমণী কলিকাতার মেডিকেল কলেজে কিয়ৎকাল শিক্ষালাভ করিয়া বিলাত যান এবং তথায় স্কটলণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন (বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সনের) ১৪ই আষাঢ় দ্বারকানাথ দেহত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সামাজিক আচারে হিন্দু সমাজ হইতে চ্যুত হইয়া "পিরালী" নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদি নিবাস যশোহর জিলার কোন গণ্ড গ্রাম। এই বংশে জয়রাম নামে এক ব্যক্তি জ্ঞাতিবিরোধে জন্ম স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং এখানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন। জয়রামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্বারকানাথ ১৭১৬ শকে (১৭৯৪ খৃঃ বা বাঙ্গালাব্দে) জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য কালে ইনি স্কুলে ইংরেজী অধ্যয়ন করেন এবং এক ইংরেজ পাদ্রির নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ রাধানাথ বিদেশে কর্ম্ম করাতে পিতার মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার ইঁহার উপর পতিত হয়। বিষয়ের তত্ত্বাবধান করাতে জমিদারী সংক্রান্ত কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা জন্মে। তিনি আইন পড়িয়া মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। মোক্তারী ব্যবসাতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হয় এবং অল্পকাল মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহার পর ৯ বৎসর কাল তিনি নিমকের (লবণের) কালেক্টরের সেরেস্তাদারি করিয়া তৎপর নিমক বিভাগের দেওয়ানের পদ লাভ করেন। অনন্তর তিনি অহিফেন বিভাগের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি কার ও প্রিন্‌সেপ নামক দুই ইংরেজকে সঙ্গে করিয়া ১৮৩৪ খৃঃ "কারঠাকুর" নামে এক কোম্পানি খোলেন। এই বাঙ্গালী কোম্পানি ইংরেজের আদর্শে নানা স্থানে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করেন। ইহার পর আরও ৪ জন সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" নামে ১৮২৯ খৃঃ এক তেজারতি কারবার খোলেন। এই ব্যবসায়ে দ্বারকানাথের এত প্রতিপত্তি হইল যে, বড়লাট লর্ড অক্‌লণ্ড সর্ব্বদা ইঁহাকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিতেন। ১৮৪২ খৃঃ ৯ই জানুয়ারী তিনি প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন। রোমের পোপ তাঁহাকে রোমনগরে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া এক ভোজ দেন, এই ভোজে তাঁহাকে প্রুসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডেরিকের (বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাটের পিতা) সহিত পরিচিত করেন। ১০ই জুন তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া নানা স্থানে সসম্মানে নিমন্ত্রিত হন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত বকিংহাম রাজপ্রাসাদে একত্র ভোজন করেন। ইহার পর মহারাণী স্বয়ং ২।৩ দিন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত পরিচিত করেন। পরে তিনি ফ্রান্সের রাজধানী হইয়া ফ্রান্সের রাজপুত্রের সহিত আলাপ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮৪৫ খৃঃ মার্চ্চ মাসে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। আর তিনি দেশে ফিরিতে পারিলেন না; রোগগ্রস্ত হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ ১লা আগষ্ট লণ্ডন সহরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শব লণ্ডনের ক প্রসিদ্ধ সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—সোমপ্রকাশনামক সাপ্তাহিক পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক। এই পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া তিনি বঙ্গে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৫ বৎসর কাল তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা ১৭৮০ শকে (১৮৫৮ খৃঃ) প্রথম প্রকাশিত হয় এবং লেখার মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করে। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃঃ) কলিকাতার দক্ষিণ চিঙ্গড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও টোলের পণ্ডিত। দ্বারকানাথ ১৮৩২ খৃঃ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করেন এবং তথায় উপাধি

লাভ করিয়া এই কলেজেই ব্যাকরণ ও সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলেজের অধ্যক্ষ, তখন তিনি তাঁহার সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ ২২শে আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তক :—"নীতিসার" দুইভাগ, রোমরাজ্যের ইতিহাস, বিশ্বেশ্বর বিলাপ কাব্য।

দ্বারকানাথ মিত্র—(জজ) এই খ্যাতনামা ব্যক্তি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ। হুগলী জেলায় আগুনসী গ্রামে ১৮৩৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরচন্দ্র মিত্র। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার ৩ ভাই, ৪ ভগিনী ছিল। ইঁহার পিতা হুগলীতে মোক্তার ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কোন বিখ্যাত লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই; দ্বারকানাথই স্বীয় বংশ বিখ্যাত করিয়াছিলেন। তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন; হরচন্দ্র সামান্য অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন; মোক্তারীর আয়ে তাঁহার সংসার একপ্রকার চলিত। দ্বারকানাথ সপ্তম বর্ষ বয়সে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৪৭ খৃঃ তিনি মাসিক ৮৲ আট টাকা জুনিয়র স্কলারসিপ পান এবং ১৮৪৯ খৃঃ তিনি মাসিক ১৮৲ হারে "রাণী কাত্যায়নী বৃত্তি" লাভ করেন। ১৮৫০ খৃঃ তিনি "সিনিয়র স্কলারসিপ" পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫১ খৃঃ তিনি কলেজের পরীক্ষায় মাসিক ৪০৲ হারে বৃত্তি পান। ১৮৫১ খৃঃ একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি ইংরেজীর ন্যায় গণিতশাস্ত্রেও বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতা পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে ১২০৲ টাকা বেতনে কার্য্যগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; পিতার মৃত্যুতে আর্থিক দুরবস্থা গতিকে তিনি আইন পড়িতে অসমর্থ হইয়া উক্ত কেরাণীগিরী চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার আইন পড়িতে বলবতী ইচ্ছা থাকাতে তিনি কেরাণীগিরী পরিত্যাগ করিয়া আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৫৭ খৃঃ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। প্রতিভাবলে অত্যল্পকাল মধ্যেই ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। বিচারকগণ সওয়াল জবাব শুনিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১৮৬২ সনে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে দ্বারকানাথের ব্যবসা আরও জাঁকিয়া উঠে। তিনি স্বাধীনচিত্ত, নির্ভীক ছিলেন এবং দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করিতে সর্ব্বদাই সোৎসুক ছিলেন। ১৮৬৫ খৃঃ হাইকোর্টে ১৫ জন জজের নিকট এক কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়; এই মোকদ্দমায় একপক্ষে জমিদার ও ইংরেজ নীলকরগণ অপর পক্ষে প্রজাগণ। দ্বারকানাথ প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বহুদিন প্রত্যহ ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সওয়াল জবাবের পর মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। এই মোকদ্দমায় জজগণ দ্বারকানাথের ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে হাইকোর্টে গবর্ণমেণ্ট উকীল নিযুক্ত করেন। ১৮৬৭ খৃঃ ৬ই জুন জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে গবর্ণমেণ্ট দ্বারকানাথকে তাঁহার পদে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেন। তিনি ৬ বৎসর এই পদে আসীন ছিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহার একবার ওলাউঠা পীড়া হয়, কিন্তু সৌভাগ্যগতিকে সেবার রক্ষা পান। ১৮৭২ খৃঃ তাঁহার ডেঙ্গু জ্বর হয়; ইহা হইতে সারিয়া উঠেন, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অন্যবিধ গ্লানি রহিয়া গেল। ১৮৭৩ খৃঃ তাঁহার গলায় ঘা (ক্যান্সার) হইল; ইহাতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়। বহুদিন গলার ঘাতে কষ্ট পাইয়া ১৮৭৪ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৪০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। হাইকোর্টের প্রধান জজ দ্বারকানাথের বিচারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বন্ধুগণের সহিত সর্ব্বদাই সদ্ব্যবহার করিতেন; তাঁহার গর্ব্ব মাত্রই ছিল না। হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার একটী মুদ্রা দোষ ছিল। আদালতে বক্তৃতার সময় তিনি একটী পেন মোচড়াইতেন। যতই তাঁহার বক্তৃতার গাঢ়তা প্রকাশ হইত, ততই দেখা যাইত তিনি পেনটী জোড়ে মোচড়াইতেছেন। মোচড়াইতে মোচড়াইতে পেনটী ভাঙ্গিয়া গেলে, তাঁহার কেরাণী আর একটী পেন হাতে দিত। কেরাণী এক তাড়া পেন লইয়াই তাঁহার পাশে বসিয়া থাকিত। জষ্টিস মিত্র ওকালতি আরম্ভের পূর্ব্বে বিবাহ করেন; এই স্ত্রী ১৮৭১ খৃঃ দুইটী সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর আবার তিনি বিবাহ করেন।

জজ দ্বারকানাথ মিত্র যে সমুদয় মোকদ্দমায় বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটী মোকদ্দমার উল্লেখ করা যাইতেছে। একটী পতিতা রমণীর বিষয়াধিকার সম্বন্ধে—এই মোকদ্দমায় বাদী মণিরাম কলিতা। প্রতিবাদিনী কেরী কলিতানী (বিধবা)। নিবাস গোলাঘাট, আসাম। বিচার্য্য বিষয়—কেরি কলিতানী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ার পর চরিত্রভ্রষ্টা হন। এই অবস্থায় তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইবেন কি না। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে জজ দ্বারকানাথ মিত্র কলিতানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, দুইজন ইংরেজ জজ দ্বারকানাথের সমর্থন করেন; কিন্তু প্রধান বিচারপতি ও অপর ছয় জন জজ কলিতানীর পক্ষে নিষ্পত্তি করায় কেরী কলিতানীর জয় হয়। বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলও কলিতানীর পক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। এই নিষ্পত্তিতে স্থির হইল যে কোন বিধবা একবার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলে পর তাহার চরিত্রদোষ সম্পত্তিচ্যুতির কারণ হইবে না। এই মোকদ্দমায় জজ মিত্র মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রের মত সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করেন যে, কুলটা বিধবা নারী স্বামীর সম্পত্তি হারাইবে। জজ মিত্র এই মোকদ্দমায় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয়—কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে হিন্দুশাস্ত্র মতে ভাগিনেয় মাতুলের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারে কিনা। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে ইহার বিচার হয়। জজ মিত্র এই মোকদ্দমা বিচার করিতে গিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা গবেষণাপূর্ণ। তিনি ভাগিনেয়কে মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেস্ পিকক্ (Sir Barnes Peacock) এবং অন্যান্য জজগণ জজ মিত্রের সহিত এক হইয়া মোকদ্দমা মীমাংসা করেন। বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলেও জজ মিত্রের নিষ্পত্তিই স্থির থাকে।

দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ (কবিরত্ন, মহামহোপাধ্যায়)—এই বিখ্যাত কবিরাজ ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া গ্রামে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারা স্বীয় স্বীয় টোলে সংস্কৃত অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্র মহম্মদপুরের বিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দ্বারকানাথ পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামে আসিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট স্মৃতি, বেদান্ত ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় গমন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। পাণ্ডিত্যে ও সুচিকিৎসায় তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের মহারাণার পুত্রের চিকিৎসার্থ ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উদয়পুরে প্রেরণ করেন। উক্ত মহারাণা বড়লাট সাহেবকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমিত হইবে কবিরাজ দ্বারকানাথ চিকিৎসাবিদ্যায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন এবং উপার্জ্জিত অর্থ তিনি সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি দানকার্য্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার কবিতা রচনা করিবারও শক্তি ছিল; রচিত কবিতাগুলি বেশ মধুর হইত। ১৮৩০ শকের ২৯শে মাঘ (১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী) বৃহস্পতিবার এই বিখ্যাত কবিরাজ কলিকাতায় স্বীয়ভবনে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন।



ধনঞ্জয়—ইনি ধারাধিপতি মুঞ্জরাজের সভাসদ্ ছিলেন। ইনি "দশরূপক" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইতি ৯৫০ শকে (১০২৮ খৃঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। (মুঞ্জ ও ভোজদেব দেখ)

ধনিক—ইনি "কাব্যনির্ণয়" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। ইঁহার পিতা বিষ্ণু একজন কবি ছিলেন। ইনি ধনঞ্জয় কৃত "দশরূপক" নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন; এই টীকার নাম "দশরূপকাবলোক"।

ধন্বন্তরি—(১) উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। (ক্ষপণক দেখ)

ধন্যমাণিক্য—ত্রিপুরার রাজা। ইনি স্বীয় ধর্ম্মপত্নী রাণী কমলাদেবীর নামে কৈলাসগড়ে (বর্ত্তমান কস্‌বায়) কমলাসাগরনামে এক বৃহৎ দীঘি খনন করান।

ধর্ম্মদাস—"বিদগ্ধমুখমণ্ডন" নামক সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় কবি বুদ্ধদেবের স্তুতি করিয়াছেন। কবিগণ নির্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্তির জন্য স্ব স্ব গ্রন্থের প্রারম্ভে অভীষ্ট দেবতার স্তুতি করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয় যে, এই কবি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। ইহাতে অনুমান হয় ইনি কবি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ধর্ম্মমাণিক্য—ত্রিপুরার রাজা। ইনি কুমিল্লা সহরে ধর্ম্মসাগর নামে এক দীঘি খনন করান।

ধাবক—একজন প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি কান্যকুব্জাধিপতি রাজা শ্রীহর্ষের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি রত্নাবলী নাটিকা রচনা করিয়া রাজা শ্রীহর্ষের নামে প্রচারপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বহুধন লাভ করেন। শ্রীহর্ষের ন্যায় একজন দিগ্বিজয়ী রাজা নাটকাদি লিখিবেন ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কাব্য প্রকাশের টীকাও উপরি উক্ত কথাই সমর্থন করে। কাব্য প্রকাশের টীকায় টীকাকার বৈদ্যনাথ লিখিতেছেন—

"শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞো নাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্যকবির্বহুধনং লেভে ইতি প্রসিদ্ধম্।"

শ্রীহর্ষ নামক রাজার নামে রত্নাবলী নাটিকা রচনা করিয়া ধাবকনামা কবি বহুধন লাভ করিয়াছিলেন। কাব্য প্রকাশকার লিখিতেছেন, "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিবধনম্।" শ্রীহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবকাদির ধন লাভ হইয়াছিল।

ধাবকের অন্য কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায় না; তিনি কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

ধোয়ী—ইনি "পবন দূত" নামক কাব্যের রচয়িতা। ইনি জয়দেবের সমসাময়িক লোক।

ধ্যানসিংহ—পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের উজীর। ইনি রণজিতের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ধ্যানসিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোলাপসিংহ ও কনিষ্ঠ সুচেত সিংহ। তিন ভ্রাতাই রণজিতের প্রিয় ছিলেন এবং তিন জনকেই রণজিৎ "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর রণজিতের আদেশে রাজকীয় চিঠি পত্রাদিতে ধ্যানসিংহকে "রাজা কল্যাণ বাহাদুর" বলিয়া সম্মানিত করা হয়। ১৮৩১ খৃঃ রণজিৎ পীড়িত হইলেন; তিনি রোগশয্যায় পুত্র খড়্গসিংহকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া এবং ধ্যানসিংহকে তাহার শিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত হন। খড়্গসিংহ রণজিতের সিংহাসনের অনুপযুক্ত ছিলেন। তিনি কুলোকের পরামর্শে ধ্যানসিংহকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন; অবশেষে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। অনতিবিলম্বে খড়্গসিংহ বন্দীভূত হইয়া নির্জ্জন কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। তদীয় নাবালক পুত্র নবনেহালসিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যে দিন খড়্গসিংহ কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন, সেই দিনই নবনেহাল সিংহের মস্তকে তোরণ দ্বার পতিত হয় এবং অবিলম্বে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। রাণী চাঁদকুমারী এখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মন্ত্রী ধ্যানসিংহের বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহ রাণী চাঁদকুমারীকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় রাণী চাঁদকুমারী পদচ্যুত হন এবং রণজিতের এক রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সেরসিংহ সিংহাসনে স্থাপিত হন। সেরসিংহ রাণী চাঁদকুমারীর পাণিগ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাণী পতিপুত্রহীনা হইলেও কিছুতেই সেরসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সিংহাসনের অধিকার লইয়া রাণী চাঁদকুমারী ও সেরসিংহে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল; অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে রাণী চাঁদকুমারী বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা আয়ের এক জায়গীর পাইয়া সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করেন এবং সেরসিংহ রাণী চাঁদকুমারীকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাণী লাহোরে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। সন্ধি হইয়া গেলেও শত্রুতা গেল না। ধ্যানসিংহ ও সেরসিংহ রাণীর প্রাণনাশের চেষ্টায় রহিলেন। ১৮৪২ খৃঃ রাজা

সেরসিংহ ও মন্ত্রী ধ্যানসিংহ উৎকোচ দ্বারা রাণী চাঁদকুমারীর ক্রীতদাসীদিগকে বশীভূত করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা রাণীর প্রাণ বিনাশ সম্পাদন করেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা সেরসিংহ ও মন্ত্রী ধ্যানসিংহে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সিদ্ধবালা সর্দ্দারগণ পঞ্জাবে অতি সম্ভ্রান্ত শিখ পরিবারের অন্তর্গত। তাঁহারা রণজিৎ সিংহের জ্ঞাতি। তাঁহারা রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সেরসিংহকে হেয় জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট থাকিতেন না। ধ্যানসিংহ সেরসিংহের মন্ত্রী, এজন্য তাঁহারা ধ্যানসিংহের প্রতিও বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রণজিতের পুত্রবধূ রাণী চাঁদকুমারীর হত্যাব্যাপারে এই উভয় ব্যক্তিই লিপ্ত। অতএব তাঁহারা এই উভয়ের প্রাণ সংহার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সিদ্ধবালা সর্দ্দারগণের মধ্যে সর্দ্দার অজিত সিংহ অত্যন্ত চতুর ও সাহসী। অজিত এক দিবস ৩০০ শত অশ্বারোহী ও ২৫০ পদাতিক সৈন্য লইয়া উভয়কে পৃথক পৃথক স্থানে সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক নিধন করেন। এই আক্রমণে রাজা সেরসিংহের দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রও লহনা সিংহের তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। অজিতের ইঙ্গিতে তাঁহার অনুচরের বন্দুকের গুলিতে ধ্যানসিংহ প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের তরবারির আঘাতে দেহ ভিন্ন হয়। ধ্যানসিংহের কয়েকজন অনুচর অজিতের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু ইহারা সকলে অজিতের সৈন্য কর্ত্তৃক হত হইল। (ইতিহাস)

ন

নকিব খাঁ—মোগল সম্রাট আকবরের প্রিয় বন্ধু। সম্রাট ইঁহাকে নয়শতী মনসবদার পদে অধিষ্ঠিত করেন; সম্রাট জাহাঁগীরের সময়ে ইনি ১৫ শতী মনসবদার হন। সম্রাট আকবর উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া হিন্দুর মহাভারত পারস্য ভাষায় অনূদিত করেন। নকিব খাঁ এই অনুবাদ কার্য্যে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। নকিব খাঁর প্রকৃত নাম মীর গিয়াসউদ্দিন আলী। ইঁহার পিতার নাম মীর আবতুল লতিফ। আবতুল লতিফ সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং আকবরের রাজত্বের ২য় বর্ষে তাঁহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ পারস্যের অন্তর্গত কোয়াজবিন নামক স্থানে বাস করিতেন। ইনি ১৬২৩ খৃঃ পরলোক গমন করেন।

নগেন্দ্র নাথ ঘোষ—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের এক জন প্রধান পুরুষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টার ছিলেন। এই ব্যবসায় ব্যতীত তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইণ্ডিয়ান নেশন নামক একখানা ইংরেজী পত্রিকা তিনি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় রচিত কৃষ্ণদাস পালের জীবনী একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি প্রতিভাবান্, প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ও শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ দক্ষ পুরুষ ছিলেন।

নন্দ—মগধের রাজা। এই নামে ৯ জন রাজা পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নন্দগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্ব্বত্র মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মৎস্যপুরাণে নন্দের জন্মবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই সকল পুরাণেই লিখিত আছে যে, নন্দ এক শূদ্রার গর্ভসম্ভূত ও তাঁহার পিতার নাম মহানন্দি। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারগণ নন্দের জন্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, নন্দ পাটলীপুত্র নগরস্থ এক দিবাকীর্ত্তির ঔরসে ও এক বারবনিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এক উপাধ্যায় নন্দের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। পাটলীপুত্রের অপুত্রক রাজা উদায়ী গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, মন্ত্রিগণ রাজহস্তী, অশ্ব, ছত্র, কুম্ভ ও চামর এই পঞ্চ অভিষেক সামগ্রী লইয়া রাজপথে গমনপূর্ব্বক কাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় নন্দ ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। রাজহস্তী নন্দকে দেখিয়া কুম্ভস্থিত জলে নন্দের অভিষেক সম্পাদন করিল এবং তাঁহাকে আপনার পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল; রাজ অশ্ব আনন্দে হ্রেষারব করিয়া উঠিল এবং চারিদিকে মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল। মন্ত্রিগণ এই ব্যাপার দেখিয়া নন্দকেই সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। নন্দ ৪৬৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। এই নন্দের বংশে ক্রমে

সাতজন নন্দ রাজা হইয়াছিলেন। কল্পক নামে এক অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত নন্দের মন্ত্রী ছিলেন। কল্পকের পুত্রগণ ক্রমে নন্দরাজগণের মন্ত্রী হইলেন। অবশেষে নবম নন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কল্পকের পুত্র শকটার এই নবম নন্দের মন্ত্রিত্ব করেন। বিখ্যাত বররুচি এই নবম নন্দের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত চাণক্য এই নন্দবংশের শেষ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ কবি বিশাখদত্ত এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া স্বীয় নাটক (মুদ্রারাক্ষস) রচনা করিয়াছিলেন। (চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য দেখ)।

নন্দকুমার—(মহারাজ) ইনি কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষের বংশধর। আদি শূর পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে দক্ষ অন্যতম। নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলায় জরুল গ্রামে বাস করিতেন। নন্দকুমারের প্রপিতামহ রাম গোপাল রায় ও পিতামহ চণ্ডীচরণ রায়। চণ্ডীচরণের দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গর্ভে পদ্মনাভ রায় জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্মনাভের দুই কন্যা ও একপুত্র। কন্যাদ্বয় জোষ্ঠা, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়া; পুত্র নন্দকুমার। প্রপিতামহ রামগোপাল কোন কারণে জরুল গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় ভদ্রপুর গ্রামে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। নন্দকুমারের কোন পূর্ব্বপুরুষ পীতমুণ্ডী গ্রামে বাস করিতেন। এজন্য এই বংশীয়দিগকে পীতমুণ্ডী ব্রাহ্মণ বলা হইত। পীতমুণ্ডীরা প্রথমে গৌণ কুলীন পরে শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রায় নামে খ্যাত হন। নন্দকুমার বাঙ্গালার বিখ্যাত নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর সময়ে আমিনী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, অবশেষে দেওয়ানের বিরাগভাজন হইয়া পদচ্যুত হন। আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর নন্দকুমার সিরাজদ্দৌলার নিকট চাকুরীর জন্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কোন কারণে সিরাজ নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ক্রোধ প্রশমিত হইলে তাঁহাকে হুগলীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। ইংরেজের সহিত সংঘর্ষে সিরাজের পতন হইলে নন্দকুমার ক্লাইবের মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। এই পদে বর্ত্তমান শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণদেব আসীন ছিলেন। নবকৃষ্ণ সিরাজের ধনাগারে অতুল অর্থরাশি পাইয়া মুন্সীগিরি পরিত্যাগ করেন। ক্লাইব এইপদে নন্দকুমারকে নিযুক্ত করেন। ক্লাইব বিলাত চলিয়া গেলে ভেরেলষ্ট সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর হন। ইনি নন্দকুমারকে প্রথমে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন কিন্তু পরে কোন কারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হন। ভেরেলষ্টের পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার সাহেব গবর্ণর হন; ইনিও ৩ বৎসর পরে ১৭৭২ খৃঃ পদত্যাগ করিয়া বিলাতে চলিয়া যান। তৎপর ওয়ারেণ হেষ্টিংশ গবর্ণর হন। ইহার বিষ নয়নে পতিত হইয়া নন্দকুমারের প্রাণান্ত ঘটে। নানা চক্রান্তে জড়িত হইয়া নন্দকুমার এক জাল মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত হন এবং জজ সার ইলা ইজা ইম্পের বিচারে ইঁহার ফাঁসী হয়।

নন্দকুমার মৃত্যুকালে ৫২ লক্ষ টাকা নগদ ও ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র গুরুদাসের অকাল মৃত্যু ঘটে; তদীয় পত্নী রাণী জগদম্বা সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের একমাত্র দৌহিত্র (জোষ্ঠাকন্যা শ্যাম মণির পুত্র) রাজা মহানন্দ মাতুলানীর নিকট হইতে বিষয় হস্তগত করেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা মহানন্দের বংশধর মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটায় বাস করিতেছেন। (ইতিহাস)।

নবকৃষ্ণ (মহারাজ)—কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাঙ্গালার গবর্ণর হেষ্টিংসের সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন এবং আনুমানিক ১৭৩২ খৃঃ মুড়াগাছা গ্রামে পৈতৃক বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম রামচরণ দেব। রামচরণ মুড়াগাছার বাস উঠাইয়া গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুরে (বর্ত্তমান কলিকাতা) আসিয়া বাস করেন। রামচরণ নবাব সরকারে হিজলী, তমলুক প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের নিমক মহালের কর সংগ্রাহক ছিলেন। মৃত্যুর পর মীরজাফর যখন নবাব হন তখন দরবারে সিরাজদ্দৌলার মুন্সী নবকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ক্লাইবের অনুরোধে দিল্লীর বাদসাহ নবকৃষ্ণকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দান করেন এবং ৫ হাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত করিয়া একজন সম্ভ্রান্ত ওমরাহ শ্রেণীতে গণ্য করেন। ক্লাইবের পর ভেরেলষ্টও নবকৃষ্ণকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। ১৭৭২ খৃঃ নবকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু ওয়ারেণ হেষ্টিংশ গবর্ণর হন এবং ইহারই অনুগ্রহে নবকৃষ্ণ প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। এই সময়

হইতে ১৩ বৎসর কাল নবকৃষ্ণ প্রবল ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। বৰ্দ্ধমানাধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে ছিলেন; এই কার্য্যের জন্য রাজা নবকৃষ্ণ বৰ্দ্ধমান রাজসরকার হইতে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাইতেন (১৭৮০ খৃঃ)। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর (বঙ্গাব্দ ১২০৪ সন) মহারাজ নবকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহারও পণ্ডিতসভা ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেহালা হইতে কুল্‌পীগ্রাম পর্য্যন্ত ৩২ মাইল দীর্ঘ একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন; ইহা এখন "রাজার জাঙ্গাল" নামে খ্যাত। কথিত আছে যে, রাজা নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ছিলেন। নবকৃষ্ণ কে একে সাতটী বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রথমে তাঁহার পুত্র সন্তান জন্মে নাই; এজন্য তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একটী পুত্রকে (গোপীমোহন দেবকে) পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। দত্তক গ্রহণের পর মহারাজ নবকৃষ্ণের ৪র্থ পত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে, ইহার নাম মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। মহারাজ রাজকৃষ্ণের জন্মের দুইবৎসর পর ১৭৮৪ খৃঃ গোপীমোহনের এক পুত্র জন্মে; এই পুত্রের নাম রাজা রাধাকান্ত দেব।

নবীন চন্দ্র সেন (কবি)—১৮৩১ শকে (বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সালে, ইং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে) ১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বঙ্গ সাহিত্যের আকাশ হইতে এই উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। কবি নবীন চন্দ্র ১৭৬৮ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৫৩ সালে) ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রামের রাউজান থানার এলাকায় অবস্থিত নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গোপীমোহন রায় প্রথমে চট্টগ্রামের জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন, পরে উন্নতিলাভ করিয়া মুন্সেফ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বেশী দিন মুন্সেফী করেন নাই। তিনি মুন্সেফী পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং এই ব্যবসায়ে বিস্তর ধন উপার্জ্জন করেন। নবীন চন্দ্রের মাতার নাম রাজরাজেশ্বরী। মাতা লেখাপড়া জানিতেন না; তিনি ১০ এর অধিক গণিতে পারিতেন না। নবীন চন্দ্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম হইতে এণ্ট্রেন্স ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতা অতিশয় ব্যয়ী ছিলেন; নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি অর্জ্জিত অর্থ নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নবীন চন্দ্র অর্থাভাবে পড়িলেন। নবীনকে গৃহশিক্ষকতা করিয়া বি. এ. পড়িবার ব্যয় চালাইতে হইয়াছিল। দানশীল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নবীনকে অর্থ সাহায্য করিতেন। নবীনের কৌলিক উপাধি "সেন", কিন্তু তাঁহার বংশের সম্মানিত উপাধি "রায়"। নবীনের পূর্ব্বপুরুষগণ "রায়" উপাধিই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু নবীন এই সম্মানিত উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কুলোপাধি "সেন" ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। নবীনচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ হুগলী জিলায় ত্রিবেণী নামক স্থানে বাস করিতেন। শ্যামরায় নামে তাঁহার একজন পূর্ব্ব পুরুষ ঢাকার নবাবের সেনাপতি ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি চট্টগ্রামে এক রাত্রিতে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহাতে কমল (পদ্ম) ভাসাইয়া দেন। লোকে মনে করিল যে, ইহাতে কমল ফুটিয়াছে। তদবধি এই জলাশয় কমলদীঘি নামে খ্যাত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র বাল্যকালে অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন। কে জানিত যে, এই দুষ্ট বালক একদিন বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিবে? তিনি ১৪ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এতন্মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ কাব্যই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এইকাব্য এবং রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ ও অবকাশরঞ্জিনী বঙ্গসাহিত্যের গৌরব রক্ষা করিতেছে। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অবকাশরঞ্জিনী (১ম ভাগ) (২) অবকাশরঞ্জিনী (২য় ভাগ) (৩) পলাশীর যুদ্ধ (৪) রঙ্গমতী (৫) রৈবতক (৬) কুরুক্ষেত্র (৭) প্রভাস (৮) অমিতাভ (৯) ভানুমতী (১০) গীতা (১১) চণ্ডী (১২) প্রবাসের পত্র (১৩) খ্রীষ্ট (১৪) "আমার জীবন" (স্বীয় জীবন চরিত) (১৫) অমৃতাভ।

নরনারায়ণ সিংহ—১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নরনারায়ণ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। (বিশ্বসিংহ দেখ)। তিনি অত্যন্ত রণনিপুণ ও শৌর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজ্যলাভ করিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ, দীর্ঘিকা খনন

ইত্যাদি নানা দেশহিতকর কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। উপর আসাম (Upper Assam) হইতে জলপাইগুড়ী পর্য্যন্ত তন্নির্ম্মিত বিস্তৃত বৃহৎ বর্ত্মের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। দেশে যাহাতে মল্লযুদ্ধের প্রচার হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন; তিনি নিজেও দেহে অসাধারণ শক্তি রাখিতেন; এজন্য তিনি জনসাধারণের নিকট মল্লনারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় দিগ্বিজয় ব্যপদেশে আসামে গমন করেন এবং কোচবিহারপতি নরনারায়ণের সহিত প্রকাশ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া, কামাখ্যা ও অন্যান্য দেবমন্দির ভগ্ন ও ধ্বংস করেন। কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ধ্বংসের অবশেষ এখনও কামাখ্যা পাহাড়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালাপাহাড়ের প্রতিগমনের পর নরনারায়ণ স্বীয় ব্যয়ে কামাখ্যা মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ করেন। মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। বর্ত্তমান কামাখ্যা মন্দির নরনারায়ণের নির্ম্মিত। ১৪৮৭ শকে (ইং ১৫৬৫ খ্রীঃ) এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। কামাখ্যা মন্দিরের মধ্যে মল্লনারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি এখনও রহিয়াছে। তাঁহার রাজত্ব সময়ে আসামের সুবিখ্যাত মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের আবির্ভাব হয়। নরনারায়ণ শঙ্করদেবের শিষ্য হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপুরুষ শঙ্করদেব রাজার গুরু হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ১৫০৬ শকে (ইং ১৫৮৪ খ্রীঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সংকোশ নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ তদীয় পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ শাসন করেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী প্রদেশ (বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও দরঙ্গ জেলা) তদীয় ভ্রাতা শিলারায়ের পুত্র রঘুরায় শাসন করেন। রঘুরায় "বড়সাগর" নামক স্থানে তদীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

নরহরি—(১) আদিশূরের রাজত্বে, কান্যকুব্জ হইতে আনীত ভট্টনারায়ণের বংশে সমুদ্ভূত। ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষষ্ঠপুরুষে নরহরির জন্ম। ইঁহার বংশে বর্ত্তমান নদীয়ার রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তী—ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইঁহার কৃত গ্রন্থ ভক্তি রত্নাকর, নরোত্তম বিলাস ও গৌরচরিত্র চিন্তামণি।

নরহরি সরকার—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ দাস সরকার। নরহরি বর্দ্ধমান জিলায় শ্রীখণ্ডগ্রামে বৈদ্যবংশে ১৪০০ শকে (ইং ১৪৭৮) খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নরহরি পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। যখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গয়াধাম হইতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখন নানাস্থান হইতে ভক্তসাধুগণ তাঁহার নিকট আগমন করেন। এই সমুদয় ভক্তগণের মধ্যে নরহরি অন্যতম। ভক্ত নরহরি শয়নে, স্বপনে, অন্তরে বাহিরে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিতেন। তিনি গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত হইয়া সুললিত স্বরে গাহিয়াছেন—

"সজনি, মরম কহিব কায়
উঠিতে বসিতে, দিগ নেহারিতে,
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল,
সকলি গৌরাঙ্গ ময়।
এ দুটী নয়নে, কত বা হেরিব,
লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমেতে গৌরাঙ্গ
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ
একি মোর হৈল সখি॥

গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ,
গৌরাঙ্গ হেরি যে সদা।
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ চরণ,
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥"

নরহরি শ্রীচৈতন্যের নিত্যসহচর ছিলেন; তিনি সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে থাকিতেন। নরহরি সর্ব্বদাই সখীভাবে আরাধ্য প্রভুর ধ্যান করিতেন এবং অনেক সময় সখীবেশে বাহির হইতেন।

নরহরি অবিবাহিত ছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর ১৪৬২ শকে (ইং ১৫৪০ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তাঁহার তিরোভাব হয়।

নরোত্তম দাস—ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। রামপুর বোয়ালিয়ার নিকটবর্ত্তী খেতরী গ্রামের রাজবংশে ১৪৫৩ শকে মাঘ মাসে ইঁহার জন্ম। শ্রীচৈতন্যের জীবদশায় ইঁহার জন্ম হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রাজপুত্র নরোত্তম প্রায় মূর্চ্ছাগত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র প্রত্যহ এক ব্রাহ্মণের নিকট গৌরচরিত্র শুনিতে যাইতেন। নরোত্তম অল্প বয়সেই গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া পড়েন। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। মাতা রাণী নারায়ণী। খেতরী গ্রামই কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল।

একদা পদ্মানদীতে স্নানের পর তীরে উঠিয়া নরোত্তম গৌরপ্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হন; সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই তিনি নৃত্য করিতেছিলেন। বহুক্ষণ কুমারকে না দেখিয়া রাণী নারায়ণী অস্থির হইলেন। যখন পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা অবগত হইলেন তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় পদ্মার তীরে উপস্থিত হইয়া ভক্তপুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। একদা সুযোগ পাইয়া ষোড়শবর্ষীয় রাজপুত্র নরোত্তম মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থান করেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহার অন্বেষণে নানাস্থানে বহুলোক প্রেরণ করেন। একদল লোক পথিমধ্যে তাঁহাকে ধরে, কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। নরোত্তম পথে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তখন রূপ ও সনাতনের অভাব হইয়াছে; জীবগোস্বামী তখনও জীবিত ছিলেন। নরোত্তম জীবগোস্বামীর পাদমূলে ভক্তি সহকারে পতিত হইলেন; উভয়ে পরিচয় হইল। লোকনাথ গোস্বামীনামে এক ভক্ত সাধুর নিকট নরোত্তম দীক্ষা গ্রহণ করেন। জীবগোস্বামী বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; নরোত্তম জীবের নিকট সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত জীবগোস্বামী নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করেন। নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ নামে দুইজন সতীর্থ পাইয়াছিলেন। জীবগোস্বামী শিষ্যদ্বারা বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য ইচ্ছা করেন এবং গ্রন্থগুলি এক সিন্দুকে পুরিয়া ১৫০৪ শকে ১২ জন পদাতিক সৈন্যসহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থপূর্ণ সিন্দুক দ্বাদশজন রক্ষী সৈন্যবেষ্টিত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল, কিন্তু গোপালপুর নামক স্থানে সন্নবাজ নিযুক্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি অপহৃত হয়। ইহাতে নরোত্তম প্রভৃতি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পান; শ্রীনিবাস গ্রন্থগুলির অনুসন্ধানার্থ গোপালপুরেই রহিলেন; নরোত্তম শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া খেতরীতে আগমন করিলেন। রাজা ও রাণী পুত্রমুখ দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন; খেতরীতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। গৃহে কিছুকাল অবস্থানের পর নরোত্তম নবদ্বীপে গমন করেন; তখন তথায় শ্রীচৈতন্যের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিত ছিলেন। নরোত্তম নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে ও তথা হইতে শ্রীখণ্ডে গমন করেন। শ্রীখণ্ড হইতে কাঁটোয়ায় যান। এই কাঁটোয়াতে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং এই স্থানে তাঁহার কেশের সমাধি হয়। নরোত্তম কাটোয়াতে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। ইহার পর তিনি খেতরীতে প্রত্যাগমন করিয়া তথায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। রাজা কৃষ্ণানন্দের উদ্যোগে মহা আড়ম্বরের সহিত বিগ্রহ স্থাপিত হয়। খেতরী গ্রাম গড়েন হাট

পরগণায় স্থিত বলিয়া নরোত্তমের রচিত গীত "গড়েনহাটী" কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইল। ১৫০৯ শকের কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে নরোত্তমের তিরোভাব হয়। ইনি "প্রার্থনা" "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" "হাটপত্তন" "চৌতিশা পদাবলী" নামক গ্রন্থচতুষ্টয় রচনা করেন।

নাগার্জ্জুন—ইনি সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামে খ্যাত। শককুষণ বংশীয় কণিষ্ক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বারাণসী এবং মগধ পর্য্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনের অভ্যুদয় হয়। বিখ্যাত মহাযান মত এই নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ শূন্যবাদের ভিত্তির উপর তিনি হিন্দু শাস্ত্রীয় যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এ নিমিত্ত প্রাচীন বৌদ্ধমত অপেক্ষা মহাযান মত জনসাধারণের নিকট সমধিক আদৃত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রধান প্রবর্ত্তক। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধতান্ত্রিকতা হইতেই হিন্দুতান্ত্রিকতা বঙ্গদেশে পুষ্টিলাভ করিয়া উহা বঙ্গদেশকে তান্ত্রিকতার স্রোতে প্লাবিত করিয়াছিল।

নানক—শিখদিগের গুরু। ১৪৬৯ খৃঃ পঞ্জাবে ইরাবতী নদীর তীরস্থ তলবন্দী গ্রামে নানক জন্ম গ্রহণ করেন। নানকের পিতার নাম কালু। ৭ বৎসর বয়সের সময় কালু তাহার পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ৯ম বর্ষ বয়সের সময় যখন তাঁহার উপবীত গ্রহণের আয়োজন করা হয় তখন তিনি উপবীত ধারণের আপত্তি করিয়া তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "লৌকিক উপবীত ধারণে কোন ফল নাই, ঈশ্বরের নামই শ্রেষ্ঠ উপবীত।" কালুর সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না, সর্ব্বদাই অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেন। একদা কালু তাহার ভৃত্যের সঙ্গে নানককে কিছু অর্থ দিয়া কোন জিনিষ খরিদ করিতে বাজারে পাঠান, কিন্তু নানক সেই অর্থ অন্নক্লিষ্ট পথিকদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। বাড়ীতে ফিরিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং তদুত্তরে তিনি বলেন যে মনুষ্যের সঙ্গে ক্রয় বিক্রয়ের যে লাভ ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রয় বিক্রয়ে তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ। এই সময়ে নানকের বয়স ১৫শ বর্ষ মাত্র। নানক এক সময়ে কোন দেবমন্দিরের দিকে পা দিয়া শুইয়াছিলেন; ইহা দেখিবামাত্র অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া নানককে ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে নানক উত্তর দেন, "আমি যে দিকে পা দিব সে দিকেইত ঈশ্বরের মন্দির।" এইরূপে দেখা যায় ভাবী শিখগুরুর ধর্ম্মভাব অল্পবয়সেই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল।

নানক বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। কেহ বলেন তিনি কবীরের শিষ্য; আবার কেহ বলেন যে তিনি সৈয়দ হোসেন নামক এক মুসলমান ফকিরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। নানকধর্ম্মের উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মগত, সমাজগত ও জাতিগত বিরোধভঞ্জন। এই বিষয়ে তিনি কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করা, সর্ব্বত্র চির শান্তি বিস্তার করা, সকলকে প্রকৃত ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করা, ইহাই নানক ধর্ম্মের সারকথা। নানক হিন্দুদিগের অবতার মানিতেন এবং মহম্মদকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। নানক সত্যানুসন্ধানের নিমিত্ত কখনও হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে, কখনও বা মুসলমান ফকিরের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। ১৫৩৮ খৃঃ নানকের মৃত্যু হয়।

জীবনের শেষ ৪০ বৎসরকাল তিনি শিষ্যদিগের নিকট গুরু আখ্যা পাইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার মৃত দেহের সমাধি লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যে বিবাদ হয়; অবশেষে স্থির হয় যে, উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হউক। আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখা গেল নানকের শব অন্তর্হিত হইয়াছে। পরিশেষে সেই আবরণ খানার এক অংশ দগ্ধ করা হয় ও অপর অংশ কবর দেওয়া হয়।

নানাসাহেব—বাজীরাও পেশবার দত্তক পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। ১৮১৮ খৃঃ বাজীরাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কাণপুরের প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী বিঠুর গ্রামে গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারিরূপে বাস করেন। তিনি ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন। তিনি এক চরম পত্রে ধুন্ধুপন্থকে উত্তরাধিকারী করেন। ১৮৫১ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী বাজীরাও পেশবার মৃত্যুর পর ধুন্ধুপন্থ ২৭ বৎসর বয়সে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ক্রমে উক্ত

পেশবার গদিতে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বাজীরাওর পরিত্যক্ত নগদ ৩০ লক্ষ টাকা ও বহুমূল্য রত্নাভরণাদি প্রাপ্ত হন। বাজীরাও যখন ধুন্দুপন্থকে দত্তক গ্রহণে অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন গবর্ণমেণ্ট সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ধুন্দুপন্থ পেশবা উপাধি প্রাপ্ত হইবেন ও পৈতৃক বার্ষিক বৃত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। ধুন্দুপন্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক বৃত্তি দাবী করেন। এই সময়ে টমসন্ সাহেব উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাট ও লর্ড ডালহৌসী ভারতের বড়লাট। টমসন্ নানা সাহেবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন এবং ডালহৌসী টমসনের যুক্তি সমর্থন করিলেন। উহারা বলিলেন যে, বাজীরাওকে ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ৮ লক্ষ টাকা হারে বার্ষিক বৃত্তি দিয়াছেন এবং উক্ত পেশবার মৃত্যু সময় ধুন্দুপন্থ প্রচুর অর্থ পাইয়াছেন; ইহাতেই তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ হওয়া উচিত। অতএব তাঁহারা ধুন্দুপন্থের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাই নানা সাহেবের অসন্তোষের কারণ। এই অসন্তোষ ৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত করে। এই অগ্নিতে বহু নরনারী মৃত্যু মুখে পতিত হন। এই সময়ে লর্ড ক্যানিং শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নানা সাহেব এই বিদ্রোহী সিপাহীগণের প্রধান নেতা। কাণপুরেই সর্ব্বাপেক্ষা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। বহু আয়াসে এই সিপাহী বিদ্রোহের দমন হয়। ১৫৫৯ খৃঃ ১৮ই এপ্রেল তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসী হওয়ার পর নানা সাহেব অরণ্য প্রদেশে পলায়ন করেন। বিদ্রোহ দমনের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণের হস্ত হইতে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন।

নিজাম উল্‌ মুলক—চিনকুলিখাঁ দেখ।

নিত্যানন্দ—বঙ্গদেশে কালনার অদূরবর্ত্তী একচাকা (এক চকা) গ্রামে এই বিখ্যাত গোস্বামী প্রভুপাদের জন্ম। পিতা হাড়াই পণ্ডিত; মাতা পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের বাল্যকালের নাম কুবের। অদ্বৈত প্রকাশের মতে ইনি ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মাঘ মাসে শুক্ল ত্রয়োদশীতে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন যে, নিত্যানন্দ বলরামের অবতার। (চৈতন্য ভাগবত)। নিতাই বাল্যকালে অন্যান্য বালকগণের সহিত যে খেলা খেলিতেন তাহাতে গ্রামের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। একদিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল খেলিতে যাইয়া ভেরেণ্ডা বৃক্ষরূপ শেলের আঘাতে নিতাই মূর্চ্ছাপন্ন হন; এই মূর্চ্ছা আঘাত জনিত নহে, চারিদিকের ক্রন্দনের বোল উঠিল, অবশেষে দুইটী বালক গন্ধমাদন্ পর্ব্বত আনয়ন ও লক্ষ্মণের নাসিকাতে ঔষধ প্রয়োগের খেলা খেলিবা মাত্র নিতাইর চৈতন্যোদয় হইল। যথা-সময়ে নিতাই বিদ্যাভ্যাসে রত হন। বিদ্যা শিক্ষায় তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া গ্রামের লোক বিস্মিত হইয়াছিল। ১২ বৎসর বয়সের সময়েই হাড়াই পণ্ডিত পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন; গ্রামের বহু লোক কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন; পদ্মাবতীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু এই আনন্দ অচিরেই বিষাদে পরিণত হইল। ১৪১০ শকে (১৪৮৮ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসে (নিতাইর বয়স তখন ১৫ বৎসর মাত্র) এক উদাসীন হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইলেন। এই অতিথি গমনের সময় হাড়াই পণ্ডিতের নিকট নিতাইকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। উদাসীন অতিথির প্রার্থনায় হাড়াই পণ্ডিত প্রাণসম পুত্রকে ভিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন কোমলপ্রাণা পদ্মাবতীর নিকট হাড়াই পণ্ডিত এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। যেমন পতি তেমনি পত্নী। পত্নী পতির অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন। এইরূপ পিতা মাতার ঘরেই নিতাইর ন্যায় ধার্ম্মিক পুত্রের উদ্ভব সম্ভব। যে মুহূর্ত্তে নিতাই উদাসীনের সহিত গৃহের বাহির হইলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পিতা মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আর সুস্থ হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের সহজ জ্ঞান লুপ্ত হইল; তাঁহারা অবশিষ্ট জীবন উন্মাদের ন্যায় কাটাইলেন। ভাবের আবেশে তাঁহারা নিতাইর দেখা পাইতেন, তাঁহাকে খাওয়াইতেন ও আদর করিতেন; আবার ভাবাবেশে পুত্রকে হারাইয়া বিলাপ করিতে থাকিতেন। যাহা হউক নিতাই আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি যথাশাস্ত্র গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ২০ বৎসর কাল নানা তীর্থ সন্দর্শন করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বর পুরী এই সময় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। ঈশ্বর পুরী নিতাইকে নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইতে উপদেশ দিলেন। ঈশ্বর পুরীর উপদেশানুসারে নিতাই নবদ্বীপাভিমুখে প্রস্থান করেন

এবং ১৪৩০ শকে (১৫০৮ খৃঃ) নিমাইর সহিত মিলিত হন। নিমাইর সহিত নিতাই মিলিত হইয়া এক হইয়া গেলেন; উভয়ের কার্য্য ও ব্যবহারে ভেদ রহিল না। "নিমাই নিতাই দুই ভাই, একে অন্যে ভেদ নাই।" নিমাই ও নিতাই উভয়েই সন্ন্যাসী; তাঁহাদিগকে দেখিয়া গৃহস্থাশ্রমের দিকে লোকের বিরাগ জন্মিল; দলে দলে লোক নিমাই ও নিতাইর স্মরণ লইয়া গৃহত্যাগ করিতে লাগিল। নিমাই দেখিলেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পবিত্র গৃহস্থধর্ম্ম লোপ পাইতে চলিল। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ধর্ম্মস্রোত ফিরাইতে সংকল্প করিলেন। তিনি আত্মসদৃশ সন্ন্যাসী নিতাইকে নীলাচলে অবস্থান কালে দুইটী হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিলেন, "ভাই, জীবের হিতের জন্য তুমি বিবাহ কর, লোকে দেখুক যে বিবাহ করিলেই যে ধর্ম্ম হয় না, তাহা নহে।" যদিও নিতাইর সংসারাশ্রমে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিতাই গৌড়ে ফিরিলেন। ঘটনাক্রমে অম্বিকা নামক স্থানে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হন। এখানে সূর্য্যদাসের কন্যা বসুধা দেবীকে নিতাই বিবাহ করেন এবং বিবাহের পর পত্নীসহ খড়দহে আগমন করিয়া বাস করিতে থাকেন। সূর্য্যদাস সমাজচ্যুতিভয়ে ও আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে প্রথমে বসুধাকে নিতাইর হস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে রোগাক্রান্ত হইয়া বসুধা প্রাণত্যাগ করেন। সূর্য্যদাস আত্মীয়গণসহ কন্যার শব লইয়া শ্মশানে যাইতেছিলেন; পথে উদাসীন নিতাইর সহিত তাহাদের দেখা হয়। নিতাই বলিলেন যে, যদি বসুধাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তবে তিনি তাঁহাকে বাঁচাইবেন। সূর্য্যদাস সম্মত হইলেন; নিতাই বসুধাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন। উদাসী অবধূত নিতাই গৃহী হইলেন। বসুধা দেবীর গর্ভে নিতাইর বীরভদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। খড়দহের গোস্বামীগণ এই বীরভদ্রের বংশসম্ভূত। ১৪৫৬ শকে (১৫৩৪ খৃঃ) নিত্যানন্দ পরলোক গমন করেন।

নিধিরাম কবিচন্দ্র—একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি গোবিন্দলাল ও দাতাকর্ণ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

নিধিরাম গুপ্ত—ইঁহার প্রকৃত নাম রামনিধি। ইনি ১৬৬৩ শকে (১৭৪১ খৃঃ) পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত চাঁপতা নামক স্থানে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় কুমারটুলীতে আসিয়া বাস করেন। নিধুবাবু সরল সুললিত বাঙ্গলায় কবিতা ও গান রচনা করিতেন। নিধুবাবুর গান "নিধুর টপ্পা" নামে পরিচিত। ইঁহার টপ্পাগুলি আদিরসপ্রধান। ১৭৫৬ শকে (১৮৩৭ খৃঃ) ৯৪ বৎসর বয়সে নিধুবাবু দেহত্যাগ করেন।

নুরজাহান বেগম—সম্রাট জাহাঁগীরের প্রিয়তমা মহিষী। ইনি উজীর ইৎমৎ-উদ্দৌলার (মির্জ্জাগয়াস) অপূর্ব্বরূপ লাবণ্যবতী কন্যা। যুবরাজ সলিম ইঁহার রূপে আকৃষ্ট হন। সম্রাট আকবর ইহা অবগত হইয়া এই রমণীকে সের আফগান নামক এক নবাগত পারস্য যুবকের সহিত বিবাহ দেন এবং সম্রাট সের আফগানকে বঙ্গদেশে এক জায়গীর দান করেন এইরূপে সম্রাট এই রমণীকে যুবরাজ সলিমের চক্ষুর অন্তরালে রাখেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর সলিম সাম্রাজ্য লাভ করিয়া সের আফগানের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক এই রমণীকে দিল্লীতে আনয়ন করেন এবং তাঁহার শাসন কালের ৬ষ্ঠ বর্ষে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম মেহরুন্নিসা ছিল; সম্রাট ইঁহাকে বিবাহ করিয়া ইঁহাকে "নুরজাহান" (পৃথিবী আলো) নাম রাখেন। সম্রাটের আদেশে তদানীন্তন স্বর্ণমুদ্রার পৃষ্ঠে সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তির সহিত ইঁহার প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কিত হইত। রাজ্য শাসন ব্যাপারে ইঁহাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্ঞী নুরজাহানের বাক্যই আইনরূপে গৃহীত হইত। ইঁহার পিতা গয়াসমির্জ্জাকে প্রধান উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইৎমৎ-উদ্দৌলা উপাধি দেওয়া হইল। সম্রাটের মৃত্যুর পর ইনি ১৮ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং এই সময়ে তিনি বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন। ১৬৪৫ খ্রীঃ ৭২ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প

পওহারীবাবা—এক জন বিখ্যাত যোগী। ইনি ১৮৪০ খৃঃ জোনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমারপুর বা (গুজি) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অযোধ্যা তেওয়ারী। অযোধ্যা তেওয়ারী পরম নিষ্ঠাবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। অযোধ্যা তেওয়ারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লছমী নারায়ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গাজিপুর জিলায় কুর্থা নামক গ্রামে ভাগীরথীর তীরস্থ এক ক্ষুদ্র বনের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ভজন সাধন ও যোগাভ্যাস করিতেন। পওহারীবাবা পিতার মধ্যম সন্তান। ইঁহার বাল্যকালের পিতৃদত্ত নাম রামভজন দাস। পিতা মাতা ইঁহাকে আদর করিয়া শুক্রাচার্য্য ডাকিতেন। শৈশব অবস্থাতেই বসন্ত রোগে ইঁহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। পঞ্চম বর্ষে ইঁহার পৈতা হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত যোগী লছমী নারায়ণ কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া অন্ধ হন; ইনি পিতার অনুমতিক্রমে জ্যেষ্ঠতাতের সেবার জন্য গমন করেন। তখন ইঁহার বয়স ১০ বৎসর মাত্র। ইনি জ্যেষ্ঠতাতের নিকট থাকিয়া বড় বড় পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন ও হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বেদান্ত দর্শনে তাঁহার অসীম জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ১৮৫৬ খৃঃ যোগী লছমী নারায়ণ স্বর্গে গমন করেন। পিতৃব্যের মৃত্যুতে শোকদগ্ধ হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক শুক্রাচার্য্য নানাতীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি উত্তরে বদরিকাশ্রম হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মধ্যে যত তীর্থ আছে সর্ব্বত্র পদব্রজে গমন করেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শুক্রাচার্য্য অন্নাহার ত্যাগ করেন; কিছু দুগ্ধ ও বিল্ব, অশ্বত্থ ও আমলকী পত্র রস পান করিতেন। এই সময়ে সাধারণ লোকে তাঁহাকে পওহারীবাবা (অর্থাৎ পবন আহারকারী সাধু) বলিয়া ডাকিত। ইহার পরে বৃক্ষ পত্ররসও ত্যাগ করিলেন এবং ৫০টী লঙ্কা বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া তাহা পান করিতেন। এই সময় তিনি এক গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া যোগ সাধন করিতেন। যোগ সাধনের সময় কিছুই পান করিতেন না। যোগ সাধনের পর যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইতেন তখন তাঁহার উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইত। তিনি অঙ্গে ধূলি বা ভস্মলেপন করিতেন না। ইহার পর ১৮৫৮ খৃঃ হইতে তিনি মাসে ২।৩ দিন দ্বার মোচন করিয়া মধ্যে বসিয়া থাকিতেন; দলে দলে লোক সকল তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইত। ইহার পর প্রায় ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বার একেবারেই খোলেন নাই; কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। ১৮৮৮ খৃঃ সহসা তিনি দ্বার খুলিয়া বাহির হন এবং এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভারতের সকল প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানের সন্ন্যাসিগণ এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহার পর যে দ্বার রুদ্ধ করেন তাহা আর খোলেন নাই। বিগত ১৮৯৮ খৃঃ মে মাসে তিনি সর্ব্বাঙ্গ ঘৃতে বিলেপিত করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে যোগাসনে সমাসীন হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন। পরদিন বহুলোক তাঁহার ভস্মাবশিষ্ট অস্থি পবিত্র ভাগীরথী সলিলে নিক্ষেপ করে। যেখানে তিনি দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন তথায় এক সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই যোগীবরের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যোগীবরকে সংসারে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করিলে পর তিনি উত্তরে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে আর এক দল নাককাটা সন্ন্যাসী সৃষ্টি করিতে বল? এই বলিয়া তিনি নাককাটা সন্ন্যাসী দলের কৌতূহলোদ্দীপক উৎপত্তি বিবরণ বলিলেন।

পক্ষধর মিশ্র—মিথিলার অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর লোক। ইঁহার নিকট নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উপাধিলাভ করেন এবং তদীয় ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণিও গুরুর অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক মিথিলায় যাইয়া ইঁহারই নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানে ঘটনাক্রমে অধ্যাপক মিশ্রের সহিতই রঘুনাথের ন্যায় শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হয়। বিচারে অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র পরাজিত হন। এই ঘটনায় ন্যায়শাস্ত্রে নবদ্বীপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। নবদ্বীপ শিক্ষাকেন্দ্র হইল। ইহার পর বঙ্গীয় ছাত্রকে আর উপাধি লাভের জন্য মিথিলায় যাইতে হইত না।

পদ্মিনী—ভীমসিংহের প্রধানা মহিষী। এই অলোকসামান্যা রূপবতী রমণীকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যান" নামক শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রঙ্গলাল বর্ণিত পদ্মিনীকে আদর্শ করিয়া কল্পনার তুলিতে স্বীয় কাব্যে প্রমীলা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সিংহ মিবারের (রাজধানী চিতোর) সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। এজন্য পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য পরিচালন করেন। পদ্মিনীর রূপই তাঁহার কাল হইল; তাঁহার রূপের অগ্নিতে মিবার রাজধানী চিতোর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

খিলিজি বংশীয় দিল্লীর সম্রাট পদ্মিনীর রূপ গুণের কথা শুনিলেন। তিনি পদ্মিনীলাভের আশায় চিতোর আক্রমণ করেন; কিন্তু রাজপুত সৈন্যের শৌর্য্যে উহা অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া ফেলেন। আলাউদ্দিন মনে করিয়াছিলেন যে. ইহাতেই পদ্মিনী সহজে হস্তগত হইবেন; কিন্তু বৃথা আশা। পদ্মিনী চতুরের উপর চতুরতা খেলিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে আপনার সেনাবরোধ উঠাইয়া লইতে হইবে; আমার সঙ্গে বহু সহচরী আপনার শিবির পর্য্যন্ত যাইবেন, তাঁহাদের কোন প্রকার সম্মানের হানি না হয় ও ভদ্রমহিলাগণের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করা হয়, তদ্বিষয়ে আপনাকে বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এবং শেষ বিদায় লইবার জন্য আমাকে স্বামীর সহিত একবার দেখা করাইতে হইবে।" কামার্ত্ত আলাউদ্দীন পদ্মিনীর সমুদয় প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রায় সহস্র সশস্ত্র বাছা বাছা রাজপুত বীর আবরণযুক্ত শিবিকায় আরোহণ করিয়া পদ্মিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট শিবিরে প্রবেশ করিলেন। অল্প সময়ের জন্য ভীমসিংহের সহিত পদ্মিনীর সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হইল। পদ্মিনী ভীমসিংহকে শিবিকার মধ্যে লইয়া প্রস্থান করিলেন; পদ্মিনীর সহচরীগণ ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেহ বাধা দিল না। ভীমসিংহের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অধিক বিলম্ব দেখিয়া আলাউদ্দীন ব্যস্ত হইলেন, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; অবিলম্বে শিবিকাগুলির আবরণ উন্মুক্ত হইল। আবরণ উন্মোচনের পর তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় ক্রোধে ও নৈরাশ্যে অধিকৃত হইল। অবিলম্বে রাজপুত বীরগণ শিবিকা হইতে বহির্গত হইয়া সম্রাটসৈন্য আক্রমণ করিলেন; তাহাদিগকে পদ্মিনী ও ভীমসিংহের অনুসরণে অবসর দিলেন না। পথিমধ্যে ভীমসিংহ এক দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণ করিয়া নিরাপদে চিতোরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু এত করিয়াও পদ্মিনী স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। আলাউদ্দীন প্রবল বেগে চিতোর আক্রমণ করিলেন। রাজপুত বীরগণ প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা ও তাঁহার ১২শ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বহু সংখ্যক শত্রু নিহত করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীমসিংহ স্বপ্নে দেখিলেন যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ১২শ রাজপুত্রের শোণিত চাহিতেছেন। ভীম একে একে একাদশজন রাজপুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইলেন; সকলেই সমরাঙ্গনে শয়ন করিলেন। অবশেষে বংশলোপের আশঙ্কায় অবশিষ্ট পুত্রটীকে না পাঠাইয়া নিজেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। চিতোরের রাজপুত-মহিলাগণ জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইলেন। পদ্মিনী চিরদিনের জন্য পতির নিকট বিদায় লইয়া প্রজ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন; রাজপুত মহিলাগণ পদ্মিনীর অনুসরণ করিলেন। ভীমসিংহ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। চিতোর বীরশূন্য হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইল; কিন্তু আলাউদ্দীনের বড় সাধের পদ্মিনী হস্তগত হইল না। আলাউদ্দীন দেখিলেন, তখনও পদ্মিনীর ভস্মাচ্ছাদিত চিতা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। এই স্থান পবিত্র তীর্থ হইয়াছে।

পরমানন্দ দাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। মহাপ্রভু কবিত্বের জন্য ইঁহাকে "কবিকর্ণপুর" উপাধি দান করিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাকে পুরীদাস বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহার পিতার নাম শিবানন্দ। ১৪৪৬ শকে নদীয়া জিলাস্থিত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি ১৪৬৩ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে চৈতন্যচরিতামৃত সংস্কৃতে রচনা করেন এবং ১৪৯৪ শকে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক নাটক রচনা করেন।

পাণিনি—সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম দেবল, মাতা দাক্ষী। মাতার নামানুসারে ইনি দাক্ষীপুত্র বা দাক্ষেয় নামে খ্যাত। গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম বলিয়া তিনি শলাতুরীয় নামেও প্রসিদ্ধ। পাণিনি শব্দশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। মহেশ্বর প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য উপদেশ দেন। পাণিনি মহেশ্বরের প্রসাদে এক ব্যাকরণ রচনা করেন; ই ব্যাকরণের নাম "অষ্টাধ্যায়ী"; ইহার অপর নাম "পাণিনি দর্শন"। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ৩৯৯৬টী সূত্র আছে, এতন্মধ্যে বৈয়াকরণিকগণ ৩টী সূত্র পাণিনিরচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টোজিদীক্ষিত এই সূত্রগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া "সিদ্ধান্ত কৌমুদী" নামে পাণিনি ব্যাকরণের এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী"ই এখন সর্ব্বত্র অধীত হইয়া থাকে। সোমদেবের কথাসরিৎ-সাগরের মতে পাণিনি কাত্যায়ন-বররুচির সমসাময়িক। কাত্যায়ন-বররুচি পূর্ব্বজন্মে পুষ্পদন্তনামে মহাদেবের এক অনুচর ছিলেন; গৌরীর শাপে মনুষ্যরূপে কৌশাম্বী নগরীতে সোমদত্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাত্যায়ন-বররুচির বহুপূর্ব্বে যাস্ক প্রাদুর্ভূত হন এবং যাস্কের বহু পূর্ব্বে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ এক উদ্ভট শ্লোক পাঠ করিয়া বলেন যে, "মাহেশ" নামে এক ব্যাকরণ পাণিনি ব্যাকরণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তি বলেন যে, মাহেশে যে রত্ন আছে, তাহা পাণিনিরূপ গোষ্পদে থাকা সম্ভব নয়।

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাস ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিং তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥"

এই শ্লোক যে কোন অর্ব্বাচীন দাম্ভিক পাণিনি-বিদ্বেষীকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

পান্না—খিচিবংশোৎপন্ন একজন রাজপুত রমণী। ইনি চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের পরিবারে তদীয় শিশুপুত্র উদয় সিংহের ধাত্রীরূপে নিযুক্ত হন। ইনি স্বীয় পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে প্রভুপুত্র উদয় সিংহের প্রাণ রক্ষা করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পান্নার স্বার্থত্যাগ ও প্রভুভক্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশ—ইনি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কামরূপাধিপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি শ্রাদ্ধ কৌমুদী, তিথি কৌমুদী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বিবাদকৌমুদী ১৫২৮ শকে রচিত হয়। এতদন্তর্গত দায় কৌমুদী সংস্কৃত টোল পরীক্ষায় এখনও পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

পুত্ত—চিতোরের সেনাপতি। সম্রাট আকবর মিবারের রাজধানী বীরভূমি চিতোর অধিকার করিবার জন্য ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অসংখ্য সেনাসহ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন। চিতোরের মহারাণা উদয় সিংহ ভীরুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পলায়ন করেন সুতরাং রাজধানী রক্ষার ভার পুত্ত ও জয়মল্ল নামক দুই সেনাপতির উপর পড়িল। পুত্ত দুর্গের বাহিরে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং জয়মল্ল দুর্গে অবস্থিত হইয়া প্রবলবিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। আকবর ইঁহাদের বিক্রম দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মহারাণা উদয় সিংহের পলায়নে তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, চিতোর অনায়াসেই হস্তগত হইবে; কিন্তু এই সেনাপতি দ্বয়ের বিক্রম দেখিয়া তাঁহার সে আশা তিরোহিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, প্রথমে দুর্গ অধিকার করিতে হইবে এবং তৎপর সমবেত রাজপুতদিগকে একটি যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি দুর্গ প্রবেশের পথ করিতে পারিবে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে। আকবরের একজন সৈন্য পুরস্কারের লোভে অন্ধকার রাত্রিতে ছদ্মবেশে দুর্গে প্রবেশ করিয়া জয়মল্লকে নিহত করে। দুর্গ অচিরে অধিকৃত হইল, কিন্তু সদাশয় আকবর পুরস্কারলোভী হত্যাকারীর প্রাণ দণ্ড করিয়া এই অন্যায় কর্ম্মের উচিত শাস্তি বিধান করেন। অতঃপর সম্রাট আপন সৈন্যদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া চিতোর আক্রমণ করেন। পুত্তের বয়স তখন ২৫ বৎসর মাত্র। জয়মল্লের নিধনে সেনাপতি পুত্ত একটুকু চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে নিরাশ হইলেন না; তিনি প্রবলবেগে একদল মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্যের অপর ভাগ সম্রাট

আকবরের নেতৃত্বে বিপরীত দিক্ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। পুত্তের জননী কর্ম্মদেবী ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন, যদি উভয় দল একত্র হইতে পারে, তবে পুত্তের জয়ের ও চিতোর রক্ষার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি একটি সৈন্যও পাইলেন না; সকল সৈন্যই পুত্তের সাহায্য করিতেছে সুতরাং মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা কর্ণবতী ও অষ্টাদশ বর্ষীয়া পুত্রবধূ কমলা দেবী তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কন্যা ও পুত্রবধূকে নিজের ন্যায় বর্ম্মপরিহিত করাইয়া এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা করিয়া এক সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আকবরের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। অসংখ্য মোগল সৈন্যের প্রতিকূলে তিনটী রাজপুত রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া আকবরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; এই তিনটী রমণীর পরাক্রম দেখিয়া তিনি আরও মুগ্ধ হইলেন। তিনি সম্রাট হইয়া রমণীর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইল। তিনি রমণীত্রয়কে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রমণীত্রয় দুই প্রহর কাল অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় ভূতলশায়িনী হইলেন। ঠিক সেই সময়ে পুত্ত একদল মোগল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। মাতা, পত্নী ও ভগিনীকে সমরশায়িনী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মাতা ও পত্নীর শেষ কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন, ভগিনীর প্রাণবায়ু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহাদের দেহ গৃহে আনিলেন। এদিকে মোগল সৈন্য গিরিবর্ত্ম দিয়া আসিয়া সমুদয় চিতোর ছাইয়া ফেলিল। পুত্ত অমিতবলে যুদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার অনুরোধে আকবর তাঁহার মৃতদেহ পত্নী কমলা দেবীর মৃতদেহের সহিত এক চিতায় ভস্মীভূত করিলেন। বীরবর আকবর পুত্ত, জয়মল্ল, কর্ম্মদেবী, কর্ণবতী ও কমলা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া চিতোর দুর্গের সম্মুখে ও নগরের নানাস্থানে স্থাপিত করিলেন।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—ইনি রাজা নরনারায়ণের সময়ের কামরূপীয় পণ্ডিত। ইঁহার কৃত "প্রয়োগরত্নমালা" ব্যাকরণ এখনও আসাম এবং কোচবেহার অঞ্চলে সুপ্রচলিত। এই ব্যাকরণের বিশেষত্ব এই যে, ইহা আগাগোড়া পদ্যে লিখিত; কলাপ ও মুগ্ধবোধের ন্যায় এই ব্যাকরণও গবর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষায় গৃহীত হইয়া থাকে।

পূর্ণানন্দ পরমহংস—খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর প্রারম্ভে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে পূর্ণানন্দ পরমহংস আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রকৃত নাম জগদানন্দ। পূর্ণানন্দ তাঁহার গুরুদত্ত নাম। গিরি, যতি, পরিব্রাজক, পরমহংস এই সকল উপাধি তদীয় গ্রন্থাবলীতে তাঁহার নামের সহিত সংযোজিত দেখা যায়।

জগদানন্দ বাল্যকালে পিতৃহীন হন। মাতা ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। কথিত আছে যে, তিনি বাল্যকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন এবং লেখা পড়া একবারেই করিতেন না।

একদা পূর্ণানন্দের ভাবিগুরু ব্রহ্মানন্দ, শাপগ্রস্ত অবস্থায় নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কাটিহালি গ্রামে উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি স্বীয় গুরু ত্রিপুরানন্দকে অবজ্ঞা করিয়া শাপগ্রস্ত হন। অবশেষে গুরুকে অনুনয় বিনয়ে সন্তুষ্ট করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষমালাভ করেন। ত্রিপুরানন্দ কহিয়াছিলেন, "যদি তুমি উপযুক্ত উত্তরসাধক সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যা পীঠের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক তথায় সাধনা করিতে পার, তবে সিদ্ধিলাভ করিবে।"

ব্রহ্মানন্দ অভিলষিত উত্তরসাধকের অনুসন্ধানে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ময়মনসিংহ জিলায় কাটিহালি গ্রামে উপস্থিত হন। জগদানন্দের মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকেই উত্তরসাধক করিবেন স্থির করিলেন। তিনি জগদানন্দকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা দিলেন। জগদানন্দ সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিক্রমে ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষিত হন এবং গুরুর নিকট "পূর্ণানন্দ" নাম গ্রহণ করেন। ইহার পর গুরুর আদেশক্রমে পূর্ণানন্দ গুরুর পূর্ব্বেই সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার পর কোন কারণে গুরু ব্রহ্মানন্দ, শিষ্য পূর্ণানন্দ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়েন। পূর্ণানন্দ নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক মণিপুরে উপস্থিত হন এবং গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অনন্তর গুরুশিষ্যে মণিপুর ত্যাগ করেন এবং তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক কামাখ্যাপীঠের উদ্ধারসাধন করেন। পূর্ণানন্দ

পীঠস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শক্তির উপাসকমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনন্তর পূর্ণানন্দের উত্তরসাধকতায় গুরু ব্রহ্মানন্দ তথায় তারাবিদ্যাবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। পূর্ণানন্দ ১৪৯৩ শকে (১৫৭১ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসে "শাক্তক্রম" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্রীঃ) "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ষট্‌চক্রনিরূপণ নামক গ্রন্থ এই "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির একটি অধ্যায় মাত্র।" ইহার পর তিনি "শ্যামারহস্য" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত "তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

পৃথ্বীরাজ—ভারতের শেষ হিন্দু রাজা। (জয়চাঁদ ও চাঁদ কবি দেখ)।

প্যারীচরণ দাস—ইনি শ্রীহট্টপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। শ্রীহট্ট জিলায় করিমগঞ্জ উপবিভাগে ইঁহার জন্ম। ইনি সাহা জাতীয় ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রমাবাই সরস্বতীর স্বামী ৺ বিপিনবিহারী দাস এম এ, বি এল ইঁহারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। প্যারীচরণ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের ফরেনডিপার্টমেণ্টে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু ঘটনাসূত্রে কর্ম্মচ্যুত হন। অনন্তর তিনি স্বদেশে আসিয়া দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। পূর্ব্ববঙ্গে তৎকালে "ঢাকাপ্রকাশ" একমাত্র সাপ্তাহিক পত্র ছিল। প্যারীচরণ দেশে আসিয়া "শ্রীহট্টপ্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি অতীব যোগ্যতার সহিত এই পত্র সম্পাদন করিতেছিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র—এই বিখ্যাত ব্যক্তিকে বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮১৪ খৃঃ কলিকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। ১৮২৯ খৃঃ ইনি হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে ইনি সমুদয় পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। এই পদে দক্ষতা দেখাইয়া তিনি ক্রমে লাইব্রেরীয়ান, সেক্রেটরী ও কিউরেটার পদে উন্নীত হন। এই পদে তিনি মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন পাইতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। একটী বিশেষ কার্য্যের জন্য তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত এই দুই যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিতেছিল। উক্ত উভয় মহাপুরুষই সংস্কৃতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত শব্দাবলীতে তাঁহাদের রচনা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতের অলঙ্কারযুক্ত করিয়া যে পরিচ্ছদ দিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানীর উপযুক্ত, সংস্কৃতাভিজ্ঞের উপযুক্ত। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহাদের পক্ষে ঐ ভাষা কর্কশ ও দুর্বোধ হইয়াছিল। তখন জিগীষা, জিজীবিষা প্রভৃতি শব্দ লইয়া বড় বড় লোকের বৈঠকখানায় নানাপ্রকার উপহাস, বিদ্রূপ ও হাসাহাসি হইত। যখন এই সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গালাভাষার ভার লোকের দুর্ব্বহ বোধ হইয়াছিল, তখন প্যারীচাঁদ মিত্র প্রচলিত সহজ বাঙ্গলাভাষায় "মাসিক পত্রিকা" নামে এক ক্ষুদ্রাকার পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইল। এই সময়ে প্যারীচাঁদ নিজের নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রচলিত বাঙ্গালায় "আলালের ঘরের দুলাল" নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন। এই উপন্যাস প্রণেতার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর দেওয়া হইল। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদারের "বিজয়বসন্ত" ও প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস। এই দুইটীর মধ্যে "বিজয়বসন্ত" তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গালাতে লিখিত। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালাতে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে।

এই প্রকার বাঙ্গালাভাষা আলালীভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান বাঙ্গালা আলালীও নহে বিদ্যাসাগরীয়ও নহে; ইহা এই উভয়ের মাঝামাঝি বঙ্কিমী ভাষা। বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ চলিতেছে। প্যারীচাঁদ ডেভিড্‌ হেয়ারের স্মরণার্থ সভা ও বেথুন-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—কাশীবাসী বিখ্যাত দণ্ডী। কাশীতে বিন্দুমাধব হরির যে মন্দির ছিল, তাহার নিকটে

প্রকাশানন্দের মঠ ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত কাশীতে আর কেহ ছিলেন না। ইনি প্রথমে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে মহাপ্রভুর সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া দ্বৈতবাদী হন। মহাপ্রভু ইঁহাকে "প্রবোধানন্দ" নাম দেন; তদবধি ইনি এই নামেই পরিচিত হইলেন। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে কাশী পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং তথায়ই জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন। নীলাচলের বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং কাশীর এই বিখ্যাত বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী, উভয়েই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেখ)

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—বিখ্যাত বক্তা ও ধর্ম্মপ্রচারক। প্রতাপচন্দ্র ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতা দিয়া ভারতে ও ইয়োরোপে অত্যধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুগলীর ৭ মাইল উত্তরস্থ বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্রের জন্মস্থান কলিকাতা হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতাপচন্দ্র তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতামহ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল একপ্রকার সুখেই কাটিয়া যায়। এই সময়ে তিনি তাঁহার পৈতৃক আবাস গরিফা গ্রামে বাস করিতেন। হুগলী নদীর শোভা দেখিয়া তাঁহার মন পুলকে নৃত্য করিত। বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে তিনি মস্তক, নাক, মুখ, পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি মসীতে লিপ্ত করিতেন। তিনি পিতাব আদরের সন্তান ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যগতিকে বাল্যকালেই স্নেহময় জনক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান; এই সময়ে তাঁহার জননীর বয়স ২৫ বৎসর মাত্র ছিল। পতিপরায়ণা জননী পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া বৈধব্য ক্লেশ সহ্য করিতেছিলেন, অবশেষে তিনিও পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত মিলিত হইবার জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে এই মায়ামোহময় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করেন।

এই সময়ে প্রতাপ অষ্টাদশবর্ষদেশীয় যুবক মাত্র। প্রতাপ দেখিতে সুশ্রী ছিলেন; তাঁহার দেহ উন্নত, বর্ণ গৌর ও মূর্ত্তি গম্ভীর ছিল। তিনি প্রথমে হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন; এথানে ·ক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা আগমন করেন এবং হেয়ার স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। এথানে সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন; এবং কিয়ৎকাল পড়িয়া পাঠ সমাপন করেন। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। এই মহাত্মার পভাব প্রতাপচন্দ্রের ভাবী জীবনে লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ১৮৫৯ খৃঃ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষা গ্রহণে আত্মীয়স্বজন সকলেই প্রতাপের উপর বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অবশেষে ১৮৬২ খৃঃ যে দিন কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে বৃত হন, সে দিন তিনি তাঁহার পত্নীসহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হন। এই দিন হইতে তিনি আত্মীয় বন্ধুজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ কিছু পৈতৃক বিত্ত পাইয়াছিলেন; কিন্তু অভিভাবকগণের অমনোযোগে উহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। এই অর্থের যাহা কিছু তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল তাহা দ্বারা তিনি ১৮৭৮ খৃঃ কলিকাতায় "শান্তি কুটীর" নির্ম্মাণ করেন। তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরার" (Indian Mirror) নামক পত্রিকার সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন এবং এই কার্য্য যশের সহিত সম্পন্ন করেন। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি প্রথম ইংলণ্ডে যান; এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথা হইতে আমেরিকায় যান; আমেরিকা হইতে সান্‌ফ্রন্‌সিস্কোর (San Fransisco পথে এই সনেই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সমুদয় বক্তৃতা দেন, তাহা পাঠ করিয়া সভ্যজগৎ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন পরলোক গমন করেন। সেন মহাশয়ের মৃত্যুর অল্পকাল পরে, তিনি "কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী ও তাঁহার উপদেশ" (Life and Teachings of Kashub Chandra Sen) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রতাপচন্দ্র পুনরায় আমেরিকায় গমন করেন। এবার তিনি "চিকাগোর" (Chicago) ধর্ম্ম মহাসভায়

(Parliament of Religion) এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। "এশিয়ার নিকট পৃথিবীর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঋণ" (The world's debt to Asia) এই বিষয় অবলম্বনে উক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতা শ্রবণে এবং ইহার কয়েকদিন পর বোষ্টন নগরে যে সমুদয় বক্তৃতা করেন তচ্ছ্রবণে আমেরিকার লোক মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ইংরেজীতে আরও তিনখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখেন। (১) "প্রাচ্য খৃষ্ট" (Oriental Christ) (২) "ঈশ্বরের আত্মা" (The Spirit of God) (৩) "ভাব-তরঙ্গ" (Hearts Beats)। এই কয়খানি গ্রন্থ তিনি কার্সিয়াঙ্গে স্থিত তাঁহার প্রিয় শৈলাবাসে বসিয়া লিখিয়াছেন।

১৯০৫ খৃঃষ্টাব্দে ২৭শে মে ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি একজন নীতিমান্, ধার্ম্মিক ও আদর্শচরিত্রসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

প্রতাপরুদ্র—বরঙ্গলের রাজা। ইনি সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। ১২৯৫ খৃঃ হইতে ১৩২৩ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

প্রতাপসিংহ—মিবারের বিখ্যাত রাণা। ইনি চিতোরাধিপতি রাণা উদয়সিংহের পুত্র। তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। আকবরের সৈন্যদল ১৫৬৮খৃঃ উদয়সিংহের রাজধানী চিতোর অধিকার করিয়া উহা ধ্বংসমুখে পাতিত করে। উদয়, চিতোর পরিত্যাগ করিয়া রাজপিপ্পলীর গুহিলদিগের শরণ লন। এই দুর্ঘটনায় উদয়ের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়; তিনি ৪ বৎসর পরে জন্মভূমির শোকে দেহত্যাগ করেন। উদয়ের মৃত্যুর পর প্রতাপ শিশোদীয় কুলের সমুদয় মানসম্ভ্রমের উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্য শত্রুহস্তগত, রাজধানী শত্রু সৈন্যে বিধ্বস্ত। অধিকাংশ রাজপুত রাজগণ মোগল সম্রাটের প্রলোভনে স্বদেশদ্রোহিতায় নিযুক্ত ছিলেন। যে অল্পসংখ্যক রাজপুতবীর দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন, প্রতাপ তাঁহাদের চালক হইলেন। প্রতাপ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ভোজনপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বৃক্ষপত্র-নির্ম্মিত পাত্রে আহার করিতেন। তিনি রাজধানীর উদ্ধার সাধন না করা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বিলাস সামগ্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি তৃণশয্যায় আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং শোকচিহ্নস্বরূপ দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার সৈন্যগণ আরাবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশে বিচরণ করিত এবং মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিত ও তাহাদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিত। আকবর প্রতাপকে দমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রধান সেনাদল আজমীরে স্থাপন করিলেন।

রাজস্থানের অধিকাংশ রাজা ও সামন্ত মোগলসম্রাটের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিলেন; কিন্তু প্রতাপ জীবন পণ করিয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই মোগলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

একদা অম্বরের রাজকুমার মানসিংহ (আকবরের পুত্র সলিমের শ্যালক) দিল্লী যাইবার পথে প্রতাপের রাজধানী কমলমীরে উপস্থিত হন। প্রতাপ রাজ-অতিথির যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করেন কিন্তু ভোজনের সময় প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ মাত্র তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ তথায় দণ্ডায়মান থাকেন। মানসিংহ প্রতাপকে তথায় উপস্থিত না দেখিয়া বারে বারে অমরসিংহের নিকট তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে প্রতাপ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যে রাজপুত কুলাঙ্গার মুসলমানদের নিকট আপন ভগিনীকে বিবাহ দেয় এবং যে সর্ব্বদা তুর্কির সহিত আহারাদি করে, সূর্য্যবংশোদ্ভব রাণা তাহার সহিত আহার করিতে পারেন না।" মানসিংহ এই উত্তরে অবমান বোধ করিয়া অন্ন স্পর্শ না করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, বলিয়া গেলেন। প্রতাপও বলিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইবেন। এই অপমানের সংবাদ আকবরের নিকট বলা হইলে, আকবরের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতাপের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে বৃহৎ আয়োজন করিলেন। সম্রাট-পুত্র সলিম বিপুল সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে আরাবল্লীর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপও

২২ হাজার রাজপুত সৈন্যসহ আরাবল্লীর গিরিসঙ্কটে মোগল সৈন্যের অপেক্ষায় ছিলেন। কমলমীরের দক্ষিণে অবস্থিত পর্ব্বত ও বনাকীর্ণ ৪০ মাইল বিস্তৃত ভূমি প্রতাপসৈন্যের কেন্দ্রস্থান হইল। এই স্থানের চারিদিকে পর্ব্বতমালা; এই গিরি-প্রদেশের নাম হলদীঘাট। এই হলদীঘাটক্ষেত্রে উভয় সৈন্যের ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইল। ঘোর যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতেছিল, এমন সময়ে প্রতাপ, রক্ষিসৈন্যবেষ্টিত সম্রাটপুত্র সলিমকে সম্মুখে পাইলেন। প্রতাপের শিক্ষিত অশ্ব "চৈতক" বিপুলবিক্রমে প্রভুকে পৃষ্ঠে করিয়া রক্ষিসৈন্যের উপর পতিত হইল, প্রতাপের যুদ্ধকৌশলে রক্ষিসৈন্যগণ নিহত হইল। সলিম হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থিত ছিলেন; প্রতাপ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষা পরিত্যাগ করিলেন, বর্ষা হাওদায় প্রতিহত হইয়া মাহুতকে বিনষ্ট করিল। সেলিম অন্য হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। সলিম অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিলেন। কিন্তু অগণিত মোগল সৈন্যের নিকট রাজপুতগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনবার প্রতাপের জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। রাজছত্র লক্ষ্য করিয়া মোগলগণ প্রতাপকে আক্রমণ করাতে, প্রতাপের ভক্ত ঝাল্লাপতি মান্না রাণা প্রতাপকে রক্ষা করিবার জন্য রাজছত্র আকর্ষণপূর্ব্বক নিজ মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। মোগলেরা মান্নাকেই প্রতাপবোধে আক্রমণ করিয়া সংহার করিল। "চৈতক" আহত প্রভু প্রতাপকে পৃষ্ঠে করিয়া দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া এক নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইল। প্রভুকে নিরাপদস্থানে রাখিয়াই পিপাসাক্লিষ্ট ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ "চৈতক" ভূতলে পতিত হইয়া দেহ-ত্যাগ করিল। প্রতাপ প্রভুভক্ত অশ্বের স্মরণার্থ ঐ অত্যুন্নত স্থানে এক নদী খনন করাইয়াছিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই লোমহর্ষণ যুদ্ধের অবসান হয়। কমলমীরের গিরিদুর্গ মোগলের করতলগত হইল। কিন্তু প্রতাপ হতোদ্যম হইলেন না। তিনি অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত ৫ বৎসর যুদ্ধ চলিল। প্রতাপ মোগলসৈন্য পরাভূত করিয়া পুনরায় কমলমীর অধিকার করিলেন এবং তৎপর ক্রমে ক্রমে ২২টী গিরিদুর্গ তাঁহার অধিকৃত হইল। তৎপর এক বৎসরের মধ্যে তিনি সমস্ত মিবার রাজ্য হইতে মোগল সৈন্য তাড়াইয়া দিলেন। এখনও চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় মোগলের অধিকারে রহিল। তিনি স্বদেশদ্রোহী মানসিংহের রাজ্য অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ঐ রাজ্যের অন্তর্গত মালপুর নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। অতঃপর প্রতাপ উদয়পুর অধিকার করিয়া লইলেন। মোগলসম্রাট স্বাধীনতাপ্রয়াসী রাজপুত বীরের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। প্রতাপ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন; কিন্তু চিতোরের আর উদ্ধার করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পুত্র অমরসিংহকে স্বদেশশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন। চিতোরের উদ্ধার করিতে পারিলেন না, ইহা তাঁহার জীবনে একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। চিতোরলাভ ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি একটা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু চিতোর লাভ না করাতে তিনি রাজ-প্রাসাদে বাস করেন নাই, কুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র অমরসিংহ একটু বিলাসী ছিলেন; অমর যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে এ ধারণা তাঁহার ছিলনা। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বহুবার এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করাতে তাঁহার বিশ্বস্ত সামন্তবর্গ অসিস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সর্ব্বদা কুমার অমরসিংহের পার্শ্বে থাকিবেন। ১৫৯৭ খৃঃ রাজপুতনার এই উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইল। সপ্তদশ পুত্র রাখিয়া প্রতাপ মৃত্যু-মুখে পতিত হন; এই পুত্রগণের মধ্যে অমরসিংহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অমরসিংহ ১৫৯৭ খৃঃ পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

প্রতাপাদিত্য—যশোহরাধিপতি; ইনি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের (ভূঁইঞার) অন্যতম। বার ভূঁইঞার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১) যশোহর—প্রতাপাদিত্য; (২) চন্দ্রদ্বীপ—কন্দর্পনারায়ণ রায়; (৩) শ্রীপুর (বিক্রমপুর)—চাঁদরায়, কেদাররায়; (৪) ভাওয়াল—ফাজেলগাজী; (৫) ভূষণা—মুকুন্দরাম রায়; (৬) খিজিরপুর—ঈশাখাঁ মসনদআলি (পিতা-কালিদাস গজদানি); (৭) ভুলুয়া—লক্ষ্মণমাণিক্য; (৮) বিষ্ণুপুর—হাম্বিরমল্ল; (৯) তাহিরপুর—কংসনারায়ণ; (১০) দিনাজপুর—গণেশরায়। (১১) পুটিয়া—নাম অজ্ঞাত। (১২) পাবনা—নাম অজ্ঞাত। ইনি বঙ্গজ কায়স্থবংশোদ্ভব, গুহবংশীয়। ১৫৬৪ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়নগরে ইঁহার জন্ম হয় এই সময়ে পাঠানেরা বাঙ্গালা বিহার

উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেন। প্রতাপের পিতা শ্রীহরি ও খুল্লতাত জানকীবল্লভ নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া সম্পত্তিশালী হন। নবাব সুলেমান শাহ শ্রীহরিকে "বিক্রমাদিত্য" ও জানকীবল্লভকে "বসন্ত রায়" উপাধি দেন। তদবধি এই দুই ভ্রাতা উপাধি দ্বারাই পরিচিত।

১৫৭৩ খৃঃ সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খাঁ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব হইলেন। দাউদ খাঁ রীতিমত দিল্লীর সম্রাটকে কর না দেওয়াতে সম্রাটের সহিত দাউদের যুদ্ধ লাগিবার উপক্রম হইল। বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া ধনরত্নসহ যমুনা ও ইছামতী নদীর বিয়োগ স্থানে গড় নির্ম্মাণ করিয়া এক নগর পত্তন করেন এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে আত্মীয়দিগকে আনিয়া তথায় স্থাপন করেন। এই স্থান বর্ত্তমান যশোহর জিলা ইহা পূর্ব্বে চাঁদখাঁর জায়গীর ছিল; চাঁদখাঁর উত্তরাধিকারী না থাকায় উহা ঘোর অরণ্যে পরিণত হয়। উহা তখন হিংস্রজন্তুসমাকুল ছিল। ধনরত্নরক্ষার ভয়ে তাঁহারা এই দুর্গম স্থান পছন্দ করিয়াছিলেন। দাউদের সহিত সম্রাটপ্রেরিত সৈন্যের যুদ্ধ হইল। দাউদ গৌড় ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় গেলেন এবং মোগল সেনানী মুনিম খাঁর হস্তে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালা ও বেহার সম্রাটকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন এবং স্বয়ং উড়িষ্যায় রহিলেন। গৌড় পরিত্যাগের সময় দাউদ তাঁহার সমুদয় ধনরত্ন যশোহরে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে বলিয়া যান। মুনিম খাঁ গৌড় অধিকার করিলেন, কিন্তু সহসা রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। দাউদ উড়িষ্যা হইতে দ্রুতবেগে আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। সম্রাট, হোসেনকুলি খাঁ নামক সেনাপতিকে বঙ্গদেশ রক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। হোসেনকুলি খাঁর সহিত দাউদের আকমহল ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে দাউদের সেনাপতি কালাপাহাড় ও স্বয়ং দাউদ প্রাণত্যাগ করেন। দাউদ গৌড় ত্যাগের সময় যে সম্পত্তি যশোহরে বিক্রমাদিত্যের রক্ষণাবেক্ষণে পাঠাইয়াছিলেন তাহা আর ফেরৎ নেওয়া হইল না; বিক্রমাদিত্য অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। বঙ্গের সুশৃঙ্খলা ও রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে টোডরমল গৌড়ে আসিলেন। বিক্রমাদিত্য গৌড়ে থাকিয়া টোডরমলকে কাগজপত্র প্রস্তুত করণে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং বসন্তরায়কে যশোহর শাসনের নিমিত্ত তথায় প্রেরণ করিলেন। বিক্রমাদিত্য কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া টোডরমলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, আর চাকুরী করিতে ইচ্ছা করিলেন না। টোডরমল্ল পুরস্কারস্বরূপ বিক্রমাদিত্যকে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী অর্পণ করেন। বিক্রমাদিত্য যশোহরে পৌঁছিয়া নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। যশোহর সুন্দর সৌধমালায় শোভিত হইল। এই সময়ে বিক্রমাদিত্যের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিক্রমাদিত্যের পিতা ভবানন্দ পৌত্রের নাম রাখিলেন "প্রতাপাদিত্য"। প্রতাপ যৌবন প্রাপ্ত হইলে মৃগয়ায় অত্যন্ত আসক্ত হইলেন; মৃগয়াকালে তাঁহার সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত। ১৫৭৫ খ্রীঃ মহামারীতে গৌড় জনশূন্য ও শ্রীহীন হইলে যশোহরের সৌধমালা লোকের নয়নানন্দকর হইয়াছিল। গৌড়ের যশ হরণ করিয়া যশোহর সার্থকনামা হইল। ক্রমে প্রতাপ উদ্ধত হইয়া উঠিলেন; তিনি কথায় কথায় পিতা ও খুল্লতাতের আদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। বিক্রমাদিত্য, পুত্রের দুর্ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইলেন। প্রাণসম সহোদর বসন্ত রায় পাছে পুত্রের নিকট অবমানিত হন, ইহা তাঁহার সর্ব্বদা চিন্তার বিষয় ছিল। পাছে পুত্রের জন্য ভ্রাতার সহিত কোন প্রকার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, এজন্য বিক্রমাদিত্য কৌশলপূর্ব্বক প্রতাপকে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রতাপকে আগ্রায় সম্রাট আকবরের রাজধানীতে প্রেরণ করেন। বসন্তরায় প্রতাপকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। প্রতাপকে আগ্রা প্রেরণ সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ বুঝিলেন পিতৃব্যের চক্রান্তেই তিনি এক প্রকার নির্ব্বাসিত হইতেছেন। যাহা হউক, প্রতাপ আগ্রায় থাকিয়া সম্রাটের মন্ত্রিগণের সহিত পরিচয় করিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে সম্রাটের দরবারে নীত হইয়া আকবরের নিকট পরিচিত হইলেন। প্রতাপের ভাগ্য ফিরিল। ধীরে ধীরে প্রতাপ, কুমার সলিমের ও টোডরমল প্রভৃতি অমাত্যগণের প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। যশোহরের রাজস্ব সম্রাট সরকারে দাখিল করিবার জন্য বিক্রমাদিত্য বার্ষিক কর আগ্রায় প্রতাপের নিকট প্রেরণ করিতেন। প্রতাপ যখন দেখিলেন তিনি সম্রাট ও সম্রাটের পারিষদগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন, তখন তিনি সম্রাট সরকারে রাজস্ব

প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন। যথাসময়ে বিক্রমাদিত্য যথারীতি রাজস্ব প্রেরণ করিলেও উহা সম্রাট সরকারে জমা হইত না। এইরূপে যশোহরের রাজস্ব বাকি পড়িলে সম্রাট প্রতাপকে ডাকাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রতাপ বলিলেন যে, তাঁহার পিতা বৃদ্ধাবস্থাপ্রযুক্ত পিতৃব্য বসন্ত রায়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু বসন্তরায় বোধ হয় কোন দুষ্ট অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া রাজস্ব প্রেরণে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন এবং তিনি বলেন যে, পিতৃব্যের অযোগ্যতায় রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাট আকবর ইহা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন এবং দেয় রাজস্ব কোন রূপে সরকারে প্রদান করিলে তাহাকেই তিনি রাজপদ দিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপ অল্প সময়ের মধ্যেই বাকী রাজস্ব প্রদান করিলে সম্রাট তাহা হইতে ৩ লক্ষ টাকা প্রতাপকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকেই পৈতৃকরাজ্যে নিযুক্ত করিয়া, নিয়োগপত্র সহ যশোহরে প্রেরণ করেন। প্রতাপ সম্রাট আকবরের নিকট হইতে ২২ হাজার সৈন্য লইয়া রওনা হইলেন। প্রতাপ যশোহরের সমীপবর্ত্তী হইলে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় শুনিলেন যে, প্রতাপ দিল্লীর সম্রাটের আজ্ঞায় রাজ্য গ্রহণের জন্য আসিতেছেন। তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইলেন; পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিবেন মনে করিয়া বিক্রমাদিত্য আহ্লাদিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতাপের আগমন আহ্লাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; নগরবাসিগণ প্রতাপের আগমনে আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ নগরে উপস্থিত হইয়াই নগরাবরোধপূর্ব্বক রাজকোষ অধিকার করিলেন; তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে, পিতৃব্য বসন্তরায় তাঁহাকে বাধা দিবেন; কিন্তু কিছুই হইল না। পিতা ও পিতৃব্য প্রতাপের ব্যবহার দেখিয়া ব্যথিত হইলেন; নগরবাসিগণ প্রতাপের ব্যবহারে বিস্মিত হইল। পিতা ও পিতৃব্য প্রতাপের শিবিরে গমন করিলেন এবং তাঁহার দুর্ব্যবহারের বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণে অনুমতি দিলেন। পিতার সহিত প্রতাপ রাজপ্রাসাদে আগমন করিলেন। পিতা ও পিতৃব্য প্রতাপের হস্তে রাজ্যভার দিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপ রাজ্যে নানা বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপনপূর্ব্বক পর্ত্তুগিজ দস্যুদিগকে দমন করিলেন; বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া নৌবল বৃদ্ধি করিলেন। প্রতাপের পরাক্রম চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। এইসময়ে পিতা বিক্রমাদিত্য পরলোক গমন করেন। পিতৃব্যের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি উড়িষ্যা হইতে উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও গোবিন্দদেব নামে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আনয়নপূর্ব্বক যশোহরে স্থাপন করেন। প্রতাপের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেন। এই নিমিত্তই তিনি উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। উৎকলের রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। দিনে দিনে প্রতাপের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল; বঙ্গদেশে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ রহিল না। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার গৃহবিবাদ উপস্থিত না হয়, এজন্য দুরদর্শী বিক্রমাদিত্য মৃত্যুর পূর্ব্বে যশোহর রাজ্য বিভক্ত করিয়া দশ আনা প্রতাপকে ও ছয় আনা অংশ বসন্তরায়কে দান করিয়া যান। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর প্রথমতঃ বসন্তরায় প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, কিন্তু প্রতাপের ব্যবহারে অবশেষে রাজ্য পৃথক্ করিতে বাধ্য হন। প্রতাপ যথোচিত স্থানের বিনিময়ে পিতৃব্যের নিকট চাকসিরি পরগণা চাহিয়াছিলেন। মগ ও ফিরিঙ্গির আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে এই স্থানটী প্রতাপের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। বসন্তরায় চাকসিরি পরগণা দিতে অসম্মত হওয়াতে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইলেন। এই ঘটনাই প্রবল মনোবাদের হেতু হইল। প্রতাপ স্বীয় কন্যা বিন্দুমতীকে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত মহাসমারোহে বিবাহ দেন। কেহ কেহ বলেন যে, রাজ্যলোলুপ দুরাকাঙ্ক্ষ প্রতাপ স্বীয় জামাতাকে বিনাশ করিয়া জামাতার রাজ্য গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। রামচন্দ্র, শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে পলায়নপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। প্রতাপ, পিতৃব্য বসন্তরায়কে গৃহবিবাদের মূল কারণ মনে করিয়া পুত্রগণসহ তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিয়া বধ করেন। একমাত্র শিশুপুত্র রাঘবকে ক্রোড়ে করিয়া বসন্তরায়ের পত্নী কচুবনে লুক্কায়িত ছিলেন এবং এই বিপদে রাঘবকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঘব পলায়নপূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হন এবং সম্রাটের সাহায্যে যশোহরের রাজপদে আসীন হইয়া দিল্লীশ্বরপ্রদত্ত যশোহরজিৎ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। (কচুরায় দেখ)।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্ব্ববঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এবং খ্যাতনামা বঙ্গীয় গ্রন্থকার। তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ঢাকায় আগমন করিয়া এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র সামান্য বেতনের কেরাণীগিরি হইতে নিজের কার্য্যকুশলতায় ডাকবিভাগের এই উচ্চকর্ম্মে মাসিক ৭০০ টাকা বেতনে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল এই কার্য্য দ্বারাই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এমন নহে; তিনি সুলেখক বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁহাকে সহকারী সভাপতি পদে বরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকৃত "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। "গ্রীক ও হিন্দু" নামক গ্রন্থে তাঁহার অপরিসীম চিন্তাশক্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৪৯ খৃঃ (বঙ্গাব্দ ১২৫৬ সন ১১ই আশ্বিন) বিজয়াদশমী দিনে নদীয়া জিলায় রাণাঘাট সবডিভিসনের অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা সারদা সুন্দরী দেবী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে তিনি পৃষ্ঠাঘাত রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রবোধানন্দ—বৈষ্ণব দার্শনিক। (প্রকাশানন্দ দেখ)।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার পরলোকগত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতৃব্য। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের পিতা ৺হরকুমার ঠাকুর ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইঁহার পিতা ৺গোপীমোহন ঠাকুর ও পিতামহ ৺দর্পনারায়ণ ঠাকুর। ইনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করেন এবং সরকারী উকিল বেলি সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে পর, ইনি তাঁহার স্থলে সরকারী উকীল নিযুক্ত হন। ইনি জমিদারের সন্তান; ওকালতি করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তদ্দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদারী বৃদ্ধি করেন। ৩ বৎসর ওকালতি করিয়া প্রসন্নকুমার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে তাঁহার হিন্দু কলেজের স্বত্ব শিক্ষাবিভাগে অর্পণ করেন। প্রসন্নকুমার বদান্য ছিলেন; শতাধিক ছাত্র তাঁহার গৃহে অন্ন পাইত। তিনি দেশীয় রীতিক্রমে টোলে শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন; বহু পণ্ডিত তাঁহার নিকট নিয়মিত মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। তিনি দেশীয়দের জন্য একটী চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করেন; তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে বহু স্থানে প্রজাদের জন্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি লর্ড ডালহৌসীর সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। বড় লাটের সভায় তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী আসীন হন নাই।

ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংস্কারের সময় প্রসন্নকুমার সার বার্ণেস পিককের (Sir Barnes Peacock) বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ ও ১৮৬৬ খৃঃ তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল তিনি সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিলাতে ছিলেন; তথায়ই জ্ঞানেন্দ্র মোহনের মৃত্যু হয়।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। ইনি কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইঁহার ছাত্র। ইনি ১৭২৭ শকে (১৮০৫ খৃষ্টাব্দে) ২রা বৈশাখ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমচাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণও পাণ্ডিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মুনিরাম কয়েকখানি ন্যায় ও স্মৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খুল্লপিতামহ নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন বেদান্ত ও জ্যোতিষে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। প্রেমচাঁদের পিতার নাম রামনারায়ণ। ১৮৩৬ খৃঃ তিনি সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনপূর্ব্বক সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া তর্কবাগীশ উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে উইলসন (H.H. Wilson) সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বর্ষেই তিনি সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া প্রবেশ করেন। ১৮৫০ খৃঃ তিনি তদানীন্তন অধ্যক্ষ কাপ্তেন সাহেবের আদেশে

অভিজ্ঞানশকুন্তলের ব্যাখ্যা সহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। অতঃপর তিনি মুরারি মিশ্র প্রণীত অনর্ঘরাঘব নাটকের, ভবভূতিকৃত উত্তররামচরিতের ও কাব্যাদর্শের টীকা লিখেন। কাব্যাদর্শের টীকায় তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ৫৭ বর্ষ বয়সে তিনি সংসারে বীতরাগ হইলেন এবং ১৮৬৪ খৃঃ সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হইলেন। এখানে তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে এপ্রিল ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—ইনি ভারতের একজন বিদ্যোৎসাহী ধনকুবের এবং বোম্বাই সহরের একজন বিখ্যাত সওদাগর। ১৮৬৬ খৃঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বৃত্তিস্থাপন নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে ২,০০,০০০৲ টাকা দান করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ দাতার স্মরণার্থ তাঁহার নামে একটি বৃত্তিস্থাপন করেন। পূর্ব্বে এই বৃত্তির মূল্য ১০,০০০৲ টাকা ছিল। এখন গভর্ণমেণ্টের কাগজের মূল্যের হ্রাস হওয়াতে ঐ বৃত্তির পরিমাণ ৭০০০৲ টাকা হইয়াছে। এম. এ. অথবা ডাক্তার উপাধিধারী যে কোন ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা খুব খ্যাতনামা ছাত্র তাঁহারাই এই পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিয়া থাকেন। যাঁহার উত্তরের কাগজ পরীক্ষকগণের মতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হয়, তিনিই এই বৃত্তি পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি পরীক্ষকগণ কোন ব্যক্তিকেই বৃত্তি পাওয়ার উপযুক্ত মনে না করেন, তবে সে বৎসর কাহাকেও বৃত্তি দেওয়া হয় না। ১৮৬৮ খৃঃ প্রথমে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। রিপণকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রথমে এই বৃত্তি পান। তৎপর বৎসর বিখ্যাত আনন্দমোহন বসু এই বৃত্তি পান। ১৮৭০ খৃঃ বিখ্যাত গণিতবিদ্ গৌরীশঙ্কর দে, ১৮৭১ খৃঃ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সারদা চরণ মিত্র, ১৮৭২ খৃঃ মেদিনীপুর নিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, ১৮৭৩ খৃঃ গিরিজা ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৪ খৃঃ বাবু বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৃত্তি পান। ১৮৭৫ খৃঃ পরীক্ষকদের বিবেচনায় এই বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত কেহই হন নাই। ১৮৭৬ খৃঃ পরলোকগত ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ১৮৭৭ খৃঃ মূলরাজ ও পরলোকগত ম্যাজিষ্ট্রেট নন্দকৃষ্ণ বসু, ১৮৭৮ খৃঃ মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনের পরলোকগত অধ্যাপক ৺প্রসন্নকুমার লাহিড়ী, ১৮৭৯ খৃঃ কেনেডি সাহেব, ১৮৮০ খৃঃ কটক কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল পরলোকগত নীলকণ্ঠ মজুমদার, ১৮৮১ খৃঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সূর্য্যকুমার অগস্তি, ১৮৮২ খৃঃ আশুতোষ গুপ্ত এই বৃত্তি পান। ১৮৮৩ খৃঃ কেহই এই বৃত্তি পান নাই। ১৮৮৪ খৃঃ রামচন্দ্র মজুমদার, ১৮৮৫ খৃঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৬ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্‌সেলার এবং হাইকোর্টের জজ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বৃত্তি পান। ১৮৮৭ খৃঃ কেহই এই বৃত্তি পান না। ১৮৮৮ খৃঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অবিনাশচন্দ্র বসু এই বৃত্তি পান। ১৮৮৯ খৃঃ কেহ পান না। ১৮৯০ খৃঃ উপেন্দ্রলাল মজুমদার। ১৮৯১ খৃঃ হুইলার সাহেব, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৯২ খৃঃ মোহিনীকান্ত ঘটক, ১৮৯৩ খৃঃ মেরী হল্যাণ্ড নাম্নী ইংরেজ মহিলা। ১৮৯৪ খৃঃ জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী. ১৮৯৫ খৃঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৬ খৃঃ জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, ১৮৯৭ খৃঃ যদুনাথ সরকার, ১৮৯৮ খৃঃ ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী, ১৮৯৯ খৃঃ প্রিয়নাথ সেন। ১৯০০ খৃঃ কৃষ্ণপ্রসাদ দে, ১৯০১ খৃঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৯০২ খৃঃ যতীন্দ্রনাথ সেন, ১৯০৩ খৃঃ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯০৪ খৃঃ ফণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯০৫ খৃঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

ফ

ফেরিস্তা—বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইঁহার রচিত ইতিহাসের নাম "তারিখ-ই-ফেরিস্তা"। (Tarikh-i-Ferishta)। ইঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাসিম। ইনি কাস্পীয়ানহ্রদের তীরবর্ত্তী অষ্ট্রাবাদ নগরে ১৫৫০ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দুশাহ্ অল্পবয়স্ক পুত্রসহ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আহ্‌মদ নগরের সুলতান মূর্ত্তজা নিজাম শাহের (প্রথম) নিকট উপস্থিত হন। নিজাম, কবির পিতাকে, স্বীয় পুত্র মিরাণ হোসেন শাহের পারস্য ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইহার অল্পকাল পরে

গোলাম আলী হিন্দুশাহের মৃত্যু হওয়াতে ফেরিস্তা একটু বিপদে পড়েন। কিন্তু তিনি রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হন নাই। অনন্তর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মূর্ত্তজার মৃত্যু হওয়াতে ফেরিস্তা বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের নিকট উপস্থিত হন। সুলতান আদিল শাহের আদেশে ফেরিস্তা উক্ত বিখ্যাত ইতিহাস লিখেন। এই ইতিহাসের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ফেরিস্তা স্বীয় গ্রন্থের নাম স্বীয় মুনিব সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহের নামানুসারে তারিখ ইব্রাহিম রাখিয়াছিলেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ফৈজী—সম্রাট আকবরের অন্যতম মন্ত্রী। ইনি আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (আবুল ফজল দেখ)। ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইতিহাস, দর্শন, পদ্য ও গদ্য রচনাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি ৯৫৪ হিজিরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০০৪ হিজিরীতে পরলোক গমন করেন। তিনি "আকবর নামা" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসমেত ১০১ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ব

বক্তিয়ার খিলিজি—দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দিনের জনৈক সেনাধ্যক্ষ। বঙ্গের সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে ইনি তদীয় রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করেন। বক্তিয়ার ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন ও উহা দুই ভাগে বিভক্ত করেন; এক ভাগের রাজধানী দেবকোট (দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী), অপরভাগের রাজধানী গৌড় (লক্ষ্মণাবতী)। বঙ্গদেশ জয় করাতে তাঁহার দেশজয়ের প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছিল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিব্বত জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং করতোয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বতের দিকে অগ্রসরও হইয়াছিলেন। এই নদীর পূর্ব্ব পার কামরূপের অধিপতি কামেশ্বরের অধিকারে ছিল। তিনি করতোয়া নদীর উপরিস্থিত বক্তিয়ারনির্ম্মিত সেতু ভাঙ্গিয়া দেন। বক্তিয়ার তিব্বতজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া অতিকষ্টে গুপ্তভাবে নদী উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় রাজধানী দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং অনতিবিলম্বে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (ইতিহাস)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালার এই প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খৃঃ ২৬শে জুন বাঙ্গালা ১২৪৫ সনের ১৩ই আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খৃঃ কলিকাতা ইউনিভারসিটীতে বি. এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়; বঙ্কিমচন্দ্র ২০ বৎসর বয়সে এদেশে সর্ব্বপ্রথম বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি ৪ বৎসর টোলে পড়িয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য ও মেঘদূত সমাপ্ত করেন। বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আইন পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন, কিন্তু তাঁহাকে আইনের পরীক্ষা দিতে হইল না। ছোটলাট হেলিডে সাহেব তাঁহার গুণগ্রামের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে একেবারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে থাকিয়া তিনি বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বত্রই সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছেন। এই পদে থাকিয়া তিনি নীলকর সাহেবের অত্যাচার এবং খুলনার নিকটবর্ত্তী স্থানের ডাকাইতের অত্যাচার দমন করেন। তিনি ১৮৯১ সনে পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ১৮৯২ খৃঃ ইঁহাকে রায় বাহাদুর এবং ১৮৯৪ খৃঃ সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। বাঙ্গালা ১৩০০ সনের ২৬শে চৈত্র রবিবার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম এখনও আছে, চিরকালই থাকিবে। যতদিন বঙ্গভাষা আছে ততদিন তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইবার নহে।

খুলনায় অবস্থানকালে তিনি প্রথম উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ ইংরেজীতে একখানা উপন্যাস লিখেন, পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ইংরেজী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় উপন্যাস লিখেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মৃণালিনী প্রণয়ন করেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসরই তিনি "বিষবৃক্ষ" "ইন্দিরা" ও "সাম্য" রচনা করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে "চন্দ্রশেখর" ও "যুগলাঙ্গুরীয়," ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "কৃষ্ণকান্তের উইল", ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে "রাজসিংহ" এবং ১৮৮০ খৃঃ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে "আনন্দমঠ" ও "দেবীচৌধুরাণী" নামক উপন্যাসদ্বয় প্রণয়ন করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "নবজীবন" নামক মাসিক পত্রিকায় "ধর্ম্মতত্ত্ব," এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে "প্রচার" নামক মাসিক পত্রিকায় "গীতা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা" প্রকাশিত হয়। এই দুই প্রবন্ধ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে লিখিত প্রবন্ধ সমূহ সংগৃহীত হইয়া "বিবিধপ্রবন্ধ," "লোকরহস্য" ও "বিজ্ঞানরহস্য" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র" প্রকাশিত হয়; ইহাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ।

বঙ্কিমের প্রতিভার পরিচয় স্থল দুইটী;—(১) তাঁহার নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্কার; (২) তাঁহার মতের স্বাধীনতা। তাঁহার বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে নূতনসৃষ্টি প্রধানভাবে লক্ষিত হয়। এই সমুদয় উপন্যাসের প্রতি ছত্রে তাঁহার প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও মতানুসরণ করেন নাই; বরং অপরকে নিজের মতে টানিয়া আনিয়াছেন। তর্কস্থলে তিনি সর্ব্বদাই জয়ী হইয়াছেন। তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমনে এবং শেষ জীবনে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম মতে তাঁহার অসীম নির্ভীকতা দৃষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান নাই, তিনটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে একটী তাঁহার জীবদ্দশাতেই কালকবলে পতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের একটী দৌহিত্র কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। এই দৌহিত্রটী হাইকোর্টের বর্ত্তমান বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য পতিকে এই যুবকটীও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

বররুচি—সোমদেবভট্টকৃত কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, যে ইনি ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব সোমদত্তের পুত্র। ইনি পাণিনির সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি ও বার্ত্তিকাদি বিবিধ ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।

(২) কেহ কেহ বলেন, বররুচি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন এবং কালিদাসের সমসাময়িক। ইনি প্রাকৃতপ্রকাশ নামে একখানা প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন।

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ॥
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং।
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥

জ্যোতির্ব্বিদাভরণে লিখিত উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্টে দেখা যায় যে, তিনি নবরত্নের অন্যতম। বররুচি একখানা সংস্কৃত অভিধান রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নীতিরত্ন নামে একখানা ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, বিদ্যাসুন্দরের উপখ্যান প্রথমে বররুচিই লিখিয়াছিলেন।

বরাহ—(১) ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত। ইঁহার পুত্র মিহির উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় বরাহমিহির নামে খ্যাত ছিলেন। (বররুচি ও খনা দেখ)। অনেকের মতে বরাহমিহির আর্য্যভট্টের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বেত্তা। ডাক্তার ভাউদাজি ও ডাক্তার কারণ এই দুই প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বরাহ ও মিহিরকে

একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে বরাহমিহির খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক এবং তাঁহার নিবাস অবন্তী নগরে ছিল। তিনি বৃহৎসংহিতা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; ডাক্তার কারণ এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দেখ)। ইনি বেদান্ত সূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন, এই ভাষ্যের নাম "গোবিন্দ ভাষ্য।" ইনি জয়পুরের রাজধানীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করেন। ইনি রূপগোস্বামীকৃত উৎকলিকা বল্লরী ও গোবিন্দ বিরুদাবলীর টীকা লিখেন।

বল্লভ গোস্বামী—ইনি বিখ্যাত ভক্ত বৈষ্ণবপণ্ডিত জীব গোস্বামীর পিতা। রূপ, সনাতন ও বল্লভ তিন সহোদর; সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও বল্লভ সর্ব্বকনিষ্ঠ। (সনাতন গোস্বামী দেখ)।

বল্লাল সেন—গৌড়ীয় সেন রাজগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। কেহ বলেন, বল্লাল সেন বিষকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং আদিশূরের বংশ ধ্বংস হইলে পর জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে কিম্বদন্তী এই যে, বল্লাল বৈদ্যবংশসম্ভূত এবং তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে জাত। কিন্তু বল্লালের স্বরচিত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামক গ্রন্থদ্বয়ে এবং আনন্দ (মতান্তরে গোপালভট্ট) ভট্ট রচিত বল্লালচরিতে দেখা যায় যে, তিনি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম বিজয়সেন, পিতামহ হেমন্তসেন ও প্রপিতামহ সামন্তসেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বল্লাল কায়স্থ ছিলেন; তাঁহারা স্ব স্ব যুক্তির সমর্থন করিতে যাইয়া বলেন যে, তিনি কায়স্থ না হইলে কায়স্থকে কন্যা সম্প্রদান করিতেন না। তাঁহারা আরও বলেন যে, বল্লাল যদি ক্ষত্রিয় হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও কৌলীন্যানুসারে শ্রেণী বিভাগ করিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বল্লালীমতে কৌলীন্যপ্রথা বর্ত্তমান না থাকাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, তাঁহার সহিত ক্ষত্রিয়জাতির কোন সম্বন্ধ ছিল না। যাহারা বল্লালকে বৈদ্যবংশোদ্ভব বলিয়া দাবি করেন, তাঁহারা বলেন, তিনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলে কুলাচার্য্যগণ কুলজি গ্রন্থে তাঁহার প্রতি "অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ" "বৈদ্যকুলোদ্ভূতঃ" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন না। "অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।" (কুলদীপিকা)। পক্ষান্তরে সেনবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বকালে বৈদ্যজাতির সমধিক উন্নতি দেখা যায়; এই সময়েই চিকিৎসাশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কারাদিপ্রণেতা বৈদ্যজাতীয় ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মতে বল্লাল সেন আদিশূরের দৌহিত্রকুলের অধস্তন নবম পুরুষ।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বল্লাল সেন বিজয় সেনের (নামান্তরে সুকসেন) পুত্র এবং তিনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১০৯১ শকে "দানসাগর" ও ১০৯০ শকে "অদ্ভুতসাগর" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। আইন-ই-আকবরি মতে বল্লালের রাজত্ব ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। মহারাজ বল্লাল সেন বঙ্গে ব্রাহ্মণাদি জাতির যথাযথ সামাজিক সম্মান ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে নবগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানই তাঁহার প্রধান কাজ। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ জনকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। শাণ্ডিল্য গোত্রে বন্দ্যঘটীয় শকুনিসুত জাহ্লন ও মহেশ্বর, ধর্ম্মাংশুসুত দেবল ও বামন, মহাদেব সুত মকরন্দ ও বৈদ্যসুত ঈশান এই ছয় জন; কাশ্যপগোত্রে চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই ৫ জন, বাৎস্যগোত্রে গোবর্দ্ধন পূতিতুণ্ড, শিরঘোষাল এবং কাঞ্জিলাল বংশীয় কানু ও কুতূহল এই ৪ জন; ভরদ্বাজগোত্র মুখবংশীয় উৎসাহ ও গরুড় এই ২ জন এবং সাবর্ণগোত্রে শিশু গাঙ্গুলী ও রোষাকার কুন্দলাল এই দুই জন; সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ জন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তিকালে এই কুলীনদিগের বংশধরগণ নানা দোষপ্রাপ্ত হওয়ায় বন্দ্যঘটী বংশীয় দেবীবর ঘটক তাঁহাদের মেলবন্ধন করেন। কুলগত দোষ হইতে মেলের উৎপত্তি। "দোষাণাং মেলনং মেলঃ।" প্রধান মেল ৪টি—খড়দহ, ফুলিয়া, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী। অন্যূন তিনটি

দোষ না হইলে মেলোৎপত্তি হয় না। দোষের মধ্যে কতকগুলি মুখ্য আর কতকগুলি গৌণ। মুখ্যদোষের মার্জ্জন হয় না; গৌণদোষ মার্জ্জিত হইয়া থাকে। কোন কুলীনে ৩টি বা ৪টি গৌণ দোষ প্রাপ্ত হইলেও তিনি মার্জ্জিত; কিন্তু পরে একটি মুখ্যদোষ প্রাপ্ত হইলেই তিনি অমার্জ্জিত হইলেন এবং তাহা হইতে মেলোৎপত্তি হইল। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) যোগেশ্বর পণ্ডিত ক্রমে গড়গড়ি, পিপ্‌লাই, শুকনালী ও বারৈহাটি এই ৪টি গৌণ দোষ প্রাপ্ত হন। যোগেশ্বরের পিতা হরির গড়গড়িতে বিবাহ ও যোগেশ্বরের নিজের পিপ্‌লাইতে বিবাহ থাকাতে তিনি গড়গড়ি ও পিপ্‌লাই উভয় দোষ প্রাপ্ত হন। উক্ত ৪টি গৌণ দোষ যোগেশ্বরে সংক্রান্ত হওয়ার পর ডিঙি-পরমানন্দ দোষযুক্ত মধুচট্টের (মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের) সহিত তাঁহার সংশ্রব হওয়ায় তাঁহাতে খড়দহমেলের উৎপত্তি হয়। ডিঙি পরমানন্দ একটি মুখ্যদোষ। পরমানন্দ ডিংসাই বলপূর্ব্বক কুলীন কন্যা গ্রহণ করাতে তিনি এই মার্জ্জনের অযোগ্য মুখ্যদোষ প্রাপ্ত হন। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য পরমানন্দ ডিংসাই কুলাণ্ডক নামে পরিচিত। এই পরমানন্দ ডিংসাইর সহিত মধুচট্টের সংশ্রব হয় এবং তৎপর মধুচট্টের সহিত যোগেশ্বরের সংশ্রব হওয়াতে খড়দহ মেলের উৎপত্তি হয়।

(২) গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়) নান্দা, ধান্দা ও বারৈহাটি নামক তিনটি গৌণ দোষ প্রাপ্ত হন। এই তিনটিই মার্জ্জিত দোষ। বন্দ্যঘটীবংশীয় হিরণ্যের সহিত কাজ করাতে নান্দা এবং শ্রীনাথ চট্টের সহি সংসৃষ্ট সাবর্ণ গোত্রীয় (গাঙ্গুলীবংশীয়) নীলকণ্ঠের সহিত কাজ করাতে ধান্দা দোষ গঙ্গানন্দে সংক্রান্ত হয়। শ্রীনাথ চট্টের অনূঢ়া কন্যা ধন্দঘাট নামক স্থানে তত্রত্য থানাদার হাসাই কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় শ্রীনাথ চট্টের কুলে দোষ জন্মে; এই দোষ ধান্দা নামে খ্যাত।

"অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্দঘাট স্থলে গতা।
হাসাই থানাদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥" (কুলরামঃ)
"নাথাই চট্টের কন্যা হাসাই থান্দারে।
সেই কন্যা বিভাকরে বন্দ্যগঙ্গাধরে॥"

(ঘটকের করিকা)

এই অপহৃতা অনূঢ়া কন্যাকে পরে বন্দ্যঘটীবংশীয় গঙ্গাধর বিবাহ করেন; সুতরাং গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ধান্দাদোষ জন্মে। অনন্তর গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীনাথ চট্টের সংশ্রব হয় এবং শ্রীনাথ চট্টের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর ও নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর সহিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মুখোপাধ্যায়ের সংশ্রব হয়। ইহার পরে যখন গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কাটাই বারৈহাটি দোষ প্রাপ্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কুল করেন, তখন মুলুকজুরী সপ্তশতি বিবাহ দোষ প্রাপ্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শিবাচার্য্যকে বর দেওয়ায় গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যে এই মুলুকজুরী দোষসংক্রান্ত হয়; এই জন্য গঙ্গানন্দে অমার্জ্জিত দোষসংক্রান্ত হওয়ায় ফুলিয়ামেলের উৎপত্তি।

আইন-ই-আকবরির মতে বল্লাল পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। অনেকের মত এই যে বল্লাল সেন ১০৯১ শকে "দানসাগর" গ্রন্থ লিখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

বসন্ত রায়—যশোহরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। (প্রতাপাদিত্য দেখ)। (২) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইনি ভক্তকবি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বাণভট্ট—ইনি বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকাব্য কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচনা করিয়া ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি কান্যকুব্জের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম ভূষণবাণ। কাদম্বরীর পূর্ব্বার্দ্ধ লিখিয়া বাণভট্ট পরলোক গমন করেন। তদীয় পুত্র ভূষণবাণ

উত্তরভাগ রচনা করিয়া পিতার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। পিতার গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিতে যাইয়া ভূষণবাণ লিখিতেছেন যে, তিনি কবিত্বদর্পে এই কাব্য লিখিতেছেন না ; পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

"যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্দ্ধং
বিচ্ছেদমাপ্তভুবি যস্তু কথাপ্রবন্ধঃ।
দুঃখং সতাং তদসমাপ্তি কৃতং বিলোক্য
প্রারব্ধ এষ চ ময়া ন কবিত্বদর্পাৎ।"

বাপ্পা—মিবারের (চিতোরের) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই সৌভাগ্যশালী বীরপুরুষ মিবারের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ ঘন শৈল মালার অভ্যন্তরে অবস্থিত ইদর নামক জনপদের রাজা নাগাদিত্যের পুত্র। এই জনপদ ভিলদিগের দ্বারা অধ্যুষিত। বাপ্পা গোহিলেট বা গিহ্লেট বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের আদিপুরুষ গোহ। গোহ হইতে তদীয় বংশ গোহলেট বা গিহ্লেট নামে অভিহিত। বাপ্পার পিতা ভিলদিগের হস্তে নিহত হন। এই সময়ে বাপ্পার বয়স তিন বৎসর মাত্র। ভিলেরা রাজবংশ সমুচ্ছেদের চেষ্টা করে। রাজপুরোহিতের চেষ্টায় বাপ্পা ভিলগণের অজ্ঞাতসারে এক নিরাপদ স্থানে নীত হইলেন। এই স্থান পরাশর অরণ্য নামে খ্যাত; ইহা ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপনিচয়ে সমাকীর্ণ। রাজপুরোহিত গোপনে কতকগুলি ব্রাহ্মণের হস্তে বাপ্পার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বাপ্পা প্রথমে এই ব্রাহ্মণগণের গোরক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে নানা ঘটনাবৈচিত্রে এবং দেবানুগ্রহে তিনি আপনার মাতুল সম্পর্কীয় মৌর্য্যবংশীয় চিতোররাজ মহারাজ মানসিংহের সভায় উপস্থিত হন। এখানে তিনি মহারাজ মানসিংহের বিশেষ অনুগৃহীত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ স্বীয় ভাগিনেয় বাপ্পাকে ভরণপোষণের উপযুক্ত ভূমিবৃত্তি দান করেন। এই সময়ে একজন বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক চিতোরপুরী আক্রান্ত হয়। মহারাজ বাপ্পার উপর যুদ্ধের ভার অর্পণ করেন। অন্যান্য সেনাপতিগণ ইহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধে মনোযোগ দিলেন না। কিন্তু বাপ্পার অমিতবিক্রমে আক্রমণকারী শত্রু পরাজিত হইল। বাপ্পা জয়লাভ করিয়াও চিতোরে ফিরিলেন না। তিনি আপনার পিতৃপুরুষদিগের রাজধানী গজনী নগরে গমন করিলেন। এই সময়ে সলিম নামক একজন মুসলমান নরপতি গজনীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। বাপ্পা সলিমকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তথায় একজন সূর্য্যবংশীয় সামন্তকে স্থাপন করেন। চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সৈন্যগণের সাহায্যে মহোপকারী মাতুল চিতোররাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং চিতোরের রাজা হইলেন। তিনি জীবনের শেষকালে প্রতীচ্য খোরাসান রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন। তিনি মাতৃভূমি ও সন্তান সন্ততিগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে বাস করেন এবং মুসলমান রমণীদিগকে বিবাহ করেন। এই সমুদয় রমণীর গর্ভে তাঁহার বহু পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। তিনি পূর্ণ একশততম বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। (ইতিহাস)

বাসুদেব সার্বভৌম—(১) নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য। তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে মিথিলা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বাসুদেব ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গমন করেন এবং তথায় বিখ্যাত পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "সার্ব্বভৌম" উপাধি লাভ করেন। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ মিথিলা ব্যতীত কোথাও পাওয়া যাইত না। যে সমুদয় ভিন্ন দেশীয় ছাত্র মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে গ্রন্থগুলি মিথিলার টোলে রাখিয়া আসিতে হইত। বাসুদেব ইহা দেখিয়া গাঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত ন্যায়শাস্ত্রীয় "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থের ৪ খণ্ড এবং কুসুমাঞ্জলির কতকগুলি শ্লোক

কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আগমনের সময় তাঁহার নিকট হইতে যখন স্থায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি রাখিয়া লেওয়া হয়, তখন তিনি বলিলেন "আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে।" ইহাতে মিথিলার অধ্যাপকগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, নবদ্বীপের পথে আসিলে মৈথিল অধ্যাপকগণের চক্রান্তে তাঁহার জীবন সংশয় হইতে পারে; ইহা চিন্তা করিয়া তিনি নবদ্বীপে আসিবার ছলে বারাণসীর পথে গমন করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। কাশীতে কিছুকাল বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তথায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমিণি ও চৈতন্যদেব বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র। কেহ কেহ বলেন, বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট তদীয় জীবনের শেষভাগে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুমতি লইয়া রঘুনাথ শিরোমণি স্থায়শাস্ত্র শিক্ষার্থ মিথিলায় গমন করেন এবং তথায় বিখ্যাত বৃদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাভূত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

(২) বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে সকলের নিকট পরিচিত। পুরীধামে ইঁহার অশেষ সম্মান। নীলাচলে ইঁহার সহিত মহাপ্রভুর বিচার হয়। দ্বৈতবাদী শ্রীচৈতন্যের নিকট অদ্বৈতবাদী সার্ব্বভৌম বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। ইনি স্থায়শাস্ত্রের টীকা এবং অমরকোষের টীকা রচনা করেন।

বিক্রমাদিত্য—উজ্জয়িনীর বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী রাজা। বিক্রমাদিত্য নিজে পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগকে প্রচুর অর্থদান করিয়া পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন। তাঁহার সভায় ৯ জন বড় পণ্ডিত ছিলেন; এই সকল পণ্ডিত নবরত্ন নামে অভিহিত হইতেন। পণ্ডিতগণের নাম কালিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, শঙ্কু ও বরাহমিহির।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥"

* অনেকের মতে বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাব কাল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ৫৬ বৎসর নিরূপিত হইয়াছে। এই বিখ্যাত নৃপতির কোন বিশ্বাসযোগ্য জীবনচরিত পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবনচরিত কতকগুলি প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর স্থাপিত। কেহ বলেন যে, বিক্রমাদিত্য পিতার দ্বিতীয় সন্তান; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্কু পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। শঙ্কু বিক্রমাদিত্যকে বধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ংই বিক্রমের কৌশলে হত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বধের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার কেহ বলেন, বিক্রমাদিত্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্তৃহরির উপর কিয়ৎকালের জন্য রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিদেশে বহির্গত হন। তিনি মহিষীর কলুষিত স্বভাব জ্ঞাত হইয়া সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়েন এবং রাজ্যত্যাগ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অবশেষে কোন কারণে আবার স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করেন। এই সকল কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। ইঁহার রাজধানী উজ্জয়িনী বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার নাম অবন্তী বা অবন্তিকা। উজ্জয়িনীতে যে শিবলিঙ্গ আছে তাঁহার নাম মহাকাল এজন্য অবন্তী বা উজ্জয়িনীকে মহাকালপুরী বলে। বিষ্ণুর মস্তক অযোধ্যা, নাসা বারাণসী, জিহ্বামূল মথুরা, হৃদয় মায়াপুরী, নাভি দ্বারাবতী, কটি এবং পাদ অবন্তী; এজন্য অবন্তীর অপর নাম বিষ্ণুপাদ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই নগরীতে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার বিশাল শোভাসন্দর্শন করিয়া বিশালা নাম রাখেন। কলিযুগে অবন্তীর নাম উজ্জয়িনী।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—এই বিখ্যাত মহাপুরুষ শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আজীবন ধর্ম্মচর্চ্চায় রত থাকিয়া যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন। যোগপথের চারিটি অবস্থা বর্ণিত আছে। প্রবর্ত্তক, সাধক, যুঞ্জনসিদ্ধ ও যুক্তসিদ্ধ। প্রবর্ত্তক অবস্থার মধ্যে ধর্ম্মের প্রাথমিক কয়েকটি ভাব মাত্র উন্মেষিত হয়, যথা দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম ও পবিত্রতা। তৎপরে সাধক অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব অল্প অল্প থাকে এবং এই অবস্থার শেষভাগে সুস্পষ্ট ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। তাহার পর যুঞ্জনযোগীদিগের অবস্থা। তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বর সহবাসে থাকেন এবং বিবিধ সত্যলাভে জীবন কৃতার্থ করেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইঁহাদেরও বিচ্ছেদ হয়; সেই সময় ইঁহারা অত্যন্ত ক্লেশে থাকেন। ইঁহাদেরও মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন যোগের অবস্থায় থাকিয়া সেই পূর্ণ পরমেশ্বরে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন. তাঁহাদিগকে যুক্তযোগী কহে। এই অবস্থাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। (যোগ সাধন)

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ১৭৬৩ শকের (১৮৪১ খৃঃ) ১৯শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে নদীয়া জিলার অন্তর্গত শিকারপুরের অদূরবর্ত্তী দহকুল নামক গ্রামে মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী এবং গর্ভধারিণীর নাম স্বর্ণময়ী দেবী। পিতা পণ্ডিত ও একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং মাতা দয়া, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি নানাগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। গোসাঁইজী মাতাপিতার দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম ব্রজগোপাল। বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত গোপীমাধব গোস্বামীর পত্নী বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে যিনি দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার ও জনক আনন্দকিশোরের মৃত্যু হয়। সুতরাং গর্ভ-ধারিণীর উপরই ইঁহার প্রতিপালনের ভার পুনর্ব্বার পতিত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া টোলে প্রবেশ করেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। এখানে তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়বলে এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। অনন্তর তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে হিন্দুশাস্ত্র পড়ার প্রতি তাঁহার আগ্রহ জন্মে এবং তিনি বেদান্তের আলোচনায় ব্রতী হন। এই সময়ে তিনি বগুড়া জিলায় কোন শিষ্যবাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে কোন শিষ্যা তাঁহার পদপূজা করিতেছিলেন; এমন সময়ে তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। গোসাঁইজী মনে করিলেন, এই স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস যে, আমার পদপূজাই তাঁহার উদ্ধারের উপায়; কিন্তু আমার কি অন্যকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা আছে? আমি নিজে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার স্থিরতা নাই, অপরের পরিত্রাণ কিরূপে করিব?" ইহার পর আর একটি ঘটনা হয়। "পরলোক চিন্তাকর" তিনি এই অশরীরিণী বাণী শুনিতে পান। তিনি বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণে অশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে তাঁহাকে কোন প্রয়োজনে পুনরায় বগুড়া যাইতে হইল। সেখানে তিন জন একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়; গোসাঁই তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন; এবং তাহারা তাঁহাকে কলিকাতায় যাইয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। গোসাঁই বগুড়া হইতে কলিকাতা আসিলেন। ব্রাহ্মসমাজে গমনের পূর্ব্বে প্রথমতঃ তিনি শাস্ত্রানুযায়ী নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন; বেদান্তচর্চ্চার পর এই কার্য্যে তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হয়।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়া দেবীর সহিত তাঁহার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়; তৎকালে যোগমায়া দেবীর বয়স ৬ বৎসর মাত্র ছিল। এই মহিলা অতি সদ্‌গুণ সম্পন্না ছিলেন; তাঁহাকে আজীবন স্বামীর ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে দেখা গিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন; সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি "পাপীর দুর্দ্দশা ও ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শিণী ভাষায় যে উপদেশ দান করেন, তাহা শ্রবণ

করিয়া গোসাঁইর চিত্তে এক অপূর্ব্বভাব প্রবেশ করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ শ্রবণ করিবার পর হইতে তিনি কয়েকজন সমপাঠীর সহিত নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে লাগিলেন। এদিকে বিজয়কৃষ্ণ ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের অভিপ্রায়ে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র হিতসঞ্চারিণী নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন; গোস্বামী মহাশয় এই সভার একজন সভ্য ছিলেন। একদিন এই সভাতে আলোচনা হয় যে, যাহা সত্য বলিয়া বোধ হইবে তদ্রূপ আচরণ না করা কপটতা। গোস্বামী মহাশয় জাতিভেদ মানিতেন না; জাতিভেদ না মানিয়া উপবীত ধারণ করা কপটতা, ইহা মনে করিয়া উক্ত আলোচনার দিনই তিনি উপবীত পরিত্যাগ করেন। তিনি যখন পূর্ব্বে বেদান্ত চর্চ্চায় রত ছিলেন, তখন একদিন শান্তিপুরের বাটীতে এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে জননীর অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াতে পুনরায় উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় স্বপ্রণীত "যোগসাধন" নামক পুস্তকে পরবর্ত্তী ঘটনা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

"পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি। তথায় করুণাময়ের কৃপায় অনেক সত্য ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার অল্প শক্তিতে যে পরিমাণ সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়া লইলেন। তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে অনেক বিপদ্ আপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্যলাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান ধারণাদি করিতে শিখিলাম;—এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম সত্য, কিন্তু কেন জানি না, এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময়ই তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইতে হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত।"

"শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে আমি যখন বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয় এবং তাহাতে দেখি যে, জীবনের প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে, সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থাৎ তখনও পাপাসক্তির মূল জীবিত ছিল। অবকাশ পাইলেই অনায়াসে আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্ম্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান, ধারণাদি এবং নানাদেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া. হায়! আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ্ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে, ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহ বাস ব্যতীত ইহার আর কোনও উপায়ই নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ঔষধি নাই। তখন নানাস্থানে ঐ ঔষধির অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক জন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম। তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্ম্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু তাহাতেও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পরিল না। আমার অন্তরের বস্তু সেখানেও পাইলাম না। তখন নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোরপন্থীদের কাছে গেলাম; তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিক-দিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধ যোগী, সকলের নিকটই গেলাম—কিন্তু কোথাও প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা-নামক পর্ব্বতে, একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।"

তিনি সাধন পাওয়ার পর গয়াধাম হইতে ঢাকায় আসিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ গ্রহণ করিলেন এবং উক্ত সমাজের প্রচারকনিবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি সাধনপ্রার্থী লোকদিগকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি সাধনে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার তৎকালীন কার্য্য উক্ত সমাজের নিয়মের বিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিলেন। তজ্জন্য গোস্বামী মহাশয় ১৮০৯ শকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকার অন্যত্র বাসাবাড়ী করিয়া কিছুদিন বাস করিলেন এবং পরে ঢাকার পূর্ব্বাংশে গেণ্ডারিয়া নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহের অল্প পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া প্রায় এক বৎসর বাস করেন। সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। গেণ্ডারিয়াতে অবস্থিতি কালে তিনি কিছুকালের জন্য মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তদীয় কুটীরের দেয়ালে নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

ওঁ হরিঃ

"এইছা দিন নাহি রহেগা।"

আত্ম প্রশংসা করিও না।

পরনিন্দা করিও না।

অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।

সর্ব্বজীবে দয়া কর।

শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

শাস্ত্র ও মহাজনদিগের আচারের সঙ্গে যাহা মিলে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে।

নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

গোস্বামী মহাশয় ১৮১৫ শকে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে যত বড় বড় সাধু আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কুম্ভমেলা হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। কুম্ভমেলায় যাওয়া অবধি তিনি আর রাত্রিতে শয়ন করিতেন না। দিন যামিনী ভগবৎচিন্তায় মগ্ন হইয়া আসনে বসিয়া থাকিতেন। কেবল আহারাদি নিয়মিত কার্য্যগুলি অভ্যাসবশতঃ যথাসময়ে নির্ব্বাহ করিতেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রায় চল্লিশ জন সাধুদ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি একদিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে, সাধু চিনিবার উপায় কি? গোঁসাই উত্তর দিলেন যে, সাধু চিনা বড় শক্ত; তবে কয়েকটী বাহ্যলক্ষণ আছে যথা ;—

১। সাধু কথনও আত্মপ্রশংসা করেন না।
২। সাধু কথনও পরনিন্দা করেন না।
৩। সাধু কথনও বুজরুকী করেন না।
৪। সাধু কথনও অপরের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করেন না।
৫। সাধু কথনও ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

গোস্বামী মহাশয় ১৮১৯ শকের শেষভাগে শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করেন। তিনি তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মিউনিসিপালিটির আদেশে সেখানে বানর বধ করা হইতেছে। এই নিষ্ঠুর আচরণে তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইল এবং তাঁহার উপদেশমতে তদীয় কতিপয় শিষ্য এই কার্য্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্টের আদেশে এই নিষ্ঠুর কার্য্য রহিত হয়।

গোস্বামী মহাশয় নিঃসম্বল ছিলেন। কিন্তু তিনি পুরীধামে দানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

গীতোক্ত এই বাক্য যে কথার কথা নয়, গোস্বামী মহাশয়ের এই কার্য্য দ্বারা তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দান ধর্ম্ম উদ্‌যাপিত হওয়ার পর ১৮২১ শকের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে (চান্দ্র জ্যৈষ্ঠ—কৃষ্ণা দ্বাদশীতে) ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি পুরীধামে দেহত্যাগ করেন। তিনি যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার দেহ দাহন করিয়া নরেন্দ্রসরোবরের উত্তর তীরে সমাহিত করা হয়; সেই সমাধির উপর এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি অনেক লোককে যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয় গয়াধাম হইতে ঢাকায় আসিবার পর, ব্রাহ্ম সমাজে অবস্থিতি কালে, যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কতিপয় উপদেশ "বক্তৃতা ও উপদেশ" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ সময়ে "বামাবোধিনী পত্রিকায়" "আশাবতীর উপাখ্যান" নামে যে একটী উপাখ্যান লিখিয়াছিলেন, তাহাও পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজয় সেন—বঙ্গের সেনবংশীয় প্রথম রাজা সামন্ত সেনের পুত্র। সামন্ত সেন দাক্ষিণাত্য হইতে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া বাস করেন। বিজয় সেন গৌড় ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ জয় করিয়া স্বীয় নাম বঙ্গে প্রথিত করেন। বিজয় একজন বীরপুরুষ ছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গে সেন বংশীয়দের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। (বল্লাল সেন দেখ)।

বিদ্যাপতি—বিখ্যাত মৈথিল কবি। ইনি "পুরুষ পরীক্ষা" নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম গণপতি; পিতামহ জয়দত্ত। ইনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের আশ্রিত ও তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছিমা দেবীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি রাজার নিকট হইতে বিসপী নামক গ্রাম প্রাপ্ত হন; দানপত্র এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার জন্মস্থান ও জন্ম সময় কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। তবে ইহা জানা আছে যে, তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোক। কাহারও মতে ১২৪০ শকে (ইং ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার জন্ম। তাঁহার রচিত মৈথিলভাষায় লিখিত রাধাকৃষ্ণঘটিত ভাবময় পদাবলী বঙ্গের সর্ব্বত্র আদৃত। দুই একটী মধুর পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পদাবলী ও পুরুষপরীক্ষা ব্যতীত তিনি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সমুদয় গ্রন্থ মিথিলায় এখনও বর্ত্তমান আছে।

"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥"
"অরুণ পূরব দিশ, বহল সগর নিশ
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ অরবিন্দা॥

কমর বদন, কুবলয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর, কুসুম তুঅ সিরজিল
কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে॥"
"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥"

চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাবলী বড় ভালবাসিতেন। উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক ছিলেন। বিদ্যাপতি বঙ্গীয় কাব্য কাননের পিকবর। বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে আশ্চর্য্য উপাখ্যান মিথিলায় প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারিগণ এখনও মিথিলার অন্তর্গত বিসপী গ্রামে বাস করিতেছেন। এই সমুদয় প্রমাণ সত্ত্বেও কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিদ্যাপতি পাটনা বা ভাগলপুর বিভাগের লোক।

বিবেকানন্দ (স্বামী)—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য। ইঁহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন। জন্মস্থান, সংসার এমন কি স্বীয় নামটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। স্বামীজি তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সর্ব্বজন পরিচিত ছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য বক্তৃতাশক্তি ছিল। তাঁহার স্বভাব সরল, পবিত্র ও মধুর ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধিধারী ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে চাকুরী করিয়া অথবা ওকালতী করিয়া প্রতিভাবলে যশ ও অর্থ উভয়ই উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যশ, ধন সবই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন স্বামীজি আমেরিকায় গমন করিয়া কালিফর্ণিয়াতে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; ইহার ফলস্বরূপ তথায় এক মঠ স্থাপিত হইয়াছে। কালিফর্ণিয়ার প্রধান নগর সানফ্রান্সিস্কোতে এক বেদান্ত সভা স্থাপিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা জন্মিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁহার ধর্ম্মমতে নাস্তিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। পরমহংসদেবের উপদেশে তাঁহার ধর্ম্মভাবের মলিনতা দূর হইল। তিনি গৃহ, পুত্রকলত্রবাঞ্ছা, নাম, যশ, ধনাকাঙ্ক্ষা সমস্ত ত্যাগ করিয়া এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তে গৈরিক বসন, দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী সাজিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার চিকাগো সহরে এক 'ধর্ম্ম মহাসভা' (Parliament of Religion) খোলা হয়। এই মহাসভায় তাঁহার বক্তৃতা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র শ্রোতা আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি নিউইয়র্ক সহরে লোক শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি সভাসমিতিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এখানে ১২ জন লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রত্যহ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথায় বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় নিউইয়র্কে গমন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি আবার ইংলণ্ডে যান। এই বর্ষের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে প্রচার করিয়া ভারতে আগমন করেন। এখানে তিনি দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপের অন্তর্গত কলম্বো হইতে উত্তরে হিমালয়ের প্রান্তে আলমোড়া পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বড় সহরে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীরা নানাস্থানে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃঃ ১৯শে মার্চ্চ তিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন।

এখানে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ধর্ম্মপরায়ণ উকীলবৃন্দ তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। এখানে তিনি কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানে গমন করেন এবং ঢাকায় প্রত্যাগমন করিয়া ৩০শে মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় জগন্নাথকলেজগৃহে ও তৎপরদিন পোগোজস্কুলগৃহে বক্তৃতা করেন। অনন্তর ৬ই এপ্রিল তিনি চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা দর্শন করিয়া শিলং উপস্থিত হন। সেখানে আসামের চিফকমিশনার সার হেনরি কটন সাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই তিনি বেলুরমঠে অকালে ৩৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

বিম্বিসার—মগধের প্রাচীন রাজা। ইনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক এবং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার পুত্রের নাম অজাতশত্রু।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—ইনি "কৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "বিল্বমঙ্গল" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সুললিত গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার "লীলাশুক" উপাধি হয়। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর তীরে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি যৌবনে অত্যন্ত লম্পট ছিলেন। ইনি পিতৃশ্রাদ্ধদিবসে মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে এক শব আশ্রয় করিয়া নদী উত্তীর্ণ হন এবং এক অজগর সর্পের পুচ্ছ ধারণ করিয়া প্রণয়িনী বেশ্যার গৃহে উপনীত হন। বেশ্যাটি তিরস্কার করিয়া বিল্বমঙ্গলকে যাহা বলে তাহার মর্ম্ম এই :—("আমার নিকট আগমনে তুমি যে একাগ্রতা দেখাইয়াছ, যদি তোমার তদ্রূপ একাগ্রতা ভগবানে থাকিত, তবে তুমি মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে।") বেশ্যার এই উক্তি শুনিয়া বিল্বমঙ্গলের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি সোমগিরি নামক কোন সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীদিগের "গিরি", "পুরি" প্রভৃতি উপাধি শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টি করেন। বিল্বমঙ্গলের রচিত গ্রন্থে অদ্বৈতবাদই ব্যক্ত হইয়াছে। এই দুই কারণে প্রতীতি হয় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ১৭২৭ শকে (ইং ১৮০৫ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কল্যাণী গ্রামে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সঙ্গমলাল, মাতা যমুনা দেবী; ইঁহার পূর্ব্বনাম বংশীধর। ইনি ১৭শ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং নাসিক, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরীতে পরিভ্রমণ করিয়া এবং নানা বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া হরিদ্বার ও কনখল অতিক্রম করিয়া বদরিকাশ্রমে উপনীত হন। বদরি নারায়ণের সমীপবর্ত্তী বিষ্ণু প্রয়াগ ও হৃষীকেশ নামক তীর্থে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া দুইজন সিদ্ধ পুরুষের নিকট নানা দর্শন শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের অতি গূঢ় বিষয় অবগত হন। এখান হইতে তিনি সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হন। এই মহাতীর্থের দশাশ্বমেধ ঘাটে তৎকালে গৌড়স্বামী নামে এক অসাধারণ পণ্ডিত ও যোগী বাস করিতেন। বংশীধর এই মহাত্মার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং গুরুর নিকট বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন। ১৭৮১ শকে গুরু দেহত্যাগ করিলে বিশুদ্ধানন্দ গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। স্বামীজীর নিকট নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বহু শিষ্য কাশীধামে আগমন করিতে লাগিল। বিখ্যাত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত ইঁহার বিচার হয়। (দয়ানন্দ সরস্বতী দেখ)। কেহ কেহ বলেন, এই বিচারে দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছিলেন। বিগত ১৮২০ শকে (ইং ১৮৯৮ খ্রীঃ) স্বামী বিশুদ্ধানন্দ দেহত্যাগ করেন।

বিশ্বনাথ (কবি-রাজ)—ইনি সাহিত্যদর্পণ নামে প্রসিদ্ধ অলঙ্কারশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

(পণ্ডিত) বিশ্বম্ভর নাথ—১৯০৭ সনের ১৪ই আগষ্ট যুক্ত প্রদেশের নেতা, জাতীয় মহাসমিতির অকৃত্রিম সুহৃদ্ এই মহাত্মা পরলোক গমন করিয়াছেন। বিশ্বম্ভর এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল, এলাহাবাদ ইউনি-ভার্সিটীর সম্মাননীয় সভ্য এবং মাদকতা নিবারণ প্রভৃতি বহু দেশহিতকর ব্যাপারের অকৃত্রিম সহায় ছিলেন। একবার তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইয়াছিলেন। ১১শ কংগ্রেসে তাঁহার

সভাপতি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বহুকাল সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া বিশ্বম্ভর বার্দ্ধক্যে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিশ্ব সিংহ—কামরূপের কোচবংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। মহাভারতোক্ত ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। তদ্বংশীয় লোকেরা বহুকাল এই প্রদেশে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া কালের অতীত অন্ধকার গর্ভে লীন হইয়াছেন। এই বংশের লোপের পর কামরূপের পরাক্রম হ্রাস হইতে লাগিল; এই রাজ্য নানা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইল। কালবশে হিন্দু ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল; হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দু দেবমন্দিরাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইল। যে কামাখ্যাপীঠের মাহাত্ম্য পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর মুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই পীঠের উপরিস্থ মন্দির ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। পীঠ বহুকাল অরণ্যমধ্যে লুপ্তাবস্থায় ছিল। ভগদত্ত বংশীয় রাজগণের পরে যে সকল বংশের রাজগণ কামরূপে আধিপত্য করেন, তন্মধ্যে কোচবংশীয়দের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। কোচবংশের আদিপুরুষ "হাজো" "হাজু" "হাজি" বা "হাথিয়া" প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার হিরা ও জিরা নামে দুইটি কন্যা ছিল। হারিয়া নামে জনৈক পরাক্রমশালী লোক হিরা ও জিরাকে বিবাহ করেন। হিরার গর্ভে শিশু এবং জিরার গর্ভে বিশুর জন্ম হয়। শিশু ও বিশু ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। বিশু বিশ্বসিংহ নাম ধারণ করিয়া রাজা হইলেন এবং শিশু শিবসিংহ নাম ধারণ করিয়া যুবরাজ পদে বৃত হইলেন। বিশ্বসিংহ নিকটবর্ত্তী রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইলেন (১৫১৫ খ্রীঃ)। একদা বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ কামাখ্যা শৈলে উপস্থিত হন। তথায় মেচ বা কোচ জাতীয় কয়েক ঘর লোক বাস করিত। দুই ভাই পথহারা হইয়া ঐ কোচজাতীয় লোকদের গৃহে উপস্থিত হন। তথায় কোন পুরুষের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই, কেবল একটি বৃদ্ধার সহিত দেখা হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে বিশ্রাম করিতেছিল। বৃক্ষের নিম্নে একটি মাটির স্তূপ (ঢিপ) ছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কি?" বৃদ্ধা বলিল, "উহা আমাদের দেবতা।" তখন তিনি পথহারা সঙ্গীদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ঐ দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। অচিরে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল; তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। অনুসন্ধানে রাজা উহা শক্তিপীঠ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং মানস করিলেন যে, যদি দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপিত হয়, তবে তথায় তিনি সোণার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; দেশে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। রাজার আদেশে অশ্বত্থ বৃক্ষ কর্ত্তিত হইল, এবং তাহার নীচে পীঠস্থান আবিষ্কৃত হইল। প্রাচীন মন্দিরের নিম্নভাগ ভূগর্ভের নীচে পাওয়া গেল। তদুপরি রাজা বিশ্বসিংহ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। প্রত্যেক ইটের সহিত এক রতি সোণা দেওয়া হইল। বিশ্বসিংহ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কোচবিহার হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কামাখ্যায় দেব সেবার জন্য পাঠাইলেন। নবদ্বীপ, মিথিলা, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া রাজা পুরাণ ও তন্ত্রের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলেন এবং স্বয়ং দেবীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তিনি পালনশক্তিপ্রকাশক নারায়ণ শব্দটি তাঁহার সন্তানগণের নামের সহিত সংযোজিত করিয়া দিলেন। এখনও কোচবিহারের রাজাদের নামের সঙ্গে নারায়ণ শব্দটি আছে।

বিষ্ণুপুরি—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। ইনি বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর রচয়িতা। ইঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ।

(মাধবেন্দ্রপুরি দেখ)।

বিষ্ণুস্বামী—ইনি বেদের অন্যতম ভাষ্যকার। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায় 'রুদ্রসম্প্রদায়' নামে খ্যাত। ইনি ১৫০০ শকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিহ্লণ—বিখ্যাত কবি। ইনি কণকাদ্রির উত্তরে স্থিত মহাপঞ্চাল দেশের রাজকন্যাকে গোপনে বিবাহ করাতে চোর কবি নামে খ্যাত হন। এই কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নভোমণ্ডলের বর্ণনা করেন।

"নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশি
নৈতাশ্চতারা নবফেণভঙ্গাঃ।
নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো
নাসৌ কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ ॥"

সাহিত্যদর্পণ নামক সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে এই শ্লোকটি অপহ্নুতি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাপঞ্চালের রাজধানীর নাম লক্ষ্মীমন্দির ও রাজার নাম মদনাভিরাম। ইনি রাজকন্যা যামিনীপূর্ণতিলকার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া ইনি কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি জন্মান্ধের মুখ দেখিবেন না এবং কবির প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তাকে দর্শন করিবেন না। যাহাতে উভয়ের দেখা না হয়, এজন্য রাজকুমারীকে বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার শিক্ষক জন্মান্ধ এবং কবিকে বলা হইয়াছিল যে, রাজকুমারী কুষ্ঠরোগগ্রস্তা। সুতরাং যবনিকার অন্তরাল হইতে রাজকুমারীকে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু নিয়তির বাধা দেয় কাহার সাধ্য। কবি এক রাত্রিতে উপরিউক্ত শ্লোকে নভোমণ্ডলের বর্ণনা করিলেন; ইহা শুনিয়া রাজকন্যা মনে করিলেন, যে ব্যক্তি জন্মান্ধ সে কিরূপে নভোমণ্ডের এরূপ চমৎকার বর্ণনা করে? সুতরাং তাঁহার মনে ইহার জন্মান্ধতাসম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। রাজকন্যা ও কবির সাক্ষাৎ হইল; কবির সৌন্দর্য্যে রাজকন্যা মুগ্ধ হইলেন। ইঁহাদের প্রণয়সঞ্চার হইল এবং যথারীতি গন্ধর্ব্ববিবাহ সম্পন্ন হইল। এই ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি বিহ্লণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বিহ্লণ মশানে বসিয়া পঞ্চাশৎ শ্লোকে রাজকন্যার (পক্ষান্তরে ভগবতী দেবীর) রূপগুণাদি বর্ণন করেন। ইহা শুনিয়া রাজা কবিকে ক্ষমা করেন এবং তাঁহার হস্তে স্বীয় তনয়াকে অর্পণ করেন। ইনি দ্বিতীয় চোর কবি। প্রথম চোর কবি সুন্দর (সুন্দর দেখ)। বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিতে এই চোর কবির উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং ইনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

বিষ্ণুশর্ম্মা—পঞ্চতন্ত্র প্রণেতা। কথিত আছে যে, চারিটী রাজপুত্রের শিক্ষার ভার ইঁহার উপর পতিত হয়। ইনি চঞ্চলমতি রাজকুমারগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কাককুর্ম্মাদির গল্প রচনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করেন। এই সমুদয় গল্প সংযোজিত ও সন্নিবদ্ধ হইয়া "হিতোপদেশ" নামক উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। যে 'হিতোপদেশ' পঞ্চতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত, তাহাতে "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" ইত্যাদি মহাকবি ভারবিবিরচিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুমান হয় পঞ্চতন্ত্রকর্ত্তা বিষ্ণুশর্ম্মা ভারবির পরকালবর্ত্তী।

বীরবল—ইনি ভাটবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইঁহার প্রকৃত নাম মহেশদাস ভাট। ইনি সম্রাট আকবরের রাজকবি ছিলেন। তিনি মনোরম আলাপে সম্রাট আকবরের মনস্তৃপ্তি করিতে পারিতেন, এজন্য ইনি সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট ইঁহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া "রাজা" উপাধি দান করেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এজন্য সম্রাট ইঁহাকে রাজকবির পদ দান করেন। ইনি আফগান সর্দ্দার ইউসুফজির বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরিত হন, কিন্তু পরাজিত হইয়া হত হন। (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি)।

বুদ্ধদেব—কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। ইঁহার অপর নাম গৌতম। ইনি গোপা নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন (গোপা ও গৌতম দেখ)। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্মমত জগতে প্রচার করেন, তাহা তাঁহার নিজ নামে খ্যাত। সমস্ত পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু বুদ্ধের জন্মস্থান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার নাই। তিব্বত, চীন ও জাপানের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

বৌদ্ধদের মতে ইন্দ্রিয় দ্বাদশটী, যথা -বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য ও লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন ও বুদ্ধি এই দুইটী উভয়েন্দ্রিয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন বলিয়া দেহকে দ্বাদশায়তন বলা হয়। ধর্ম্মোপার্জ্জন—এই দ্বাদশায়তন শরীরের শুশ্রূষারূপ পূজা করাই প্রধান কর্ম্ম। ইঁহাদের

দেবতা সুগত (বুদ্ধ)। ইঁহাদের মতে প্রমাণ দুইটী, যথা :—প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং জগৎ ক্ষণভঙ্গুর। বৌদ্ধেরা বলেন যে, প্রতিক্ষণে জগতের পরিবর্ত্তন হইতেছে সুতরাং কোন পদার্থই স্থায়ী নহে। মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনশীলতাই এই বিশ্বের প্রধান লক্ষণ। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের সহিত বৌদ্ধদর্শনের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। বুদ্ধদেব ও কপিল উভয়েই সাংসারিক দুঃখে কাতর। উভয়েই বলেন যে, দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা। এই সমুদয় হইতে অনুমিত হয় যে, সাংখ্যদর্শনই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল।*

বৌদ্ধগণ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক বৌদ্ধদিগের মতে জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ মিথ্যা, সকলই শূন্য। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তুমাত্রই অলীক, কেবল বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ বাহ্যবস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ মনে করেন এবং বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্যবস্তু সমুদয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৌদ্ধদিগের মতে সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্রস্থায়ী। এইরূপ স্থিরবাসনার নাম মার্গতত্ত্ব; এই মার্গতত্ত্বই মোক্ষ।

(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)।

বৃন্দাবন দাস—চৈতন্যভাগবতনামক বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রণেতা। এই ভক্ত বৈষ্ণব কবি ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খৃঃ) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোধান হয়। তিনি ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ৩ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের গয়া গমন পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে তাঁহার শেষলীলা বর্ণন করা হইয়াছে। এই শেষ খণ্ডে মহাপ্রভুর জীবনী বিস্তৃতরূপে লিখিত হয় নাই দেখিয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই বর্ত্তমান ছিলেন; মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসর পরে বৃন্দাবন এই চৈতন্যভাগবত রচনা করেন।

বেতালভট্ট—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন। ইনি রাজা বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করিয়া এক মনোরম গদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন; এই গ্রন্থের নাম "বেতালপঞ্চবিংশতি"। এতদ্ব্যতীত তিনি "নীতিপ্রদীপ" নামে কতকগুলি শ্লোকসমন্বিত এক ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের প্রথম শ্লোক এই :—

"রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈঃ
শ্রীখণ্ড খণ্ডৈর্মলয়াচলঃ কিং।
বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ॥"

বৈরাম খাঁ—সম্রাট হুমায়ুনের বিখ্যাত সেনাপতি। ইনি হুমায়ুনের সহিত পারস্য হইতে ভারতে আগমন করেন। তাঁহারই বীরত্বে নাবালক আকবর দিল্লীর সিংহাসনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আকবর সম্রাট হইয়া তাঁহাকে খান্‌খানান্ (Lord of Lords) উপাধি দেন। ইনি পরবর্ত্তী কালে বিদ্রোহী হইয়া সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে দাঁড়ান; কিন্তু পরাজিত হইয়া আকবরের নিকট নীত হন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াই নিরস্ত হন নাই; তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মক্কা যাত্রা করেন, কিন্তু গুজরাটে উপস্থিত হইলে মুবারিক খাঁ লোহানি নামক এক ব্যক্তির অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন (১৫৬১ খৃষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি)। হুমায়ুনের সাম্রাজ্যকালে এই ব্যক্তির পিতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বৈরাম খাঁ স্বহস্তে তরবারির আঘাতে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পুত্র এত দিন পরে আজ পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইল।

বোপদেব—বিখ্যাত "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ প্রণেতা। মুগ্ধবোধ ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত ৭ খানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। কবিকল্পদ্রুম, রামব্যাকরণ, কাব্যকামধেনু, শতশ্লোকচন্দ্রিকা এবং হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংসপ্রিয়া নাম্নী

ভাগবতী টীকা ত্রিতয়। কিন্তু মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম ও শতশ্লোকচন্দ্রিকা ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থগুলি এতদ্দেশে প্রচলিত নাই।

বোপদেবের পিতার নাম কেশব ও গুরুর নাম ধনেশ্বর; ইঁহারা উভয়েই চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন।

"দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা-
স্থানং বৈদপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যাং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥"

(শতশ্লোক চন্দ্রিকা)

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশব-নন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥"

(মুগ্ধবোধম্)

বৌধায়ন—আপস্তম্ব দেখ।

ব্যাড়ি—ইনি একজন সংস্কৃত অভিধান প্রণেতা। পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে এই অভিধানের বচন সকল প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি গুণাঢ্যের সমসাময়িক (গুণাঢ্য দেখ)। ব্যাড়ি বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন।



ভট্টনারায়ণ—শাণ্ডিল্যগোত্রজ ও বন্দ্যোপাধ্যায়গণের আদিপুরুষ এবং বিখ্যাত বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা। বঙ্গের সেনবংশীয় আদি রাজা আদিশূর ৯৯৯ শকে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তন্মধ্যে অন্যতম। আদিশূরের যজ্ঞ সমাপনের পর এই পঞ্চব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, সিদ্ধকাম রাজা কিছুতেই তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না। রাজার সানুনয় প্রার্থনায় ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম সসম্মানে অর্পণ করিলেন। এই গ্রামগুলির নাম পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। ভট্টনারায়ণ অপর চারিজন ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল স্ত্রী ও ভৃত্যসহ কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আসেন নাই; তাঁহার সঙ্গে প্রভূত ধনরত্ন ছিল। রাজা আদিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য গ্রাম অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিলে, ভট্টনারায়ণ উক্ত দান গ্রহণে অসম্মত হন, তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন, "আমার সহিত প্রভূত ধন আছে; এই অর্থদ্বারা গ্রাম ক্রয় করা যাইতে পারে।" প্রবাদ এই যে, ভট্টনারায়ণ দান গ্রহণ না করিয়া স্বীয় অর্থদ্বারা গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন (আদিশূর দেখ)। জ্ঞানগরিমায় ও কবিত্বমহিমায় ভট্টনারায়ণ অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশে বহু প্রতিভাসম্পন্ন ও মহনীয়চরিত্র লোক জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ভট্টি—এই কবি স্বীয় নামে "ভট্টি" নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। টীকাকার ভরতমল্লিক বলেন যে, ইনি রাজা ভর্ত্তৃহরি হইতে অভিন্ন। কিন্তু ভট্টিকাব্যের শেষে গ্রন্থকর্ত্তা আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি বলভী-পতি রাজা নরেন্দ্রের রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যিনি নিজে রাজা, তিনি কেন অন্যের রাজধানীতে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিবেন? সুতরাং ভরতমল্লিকের কথা প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। টীকাকার জয়মঙ্গল ভট্টনামক কবিকে "ভট্টি" কাব্যের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভট্টিকাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনীই প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উদয়পুরের প্রাচীন রাজধানী বল্লভীপুর। উদয়পুরের রাজগণ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা রামচন্দ্রের বংশধরগণের রাজধানীতে স্বীয় গ্রন্থ লিখিবেন, অসম্ভব নহে। (ভর্ত্তৃহরি দেখ)।

ভট্টোজিদীক্ষিত—প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণের প্রণেতা। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীধর সূরি এবং ইঁহার পুত্র ভানুজিদীক্ষিত। এই বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টোজি সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যতীত আরও ৩৩ খানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে নিম্নে কয়েক-খানার নাম প্রদত্ত হইল:—অদ্বৈতকস্তুভ, ধাতুপাঠ, আচারপ্রদীপ, লিঙ্গানুশাসনসূত্রবৃত্তি, অশৌচনির্ণয়, আহ্নিককারিকা, তিথিনির্ণয়, প্রৌঢ়মনোরমা, মাসনির্ণয়, তীর্থযাত্রাবিধি ও শব্দকৌস্তুভ।

ভবদেব ভট্ট (মহামহোপাধ্যায়)—(১) পিতার নাম কৃষ্ণদেব মিশ্র; ইহার নিবাস মিথিলা। ইনি পাণ্ডিত্যহেতু মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি পাতঞ্জলসূত্র-ভাষ্য রচনা করেন।

(২) বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মার্ত্ত। ইহার পিতার নাম গোবৰ্দ্ধন। ইহার প্রণীত "প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ" মিথিলার পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদৃত। ইঁহার মন্ত্রণায় রাজা হরিবর্ম্মদেব ও তৎপুত্র বহুকাল রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি স্মৃতি, তন্ত্র, গণিত জ্যোতিষাদি নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি যেমন জ্ঞানপ্রবীণ তেমনি ইঁহার হৃদয়ও উন্নত ছিল; রাঢ়দেশের নানা স্থানে জলাভাব দূরীকরণার্থ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি জনসমাজের অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অপর নাম "বালবলভীভুজঙ্গ"। এখনও ইঁহারই পদ্ধতি অনুসারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের দশসংস্কার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ "বিন্দুহ্রদ" নামক বৃহৎ সরোবর ইহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ভবভূতি—ভারতের বিখ্যাত সংস্কৃত নাটককার। এই মহাকবি উত্তররামচরিত, বীরচরিত ও মালতীমাধব নামক তিনখানি প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করিয়া নাট্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই নাটকত্রয় লিখিতে গিয়া অদ্ভুত রচনা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। ভবভূতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদর্ভের (বর্ত্তমান বেরার) অন্তর্গত পদ্মপুরনামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি কাদম্বরীপ্রণেতা বাণভট্টের সমকালবর্ত্তী কবি। ইনি কনোজরাজ যশোবর্ম্মার সভাসদ্ ও রাজকবি ছিলেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মাকে পরাভূত করিয়া রাজকবি ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। ইঁহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ এবং পিতামহ গোপালভট্ট। নীলকণ্ঠ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার মাতা জাতুকর্ণগোত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি জাতুকর্ণি নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার রচিত তিনখানি নাটকই অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছে। বীরচরিত সর্ব্বপ্রথমে রচিত হয়, তৎপর মালতীমাধব ও উত্তররামচরিত। মালতীমাধব ও উত্তরচরিতে যে কবিশক্তি বিকসিত, বীরচরিতে তাহার উন্মেষমাত্র দৃষ্ট হয়। সমুদয় দিকে বিচার করিলে উত্তররামচরিতই ভবভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। ভবভূতির নাটক দীর্ঘ সামাসাঢ্যপদে সমলঙ্কৃত। এই কবির সময়ে কাব্যের উৎকর্ষ সমাসবাহুল্যের উপর নির্ভর করিত। শব্দ প্রয়োগের কৌশলে ও ভাবের উচ্চতায় তাঁহার কাব্য সংস্কৃতসাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংস্কৃতসাহিত্যে পাণ্ডিত্যহেতু তিনি "শ্রীকণ্ঠ" উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, মালতীমাধবই ভবভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক; কিন্তু সমালোচকের এই বিচার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ভবভূতি সংস্কৃত ভাষার উপর যেরূপ আধিপত্য দেখাইয়াছেন, অতি অল্প কবিই তদ্রূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভবানন্দ—বিখ্যাত ভক্ত বৈষ্ণব রায় রামানন্দের পিতা। (রামানন্দ রায় দেখ)।

ভবানন্দ মজুমদার—রামচন্দ্র সমদ্দারের পুত্র এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গের নবাব ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে মজুমদার উপাধি ও কাননগো পদ প্রদান করেন। ভবানন্দ স্বীয় পৈতৃকসম্পত্তি হইতে ফতেপুর, কাকুরগাছি ও পাটকাবাড়ি এই তিনটি গ্রাম তিন সহোদরকে ভাগ করিয়া দিয়া নিজে বল্লভপুর গ্রামে বাস করেন। এই সময়ে সম্রাট আকবরের আদেশে তদীয় সেনাপতি মানসিংহ বিখ্যাত প্রতাপাদিত্যকে

দমন করিতে বঙ্গে আগমন করেন। ভবানন্দ রাজা মানসিংহকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। সম্রাট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভবানন্দকে "রাজা" উপাধি দেন এবং নবদ্বীপ, কাশিমপুর প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। কাশীর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও মন্দির রাজা ভবানন্দ প্রতিষ্ঠিত করেন। দীর্ঘকাল সুখে রাজ্য ভোগ করিয়া ভবানন্দ দেহত্যাগ করেন। ভবানন্দের দুই রাণী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী। উভয়েই স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। চন্দ্রমুখীর তিন পুত্র গোপাল, গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ। রাজা ভবানন্দের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল রাজ্য লাভ করেন।

ভবানন্দ রায়—ইনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত দোহারের প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় রায়বংশের আদিপুরুষ। ইনি ৩৫৬ বৎসর পূর্ব্বে আকবর বাদসাহের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে দোহারের জমিদারীর উল্লেখ আছে। ভবানন্দ রায়ের সময় হইতে দোহারে অবিচ্ছেদে দুর্গোৎসব চলিতেছে। দোহারের রায়বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত; বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ইঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।

ভবানী (রাণী)—নাটোরের বিখ্যাত রাণী। ইনি "রাণীভবানী" নামে বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত। এই দানশীলা রাণী হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার জন্যই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি রাজসাহী জেলার প্রধান নগর নাটোরের রাজা রামকান্তের মহিষী ও রাজা রামজীবনের পুত্রবধূ। ১৬৬৮ শকে (ইং ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) রাজা রামকান্ত পরলোক গমন করেন এবং রাণী ভবানী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন। তাঁহার রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় দেড়কোটী টাকা ছিল, কিন্তু এতন্মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা তাঁহাকে নবাবসরকারে রাজস্ব দিতে হইত। রাণীভবানীর শ্বশুর রামজীবনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় রায়ান্ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারে কানুনগো কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামে এই বিস্তৃত জমিদারী লাভ করেন। রাণী ভবানী দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। তিনি এই রূপের গুণে রাজমহিষী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী; পৈতৃক নিবাস রাজসাহীর অন্তর্গত বর্ত্তমান বগুড়া জিলার ছাতিম (ছাতিয়ান) গ্রাম। রাণীর মাতার নাম জয়দুর্গা; লোকে তাঁহাকে কস্তুরী দেবী বলিয়া ডাকিত। দয়ারামনামে নাটোরের রাজসরকারে একজন বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন; ইঁহারই চেষ্টায় রূপবতী ব্রাহ্মণকুমারী ভবানী রাজপত্নী হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে দয়ারাম নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানি পদ লাভ করেন। বৃদ্ধ দেওয়ান দয়ারাম বালিকা রাণী ভবানীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাণী ভবানীর স্বামী রামকান্ত জমিদারী শৃঙ্খলায় রাখিতে পারেন নাই; যথারীতি কর আদায় হইত না; কাজেই নবাবসরকারে দেয় রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ রামকান্তের অযোগ্যতা দেখিয়া জমিদারীর ভার দেবীপ্রসাদ নামক অপর একব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। কেহ কেহ রামকান্তের রাজ্যচ্যুতির অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, রামরতননামে একজন চতুর জ্ঞাতি নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর নিকট যাইয়া দরখাস্ত করেন যে, রাজা রামকান্ত নাটোররাজের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহেন, দরখাস্তকারী নিজেই উহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আলীবর্দ্দি এই ব্যক্তির এজাহারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইঁহাকেই রাজসনন্দ্ দিয়া একদল সৈন্যসহ নাটোরে প্রেরণ করেন। রামরতন নাটোরে আসিয়া নবাব সৈন্যের সাহায্যে রাজবাটী অধিকার করেন। দয়ারাম, রাণী ভবানীকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগৎশেঠের অনুরোধে নবাব রামকান্তকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দেওয়ান দয়ারামই তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ও রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রাণী রূপে অতুলনীয়া হইলেও তাঁহার ভাগ্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তিনি অল্পবয়সেই বৈধব্যদশাগ্রস্ত হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক জ্বালাময় জীবনভার বহন করিয়াছিলেন। দেবসেবা, দুঃখীর দুঃখমোচন, জলাশয়খনন প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া রাণী জীবনভার কিয়ৎপরিমাণে লঘু করিতে চেষ্টা করিতেন। রাণী ভবানীর দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। ইহাদের একটি অন্নপ্রাশনের পরই দেহত্যাগ করে; রাজকুমারের নাম রাখা হইয়াছিল কাশীকান্ত। অপরটি অন্নপ্রাশন পর্য্যন্তও পৌছিতে পারে নাই, তৎপূর্ব্বেই পরলোক গমন করে। তৎপর তাঁহার

একটি কন্যা জন্মে। এই কন্যার নাম তারাসুন্দরী। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামনিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়, কিন্তু সাংসারিক সুখে তারাসুন্দরী জননী অপেক্ষাও অধিকতর দুর্ভাগ্যবতী। তারা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই বিধবা হইলেন; তারার সুখের প্রদীপ নিবিল। রাণী ভবানীর হৃদয়ে আর একটী শেল বিদ্ধ হইল। নিজের বৈধব্য ও প্রিয়তমা তনয়ার বৈধব্য তাঁহাকে আঁতে আঁতে যাতনা দিয়াছিল। রাণী ভবানী সংসারে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাণী তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কন্যাসহ গঙ্গাতীরবাসিনী হইলেন। রাজা রামকৃষ্ণ পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। রাণী ভবানী গঙ্গাতীরে বড়নগর নামক স্থানে স্বীয় বাসযোগ্য বাড়ী ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি প্রত্যহ শেষরাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া জপ করিতেন। জপ সম্পন্ন হইলে তিনি বাগানে যাইয়া স্বীয় হস্তে পুষ্পচয়ন করিতেন, দাসদাসীরা আলো লইয়া তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ গমন করিত। অনন্তর প্রত্যূষে যথাশাস্ত্র স্নানাহ্নিক সমাপন করিতেন। তৎপর দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক শিবপূজা সমাপ্ত করিয়া পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেন। অতঃপর স্বহস্তে পাক করিয়া দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন; পরে পরিবারস্থ সকল ব্রাহ্মণের ভোজনের পর নিজে আড়াই প্রহর বেলার সময় আহার করিতেন। আহারান্তে বিশ্রামের পর কুশাসনে আসীন হইয়া দেওয়ানকে বিষয়কর্ম্ম পরিচালন সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ দিতেন। এইরূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাণী জীবন অতিবাহিত করেন এবং ৭৯ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গগমন করেন। তাঁহার বড়নগর ভবনে অবস্থান কালে দুইটী দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমটী তাঁহার দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু এবং দ্বিতীয়টী তাঁহার বৈধব্যদশাগ্রস্তা লাবণ্যময়ী তনয়া তারাদেবীকে লাভের জন্য সিরাজদ্দৌলার বিফল চেষ্টা। রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিশ্বনাথ রাজপদে আসীন হন। তারাদেবীর রূপে মুগ্ধ সিরাজঘটিত ব্যাপারে কোন সত্যতা আছে কিনা বলা কঠিন। যাহাতে নবাব আলীবর্দ্দিখাঁর মৃত্যুর পর সিরাজ নবাবী পদ না পান, এজন্য বঙ্গীয় হিন্দুজমিদারদিগকে উত্তেজিত করিবার মানসে রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সিরাজচরিত্রে উক্ত কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন।

নাটোরের ৩০ মাইল দূরে করতোয়াতটে বগুড়া জিলার অন্তর্গত ভবানীপুর রাজা রামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র ও একটী তীর্থস্থান। রাণী ভবানীর নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ইহা অন্যতম মহাপীঠ। এখানে দেবী অপর্ণা ও বামন নামে ভৈরব আছেন। এখানে রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন বর্ত্তমান আছে।

নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রাণী ভবানী হইতে অধস্তন ষষ্ঠপুরুষমাত্র।

ভরত মল্লিক—বৈদ্যকুলোদ্ভূত বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। ইনি স্বীয় পাণ্ডিত্যের জন্য মহামহোপাধ্যায় ও যশশ্চন্দ্র রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহাকে লোকে ভরতসেনও কহিয়া থাকে। ইঁহার রচিত মুগ্ধবোধ-বোধিনী, ভট্টিকাব্যের টীকা, নলোদয়ের টীকা, কিরাতার্জ্জুনীয়ের টীকা ও কুমারসম্ভবের টীকা প্রসিদ্ধ। এই পাঁচখানিই প্রাথমিক টীকা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইনি রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগের একজন প্রধান কুলীন। এই পাঁচখানি প্রসিদ্ধ টীকা ব্যতীত তিনি উপসর্গবৃত্তি, কারকোল্লাস, দ্রুতবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদ্রচিত উপসর্গ বৃত্তি পাঠে জানা যায় যে, তিনি ১৭৫৮ শকে (ইং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ) বর্ত্তমান ছিলেন।

"শাকেঽষ্টশরসপ্তেন্দুমিতে চাষাঢ়কে কুজে।
সমাপ্তা চোপসর্গানাং বৃত্তিঃ প্রতিপদীন্দুজে॥"

ভরত শিরোমণি—ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। ইনি স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহুগ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরি—(১) বিক্রমাদিত্যের পিতা গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে এক দাসীর গর্ভে ইঁহার উৎপত্তি (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী)। ইনি কিয়ৎকাল উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন (বিক্রমাদিত্য দেখ)। ভর্ত্তৃহরি পত্নীর চরিত্রের পবিত্রতায়

সন্দিগ্ধ হইয়া রাজাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন; এই সময়ে তিনি একশত শ্লোকবিশিষ্ট তিনখানি কাব্য প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থত্রয়ের নাম শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক।

(২) এই ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন। ভট্টিকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি যে, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, তাহা ইঁহার গ্রন্থ পাঠেই অবগত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রতিশ্লোকে, প্রতিপদে শব্দ প্রয়োগের কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইনি বল্লভীরাজ শ্রীধরসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ভাউদাজী—ইঁহার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ভিটল। ইনি সারস্বত গাউদ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে পর্ত্তুগিজদিগের অধিকৃত গোয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভাউদাজীর পিতার নাম ভিটল রামকৃষ্ণ। পিতা কৃষিকার্য্য দ্বারা অতিকষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন, অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় ভাউদাজী বোম্বাই নগরে আগমন করেন। তিনি এই বাল্যকালেই দাবাখেলায় এত নিপুণ ছিলেন যে, একজন সাহেব তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতে তাঁহার পিতাকে পরামর্শ দেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভাউদাজী ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর পরেই তিনি এক বৃত্তি পান ও তৎসঙ্গে একটী রৌপ্যপদকও প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি এলফিন্‌ষ্টোন স্কুলে (Elphinstone school) এক কার্য্যগ্রহণ করেন। তিনি "শিশুহত্যা" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া ৬০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। এখন হইতে সংসারের ভার তাঁহার উপর পতিত হইল। তথাপি তাঁহার জ্ঞানপিপাসা কমে নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক বাহির হন এবং অল্প দিনের মধ্যে ডাক্তারি ব্যবসাতে অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি যে কেবল উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন এমন নহে, তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যও যথেষ্ট ছিল। তিনি এক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া তাঁহাতে স্বীয় ভ্রাতা নারায়ণ দাজীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তিনি চিকিৎসা প্রণালীতে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি বোম্বে এসোসিয়েসন (Bombay association) নামে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক সভাস্থাপন করেন। তিনি বহুকাল এই সভার সেক্রেটরি ছিলেন। এই সভা, গবর্ণমেণ্ট ও পার্লেমেণ্টে আবেদন নিবেদন করিয়া দেশের অনেক উপকার করিয়া থাকেন।

ভাউদাজী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" ছিলেন এবং বহুবার সিণ্ডিকেটের সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসায়িটির মেম্বর, বম্বে এশিয়াটিক সোসায়িটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, গ্রাণ্টকলেজ সোসায়িটির প্রেসিডেণ্ট, এবং জিওগ্রাফিকেল সোসায়িটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি "জি, সি, এম, সি" এবং "এম, আর, এ, এস" উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

ভানুমতী—ভারতখ্যাত কবি কালিদাসের পত্নী। ইনি ভোজরাজের দুহিতা। ইনি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। ভোজরাজবংশীয়গণ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় অতি নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহারা এই ক্রীড়ায় অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন; এজন্য ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার অপর নাম ভোজবাজী। ভানুমতীর নামানুসারে এই বিদ্যাকে হিন্দী ভাষায় "ভানুমতীকা-খেলা" ও বলা হইয়া থাকে।

ভারতচন্দ্র রায় (গুণাকর)—বিখ্যাত বঙ্গীয় কবি। ইনি নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ভারতচন্দ্র জমিদারের পুত্র। ইঁহার পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বর্দ্ধমান জিলার ভুরসুট পরগণায় পেঁড়ে-বসন্তপুর গ্রামের সন্নিহিত নরেন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে (ইঃ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ১১১৯ সাল) জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্র রায় নবাব আলীবর্দ্দিখাঁর সমসাময়িক লোক। তাঁহার বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ছিল। জমিদারী সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া নরেন্দ্র রায় তদানীন্তন বর্দ্ধমানের রাজমাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটূক্তি করেন। ইহাতে মহারাণী ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক নরেন্দ্র রায়ের জমিদারী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তদবধি নরেন্দ্র রায় গরীব হইলেন। পিতার দুরবস্থার সময় ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে গিয়া তদীয় আশ্রয়ে বাস করিতে

থাকেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাজপুর গ্রামে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করিয়া ঐ দুই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তাজপুরের নিকটবর্ত্তী শারদা গ্রামের কোন অনুচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণমহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র জমিদারের সন্তান; এই বিবাহে তাঁহার বংশমর্য্যাদার হানি হইল। এজন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন। ভ্রাতার ভর্ৎসনায় তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক হুগলী জিলায় বাঁশবেড়িয়া গ্রামের সন্নিহিত দেবানন্দপুরে গমন করেন এবং তথায় কায়স্থকুলোদ্ভব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে সাদরে গৃহীত হন। এখানে তিনি অধ্যবসায়বলে উত্তমরূপে পারস্য ভাষা আয়ত্ত করেন। এই সময় হইতে তাঁহার কবি-শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে; তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় কবিতা লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। পাঁচ বৎসর পরে সংস্কৃত বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর পিতার আদেশে কিয়ৎকাল বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করেন। এখানে জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে তিনি কারারুদ্ধ হন, কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই; তিনি কৌশলক্রমে কারাগার হইতে বহির্গত হন এবং পলায়নপূর্ব্বক কটকে উপস্থিত হন। এখানে তিনি সুবাদার শিবভট্টের স্নেহদৃষ্টিতে পতিত হইয়া সুখে বাস করিতে থাকেন।° তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে থাকিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। ভারতচন্দ্র সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন; গৈরিকরঙ্গের বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কটক হইতে তিনি বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। এখানে তিনি বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। কৃষ্ণনগরে তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাস করিতেন। তিনি সপরিবারে ভারতচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন এবং নানারূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব বেশ পরিত্যাগ করাইয়া স্বগৃহে আনয়ন করেন। এই আত্মীয় ভারতচন্দ্রকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী লইয়া যান; এখানে পত্নীর সহিত বিবাহের পর তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কোন বিষয়-কর্ম্মসূত্রে তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচিত হন। গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পারস্য ও সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা এবং কবিশক্তি ও দুরবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন। মহারাজ তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে রাখিয়া মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সন্ধ্যার পর মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। এই সময়ে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া মহারাজকে শুনাইতেন। মহারাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধি দান করেন এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের অনুকরণে একখানা কালিকামঙ্গল কাব্য লিখিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। মহারাজের অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া তিনি "অন্নদামঙ্গল" নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য লিখেন। এই কাব্য ভারতচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই কাব্যে ভারতচন্দ্রের যেমন অসামান্য কবিত্বের পরিচয় আছে, তেমনি ইহাতে অসাধারণ দোষও দৃষ্ট হয়। কাব্যখানির কোন কোন অংশ অশ্লীলতা দোষদুষ্ট। কবি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তাঁহার রচনা সেই সময়ের উপযোগী না হইলে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তিনি যে সমাজের লোক সেই সমাজের প্রভাবও তাঁহার জীবনে ও রচনায় লক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতচন্দ্রের সময়ে বিলাসব্যসনে রত মোগল সম্রাটের হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইতেছিল। সমাজেও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্য ভারতচন্দ্রের রচনা স্থানে স্থানে ঘোরতর অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে। অনেক বড় কবির লেখায় অশ্লীলতা দৃষ্ট হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, এবং শকুন্তলা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট; ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি সেক্‌সপিয়রের অনেক নাটকে অশ্লীলতা দৃষ্ট হয়; বঙ্গের অন্যতম প্রধান কবি অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের উদ্ভাবয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, তবে অন্নদামঙ্গলের "বিদ্যাসুন্দর" অংশে অশ্লীলতার মাত্রা একটু বেশী। অনুসন্ধান করিলে অলঙ্কার ও রস পরিচ্ছেদের সমুদয় উদাহরণ অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যাইতে পারে। কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার বাক্যালাপচ্ছলে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। রাজা তাঁহাকে দীর্ঘ-কাল নবদ্বীপে থাকিতে দেখিয়া তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে কবি বলিলেন যে, তাঁহার

স্ত্রী শ্বশুরালয়ে থাকেন। ভ্রাতাদিগের সহিত সদ্ভাব না থাকাতে তিনি স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা অবগত হইয়া রাজা বার্ষিক ৬০০৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া মূলাযোড় গ্রাম তাঁহাকে ইজারা দেন। এখানেই তিনি ১৬৮২ শকে ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ভারবি—ভারতের বিখ্যাত মহাকবি। ইঁহার প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্যের নাম "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্"। এই একখানি মহাকাব্য লিখিয়া কবি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই মহাকাব্যের বিষয় অর্জ্জুনকর্তৃক পাশুপতাস্ত্র লাভ। পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে অবস্থান কালে ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে মহাদেবের নিকট অস্ত্রলাভ করিতে উপদেশ দেন। অর্জ্জুন তদনুসারে তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। অর্জ্জুনকে কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মহাদেব অর্জ্জুনের বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পাশুপতাস্ত্র প্রদান করেন। এই মহাকাব্যের রচনা প্রসাদগুণসম্পন্ন। রচনার অর্থগৌরবে ইহা মহাকাব্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। মহাকবি ভারবি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে ইনি মহাকবি মাঘের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক।

ভাস্করাচার্য্য—ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ও গণিতজ্ঞ। ইঁহার পিতার নাম মহেশ আচার্য্য (ওরফে মহেশ দৈবজ্ঞ)। ইনি দাক্ষিণাত্যে সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড় নামক গ্রামে ১০৩৬ শকে (১১১৪ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিখ্যাত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" রচনা করেন। এই গ্রন্থ ৪ খণ্ডে বিভক্ত :—(১) লীলাবতী বা পাটীগণিত, (২) বীজগণিত, (৩) গ্রহগণিতাধ্যায় ও (৪) গোলাধ্যায়। শেষোক্ত দুইখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ। ইঁহার পুত্র লক্ষ্মীধর ও কন্যা লীলাবতী। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার নামানুসারে তিনি তদীয় গ্রন্থের ১ম ভাগের নামকরণ করিয়াছেন।

ভাস্করানন্দ স্বামী—এই বিখ্যাত বৈদান্তিক যোগী ও সাধু ৭৫৫ শকে (ইং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ, সংবৎ ১৮৯১ ও বঙ্গাব্দ ১২৪০ সাল) আশ্বিনের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় কানপুর বিভাগের অন্তর্গত মৈথেলালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত ইহলৌকিক জীবন অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ইঁহার পিতার নাম মিশ্রিলাল। ইঁহার জন্ম তারিখে সন্ধ্যার সময় তিনজন অজ্ঞাতপূর্ব্ব সন্ন্যাসী মিশ্রিলালের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং সেই রাত্রিতেই যে তাহার এক সৌভাগ্যশালী পুত্র জন্মিবে তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। সকলের বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক মধ্যরাত্রে ভাস্করানন্দ প্রসূত হইলেন। সন্ন্যাসিত্রয় মিশ্রিলালের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় এক হোম সম্পাদন করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। অতঃপর কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না যে, সন্ন্যাসিগণ কোথায় কোন্‌দিকে গমন করিলেন। মিশ্রিলাল পুত্রের নাম মতিরাম রাখিলেন। ৮ম বর্ষে মতিরামের উপনয়ন ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হইল। মতিরাম উপনয়নের পরেই গুরুগৃহে গমন করিয়া সারস্বতচন্দ্রিকা নামক ব্যাকরণ ও কালিদাসকৃত রঘুবংশ সমাপ্ত করিয়া বেদান্তদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বেদান্ত দর্শন পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সংসারে অসারবুদ্ধি উপস্থিত হইল, চিত্ত বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল। পিতা মতিরামের বৈরাগ্যভাব প্রশমনার্থ তাঁহাকে অপরিণত বয়সে বিবাহ করাইয়াছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই মতিরাম বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীধামে গমন করেন। অল্পকাল পরেই বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া মতিরাম জন্মভূমি দর্শন করিতে মৈথেলালপুরে আগমন করেন। দেশে আসিয়া তিনি পরম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এখন তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। এখানে সংসারের মোহ তাহাকে জড়ীভূত করিতে পারিল না। তিনি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি জনক জননী, ভার্য্যা ও বন্ধুবান্ধবদিগকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; যথাসময়ে তাঁহার পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। যে রাত্রিতে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, মতিরাম সেই রাত্রিতেই

গৃহত্যাগ করিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মতিরাম নানাস্থান ভ্রমণপূর্ব্বক ভারতখ্যাত বিবুধজননী উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এই জনকোলাহলময় নগরীতে মহাকালেশ্বর শিবের মন্দির আছে; এই মন্দির কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির অপেক্ষা অনেক বড়। মতিরাম, দেবমন্দিরে শিবের অর্চ্চনা করিয়া নগরের অদূরে এক নির্জ্জন স্থানে শ্মশানক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং তথায় ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহার যোগ শিক্ষার ইচ্ছা হইল। যে রাত্রিতে তাঁহার এই ইচ্ছা হইল, তৎপরদিনই দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত পরমহংস স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী তথায় উপস্থিত হইলেন। মতিরাম যোগিবর স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট যোগশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং তৎপর ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রকারের সিদ্ধিও লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। এইরূপে মতিরাম নানাপ্রকার যোগবিভূতিতে অলঙ্কৃত হইয়া কিছুকাল উজ্জয়িনীতে বাস করেন। অতঃপর গুজরাটে গমনপূর্ব্বক এক মঠে অবস্থান করিয়া চারি বৎসর বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। যে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু পরমহংস পূর্ণানন্দের নিকট তিনি যোগ শিক্ষা করেন, তাঁহারই নিকট তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মতিরাম স্বীয় নাম, যজ্ঞসূত্র, কুল, মান প্রভৃতি সমুদয় ত্যাগ করিলেন। তিনি গুরুদত্ত ভাস্করানন্দ স্বামী সরস্বতী নাম গ্রহণ করিলেন। তিনি এই নামেই জগতে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে স্বামীজীর বয়স সপ্তবিংশবর্ষ মাত্র। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি কিছুকাল রেবানদীতটে এক শ্মশানক্ষেত্রে বাস করেন; তৎপর তিনি জাহ্নবীতটবর্ত্তী শৃঙ্গিরামপুরে গমন করেন। এই স্থানে স্বামীজী স্বীয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। একাদশ বৎসরে পুত্রটী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। স্বামীজী একাদশ বৎসর হইল গৃহত্যাগ করিয়াছেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়াও স্বামীজী কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রশান্ত গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বামী ভাস্করানন্দ পিতামাতা ও পুত্রবিয়োগবিধুরা পত্নীকে দেখিবার জন্য একবার গৃহে আগমন করেন। গ্রামের লোক স্বামীজীকে দেখিয়া কৃতার্থ হইল। তিনি সকলকে সংসারের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গৃহত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি তিন বৎসর মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কঠোর সাধনা করিয়া হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, মানসসরোবর, জ্বালামুখ, কুরুক্ষেত্র, অমৃতসরের শিখতীর্থ (সুবর্ণ মন্দির), নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুরের অন্তর্গত পুষ্করতীর্থ, বর্ত্তমান গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারাবতী প্রভৃতি তীর্থস্থান পদব্রজে ভ্রমণ করেন। দ্বারকা হইতে বোম্বাই প্রদেশের সমুদয় তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে সেতুবন্ধরামেশ্বরতীর্থে উপস্থিত হন। রামেশ্বর হইতে মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের পবিত্র পুরীতে উপনীত হন। এখান হইতে বঙ্গদেশ, আসাম ও বিহারের তীর্থ সমুদয় দর্শন করিয়া পুনরায় প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রয়াগ হইতে পুনর্ব্বার হরিদ্বারে গমন করেন। এইরূপে স্বামীজী ১৩ বৎসর পদব্রজে ভারতের সমুদয় তীর্থ ভ্রমণ করেন। হরিদ্বারে আসিয়া তিনি বিখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অনন্তরামের সাক্ষাৎ পান এবং নিজে বেদান্ত বিষয়ে পণ্ডিত হইলেও অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার নিকট গীতাভাষ্য, পঞ্চদশী, বেদান্তপরিভাষা, দশোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অনন্তরামের সহিত মিলিত হইয়া স্বামীজী কিছুকাল মনের আনন্দে কাটাইলেন। হরিদ্বার হইতে স্বামীজী পুনরায় কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। এখানে তিনি গঙ্গাতীরে আসীন হইয়া বিশ্বনাথের উপাসনায় রত হইলেন। এই সময় তাঁহার মুখে কেবল বিশ্বনাথ শব্দ পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইত; তিনি আপনার মনে আপনি হাসিতেন ও কাঁদিতেন; প্রেমাবেগে কখন কখন তাঁহার নেত্রপ্রান্ত হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকসমাগম হইতে লাগিল; জনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তিনি বিরক্ত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে গমনের ইচ্ছা করিলেন। তিনি অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত আমেটীর রাজা লালমাধব সিংহের অনুরোধে কাশীধামস্থিত তদীয় "আনন্দবাগ" নামক উদ্যানে গমন করিলেন। রাজার

আজ্ঞায় স্বামীজীর সেবার জন্য ৮ জন ভৃত্য নিযুক্ত হইল। এই আনন্দবাগে স্বামীজী সদানন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর থাকিবার স্থানটী নির্জ্জন হইল বটে, কিন্তু এখানেও নরনারীর সমাগম হইতে লাগিল। জনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখানে ভদ্রঘরের মহিলাগণ, রাণী, মহারাণী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পদবীর নারীগণ শিবিকারোহণে স্বামীজীকে দর্শন করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। একদা কোন রাজা স্বামীজীর চরিত্র পরীক্ষার জন্য কাশীর তিনটী বেশ্যাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া স্বামীজীর আবাসে প্রেরণ করেন। স্বামীজীর হুঙ্কারে দুইটী বেশ্যা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল, কিন্তু তৃতীয় বেশ্যাটীর পদ এক সর্পদ্বারা জড়িত হওয়াতে সে "ত্রাহি ত্রাহি" রবে স্বামীজীর করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। রাজা ইহা দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। বেশ্যাটীকে ৪ ঘণ্টা সর্পবেষ্টিত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল ; রাত্রি প্রভাত হইলে সর্প চলিয়া গেল, বেশ্যাটীও পলায়ন করিয়া গৃহে আসিল ; কিন্তু অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিল এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা তীর্থভ্রমণে পাপক্ষয় করিয়া পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ গৃহস্থভাবে বাস করিতে লাগিল। এই ঘটনার পর হইতে কেহ আনন্দবাগে প্রবেশ করিতে পারিত না। তখন স্বামীজী ভূগর্ভস্থ গৃহে ক্রমাগত দুই তিন মাস অনাহারে, এমন কি জলটুকু পর্য্যন্ত পান না করিয়া, যোগাসনে অবস্থিত থাকিতেন। এই সময়ে তিনি কৌপীনখানিও ত্যাগ করিয়া উলঙ্গাবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সংসার ও সমাজের নিকট তাঁহার আর কিছুই চাহিবার রহিল না। আবার ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট লোকসমাগম হইতে লাগিল। এখন কোন স্ত্রীলোক তাঁহার দর্শনার্থিনী হইয়া সমীপে গমন করিলে, স্বামীজী নিকটস্থ কোন ব্যক্তি হইতে বস্ত্রখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক কটিদেশ আবৃত করিতেন ; রমণী চলিয়া গেলে যাহার কাপড় তাহাকে দিতেন। তাঁহাকে শীতকালে দারুণ শৈত্যের মধ্যে বাহিরে নগ্নদেহে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের এক রাণী স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোন বৈষয়িক গোলমালে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া তাহার সম্পত্তি হস্তচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা হইল। তিনি স্বামীজীর শরণ লইলেন। স্বামীজী বলিলেন, "মোকদ্দমায় তোমার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইবেন।" স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সুফল হইয়াছিল। রাণী মোকদ্দমায় জয়লাভের পর স্বামীজীর নিকট দেড়লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি উহা স্পর্শও করেন নাই। রাণী এই টাকায় আনন্দবাগের নিকট এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও তৎসঙ্গে এক অতিথিশালা স্থাপন করেন এবং অতিথিশালার এক প্রকোষ্ঠে স্বামীজীর শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিও স্থাপন করেন। স্বামীজীর আনন্দবাগে আসিবার প্রায় পাঁচবৎসর পর তাঁহার পিতা মিশ্রিলাল সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হন এবং এখানে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মাতৃদেবী গৃহ-ত্যাগ করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার সাধ্বী পত্নী তপস্যা দ্বারা কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। স্বামীজী যোগবলে জননীকে বদরিকাশ্রমে পীড়িতা জানিয়া সত্বর কাশী হইতে বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং এখানে জীবন্মুক্ত পুত্রের কোলে মস্তক রাখিয়া মাতা দেহত্যাগ করেন। মাতার দেহত্যাগের পর স্বামীজী আবার আনন্দবাগে আসিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আনন্দবাগে পিপীলিকাশ্রেণীবৎ মনুষ্যপ্রবাহ চলিতে লাগিল। কাশীর মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর স্বামীজীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্বীয় রামনগরের রাজভবনে স্থাপন করেন। অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, একদিন মহারাজ আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমনার্থ এক টেলিগ্রাম পাইয়া গৃহগমনে স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে কাশীত্যাগ করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন। মহারাজ মহাবিপদে পতিত হইলেন। একদিকে রাজকার্য্য অপরদিকে গুরুর আজ্ঞা ; কোন্‌টা লঙ্ঘন করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি আবার স্বামীজীর নিকট গেলেন, স্বামীজী বলিলেন, "একান্তই যদি বাড়ী যাওয়ার আবশ্যক হয়, তবে যে

গাড়ীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছ তাহাতে না গিয়া, তাহার পরের গাড়ীতে যাও"। মহারাজ স্বামীজীর আদেশ পালন করিয়া রেল ষ্টেশনে গিয়া শুনিলেন যে, যে গাড়ীতে তিনি প্রথমে যাওয়ার মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই গাড়ী কাশী পরিত্যাগ করিয়া জৌনপুর ষ্টেশনের নিকটে অপর এক গাড়ীর সহিত সজ্বর্ষে ভাঙ্গিয়া যায় এবং বহুলোক হতাহত হয়। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, স্বামীজী কেন তাঁহাকে পূর্ব্বের গাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কাশী ও অযোধ্যার মহারাজের ন্যায় ভারতের বহু নৃপতি—রেওয়া, নাটোর, ভিঙ্গা, ডুমরাওন, বেড়িয়া, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের রাজগণ ও হায়দরাবাদের নিজাম, মুর্শিদাবাদের নবাব, রামপুরের নবাব প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণ এবং ভারতের বড়লাট, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট ও ভারতের প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সকলেই স্বামীজীকে দর্শন করিতে আনন্দবাগ আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। কলিকাতা ভবাণীচরণ দত্তের লেনের ডাক্তার ভাদুড়ী অম্লশূল বেদনায় ১৪ বৎসর যাবত বহুকষ্ট পাইতেছিলেন; তিনি অবশেষে স্বামীজীর শরণ লন। স্বামীজী ডাক্তার ভাদুড়ীর ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার উদরের উপর দিয়া একবার হস্তসঞ্চালন করিলেন। স্বামীজীর হস্তস্পর্শে ডাক্তার ভাদুড়ীর কঠিন পীড়া সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল। একদা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক জমিদার সপত্নীক আনন্দবাগে উপস্থিত হন। উঁহারা পতিপত্নীতে স্বামীজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্নী দশমাস গর্ভবতী ছিলেন। পতি তাঁহাকে কাশীতে আনয়ন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে আনিতে বাধ্য হন। আনন্দবাগে আসিয়া পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। জমিদারটী বিপদে পড়িলেন। তিনি এখনও স্বামীজীকে এই বিপদের বিষয় কিছু বলেন নাই। স্বামীজীর চারিদিকে বহুলোক উপস্থিত। এই লোকের মধ্যে মানকী নাম্নী একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত। স্বামীজী তাহাকে দেখিয়াই হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাহাকে পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া, যেথানে জমিদারপত্নী প্রসব বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী মানকীকে অন্তর্ব্বত্নী স্ত্রীলোকটীর মস্তকে হস্তার্পণ করিতে বলিলেন। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে মানকী বলিল যে, গর্ভস্থ পুত্র সন্তান যেন দশদিন পরে প্রসূত হয়। স্বামীজীর আদেশে মানকীর মুখ হইতে এই কথা নিঃসৃত হইবা মাত্র প্রসব বেদনা থামিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে জমিদার তদীয় পত্নীকে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন। স্বামীজীর বাক্য সফল হইয়াছিল; দশদিন পরে জমিদারপত্নী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। এইরূপ কত অলৌকিক ঘটনা সজ্ঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভারতবর্ষ, ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রদেশ, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি দেশ মহাদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক লর্ড, লেডি, কাউণ্ট, ব্যারণ, মার্কুইস, জেনারেল, কর্ণেল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ স্বামীজীর দর্শনার্থী হইয়া আনন্দবাগে আগমন করিয়াছিলেন। ১৮২১ শকে (ইং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সাল) ২৫শে আষাঢ় রবিবার মধ্যরাত্রে স্বামীজী সমাধিস্থ হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। বৃহস্পতিবারই তিনি বিশিষ্ট দর্শকদিগকে বলিলেন যে, তিনি অচিরে দেহত্যাগ করিবেন এবং এই সংবাদ তাঁহার কোন কোন শিষ্যকে তারে সংবাদ দিতে অনুরোধ করিলেন। সংবাদ সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ স্বামীজীকে শেষবার দেখিতে আসিলেন। পরমভক্ত গয়াপ্রসাদ, এলাহাবাদের মহাদেবপ্রসাদ, অযোধ্যাপতি মহারাজ প্রতাপনারায়ণ, কাশীর মহারাজ ও তদীয় দেওয়ান, নাগোধের মহারাজ যাদবেন্দ্রসিংহ, মৈনপুরের মহারাজ তেজসিংহ প্রভৃতি রাজা মহারাজ, জমিদার তালুকদার ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ এবং অন্যান্য বহুলোকও স্বামীজীর দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত দশোপনিষদ্ ও স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক কঠিন দর্শনঘটিত পুস্তক এখন দার্শনিক পণ্ডিতগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (সি-আই-ই)—এই মহাত্মা ১৭৪৭ শকে (ইং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে) ২রা ফাল্গুন কলিকাতা মহানগরীতে হরিতকী বাগাননামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ তৎকালের

একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ৮ম বৎসরের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। এই বিদ্যালয়ে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ছাত্র এই স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন ; ইঁহারা সকলেই ভাবী জীবনে দেশে খ্যাতনামা হইয়া গিয়াছেন। এই সমুদয় ছাত্রের মধ্যে বিখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অন্যতম। ভূদেব স্কুলে প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসার ২য় শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে হাবড়া (Howra) স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হয়। এই পদে প্রতিযোগিপরীক্ষা (Competitive Examination) গ্রহণ করিয়া লোক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব স্থির হয়। ভূদেব প্রতিযোগিপরীক্ষায় প্রথম হইয়া মাসিক ৩০০৲ শত টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এডিশনাল ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "শিক্ষাদর্পণ" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসে (বঙ্গাব্দ ১২৭০ সালে) পিতা তর্কভূষণ মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে "এডুকেশন গেজেটের" পরিচালন ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই পত্রিকা এখনও তাঁহার পুত্রের তত্ত্বাবধানে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই সময়ে তিনি "পুষ্পাঞ্জলি" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

অতঃপর তাঁহার মাসিক বেতন ১৫০০৲ টাকা হইল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর তিনি ছোট লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পেন্সন গ্রহণ করিয়া ভূদেব কিছুকাল কাশীধামে বাস করেন এবং তথায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মে (বঙ্গাব্দ ১৩০১ সাল) ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। ভূদেব নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক ছিলেন তাঁহার হৃদয় উদার, চিত্ত সরল এবং তিনি মাতা পিতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ সন্তান ছিলেন। তিনি পিতার নামে দেড়লক্ষ টাকা উৎসর্গ করিয়া "বিশ্বনাথ ট্রাষ্টফণ্ড" স্থাপন করেন। এই টাকার সুদ হইতে পিতার নামে স্থাপিত "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী"র ব্যয় ও মাতার নামে স্থাপিত "ব্রহ্মময়ী ঔষধালয়ে"র ব্যয় চলিতেছে। এই ঔষধালয় হইতে অনাথ দরিদ্র সন্তানগণ বিনাব্যয়ে ঔষধ পাইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এদেশীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও টোলের ছাত্র এই তহবিল হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এই "ফণ্ড" (তহবিল) স্থাপন করিয়া ভূদেব চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ভূদেবের চরিত্র মৌলিকতাপূর্ণ। তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া বাঙ্গালী জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। (১) পারিবারিক প্রবন্ধ, (২) সামাজিক প্রবন্ধ, (৩) আচার প্রবন্ধ, (৪) পুষ্পাঞ্জলি, (৫) ইংলণ্ডের ইতিহাস, (৬) গ্রীস ও রোমের ইতিহাস, (৭) পুরাবৃত্তসার, (৮) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৯) ঐতিহাসিক উপন্যাস, (১০) বিবিধ প্রবন্ধ, (১১) ক্ষেত্রতত্ত্ব, (১২) স্বপ্নলব্ধ ভারতেতিহাস, (১৩) শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব। রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক ও উত্তর রামচরিতের সমালোচনা করিয়া বিবিধ প্রবন্ধ নামে একখানা বহি প্রচারিত করা হইয়াছে। আচার প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণিত হইয়াছে ঃ—(১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য। তিনি বলিতেন যে, উপযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অবনত ও ঘৃণিত হইতেছেন। নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান ভূদেব, আজীবন মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া দেড়লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ব্বক স্বজাতীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন।

ভোজদেব—ইনি মালবের অন্তর্গত ধারানগরের অধিপতি। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ হণ্টার সাহেবকে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব কালসম্বন্ধে যে তালিকা প্রদান করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ভোজরাজ ৯৬৪ শকে, ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে, বরাহমিহির ১২২ শকে

এবং দ্বিতীয় বরাহমিহির ৪২৭ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। মার্শম্যান সাহেবের মতে ভোজরাজ ১১৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। ফিড্‌জ এড্‌ওয়ার্ড সাহেব বাসবদত্তার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ভোজরাজ ৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। কহ্লনকৃত রাজতরঙ্গিণীর ৫ম তরঙ্গে লিখিত আছে যে, কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্ম্মা ভারতখ্যাত ভোজরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। শঙ্করবর্ম্মা ৮১২ শক হইতে ৮২৯ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের মুখে মুঞ্জরাজ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজদেবের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার বধসাধনার্থ বৎসরাজকে নিযুক্ত করেন। ভোজদেব বৎসরাজের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া বলিলেন, ধর্ম্মই লোকের একমাত্র সুহৃৎ ; অপর সকল বস্তুই শরীরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই পরলোকে সঙ্গে সঙ্গে যায়।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যচ্চ গচ্ছতি ॥"

এই শ্লোক শুনিয়া বৎসরাজের চৈতন্য হইল। তিনি ভোজরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি মুঞ্জরাজের প্রীতিসম্পাদনার্থ এক কৃত্রিম ছিন্নমস্তক তাঁহাকে দেখাইলেন। মুঞ্জরাজ ভ্রাতুষ্পুত্রের ছিন্নমস্তক দেখিয়া শোকাভিভূত হইলেন। বৎসরাজ মনোভাব গোপনপূর্ব্বক মুঞ্জরাজকে বলিলেন যে, ভোজ মৃত্যুর সময় একখানা পত্র লিখিয়া আপনাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন ; এই বলিয়া একশ্লোকবিশিষ্ট একখানা কাগজ তাঁহার হস্তে দিলেন। শ্লোকটি এই :—

মান্ধাতেতি মহীপতিঃ কৃতযুগেঽলঙ্কারভূতোগতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌদশাস্যান্তকঃ।
অন্যেচাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে !
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মন্যে ত্বয়া যাস্যতি ॥

ইহার ভাবার্থ এই, মরিবার সময় কেহই সঙ্গে যায় না, সকল বস্তুই পড়িয়া থাকে, আত্মা একাই পরলোকে যায়। সত্য যুগে মান্ধাতা প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ—যাঁহারা এক সময়ে পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারাও চলিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী তাঁহাদের সঙ্গে যায় নাই, পার্থিব ভোগ্যবস্তু সমুদয় তাঁহাদের পিছে পড়িয়া রহিয়াছে ; ত্রেতাযুগে যে রামচন্দ্র সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন এবং তথায় দিগ্বিজয়ী রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, তিনিও একাকীই চলিয়া গিয়াছেন ; দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরাদি রাজারা যাঁহারা রাজসূয়প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একাকীই স্বর্গে গিয়াছেন, সমস্ত পার্থিব ভোগ্যবস্তু তাঁহাদের পিছে পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু রাজ্যলোভী আপনাকে দেখিয়া মনে হয় যে, পৃথিবী আপনার সঙ্গেই যাইবেন, পার্থিব ভোগ্যবস্তু সমুদয়, স্ত্রী পুত্র, মণিমাণিক্যাদি সকলই আপনার সঙ্গে পরলোকে যাইবে ; নচেৎ সিংহাসনের লোভে, ধনসম্পত্তি উপভোগের জন্য আপনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিতে যাইবেন কেন ?

এই পরমার্থতত্ত্বযুক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া মুঞ্জরাজ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি প্রবেশদ্বারা জীবনজ্বালা জুড়াইতে সঙ্কল্প করিলেন। ইহা দেখিয়া বৎসরাজ বলিলেন, আপনার অনুমতি হইলে একজন কাপালিক যোগ-প্রভাবে ভোজকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন। মুঞ্জ তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। বৎসরাজের ইঙ্গিতে ভোজদেব মুঞ্জের সম্মুখে আনীত হইলেন। মুঞ্জ অশ্রুপূর্ণনেত্রে, লজ্জাবনতমুখে ভোজকে ক্রোড়ে লইয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ইনি কেবল রাজ্যশাসনে নিপুণ ছিলেন এমন নহে ; ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, চম্পূরামায়ণ ও একখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ লিখেন ; এতদ্ব্যতীত ইনি মনুসংহিতার টীকা রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই টীকা এখন লুপ্ত

হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অপর এক ভোজরাজের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ইনি কর্ণাট প্রদেশের অধিপতি ছিলেন এবং ইঁহার সভায় বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কর্পূর, কবিরাজ, বিনায়ক, মদন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন। (বল্লালমিশ্রকৃত ভোজ প্রবন্ধ)

ম

মইনুদ্দিন চিস্তি—বিখ্যাত মুসলমান সাধু। আজমীরে ইঁহার সুবৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত সমাধি মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। ইনি ১১৪২ খৃঃ সিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভারতে আসিয়া আজমীরে বসতি করিতে থাকেন; তথাকার রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দিন ঘোরী ইঁহাকে বন্দীভূত করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহার আদেশে ইনি নিহত হন।

মঙ্গলদাস নাথু ভাই (সার, কে, সি, এস, আই)—এই বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী বদান্য গুজরাটবাসী হিন্দু সন্তান ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ সম্পত্তিশালী বলিয়া সকলের সম্মানার্হ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর সময় মঙ্গলদাসের বয়স ১১ বৎসর মাত্র ছিল। ইঁহার পিতামহের নাম রামদাস মনোরদাস এবং পিতা নাথুভাই রামদাস। গুজরাটী নামের মধ্যে পিতার নামও থাকে। প্রথমে নিজের নাম তৎপর পিতার নাম এবং তারপর ব্যবসায় বা জাতিগত নাম। অনেক স্থলে তৃতীয় নামটী একেবারেই থাকে না। মঙ্গলদাসের নামও তাঁহার পিতা ও পিতামহের নামের দিকে দৃষ্টি করিলেই গুজরাটী নামরহস্য বুঝা যাইবে। মঙ্গলদাস একজন গৃহ-শিক্ষকের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়সের সময় "বাই রুক্মা বাই"কে বিবাহ করেন এবং বিবাহের দুই বৎসর পরেই পৈতৃক সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হন। তিনি কাপুল বাণিয়া শ্রেণীর হিন্দু ছিলেন। হোলির সময় স্বশ্রেণীর কতকগুলি কদর্য্য আচার দেখা যাইত; তিনি এই সমুদয় কদাচার স্বশ্রেণী হইতে উঠাইয়া দেন। তিনি শিক্ষার উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই নগরে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বৎসরেই তিনি "রয়েল এশিয়াটিক সোসায়িটি" ও "রয়েল জিওগ্রাফিকেল সোসায়িটি"র মেম্বর হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রাডুয়েটদের জন্য একটী বৃত্তিস্থাপন করিতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ হাজার টাকা দেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উদ্যোগে বিখ্যাত "বম্বে এসোসিয়েসন (Bombay association) নামক সভা পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি ৮ বৎসর বোম্বাই লাটসাহেবের সভার সদস্য ছিলেন। এই সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া তিনি সর্ব্বদাই দেশের লোকের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে (বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা ৭ম এডওয়ার্ড) এদেশে আগমন করেন। তখন তিনি যুবরাজ ছিলেন। যুবরাজ, মঙ্গলদাসের পুত্রদ্বয়ের বিবাহোপলক্ষে তাঁহার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। বিবাহ সভায় জাঁকজমকের ত্রুটি হয় নাই। পুষ্প ও পুষ্পমাল্যের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। বহু লক্ষপতি, কোটিপতি দেশীয় সওদাগরগণ সভাতে যুবরাজ দর্শনে উপস্থিত হইয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলদাস স্বর্গে গমন করেন। মৃত্যুকালীন চরমপত্রে (Will) তিনি প্রায় আট লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। স্বজাতীয় বাণিয়াদের জন্য ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং বালকেশ্বর (Walkeswar) নামক শ্মশান ঘাটের অদূরে ৭০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে এক স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণ করেন। তৎকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সংখ্যা নাই।

মতিলাল শীল—কলিকাতার বিখ্যাত দানশীল ধনী। ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক্। ছোলা বেচিয়া যেমন কৃষ্ণপান্তী বড় মানুষ হইয়াছিলেন, মতিলাল শীলও তদ্রূপ বোতল ও কর্কের (ছিপির) ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়াছিলেন।

ইনি ১৭১৩ শকে (ইং ১৭৯১ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১১৯৮ সাল) কলিকাতা নগরীতে কলুটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৬৩ বর্ষ বয়সে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে (১২৬১ সালে ৭ই জ্যৈষ্ঠ) কলিকাতায় গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। তিনি কলিকাতায় একটী অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় (Seel's free College) স্থাপন করেন। তিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, অতিথিশালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা চৈতন্যচরণ শীল সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। মতিলালশীল বোতলের ব্যবসায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাহেবদের হৌসে (বাণিজ্যাগারে) কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তিনটি হৌসের মুচ্ছুদ্দি বা অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় (এম, এ,)—পূর্ব্ববঙ্গের স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর। ইনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামচরণ চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় আবকারির সেরেস্তাদার ছিলেন। মাতা পার্ব্বতী দেবী। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁ গ্রাম। এই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাইজপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাল্যকালে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ঢাকা কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন। এই পদ হইতে আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ও পরে ইন্‌স্পেক্টর হইয়া প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে (৭০০৲ টাকা বেতনে) উন্নীত হইয়াছিলেন। পেন্সন গ্রহণের সময় ইনি ঢাকা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। ৬ বৎসর পেন্সন ভোগ করিয়া ৬১ বৎসর বয়সে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট (বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সনের ৬ই ভাদ্র) রবিবার মধ্যরাত্রে দেহত্যাগ করেন। ইনি ন্যায়পর, সরল ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। ইনি সকলকে এমন কি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকেও তদীয় দোষ প্রদর্শন করিতে একটুও ভয় করিতেন না। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

মথুরেশ—নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কবিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "মহাকবি" উপাধি দেন। তিনি ইঁহাকে বলিতেন, "মথুরেশো মহাকবিঃ"। একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হন। মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, যদি তিনি মথুরেশ পণ্ডিতকে পরাজিত করিতে পারেন, তবে তিনি নবদ্বীপের সমুদয় পণ্ডিতকেই পরাজিত করিয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানা চিঠি দিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে মথুরেশ পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রেরণ করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গুপ্তিপাড়ার ঘাটে উপস্থিত হইয়া একজন ভৃত্যদ্বারা পত্র খানা মথুরেশ পণ্ডিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বিচারের সময় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মথুরেশ পণ্ডিত একটি শ্লোক লিখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নিকট প্রেরণ করেন। শ্লোকটি পাঠ করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জয়ের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করেন। শ্লোকটির মর্ম্ম এই "কবিতা একটি নায়িকাসদৃশী ; বাল্মীকি মুনি হইতে এই নায়িকার জন্ম ; তিনি ব্যাসের সহিত বাল্যক্রীড়া করেন এবং যৌবনে কালিদাসের সহিত বিবাহিতা হইয়া কালক্রমে অমরসিংহ, শঙ্কু, ধনিক প্রভৃতি প্রসব করেন। কবিতার সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক থাকাতে ইঁহারা সকলেই কবি। এক্ষণে কবিতার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার সে রস (শৃঙ্গারাদি স্থায়িভাব) নাই, সে অলঙ্কার (পক্ষে কাব্য শোভাকর ধর্ম্ম) নাই, সে প্রকার গতিভঙ্গী (ছন্দোবন্ধাদি) নাই। বল দেখি এখন তিনি কাহাকে আশ্রয় না করিয়াছেন ? যেহেতু তাঁহাকে সামান্য দূরে যাইতে হইলেও তৃণজাতীয় যষ্টিকে অবলম্বন করিতে হয়। ইহাতে ব্যঙ্গ ক্রমে বলা হইল যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সামান্য কবি মাত্র।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—এই বিখ্যাত প্রতিভান্বিত পুরুষ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া মদনমোহন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মদনমোহন বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ছিলেন। তিনি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। কলিকাতার বালিকাবিদ্যালয় (বেথুন স্কুল) স্থাপন বিষয়ে

তর্কালঙ্কার মহাশয় বেথুন সাহেবকে বিশেষ আনুকূল্য করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া একটী যুক্তিপূর্ণ বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বহুলোক নিজ নিজ কন্যাগণের শিক্ষায় মনোযোগী হন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিছুকাল এই পদে থাকিয়া তিনি এই জিলাতেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ওলাউঠা রোগে দেহত্যাগ করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি "বাসবদত্তা" নামে একখানি বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার পর "রসতরঙ্গিণী" নামে আর একখানি কাব্য লিখেন; কিন্তু তৎপ্রণীত শিশুশিক্ষা তিনভাগ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী কোন গ্রন্থই ছিল না। বাঙ্গালাভাষার উন্নতির মূলে মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর।

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)—বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। মধুসূদন যশোহরের অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। রাজনারায়ণের চারিটী স্ত্রী; জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কিছুকাল বাঙ্গালা পড়িয়া মধুসূদন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। তিনি ডিরোজিও সাহেবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তৎকালে হিন্দুকলেজের অধিকাংশ ছাত্রের আচার ব্যবহার এবং শিক্ষা ডিরোজিও সাহেবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ডিরোজিওর উপদেশে ছাত্রেরা লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম এবং সামাজিক আচার ব্যবহার উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিল। মধুসূদন এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই সমুদয় ছাত্র জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডিরোজিওর ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ইংরেজীতে কাব্য ও উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মধুসূদন ১৮৩৭ খৃঃ হইতে ১৮৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর ইংরেজী কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সাধারণতঃ স্বদেশ হিতৈষণা ও প্রণয় বিষয়িণী ছিল। এই সময়ে তাঁহার বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা হয়। মধুসূদনের পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য একটী পাত্রী অনুসন্ধান করিয়া বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ইংরেজ ভাবাপন্ন মধুসূদন এরূপ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে তিনি খৃষ্টান পাদ্রীদের নিকট পলাইয়া গেলেন এবং ৺ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে ৪ দিন লুকাইয়া রহিলেন; আর বিবাহ হইল না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় হইতে তাঁহার নামের সঙ্গে "মাইকেল" নাম সংযোজিত হইল। যদি তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি না করিতেন, তবে হয়ত মাইকেল সমস্ত জীবন, কার্য্যে না হইলেও, নামে হিন্দু থাকিতেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর মধুসূদন শিবপুরস্থ বিশপস্‌কলেজে (Bishop's College ৪ বৎসর অধ্যয়ন করেন। মধুসূদন তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন; ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও এই কলেজে অধ্যয়নের ব্যয় তাঁহার পিতাই বহন করিয়াছিলেন। ইহার পর পিতাপুত্রের আকর্ষণ শিথিল হইল; মধুসূদন সংসারে অসহায় হইয়া পড়িলেন। বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন কালে ঐ কলেজের কয়েকজন মান্দ্রাজীছাত্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা হয়। এই সূত্রে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার্থ মান্দ্রাজ গমন করেন। এখানে তিনি অত্যন্ত অর্থাভাবে পতিত হন। স্থানীয় ইংরেজী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন, তাহার উপরই তাঁহার জীবিকা নির্ভর করিত। পত্রিকায় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি একজন সুলেখক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। এই সময়ে মান্দ্রাজ কলেজের প্রধান শিক্ষকের কন্যা মধুসূদনের গুণে মুগ্ধ হন এবং অনতিবিলম্বে ইঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষের অনৈতিহাসিক বিবরণের অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে "ক্যাপটিভ লেডি" (Captive Lady) নামে একখানি কাব্য লিখেন। মান্দ্রাজে এই কাব্যখানি অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। এই স্থানে অবস্থান কালে

মধুসূদন "ভিসন্স অব দি পাষ্ট" (Visions of the Past) নামে আর একখানি খণ্ডকাব্য অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচনা করেন। এই কাব্য পাঠ করিলে বিখ্যাত ইংরেজ কবি বাইরন প্রণীত "ড্রিম" শীর্ষক কবিতাটির স্মরণ হয়। মধুসূদন মান্দ্রাজে "এথিনিয়ম" (Athenium) নামে একখানি ইংরেজী সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং পরে ইহার সম্পাদকও হইয়াছিলেন। ৮ বৎসর এই পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া এবং কিছুকাল মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া মধুসূদন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সস্ত্রীক আগমন করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই উন্নত হয় নাই। আর্থিক অভাব হেতু তিনি কলিকাতা পুলিশকোর্টে কেরাণীগিরি লইতে বাধ্য হন। এই পদ হইতে তিনি অনুবাদকের (Interpreter) কার্য্যে উন্নীত হইয়াছিলেন। বেথুন সাহেব মাইকেলকে বাঙ্গালা কাব্য লিখিতে পরামর্শ দান করেন এবং তাঁহার পরামর্শে তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক প্রণয়ন করেন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর "পদ্মাবতী" নাটক লিখেন। এই সময়ে তিনি নব্যবাঙ্গালীদিগের আচার ব্যবহার সমালোচনা করিয়া "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এবং "একেই কি বলে সভ্যতা" নামে দুইখানি প্রহসন লিখেন। বাঙ্গালা পয়ার লিখিতে তাঁহার মোটেই কলম চলিত না, এজন্য তিনি বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দঃ পরিবর্ত্তনে প্রয়াসী হইলেন। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রণয়ন করেন। তদানীন্তনকালের সকল শিক্ষিত লোকেই এই নূতনচ্ছন্দে লিখিত কাব্যখানা উপহাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; চারিদিকে বিদ্রূপের তরঙ্গ উত্থিত হইল। ঈশ্বর গুপ্তের অনুবর্ত্তী লেখকেরা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের অনুসরণকারী লেখকগণ সকলেই একবাক্যে মধুসূদনের লেখায় উপহাস করিতে লাগিলেন। যিনি মধুসূদনকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, মধুসূদনের গুণাবলী ও কবিশক্তি দেখিয়া যাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না এবং মধুসূদনের দুরবস্থা মোচনের জন্য যাঁহার হস্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত, সেই বিদ্যাসাগরও তিলোত্তমার ছন্দের প্রশংসা করেন নাই। কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য লোক এই অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্য পড়িয়া "তিলোত্তমা"র বিরুদ্ধসমালোচকগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। মেঘনাদবধ কাব্যে ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য এবং করুণরসের উদ্দীপনা দেখিয়া সমালোচকগণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত বিদ্যাসাগর এই কাব্য পাঠ করিয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই মাইকেল "কৃষ্ণকুমারী" নাটক ও "বীরাঙ্গনা" কাব্য রচনা করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর তথায় ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইয়োরোপে অবস্থান কালে তিনি "চতুর্দ্দশপদী কবিতা" লিখেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত অর্থাভাবে পতিত হন। দয়ালু বিদ্যাসাগর তাঁহাকে অর্থসাহায্য না করিলে বিদেশেই এই বিখ্যাত কবির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইত (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেখ)। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এই ব্যবসাতে তিনি সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পর তিনি আরও ৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই ৬ বৎসর দরিদ্রতাজনিত মানসিক কষ্ট পাইয়া, রোগযন্ত্রণায় অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় দুই ঘটিকার সময় আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া তিনি "মায়াকানন" নামক কাব্য লিখেন। মধুসূদন ব্যয়সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার কমে একজন ভদ্রলোকের গ্রাসাচ্ছাদন হইতে পারে না।

মধ্বাচার্য্য—বিখ্যাত দার্শনিক। ইঁহার অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ; এজন্য ইঁহার দার্শনিক গ্রন্থ পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শননামে অভিহিত। ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তুলব নামক স্থানে বাস করিতেন। ইঁহার পিতার নাম মধিজী; ইনি অচ্যুতপ্রচনামা পণ্ডিতের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকখানির নাম দেওয়া গেল:—গীতাভাষ্য, সূত্রভাষ্য, ঋক্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, তন্ত্রসার, অনুবেদান্তরস-প্রকরণ ইত্যাদি। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন; ইঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

মনোমোহন ঘোষ (ব্যারিষ্টার)—এই বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক, কায়স্থবংশে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ রামলোচন ঘোষ একজন সব্‌জজ ছিলেন। রামলোচন বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। মনোমোহন বাল্যকালে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে একবৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত গমন করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে তিনি নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশ করেন, কিন্তু উক্ত পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর হিন্দুপেট্রিয়ট হস্তান্তরিত হওয়াতে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ তাহাতে প্রকাশিত হইত না; কাজেই মনোমোহনের প্রবন্ধ হিন্দুপেট্রিয়টে স্থান পাইল না। তিনি আর একখানি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক ব্যক্তির সাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে ইহা বিখ্যাত নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদকতায় দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু দুইবারই অকৃতকার্য্য হন। এই পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনই তাঁহার অনুত্তীর্ণ হওয়ার প্রধান কারণ। ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ এই পরীক্ষা দিতে গিয়া যে সমুদয় অসুবিধা ভোগ করেন তাহার নিরাকরণার্থ তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। ১৮৬৬ খৃঃ জুনমাসে তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৬৭ খৃঃ ১০ই জানুয়ারি তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করেন। তিনি কালক্রমে হাইকোর্টের একজন প্রথম শ্রেণীর দেশীয় ব্যারিষ্টার হইয়া উঠিলেন। তদানীন্তন ছোটলাট সার উইলিয়ম গ্রে তাঁহাকে কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু মনোমোহন এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৬৯ খৃঃ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দেশের হিতকল্পে নানাস্থানে বক্তৃতা দেন। ১৮৮৫ খৃঃ বঙ্গদেশের অবস্থা ইংলণ্ডবাসীদিগকে জ্ঞাত করাইবার জন্য তাঁহাকে দেশের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। বিলাতের বড় বড় লোক তাঁহার বক্তৃতা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল এবং ব্যারিষ্টারি ব্যবসাতে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমা পরিচালনেই তিনি সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমিনুদ্দীনের মোকদ্দমা, পুর্ণিয়ার মোকদ্দমা, লালচাঁদ চৌধুরীর মোকদ্দমা, লোকনাথপুরের মোকদ্দমা, কৃষ্ণনগরের ছাত্র মোকদ্দমা, মুলুকচাদ চৌকিদারের মোকদ্দমা, রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর মোকদ্দমা, বুদ্ধগয়ামন্দিরের মোকদ্দমা, নাটোরের মোকদ্দমা—এই সমুদয় মোকদ্দমাতে মনোমোহন অত্যন্ত কৃতিত্ব প্রদর্শদ করেন। মনোমোহন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেথুনকলেজ কমিটির মেম্বর ও পরে সেক্রেটরী হইয়াছিলেন। মনোমোহন জাতীয় মহাসমিতির একজন অকৃত্রিম সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্‌করণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ১৮৮৫ খৃঃ বিলাত যাইয়া এ বিষয়ে আন্দোলন করেন। ১৮৯৬ খৃঃ অক্টোবর মাসে তিনি কৃষ্ণনগরের বাটীতে দেহত্যাগ করেন। কৃষ্ণনগরবাসিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। মনোমোহন দেশহিতৈষী, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সাধুচরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি জীবনে উদারতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনকে তিনি অনেকবার অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং উক্ত কবির মৃত্যু সময়ে তাঁহার দুই পুত্রের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই সাহায্যে মধুসূদনের দুই পুত্র শিক্ষিত হইয়া সরকারী কার্য্য প্রাপ্ত হন। মনোমোহনের পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদী গ্রাম। বয়রাগাদীর বাড়ী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থাবরসম্পত্তি কনিষ্ঠ সহোদর বিখ্যাত লালমোহন ঘোষ প্রাপ্ত হন; মনোমোহন কৃষ্ণনগরের বাড়ীতেই থাকিতেন।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য—বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন; এই কলেজ হইতে বি এ.

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়া গণিতে এম এ উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃতে পারদর্শিতা হেতু তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষা দিয়া "বিদ্যারত্ন" উপাধি লাভ করেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের হিসাববিভাগে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, কলিকাতা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পঞ্জাবের একাউণ্টেণ্ট জেনারল নিযুক্ত হইয়া লাহোরে গমন করেন। এবং ৩রা নবেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ৪ঠা তারিখেই তিনি অসুস্থ হন; ৮ দিনে তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ১১ই নবেম্বর তিনি ৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সরল, বিনয়ী, পরোপকারী, স্বদেশপ্রিয় ছিলেন। মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে অবস্থান কালে তাঁহার জীবনে এই সকল গুণের অদ্ভুত বিকাশ দেখা গিয়াছে। নাগপুরে অবস্থানকালে তিনি প্লেগাক্রান্ত রোগীদিগকে স্বীয় গৃহপ্রাঙ্গনে স্থান দিয়া তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণের বিবাহ স্বীয় ব্যয়ে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং বর ও নববধূর ব্যবহারের জন্য স্বীয় শয়নকক্ষ এক রাত্রির জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে অনেক বাঙ্গালী যুবক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তথাকার এড্‌ভোকেট হইয়াছে। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন; নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামে এক বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

মম্মঠ ভট্ট—ইনি কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের রচয়িতা এবং নৈষধরচয়িতা কবি শ্রীহর্ষের মাতুল। ইঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী এই:—শ্রীহর্ষ নৈষধ রচনা করিয়া মাতুলকে পড়িতে দেন। মম্মঠ ভট্ট ইহা পাঠ করিয়া ভাগিনেয়কে বলিলেন, "বাপুহে, যদি 'কাব্যপ্রকাশ' রচনা করিবার পূর্ব্বে তুমি এই কাব্যখানা আমাকে দিতে, তবে দোষ পরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে আর আমাকে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না।"

ময়ূর ভট্ট—কাদম্বরী প্রণেতা বিখ্যাত বাণভট্টের শ্বশুর। ইনি সূর্য্যশতক রচনা করেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বীয় তনয়ার রজনী-বিলাস সম্বন্ধে এক আদিরসাত্মক শ্লোক রচনা করেন। ইহাতে কন্যা ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। কন্যার শাপে কবি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। অনন্তর কবি রোগ মুক্তির জন্য শতশ্লোকে সূর্য্যের স্তব করেন এবং ইহাতে তিনি রোগ মুক্ত হন। এই শতশ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য সূর্য্যশতক নামে অভিহিত। কবি শ্রীক্ষেত্রের পথে জন্মগ্রহণ করেন এবং ময়ূরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হন। শৈশবে ময়ূরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ময়ূর নামে অভিহিত হন। ইনি ৬০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

মল্লিনাথ—ইঁহার পূর্ণ নাম কোলাচল মল্লিনাথ। ইনি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নানা শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। ইনি বেদ, উপনিষদ, কাব্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, ভারবি, মাঘ ও নৈষধ মহাকাব্যের মেঘদূত নামক খণ্ডকাব্যের এবং অমরকোষ অভিধানের গভীর জ্ঞান ও গবেষণাপূর্ণ টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

মহসীন (হাজী মোহাম্মদ মহসীন)—বিখ্যাত উদারহৃদয় দানশীল মুসলমান। হাজী মোহাম্মদ মহসীন ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হাজী ফয়জুল্লা একজন পারস্যদেশীয় বণিক্ ছিলেন এবং তিনি বাণিজ্যার্থ হুগলীতে আগমন করিয়া বাস করেন। ফয়জুল্লা, হুগলী ও মুর্শিদাবাদে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে কারবার দেউলিয়া হওয়াতে তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। দেশে ফিরিয়া যাইতে সাধ্য না থাকায় তিনি হুগলীতেই বাস করিতে থাকেন। মহসীনের মাতার পূর্ব্বস্বামী আগা মোতাহেরও একজন পারস্য দেশীয় বণিক্ ছিলেন; তিনিও হুগলীতে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি হুগলীতে ইমামবড়া প্রতিষ্ঠিত করেন। আগা মোতাহেরের মন্নুজান নাম্নী একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা ছিল। তিনি দানপত্রে এই প্রিয়তমা কন্যাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া পরলোক গমন করেন। মতাহেরপত্নী স্বামীর অতুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া হাজী ফয়জুল্লাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহফলে হাজী মোহাম্মদ মহসীনের জন্ম হয়। মন্নুজান ও মহসীনের পিতা বিভিন্ন হইলেও মাতা এক

মন্নুজান ঐশ্বর্য্যশালিনী, মহসীন গরীব; তথাপি ভাই ভগিনীতে স্নেহমমতার কোন ক্রটি ছিল না। মন্নুজানের বয়স মহসীন অপেক্ষা ৮ বৎসর অধিক। মহসীন আরবী ও পারস্ত ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। মন্নুজানের অতুল সম্পত্তি দেখিয়া কতকগুলি দুরাত্মা অর্থলোভে তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। মহসীন ইহা বুঝিতে পারিয়া ভগিনীকে সতর্ক করিয়া দেন; ভগিনীর প্রাণরক্ষা হইল। অর্থের জন্য মানুষ মানুষকে খুন করিতে পারে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলচিত্ততার জন্যই সংসারে বিপদ্ উপস্থিত হয়, ইহা দেখিয়া মহসীন বিবাহ করিলেন না। তিনি সংসারে থাকিয়াও উদাসীনের ন্যায় রহিলেন। তিনি ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এই ভাবে ৬৩ বৎসর কাটাইয়া তিনি ১৭৯৫ খৃঃ দেশভ্রমণে বাহির হন। আগা মোতাহেরের আদেশ ছিল যে, তাঁহার ভাগিনেয় সালাহুদ্দিনের সহিত মন্নুজানের বিবাহ হয়। তদনুসারে সালাহুদ্দিন পারস্যদেশ হইতে আসিয়া মন্নুজানকে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। সালাহুদ্দিন হাজী ফয়জুল্লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইমামবড়ার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। বৈধব্যদশাগ্রস্তা হওয়াতে মন্নুজানের হস্তে বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পতিত হইল। তিনি অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন; তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে মহসীনের উপর সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া তিনি বিশ্রাম লাভ করেন; কিন্তু মহসীন বিদেশভ্রমণে বাহির হইয়া মন্নুজানকে বা অপর কাহাকেও কোন চিঠি দেন নাই। মন্নুজান বহু অনুসন্ধান করিলেন; নানাস্থানে চিঠি লিখিলেন; অবশেষে তাঁহার সন্ধান পাইলেন নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া তাঁহাকে হুগলীতে আনয়ন করিলেন। মন্নুজান মহসীনের হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মহসীন এখন অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিনি সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন; তিনি এই বিপুল সম্পত্তি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্তজনগণের শিক্ষার্থ ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১৮০৬ খৃঃ এক দানপত্র প্রস্তুত হইল। এই দানপত্র সম্পাদনের পর তিনি ৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি সমস্ত মুসলমান সমাজের অশেষকল্যাণ সাধন করিয়া ১৮১২ খৃঃ স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ ৯ লক্ষ টাকা। এই টাকা দ্বারা হুগলী কলেজ নির্ম্মিত ও ইমামবাড়া হয়। মহসীনের দানপত্রের মর্ম্ম এই :—"মোট সম্পত্তির তিন অংশের এক অংশ ফাতেহা ও মহরমোৎসব এবং ইমামবড়া ও মসজিদের সংস্কার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। নয় অংশের দুই অংশ মতোয়ালীদ্বয় পারিশ্রমিকস্বরূপ পাইবেন এবং অবশিষ্ট নয় অংশের চারি অংশ মাসিক বৃত্তিদানে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিকদানে ও কর্ম্মচারিগণের বেতন দানে ব্যয়িত হইবে।"

মহাতাবচাঁদরায় (মহারাজাধিরাজ বাহাদুর)—বর্দ্ধমানের খ্যাতনামা রাজা। ইনি পঞ্চনদের (পঞ্জাবের) কাপুর ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ লাহোরের অন্তর্গত কোটলি নামক স্থানে বাস করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ক্ষত্রিয় পরিবার বর্দ্ধমানে আগমন করেন। মহাতাবচাঁদ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ রায়ের পোষ্যপুত্র। দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলম তেজচাঁদকে ১৭৭১ খৃঃ এক সনন্দ প্রদান করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি দান করেন। এতব্যতীত তাঁহাকে পাঁচ হাজার পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন; এবং তিনটি কামান, "বাণ্ড" বাদ্য, নাগরা প্রভৃতি রাজকীয় আসবাব রাখিবার ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হন। ১৮২০ খৃঃ ১৭ই নবেম্বর মহাতাব জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩২ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট রাজ্যে অভিষিক্ত হন। মহাতাব তাঁহার রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; তিনি বাষিক ৪০ লক্ষ টাকা সরকারী রাজস্ব দিতেন। ১৮৩৩ খৃঃ ৩০শে আগষ্ট বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক তাঁহার মহারাজাধিরাজ উপাধি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে এক সনন্দ দান করেন। ১৮৬৮খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে তাঁহাদের পারিবারিক অস্ত্রাদি সংরক্ষণে অনুমতি দেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে তাঁহার সম্মানার্থ ১৩টী তোপের ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৪ খৃঃ বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে স্বীয় ব্যবস্থাপক সভায় অতিরিক্ত সভ্য পদে মনোনীত করেন। তিনি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যকল্পে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। তিনি বর্দ্ধমানে একটী পশুশালা স্থাপন করেন

এবং আলীপুরের পশুশালায় বহু অর্থ দান করেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজা ও বিপন্ন কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। ১৮৯৭ খৃঃ ভাগলপুরে তিনি দেহত্যাগ করেন। জনসাধারণের শিক্ষার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল; তিনি বর্দ্ধমানে একটী উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন; এক্ষণে ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর (2nd grade) কলেজে উন্নীত হইয়াছে। খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ এম, এ ১৮৮২ খৃঃ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান রাজকলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন; বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় এই কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন আছেন।

মহানন্দি (মহানন্দ)—নন্দবংশের শেষ রাজা। (নন্দ দেখ)।

মহাবীর—জৈন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ (শাক্যসিংহ) এবং জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর সমসাময়িক ব্যক্তি। ইনি দ্বাদশবর্ষকাল কঠোর তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা দেশ পর্য্যটনে বাহির হন। সহস্র সহস্র নরনারী ইঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করে ও নানা স্থানে জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহামায়া—বুদ্ধদেবের জননী। (বুদ্ধদেব দেখ)।

মহিমারঞ্জন (রায় চৌধুরী, রাজা)—রংপুর জিলার কাকিনা নামক স্থানের জমিদার ও রাজা। ইনি বঙ্গীয় জমিদারগণের মধ্যে একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। রাজা মহিমারঞ্জন বগুড়ার তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত লক্ষ্মীপুর গ্রামে ১৭৭৫ শকের ২২শে মাঘ (১৮৫৩ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী) জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সনের ২০শে বৈশাখ (ইং ১৯০৯ খ্রীঃ ৩রা মে) ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি কোনরূপ ব্যসনে আসক্ত ছিলেন না; সর্ব্বদা নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মানসিক উন্নতি সাধনে নিরত থাকিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না; সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁহার সমান আদর ছিল। বঙ্গাব্দ ১২৯৪ সনে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা মহিমারঞ্জন পরম ধার্ম্মিক, সংযমী, দয়ালু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কাকিনার "রাজ ডিস্পেন্সরী," স্কুল গৃহ, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, এই সমুদয় তাঁহার অবদান কর্ম্মের নিদর্শন।

মহীপাল—গৌড় ও মগধের পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল-রাজবংশের একজন বিখ্যাত রাজা। অল্পদিন হইল দিনাজপুরে এক তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে দেখা যায় যে, ১ম মহীপাল এই পাল বংশের ১০ম নৃপতি এবং ২য় মহীপাল এই বংশের ১৩শ নৃপতি। এই বংশের প্রথম রাজা গোপালদেব। জেনারেল কনিংহাম ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ১ম মহীপাল ১০১৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তিনি পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাক্তার, এম ডি, ডি এল্, সি. আই. ই)—এই বিখ্যাত চিকিৎসক হাবড়ার ১৮ মাইল পশ্চিমে পাইকপাড়া নামক গ্রামে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে পিতৃহীন হন এবং তদবধি কলিকাতায় মাতুলালয়েই লালিতপালিত ও শিক্ষিত হন। ইনি হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন এবং সিনিয়র পরীক্ষা না দিয়াই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ইনি ১৮৫৯—৬০ খৃঃ এল্. এম. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৩ খৃঃ এম্. ডি উপাধি লাভ করেন। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন; পরলোকগত ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম্ ডি। ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে ১৮৬২ খৃঃ প্রথম এম্ ডি হন। ডাক্তার সরকার প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর বিরোধী ছিলেন, পরে বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে এই চিকিৎসা প্রণালীর দিকে আকৃষ্ট করেন। এই চিকিৎসা প্রণালী আলোচনা করিয়া তিনি ইহার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইনি ১৮৬৮ খৃঃ "জার্ণেল অব মেডিসিন" নামে একখানা চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকা প্রচার করেন এবং ১৮৬৭ খৃঃ বিখ্যাত বিজ্ঞান সভা (Science association) স্থাপন করেন। ১৮৭০ খৃঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সি. আই. ই উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৭ খৃঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ছোট

লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ভগবান্ ডাক্তার সরকারকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও কিঞ্চিৎ ধন দিয়াছিলেন, তিনিও উহাদের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ইনি ১৮২৫ শকের ১১ই ফাল্গুন (১৯০৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারি) পরলোক গমন করেন। ডাক্তার সরকার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন; দেশে বিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী জাতি তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি যে কল্পনা, যে আশা, হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিজ্ঞান সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, দেশীয় সম্পত্তিশালী জনগণের উৎসাহের অভাবে তাঁহার সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক। পিতার নাম হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। পিতা কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাটীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন এবং ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে বহু বৎসর আসীন ছিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার—শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডের অন্তঃপাতী সুপাতলী গ্রামে ১৫০৪ শতাব্দীতে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) এই বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুকুন্দরাম বিশারদ; ইনি শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের দশগোত্রের অন্যতম কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রসম্ভূত। মহেশ্বর কাব্যপ্রকাশের "ভাবার্থচিন্তামণি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যেমন অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজে স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ মহেশ্বরও "বর্ণধর্ম্মপ্রদীপ" "দায়প্রদীপ" "বিচারপ্রদীপ" "সংসারপ্রদীপ" প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রদীপ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্টের যে অংশে রঘুনন্দনের প্রসার নাই, তথায় মহেশ্বর কৃত "প্রদীপের" আদর দৃষ্ট হয়।

মাঘ—বিখ্যাত ভারতীয় মহাকবি। ইনি "শিশুপাল বধ" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য লিখিয়া জগতে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নানা উদ্ভট শ্লোকে ইঁহার কবিশক্তি প্রশংসিত হইয়াছে।

"কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ।"
"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

পণ্ডিতবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেন যে, মাঘ ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যকে আদর্শ করিয়া স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন। রচনা প্রণালী দেখিলে এই উভয় কবিই যে কালিদাসের পরবর্ত্তী তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। প্রাচীন আখ্যায়িকা প্রভৃতিতে মাঘেরই সমধিক উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ভারবির নাম তেমন দৃষ্ট হয় না; ইহাতে মাঘকে ভারবির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে এক এক বার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু এবিষয়ে আর প্রবলতর যুক্তি কিছুই দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়; কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লোকদিগের আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিতে হয়। মহাকবি মাঘ কোন্ দেশে কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন নির্ণয় করা দুরূহ। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। গ্রন্থের আভ্যন্তর প্রমাণ ও বাহিরের প্রমাণ দৃষ্টে বোধ হয় যে, মাঘ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ভোজপ্রবন্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, তিনি গুর্জ্জর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ সুপ্রভদেব কোন রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই রাজার নাম ধর্ম্মদেব। কোন গ্রন্থে এই রাজার নাম ধর্ম্মলাভ আবার কোন গ্রন্থে বা বর্ম্মদেব লিখিত হইয়াছে। এই রাজা গুর্জ্জর দেশীয় ছিল। কথিত আছে যে, মহাকবি অর্থাভাবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

মাধবদেব (মহাপুরুষ মাধবদেব)—এই মহাপুরুষ কায়স্থকুলে নারায়ণপুরে ১৪১০ শকে (ইং ১৪৮৮খ্রীঃ) বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি অতি

কষ্টে দিন পাত করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি বৈদিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু মহাপুরুষ শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং দ্বৈতবাদী হইয়া পড়েন। তিনিই শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হইতেন। তিনি মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন (শঙ্করদেব দেখ)। তিনি শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত সত্রগুলির উন্নতি সাধন করেন এবং নিজেও অনেক সত্র স্থাপন করেন। তিনি শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত বরপেটাসত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "নামঘোষা" একখানা প্রধান বৈষ্ণব গ্রন্থ। তিনি ১৬ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫১৮ শকে (ইং ১৫৯৬ খ্রীঃ) ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

মাধবরাও (রাজা, সার, কে. সি. এস আই)—এই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ১৮২৮ খৃঃ কুম্ভকোনম সহরে এক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাধবরাওর পিতা রঙ্গরাও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। মাধবরাও বাল্যকালে মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। গণিত ও বিজ্ঞানেই তিনি অধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া কিছুকাল শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তৎপর মান্দ্রাজের একাউন্টেণ্ট জেনারেল আফিসে প্রবেশ করেন। এখান হইতে তিনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। এই শিক্ষকপদে তিনি ৪ বৎসর ছিলেন; তৎপর এই রাজ্যে দেওয়ানপদের নিম্নেই জমাসেরেস্তায় এক উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে তিনি দেওয়ান-পেস্কারের পদ লাভ করেন। তাঁহার উপর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগের শাসন ভার অর্পিত হইল। তিনি অতি যোগ্যতার সহিত এই কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। এই সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। মহারাজ স্বয়ং কিছুই কাজকর্ম্ম দেখিতেন না; অধিকাংশ কর্ম্মচারীই উৎকোচগ্রাহী ছিল; কর্ম্মচারীরা নিয়মমত বেতন পাইত না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট দেয় বার্ষিক কর বাকী পড়িতে লাগিল। রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। বড়লাট ডালহৌসী এই কারণে ত্রিবাঙ্কুররাজ্য ইংরেজের খাস করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে মাধবরাও লর্ড ডালহৌসীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্য অনুনয় করিলেন; লর্ড ডালহৌসী মাধবরাওর প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে ৭ বৎসরের সময় দেন। কথা হইল যে, যদি মাধবরাও ৭ বৎসরের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের অবস্থা উন্নত করিতে না পারেন, তবে উহা ইংরেজগবর্ণমেণ্টের খাস হইবে। এই চুক্তিতে মাধবরাও ১৮৫৭ খৃঃ ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন হইলেন। এইরূপে মাধবরাও ৩০ বৎসর বয়সে পরিশ্রম, সততা ও কর্ম্মদক্ষতার বলে ভারতের এক প্রধান রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পদে আসীন হইলেন। মাধবরাও প্রথমতঃ কাগজ ও তামাকের এক-চেটিয়া ব্যবসা উঠাইয়া দেন; ইহাতে রাজ্যের আয় অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৫ খৃঃ তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিনের বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি স্থাপন করেন। এই সমুদয় কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কে. সি. এস. আই, উপাধি দান করেন। এই বৎসর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ফেলো" নির্ব্বাচিত করেন। মাধবরাওর ছাত্র রাজকুমার এখন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ হইয়াছেন। এই নবীন মহারাজকে বহুলোকে মন্ত্রণা দিয়া মাধবরাওর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই মাধবরাওর সহিত মহারাজের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ইঁহার ফলে মাধবরাও ১৮৭২ খৃঃ কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এখানে বিখ্যাত রাজনৈতিকের জীবনের প্রথম অঙ্ক শেষ হইল। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ, সার মাধবরাওকে মাসিক এক হাজার টাকা পেন্সন দিলেন। মাধবরাও এই পেন্সন ১৯ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি মান্দ্রাজেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। জীবনের বাকী অংশে আর কোন কার্য্য না করিয়াই শান্তিতে কাটাইবেন তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা ছিল। বড়লাট সাহেব তাঁহাকে তাঁহার সভায় সভ্যপদে মনোনীত করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সার মাধবরাও এই সম্মানের পদ প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইন্দোরের তুকাজি হুলকারের দেওয়ানি পদ গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি দুই বৎসর ছিলেন। এই সময়ে বরদার গাইকোবার মলহররাও

পদচ্যুত হন। ভারতগবর্ণমেণ্ট তুকাজি হুলকারের নিকট মাধবরাওকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তুকাজি সম্মতি দিলে মাধবরাও ১৮৭৫ খৃঃ বরদার দেওয়ান ও নাবালক গাইকোবারের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে বরদারাজ্যের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ম্মচারীদের ধূর্ত্ততা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্রমূলক রক্তপাতে দেশ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সর্দ্দার নামধারী সম্ভ্রান্ত জমিদারেরা প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া এবং স্থানে স্থানে লুটপাঠ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলেন। মাধব রাও এই সমুদয় অত্যাচার নিবারণ করিয়া কর সংগ্রহের সুন্দর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। জমিদারগণ রাজসরকারে কিছু কিছু খাজানা দিয়া বা সৈন্য যোগাইয়া জমিদারী ভোগ করিতেন। মাধব রাও এই সমুদয় জমিদারদিগের কাগজ পত্র তলব করিয়া ১৭।১৮ বৎসরের খাজানা আদায় করিলেন। যে সকল সর্দ্দার অবাধ্যতার লক্ষণ দেখাইয়াছিলেন মাধবরাও তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। এইরূপে অনতিবিলম্বেই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি রাজস্ব বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, বিচার বিভাগের সংস্কার করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপিত করিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নাবালক গাইকোবারকে লইয়া দিল্লীর দরবারে গমন করেন। এই দরদারে মাধবরাও "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গাইকোবার সাবালক হইয়া নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে গাই-কোবারের সহিত তদীয় দেওয়ান রাজা মাধব রাওর কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইতে লাগিল। এইজন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মাধবরাও কর্ম্মত্যাগ করেন। গাইকোবার তাঁহাকে পেন্সনের পরিবর্ত্তে নগদ তিন লক্ষ টাকা দেন। এইরূপে এই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞের জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইল। তিনি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া জীবনের বাকী অংশ মাদ্রাজে অতিবাহিত করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। মাধবরাও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

মাধবাচার্য্য—(১) বেদের সুবিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইঁহার অপর নাম বিজয়ানন্দ ও বিদ্যারণ্য স্বামী। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী পম্পানগরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সায়ণ ও মাতা শ্রীমতী। ইনি বিজয় নগরের অধিপতি বুক্কন রায়ের কুলগুরু ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার অপর নাম বিজয়ানন্দ হইতেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। ইনি ভারতীতীর্থের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি শৃঙ্গগিরিমঠের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। ৯০ বর্ষ বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি পরাশর সংহিতার একখানি ভাষ্য রচনা করেন; এই ভাষ্য "পরাশর মাধব" নামে প্রসিদ্ধ। এই ভাষ্যে মাধবাচার্য্য নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

"শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তির্সায়ণঃ পিতা।
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥" (পরাশর মাধব)।

ইনি "সর্বদর্শন সংগ্রহ" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

(২) চৈতন্য মহাপ্রভুর ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতৃব্যপুত্র। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতার নাম সনাতন। কালিদাস ও সনাতন দুই সহোদর নবদ্বীপবাসী দুর্গানাথ মিশ্রের পুত্র। মাধব শ্রীচৈতন্যের আদেশে অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য লিখেন।

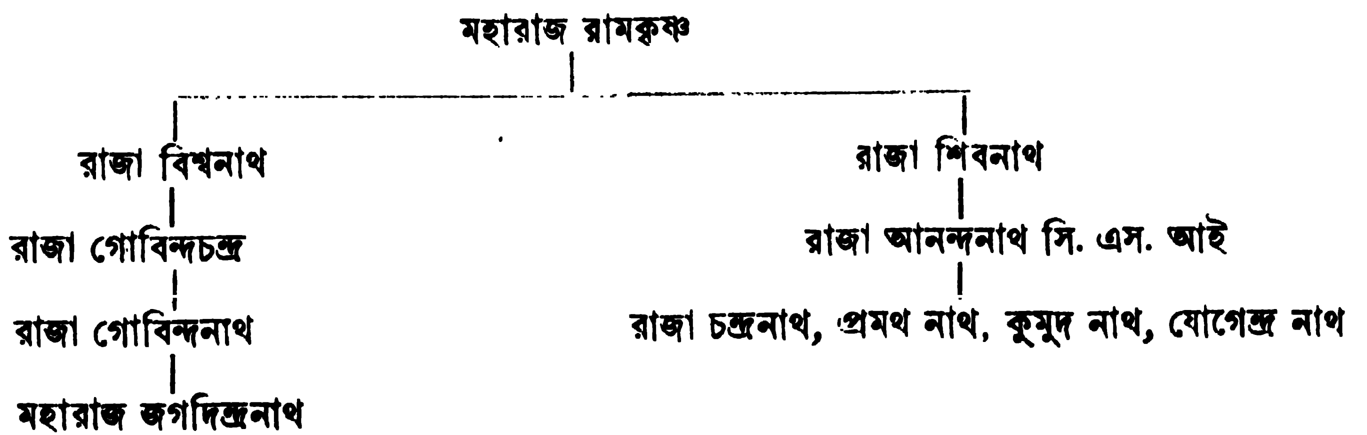
(৩) চণ্ডীকাব্য প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম পরাশর।

মাধবেন্দ্রপুরি—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। ইনি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরি ইঁহার শিষ্য।

মাধাই—শ্রীচৈতন্যের সমকালবর্ত্তী নবদ্বীপের একটী উদ্ধত প্রকৃতির লোক। ইহার অপর ভ্রাতা জগাই। জগাই ও মাধাই দুই ভ্রাতা বৈষ্ণবগণের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। একদিন ইহারা নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসের খণ্ডদ্বারা আহত করিয়াছিল। পরিশেষে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহে ইহাদের মুক্তি হয়; ইহারা পূর্ব্বস্বভাব পরিবর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিত। হরিনাম জপ করিয়া ইহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে এবং সাধু বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হয়।

মানসিংহ—অম্বরাধিপতি ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার জনকের নাম জগৎসিংহ। ভগবান্ দাস ইঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। ভগবানের মৃত্যুর পর ইনি অম্বরের সিংহাসন লাভ করেন। ভগবান্ দাসের পিতা বেহারী মল্ল স্বীয় দুহিতাকে সম্রাট্ আকবরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন এবং মানসিংহের ভগিনীকে যুবরাজ সলিম বিবাহ করেন। সম্রাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হেতু ইনি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনে আনয়ন করেন। ইনি কাবুলের বিদ্রোহদমনে প্রেরিত হইয়া উক্ত দেশ মোগলের বশে আনয়ন করেন। মিবারপতি প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক ইনি অবমানিত হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬০ জন পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে ১৫০০ শত মহিলা তাঁহার ভার্য্যারূপে বর্ত্তমান ছিলেন; ইঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে রাজার ঔরসে দুই তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু এই সমুদয় সন্তানের মধ্যে রাজা ভাওসিংহ ব্যতীত অপর সকলেই রাজার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (প্রতাপসিংহ দেখ)।

রামকৃষ্ণ (মহারাজ)—বিখ্যাত রাণীভবানীর দত্তক পুত্র (রাণীভবানী দেখ)। ইনি দিল্লীর বাদশাহ্ আলমগীরের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রস্তাবিত "দশশালা" বন্দোবস্তে ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। ইঁহার আপত্তি গ্রাহ্য না হওয়াতে ইনি সংসারে বীতস্পৃহ হন। ইনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, অদৃষ্টের ফলে রাজত্ব লাভ করেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন রাজত্বেও সুখ নাই। তিনি রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া উদাসীনবৎ জীবন যাপন করিতে থাকেন। বাকী খাজানায় তাঁহার জমিদারী নিলাম হইতে লাগিল। নিলামের সংবাদ আসিলে তিনি বলিতেন "জয়কালীকে ভোগ দেও।" মহারাজ রামকৃষ্ণের জমিদারী ক্রয় করিয়া কতকগুলি লোক বড় মানুষ হন; ইঁহাদের মধ্যে নড়ালের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায়, দিঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়, গোবরডাঙ্গার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কেনারাম মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ গোপীমোহন ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই মহারাজ রামকৃষ্ণের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পুত্রের এইরূপ উদাসীনতা দেখিয়া রাণীভবানী পুনরায় স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ দুইটি পুত্র রাখিয়া ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে (কাহারও মতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে) দেহত্যাগ করেন। এই রাজবংশের রাজগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।



রাজা চন্দ্রনাথ গবর্ণর জেনারেলের ফরেন ডিপার্ণমেণ্টের এটেচি (Attachee) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে কোন বাঙ্গালী আসীন হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ দুইবার বঙ্গীয় ছোটলাট সাহেবের সভার সদস্য হইয়াছিলেন। জগদিন্দ্রনাথ লর্ড লিটনের শাসনকালে "মহারাজ" উপাধি লাভ করেন।

মিহির—বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা। (খনা দেখ)।

মীরাবাই—মিবারের অধিপতি রাণা কুম্ভের পত্নী। ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে মারবার প্রদেশে একজন রাঠোর সামন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলার জীবনবৃত্তে রাজস্থানের ইতিহাস অলঙ্কৃত হইয়াছে। মীরা বিষ্ণুর উপাসিকা ছিলেন. কিন্তু তাঁহার শ্বশুরবংশে শক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত ছিল। তাঁহার শাশুড়ী পুত্রবধূকে বিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ উপেক্ষিত হইল দেখিয়া, বৃদ্ধা রাণী তাঁহাকে রাজভবন পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। রাণা কুম্ভ মাতার আদেশের প্রতিকূলে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মীরা ভিখারিণীর বেশে রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। স্বামিপ্রদত্ত অর্থে তিনি স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দীনদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। রাণা কুম্ভ মীরার মনস্তুষ্টির জন্য রাজান্তঃপুরে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মীরা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া নগরের রাজপথে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। মীরার কলকণ্ঠে জনসঙ্ঘ মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার "বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা" শুনিয়া নরনারীবৃন্দ ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। রাণা কুম্ভ কোন কারণে মীরাকে চিতোর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় বৈষ্ণবী মীরা রাজপুতনার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। মীরার যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্য তেমনি তাঁহার অনুপম কলকণ্ঠনিঃসৃত মনোমোহকর সঙ্গীত। রাজপুতনার নরনারী তাঁহাকে স্বর্গভ্রষ্টা দেববালা বলিয়া মনে করিত। মীরাবাই সম্বন্ধে একটী ভ্রমপূর্ণ প্রবাদ ইতিহাসে বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, সম্রাট্ আকবর স্বীয় সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনকে লইয়া মীরার সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন; এবং সঙ্গীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের হার উপঢৌকন দেন। রাণা কুম্ভ ইহা অবগত হইয়া অসতী বোধে নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া মীরাকে হত্যা করেন। সম্রাট্ আকবর ১৫৪২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু মীরা ইহার ১২২ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। সুতরাং উক্ত জনরব যে মিথ্যা তৎসম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। মীরা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া রাজপুতনার নরনারীগণকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। মীরার সুললিত পদাবলী ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। মীরার চরিত্রের উপর রাণা কুম্ভের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কয়েক দিন তিনি মীরার উপর একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে চিতোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই রাণা তাঁহার ভ্রম বুঝিলেন; তিনি ব্রাহ্মণদূত প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে চিতোরে আনয়ন করেন। তিনি মীরার শান্তি সুখ বিধানের জন্য চিতোরে বহু কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মীরা প্রত্যহ মন্দিরে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। কত শত গৃহস্থ নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আসিতেন। শুনা যায় মীরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এখনও চিতোরে রঙ্গোরজীর সঙ্গে মীরাবাইর পূজা হইয়া থাকে।

মীর্জ্জাফর — জাফরআলি খাঁ দেখ।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ)—চণ্ডী কাব্য প্রণয়ন করিয়া এই কবি বঙ্গে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দরাম বর্দ্ধমান জিলায় সলিমাবাদ পরগণায় দামুন্তা গ্রামে অনুমান ১৫৩৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমানের মুসলমান শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে কবিবর মুকুন্দরাম স্বীয় আবাসগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জিলায় ঘাটাল থানার এলাকায় অবস্থিত আরড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কবি বর্দ্ধমানের নবাবের কর্ম্মচারী ডিহিদার মামুদা সরিফের অত্যাচার কাহিনী স্বীয় গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। কবি ১৫৭৭ খৃঃ দামুন্তা হইতে পলায়ন করিয়া আরড়ায় আসিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, জলপথে পলায়নের সময় চণ্ডীদেবী স্বপ্নে তাঁহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করেন। মুকুন্দ রামের পিতার নাম হৃদয় মিশ্র; মাতা দৈবকী ও পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র। মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিধিরাম কবিচন্দ্র, কনিষ্ঠ রামানন্দ। কবির পোষ্যের নাম শিবরাম, কন্যা যশোদা, জামাতা মহেশ ও পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম একজন প্রথম শ্রেণীর বঙ্গীয় কবি; তাঁহার লেখা সরল ও মধুর। তিনি বাঙ্গালীর সংসারের যথার্থ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন; তাঁহার নারী ও পুরুষ চরিত্র বর্ণনায় কৃত্রিমতার লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না

মুকুলজি — মিবারের রাণা লাক্ষের পুত্র ও চণ্ডের বৈমাত্রের ভ্রাতা। (চণ্ড দেখ)।

মুঞ্জ—ইনি ধারানগরের অধিপতি। মালবদেশে দুইটি প্রধান নগর—একটির নাম উজ্জয়িনী ও অপরটি ধারা। মুঞ্জরাজ বিখ্যাত ভোজরাজের পিতৃব্য। (ভোজদেব দেখ)।

মুরা—বিখ্যাত মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের জননী। ইঁহার নামানুসারে চন্দ্রগুপ্তের বংশ মৌর্য্যবংশ নামে খ্যাত হয়। (চন্দ্রগুপ্ত দেখ)।

মুরারি গুপ্ত —শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক পার্শ্বদ ভক্ত। শ্রীচৈতন্যের সময়ে শ্রীহট্টবাসী অনেকেই নবদ্বীপের অধিকারিরূপে তথায় বাস করিতেন। তন্মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীচৈতন্যের মাতৃষ্বস্পতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, রত্নগর্ভাচার্য্য ও মুরারিগুপ্ত প্রভৃতিই প্রধান।

মুরারিগুপ্ত শ্রীচৈতন্য হইতে ১০।১২ বৎসরের বয়োধিক। তিনি বাল্যকাল হইতেই অধ্যায়চর্চ্চা ভালবাসিতেন। ১৯।২০ বৎসর বয়সে তিনি জ্ঞানপ্রবীণ হইয়া উঠেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইতে সকল ঘটনাই দেখিয়াছেন। এই সমুদয় ঘটনা অবলম্বনে তিনি ১৪৩৫ শকে (অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের ৪ বৎসর পরে) "চৈতন্য চরিত" নামে সংস্কৃতে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে ইহাই আদি গ্রন্থ। পরবর্ত্তী লেখকগণ এই আদিগ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন, ইহা চৈতন্য চরিতামৃতে ও চৈতন্যমঙ্গলে স্বীকৃত হইয়াছে।

মুরারিগুপ্ত কেবল চৈতন্যচরিত লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বঙ্গভাষা তখন নিতান্ত শিশু হইলেও মুরারি তাহার সেবায় অবহেলা করেন নাই। তিনি কয়েকটি সুধামধুর পদ রচনা করিয়া শ্রীহট্টবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন পদের গ্রন্থসমূহে উক্ত পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। চৈতন্যচরিত ও বাঙ্গালা পদাবলী ব্যতীত তাঁহার সংস্কৃত "রামাষ্টক" অতি প্রসিদ্ধ।

মুরারি মিশ্র —অনর্ঘরাঘব নামক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা।

মুলজী (কর্সেন্দাস)—বোম্বাইর বিখ্যাত সমাজসংস্কারক। ইনি ১৮৩২ খৃঃ ২৫শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। ইনি ভাটিয়া হিন্দু শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই শ্রেণীতে কুৎসিত সামাজিক প্রথা বর্ত্তমান ছিল। এই শ্রেণীর লোকদিগকে "মহারাজ" নামধেয় পুরোহিতগণ অতি কঠোর সামাজিক শাসনে আবদ্ধ রাখিতেন। তিনি এই কুৎসিত প্রথা দমনে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি "সত্য প্রকাশ" নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই পত্রিকায় এই সমুদয় কুৎসিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন; মহারাজ পুরোহিতদিগকেও আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। ১৮৬১ খৃঃ ১৪ই মে সুরাটের গুরুমহারাজ "সত্য প্রকাশ" সম্পাদকের নামে মানহানির অভিযোগ করেন। বোম্বাই সুপ্রিমকোর্টে ৪০ দিন পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার বিচার হয়। বিচারে সম্পাদক কার্সেন্দাস্ মুলজি জয়লাভ করেন। বিচারক তাঁহাকে সৎসাহসের জন্য অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ—বাঙ্গালার নবাব ও মুর্শিদাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে এক মুসলমান বণিকের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তদীয় ধর্ম্ম ও মোহাম্মদ হাদী নাম গ্রহণ করেন। নানা ঘটনার পর তিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন এবং সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সুনজরে পতিত হইয়া ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে প্রত্যেক সুবায় দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়; একজন শাসন বিভাগের কর্ত্তা, ইঁহার পদবী নাজিম বা সুবাদার এবং অপর ব্যক্তি রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা—ইঁহার পদবী দেওয়ান। বাদশাহের পৌত্র আজিমুখান বাঙ্গালার নাজিম (সুবাদার) পদে এবং মোহাম্মদ হাদী দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন (১৭০১)। তৎকালে ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। মোহাম্মদ হাদী কার্য্য কুশলতায় বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। নানাকারণে নাজিমের সহিত দেওয়ান

মোহাম্মদ হাদীর মনোবাদ উপস্থিত হয়। মোহাম্মদ হাদী দেখিলেন, রাজস্বকার্য্য সম্বন্ধে ঢাকা অপেক্ষা মুকসুদাবাদই অধিকতর সুবিধাজনক স্থান। এজন্য নাজিমের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়াই তিনি রাজস্ববিভাগ মুকসুদাবাদে উঠাইয়া আনেন। তিনি প্রচুর রাজস্বের টাকা লইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহ তখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। আশাতীত অর্থ পাইয়া বাদশাহ আওরঙ্গজেব দেওয়ানের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি দান করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ মুকসুদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া এই নগরীটির নাম স্বীয় নামানুসারে মুর্শিদাবাদ রাখেন। তদবধি এই নগরী মুর্শিদাবাদ নামে প্রথিত হয়। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবী পদ লাভ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের নবাবী পদ লাভ করিয়া স্বীয় জামাতা সুজাউদ্দিনকে প্রথমে উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান ও পরে নায়েব নাজীম পদে উন্নীত করেন। কিন্তু তিনি স্বীয় জামাতার চরিত্রহীনতার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা জিন্নেতুন্নেসা বেগম অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন। জিন্নেতুন্নেসার গর্ভে সরফরাজ খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। সুজাউদ্দিনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ সুবে বাঙ্গালার রাজস্ব ও জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত (Settlement) করিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তে তাঁহার বিচক্ষণতা ও সুবিচার পরিলক্ষিত হইয়াছে। নাটোরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন তাঁহাকে একার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা সুজাউদ্দিন বাঙ্গালার নবাব হইয়া মুর্শিদাবাদের গদিতে বসেন। অল্পকাল পরেই সুজার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার স্থলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাব হন। এই সময়ে সুজাউদ্দিনের অনুগ্রহে লালিত নবাব আলীবর্দ্দি, পাটনার গদিতে ছিলেন। বাঙ্গালার নবাবী লাভের জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল। ওদিকে সরফরাজ খাঁর বাঙ্গালার গদি লাভের পর হইতে রাজ্যে নানা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া আলীবর্দ্দি সসৈন্যে বঙ্গের দিকে অগ্রসর হন। সরফরাজখাঁও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। গিরিয়া নামক স্থানে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হয়। ঘোর যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। আলীবর্দ্দি বাঙ্গালার নবাব হইলেন। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর সহিত আহমরাজ রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহের, কোচবিহারাধিপ রূপনারায়ণের এবং ত্রিপুরার মহারাজ রত্নমাণিক্যের বন্ধুত্ব ছিল। বিচার বিষয়ে নবাব এমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত স্বীয় পুত্রের প্রাণদণ্ড করিতেও নিরস্ত রহেন নাই।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার—ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফ পরগণার ভাতকাটিয়া গ্রাম নিবাসী ছিলেন। ইঁহার সময়ে ইনিই শ্রীহট্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ইঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল।

য

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—(সার, মহারাজ বাহাদুর, কে. সি. এস. আই) এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৭৮৩ শকের বৈশাখের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে (১৮৩১ খৃঃ মে মাসে) কলিকাতা যোড়াসাঁকো নামক পল্লীতে স্বীয় পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺ হরকুমার ঠাকুর, পিতামহ ৺ গোপীমোহন ঠাকুর এবং প্রপিতামহ দর্পনারায়ণ ঠাকুর। আদিশূরের রাজত্বে ৯৯১ খৃঃ কান্যকুব্জ হইতে আনীত ভট্টনারায়ণের বংশে মহারাজ বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ উদ্ভূত। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের পিতা হরকুমার ঠাকুর সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; তিনি সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তিনি কৃতবিদ্য পুত্রের শিক্ষার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় যতীন্দ্রমোহন অল্পকালের মধ্যেই সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে পড়িয়া মৃত্যুপথগামী হওয়ার আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণদাস নামে এক ভৃত্য তাঁহাকে রক্ষা করে। এজন্য মহারাজ চিরকাল ভৃত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন যখন হিন্দুকলেজে পড়া শেষ করেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। মহারাজ বাহাদুর পিতার নামে ও পিতৃব্য ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের

নামে কয়েকটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ১৮৬৬ খৃঃ ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রত্যহ ২৫০ আড়াই শত লোককে আহার করাইতেন। তিনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ১৮টী ছাত্রের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। তিনি এক হাসপাতালে দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। তাঁহার নানা স্থানে প্রদত্ত টাকার সমষ্টি পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে নানা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ছোট লাট ও বড় লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি তিনবার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন ;— প্রথম বার ১৮৭৭ খৃঃ, দ্বিতীয় বার ১৮৭৯ খৃঃ, তৃতীয় বার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি নিযুক্ত হন এবং এই সনে তিনি সি, এস, আই, উপাধি লাভ করেন। ইহার পরবর্ত্তী কালে তিনি কে, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি বংশানুক্রমিক "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো", কলিকাতা যাদুঘরের (Museum) "ট্রষ্টি", মেও হাসপাতালের "গভর্ণর" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সিণ্ডিকেট" সভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিলেন; তদপেক্ষা ধনী জমিদার বঙ্গে বহু ছিলেন; কিন্তু কেহই গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ সম্মান পান নাই। গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি (বঙ্গাব্দ ১৩১৪ সনের ২৪শে পৌষ) বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হয়। বড় লাট লর্ড মিণ্টো ও ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার মহোদয়গণের প্রতিনিধিদ্বয় মৃত্যু সময়ে মহারাজ বাহাদুরের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং শবদেহ শ্মশানে নীত হইবার সময় তাঁহারা শবের পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ কলিকাতার দুর্গ হইতে ২১ বার তোপধ্বনি করা হইয়াছিল এবং দুর্গের ব্রিটিশ পতাকা অর্দ্ধ নমিত করা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ১৩১৪ সনের পৌষ মাসে নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যশোবন্তরাও (হুলকার)—(১) বিখ্যাত তুকাজীরাও হুলকারের পুত্র। তুকাজী হুলকারের বিভিন্ন পত্নীগর্ভজাত চারি পুত্র তন্মধ্যে কাশীরাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের রাজসিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। বিবাদে যশোবন্তেরই জয় হয় ; যশোবন্ত, জ্যেষ্ঠ কাশীরাও ও ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডেরাওকে গোপনে হত্যা করেন। এই হত্যাজনিত পাপের ফলে যশোবন্ত উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন এবং বহুকাল যন্ত্রণা ভোগের পর ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

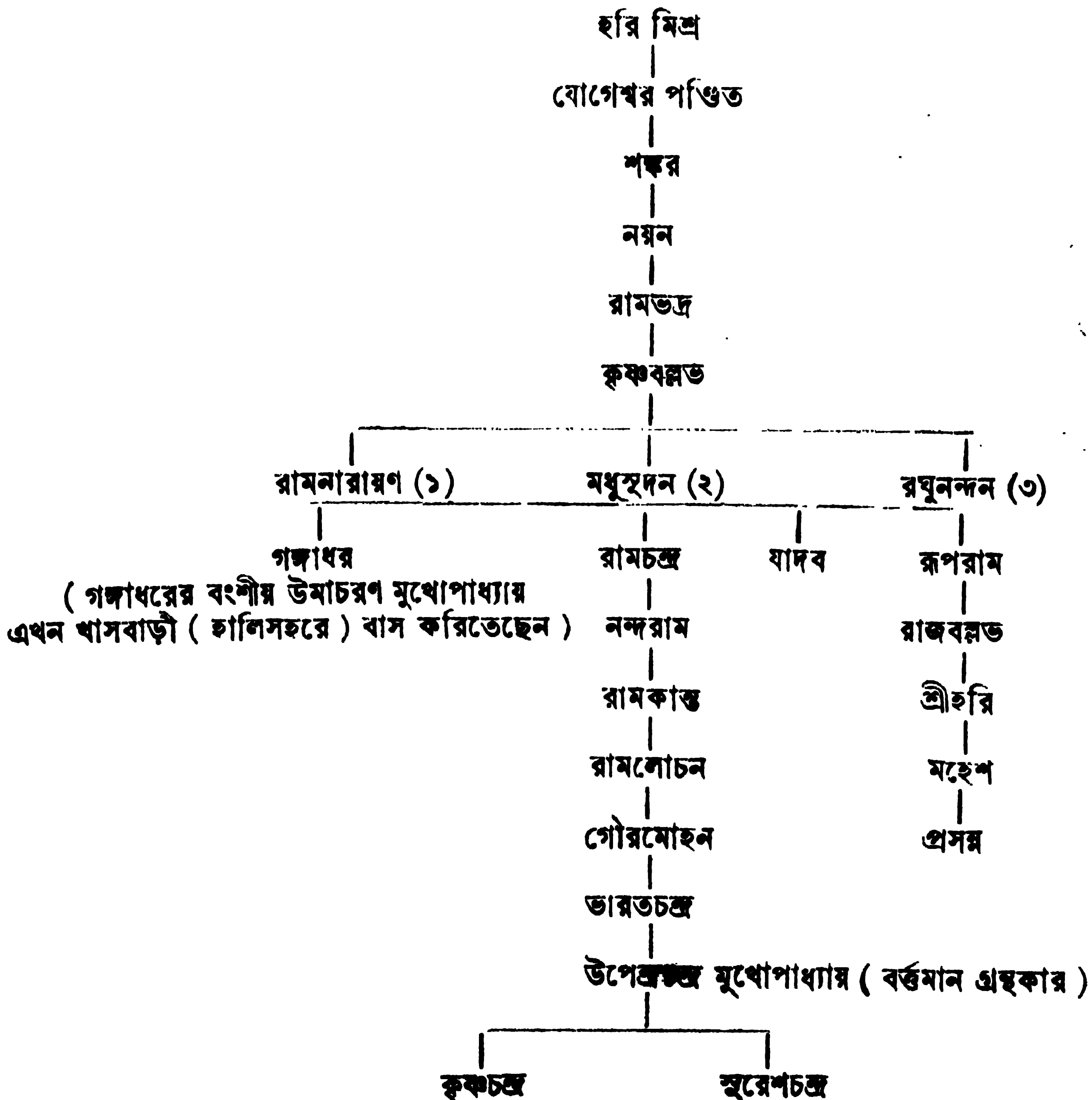
(২) একজন বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সাধু। ইনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পুনানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঢণ্ডো ও মাতা হরি-বাই। ইনি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রথমে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিতেন, পরে যোগ্যতা দেখাইয়া ক্রমে মামলেদারের পদে উন্নীত হন। এই পদে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেন। যশোবন্ত সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত এবং তাঁহাকে "বেদ মামলেদার" বলিয়া অভিহিত করিত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যশোবন্ত ইংরেজগবর্ণমেণ্টকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য গবর্ণমেণ্টে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। একদা যশোবন্ত কমিশনর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাটানা নামক স্থানে গমন করেন। এখানে যশোবন্তকে দেখিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হয়। কমিশনর সাহেব বিস্ময়ান্বিত হইয়া কালেক্টর সাহেবকে এত লোক সমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কালেক্টর বলিলেন "লোকে যশোবন্তকে দেবতারন্যায় ভক্তি করে ; তাঁহাকে দেখিবার জন্য এখানে এত লোকের সমাগম হইয়াছে।" কমিশনর বলিলেন যে, এ অবস্থায় যশোবন্তদ্বারা সরকারী কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় ; অতএব ইহাকে পেন্সন দেওয়া হউক। ইহার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত পেন্সন গ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনায় আত্মাকে নিয়োজিত করিলেন। মহারাজ সিন্ধিয়া ও হুলকার প্রভৃতি দেশীয় নৃপতিবৃন্দ যশোবন্তকে বহুসম্মান করিতেন। মহারাজ হুলকার যশোবন্তকে একবার রাজধানীতে লইয়া যাইতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হুলকার স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে ইন্দোরে লইয়া যান। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর এই মহাপুরুষ মানবলীলা সংবরণ করেন।

যশোবন্ত সিংহ—মারবারের (যোধপুরের) বিখ্যাত নৃপতি। ইনি সম্রাট্ সাহজাহানের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আওরাঙ্গজেব সাম্রাজ্য লাভ করিয়া যশোবন্তের ক্ষমতা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হন। সম্রাট্ আওরাঙ্গজেবের চক্রান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বীসিংহ দিল্লীতে হত হন। যশোবন্তের অপর দুই পুত্র কাবুলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যশোবন্ত পুত্রশোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। এই দুঃসময়ে ৬৪২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরাঙ্গজেব বিষ প্রয়োগে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার ন্যায় বীর মারবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

যশোবর্ম্ম দেব— কনোজের প্রসিদ্ধ নৃপতি। বিখ্যাত কবি ভবভূতি ইঁহারই সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি গৌড়দেশ (বঙ্গদেশ) জয় করেন। গৌড় জয় করিয়া তিনি নর্ম্মদাতীরে রাজা কার্ত্তবীর্য্যের পবিত্র আশ্রম সন্দর্শন করেন। তথা হইতে তিনি মরুদেশ (মারবার) ও শ্রীকণ্ঠে (থানেশ্বর) গমন করেন। এখান হইতে কুরুক্ষেত্র হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন এবং তথা হইতে স্বীয় রাজধানী কনোজে উপস্থিত হন। কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্যের সহিত ইঁহার যুদ্ধ হয়, কিন্তু ইনি পরাজিত হইয়া ললিতাদিত্যের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিত (মুখোপাধ্যায়)—ইঁহা হইতে খড়দহমেলের উৎপত্তি হইয়াছে। (বল্লাল সেন দেখ)। যোগেশ্বরের বংশাবলী পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যোগেশ্বরের বংশাবলী।



(১)—(৩)—এই তিন জনে কাশ্যপকাঞ্জারী মার্জ্জনা করেন।

র

রঘুনন্দন—(১) ইনি শ্রীচৈতন্যের পরমভক্ত শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য ইঁহাকে কোলে লইয়া "পুত্র" সম্বোধন করিয়াছিলেন। এজন্য বৈষ্ণব সমাজ ইঁহাকে অত্যন্ত আদর ও সম্মানের চক্ষে দেখে। ইনি বৈদ্যবংশীয় ও ইঁহার পিতার নাম মুকুন্দ।

(২) ইনি বর্দ্ধমান জেলায় নিত্যানন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কিশোরীমোহন গোস্বামী। ইনি "ভাগবত-সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি রঘুনন্দন গোস্বামী নামে পরিচিত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য—ইনি খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় ২৫ বৎসর পরে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রাদুর্ভাবসময় যথার্থরূপে নির্ণয় করা দুরূহ। ইনি বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; ইদানীন্তন হিন্দু-সমাজ ইঁহার প্রণীত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের বিধান অনুসারে চালিত হইতেছে। রঘুনন্দনের সময়ের হিন্দু-সমাজ বাঙ্গালার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নবাব হোসেন শাহের শাসনে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ দলে দলে ইস্‌লামধর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছিল। এই সমুদয় দিকে লক্ষ্য করিয়া রঘুনন্দন হিন্দু সমাজ সংস্কার বিধায়ক অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব (স্মৃতিগ্রন্থ) প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের সহিত রঘুনন্দনকৃত স্মৃতির বিরোধ হওয়াতে নানাস্থানের পণ্ডিতগণ রঘুনন্দনের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বিচারে রঘুনন্দন জয়ী হন। এই বিচারের পর হইতেই তাঁহার নিকট নানা স্থান হইতে বহু শিষ্য অধ্যয়নার্থ আসিতে লাগিল এবং তাহারা শিক্ষিত হইয়া তৎপ্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থ আদৃত হইল এবং হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড নূতন অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব অনুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল। রঘুনন্দন এই সময় হইতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নামে বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। ইঁহার পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। পিতাও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং নবদ্বীপে ইঁহার টোল ছিল। রঘুনন্দন ২৫ বৎসরে তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। তিনি ২৫ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানা দিগ্দেশ ভ্রমণপূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর তাঁহার যশ অঙ্গবঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নের কিছুকাল পরে পিতৃ-পুরুষদিগের শ্রাদ্ধের জন্য গয়ায় যান। তথাকার পাণ্ডারা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অধিক অর্থ দাবী করাতে, তিনি গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ এক ক্রোশ নিরূপণ করিয়া প্রান্তরে গিয়া পিণ্ড দান করিতে উদ্যত হন। পাণ্ডারা ইঁহার পরিচয় পাইয়া বিপদ্ গণিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, যদি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মাঠে পিণ্ড দান করেন, তবে সকলেই তথায় যাইবে। এজন্য তাঁহারা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে নম্র ব্যবহারে তুষ্ট করিয়া মন্দিরে আনয়ন করিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তিনি সমস্ত জীবন শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিয়া সপ্ততি বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী—ইনি মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে প্রধান ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইনি ১২ লক্ষ টাকা আয়ের পৈতৃক সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি অল্প বয়সে সংসারত্যাগী হন। ইনি সপ্তগ্রাম নামক এক সমৃদ্ধিশালী নগরীর অধিবাসী ছিলেন। এই নগরী পূর্ব্বে বঙ্গদেশের মধ্যে এক প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। রঘুনাথ ১৪১৯ শকে এই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোবর্দ্ধন দাস তাঁহাকে সংসারে আসক্ত রাখিবার জন্য এক রূপলাবণ্যবতী রমণীর সহিত পরিণীত করেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের এক মাত্র পুত্র। গোবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ সহোদর হিরণ্যদাস অপুত্রক ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন কায়স্থ ছিলেন এবং ইঁহারা গৌড়াধিপতি সৈয়দহুসেন শাহের করসংগ্রাহক কর্ম্মচারী ছিলেন, এজন্য ইঁহারা নবাব সরকার হইতে "মজুমদার" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহারা নবদ্বীপবাসী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কুলপুরোহিত বলরাম আচার্য্যের বাড়ীতে মুসলমান কুলসম্ভূত বিখ্যাত হরিদাসের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া

বালক রঘুনাথের বৈরাগ্যোদয় ও ধর্ম্মে মতি হয়। ইনি বহুবার সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তজ্জন্ত পিতা ইঁহাকে বান্ধিয়া রাখেন এবং ৫ জন সর্দ্দার, ৪ জন ভৃত্য ও ২ জন ব্রাহ্মণকে প্রহরী নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি পলায়ন করিয়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্তের নিকট উপস্থিত হন। তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর বৃন্দাবনে যান; তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকেন। বিখ্যাত কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্তচরিতামৃতে স্বীয় গুরুর অশেষ গুণ গান করিয়াছেন। কথিত আছে যে, বৃন্দাবনে গিয়া রঘুনাথ অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল ঘোল (মাঠা) খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। ১৫০৪ শকে বৃন্দাবনে রঘুনাথের তিরোভাব হয়। ১৪৩৯ শকে রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতে রঘুনাথ বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি "চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ", "মনঃশিক্ষা" ও "গুণলেশশেখর" নামে তিন খানি ভক্তি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী—অমরকোষের বিখ্যাত টীকাকার। ফরিদপুর জিলায় মাদারিপুর উপবিভাগের অন্তর্গত সামন্তসার গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। (২) ফরিদ জিলার নবগ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পাণ্ডিত্য থাকিলে অন্য উপাধির প্রয়োজন নাই বলিয়া ইনি কৌলিক উপাধির পরিবর্ত্তে অন্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—ইনি রূপসনাতনাদির ন্যায় মহাপ্রভুর "গণের" মধ্যে অন্যতম। ইনি কাশীবাসী তপন মিশ্রের পুত্র। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন।

রঘুনাথ শিরোমণি—ইনি নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক। রঘুনাথ খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে ১৪৭২ খৃঃ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বস্ত প্রমাণের অভাবে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ন্যায় ইঁহারও প্রাদুর্ভাব সময় নিরূপণ করা দুরূহ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইনি শ্রীহট্ট জিলায় দীঘিরপার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িকগণের অন্তর্ভূত কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ; বৈদিকসংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি, শ্রীহট্ট জিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুপতি উক্ত জিলায় জনৈক রাজা সুবিদ নারায়ণের কন্যা রত্নাবতীকে বিবাহ করেন। ইঁহার মাতার নাম সীতাদেবী। রঘুনাথের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন; মাতা অতি কষ্টে সময়ে সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুত্রের ভরণপোষণ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সেই তিনি টোলে প্রবেশ করেন। দারিদ্র্যপীড়নে নিপীড়িত হইয়া মাতা সীতাদেবী, রাজকন্যার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুপতির বিবাহ দেন। রাজা বংশ মর্য্যাদায় একটু নীচ ছিলেন; এজন্য অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের নিন্দা করাতে সীতাদেবী রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হন। এই সময়ে নবদ্বীপ সরস্বতীর ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। নবদ্বীপের নাম চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে ছাত্র ও অধ্যাপক আসিয়া নবদ্বীপে শিক্ষালাভ করিয়া যাইত। এইস্থানে আসিয়া তিনি বিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করেন। সার্ব্বভৌম রঘুনাথের প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই রঘুনাথ ন্যায় শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে রঘুনাথকে স্বীয় অধ্যাপক বাসুদেব কৃত "সার্ব্বভৌম নিরুক্তি" ও গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণি" অধ্যয়ন করিতে হইত। তিনি অধ্যাপক সার্ব্বভৌমের নিকট পাঠগ্রহণ কালে এই উভয় গ্রন্থের ভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব স্বীয় ছাত্রের বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। রঘুনাথ উক্ত চিন্তামণি গ্রন্থের ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক ছাত্রাবস্থাতেই নিজ মত প্রচার করিতে লাগিলেন; ইহাতে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে হুলস্থুল উপস্থিত হইল। শ্রীচৈতন্য রঘুনাথের সহাধ্যায়ী, উভয়েই প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন; উভয়েরই মধ্যে বেশ সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। একদিন রঘুনাথ একটী বিষয় ভাবিতেছিলেন এমন সময় চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। রঘুনাথ বুঝিলেন, চৈতন্য সামান্য মানব নহেন। কথিত আছে, অধ্যাপক সার্ব্বভৌম মহাশয় রঘুনাথকে উপাধিলাভের জন্য মিথিলায় প্রেরণ করেন। রঘুনাথ মিথিলায় যাইয়া তত্রত্য বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের টোলে ভর্ত্তি হন। কিয়ৎকাল

অধ্যয়নের পরে রঘুনাথ স্বীয় অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়শাস্ত্রীয় তর্কে পরাস্ত করিয়া "শিরোমণি" উপাধি লাভ করেন এবং তথায় নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আসেন ও ভবিষ্যতে উপাধি লাভের জন্য বঙ্গদেশ হইতে কাহাকেও মিথিলায় যাইতে হইবে না এ নিয়মটীও সংস্থাপন করিয়া আসেন। রঘুনাথ ৩৮ খানি গ্রন্থ লিখেন, তন্মধ্যে ব্যুৎপত্তিবাদ, লীলাবতী টীকা, ক্ষণভঙ্গুর-বাদ, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, পদার্থমণ্ডল, প্রামাণ্যবাদ, ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি, অদ্বৈতেশ্বর-বাদ, অবয়ব গ্রন্থ, আকাঙ্ক্ষাবাদ, কেবলব্যতিরেকী, পক্ষতা, আখ্যাতবাদ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি টীকা প্রসিদ্ধ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরলোক গমন করেন।

রঘুপতি উপাধ্যায়—বৈষ্ণব কবি। ইনি ত্রিহুত দেশবাসী এবং ১৪শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

রঙ্গচার্লু—(চেটিপনিয়ম্ বীরবল্লী রঙ্গচার্লু সি. আই. ই.) রঙ্গচার্লু মান্দ্রাজ প্রদেশে চিংলেপট জিলায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চেটিপনিয়ম রাঘব চেরিয়ার। পিতা চিংলেপট কালেক্টরীর একজন কেরাণী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন; কিন্তু লেখা পড়ায় তাঁহার মনোযোগ কম ছিল। ১৮৪৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি মান্দ্রাজ হাই-স্কুলে পড়েন; ইহার পর তিনি মান্দ্রাজ কালেক্টরীর কেরাণী হইয়া গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে প্রবেশ করেন। ১৮৬৪ খৃঃ তিনি কালিকটের ডেপুটীকালেক্টর হন। এই সময়ে মহীশূর রাজ্যে বড় গোলমাল। পদচ্যুত রাজা কৃষ্ণরাও উদিয়ার এক পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই নাবালক পোষ্যপুত্রকে গদিতে বসাইলেন; ১৮ বৎসরের সময় এই রাজাকে রাজ্যভার দেওয়া হইবে এই বন্দোবস্ত হয়। রঙ্গচার্লুকে ইংরেজ গবর্ণ-মেণ্ট এই রাজ্যের কণ্ট্রোলার পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ খৃঃ এই পদে তিনি নানা বিষয়ের সংস্কার কার্য্য সাধন করেন। অনেক তোষামুদে লোক রাজবাড়ীতে থাকিয়া নানা উপায়ে অর্থ শোষণ করিত। রঙ্গচার্লু ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "মহীশূরে ইংরেজ শাসন" নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক ইংরেজীতে রচনা করিয়া ইংলণ্ডে প্রকাশিত করেন; ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত সুখ্যাতি হয়। তিনজন ইংরেজ ডেপুটী কমিশনারের স্থলে একজন দেশীয় কমিশনার হয়। ডেপুটী কমিশনারের বেতন ১৬৬৬৲ হইতে ৭০০৲ টাকাতে কমান হয়; ২৭ জন সহকারী ডেপুটী কমিশনার পদের মধ্যে ৮টী পদ উঠাইয়া দেন। এইরূপ আরও নানা প্রকার সংস্কার করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেন। এই সমুদয় কাজের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৮০ খৃঃ সি. আই. ই. উপাধি দেন। ১৮৮১ খৃঃ ২৫শে মার্চ্চ তাঁহাকে মহীশূরের দেওয়ান বা মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়; ইহাই সর্ব্বোচ্চ পদ। এই পদে থাকিয়া তিনি নানাবিধ সংস্কার কার্য্যে ও রাজ্যের আয় বৃদ্ধি কার্য্যে মনোযোগ দেন। তিনি রেলওয়ে বিস্তারদ্বারা রাজ্যের অশেষ উন্নতি কল্পনা করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কঠিন রোগগ্রস্ত হন, এই রোগে কয়েক মাস কষ্ট পাইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। মহীশূরের মহারাজ ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বহু কর্ম্মচারী তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি রাজ্যের পরম হিতৈষী ছিলেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের বিখ্যাত কবি। এক পদ্মিনী উপাখ্যানই ইঁহাকে অমর করিয়াছে। ইঁহার পথ অনুসরণ করিয়া মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালীজাতির উন্নতিসাধন করিয়া-ছেন। রঙ্গলালই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় সাধুরুচির প্রবর্ত্তক। রঙ্গলাল বর্দ্ধমান জিলায় কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামনারায়ণ। রঙ্গলাল হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পাঠে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তবে তিনি ইংরেজী ভাষাটী উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী কবিতা পড়িতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস হইয়াছিল। "এডুকেশন গেজেট" ১৮৫৫ খৃঃ স্থাপিত হয়। ওব্রায়ন স্মিথ নামে এক সাহেব ইহার সম্পাদক ছিলেন; রঙ্গলাল সহকারী সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি "আয় কর" (Income-tax) সংক্রান্ত

একটী কাজ প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করেন। তিনি ১৮৮৭ খৃঃ ১৩ই মে পরলোক গমন করেন। তিনি পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী নামে তিন খান উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে অল্পই আছে। ইহা একখানা ঐতিহাসিক কাব্য। ইহা দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন কৃত চিতোর আক্রমণ অবলম্বন করিয়া লিখিত। ইহার ভাব ও ভাষা ক্ষীণ বাঙ্গালীচিত্তের অবসন্নতা দূর করিয়া তাহাতে মহাভাবের উদ্দীপন করে।

রঙ্গানন্দ মুদালিয়ার—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব গণিতের অধ্যাপক। তিনি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে এক সম্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় তিনি মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের সমুদয় অধ্যাপকই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার যশঃ তদানীন্তন ডিরেক্টর পাউয়েল (Powell) সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং অনতিবিলম্বে গণিতের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" হন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি "সিণ্ডিকেটের" মেম্বর পদে আসীন থাকিয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অশেষ উন্নতি সাধন করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি লোকের সহিত ব্যবহারে ভদ্রতা ও বিনয়ের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত—বঙ্গের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রবন্ধ লেখক। তিনি ১৭৭১ শকে ২৯শে ভাদ্র (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর, বঙ্গাব্দ ১২৫৬ সনে) ঢাকা জিলায় মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অধীন মত্তগ্রামে তদীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকান্ত গুপ্ত। কমলাকান্ত তেওতা গ্রামবাসী ছিলেন। রজনীকান্ত পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন এবং ইহার ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই রোগজনিত শ্রবণ দৌর্ব্বল্যই তাঁহার শিক্ষার পরিপন্থী হইয়া উঠিল। তিনি মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মাসিক চারি টাকা হারে বৃত্তি লাভ করিয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। শ্রবণ দৌর্ব্বল্য হেতু এখানেই তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি পাঠাবস্থায় জয়দেবচরিত সম্বন্ধে একখানি রচনা লিখেন। তাঁহার রচনা খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। এই রচনা পরে তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনার মাধুর্য্যে তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট রহিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "পাণিনি বিচার"। ইহা একখানি গবেষণাপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস"। এই গ্রন্থ তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই বিখ্যাত গ্রন্থের পরিসমাপ্তির অল্পপূর্ব্বেই রজনীকান্ত ইহ জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠক যে তাঁহার আদরের গ্রন্থখানা পরম যত্নে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তিনি জানিয়া যাইতে পারেন নাই, ভগবান তাঁহাকে এ সুখ উপভোগের অবসর দেন নাই। রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া এ অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করিতেন। তিনি "আর্য্যকীর্ত্তি", "ভারতকাহিনী", "ভারতবর্ষের ইতিহাস", "প্রবন্ধমালা" প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮২২ শকের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সন ইং ১৯০০ খৃঃ) দেহত্যাগ করেন।

রজনীনাথ রায়—বঙ্গের অন্যতম সমাজসংস্কারক ও ভারত গবর্ণমেণ্টের "হিসাব পরীক্ষা বিভাগের" (Comptroller's office) অতি উচ্চ ও প্রতিপত্তিশালী কর্ম্মচারী। ঢাকা জিলায় বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গাওদিয়া গ্রামে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১২৫৬ সনের ১লা পৌষ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রজনীনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

এফ. এ ও বি. এ. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। রজনীনাথ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের হিসাব বিভাগে প্রবেশ করেন। তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে যোগ্যতা দেখাইয়া তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেনারেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কুলীন কুমারী বিধুমুখী কৌলীন্য প্রথানুসারে এক বহুপত্নীক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিতা হইতে যাইতেছিলেন; কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি এই শিক্ষিতা মহিলাকে কৌলীন্যের গ্রাস হইতে উদ্ধার করেন। রজনীনাথ ইঁহাদের অন্যতম। কিয়ৎকাল পরে রজনীনাথ ব্রাহ্ম মতে বিধুমুখীকে বিবাহ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল (বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সনের ২রা বৈশাখ) কলিকাতা ভবানীপুরে রজনীনাথ দেহত্যাগ করেন।

রণজিৎসিংহ (মহারাজ)—পঞ্জাবের বিখ্যাত ভূতপূর্ব্ব মহারাজ। পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহাসিংহ ও মাতা মলবাই। শৈশব কালেই বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়াতে রণজিতের একটী চক্ষু নষ্ট হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রণজিৎ মহতাব্ কুমারী নাম্নী এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রণজিতের পিতা মহাসমারোহে এই শিশুদ্বয়ের বিবাহ সম্পন্ন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহাসিংহ পরলোক গমন করেন। রণজিৎ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে পিতার স্থলে সর্দ্দার পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি নামে মাত্র সর্দ্দার হইলেন; তাঁহার মাতা ও রাজমন্ত্রী লখ্‌পতরায় নাবালক সর্দ্দারের পক্ষে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতার নিকট অত্যন্ত আদর পাইয়া রণজিৎ বিদ্যাশিক্ষার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন নাই। গ্রন্থপাঠ ও লেখাপড়ায় তিনি অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া পড়িলেন। মৃগয়াদি ব্যসনেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। রণজিৎ সপ্তদশবর্ষ বয়সে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুল দলসিংহকে তিনি মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মাতার চরিত্র ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী লখ্‌পতরায়ের সংশ্রবে কলঙ্কিত হইয়াছিল; নূতন মন্ত্রী দলসিংহ কেতাস নামক স্থানের যুদ্ধে লখ্‌পতরায়কে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহাতেও মাতার চরিত্র সংশোধিত হইল না; মাতা লায়েকমিশর নামক অপর একব্যক্তির সহিত গুপ্তপ্রণয়ে আবদ্ধ হন। রণজিৎ ইহা অবগত হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মাতার কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন। লায়েকমিশর পলায়ন করে, কিন্তু অবশেষে ধৃত হইয়া রণজিতের হস্তে নিহত হয়। রণজিতের সৌভাগ্য লক্ষ্মী দিন দিনই উদীয়মান হইতে লাগিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ লাহোর অধিকার করেন; ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মুবিজয়ে যাত্রা করেন। রণজিৎ জম্মুনগরের সমীপবর্ত্তী হইলে জম্মুর অধিপতি বিশ হাজার টাকা ও হস্তী রণজিৎকে উপহার দিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রণজিৎ জম্মুরাজকে যথাযোগ্য খেলাৎ দিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি শিয়ালকোট ও দিলাবর অধিকার করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মহাসমারোহে দরবার করিয়া "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। এই দরবারে সমুদয় সামন্ত রাজা ও সর্দ্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। রণজিৎ যথাশাস্ত্র মহারাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন। লাহোরে টাকশাল স্থাপিত হইল। অভিষেক দিবস হইতে তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইল। তিনি এক শিখসর্দ্দারের কন্যা রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে মহারাণী রাজকুমারীর গর্ভে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে একপুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের জন্ম উপলক্ষে রাজধানী লাহোরে বহুদিন উৎসব চলিয়াছিল; দীন দুঃখীকে প্রভূত অর্থদান করা হইয়াছিল; প্রত্যেক সৈন্যকে এক এক ছড়া সোণার হার উপহার দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর রণজিৎসিংহ মোরাণ নাম্নী এক রূপলাবণ্য-সম্পন্না মুসলমান রমণীর প্রেমে পতিত হন। এই প্রেমাসক্তিহেতু তিনি কিয়ৎকাল রাজকার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পরে এই রমণীকে মুসলমানের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেন। এই মুসলমান রমণী মহারাজ রণজিৎসিংহের উপর প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। মহারাজের নামাঙ্কিত মুদ্রায় মোরাণের নামও উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মহারাজ মোরাণকে লইয়া হরিদ্বারে তীর্থ করিতে আসেন; এখানে নানা প্রকার ধর্ম্মকার্য্যে লক্ষাধিক মুদ্রা দান করেন। ইহার পর তিনি ক্রমে মুলতান ও অমৃতসর জয় করেন। এই নগর শিখদিগের নিকট অতি পবিত্র। নগরের মধ্য স্থলে

অমৃতসরোবর; সরোবরের মধ্য স্থলে "দরবার সাহেব" নামক শিখ ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; এই মন্দিরে প্রত্যহ "গ্রন্থসাহেব" নামক শিখ ধর্ম্মপুস্তক পঠিত হইয়া থাকে। মহারাজ এই নগরের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রাচীরের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সময়ে আফগানিস্থানে তৈমুর শাহের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। মহারাজ রণজিৎ এই সুযোগে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া ঝঙ, সহিবাল প্রভৃতি চারিটী স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিপাশা ও চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী মুসলমান সর্দ্দারগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করেন। এ পর্য্যন্ত পঞ্জাবের মুসলমান সর্দ্দারগণের নিকট কাবুলের সভাই প্রধান বিচারালয় বলিয়া বিবেচিত হইত; এখন হইতে মহারাজ রণজিৎসিংহকেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রধান অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিলেন। এখন হইতে তিনি পঞ্জাবের একচ্ছত্র রাজা বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সময়ে ইয়োরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহিত ইংরেজদের ঘোর যুদ্ধ চলিতেছিল। ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড মিণ্টো ফরাসীদিগ-কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া সীমান্তস্থিত রাজন্যবর্গের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এল্ফিন্‌ষ্টোন সাহেবকে কাবুল দরবারে, সারজন ম্যালকমকে পারস্যরাজের দরবারে এবং সার চার্লস মেট্‌কাফকে লাহোর দরবারে রণজিৎসিংহের নিকট প্রেরণ করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সহিত রণজিতের একটু মনোবাদ হয়; মনোবাদ সহজেই মীমাংসিত হয়। এই বৎসরের ২৫শে এপ্রিল ইংরেজের সহিত রণজিতের পুনরায় সন্ধি হয়। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু কেহ কাহাকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পুত্র খড়্গসিংহের বিবাহোপলক্ষে রণজিৎ বিশেষ ধুমধাম করেন। ইংরেজ সেনানী অক্টারলোনি এই ব্যাপার উপলক্ষে লাহোরে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কাবুলের অধিপতির সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বৎসরে নবেম্বর মাসে বড় লাট লর্ড অকলাণ্ড প্রকাশ্য দরবারে লাহোরের মহারাজ রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে সমবেত শিখ ও ইংরেজ সৈন্য কন্দাহার অধিকার করিয়া ৮ই মে তারিখে শাহ্ সুজাকে কান্দাহারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে জুন মহারাজ রণজিৎসিংহ দেহ ত্যাগ করেন।

রমাকান্ত রায়—শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত জলশুকাগ্রামে ১৭৮৫ শকে (ইং ১৮৬৩ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালীকিশোর রায়। ইঁহারা সাহা জাতীয় জমিদার; কিন্তু সম্প্রতি ক্ষীণবিত্ত হইয়াছিলেন। ইনি খনিজবিদ্যা শিক্ষার্থ জাপানে গমন করেন। এই বিষয়ে তিনি বঙ্গীয় যুবকগণের প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি সঞ্জীবনীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া জাপানকে বঙ্গদেশীয় লোকের নিকট পরিচিত করেন। তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ই. উপাধি লাভ করিয়া জাপানেই কার্য্যপ্রাপ্ত হন; কিন্তু দেশভক্ত রমাকান্ত স্বদেশ সেবার জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ভারতে ফিরিলে পর কাশ্মীরে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু স্বদেশ-সেবার বলবতী বাসনা হইতে তিনি একাজও পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি নিজে মাথায় লইয়া দেশজাতবস্ত্র বিক্রয় করিতেন। তাঁহার মহান্ আদর্শে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ দেশের কাজে মানের দিকে লক্ষ্য করে নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি ২৫০৲ টাকা বেতনে হাজারিবাগে একটি খনিতে কাজ প্রাপ্ত হন; ইহার মধ্যে নিজের ব্যয়ের জন্য ৫০৲ টাকা রাখিয়া, বাকী ২০০৲ টাকা দ্বারা তাঁহার কয়েক জন বন্ধুকে সাহায্য করিতেন। তাঁহারই উৎসাহে উঁহারা আমেরিকায় পড়িতে যান এবং তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রমাকান্ত এই চাকরি গ্রহণ করেন। পরার্থজীবন রমাকান্ত বিবাহ করিতে অবসর পান নাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে রোগাক্রান্ত হইয়া ১৮২৮ শকে (১৯০৬ খ্রীঃ) কর্ম্মবীর রমাকান্ত দেহত্যাগ করেন।

রবিবর্ম্মা—ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। রবিবর্ম্মা ত্রিবাঙ্কোরের প্রাচীন রাজবংশে ত্রিবিন্দ্রামসহরের নিকটবর্ত্তী কিলিমানুর নামক গ্রামে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন ভাই ও এক ভগিনী এবং

তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহারা সকলেই স্বভাবশিল্পী। তিনি সমস্ত জীবন চিত্রশিল্পের আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষে, ইয়োরোপে ও সভ্যজগতের অন্যান্য প্রদেশে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ভারতীয় পুরাণ ও ইতিহাস হইতে এই বিখ্যাত চিত্রকর বহুচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শিল্পের আলোচনায় প্রবল আসক্তি থাকিলেও তিনি সমাজ শাসনের ভয়ে ইয়োরোপে যাইতে পারেন নাই। তিনি যে কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তদনুযায়ী সিদ্ধিও তিনি লাভ করিয়াছেন; এজন্য ভারতে তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বিলাসিতার ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিয়া অনায়াসেই তিনি সময় অতিবাহিত করিতে পারিতেন। চিত্রশিল্পের দিকে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি না থাকিলে তিনি এই কঠোর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি বরদার গাইকোবারের ও মহীশূরের মহারাজের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের দরবারে গমন করিয়া তথায় বহুকাল অবস্থান করেন এবং উক্ত মহারাজদ্বয়ের ও তাঁহাদের সন্তানগণের চিত্র অঙ্কিত করেন। মহীশূরের মহারাজ তাঁহাকে দুইটী হস্তী উপহার দেন। তিনি জীবনে বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রবিবর্ম্মা বিনয়ী ও ধীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁহার দয়া ও দানশীলতার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। দরিদ্রের অভাব দূর করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন।

রমেশ চন্দ্র দত্ত (সি. আই. ই.)—বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান, সমগ্র ভারতের এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন। রমেশচন্দ্র ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩ রা মার্চ্চ তিনি বিলাত গমন করেন। বিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারী লাল গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ও তাঁহার সঙ্গে বিলাত গমন করেন। ইঁহারা সকলেই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এই তিন বন্ধু একত্র স্বদেশে আগমন করিয়া রাজকার্য্যে ব্রতী হন। আসিবার কালে তাঁহারা স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কোপ্রুশিয় যুদ্ধ হয়। তাঁহাদের মার্শেলিজ নগরে উপনীত হইবার কিছুপূর্ব্বে এই বিখ্যাত যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীরা ফ্রান্সের বহু মনোহর অট্টালিকা ভগ্ন করিয়া ফেলে; ইহাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কমিউনিষ্ট দিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হন। মার্শেলিজের পুলিশ ইঁহাদিগকে বিদেশীয় কমিউনিষ্ট বোধে গ্রেপ্তার করে; কিন্তু ইঁহাদিগের নিকট সন্দেহজনক কোন দ্রব্য না থাকাতে ইঁহাদিগকে একরাত্রি হাজতে রাখিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রমেশ চন্দ্র ১৮৭১ খৃ: হইতে ১৮৮২ খৃ: পর্য্যন্ত বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্ন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃ: হইতে ১৮৮৫ খৃ: পর্য্যন্ত বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন "I sent for you as I wished to see you and know you before leaving India. Your work should be known in England; the fitness of Indians for high administrative posts would not then be questioned." তিনি তৎপর ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর ও মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃ: তিনি সি. আই. ই (C. I. E.) উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৮৯৪ খৃ: তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার হন। তিনি ভারতবাসীর মধ্যে প্রথমে এই উচ্চ রাজকার্য্য লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর ও ঐ বিভাগের করদরাজ্য সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ১৮৯৭ খৃ: অক্টোবর মাসে ২৬ বৎসর রাজকার্য্য করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খৃ: হইতে ১৯০৪ খৃ: পর্য্যন্ত তিনি বিলাত থাকেন। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে ১৯০৭ খৃ: অক্টোবর পর্য্যন্ত বরদারাজ্যে দেওয়ানী কার্য্যে (অর্থ সচিবের কাজে) নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি বরদারাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ খৃ: তিনি পুনরায় বরদায় গমন করেন এবং এই স্থানেই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের

অবসান হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ শে নবেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ) তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে বহুগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধেই তিনি বঙ্গভাষায় উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উপন্যাসগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। তৎপ্রণীত গ্রন্থগুলির এক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) Three years in Europe (in English) (ইয়োরোপে তিন বৎসর)

(২) History of Bengali Literature (in English) (Ar. Ce. De.) ("বঙ্গভাষার ইতিহাস")

(৩) ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ (মূল সহ)

(৪) শতবর্ষ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কণ, জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা।

(৫) সংসার (সামাজিক উপন্যাস)—It is translated into English and named "Lake of Palus."

(৬) সমাজ

(৭) Economic History of India ("ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস")

(৮) India in the Victorian age (মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যকালে ভারতবর্ষ)

(৯) Ancient and Modern India.

(১০) Ancient Civilization of India.

(১১) Ramayan (English translation)

রমেশচন্দ্র মিত্র (সার, কে. টি.)—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী এত উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দুইবার প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১২ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র মিত্র; নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রাম। তাঁহার পিতা জমিদার ছিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের হেডক্লার্কের কর্ম্ম করিতেন। ১৮৫৮ খৃঃ রমেশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে "সিনিয়র" বৃত্তি পরীক্ষার (Senior Scholarship Examination) উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২৫৲ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসর তাঁহার জননী কমলমণি স্বর্গে গমন করেন। মাতার সদ্গুণরাশি পুত্রে সংক্রান্ত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২১শ বর্ষ বয়সে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন। ১০ বৎসর এই আইন ব্যবসা করিয়া তিনি প্রভূত যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। হাইকোর্টের দেশীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র পরলোক গমন করিলে পর রমেশচন্দ্র ৩৪ বৎসর বয়সে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতির পদ খালী হইলে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপণের অনুগ্রহে উক্ত পদে অস্থায়িভাবে উন্নীত হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। শারীরিক অসুস্থতাপ্রযুক্ত তিনি ৫০ বৎসর বয়সে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৯ বৎসর কাল পেন্সন ভোগ করিয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দেহত্যাগ করেন। রমেশচন্দ্র স্বাধীন চিন্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসন সময়ে যখন সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র দরিদ্রের দুঃখমোচনে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। স্বগ্রাম বিষ্ণুপুরের দীনদুঃখীরা নিয়মিতরূপে তাঁহার অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইত; এই জন্য তিনি প্রতিমাসে ২৫০৲ টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি চরম দানপত্রে (Will) সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য ৬০,০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরে একটী এণ্ট্রেন্স-স্কুল, একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেই এই সমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম—শ্রীহট্টের ইটাপরগণায় ভূমি-উঢ়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের দশগোত্রের অন্যতম কাত্যায়নগোত্রীয় ছিলেন। ইদানীন্তন কালে ইনি শ্রীহট্টের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষভাগ ইনি বারাণসীতে যাপন করেন; তথায়ও তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে হইত। পণ্ডিত সমাজে একটা শ্লোকপাদ প্রচলিত আছে, "শ্রীহট্টে নাস্তি মধ্যমঃ।" রাজগোবিন্দের অসাধারণ প্রতিভাই বোধ হয় এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

রাজনারায়ণ বসু—বিখ্যাত বক্তা, প্রবন্ধ লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে "সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪০৲ হারে একটী বৃত্তি লাভ করেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ইহার দুই বৎসর পরে আদি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি লিখেন। (১) Hindu Theist's brotherly gift to English Theists (ঈশ্বর বিশ্বাসী ইংরেজের প্রতি ঈশ্বর বিশ্বাসী হিন্দুর প্রীতি-উপহার), (২) Science of Religion (ধর্ম্মবিজ্ঞান), (৩) Religion of love (প্রেমধর্ম্ম), (৪) Old Hind'us Hope (বৃদ্ধ হিন্দুর আশা), (৫) English Translation of 5 UPanishads Viz Isha, Kena, Katha &c. (ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি পাঁচ খানা উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ)। বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে তৎপ্রণীত "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। পুস্তকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা ও রাজনীতি সম্বন্ধে—বহুগ্রন্থ লিখেন; তন্মধ্যে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা," "সেকাল ও একাল", "বঙ্গভাষাও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" ও "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" এই সমুদয় অতি প্রসিদ্ধ। সোমপ্রকাশের সম্পাদক ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "হিন্দুধর্ম্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহা রক্ষা করিলেন।" এই গ্রন্থ লইয়া বিলাতে পাদ্রী মহলে অত্যন্ত আন্দোলন হইয়াছিল। কেহ কেহ রাজনারায়ণকে "কলির বেদব্যাস" বলিতেন। ভূদেব বাবু বলিতেন, "আমি রাজনারায়ণ বাবুর গোঁড়া।" "সেকাল ও একাল" নামক গ্রন্থের এমন প্রশংসা হইয়াছিল যে, তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক ২০০৲ টাকা ব্যয়ে এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া পাঠ করিয়াছিলেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" লইয়াও নানা স্থানে আন্দোলন হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা পাঠের পর বলিয়াছিলেন, "তুমি কি একটা বল, লিখ, ছমাস তার আন্দোলন থাকে।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের আন্দোলন করেন, তখন রাজনারায়ণ বাবু মহোৎসাহে আপন দুই ভ্রাতাকে বিধবা বিবাহে প্রবৃত্ত করেন, এজন্য তাঁহাকে সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তৎপর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর স্কুলে হেড্‌মাষ্টার পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উহা পরিত্যাগ করেন। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনার্থ বৈদ্যনাথ গমন করেন এবং মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তথায়ই থাকেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, ভারতের প্রথম ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, ভারতের প্রথম দেশীয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জগদীশ নাথ রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত স্ত্রী-কবি তরু দত্তের পিতা গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

রাজবল্লভ সেন (মহারাজ)—ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা—বিলদায়নীয়ার প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশজ রাজা। রাজবল্লভ ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার, দেবীদাস বসুর অধীনে ঢাকার কাননগোর সেরেস্তায় এক মোহরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর, রাজারাম ও ধনিরাম এবং কনিষ্ঠ রামদাস। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজারাম বিক্রমপুর পরগণার তহশীলদার ছিলেন এবং রাজবল্লভ কাননগো সেরেস্তার মুহুরী ছিলেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত রায়, ঢাকার নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হইলে, রাজবল্লভ তাঁহার

অনুগ্রহে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেন। অতঃপর নবাব আলীবর্দ্দিখাঁর সময়ে তদীয় জামাতা নিবাইস মোহাম্মদ ঢাকার নবাব হন। নিবাইস মোহাম্মদ মুর্শিদাবাদে থাকিয়াই স্বীয় প্রতিনিধি হুসেনকুলীখাঁদ্বারা ঢাকার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নিবাইস্ মোহাম্মদের পত্নী ঘেসেটীবেগমের অনুগ্রহে রাজবল্লভ ঢাকার নবাব সরকারে পেস্কারি পদে নিযুক্ত হন। হুসেন-কুলী রাজবল্লভের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন সহকারী পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি-খাঁ রাজবল্লভের কার্য্যে প্রীত হইয়া হুসেনকুলীখাঁর অনুরোধক্রমে তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন। নিবাইস মোহাম্মদের পত্নী ঘেসেটীবেগমের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা আলীবর্দ্দিখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র মুর্শিদাবাদের নবাব পদে অভিষিক্ত হন; কিন্তু আলিবর্দ্দিখাঁ তাঁহার অপর কন্যার গর্ভজাত সন্তান সিরাজদ্দৌলাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিরাজদ্দৌলা নবাব হইয়া মাতৃষসা ঘেসেটীবেগমের প্রিয়পাত্র হুসেনকুলীখাঁর প্রাণদণ্ড করেন। হুসেনকুলীর মৃত্যুর পর রাজা রাজবল্লভই নিবাইস মহম্মদের প্রতিনিধিরূপে ঢাকা শাসন করিতে লাগিলেন; তিনি ঢাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ও ঘেসেটীবেগমের প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠিলেন; কাজেই তাঁহাকে অধিকাংশ সময় ঢাকা ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদে থাকিতে হইত। আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পরে তিনি সিরাজদ্দৌলার কোপে পতিত হন। ঘটনা-চক্রের পরিবর্ত্তনে সিরাজ রাজ্য হারাইলেন ও শত্রু হস্তে নিহত হইলেন এবং অহিফেন সেবনকারী মীরজাফর মুর্শিদাবাদের মসনদে আসীন হইলেন। মীরজাফর রাজা রাজবল্লভকে কার্য্যদক্ষ জানিতেন। তিনি রাজবল্লভকে তাঁহার মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করিয়া রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ঢাকার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম রাজা রাজবল্লভকে "মহারাজ রায়রাইয়ান্ সলারজঙ্গ বাহাদুর" উপাধি দিয়া ও পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে একখানা তরবারি অর্পণ-পূর্ব্বক মুঙ্গেরের সুবাদারী পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে নূতন নবাব মীরকাসেম রাজবল্লভের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মীরকাসিমের শেষাবস্থায় রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস এক প্রকার বন্দিভাবে ছিলেন। ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাসেম স্বীয় পলায়মান সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি মুঙ্গের হইতে পলায়নের সময় রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাসের গলায় বালুকাপূর্ণ থলে (Bag) আবদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের নিকট ভাগীরথী নদীতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে ৬৫ বৎসর বয়সে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে (১১৭০ বঙ্গাব্দ) শ্রাবণমাসে ভাগীরথী জলে মগ্ন হইয়া পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত রাজবল্লভ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বিক্রমপুরস্থ ভবন বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত ছিল। এই বিখ্যাত রাজভবন পদ্মাগর্ভে লীন হওয়াতে পদ্মার এই অংশ কীর্ত্তিনাশা নামে খ্যাত হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে যজ্ঞসূত্র প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে এক বৃহৎ পণ্ডিতসভার অধিবেশন হয়। সমাজের উন্নতিসাধনে যত্নপর হওয়াতে রাজবল্লভ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে সমাজপতি বলিয়া গৃহীত হন।

রাজমোহন আম্বলী—বিখ্যাত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতরচক। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাইচাইল গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার সুরচিত শ্যামাসঙ্গীত ঢাকা জিলার সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রাজরাজা—বিখ্যাত চোল নৃপতি। ৯৮৫ খৃঃ হইতে ১০১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইনি সিংহল জয় করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রচোল (১ম)—দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় বিখ্যাত রাজা। ইঁহার পিতা রাজরাজা। ইঁহার অপর নাম গঙ্গাইকোণ্ড। বিখ্যাত রামানুজস্বামী ইঁহার সভায় সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ব্রহ্মদেশস্থ পেগু নগর এবং আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপ জয় করেন। ইঁহার রণতরী সমূহ বঙ্গোপসাগরে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। (রাজরাজা দেখ)।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—(রাজা, সি. আই. ই)—বঙ্গের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ। রাজা রাজেন্দ্রলাল ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা সহরতলীতে শুঁড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। জন্মেজয়

রাজবংশসম্ভূত। রাজেন্দ্রের পিতামহের নাম রাজা পিতাম্বর মিত্র। রাজেন্দ্রলাল বিধবা পিতৃব্যপত্নীর যত্নে কলিকাতায় লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হন। তিনি বাল্যকালে গোবিন্দ বসাকের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ইংরেজী শিক্ষা করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে শিক্ষার্থ বিলাতে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার আপত্তিতে এই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। মেডিকেল কলেজের পাঠ সমাপ্ত না হইতেই তিনি কোন কারণ বশতঃ ঐ কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং তৎপর আইন শিক্ষা করিতে থাকেন। আইনের পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ডাক্তারি ও আইনে যখন কিছু হইল না, তখন তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতে মনোযোগ দেন। পার্সীভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, কিন্তু সংস্কৃতে জ্ঞান অতি সামান্যমাত্র ছিল, এজন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিতে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন এবং অল্পকাল মধ্যে এই দুরূহ প্রাচীন ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। অতঃপর তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মেন ভাষা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করেন। তিনি হিন্দী ও উর্দ্দূভাষা ভালরূপই জানিতেন। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের ও বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার অনন্য-সাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও বিচার শক্তি ছিল। তিনি দেখিলেন যে, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় উদরপূর্ত্তি হয় না, এজন্য তিনি চাকরীর অন্বেষণে রহিলেন। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "এসিয়াটিক সোসায়িটী"র (Asiatic Society) সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাতে তাঁহার নানা ভাষায় ও নানা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ হইল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক একখানা মাসিক পত্রিকা সম্পাদন ও প্রচার করেন। তিনি এই পত্রিকা সাত বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ মনোযোগী হন। এসিয়াটিক সোসায়িটি হইতে প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় এবং অন্যান্য কয়েক খানা ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউটের" (Ward's Institute) ডাইরেক্টর হন। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "উড়িষ্যার প্রাচীন তত্ত্ব" (Antiquities of Orissa) এবং "বুদ্ধগয়া"ই (Buddha Gaya) বিখ্যাত। এই প্রবন্ধাবলী তৎপর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া তিনি বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। স্বীয় প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন করিয়া তিনি "ইণ্ডোএরিয়ানস্" (Indo Aryans) নাম দিয়া দুই খণ্ড প্রকাশিত করেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর তিনিই কার্য্যতঃ হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসায়িটির সভাপতি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে ডি. এল. উপাধি দান করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি. আই ই. রায় বাহাদুর ও রাজা উপাধি দান করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৬৭ বৎসর বয়সে বাত রোগে তিনি দেহত্যাগ করেন।

রাণাড়ে (মহাদেব গোবিন্দ, এম. এ, এল. এল. বি, সি আই. ই,)—বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি। এই মহাত্মা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবিন্দ অমৃত রাণাড়ে; পিতা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে দেহত্যাগ করেন। মহাদেব গোবিন্দ বোম্বাই এলফিন্‌ষ্টোন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। এই কলেজ হইতে তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এল এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করাতে তিনি "উপাধিধারিগণের রাজা" (Prince of graduates) নামে অভিহিত হইতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি সোলাপুরের জজ পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। তৎপর তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এলফিন্‌ষ্টোন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাণাড়ে অধ্যাপকের কাজে ছিলেন; এই বৎসরেই তিনি হাইকোর্টের "এড্‌ভোকেট" (advocate) পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করেন। এই

পরীক্ষা বিলাতের ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার তুল্য। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাণাড়ে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত নানা স্থানে সব জজের কাজ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে পুনার ছোট আদালতে জজ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "ভারতীয় আয়ব্যয় সমিতি"র (Indian Finance committee) মেম্বর হন। তিনি বহুবার বোম্বাই গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর তিনি পরলোকগত বিচারপতি ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের স্থলে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সনের ৩রা মাঘ) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় এই মহাত্মা পরলোক গমন করেন। রাণাড়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে শোকসভা হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজগণ তাঁহার অভিমত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেন। কেবল বিচারপতিরূপেই তাঁহার খ্যাতি ছিল না; তিনি ইংরেজীতে বহুগবেষণাপূর্ণ কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে (১) বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ক গ্রন্থ, (২) মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস, (৩) খাজানা আইন সংক্রান্ত পুস্তিকা (Hand Book of Revenue Law), (৪) রাজা রামমোহন রায়ের বক্তৃতা; এই কয়েকখানি প্রসিদ্ধ। রাণাড়ে ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তিনি প্রার্থনা সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। রাণাড়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের "সিণ্ডিকেট" সভার মেম্বর ছিলেন। তিনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন।

রাণা রাজসিংহ—মিবারের বিখ্যাত মহারাণা। ইনি মহারাণা জগৎসিংহের পুত্র। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে বৃদ্ধ শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। বীরবর প্রতাপসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতদিগের গৌরব লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; রাণা রাজসিংহের রাজ্যাভিষেক হইতে সেই রাজপুত বীর্য্যের পুনর্বিকাশ লক্ষিত হইল। রাজসিংহ সিংহাসন লাভ করিয়াই মোগল সম্রাটের অধিকৃত আজমীরের নিকটবর্ত্তী "মানপুর" নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেন। এই নগরের আক্রমণ বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহজাহানের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু উদারহৃদয় সম্রাট্ ইহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। রাণাগণের অভিষেককালে যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তন্মধ্যে "টিকাতোর" অন্যতম। এই অনুষ্ঠানে শত্রুরাজ্যের আক্রমণ বুঝায়। বহুকাল এই "টিকাতোর" প্রথা অনুষ্ঠিত হয় নাই; রাজসিংহ "মানপুর" আক্রমণ করিয়া এই লুপ্তপ্রায় বিধান পুনরুজ্জীবিত করেন। ইহার ৭ বৎসর পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন। সিংহাসন লাভ করিয়া আওরঙ্গজেব রূপনগরের সামন্ত নৃপতির কন্যা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী প্রভাবতীলাভে যত্নপর হন। অবিলম্বেই বিবাহ প্রস্তাবসহ দুই সহস্র মোগল সৈন্য রূপনগরের সামন্ত নৃপতির নিকট প্রেরিত হইল।

রূপনগরের সামন্ত নৃপতি রাঠোর কুলোদ্ভূত। মাড়বারের রাঠোরকুল মিবারের মহারাণা রাজসিংহের মাতামহবংশ। এই রাঠোর বংশ নানা শাখায় বিভক্ত; ইহার একটি শাখা স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মোগলরাজ্যভুক্ত রূপনগর নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। সুতরাং এই রূপনগরের নৃপতি দিল্লীশ্বরের একজন সামন্ত রাজা মাত্র। দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব রূপনগরের রাজতনয়া প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন; এরূপ স্থলে উক্ত সামন্ত নৃপতির সাধ্য ছিল না যে, আওরঙ্গজেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করেন। প্রভাবতীর পিতা বিপদ্ গণিলেন; মোগল সম্রাটের বিবাহপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দুই হাজার মোগল সৈন্য স্বীয় নগরে উপস্থিত হইয়াছে; তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া প্রভাবতী স্বয়ংই নিজের উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগিনী হইলেন। তিনি গোপনে মিবারের রাণা রাজসিংহের নিকট স্বীয় বিপদ্ জ্ঞাপন করিয়া পত্রসহ এক চর প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। প্রভাবতী চরমুখে জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি গোপনে মিবার রাজধানীতে যাইবেন না। রাণা রাজসিংহ সম্মত হইলেন। প্রভাবতী মোগলসৈন্যসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন মোগলসৈন্য আরাবল্লী শৈলের পাদদেশ অতিক্রম করিল, তখন সহসা রাজসিংহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা পলায়নপর

হইল। রাজসিংহ প্রভাবতীকে লইয়া স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন; মহাসমারোহে রাণার সহিত প্রভাবতীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতাপসিংহের উপযুক্ত বংশধরের এই অলৌকিক শক্তি ও বীরত্বের অভিনয় সন্দর্শন করিয়া সমস্ত রাজপুতজাতি অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইল। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রতিকূলে রাণা রাজসিংহের এই প্রথম অস্ত্রধারণ। রাণা রাজসিংহ, মারবার রাজপুত্র অজিৎ সিংহের উদ্ধার সাধনের জন্য আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার অস্ত্রধারণ করেন।

মাড়বারপতি যশোবন্তসিং আওরঙ্গজেবের কূটচক্রে পড়িয়া অজ্ঞাতসারে বিষপানে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যশোবন্ত-পত্নী একদিকে স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র অজিৎসিংহের প্রাণ রক্ষায়, অপর দিকে স্বীয় সতীত্ব রক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের রূপলাবণ্যভয়ে কাতর ছিলেন। মানরক্ষার্থ তিনি রাজসিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাণা স্বীয় মাতামহবংশের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহাদের আবাসের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যশোবন্তপত্নী অজিৎসিংহকে সঙ্গে লইয়া মিবারের দিকে রওনা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাত্র আড়াই শত বাছা বাছা রাজপুত সৈন্য ছিল। পথিমধ্যে আরাবল্লী গিরিসঙ্কটে তাহারা মোগলসৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও অজিতের শরীররক্ষিসৈন্যগণ মোগলদিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিল। রাজকুমার অজিৎ মিবারের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; রাণা রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণে গ্রহণ করিলেন। মাড়বার রাজমহিষী পুত্রকে মিবারে রাখিয়া বিষয় রক্ষার্থ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর আওরঙ্গজেব রাজসিংহের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে বিরাট আয়োজন করিলেন। তিনি স্বীয় ৪র্থ পুত্র আকবরের সহিত পঞ্চাশ হাজার সৈন্য মিবারে প্রেরণ করেন এবং দেহহির খাঁ নামক সেনানীর অধীনে আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তৃতীয় সেনাদলসহ মিবারে উপস্থিত হন। এদিকে রাজসিংহ স্বীয় সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া মোগল সৈন্যের গতিরোধ করেন। রাজপুত সৈন্য অমিতবিক্রমে মোগল সৈন্য পরাস্ত করিল। রাজসিংহ জয়ী হইলেন, কিন্তু তাঁহার বহু সৈন্য হতাহত হইল। আওরঙ্গজেব ও তদীয় পুত্র আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে নানাপ্রকারে বিপন্ন হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা সন্ধি করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্ব্বেই বীরকেশরী রাজসিংহ ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতেই তিনি মোগল সম্রাটের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, এজন্য তাঁহার অঙ্গের নানাস্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ ও দেশহিতৈষী নৃপতি ছিলেন। "রাজসমুন্দসরোবর" নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। আরাবল্লী শৈলমালার পাদপ্রস্থের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত গোমতী নাম্নী নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া এই বাপী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পরিধি প্রায় ১২ মাইল; ইহার চতুর্দ্দিক শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে আবৃত। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

রাধাকান্ত দেব (সার, রাজাবাহাদুর, কে. সি. এস. আই)—রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র; কলিকাতা শোভাবাজারের রাজগণ ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার পিতার নাম রাজা গোপীমোহন দেব। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় রাধাকান্তও রাজভক্ত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যখন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের জন্য কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন ইনি তৎকাল প্রচলিত লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে দণ্ডায়মান হন। তিনি নানাস্থানে পণ্ডিত দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া ও সভাসমিতি করিয়া রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত এবং হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে "স্কুলবুকসোসায়িটি ও স্কুল সোসায়িটি" স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। তিনি বহুপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া বিখ্যাত "শব্দকল্পদ্রুম" নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত করেন। এই "শব্দকল্পদ্রুম'ই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রাধাকান্ত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম

ভাগ বাহির হয়; ৩৬ বৎসর পরিশ্রমের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানের শেষ ভাগ প্রকাশিত হয়। তিনি এই বৃহৎ গ্রন্থ ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার জ্ঞানীদিগকে উপহৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সাহিত্য সমালোচনী সভাকে তিনি এই গ্রন্থ উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ অভিধান মুদ্রিত হইলে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উহার এক খণ্ড উপহার দেন। মহারাণী উপহারলাভে প্রীত হইয়া রাজানুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটী পদক অর্পণ করেন। এই পদকের এক পৃষ্ঠে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে "From Her majesty Queen Victoria to Raja Radha Kanta Bahadur" এই কয়টী শব্দ খোদিত ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা" (British India Association) স্থাপিত হয়; এই সভার সভ্যগণ রাজাবাহাদুরকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজাবাহাদুর সংসারপরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে গমন করেন। এই তীর্থে অবস্থান কালে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নবেম্বর তাঁহাকে কে. সি. এস. আই (K. C. S. I.) উপাধি দান করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল তিনি বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করেন।

রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ—শ্রীহট্টের অনেকে নবদ্বীপে টোল করিয়া নবদ্বীপের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন; এই সমুদয়ের মধ্যে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অন্যতম। শ্রীহট্ট জিলার বুরুঙ্গা গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। তৎকালে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশে ছিল না। ইঁহার বহু ছাত্র বড় বড় পণ্ডিত হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

রাধানাথ চৌধুরী—শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ উপবিভাগে আগিয়ারাম নামক গ্রামে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দরিদ্রের সন্তান হইলেও স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে এফ. এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন এবং স্বীয় জীবন শ্রীহট্টের হিতকল্পে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন ও "পরিদর্শক" নামক পত্রিকা পরিচালন করেন। তাঁহার স্কুলে অনেক ছাত্র বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য হইয়াছে। তাঁহার জীবন কর্ম্মবহুল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হয়।

রামকমল সেন—বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ও নববিধান সমাজের স্থাপয়িতা ৺কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। তিনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ গরিফাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সামান্য রকমে লেখা পড়া জানিতেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া তিনি কিছুকাল ইংরেজী শিক্ষা করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি এক কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন; এই কার্য্যকালে বহু সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি ডাক্তার উইলসন সাহেবের সহায়তায় কলিকাতা টাকশালের দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি এই পদ হইতে "ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে"র (Bank of Bengal) দেওয়ানি পদ লাভ করেন। এই পদে তিনি বহুকাল যশের সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুকলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও "কাউন্সিল অব এডুকেশনে"র (Council of Educarion) সভ্য ছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কৃষিসভার সহকারী সভাপতিপদে নিযুক্ত হন। এই বৎসরে ২রা আগষ্ট তারিখে তিনি নিজ গ্রামে (গরিফা) দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ৪ পুত্র:—হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তিন জন একের পর অন্যে টাকশালের দেওয়ানি করেন। ৪র্থ পুত্র মুরলীধর হাইকোর্টের এটর্ণি (Attorney) হইয়াছিলেন। ২য় পুত্র প্যারীমোহন ৩২ বৎসর বয়সে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীমোহনের তিন পুত্র:—(১) নবীনচন্দ্র, (২) কেশবচন্দ্র, (৩) কৃষ্ণবিহারী।

রামকান্ত নন্দী—কান্তবাবু দেখ।

রামকান্ত মুন্সী—চব্বিশপরগণা জিলার বসিরহাট উপবিভাগের অন্তর্গত টাকীগ্রামের রায়চৌধুরী উপাধিক জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি ১৬৬৩ শকে (ইং ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) টাকীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন যশোহর সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রামকান্তের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ভবানীদাস রায় চৌধুরী

রাজবংশের জ্ঞাতিসূত্রে প্রচুর বিত্তসম্পত্তি পাইয়া যমুনা-ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থানে টাকীর পরপারবর্ত্তী শ্রীপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তদীয় তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস গৃহবিবাদহেতু নদীর পরতীরবর্ত্তী টাকী গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। কৃষ্ণদাসের পুত্র রামদেব, তৎপুত্র রামসন্তোষ এবং রামসন্তোষের তৃতীয় পুত্র রামকান্ত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনুগ্রহে রামকান্ত রেভিনিউবোর্ডে সামান্য বেতনে এক কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে থাকিয়া রামকান্ত বুদ্ধি ও কার্য্যনৈপুণ্যে হেষ্টিংসের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তৎকর্ত্তৃক "মুন্সী" (Foreign Secretary) পদে উন্নীত হন। হেষ্টিংসের পর তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও সার জন শোরের শাসনকালেও দুইবার অধিকতর উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত হন তিনি ১৭২৩ শকে (ইং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে) ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রামকানাই ন্যায়পঞ্চানন—স্মৃতিশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কালীপাড়ায় ইঁহার বাস ছিল।

রাম কানাই শিরোমণি—দক্ষিণ বিক্রমপুরে—ফরিদপুর জিলার ছয়গাও গ্রামবাসী। ইঁহারা দুই সহোদর; কনিষ্ঠের নাম গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ। উভয় ভ্রাতাই পুরাণশাস্ত্রে অসাধারণ কৃতী ছিলেন। ভাগবতাদি গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ইঁহারা শ্রোতৃমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিতেন। গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নানাবিধ কাব্য ছিল। রাম কানাই শিরোমণি সগর্ব্বে বলিতেন, যে তিনি কদাপি কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই।

রাম কুমার চক্রবর্ত্তী—ইঁহার নিবাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিলাসপুর। ঐ গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। ইনি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ ছিলেন। এই বিলাসপুরেই অন্য একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন; তাঁহার নাম—উদয় চক্রবর্ত্তী।

রামকুমার নন্দী মজুমদার—শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত বেজুড়া নামক গ্রামে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রামকুমার দরিদ্রের সন্তান; তিনি কোনও বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু আপন চেষ্টায় বাঙ্গালা, পারস্য, ইংরেজী ও অল্প সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই যাত্রার পালা রচনা করিয়া কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; পরে বহুগীতাভিনয়, পাঁচালী ও সখীসংবাদের পালা লিখিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিলে, রামকুমার "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর" লিখিয়া উক্ত কবি শ্রেষ্ঠের ও বঙ্গদর্শন, ঢাকাপ্রকাশ প্রভৃতি তাৎকালিক সংবাদপত্রের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। রামকুমারের নাম তদীয় "পরমার্থ সঙ্গীত" দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সঙ্গীতগুলি যেমন মিষ্ট তেমনি ভাবগাম্ভীর্য্যশালী "পরমার্থ সঙ্গীত" চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন সঙ্গীতসাহিত্যে তেমনি বিষয় কার্য্যে ও শিল্পকার্য্যে তদীয় প্রতিভা প্রকটিত হইয়াছিল। ফলতঃ ঈদৃশ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অল্পই দেখা যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ১৭৫৬ শকে ১০ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বুধবারে (ইংরেজী ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে) পরমহংস রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পরমধার্ম্মিক ও যোগবলসম্পন্ন ছিলেন। পরমহংসদেব পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান; তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর—রামকুমার ও রামেশ্বর। রামকুমার ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; কলিকাতা ঝামাপুকুরে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ বাল্যকালে কিছুই লেখা পড়া শিখেন নাই; লেখাপড়াতে তাঁহার আস্থাও ছিল না। শিশুকালেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত হইয়াছিল; তিনি সমবয়স্ক বালকাদির সঙ্গে মাঠে গমন করিয়া বৃন্দাবনের ভাবে ক্রীড়া করিতেন; তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণ সাজিতেন এবং তাঁহার সহচরদের মধ্যে কেহ শ্রীদাম, কেহবা সুবল ইত্যাদি সাজিতেন। প্রান্তরগামী লোকেরা ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। কলিকাতার দক্ষিণস্থ জানবাজার নিবাসিনী বিখ্যাত রাণী রাসমণি কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া স্বীয়গুরুর নামে কালী ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করেন। পরমহংস দেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর

রামকুমার ঝামাপুকুরে অবস্থান কালে রাণী রাসমণির সহিত পরিচিত হন। এই ধর্ম্মপরায়ণা রাণী রামকুমারকে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত জানিয়া দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দিরের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। পরমহংস দেবও তদবধি জ্যেষ্ঠের সহিত দক্ষিণেশ্বরে অবাস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে দিবস উক্ত বিগ্রহদ্বয় দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিবস উক্তস্থানে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল, প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করা হইয়াছিল ; সকলেই প্রচুর উপাদেয় বস্তু আহার করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ ইহার কিছুই স্পর্শ করেন নাই ; তিনি সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে এক পয়সার মুড়কী ক্রয় করিয়া আহার করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈদৃশ আচরণের হেতু কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত ; এই দেব মন্দিরের সংলগ্ন একটী উদ্যান আছে ; উদ্যানের এক পার্শ্বে গঙ্গার তীরে এক অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ কালের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান। দেবমন্দির ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে নেত্রপাত করিলে হৃদয় স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। রামকৃষ্ণ প্রথমে বিগ্রহের মাল্যচন্দনাদি বেশভূষাসম্পাদনে নিযুক্ত হন এবং পরে রাধাকৃষ্ণের পূজা করিতে আদিষ্ট হন ; অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে রাণী রাসমণি রামকৃষ্ণদেবকেই কালী পূজায় নিযুক্ত করেন।

রামকৃষ্ণ দেব যখন ষোড়শবর্ষদেশীয় ছিলেন তখন তিনি জয়রামবাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সারদামণি দেবীকে বিবাহ করেন। অভিভাবকের মতানুবর্ত্তী হইয়া তিনি বিবাহ করেন ; তিনি ঈশ্বরভক্ত ছিলেন ; বিবাহ কি, কেন লোকে বিবাহ করে, এ বিষয় কিছুই তিনি জানিতেন না। যাহা হউক অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। তিনি গদ্‌গদ ভাবে কালীকে ডাকিতেন ; কখনও বা কালীর নিকট আব্দার করিয়া দয়া ভিক্ষা করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমায় দয়া কর্ না মা ; তুই রামপ্রসাদকে দয়া কর্‌লি, আমায় কেন দয়া কর্‌বি না মা ? আমি শাস্ত্র পড়ি নাই, আমি মূর্খ, আমি কিছুই জানিনা মা, আমি কিছুই জানিতে চাইনা মা, তুই আমায় দয়া কর্ব্বি কি না বল্।" ইত্যাদি রূপে তিনি কালী মায়ের নিকট আবদার করিয়া খেদ করিতেন, কখনও বা রোদন করিতে থাকিতেন। এইরূপ কাতরভাবে মাকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি উন্মাদ ভাব প্রাপ্ত হইলেন ; ৬ মাস কাল তাঁহার এই ভাব ছিল ; পরে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতে থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে বিরহের যে সমুদয় লক্ষণ লিখিত আছে, এই সময়ে পরমহংসদেবে তৎসমুদয় লক্ষিত হইয়াছিল। প্রকৃতিস্থ হইলে পর রামকৃষ্ণ সাধন আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ সাধুগণ সাধন দ্বারা ঈশ্বর দর্শন লাভ করেন ; কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবনে তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি প্রথমে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে সাধন আরম্ভ করেন। রামকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া কালী-সাধনে ব্রতী হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, কামিনী ও কাঞ্চন হইতেই পার্থিব সকল প্রকার পদার্থের সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হয় ; অতএব তিনি কামিনী, কাঞ্চন সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র সার, ঈশ্বরই একমাত্র অবলম্বনীয় ; কামিনী, কাঞ্চন প্রভৃতি অসার ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তিনি এক হস্তে একটী টাকা ও অপর হস্তে একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া এইরূপ বিচার করিতেন :—"টাকা গোলাকার রৌপ্যখণ্ড, ইহাতে বিবির মুখ আছে, ইহা জড় পদার্থ, টাকায় চাউল, ডাইল, বস্ত্র, হাতী ঘোড়া সবই হয়, ইহা দ্বারা দশ জনকে ডাল ভাত খাওয়ান যায় এবং ইহাতে তীর্থ যাত্রা, সাধুসেবা ইত্যাদিও হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহা দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। অর্থ থাকিলে মন আসক্তিবিহীন হয় না এবং আসক্তি বর্ত্তমান থাকিলে মন রজঃ ও তমোভাবে আক্রান্ত থাকে ; তমঃ দ্বারা অভিভূত মন কখনও ঈশ্বরলাভে সমর্থ হইতে পারে না। আর এই যে মৃত্তিকা, ইহাতে শস্য জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে জীবনও রক্ষিত হয় ; ইহাতে গৃহাদিনির্ম্মিত হয়, দেব দেবীর মূর্ত্তিও ইহাতে নির্ম্মিত হয় বটে, কিন্তু ইহাও টাকার ন্যায় জড় পদার্থ ; টাকা মানবের মনে যেরূপ ঈশ্বরবিরোধিভাব আনয়ন করে ইহাও তদ্রূপই করিয়া থাকে। দুইটীই একজাতীয় পদার্থ। টাকা মাটি, মাটি টাকা। যদি ইহাদের হইয়া থাকিতে চাও, তবে সচ্চিদানন্দ পাইবে না।"

অতঃপর পরমহংসদেব কামিনী লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "কামিনী সম্ভোগ করিতে চাও আগে কামিনীতে কি বুঝায় দেখ। কামিনী একটী হাড়ের খাঁচা ; মাংস ও তদুপরি চর্ম্মে আবৃত। চামড়া পৃথক্ করিলে রক্ত, মাংস বসা ইত্যাদি পাওয়া যাইবে ; এই প্রকার কামিনীকে লইয়া সংসারের লোকগুলি উন্মত্ত রহিয়াছে। কামিনী দ্বারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীসহবাসে সন্তানাদি উৎপন্ন হয়। মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ ও অপর দিকে সন্তানের প্রতি বাৎসল্য রসে অভিভূত হইয়া পড়ে। মন এই অবস্থায় নীত হইলে তাহাদ্বারা ঈশ্বরচিন্তা কিছুতেই সম্ভবে না। কামিনীতে আসক্ত হইয়া লোক জড় পদার্থে বিস্তৃত হয়, জড়েরা সৃষ্টিকর্ত্তাকে লাভ করিতে কখনও সমর্থ হয় না।" রামকৃষ্ণ এক হস্তে চন্দন ও অপর হস্তে বিষ্ঠা লইয়া বিচার করিতেন এবং নির্ব্বিকারচিত্তে সমভাবে বসিয়া থাকিতেন। পরমহংসদেব যখন এই প্রকার সাধন করিতেন, তখন দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ভূতাবিষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। এই সময়ে তিনি কুম্ভযোগ করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িয়া ছিল ; সাধুরা তাঁহাকে এই সময়ে পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন। পরমহংসদেব গোপনে গোপনে সাধন ভজন করিতেন ; এই সময়ে কালীপূজা করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না ; যখন এই ইচ্ছা হইত, কালাকাল কিম্বা শুচি অশুচির বিষয় চিন্তা না করিয়া পূজায় বসিয়া যাইতেন। প্রবাদ এই যে, তিনি কালীকে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং দেবী তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন। একদিন হলধারী নামে একজন মূর্ত্তিপূজাবিরোধী পণ্ডিত পরমহংসদেবকে বেদান্তের মায়াবাদ ও মূর্ত্তিপূজার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রামকৃষ্ণ কালীর নিকট যেমন মা মা বলিয়া ডাকিলেন, অমনি আদ্যাশক্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কালীকে বলিলেন "মা! হলধারি আমাকে বলে আমার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে, যাহা আমি দর্শন করি তাহা নাকি সবই মিথ্যা, মায়া মাত্র। মা! সত্য করিয়া বল্ আমার কি হল।" অভয়া বলিলেন, "তুমি যেমন আছ, তেমনি থাক।" এই বলিয়া কালী অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদবধি রামকৃষ্ণ আর কাহারও কথা শুনিতেন না। এই সময়ে মন্দিরের সকলের ধারণা হইল রামকৃষ্ণের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে ; কেহ কেহ বলিলেন যে, অত্যধিক যোগরত হওয়াতেই রামকৃষ্ণের এইরূপ উন্মত্ততা জন্মিয়াছে। রাণী রাসমণি এই কথা শুনিয়া তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরমহংসদেব কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না ; তিনি আপনার ইচ্ছানুসারেই চলাফেরা, ধ্যানধারণাদি করিতেন ; তাঁহার কিছুমাত্র ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। পরমহংসদেব দ্বাদশ বর্ষ তন্ত্রোক্ত সাধন করিয়া পরে কর্ত্তাভজা, বাউল প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্প্রদায়-সম্মত সাধন করেন।

রাণী রাসমণির জ্ঞাতসারে একব্যক্তি একটী রূপলাবণ্যসম্পন্না বেশ্যা পরমহংস দেবের নিকট প্রেরণ করেন। সেই ব্যক্তির ধারণা হইয়াছিল যে, স্ত্রীসংসর্গবিহীন হওয়াতেই রামকৃষ্ণের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। বেশ্যা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে, রামকৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রাণী রাসমণি বুঝিলেন যে, রামকৃষ্ণ প্রকৃতই একজন সিদ্ধ পুরুষ ; তিনি এবং তাহার কর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি উচ্চ ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, রামকৃষ্ণ সাধারণ সাধুদিগের স্বভাববিশিষ্ট নহেন, তাঁহার মধ্যে অসাধারণত্ব আছে। অপর এক দিন মথুর নামে কালীমন্দিরের ভার প্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী পরমহংসদেবের জিতেন্দ্রিয়তা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লছ্মিবাই নাম্নী এক বারবণিতার গৃহে কৌশল পূর্ব্বক লইয়া যান। রামকৃষ্ণ দেব এই বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মথুর অদৃশ্য হইলেন এবং ১৫।১৬টী নবযৌবনসম্পন্না বেশ্যা তাঁহার প্রতি নানা হাবভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব, "মা ব্রহ্মময়ি, মা আনন্দময়ি" বলিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে আসীন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। বেশ্যাগণ পরমহংসদেবের ভাব দেখিয়া ভীত হইল এবং গলবস্ত্রে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এখন হইতে মথুরবাবু পরমহংসদেবের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর পরমহংসদেব রাম-বিষয়ক সাধনা আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবান রামচন্দ্রকে চিন্তা করিয়া তদ্গত হইয়া

থাকিতেন। তিনি যাবতীয় পদার্থে রামচন্দ্রকে অবলোকন করিতেন, যে বস্তুতে রাম দেখিতে পাইতেন না, সে বস্তু তিনি গ্রহণ করিতেন না। এক রামাৎ সন্ন্যাসী তাঁহাকে এক পিত্তলের মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন; এই মূর্ত্তির নাম রামলালা। তিনি এই মূর্ত্তির প্রতি বাৎসল্য ভাব দেখাইতেন। তাঁহার আলাপ শুনিয়া বোধ হইত যে, তিনি রামলালাকে আধ্যাত্মিক ভাবে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন; যখন যেখানে যাইতেন রামলালাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। গঙ্গাস্নানের সময় তিনি রামলালাকে অধিক জলে নামিতে নিষেধ করিতেন; লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইত। অতঃপর তিনি কৃষ্ণ সাধনা করেন। তিনি কখনও শ্রীদাম সুবলাদির স্থানে নিজকে স্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সখ্যভাব স্থাপন করিতেন, কখনও বা শ্রীমতী রাধিকার অষ্ট সখীর সেবিকারূপে নিজকে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সখীভাবে সাধন করিতেন। এই সময়ে তিনি বক্ষে কাঁচুলী, কণ্ঠে হার, ললাটে সিন্দূর, কর্ণে অলঙ্কার পরিধান করিতেন। পরমহংসদেব এই পরিচ্ছদ আভরণাদি মথুরবাবুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সখীভাব সাধনপূর্ব্বক মহাভাব লাভ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারসুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন। এই সময়ে পরমহংসদেব অধিকাংশ সময়েই স্ত্রীবেশে স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন; এই সময়ে তিনি সর্ব্বদা জানবাজারে মথুরবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তদীয় অন্তঃপুরে বাস করিতেন; মথুরবাবুর কন্যাগণই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তিনি এইরূপে জ্ঞান ও ভক্তির নানা পথে পরিভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকল ধর্ম্মমত ও সাধন প্রণালীর পরিণাম ফলই এক। মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের মধ্যে সিদ্ধ পরমহংসদিগের যে অবস্থা, তান্ত্রিক মতাবলম্বী সিদ্ধ কুলাচারীদিগেরও সেই অবস্থা। বাউলদিগের "সাঁই" ভাব, কর্ত্তাভজাদিগের "আলেখ" ভাব, নবরসিক সম্প্রদায়ের 'অটুট" ও বৈষ্ণবগণের "মহাভাব" এই সমুদয় ভাব নিম্নস্তরে ভিন্ন হইলেও সাধনের শেষ অবস্থায় ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া তিনি বোধ করিলেন না।

সাধন ভজন শেষ করিয়া পরমহংসদেব ভগবানের শক্তি ও অলৌকিক কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন এক ব্যক্তি ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে তর্ক করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা একবার করেন তাহা আর তিনি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি মনুষ্য সৃষ্টি, এক বৃক্ষে এক প্রকার ফুলের সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করেন। পরমহংসদেব উত্তরে বলিলেন যে, মূঢ় মানব তাহার নিজের পরিমিত শক্তি দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি মাপিয়া থাকে। তিনি সহসা এক জবা গাছে এক বৃন্তে একটী শ্বেত ও অপর বৃন্তে একটী লাল জবা দেখিতে পাইয়া উক্ত ভদ্র লোকটীকে দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন যে, ভগবান যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখনই তাহা করিতে পারেন, তাঁহার শক্তি অপরিসীম, তিনি ইচ্ছাময়। তিনি কাশীধামে যাইয়া কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দর্শন করেন, দর্শনের সময়েই তাহার ভাবাবেশ হয়; তিনি জড়বৎ ছিলেন। তিনি কি দেখিলেন. কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। অতঃপর তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিতে ধর্ম্মভাবহীনতা লক্ষ্য করিয়া পরমহংসদেব দুঃখিত হইয়াছিলেন। মধুবনে ভ্রমণকালে গঙ্গামাতা নাম্নী এক প্রাচীনার সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেব মনে করিলেন, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী কাশীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তদ্রূপ এই প্রাচীনা মহিলা গঙ্গামাতা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের মহাত্ম্য রক্ষিত হইতেছে। দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীই পরমহংসদেবের নির্দ্দিষ্ট আবাস ছিল বটে, কিন্তু তথায়ই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন না; তিনি নানা স্থানে গমনাগমন করিতেন; তিনি অনেক সময় কলিকাতায় আসিতেন। তিনি কখনও সাধুসন্ন্যাসীর বেশে থাকিতেন না কখনও কোন সাম্প্রদায়িক লক্ষণ তাঁহার শরীরে বা বেশে দেখা যাইত না। তিনি কখনও আদি ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, কখনও চৈতন্য-সভায় যাইতেন, কখনও বা কলিকাতার বাহিরে নানাস্থানে ভক্ত সাধকদিগের বাটীতে যাইতেন। একবার তিনি শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলেন; তখন তাঁহার পত্নী ষোড়শী। তিনি পত্নীকে স্ত্রীভাবে দেখিলেন না; তিনি তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনপূর্ব্বক তাহার পা পূজা করিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া জীবন্ত উপদেশ দানে লোকদিগের অন্তরে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিতেছিলেন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ

করিয়া বহুলোক তাঁহার সঙ্গ ধরিত; অচিরকালমধ্যে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় অবসরক্রমে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবের জীবন্ত উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ লইয়া আসিতেন; তিনি অনতিবিলম্বেই পরমহংসদেবের একজন পরমভক্ত হইয়া পড়িলেন। কেশবচন্দ্র এপর্য্যন্ত ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দেখিতেন, এখন হইতে তাঁহার মনে সরস মাতৃভাব উপ্ত হইল; তিনি ব্রহ্মকে মাতৃভাবে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। নববিধান সমাজের বিখ্যাত প্রচারক ও বাগ্মী ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:— "তাঁহার ধর্ম্ম কি? হিন্দুধর্ম্ম; কিন্তু ইহা এক অদ্ভুত প্রকার হিন্দুধর্ম্ম। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দুদেবতার উপাসক নহেন; তিনি শৈব নহেন, বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিকও নহেন, অথচ তিনি এসকলই; তিনি শিবের উপাসনা করেন, কালীর উপাসনা করেন, রামের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং তিনি বেদান্ত মতের দৃঢ়সমর্থনকারী। তিনি একজন পৌত্তলিকও বটেন, অথচ তিনি নিরাকার, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, অনন্ত ঈশ্বরের অনুরক্ত ধ্যাতা; তিনি এই ঈশ্বরকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করেন।" বিখ্যাত নাটককার—গিরিশচন্দ্র ঘোষ রামকৃষ্ণের পরমভক্ত ছিলেন। এই মহাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের চিত্তের আবিলতা দূর হয়। পরমহংসদেবের উপদেশ লাভ করিয়া তাঁহার অশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পরমহংসদেব ধনাঢ্য লোকদিগকে দেখিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগকে তিনি তীব্র কথা শুনাইয়া দিতেন। তাঁহারাও অপ্রীতিকর কথা শুনিবার আশঙ্কায় তাঁহার নিকট যাইতেন না। একদিন স্বনামখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, "বৈরাগ্যশাস্ত্র এদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সকল বস্তু অসার বলিয়া শিক্ষা দেওয়া সেকালের কথা। এইরূপ শিক্ষার দোষে আজ ভারতবর্ষ পরাধীন। যাহাতে আপনার দেশের হিতসাধন হয়, এরূপ উপদেশ দিবেন।" ইহার উত্তরে পরমহংসদেব দেখাইলেন যে, মানুষের চেষ্টায় কিছুই হইতে পারে না; অনন্তব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় মানুষ অতি ক্ষুদ্র জীব, তাহার ক্ষমতাও অতি সামান্য। তিনি আরও বলিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। পরমহংসদেবের উপদেশাত্মক উত্তর শুনিয়া কৃষ্ণদাস অবাক হইয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরমহংসদেব ভক্তদিগের সঙ্গে সর্ব্বদাই আনন্দে কাল কাটাইতেন; তিনি প্রতি সপ্তাহে শনিবারে কোন না কোন ভক্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন; সেদিন সে বাড়ী কীর্ত্তন, নৃত্য ও হরিধ্বনিতে আমোদিত হইত। তিনি কাহাকেও শিষ্য করেন নাই, তাঁহার পদধূলি লইতে কেহ অবসর পাইতেন না; তাঁহাকে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন। ১৮০৮ শকের ১লা ভাদ্র (ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ আগষ্ট, বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সন) এই মহাত্মার তিরোভাব হয়। প্রাতে বেলা দুই ঘটিকার সময় মৃদঙ্গ করতাল সহকারে হরির নাম সঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বক পরমহংসদেবের শব কাশীপুরের উদ্যানবাটী হইতে জাহ্নবী-তীরে আনয়ন করা হইল; সন্ধ্যার পূর্ব্বে চিতা সজ্জিত হইল, শবদেহ চিতার উপর স্থাপিত হইল, প্রজ্বলিত চিতার উপর চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেবের নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। রামকৃষ্ণের লীলা ফুরাইল।

রামকৃষ্ণ (মহারাজ)—৩৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

রামগতি ন্যায়রত্ন—হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৭৫৩ শকে (ইং ১৮৩১ খৃঃ ও বঙ্গাব্দ ১২৩৮ সালে) হুগলী জিলায় পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী ইল্‌ছোবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী নামক স্থানে ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। ১৮১৬ শকে (ইং ১৯৮৪ খৃঃ ও বঙ্গাব্দ ১৩০১ সাল) ২৪ শে আশ্বিন বিজয়াদশমীর দিন ইনি স্বর্গে গমন করেন। ইনি "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক বাঙ্গালাভাষার একখানা ইতিহাস লিখিয়া বঙ্গে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাঙ্গালাভাষা থাকিবে, ততদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালাসাহিত্যজগতে উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান থাকিবে। হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পরলোকগত ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রামদাস সেনের পুস্তকাগারে বসিয়া তিনি এই বিখ্যাত গ্রন্থ

সঙ্কলন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বস্তুবিচার, রোমাবতী, দময়ন্তী, রামচরিত, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক ও রচনা করেন। (রামদাস সেন– দেখ)।

রামগোপাল ঘোষ।—এই বিখ্যাত ব্যক্তি গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ নামক একজন সামান্য দোকানদারের পুত্র। রামগোপাল কলিকাতা সহরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে প্রথমে হেয়ারস্কুলে এবং পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন; ১৪ বৎসর বয়সের সময় তিনি হিন্দুকলেজে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময়ে ডিরোজিও সাহেব এই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ডিরোজিও অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত গুণাবলীই রামগোপালে সংক্রান্ত হইয়াছিল। রামগোপাল ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যোসেফ নামক একজন য়িহুদী সওদাগরের আফিসে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কেল্সল (Kelsall) নামে এক সাহেব যোসেফ সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া এক যোগে এক কারবার খোলেন। রামগোপাল এই কোম্পানির ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে যোসেফ, কেল্সল হইতে কারবার পৃথক করিয়া লন এবং রামগোপাল কেল্সলের সহিত মিলিত হইয়া এক কারবার খোলেন; এই কোম্পানির নাম কেল্সল ঘোষ এণ্ড কোং (Kelsall Ghose & Co.)। এই ব্যবসায়ে রামগোপাল প্রচুর অর্থ লাভ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কেল্সল সাহেবের সহিত মনোবাদ হওয়ায় রামগোপাল দুইলক্ষ টাকা লইয়া স্বীয় অংশ ত্যাগ করিয়া আসেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আকিয়াব নামক স্থানে চাউলের কারবার দেন; এই কারবারে তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন। সাধুতা এবং লোকের সহিত সদ্ব্যবহারেই তিনি ব্যবসাতে এত উন্নতি লাভ করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কোন অভাবনীয় কারণে কলিকাতার বণিক্‌সম্প্রদায়ের বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হন; রামগোপাল ইঁহাদের অন্যতম। কেহ কেহ রামগোপালকেও বেনামি করিয়া কারবার চালাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেন নাই; তিনি শঠতা করিয়া লোকের ক্ষতি করা অপেক্ষা অঙ্গের বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা শ্লাঘ্য মনে করিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, রামগোপাল কিরূপ উদার, ন্যায়বান্ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। রামগোপাল একজন বড় বক্তা ছিলেন; তিনি নির্ভয়চিত্তে বড় বড় সভাতে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার সহিত অনেক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সভার যোগ ছিল। রামগোপাল ইংরেজী ও বাঙ্গালা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এবং জনসাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়া দেশীয়দিগকে দেশের কার্য্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য এক প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন; দেশীয় জমিদারগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন নাই; রামগোপাল ইহাতে ভীত না হইয়া দেশীয় লোকদিগকে বক্তৃতাদ্বারা এরূপ মুগ্ধ করেন যে, তাঁহারা অনেকেই এক মাসের বেতন এই কার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বড়লাটসাহেবের সভায় ৪টী আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হয়। সমস্ত ইয়োরোপীয়েরা এই আইনগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, কিন্তু রামগোপাল এই আইনগুলি সমর্থন করিয়া একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করেন; এই যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা পাঠ করিয়া এদেশীয় ইংরেজগণ তাঁহার চিন্তাশীলতার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতবর্ষের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন এদেশ হইতে মহারাণীকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়; রামগোপাল এই অভিনন্দন পত্র প্রদানে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতাতেই তিনি যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি সমাজের নানা বিষয়ের উন্নতির জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন বেথুন কলেজ খোলা হয়, তখন সাধারণের মতামতের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি সাহেবের সহিত স্বীয় দুহিতাকে প্রথমে সেই স্কুলে প্রেরণ করেন। কলিকাতায় নিমতলার বর্ত্তমান শ্মশানঘাট রামগোপালের চেষ্টাতেই হইয়াছিল; এই ঘাট নির্ম্মাণে যে চাঁদা আদায় করা হয়, শুনা যায়, তাহার অর্দ্ধেকই রামগোপাল নিজে দিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসি-

পালিটীর তত্ত্বাবধানে এই ঘাট নির্ম্মিত হয়। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দিয়াছিলেন। রামগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তিনি শান্তি-বিধায়ক বিচারপতি (Justice of the Peace) এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি স্বীয় চরমপত্রে (Will) নিম্নলিখিতরূপে একলক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১।	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	৪০০০০৲
২।	ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবেল সোসায়িটী	২০০০০৲
৩।	ঋণগ্রস্ত বন্ধুদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য ...	৪০০০০৲
	মোট	১০০০০০৲

রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার—গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশের জ্যেষ্ঠতাত। (গোবিন্দরাম দেখ)।

রামচাঁদ (দেওয়ান)—নবকৃষ্ণ দেখ।

রামতনু লাহিড়ী—এই মহাত্মা ১৭৩৫ শকে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। রামতনু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে বয়সে ৫ বৎসরের বড়। তিনি মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের শিষ্য ছিলেন। ১৮১৭ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়; রামতনু ১৮২৬ খৃঃ অব্দে ঐ কলেজে ভর্ত্তি হন, এই বৎসর হেন্‌রি ভিভিয়ান্ ডিরোজিও (H. V. Derozio) নামে এক ইংরেজ যুবক এই স্কুলের শিক্ষক হন। ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেও তাঁহার শিক্ষার গুণে সমস্ত স্কুলের ছাত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ ও রাজা দিগম্বর মিত্র, লাহিড়ী মহাশয়ের সতীর্থ ছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষাতে ছাত্রগণ সমাজে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। ডিরোজিওর প্রদত্ত নীতি-শিক্ষা রামতনুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মনোভাবের এবং জীবনের গতির ঘোর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। তিনি জাতি-ভেদ-প্রথা সামাজিক ও নৈতিক পাপ বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। গোমাংসভক্ষণে কোন পাপ হয় না, ইহা বলিয়া তিনি ও তাঁহার সতীর্থ কয়েক ব্যক্তি গো-মাংস হাতে করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেন এবং লোকদিগকে ইহা খাইতে অনুরোধ করিতেন। তিনি ১৮৫১খৃঃ উপবীত ত্যাগ করেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ হিন্দু-সমাজে প্রচলিত কতকগুলি রীতি সংস্কারের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমুদয় সংস্কারকার্য্যে ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারিগণ রামতনুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেশীয় হিন্দুগণ ঘৃণার সহিত তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। যাহা হউক, স্বসমাজকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি একটুও ভীত হন নাই। তিনি যাহা সঙ্গত মনে করিতেন তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন। রামতনু ১৮৫২ খৃঃ ৩৯ বৎসর বয়সে উত্তরপাড়া উচ্চ ইংরেজী-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বর্দ্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে কলিকাতা আসিতে হয়; এখানে আসিয়া দক্ষিণ-রসা স্কুলে প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখান হইতে অল্পদিন পরে তিনি বরিশাল জিলা-স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের পদে গমন করেন এবং তথায় এক বৎসর থাকিয়া কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক হইয়া আসেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে পেন্সন গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তিনি মাসিক ৭৫৲ টাকা পেন্সন পাইতেন। ১৮৭৯ খৃঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের তাড়নায় তিনি কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতা আসিতে বাধ্য হন। ১৮৮৫খৃঃ ২৩শে আগষ্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়কুমার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। ১৮৯১ খৃঃ ২৮শে জুলাই প্রিয়বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে তাঁহার মানসিক ব্যথা আরও বৃদ্ধি পায়। এখন তিনি সংসারের বন্ধন ধীরে ধীরে ছিঁড়িতেছে দেখিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৮৯১ খৃঃ ৭ই অক্টোবর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণের মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ পুত্র শরৎকুমার দিন দিন যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে

লাগিলেন। তিনি হারিসন্ রোডের উপরে একটী বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। এই বাড়ীতেই রামতনু পুত্রকন্যাগণ-সহ বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট লাহিড়ী মহাশয় দুই পুত্র শরৎকুমার ও বসন্তকুমারকে সংসারে রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "এখন তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে এবং দেবতাগণ তোমাকে অমরধামে লইয়া যাইতে বাহু প্রসারণ করিয়া আছেন।" রামতনু ঈশ্বর-নিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতভেদ হয়, তখন তিনি কেশব বাবুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন তিনি বাগানে ফুলের চারা রোপণ করিতেন, তখন প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইত। রামতনু চির-জীবন শিক্ষার্থী ছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সর্ব্বদা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ছাত্রদের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন। যদি কোন অপরাধী ছাত্র প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে জ্ঞাত করিত, তবে তাহার শত দোষ তিনি ক্ষমা করিতেন। ছাত্রেরা যাহাতে আপন যত্নে শিক্ষা লাভ করে, যাহাতে লেখা পড়ার প্রতি তাহাদের আসক্তি জন্মে এবং যাহাতে শিক্ষার ফল কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, এই সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। আহারের পর মানসিক চিন্তা অস্বাস্থ্যকর, এজন্য স্কুল বসিলে প্রথমে হস্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে বানান-শুদ্ধির কার্য্যও হইত। অর্দ্ধঘণ্টা পর পড়া আরম্ভ হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ আবৃত্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণ-শুদ্ধি ও যতি-বিচ্ছেদ ঠিক হইত, ততক্ষণ ছাত্রকে শুধু আবৃত্তি করিতে হইত। তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে ত্রুটি করিতেন না। আবৃত্তির পর ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। হিন্দুকলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রামতনু প্রথমে ঐ কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সমপাঠীদের ন্যায় তিনিও ইচ্ছা করিলে বড় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি স্বদেশে উত্তম শিক্ষকের অত্যন্ত অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন মানের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিক্ষা-কার্য্যে আত্মসমর্পণ করেন এবং কায়-মনে এই কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন। ইংরেজী-সাহিত্যে তিনি একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত লোক ছিলেন। রামতনু কোন প্রচলিত ধর্ম্মে ভক্ত ছিলেন না; ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ভগবানের কার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি তাহা সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ থাকিত; সাংসারিক কোন যন্ত্রণাই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

রামদাস—শিখদিগের গুরু। ইনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর নগর স্থাপন করেন।

রামদাস সেন (ডাক্তার)—বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। রামদাস বহরমপুরবাসী একজন জমিদার। তাঁহার পিতামহ কৃষ্ণকান্ত সেন বহরমপুরে একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। রামদাসের পিতার নাম লালমোহন সেন। লালমোহন দানশীল ও বিদ্যার উৎসাহদাতা বলিয়া বহরমপুরে সুপরিচিত ছিলেন। রামদাস জমিদার সন্তান, তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না; কিন্তু সম্পদের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াও তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রম জন্মে নাই। তিনি আলস্যে সময় অতিবাহিত না করিয়া সর্ব্বদা লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে সুবৃহৎ পুস্তকাগার ছিল, তিনি সর্ব্বদা পুস্তক পাঠে রত থাকিতেন; হুগলীনর্ম্মাল স্কুলের বিখ্যাত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে গৃহ শিক্ষায় সাহায্য করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যাপনায় রামদাস উপযুক্তরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পারিবারিক পুস্তকালয় হইতে পৌরাণিক গ্রন্থ ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতেন। রামদাস প্রথমে পদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং কবিতালহরী, কবিতাকলাপ ও বিলাপতরঙ্গ নামক তিন খানা পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রামদাস প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। অনন্তর এই প্রবন্ধগুলি "ঐতিহাসিক রহস্য" নামে প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতীত "রত্ন রহস্য" ও "ভারতীয় রহস্য" নামে আরও দুইখানা গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রাচীন ভারতের কয়েকটী জ্ঞাতব্য

বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। বিলাতের বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেব রামদাসের ঐতিহাসিক রহস্য ও ইংরেজী পত্রিকায় লিখিত প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার জন্য তিনি ইয়োরোপের নানা পণ্ডিতসভা হইতে তত্তৎসভার সভ্যপদবী লাভ করেন। রামদাস ১৭৬৭ শকের ২৬শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪৫ খৃঃ ও বঙ্গাব্দ ১২৫২ সাল) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১০ শকের ৩রা ভাদ্র (ইং ১৮৮৭ খৃঃ ও বঙ্গাব্দ ১২৯৪ সাল) পরলোক গমন করেন। তিনি "বুদ্ধদেব" নামে অপর একখানা গ্রন্থ লিখিয়া যান; এই গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ডাক্তার রামদাস অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইটালী দেশের ফ্লোরেন্স নগরস্থ ওরিয়েন্টাল একাডেমি হইতে তিনি "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহরমপুর কলেজের ভার মহারাণী স্বর্ণময়ী গ্রহণ করিলে পর ডাক্তার রামদাস উহার অন্যতম "ট্রষ্টি" নিযুক্ত হন।

রামদাস স্বামী (সমর্থ রামদাস)—দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক, ধর্ম্মপ্রচারক ও গ্রন্থকার। তিনি সমর্থ রামদাস নামে দাক্ষিণাত্যে পরিচিত। রামদাস ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী নদীর তীরস্থ জম্বুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সূর্য্যজী পন্ত, মাতা রাণু বাই। অল্পবয়সেই রামদাসের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার বাল্যকালের নাম রামায়ণ। প্রবাদ এই যে, ৮ বৎসর বয়সের সময়েই রামায়ণ পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই সময়েই ভগবান্ শ্রীরাম মনোহরবেশে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলেন, "ধর্ম্মের বড় দুর্দ্দশা হইয়াছে, শাস্ত্র লোপ পাইতেছে; তুমি কৃষ্ণানদীর তীরে যাইয়া পুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপন কর এবং ম্লেচ্ছদের দমনের জন্য শিবাজীর সাহায্য কর।" এই সময় হইতে রামায়ণ "রামদাস" নামে খ্যাত হইলেন। পুত্রের ধর্ম্মভাব দেখিয়া মাতা তাঁহাকে সংসারী করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন; রামদাসের বিবাহে প্রবৃত্তি না থাকিলেও মাতার অনুরোধে বিবাহে সম্মতি দিলেন; বিবাহের দিন স্থির হইল; মঙ্গলাষ্টক পাঠের সময় পুরোহিত সাবধানতার সহিত তাঁহাকে মন্ত্র পাঠ করিতে বলিলেন। রামদাস মন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত বলিলেন, "শিব তোমার মঙ্গল করুন; তুমি সাবধান হও; এপর্য্যন্ত একা ছিলে এখন একটী গুরুভার তোমার উপর পতিত হইল।" এই কথা শুনিবামাত্র রামদাস সভামণ্ডপ হইতে পলায়ন করিলেন; কোথায় গেলেন, সে দিন কেহ তাঁহার সন্ধান পাইল না। রামদাস পলায়ন করিয়া নাসিক জিলার অন্তর্গত কড়ী নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় একটী পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। এখানে ধ্যানধারণাদি দ্বারা তিনি ধর্ম্মজীবনে অনেক উন্নতি লাভ করেন।

এখান হইতে বাহির হইয়া তিনি সমগ্র ভারতের ও লঙ্কাদ্বীপের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে জম্বুক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এখানে মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন। তৎপর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানদীর তীরে মাহুলী নামক স্থানে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এখানে দিনে থাকিয়া স্নান ও পূজা সমাপন করিতেন এবং রাত্রিতে দুই ক্রোশ দুরবর্ত্তী জরাণ্ডা নামক পাহাড়ে গিয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল; মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী স্বামিজীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া চাপরের দেবমন্দিরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। রাজ-প্রাসাদ শিবাজীর ভাল লাগিল না; তিনি মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রামদাস স্বামীর নিকট যাইতেন; স্বামিজীও মাঝে মাঝে শিবাজীকে দেখিবার জন্য সাঁতরায় গমন করিতেন। সেখানে স্বামিজীর কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। শিবাজী স্বামিজীর আদেশমত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রামদাস স্বামিজীকে সর্ব্বদা দেখিতে না পাইয়া শিবাজী দুঃখ অনুভব করিতেন; এজন্য তিনি রাজধানীর নিকটবর্ত্তী পরেলী পর্ব্বতে স্বামিজীর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বামিজী এখানেই বাস করিতে লাগিলেন। জননীর আসন্ন মৃত্যুর বিষয় অবগত হইয়া রামদাস জম্বুক্ষেত্রে গমন করেন এবং মাতার মৃত্যুর পর

পুনরায় পরেলী পর্ব্বতে আসিয়া অহোরাত্র কীর্ত্তনে নিমগ্ন হইলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয় এবং ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রামদাস দেহত্যাগ করেন।

রামদুলাল সরকার—ইঁহাকে বাঙ্গলার "রথস্ চাইল্ড" বলা হইত। এই বিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি এক নিঃসহায় দরিদ্রের সন্তান। ইঁহার পিতা বলরাম সরকার দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক ক্ষুদ্র একটি গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই কৃষিজীবী। বলরামের পৈতৃক কুলোপাধি "দে"। তিনি এই কৃষক সন্তানদিগকে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন, এজন্য তাঁহাকে সকলে সরকার ডাকিত। ১৬৭৪ শকে (ইং ১৭৫২ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১১৫৯ সাল) বর্গীর হাঙ্গামায় এই প্রদেশ উপদ্রুত হইতেছিল। বলরাম গর্ভবতী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামবাসিগণের সহিত প্রাণরক্ষার্থ আবাসভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে। এই গর্ভবতী স্ত্রী পথক্লেশে ক্লান্ত হইয়া প্রান্তর মধ্যে এক পুত্র প্রসব করে। এই পুত্রই পরবর্ত্তিকালে রামদুলাল সরকার নামে বঙ্গে খ্যাত হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই রামদুলালের পিতামাতার মৃত্যু হয়। তিনি ছোট একটি ভাই ও একটি ভগিনীকে লইয়া মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের বাড়ীতে উপস্থিত হন। রামসুন্দর কলিকাতাবাসী। রামসুন্দরও দরিদ্র। তিনি দৌহিত্রী ও দৌহিত্রগণের ভরণপোষণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। রামদুলালের মাতামহী কলিকাতার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের বাড়ীতে পাচিকার কার্য্য গ্রহণ করিলেন। রামদুলাল মাতামহীর সঙ্গে এই দত্ত বাড়ীতেই আহারাদি পাইতেন। রামদুলাল মদনমোহনের স্নেহদৃষ্টিতে পড়িলেন। মদনমোহন তাঁহাকে নিজের গদীতে শিক্ষানবীশ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিলে, তাঁহাকে ১০৲ টাকা বেতনে এক মোহরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে রামদুলালের বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। রামদুলালকে অনেক সময় বহু টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে তন্নিকটবর্ত্তী টিটাগর, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইত। মদনমোহন দত্ত রামদুলালের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। একদা মদনমোহন কিছু টাকা দিয়া রামদুলালকে নিলাম ক্রয়ের জন্য কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী টালায় প্রেরণ করেন। রামদুলাল ১৪ হাজার টাকায় মুনিবের নামে এক নিলাম ক্রয় করেন। তিনি জানিতেন যে, এই নিলামের বস্তুর মধ্যে ভাগীরথীর মুখে নিমগ্ন এক সওদাগরী জাহাজ আছে। নিলামের বায়না দেওয়া হইয়া গেলে পর, এক সাহেব আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা অধিক দিয়া ঐ নিলাম পুনরায় খরিদ করেন। রামদুলাল এই লক্ষ টাকা নিজেই লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যখন মুনিবের পক্ষে ১৪ হাজার টাকার নিলাম কিনিয়াছিলেন, তখন এই লক্ষ টাকাও তাঁহার মুনিবেরই প্রাপ্য, ইহা মনে করিয়া তিনি সমস্ত টাকা মুনিবের নিকট দিলেন এবং তাঁহার নিকট এই লভ্য লক্ষ টাকার বৃত্তান্ত বলিলেন। ১০৲ টাকা বেতনের মুহুরী এক লক্ষ টাকার লোভ সংবরণ করিয়াছে দেখিয়া, মদনমোহন বিস্মিত হইলেন। তিনি রামদুলালকে বলিলেন, "দেখ, এই টাকা তোমারই রহিল, তোমারই ভাগ্যে এই লক্ষ টাকা আসিয়াছে।" এই বলিয়া ১৪ হাজার টাকা নিজে রাখিয়া, মদনমোহন লক্ষ টাকা রামদুলালকে দিলেন। এই লক্ষ টাকা হইতে রামদুলালের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। তিনি এই টাকা ব্যবসায়ে খাটাইয়া ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন। কলিকাতার ইয়োরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় সওদাগরগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। আমেরিকায় তাঁহার এরূপ সম্মান হইয়াছিল যে, কোন সওদাগর তাঁহার একখানা জাহাজের নাম রামদুলাল রাখেন। রামদুলাল কলিকাতায় নিজের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। আমেরিকার সওদাগরগণ তাঁহাকে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহারা রামদুলালকে তাঁহাদের সকল সওদাগরী আফিসের একমাত্র প্রতিনিধি (এজেণ্ট) নিযুক্ত করেন। রামদুলাল নিজে ৪ খানা সওদাগরী জাহাজ ক্রয় করিয়াছিলেন। এই জাহাজগুলিতে চীন, জাপান ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইত। কলিকাতায় এক অতি বৃহৎ ইংরেজ সওদাগরী আফিস ছিল; রামদুলাল এই আফিসের মুচ্ছুদ্দি (সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী) ছিলেন। সওদাগর

সাহেবেরা বলিতেন যে, রামদুলালের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, বদান্য ও কাজের লোক তৎকালে কলিকাতায় কেহ ছিল না। রামদুলাল যখন হৌসে যাইতেন, তখন হৌসের অংশীদারগণ স্বীয় স্বীয় আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি সওদাগর সাহেবদিগকে ৩৩ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন; এই টাকার অধিকাংশ অনাদায়ী রহিয়াছে। রামদুলালের বদান্যতা অসামান্য ও আড়ম্বরবিহীন। অনেক সময়ই দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি বুঝিতে পারিতেন না যে, কোথা হইতে অর্থ আসিল। তিনি কর্ম্মচারীদের অভাব অনুভব করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে ব্যাঙ্কনোট তাহাদের বাড়ীতে প্রেরণ করিতেন। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত কৃষ্ণপান্তী এক লক্ষ মণ চাউল পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বেলগেছিয়াতে এক অতিথিশালা স্থাপন করেন; এখানে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক আহার পাইত। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিয়া, পীড়িতকে ঔষধ ও পথ্য দান করিয়া এবং বিপন্নকে অর্থদানে উপকৃত করিয়া তিনি উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ ৫ শত লোক আহার পাইত। অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়া তিনি প্রতিমাসে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। দুই লক্ষ বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি কাশীতে ১৩টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তিন হাজার টাকা দিয়াছিলেন। এত ব্যয় করিয়াও তিনি মৃত্যুকালে এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অমিতব্যয়ী, বিলাসী উত্তরাধিকারিগণ এই টাকাগুলি অল্পসময়েই উড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে ১২৩১ সালে (ইং ১৮২৫ খৃঃ) বাতব্যাধিতে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র ও ৫ কন্যা বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার শ্রাদ্ধে তদীয় পুত্রগণ অশ্ব, হস্তী, পাল্কী প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। কাঙ্গালী বিদায়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। তাঁহার বিনয় ও কৃতজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। যতদিন মদনমোহন দত্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বসিয়া পূর্ব্ব বেতন ১০৲ টাকা লইয়া আসিয়া নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন। তিনি তাঁহার সৌভাগ্য ও সম্পদের সময়েও মদন দত্তের বাড়ীতে রিক্তপদে প্রবেশ করিতেন; পূর্ব্ব মুনিবের প্রতি তাঁহার এমনি শ্রদ্ধা, এমনি ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যেক পুত্রের বিবাহে তিন লক্ষ করিয়া টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই বিবাহোপলক্ষে নবদ্বীপের নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণ প্রত্যেকে এক শত টাকা বিদায় পাইয়াছিলেন এবং তিনি এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতিবেশীদিগকে স্ব স্ব গৃহে রন্ধন করিতে দেন নাই।

রাম দুর্লভ তর্কভূষণ—মহারাজ রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইঁহারা রাজনগরের "কাশ্যপ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

রামদেব বিদ্যালঙ্কার—গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশের পিতা। (গোবিন্দরাম দেখ)

রামনাথ (বুনো রামনাথ)—নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী। ছাত্রগণ নানা দিগ্দেশ হইতে ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। এই প্রবীণ পণ্ডিত সামান্যবেশে থাকিতেন এবং আহারাদিতেও ইঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না; এজন্য ইঁহাকে লোকে "বুনো রামনাথ" বলিত। একদা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কিছু অর্থ দিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার বাড়ীতে যান। পণ্ডিত মহাশয় মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয়, আপনার কোন অসঙ্গতি আছে?" "অসঙ্গতি" এই শব্দ ন্যায়শাস্ত্রে "অসমন্বয়" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন "না, কোন অসঙ্গতি নাই, আমি ছাত্রগণের নিকট সকল পাঠেরই সঙ্গতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছি।" মহারাজ দেখিলেন মুস্কিল, পণ্ডিতকে স্বীয় মনোগত ভাব বুঝাইতে পারিতেছেন না। তিনি খুলিয়া বলিলেন "আপনার টাকা কড়ির অনটন আছে?" পণ্ডিত বলিলেন "না, আমার আহারাদির জন্য টাকা কড়ির প্রয়োজন নাই; ক্ষেত্রে শস্য আছে, উহাহইতে গৃহিণী চাউল ও ডাইল প্রস্তুত করেন এবং ঐ যে তেঁতুল গাছ

দেখিতেছ, উহার পত্রদ্বারা আমার পত্নী চর্চ্চরী প্রস্তুত করেন, আমি উদর পূর্ণ করিয়া উহাদ্বারা অন্ন আহার করি।" পণ্ডিতের উত্তর শুনিয়া মহারাজ নিরাশ হইলেন এবং বিষণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পণ্ডিতের পত্নীও বেশভূষায় ও চালচলনে আড়ম্বরহীনা ছিলেন, কিন্তু তিনি তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। তাঁহার হাতে একগাছি শাঁখা মাত্র দেখিয়া রাণী তাঁহাকে কিছু স্বর্ণাভরণ দিতে ইচ্ছা করেন। পণ্ডিতপত্নী বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীলোকের স্বামীই অলঙ্কার।" অনন্তর হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যে দিন এই শাঁখা খসিয়া পড়িবে, সেদিন নবদ্বীপ আঁধার হইবে।"

রামপ্রসাদ সেন (কবিরঞ্জন)—বৈদ্যবংশোদ্ভব একজন বাঙ্গালী ভক্ত কবি। "রামপ্রসাদী পদাবলী" বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হয়; ইহা কবির অতুল সম্পত্তি। পদাবলী ব্যতীত তাঁহার "কালী সংকীর্ত্তন", "শিব সংকীর্ত্তন" "কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন" ও "বিদ্যাসুন্দর" নামক কয়েক খানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যও আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদী বিদ্যা-সুন্দরকে ছায়ায় পাতিত করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ অধিকতর মধুর হওয়ায় তাহা জনসাধারণের নিকট অধিকতর আদৃত হইয়াছে। রামপ্রসাদ সেন, বিখ্যাত শিব সংকীর্ত্তন প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সমকালীন লোক। রামপ্রসাদ শক্তিমন্ত্রসাধক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটববর্ত্তী হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট (বর্ত্তমান কুমারহাটা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ বাল্যকালে বাঙ্গালা, পারসী ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সংসার পালনের ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয়। কাজেই তাঁহাকে চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইতে হইয়াছিল। বহুকষ্টে তিনি কলিকাতায় কোন ধনবানের গৃহে সামান্য বেতনে এক মুহুরীগিরি পাইলেন। একদিন তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী দেখিলেন যে, রামপ্রসাদ পাকাখাতার মধ্যে যেখানে স্থান পাইয়াছেন সেখানেই শক্তি-বিষয়ক গান লিখিয়া রাখিয়াছেন। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বিষয়ী; তিনি গানের অর্থের দিকে মনোযোগ না দিয়া, পাকাখাতা নষ্ট করাতে রামপ্রসাদের নামে জমিদারের নিকট অভিযোগ করিলেন। জমিদার "আমায় দেওমা তবিল্‌দারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি" ইত্যাদি গান পড়িয়া বিস্মিত হইলেন; তিনি মনে করিলেন, রামপ্রসাদ সামান্য লোক নহেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে ডাকিলেন ও তাঁহাকে বাড়ী যাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য জমিদার মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রামপ্রসাদের বাড়ী নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। মহারাজ তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং তাঁহার কবিত্বের জন্য তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধিদান করেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

রামবসু—বিখ্যাত কবিওয়ালা। রামবসু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শালিকায় ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ভবানীবেণে, নীলুঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাগণের দলে গান করিতেন। পরে নিজেই এক কবির দল গঠন করেন। তিনি বৈষ্ণবসঙ্গীত রচনাতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন; তাঁহার প্রেমরসসিক্ত গান শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অশ্রুসিক্ত হইতেন। ১৮২৮ খৃঃ ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামমোহন রায় (রাজা)—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃঃ মে মাসে হুগলী জেলায় খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে তহশিলদারের কর্ম্ম করিয়া "রায়" উপাধি লাভ করেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরা এই উপাধি বংশানুক্রমে ব্যব-হার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামকান্ত প্রথমে মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে চাকুরী করিতেন; তিনি নবাব-সরকারের ৯ লক্ষ টাকার ইজারাদার ছিলেন, পরে বর্দ্ধমানের মহারাজের

কোন কোন মহালে ম্যানেজারী করেন। রামকান্ত এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। রামকান্তের স্ত্রীর নাম তারিণী দেবী; লোকে তাঁহাকে ফুলঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিত। তৎকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পারস্যভাষা জানা অতি প্রয়োজনীয় ছিল; এজন্য রামকান্ত রামমোহনকে পারস্যভাষা এবং আরবী-ভাষা শিক্ষা করিতে পাটনায় প্রেরণ করেন। এখানে রামমোহন ২।৩ বৎসর এক মৌলবীর নিকট শিক্ষা করিয়া আরবী ও পারসীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে রামমোহনের বয়স ১২ বৎসর মাত্র। পাটনা হইতে রামমোহন সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ কাশীতে গমন করেন; তথায় অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সংস্কৃতসাহিত্য এবং উপনিষদে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বেদান্ত ও উপনিষদ্ পড়িয়া তিনি একেশ্বরবাদী হইয়া উঠিলেন এবং একেশ্বরবাদ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, পৌত্তলিকতা প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রের এবং প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদিগের মত-বিরুদ্ধ। রামমোহনের পিতা গোঁড়া-হিন্দু ছিলেন। তিনি রামমোহনকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, অনেক বুঝাইলেন, অবশেষে শাসন করিলেন। পিতা যখন দেখিলেন যে, কিছুতেই কিছু হইল না, তখন তিনি রামমোহনকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।' ভারতবর্ষে তখনও রেল হয় নাই; লোকের যাতায়াতে কষ্টের একশেষ ছিল এবং গমনাগমন বিপজ্জনকও ছিল। এ অবস্থায় রামমোহন পদব্রজে ভারতবর্ষের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা ও আচার রীতি-নীতি অবগত হন। পরে হিমালয় পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করেন। তিব্বতের লামাগণ ধর্ম্ম-যাজক। তাঁহাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের কুসংস্কারের কথা বলাতে তাঁহারা রুষ্ট হইয়া রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। এই সময়ে রামমোহনের বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। তিব্বতীয় স্ত্রীলোকদিগের অনুগ্রহে রামমোহন প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে ফিরিলেন। পিতামাতা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু যখন রামকান্ত দেখিলেন পুত্রের ধর্ম্মমত কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং পুত্র তৎকালপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছেন, তখন এবারও তিনি রামমোহনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরে পিতার মৃত্যু হইলে মাতা তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করেন। ২২ বৎসর বয়সের সময় রামমোহন ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ৬ বৎসরের চেষ্টায় তিনি শুদ্ধরূপে ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০০ খৃঃ রামমোহন রঙ্গপুরের কালেক্টরের দেওয়ানি পদ গ্রহণ করেন। এই দেওয়ানি পদে তিনি ১৩ বৎসর ছিলেন। এই ১৩ বৎসর চাকরী করিয়া তিনি এক লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কালেক্টর ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কালেক্টরের অনুগ্রহে তাঁহাকে অন্যান্য আমলার ন্যায় সাহেবের নিকট দাঁড়াইয়া কাগজ দস্তখত করাইতে বা হুকুম গ্রহণ করিতে হইত না। তিনি এই কয় বৎসরে ফরাসী, লাটিন, গ্রীক ও য়িহুদীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় অতি সুপুরুষ ছিলেন; যেমন তাঁহার আকৃতিগত সৌন্দর্য্য, তেমনি তাঁহার প্রকৃতিগত মধুরতা ছিল। রামমোহনের মাতা পুত্রের ধর্ম্মমতে এত বিরক্ত হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে রঘুনাথপুর নামক গ্রামে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পরামর্শ দিলেন। রামমোহনও তাহাই করিলেন; কিন্তু তিনি গ্রামে বেশী দিন থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা অবস্থানকালে তিনি বাঙ্গালা ভাষায়, বেদান্ত দর্শন ও বেদান্তসারের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ দেখিয়া তদানীন্তন খৃষ্টীয় মিশনারিগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং রামমোহনের নাম ও পরিচয় ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮১৬-২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অনেকগুলি উপনিষদ্ ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। যথা,—তলবকার উপনিষদ্ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই আষাঢ়, ঈশোপনিষদ্ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আষাঢ়, কঠোপনিষদ্ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ভাদ্র, মুণ্ডকোপনিষদ্ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ভাদ্র, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২১ আশ্বিন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রামমোহনকে ভয়ানক গালাগালি দিতে থাকেন। রামমোহন অতি ধীরতার সহিত পত্রিকায় নিজমত সমর্থন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের লৌকিক আচারের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। রামমোহন কেবল হিন্দু-ধর্ম্মেরই আলোচনা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি আরবিভাষায় লিখিত কোরাণ, হিব্রুভাষায় লিখিত প্রাচীন বাইবেল (Old Testament) ও গ্রীকভাষায় লিখিত নূতন বাইবেল (New Testament) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি যিশুখৃষ্টের উপদেশগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ছাপাইয়া প্রকাশিত করেন ; ইহাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, যিশুখৃষ্ট মাত্র লোক-শিক্ষক ও ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, তাঁহার মধ্যে দেবত্ব ছিল না। ইহাতে শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের সহিত রামমোহনের তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল। মিশনারিদের পক্ষ হইতে মার্শম্যান সাহেব রামমোহন রায়ের উত্তর দিতে লাগিলেন ; কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রত্যুত্তর তাঁহারা আপনাদের কাগজে বাহির করিলেন না। ইহাতে রামমোহন নিজে এক ছাপাখানা স্থাপন করিয়া নিজ ব্যয়ে পত্রিকা বাহির করিতে লাগিলেন এবং নিজের পত্রিকায় খৃষ্টানদের ধর্ম্মমতের আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের পত্রিকায় তিনি দেখাইলেন যে, প্রকৃত হিন্দুরা একেশ্বর-বাদী। তিনি দেখিলেন, বেদান্ত ও উপনিষদ্ প্রকৃত হিন্দু-শাস্ত্র। তিনি দেখাইলেন যে, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানেরা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব বাদী হিন্দুদের ন্যায় পৌত্তলিক। খৃষ্টানদের সহিত তর্কযুদ্ধে এই ফল হইল যে, এডাম্ নামক একজন পাদ্রি একেশ্বরবাদী হইয়া পড়িলেন। তিনি ইহার পর সতীদাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। নিজ পত্রিকাতে সতীদাহের বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই সমুদায় প্রবন্ধের দিকে বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ১২ বৎসরের চেষ্টায় তিনি এই কুসংস্কার নিবারিত করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইংলণ্ডে যাইয়া তথাকার আচার রীতি নীতি দেখিতে রামমোহন রায়ের বড়ই ইচ্ছা ছিল। এই সময় এক সুযোগ উপস্থিত হইল। দিল্লীর পদচ্যুত সম্রাট্ তাঁহার কোন কোন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, রামমোহন রায়ের সঙ্গে এক আবেদনপত্র প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিলাত প্রেরণ করেন।

রামমোহন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর পালিতপুত্র রাজারাম রায়, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরিকে সঙ্গে লইয়া বিলাত রওনা হন। জাহাজে তিনি নিজের ক্যাবিনে বসিয়া খাইতেন এবং তাঁহার নিজের ব্রাহ্মণ তাঁহার জন্য পৃথক্ স্থানে পাক করিত। বিলাতে যাওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার যশঃ তথায় বিস্তৃত হইয়াছিল। বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট Sir J. C. Hobhouse তাঁহাকে রাজার নিকট উপস্থিত করেন। রাজার সিংহাসনে আরোহণের সময় ইউরোপের রাজগণের দূতদের মধ্যে রামমোহনের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার সম্মানার্থ লণ্ডনে এক মহাভোজ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বিচার এবং রাজস্ব বিভাগের কার্য্য কিরূপ নির্ব্বাহিত হয়, তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সম্মানিত করেন। ভারতের অধিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি প্রশ্ন করা হইয়াছিল। সতীদাহ আইনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষহইতে পার্লেমেণ্টে আপীল করা হইয়াছিল। আপীল শুননের দিন রামমোহনকে হাউস্ অব কমন্সে আহ্বান করা হয়। রামমোহনও এই আপীলের বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। তথায় ফরাসীরাজ ফিলিপ দুই দিন তাঁহার সহিত আহার করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ইণ্ডিয়া-বিল পাশ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি লণ্ডনেই অবস্থিতি করেন। এখানে তিনি হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত কয়েকখানা বহি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন এবং বড় বড় লোকের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক করেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কার্পেণ্টারের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তিনি ব্রিষ্টলে যান। ব্রিষ্টলের নিকটবর্ত্তী ষ্টেপল্‌টন গ্রোভ (Stapleton Grove) নামক গ্রামে বাস করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। বহু যোগ্য ডাক্তারের চিকিৎসা এবং বহু শুশ্রূষাতেও

তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল না। তাঁহার মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী এক স্থানে সমাহিত করা হয়; কিন্তু ১০ বৎসর পরে দেহাবশেষ উত্তোলিত হইয়া ব্রিষ্টল নগরে নীত ও সমাহিত হয়। ব্রিষ্টলের এই সমাধির উপর ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রামমোহন ইংরেজী ও দেশীয়ভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ডেভিড হেয়ার (David Hare) ও সার জন হাইড্ ইষ্ট (Sir John Hyde East) এই দুই ব্যক্তির সহিত একযোগে তিনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপন করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করিয়াছিলেন। রামমোহন "সংবাদ-কৌমুদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন এবং সতীদাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহন যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর এক ভাড়াটে বাড়ীতে উপাসনা সভা স্থাপন করেন। প্রতি শনিবার ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য হইত। দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ এই সভায় বেদ পাঠ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। উপাসনা সভা স্থাপনের অল্পদিন পরে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল এবং এই অর্থদ্বারা চিৎপুর রোডের পার্শ্বে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া রামমোহন তাহার উপর ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৫১ শকে (ইং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) ১১ই মাঘ এখানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ তারিখে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাজা রাধাকান্ত দেবের ধর্ম্মসভা এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে উক্ত রাজার একজন অনুচর ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইয়াছিলেন। এই সম্পাদক মহাশয় প্রতিগৃহে রামমোহন ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলকে সমাজচ্যুতির ভয় দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেন।

রামরায়—শিখগুরু হররায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। নানকপন্থী সম্প্রদায় "উদাসী" ও "নির্ম্মলা" এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। গুরু রামরায় উক্ত "উদাসী" শাখার অন্তর্গত "রামরায়" নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়কে "রামরায়িসম্প্রদায়" কহে। দিল্লীর সম্রাট, গুরু হররায়কে বন্দী করেন; হররায় স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরায়কে "জাবিন" স্বরূপ রাখিয়া মুক্তি লাভ করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে হররায়ের মৃত্যু হইলে শিখগণ দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহ-বর্দ্ধিত-রামরায়কে গুরুপদে বরণ করিল না; তাহারা হররায়ের দ্বিতীয় পুত্র হরকিষণকে গুরুপদে অভিষিক্ত করে। ইহাতে রামরায়ের সহিত হরকিষণের মনোবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদ মীমাংসার ভার সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের উপর অর্পিত হয়। হরকিষণ দিল্লীতে আসিতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই রামরায় বলিয়াছিলেন যে, হরকিষণ বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিবে। এতদিনে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। হরকিষণ মৃত্যুসময়ে হরগোবিন্দের পুত্র তেগবাহাদুরকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে মহাতেজস্বী গুরু তেগবাহাদুর দিল্লীতে অতি নৃশংসরূপে হত হন। আওরঙ্গজেব মনে করিয়াছিলেন যে, এখন শিখগণ রামরায়কে গুরুপদে বরণ করিবে; কিন্তু তাহা হইল না। তাহারা গুরু তেগবাহাদুরের হত্যাতে ক্রোধান্ধ হইয়া গুরুবধের প্রতিশোধ লইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল এবং তেগবাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দসিংহকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিল। গুরু গোবিন্দের শিক্ষায় শিখগণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। রামরায়ের গুরুপদ প্রাপ্তির আশা একেবারে বিলুপ্ত হইল। তিনি জীবনের অবশিষ্টভাগ শান্তিতে যাপন করিবার জন্য আওরঙ্গজেবের অনুরোধ পত্র লইয়া গড়ওয়ালাধিপতির নিকট উপস্থিত হন এবং আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করেন। গড়ওয়ালরাজ ফতে শাহ রামরায়ের অসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণতা ও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া দেরাদুনে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মহাত্মা রামরায়ের যশঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত

হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে লোকসঙ্ঘ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে দেরা (বা দেহ্‌রা) একটী ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইল। দেহ্‌রা শব্দের অর্থ আশ্রম এবং ডুন শব্দে উপত্যকা বুঝায়। কথিত আছে যে, রামরায় সমাধিস্থ হইয়া ২।৩ দিবস মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেন। প্রবাদ এই, তিনি কোন শিষ্যের মঙ্গলার্থ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। অদ্যাপি তাঁহার সমাধিস্থান ও শয়ন-খট্টা পূজিত হইয়া থাকে। উদাসীরা গুরু নানকের মতাবলম্বী। ইঁহারা মঠে বাস করেন; ইঁহারা নিজে রন্ধন করেন না, অপরে রাঁধিয়া দিলে ইঁহারা আহার করেন। রামরায়ের মতে গুরুই পরমদেবতা ও একমাত্র উপাস্য; তিনিই সকল তীর্থের সার ও একমাত্র গতি। গুরু ব্যতীত জীবের অন্য নমস্য নাই। গুরুগোবিন্দ এই "রামরায়ি" দিগকে সমাজচ্যুত করেন এবং "অকালী" নামে এক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। গুরুগোবিন্দের শিখশিষ্যগণই "অকালী" নামে অভিহিত হইত। এই অকালী সম্প্রদায়ের লোক কখনও কেশ বা শ্মশ্রু মুণ্ডন করে না, সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকে এবং নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে।

রামসরস্বতী—কামরূপ জিলার উত্তরাংশে পচরিয়া নামক গ্রামে এই কবিচূড়ামণির জন্ম হয়। ইনি মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের সমসাময়িক লোক হইলেও তাঁহাদের হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ সিংহের সভাতে ইঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। ইনি মূল সংস্কৃত মহাভারত সরল আসামীয় ভাষায় ছন্দোবন্ধে অনুবাদ করেন। ইঁহার কবিতা সরল, সুললিত ও প্রাণস্পর্শী। এই অনুবাদকার্য্য তিনি বিহারের রাজা নরনারায়ণের আদেশ অনুসারে ১৪৫০ শকাব্দ হইতে ১৪৬০ শকাব্দ মধ্যে সম্পন্ন করেন। তিনি রামায়ণেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনন্তরামায়ণ ইঁহারই প্রণীত। পরলোকগত গুণাভিরাম বড়ুয়া ও আনন্দরাম ঢেকিয়ান ফুকন বলেন যে, রামসরস্বতী ও অনন্ত কন্দলী একই ব্যক্তি। আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে, কুমারহরণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা চন্দ্রভারতী ও রামসরস্বতী একই ব্যক্তি। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত এবং আরও কতিপয় পুরাণের অনুবাদও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রামসিংহ (রাজা)—শ্রীহট্টের উত্তরস্থিত জয়ন্তীরাজ্যের রাজা। তাঁহার রাজধানী জয়ন্তীপুর। জয়ন্তীরাজ্য দীর্ঘকাল স্বাধীন ছিল; এই রাজ্যের প্রাচীন নাম "নারীদেশ"। মহাভারতে নারীদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যখন মুসলমানেরা শ্রীহট্টরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তখনও জয়ন্তীরাজ স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রামসিংহের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় রাজা রাজেন্দ্রসিংহের সময় এই রাজ্য ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইয়া শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্ভুত হয়। জয়ন্তীরাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়ের সামিল হইয়া, "খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়" জিলার (Khasia Jayantia Hill District) সৃষ্টি করিয়াছে। জয়ন্তীয়ার অধিপতিগণ সিন্টেঙ্গ বংশোদ্ভব হইলেও তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দেবদেবীর পরমভক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করিতেন এবং এখনও তদ্বংশীয়েরা মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ম্মন্য রাজবংশীয়দের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। রাজা রামসিংহ অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে তদীয় কীর্ত্তিসূচক প্রাসাদাবলী ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এখন রাজধানী জয়ন্তীপুর বিধ্বস্তপ্রায়। রাজবংশীয়গণ দীনভাবে কালযাপন করিতেছেন।

রামস্বামী মুদালিয়ার—মান্দ্রাজ প্রদেশের বিখ্যাত রাজনৈতিক বক্তা। রামস্বামী মান্দ্রাজ প্রদেশে সালেম নামক নগরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এম. এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া তৎপরবর্ত্তী বৎসর আইনের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সালেমে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসাতে তাঁহার অত্যন্ত সুখ্যাতি হয় এবং

তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতের পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ হইয়া উহার পুনর্গঠনের জন্য নব নির্ব্বাচন (General Election) হয়, তখন ভারতবর্ষ হইতে যে কয়েক ব্যক্তি ইংলণ্ডে বক্তৃতা করিতে প্রেরিত হন, তন্মধ্যে রামস্বামী অন্যতম। তিনি জন ব্রাইটের পক্ষসমর্থন করিয়া নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রামস্বামীকে একবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এত বড় সম্মানিত পদের কখনও যোগ্য হন নাই। তিনি ভদ্র ও বিনয়ী ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ তিনি পরলোক গমন করেন। ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে অধিক পরিমাণে শাসনবিভাগের কার্য্যে নিয়োগের বিষয় বিচারের জন্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এক কমিশন (commission) নিযুক্ত হয়; রামস্বামী এই কমিশনের অন্যতম সভ্য ছিলেন।

রামানন্দ—বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক সাধু। ভক্তমালগ্রন্থে লিখিত আছে, রামানুজের শিষ্য দেবাচার্য্য, দেবাচার্য্যের শিষ্য রাঘবানন্দ এবং রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ। রামানন্দ কাশীতে আসিয়া নিজ নামানুসারে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগকে রামাৎ বলে। রাম এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা।° রামানন্দের অনেক শিষ্য। তন্মধ্যে কবীর ও অনন্তানন্দই প্রধান। কাশীতে পঞ্চগঙ্গাঘাটে শিষ্যেরা তাঁহার অবস্থানের জন্য এক মঠ প্রস্তুত করিয়া দেন। কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা ঐ মঠ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এখন ঐ স্থানে এক প্রস্তরময় বেদী ও তাহাতে রামানন্দের পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে।

রামানন্দ ন্যায়বাগীশ—সুপ্রসিদ্ধ পুরাণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কথকতার জন্য তিনি মহাভারতকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ন্যায়বাগীশের বিরচিত সত্যভামা ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ প্রভৃতি উপাখ্যানের অপূর্ব্ব কবিত্ব ও যমকানুপ্রাসাদি অলঙ্কার শোভিত শ্লোকগুলি এখনও কথকতা ব্যবসায়িগণের মুখে শুনা যায়। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার "দিগ্‌বিজয়ী" নামে সম্মানিত ছিলেন। ফরিদপুর জিলার জপ্‌সা গ্রামে ইঁহাদের বসতি ছিল। জপ্‌সা এখন পদ্মাগর্ভে।

রামানন্দরায়—একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব। ইনি রায় রামানন্দ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। ইনি উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে ইনি পরম বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। স্বয়ং চৈতন্যদেব ইঁহার অসামান্য গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইঁহার দর্শন লালসায় বিদ্যানগরে গমন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরে জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার প্রথম মিলন হয়। ইনি "জগন্নাথ বল্লভ" নাটক রচনা করিয়া অসামান্য কবিত্বের পরিচয় দেন। এতদ্ব্যতীত পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে ইঁহার রচিত অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোভাব হয়।

রামানুজ (স্বামী)—বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ। রামানুজ দাক্ষিণাত্যে চেংলাপত জিলায় শ্রীপরম্বদুর (পেরুম্বুর) গ্রামে ৯৩৯ শকে (ইং ১০১৭ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। শিলালিপির প্রমাণে দেখা যায় যে, তিনি ১০৫০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী, মাতা ভূমিদেবী। রামানুজ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ মতের প্রবর্ত্তক। তিনি "যতিরাজ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত দর্শন শাস্ত্রের নাম "রামানুজ দর্শন"। তিনি ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিষ্ণুপ্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তিনি কাঞ্চীপুর হইতে স্বীয় ধর্ম্ম-মত প্রচারোদ্দেশে মহারাষ্ট্র প্রদেশে গমন করেন এবং তথা হইতে দ্বারকায় যান। এখানে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতাবলম্বী বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে তীর্থদর্শন করিয়া তত্তৎস্থানে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করেন। অতঃপর হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম হইয়া কাশ্মীরে সারদামঠে গমন করেন। এখানকার মঠাধ্যক্ষেরা বিরুদ্ধমতের গ্রন্থ মঠে রাখিতেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত

করিয়া তিনি স্বরচিত গ্রন্থগুলি মঠে রাখিতে বাধ্য করেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে ৭৪ জনকে তিনি আচার্য্য অর্থাৎ পীঠাধিপতি নামে অভিহিত করেন। সারদামঠ হইতে তিনি কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অযোধ্যায় আগমন করেন এবং অযোধ্যা হইতে গয়াধামে উপস্থিত হন। গয়াধামের অনেক বৌদ্ধ রামানুজের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি এখান হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া কাঞ্চীপুরে গমন করেন এবং কাঞ্চীপুর হইতে তাঁহার প্রিয় স্থান শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হন।

জীবনের অবশিষ্টাংশ এখানে অতিবাহিত করিয়া ১২০ বৎসর বয়সে ১০৫৭ শকে (১১৩৭ খৃঃ) তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। ভার্গবপুরাণ ও পদ্মপুরাণে রামানুজস্বামীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামানুজদর্শনে বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রকটিত হইয়াছে। এই মত প্রধানতঃ জীব, ঈশ্বর, উপায় (ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ) ফল বা পুরুষার্থ ও বিরোধি (ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক) এই অর্থ পঞ্চকের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতে জীব ৫ প্রকার, যথা—নিত্য, মুক্ত, কেবল, মুমুক্ষু ও বদ্ধ। ঈশ্বরের স্বরূপ পঞ্চবিধ, যথা—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামি ও অর্চ্চা। অর্চ্চা যথা—প্রতিমাদি; বিভব, রামাদি অবতার। ঈশ্বর পরমাত্মা হরি, ইনি সকলের নিয়ামক; চিৎ, অচিৎ সমুদয় বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ। প্রতিমাদি পূজা করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে এবং ভগবদ্ভক্তি হইলে পর রামাদি অবতাররূপ বিভবের উপাসনা করিতে হয়। এইরূপে উত্তরোত্তর অপর তিন মূর্ত্তির উপাসনা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। উপায় পঞ্চবিধ যথা—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, প্রপূত্তিযোগ ও আচার্য্যাভিমানযোগ। পুরুষার্থ ৫ প্রকার, যথা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, কৈবল্য ও মোক্ষ। বিরোধীও পাঁচ প্রকার, যথা—স্বরূপবিরোধী, পরস্বরূপবিরোধী, উপায়বিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী ও প্রাপ্তিবিরোধী। রামানুজস্বামী দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত ৪৭ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীভাষ্য (বেদান্তভাষ্য), গীতাভাষ্য, বেদার্থসংগ্রহ, নারায়ণটীকা, বেদান্তপ্রদীপ ও শতভূষণী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য—বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তন্মধ্যে বেণীসংহার নাটকপ্রণেতা ভট্টনারায়ণ অন্যতম। রামেশ্বর এই ভট্টনারায়ণের বংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী। ইনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি "শিবসঙ্কীর্ত্তন" নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—বিক্রমপুরের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক। রাসবিহারী ১৭৪৭ শকে (১৮২৫ খৃঃ—বঙ্গাব্দ ১২৩২ সাল) ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হয় এবং তদবধি তিনি খুল্লতাত ৺তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা লালিত পালিত হন। তিনি বাল্যবয়সে সামান্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক কবি-শক্তি তাঁহাকে যশের পথে প্রধাবিত করিয়াছিল। তিনি হৃদয়ের যে উদারতা ও পরদুঃখকাতরতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কবিশক্তি সেই উন্নতভাবদ্বয়ের বিকাশসম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার পিতৃব্য ৺তারকচন্দ্র গোঁড়া কুলীন ও বহু-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তারকচন্দ্র স্বয়ং ১৯টী বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি রাসবিহারীকে অপরিণত বয়সে ১৪টী বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমাজে কৌলীন্যের বড় প্রভাব; কোন কোন ব্যক্তি শতাধিক বিবাহও করিয়াছিলেন। কুলীনগণ তৎকালে এই বিবাহদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাসবিহারী অন্তরে এই বহু বিবাহের বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন; কিন্তু অভিভাবকের ভয়ে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অবশেষে যখন বিবাহের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন পরোক্ষভাবে তাঁহার বিবাহে অনিচ্ছা অভিভাবক পিতৃব্যকে জ্ঞাপন করিলেন। এরূপ না করিলে রাসবিহারীকে বাধ্য হইয়া আরও অধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত। এপর্য্যন্ত রাসবিহারী পিতৃব্যের সহিত একান্নভুক্ত ছিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় রাসবিহারীকে

তাঁহার পিতৃব্য পৃথক্ করিয়া দেন। এখন তিনি বিবাহের উপর জীবিকা নির্ভর না করিয়া চাকুরীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং অনতিবিলম্বে ময়মনসিংহের আঠারবাড়ীর জমিদারের অনুগ্রহে তদীয় জমিদারীতে এক তহশিলদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। জমিদার তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন এ কাজে থাকিতে পারিলেন না। তিনি হৃদয়ে যে দৃঢ়ব্রত লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সমাপ্ত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পাঁচ বৎসর চাকুরী করিয়া জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাজসংস্কারে নিযুক্ত হইলেন। সমাজের বহুবিবাহকারী কুলীনগণ ও কুলাচার্য্যগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার উপর নানাপ্রকার সামাজিক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল; কিন্তু রাসবিহারী কিছুতেই ভীত হইলেন না। তাঁহার গান রচনা করিবার শক্তি ছিল। তিনি কৌলীন্যপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর গীত রচনা করিয়া সমাজের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের বাড়ীতে গান করিতেন। এই প্রথার ফলে বহু কুলীনকন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া "যমবরা" নামে আখ্যাত হইতেন; ১০, ১৫ বা ততোধিক সংখ্যক রমণী এক সময়ে একবরে বিবাহিতা হইতেন; বৃদ্ধ বরের সহিত বালিকা পাত্রী এবং বৃদ্ধা পাত্রীর সহিত বালক বর বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতেন। সমাজের নরনারী উৎফুল্লহৃদয়ে তাঁহার গান শুনিতেন। সমাজের সম্ভ্রান্ত কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের দৃষ্টি রাসবিহারীর দিকে আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার গান শুনিয়া সমাজের দুরবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ৺অভয়কুমার দাস ও ব্রজসুন্দর মিত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, সমাজের ব্রাহ্মণ জমিদার ও তালুকদারগণ রাসবিহারীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। এই সমুদয়ের সাহায্যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। বহু বিবাহ নিবারণ করা, মেলভঙ্গ করা, নির্দ্দিষ্ট ঘর ও পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া বিবাহ দেওয়া এই তিনটীই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং এই তিন কার্য্যেই তিনি অল্পাধিক্য পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বহু বিবাহ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুকের ঢাকায় আগমনের সময় রাসবিহারীর চেষ্টায় তাঁহার নিকট ঢাকা ও বরিশাল হইতে দুইখানা আবেদন পত্র উপস্থিত করা হয়। কিন্তু উক্ত বড়লাট কৌলীন্যপ্রথার জটিলতা সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া এই সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হন। এখন কুলীন সমাজে বহু বিবাহ নিবারিত হইয়াছে; অধিকাংশ কুলীনই এই কুপ্রথাটী ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তবে এখনও কোন কোন স্থানে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীনসন্তান এই অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। ভঙ্গকুলীনগণের মধ্যে মেলভঙ্গ ও পর্য্যায়ভঙ্গ করিয়া বিবাহ দেওয়া এখন সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। নিকষ কুলীনগণের মধ্যেও পর্য্যায়ভঙ্গ দেখা যাইতেছে। "বিপর্য্যয়েকুলং নাস্তি" ইহা এখন পুরাতন কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তিনি "বল্লালী সংশোধিনী," "কুলীন কীর্ত্তন" ও "রমণীরমণ কাব্য" নামক তিনখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া সমাজের ব্যক্তিবর্গের নিকট বিতরণ করিতেন।

তাঁহার রচিত সুললিত গান সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শুনা যাইত। উপরিউক্ত তিনখানি পুস্তিকা ব্যতীত তিনি তিনখানি স্কুল-পাঠ্যপুস্তকও লিখেন। তাঁহার "বিদ্যাবিধি" "শৈশব জ্ঞান-চন্দ্রিকা" ও "সীতার বনবাস" বহুকাল পূর্ব্ববঙ্গে মধ্য-শ্রেণীর স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাসবিহারী ৩০ বৎসর বয়সে সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন এবং ৪১ বৎসর অক্লান্তভাবে এই কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে ১৮১৯ শকে (১৮৯৭ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সনে) ২৮শে চৈত্র স্বর্গে গমন করেন। তিনি কেবল অন্যকেই মেলভঙ্গ, পর্য্যায়ভঙ্গ ইত্যাদি সমাজসংস্কারবিষয়ক কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি নিজেও ফুলিয়া মেলের কুলীন হইয়া খরদহ মেলের গাঙ্গুলী পরিবারে স্বীয় পুত্রকন্যার বিবাহ সম্পাদন করেন। এইরূপে নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমাজের লোকদিগকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। নিম্নলিখিত গানটী একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।

রাগিণী বসন্ত—তাল যৎ

বহুদিন পর এসেছি চিনি না শ্বশুর বাড়ী।
কোন্ পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী ॥
যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হ'ল ছেলে পিলে
বিয়ে ক'রে গেলাম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি।
বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটী জানি,
উত্তরেতে বাগান খানি, সুপারি সব সারি সারি ॥
দ্বিজ রাসবিহারী বলে আর ত হাসি রাখ্‌তে নারি।
তুমি যারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারী ॥

২। শিশুবরের প্রতি বৃদ্ধাপাত্রীর উক্তি।

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর)

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশুবরের পাশে কোন্ বা রসে ঘোম্‌টা দিব পাকা চুলে ॥
গায়ে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলী,
নিয়েছে মালার থলি হস্তে তুলে।
ভাল ফল্‌লো ফল বল্লালীতে মিল্‌লো বর এক কচ্‌মা ছেলে ॥
(হায়) লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু বরকে নিয়ে
কেমনে ঘুরবো আমি কলাতলে।
বল্‌বো বা কি, বল্‌বে বা কিঁ, বল্‌বে বা কি এয়ো কুলে ॥

৩। রাসবিহারী সম্বন্ধে তদীয় জীবদ্দশায় নিম্নলিখিত গানটী ব্রাহ্মণপরিবারে দ্বিতীয় বিবাহাদি উপলক্ষে গীত হইত।

(লক্ষ্ণৌ ঠুংরী)

যদি বেঁচে থাকে মোদের রাসবিহারী,
তবে সুখে রবে কুলীন-কুমারী।
বাড়ী ঘর তা'জে সমাজে সমাজে
একাজে ওকাজে করে দৌড়াদৌড়ি।
উপবাসী রয়ে, উপহাস সয়ে,
উপদেশ দিয়ে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥

রাসমণি (রাণী)—এই দানশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা জমিদার পত্নীর "রাণী" উপাধিটি গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত নহে। লোকে তাঁহাকে এতই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত যে, জনসাধারণ ইঁহাকে রাণী উপাধিতে অভিহিত করিত। এই দানশীলা রাণী এক দরিদ্র কৈবর্ত্তজাতীয় কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস;

নিবাস হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোনা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম। স্বীয় রূপলাবণ্যের প্রভাবে তিনি কলিকাতাবাসী ধনী প্রীতিরাম মাড়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র মাড়ের সহিত বিবাহিতা হন। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর তদীয় জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজ হস্তে পড়ে। তিনি অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত এই জমিদারী রক্ষা ও বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। দানশীলতার জন্যই বঙ্গের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম গীত হয়। বিখ্যাত রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ইনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে স্থাপন করিয়া তথায় এক অতিথিশালা নির্ম্মাণ করেন এবং তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি দীন-দুঃখীদিগকে অকাতরে অন্নবস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অসাধারণ তেজঃস্বিতার কথাও বহুল পরিমাণে শুনা যায়। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না; তিনটি কন্যা রাখিয়া তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৬৭ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রাহুল—বুদ্ধদেবের পুত্র। গোপার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মের সপ্তম দিবসে বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন। রাহুল সপ্তম বর্ষ বয়সে বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া বুদ্ধসঙ্ঘে মিলিত হন এবং বিংশবর্ষ বয়সে বৌদ্ধভিক্ষুরূপে গৃহীত হন। (বুদ্ধ দেখ)।

রুদ্রসিংহ—স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ গদাধর সিংহের পুত্র (গদাধরসিংহ দেখ)। তাঁহার মাতা জয়মতী (জয়মতী কুঁরকী দেখ)। আহোম রাজগণের মধ্যে রুদ্রসিংহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ১৬১৭ শকে (১৬৯৫ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বহু দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি জননীর নির্য্যাতন স্থানের উপর "জয়সাগর" নামে এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন। তিনি পঞ্জাব, কাশ্মীর, অযোধ্যা ও বঙ্গের নরপতি-গণের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সভায় ঐ সকল রাজগণের নিকট হইতে প্রতিনিধি আগমন করিতেন। তিনি নিজে লেখা পড়া না জানিলেও তাঁহার স্মরণশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রবল ছিল। তিনি নানাস্থানে ব্রাহ্মণের জন্য টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। রুদ্রসিংহ, নদীয়া শান্তিপুরের শিমলা গ্রামবাসী কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য নামক এক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। আসামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই উক্ত ন্যায়বাগীশের নিকট দীক্ষিত হন। মৃত্যুর সময় তিনি অনুরোধ করিয়া যান যে, তাঁহার বংশীয়েরা যেন উক্ত ভট্টাচার্য্য বংশীয়দিগের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৮ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করিয়া রুদ্রদেব পরলোক গমন করেন।

রূপ গোস্বামী—বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কবি। রূপ-শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ছিলেন এবং তিনি মহাপ্রভুর পার্শ্বচরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪১১ শকে (১৪৮৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮০ শকে (১৫৫৮ খৃঃ) তাঁহার তিরোভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম কুমার ও পিতামহ মুকুন্দ। কুমার বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সনাতন, মধ্যম রূপ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভ। বল্লভ গোস্বামীর পুত্র জীব গোস্বামী বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

রূপ গোস্বামী বাল্যকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের উজীরের কর্ম্ম সম্পাদন করেন। সুলতান হুসেন শাহ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাকে এই পদ হইতে প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তিনি ২৭ বৎসর কাল গৃহস্থাশ্রমে অতিবাহিত করেন এবং তৎপর বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। রূপ বৃন্দাবনধামে স্বীয় আবাস গৃহের নিকট শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে দুইটী জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। এখানে ৪৩ বৎসর অবস্থান করিয়া নানা সাধুকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন।

রূপগোস্বামীর গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা অতিপ্রত্যূষে রূপগোস্বামী সুলতানের আদেশে তাঁহার দরবারে যাইতেছিলেন; তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। তিনি পথিপার্শ্বস্থ এক

দরিদ্রের কুটীরে অস্ফুট কথা শুনিতে পাইলেন। দরিদ্র-গৃহস্থপত্নী স্বামীকে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতে অনুনয় করিতেছিল, যেহেতু গৃহে একমুষ্টি চাউলও ছিল না। বৃদ্ধ ভিক্ষুক বলিল, যে ভোর হওয়ার একটু বিলম্ব আছে; বিশেষতঃ যেরূপ প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছে তাহাতে ক্রীতদাস ও পরের চাকর ব্যতীত আর কাহারও ঘরের বাহির হওয়ার সাধ্য নাই; শৃগাল কুকুরও এমন সময়ে ঘরের বাহির হয় না। ভিক্ষুকের কথা শুনিতে পাইয়া রূপগোস্বামীর চৈতন্য হইল; তাঁহার অবিলম্বেই সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া চাকরী পরিত্যাগ করিবার জন্য সুলতানের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুলতান কিছুতেই রূপকে ছাড়িতে চাহিলেন না। রূপের অনুনয়ে অগত্যা তিনি তাঁহাকে কিছুকালের জন্য বিদায় দিলেন। রামকেলি নামক স্থানে রূপ ও সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রূপগোস্বামী অতঃপর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে শরণ লন এবং পরে তাঁহারই আদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া ৮৪টী লুপ্ত বনতীর্থের উদ্ধার সাধন করেন।

রূপগোস্বামী সংস্কৃতে ৪৭ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে নিম্নে কয়েক খানার নাম উল্লেখ করা গেল :—

উজ্জলনীলমণি, উদ্ধবদূত, উপদেশামৃত, গঙ্গাষ্টক, গোবিন্দ বিরুদাবলী, চৈতন্যাষ্টক, দানকেলিকৌমুদী, নাটক-চন্দ্রিকা, পদ্যাবলী, পরমার্থসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মথুরা-মহিমা, যমুনাষ্টক-রসামৃত, ললিতমাধব নাটক, ব্রজবিলাসস্তব, সাধনপদ্ধতি, স্তবমালা, হংসদূত কাব্য, হরিনামামৃত-ব্যাকরণ, শ্রীরূপচিন্তামণি, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, বিদগ্ধমাধব ও উৎকলিকা-বল্লরী। সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতীত তিনি একখানি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থও লিখিয়াছিলেন; এই গ্রন্থের নাম "কারিকা"। উপরি উক্ত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থখানা রূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া রচনা করিয়াছেন।

ল

লক্ষ্মণসেন—বঙ্গে কৌলীন্যপ্রথাপ্রবর্ত্তক বিখ্যাত রাজা বল্লালসেনের পুত্র। লক্ষ্মণসেন একজন প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী নরপতি। বঙ্গের পাল রাজগণ বঙ্গে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে মগধের একাংশে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের রাজধানীর নাম ছিল পাটলীপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা)। তাঁহারা ক্রমে পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গের একাংশ অধিকার করিয়া তথায় মুদ্গগিরি (বর্ত্তমান মুঙ্গের) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ৩০০ বৎসর রাজত্বের পর পাল বংশীয়েরা হীনবল হইলে, দাক্ষিণাত্য হইতে বিজয়সেন বঙ্গে আগমন করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমে (বর্ত্তমান রাজসাহীতে) রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্র বল্লালসেন গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন স্বীয় নামানুসারে গৌড়ের নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন। লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে কাশী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও মিথিলায় লক্ষ্মণসেনের অব্দ প্রচলিত আছে; এই অব্দ লক্ষ্মণসংবৎ (লসং) নামে কথিত। ১১০৮ খৃঃ হইতে লক্ষ্মণসংবতের আরম্ভ; এখন ৮০০ লসং চলিতেছে। মাঘ মাসে এই বৎসর আরব্ধ হইয়া থাকে। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গে ৪টি রাজধানী বর্ত্তমান ছিল :—একটি বর্ত্তমান মালদহের নিকটবর্ত্তী গৌড়, অপর একটি বর্ত্তমান নদীয়া জিলায় নবদ্বীপ, অপর দুইটি ঢাকা জিলায় অবস্থিত—সুবর্ণগ্রাম ও রামপাল। রামপাল বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী। এখনও তথায় পরিখাবেষ্টিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বল্লালের প্রাচীন রাজভবন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণসেনের বিখ্যাত মন্ত্রী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" নামক একখানি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বঙ্গের বিখ্যাত কবি জয়দেব এই রাজসভায় থাকিয়া তাঁহার সুললিত গীতিকাব্য "গীতিগোবিন্দ" রচনা করেন। উমাপতিধর, শরণ ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য নামে আরও তিন জন কবি বিদ্যোৎসাহী রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। লক্ষ্মণসেনই বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা। তিনি ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষকালে রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজা বৃদ্ধ, মন্ত্রিগণ আলস্যপরায়ণ ও অবিশ্বস্ত, সৈন্যগণ অকর্ম্মণ্য ও বিলাসিতাপরায়ণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজি নামক এক মুসলমান

সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ গৌড় হইতে নবদ্বীপে রাজধানী আনয়ন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের সভাপণ্ডিতেরা বলিলেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে যে, অতঃপর মুসলমানেরাই বঙ্গে রাজত্ব করিবেন।" সুতরাং যুদ্ধ করা বৃথা মনে করিয়া লক্ষ্মণ সপরিবারে পলায়ন করিয়া বিক্রমপুরে গমন করিলেন। (ইতিহাস)। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, লক্ষ্মণসেনের পিতার নাম বল্লালসেন এবং পিতামহ বিজয়সেন। তাঁহার মতে লক্ষ্মণসেন ১১০১ খৃঃ রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার প্রপৌত্র লক্ষ্মণীয়া নামান্তরে অশোকসেন বা শূরসেন বঙ্গের শেষ রাজা। এই লক্ষ্মণীয়া ১২০৩ খৃঃ বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

লক্ষ্মী—শ্রীচৈতন্যের প্রথমা পত্নী। (শ্রীচৈতন্য দেখ)।

লক্ষ্মীবাই—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ঝান্সির অধিপতি এবং পরলোকগত গঙ্গাধর রাওর বিধবা রাণী। রাজা গঙ্গাধর রাওর মৃত্যুর পর এই রাজ্য বড় লাট লর্ড ডালহৌসী ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ইহাতে লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজ সৈন্যের সহিত ঘোর যুদ্ধ করেন। ইংরেজ সেনাপতি সার হিউ রোজ এই বীর মহিলার শৌর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বীর রমণী গোয়ালিয়রের অনতিদূরে ইংরেজ সৈন্যের সহিত অসীম বিক্রমে তুমুল যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সহসা এক ইংরেজ সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

লম্বোদর বৈদ্য—ইনি গোপীদূত নামক খণ্ডকাব্যের রচয়িতা।

লালমোহন ঘোষ—বাঙ্গালীর জীবনে যে সমুদয় মহাত্মা জাতীয়ভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, লালমোহন তাঁহাদের অন্যতম। মনোমোহন, আনন্দমোহন, উমেশচন্দ্র, কালীচরণ অন্তর্হিত হইয়াছেন; লালমোহনও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। লালমোহন ১৭৭১ শকে (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামলোচন ঘোষ রায়বাহাদুর। লালমোহন জ্যেষ্ঠ সহোদর মনোমোহনের ন্যায় স্বদেশহিতৈষী ও অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন; (মনোমোহন ঘোষ দেখ)। তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পরে জ্যেষ্ঠ সহোদর মনোমোহনের উপদেশে তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গমন করেন এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার পশার ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লালমোহন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তিনি ভারতসভা কর্ত্তৃক (British Indian Association) ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সিবিল সার্ভিসে ভারতবাসীর পথ সুগম করিবার জন্য বিলাতে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন। পার্লেমেণ্টের বিখ্যাত সভ্য "জন ব্রাইট" (John Bright) তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "লালমোহন ঘোষের বাগ্মিতা বিস্ময়কর ও অতুলনীয়; আমি দীর্ঘ মন্তব্যে সে বাগ্মিতার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব না।" যিনি ইংরেজ বাগ্মীদিগের শিরোভূষণ ছিলেন, লালমোহনের সম্বন্ধে তাঁহার এই প্রশংসা বাণী শুনিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতি গৌরব অনুভব করিবে। লালমোহনের আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালায় "ষ্টাটুটারি সিভিলসার্ভিস" পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। ইহার দুই বৎসর পরে ভারতে ইলবার্টবিলের আন্দোলন হয়। লালমোহন ইলবার্টবিলের পক্ষে নানা স্থানে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এই বিষয়ে তিনি কলিকাতা টাউন হলে (Town Hall) এবং ঢাকায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস (Indian Daily news) নামক সংবাদ পত্রে তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল :—"Whatever our opinion may be of the immediate occasion which called forth that speech, it must certainly be acknowledged that in mere satire and power of invective it was worthy of the best orators of any time or age."

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের দুরবস্থার বিষয় ইংরেজদিগকে জানাইবার জন্য পুনরায় বিলাতে গমন করেন। এই সময়ে তিনি সভ্যরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। ড্রেফ্‌ট্‌ফোর্ডের উদারনৈতিক সম্প্রদায় তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক সমরে পরাজিত হইয়া পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে উক্ত মহাসভায় প্রবেশ সম্ভব। ইঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া বিখ্যাত দাদাভাই নৌরজী ও সার মাঞ্চর্জী ভবনাগরী পরবর্ত্তী কালে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ছোটলাটের সভায় সভ্যরূপে প্রবেশ করেন। ৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শেষজীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি রাজনীতি ও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া গৃহে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিনি মাইকেল মধুসূদনকৃত মেঘনাদবধ কাব্যের কিয়দংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এই অনুবাদকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই· তিনি বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনী লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি ফরাসী ভাষাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জীবনী লিখিতে যে যে উপকরণের আবশ্যক তাহাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কাল তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছে। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশিয়াবাগানস্থ ভবনে সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

লালাবাবু—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেখ।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—এই বিখ্যাত মহাপুরুষ "বারদীর ব্রহ্মচারী" নামে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের নিকট পরিচিত। ইঁহার পূর্ব্বনাম লোকনাথ ঘোষাল; পিতা রামনারায়ণ ঘোষাল; মাতা কমলা দেবী। ইনি বর্ত্তমান ২৪ পরগণার বারাশতের এলাকায় চৌরাশীচাকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জিলায় নারায়ণগঞ্জ উপবিভাগের (Sub Division) এলাকায় মেঘনা নদীর তীরে বারদী গ্রাম অবস্থিত। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় শৃঙ্গ হইতে দুইজন মহাপুরুষ বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে উলঙ্গ, দীর্ঘজটাকলাপে মস্তক ও শরীরের একাংশ সমাচ্ছন্ন, দীর্ঘকাল হিমময় প্রদেশে অবস্থানহেতু তাঁহাদের শরীর একপ্রকার স্থূল শ্বেতচর্ম্মে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এই মহাপুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন বারদী গ্রামে উপস্থিত হন, অপর মহাপুরুষ কামাখ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন। যিনি বারদীতে উপস্থিত হন, তাঁহাকে প্রথমে গ্রামের লোকেরা চিনিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহারা ব্রহ্মচারীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাকে এক মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিলেন। বারদীর জমিদার নাগ বাবুরা তাঁহার আবাসের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ইঁহারই নাম লোকনাথ; ইঁহার বর্ত্তমান জীবনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যাঁহারা চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করেন তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান কালে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আর যাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান কালে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আশ্রমান্তর অবলম্বন করিতে হয়। এই শ্রেণীর ব্রহ্মচারীদিগকে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী বলে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নাম সমাবর্ত্তন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী অনুমান ১৬৫২ শকে (বঙ্গাব্দ ১১৩৭ সনে, ১৭৩০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী পিতার চতুর্থ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তিন সহোদর সংসারেই ছিলেন। তৎকালে ভগবান্ গাঙ্গুলী নামে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ষড়দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত তৎকালে আর কেহ বর্ত্তমান ছিলেন না। এই অগাধপাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট লোকনাথ দীক্ষিত হন। লোকনাথের যজ্ঞোপবীতের সময় ভগবান্ গাঙ্গুলী তাঁহার আচার্য্য গুরু হইয়া, তাঁহাকে লইয়া বনবাসী হইলেন। উপনয়নের পর হইতে প্রায় ৮০ বৎসর কাল লোকনাথ গুরুর সহিত নানা বনে, পর্ব্বতে, তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে অবস্থান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার গুরু জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। লোকনাথ যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তিনি গুরুর দিকে চাহিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি গুরুকে বলিয়াছিলেন, "গুরো! আমি পার হইয়াছি, তুমি এখনও সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছ! তুমি এত খাটিয়া আমাকে পার করিলে, কিন্তু তুমি যেমন তেমনই রহিয়াছ। তোমাকে দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।" গুরু বলিলেন, "আমি চিরকাল জ্ঞানমার্গাবলম্বী। কর্ম্মদ্বারা যে এরূপ সিদ্ধি হইতে পারে, এতকাল আমি এ কথা মানিতাম না; সুতরাং সিদ্ধিলাভের জন্য এতাদৃশ যত্নও করিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমাকে কর্ম্মপথে চালাইয়া, কর্ম্মযোগে এই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া, আমি শিক্ষালাভ করিলাম। আমি এই দেহপাত করিয়া, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া, তোমার শিষ্য হইব। তখন তুমি এই পথে আমাকে চালাইও।

ভগবান্ দুইটী শিষ্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন – একটী লোকনাথ, অপরের নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকনাথ ও বেণীমাধব কেহই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, সংস্কৃত ভাষা ইঁহারা পড়িতে জানিতেন না। তাঁহারা যে গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন; শিষ্যদিগকে তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নের ক্লেশ দেন নাই। তাঁহার অধীত বিদ্যা বিনা অধ্যয়নে তাঁহার শিষ্যদ্বয়ে সংক্রান্ত হইয়াছিল গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী শিষ্যদ্বয়কে "নক্তব্রত, একান্তরা, ত্রিরাত্র, পঞ্চাহ, নবরাত্র, দ্বাদশাহ, মাসাহ প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন।" নক্তব্রতে লোকনাথকে দিবাতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে হবিষ্য গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহাকে এই ব্রত প্রায় ৪০ বৎসর পালন করিতে হইয়াছিল। একান্তরা ব্রতে তাঁহাকে একদিন উপবাসী থাকিয়া পরবর্ত্তী দিনে আহার করিতে হইত। ত্রিরাত্র ব্রতে তাঁহাকে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া চতুর্থ দিনে আহার করিতে হইত। গুরু, শিষ্যদ্বয়কে এইরূপে ক্রমে ক্রমে কঠোরতর ব্রত পালন করিতে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন। মাসাহ ব্রতে লোকনাথকে একমাস উপবাসী থাকিয়া তৎপর আহার করিতে হইয়াছে। এই ব্রত মাত্র দুইবার তাঁহাকে পালন করিতে হইয়াছিল। বেণীমাধব প্রথম বারে মাসাহ ব্রত পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বারে সম্পূর্ণ একমাস উপবাসী থাকিতে পারেন নাই। উপবাসের ব্যাপককালের দৈর্ঘ্য অনুসারে তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইত। যে ব্রতে যত অধিক দিন উপবাসী থাকিতে হইত, তাহা তত অল্পবার অনুষ্ঠিত হইত।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত অদ্ভুত। তিনি পশ্চিমদিকে গমন করিতে করিতে আফগানিস্থান, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন মক্কা ও মদিনাবাসী মুসলমানগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারীর জন্য মুখ বাঁধিয়া আহারের সামগ্রী রন্ধন করিতেন এবং লোকনাথ হৃষ্টচিত্তে তাহা ভোজন করিতেন। মক্কার পথে আবদুল গফুর নামক এক মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আবদুল গফুর কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না; মুসলমানেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারীর সহিত সাধু আবদুল গফুরের আলাপ হইল। তিনি প্রথমেই ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কয়দিনের লোক?" লোকনাথ উত্তর দিলেন "দুইদিনের" (অর্থাৎ আমার দুই জন্মের কথা স্মরণ আছে)। মুসলমান সাধু ব্রহ্মচারীর কথার উত্তরে বলিলেন যে, তিনি "চারিদিনের" লোক অর্থাৎ চারি জন্মের কথা তাঁহার স্মরণ আছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর উত্তরাভিমুখে ভ্রমণ বৃত্তান্ত আরও অদ্ভুত। তিনি ও বেণীমাধব ব্রহ্মচারী পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানমার্গ অবলম্বন করিয়া উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্বে গুরু ভগবান ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন; তিনি কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে আসীন হইয়া দেহত্যাগ করেন। হিতলাল মিশ্র নামে এক ব্রহ্মচারীর সহিত সশিষ্য ভগবানের সাক্ষাৎ হয়। তিনি হিতলালকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরে যেন তিনি তাঁহার শিষ্য দুইটীর ভার গ্রহণ করেন। তৎকালে লোকনাথ ও বেণীমাধবের বয়স ৯০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল; এই বয়সেও গুরু তাঁহাদিগকে বালকের মত দেখিতেন। হিতলাল, লোকনাথ ও বেণীমাধব এই ব্রহ্মচারীত্রয় বহু বৎসর শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিয়া শরীরটাকে হিমালয় প্রদেশে গমনোপযোগী করিয়া লইলেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে পরিজ্ঞাত পৃথিবীর উত্তরসীমা অতিক্রমপূর্ব্বক বহু সহস্র মাইল

উত্তরে গমন করিয়াছিলেন। সূর্য্য না থাকায় তাঁহাদের সময় নির্ণয় কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। তাঁহারা ২০ বার বরফ গলিতে ও বরফ জমিতে দেখিয়াছিলেন। বরফ জমিতে আরম্ভ করা অবধি বরফ গলা পর্য্যন্ত সময়কে এক বৎসর ধরিয়া লইয়াছিলেন। এই হিসাবে তাহারা ২০ বৎসর কাল এই অন্ধকারময় প্রদেশে ছিলেন। এতদূর গমন করিয়াও তাঁহারা সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা হিমময় পর্ব্বতে বাধা পাইয়া আর উত্তরে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সুমেরু পর্ব্বতে গমন ঘটিল না দেখিয়া লোকনাথ ও বেণীমাধব উদয়াচল দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিলেন। কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা চীনরাজ্যে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহারা তত্রত্য চীনরাজ-কর্ম্মচারীর হস্তে বন্দী হন। পরে ৩ মাস অন্তর মুক্তিলাভ করেন এবং উক্ত কর্ম্মচারিগণদ্বারা পূর্ব্বাভিমুখে গমনে নিষিদ্ধ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে বেণীমাধব কোন এক মহাত্মার আশ্রমে থাকিয়া যান; লোকনাথ একাকী বহু বৎসর ভ্রমণ করিতে করিতে বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উপস্থিত হন। তথা হইতে আনুমানিক ১২৭১ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরার অন্তর্গত দাউদকান্দীতে আগমন করেন এবং তথা হইতে এক কর্ম্মকারের যত্নে বারদী গ্রামে উপস্থিত হন। এথানে ২৬ বৎসর অবস্থানের পর দেহত্যাগ করেন। গত ১২৯৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৫৮ বৎসর বয়সে লোকনাথ বারদী গ্রামে দেহত্যাগ করেন। লোকনাথ জাতিস্মর ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন; বর্দ্ধমান জিলায় দামোদর নদের তীরবর্ত্তী বেরুগ্রাম (বেরুগাঁ) নামে এক বৃহৎ পল্লীতে তাঁহার নিবাস ছিল।

লোচনদাস—যে কয়জন ভক্ত বৈষ্ণবকবি চৈতন্যদেবের জীবন চরিত লিখেন তন্মধ্যে লোচন দাস অন্যতম। তিনি ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে) বর্দ্ধমান জেলায় কো-গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫১১ শকে (ইং ১৫৮৯ খৃঃ) ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রণীত "চৈতন্য মঙ্গল" একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কেহ কেহ মনে করেন চৈতন্য-মঙ্গলের রচনা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস; মাতা সদানন্দী; পিতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত।



শঙ্করদেব (মহাপুরুষ)—আসামের বার ভূঞা বংশের কায়স্থকুলে মহাত্মা শঙ্করদেব ১৩৭১ শকে (১৪৪৯ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসে দশমী তিথিতে শুক্রবার বরদোয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাপুরুষ শঙ্করদেব নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কুসুমবর ভূঞা। তিনি অল্প বয়সেই মাতৃপিতৃহীন হন। তিনি মহেন্দ্রকন্দলী নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভা ও কর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ হয়। ১৯ বৎসর বয়সেই তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি জন্মস্থান বরদোয়া পরিত্যাগ করিয়া কোচবিহারে যান। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ধর্ম্মব্যাখ্যায় বিরক্ত হইয়া কোচবিহারপতি নরনারায়ণের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। রাজা নরনারায়ণ শঙ্করদেবকে সভায় আনয়ন করেন এবং তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হন। তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক রাজা স্বয়ংই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু মহাত্মা শঙ্করদেব রাজগুরু হইতে চাহিলেন না। কোচবিহার গমনকালে পথিমধ্যে তেমুয়ানি গ্রামে মহাত্মা মাধবদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মাধবদেবকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়ে শ্রীক্ষেত্র, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে ১২ বৎসর পর্য্যটন করেন। শ্রীক্ষেত্রে গমনকালে নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। হরিনামকীর্ত্তন তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। উক্ত তীর্থস্থানসমূহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আসামে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ নিচয়ের সরল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া এবং সঙ্গীতাদি দ্বারা তিনি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "কীর্ত্তনঘোষা"

সর্ব্বপ্রধান। তিনি ২৯ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৪৯০ শকে (ইং ১৫৬৮ খ্রীঃ) ভাদ্রমাসে শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে ১১৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

শঙ্করাচার্য্য—প্রসিদ্ধ বেদান্তভাষ্য কর্ত্তা। ইঁহার পিতার নাম শিবগুরু; মাতার নাম বিমলা। শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে শুক্লাদশমী তিথিতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কেরল রাজ্যে চিদম্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞাতিবর্গের সহিত মনোমালিন্ত হওয়াতে তিনি মাতাকে একাকিনী রাখিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত নানাস্থানে গমন করেন। কিছুদিন পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন মাতা অত্যন্ত রুগ্না, জ্ঞাতিগণের মধ্যে কেহই তাঁহার শুশ্রূষা করিতে আসেন নাই। তিনি রোগক্লিষ্টা মাতার যথাসাধ্য সেবা করিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনরক্ষা পাইল না। কয়েক দিন পর মাতার মৃত্যু হইলে, শবদেহটী বাটীর প্রাঙ্গণে অগ্নিসৎকার করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বাল্যকালেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রতিভাবলে অল্পসময়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার উপর সম্যক্ অধিকার লাভ করিয়া বহুবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পঞ্চমবর্ষ বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়; অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি চতুর্থাশ্রম (ভিক্ষু) অবলম্বন করেন। তিনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বদরিকাশ্রমে অবস্থান করেন। এই আশ্রমে বসিয়াই ১৬ খানি ভাষ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নারায়ণ মঠ প্রতিষ্ঠা ও জ্যোতির্ম্মঠ নির্ম্মাণ করেন। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে বারাণসীতে আগমন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করেন। বুদ্ধদেবেরও প্রথম প্রচারক্ষেত্র বারাণসী। বৌদ্ধ-প্লাবিত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপনার্থ যে সকল মনীষীর আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য প্রধান। কুমারিলভট্ট দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এবং শঙ্করাচার্য্য মহাদেবের জ্ঞানাবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শঙ্কর, বারাণসী হইতে মাহিষ্মতীপুরে গমনপূর্ব্বক মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। মাহিষ্মতী নগরী মধ্যভারতে বিন্ধ্য পর্ব্বত ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী জব্বলপুরের নিকটে অবস্থিত। মণ্ডনমিশ্র কর্ম্মে ব্রহ্মবাদী। মণ্ডনের পত্নী সরস্বতী দেবী এই বিচারে মধ্যস্থতা করেন। মণ্ডনপত্নীর লৌকিক নাম উভয়ভারতী। ইনি সরস্বতীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুই প্রগাঢ় জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া বিচার করিতেছেন, আর প্রাচীন ভারতের জ্ঞানগৌরব সূচনা করিয়া একটী নারী সেই বিচার মীমাংসায় মধ্যস্থতা করিতেছেন। ভারতের সেদিন কি আর ফিরিবে? পত্নীর বিচারে স্বামী মণ্ডনের পরাজয় হইল। পত্নী উভয়ভারতীর মধ্যস্থতায় পতির পরাজয় হইল বটে, কিন্তু উভয়ভারতী শঙ্করকে বলিলেন যে, পত্নী পতির আত্মার অর্দ্ধেক, "আত্মনোঽর্দ্ধং পত্নী।" অতএব যে পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং পরাজিত না হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামীর পরাজয় স্বীকৃত হইবে না। শঙ্কর স্ত্রীজনের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু পরে উভয়ভারতীর যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। ৭ দিন পর্য্যন্ত বিচার চলিতে লাগিল; বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শঙ্করকে পরাজিত করিতে না পারিয়া উভয়ভারতী কামশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। যতিবর শঙ্কর কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ; তিনি প্রশ্নের উত্তরের জন্য এক মাস সময় চাহিলেন। পরে শঙ্কর শিষ্যবর্গ সহ এক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি দেখিলেন অমরু (মতান্তরে অমরক) নামক রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া বনমধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাজমহিলাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। শঙ্কর শিষ্যদিগকে নিজ শরীর রক্ষার ভার দিয়া এই মৃত রাজদেহে প্রবেশ করিলেন। তিনি কামিনীগণের সহিত কামক্রীড়ায় রত থাকিয়া এক মাসের ঊর্দ্ধকাল অতিবাহিত করিলেন। শঙ্করশিষ্যগণ ইহাতে চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সংসার-মোহনাশক পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। শঙ্করের চৈতন্য হইল। তিনি রাজদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় দেহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শঙ্কর মাহিষ্মতীপুরে গমন করিলেন। উভয়ভারতী বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিলেন। মণ্ডন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্বামীর সন্ন্যাসে স্ত্রীর বৈধব্য হয়; এজন্য স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই উভয়ভারতীরূপিণী বাগ্দেবী সরস্বতী সকলের সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। কেহ কেহ বলেন, শঙ্কর কাশ্মীরমণ্ডলে অবস্থানকালে মৃত রাজদেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে বিবৃত হইল। কোন্‌টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত, পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পরাজিত মণ্ডন, শঙ্করের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য ও ব্রহ্মস্বরূপাচার্য্য নামদ্বয় গ্রহণ করেন। সরস্বতী দেবীর প্রতি শঙ্করাচার্য্যের গভীরশ্রদ্ধা উদিত হইয়াছিল; এজন্য তিনি দ্বারকায় সরস্বতী দেবীর নামে শারদামঠ ও তাহাতে এই মহনীয়গুণসম্পন্না রমণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন জৈনেরা দ্বারকানগরীতে হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়া আপনাদের দেবালয় স্থাপন করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য জৈনদিগকে পরাজিত করিয়া দ্বারকানগরীটাকে হিন্দুতীর্থে পরিণত করেন। তিনি সপ্তদশ বর্ষ বয়সে মহীপুরে গমনপূর্ব্বক তথায় শৃঙ্গগিরি (শিঙ্গারি) মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গগিরিমঠ দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগরের অদূরবর্ত্তী; ইহা তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত। তুঙ্গভদ্রা নদী সহ্য পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া কৃষ্ণানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, শিঙ্গারিমঠ রামেশ্বর সেতুবন্ধে অবস্থিত। ৮০৭ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; এই বৎসরেই সুরেশ্বরাচার্য্যকে দ্বারকাপীঠে শারদা মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ৮০৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই বৎসরেই তোটকাচার্য্য ও হস্তামলকাচার্য্য শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য ৮১৩ খৃষ্টাব্দে হস্তামলকাচার্য্যকে শৃঙ্গগিরি (বর্ত্তমান শিঙ্গারি) মঠের এবং তোটকাচার্য্যকে জ্যোতির্ম্মঠের (বর্ত্তমান যোশীমঠ) অধ্যক্ষতা প্রদান করেন। যোশীমঠ হিমালয়বক্ষে কেদার নামক পুণ্যভূমিতে অবস্থিত। ৮১৫ খৃষ্টাব্দে শঙ্কর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় দারুমূর্ত্তি স্থাপন ও গোবর্দ্ধন মঠের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পদ্মপাদাচার্য্য নামক শিষ্যের উপর গোবর্দ্ধন মঠের অধ্যক্ষতা অর্পণ করেন। কথিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্যকে ১০৩২টী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতে হইয়াছিল। দিগ্বিজয় সমাপন করিয়া শঙ্কর কাশ্মীরমণ্ডলে সংস্থাপিত শারদাপীঠে অবস্থান করেন। শারদাপীঠে আরোহণের সময় এক দৈববাণী হয়। দৈববাণীতে প্রতিপন্ন হয় যে, শঙ্করের শারদাপীঠে আরোহণে যোগ্যতা আছে। অত্রত্য পণ্ডিতগণ জয়লাভের আশায় আকৌমার বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বী শঙ্করকে আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করিতে বলেন। শঙ্কর কখনও আদিরসের আস্বাদন করেন নাই। তিনি পরপুর প্রবেশ বিদ্যাদ্বারা মৃত রাজা অমরুর শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং রাত্রিতে তদীয় মহিষীগণের সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া প্রভাতে সেই রাজশরীরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই শত শ্লোকে আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য 'অমরুশতক' নামে প্রসিদ্ধ। এই শ্লোকগুলি শান্তির পক্ষেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ৮২০ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে কৈলাসপর্ব্বতে নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করিয়া শঙ্কর স্বর্গে গমন করেন।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমত প্রবর্ত্তক। তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। জগৎ প্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে, সকলই মিথ্যা। যেরূপ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইয়া থাকে এবং রজ্জু বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হইলে ভ্রম নিবারিত হইয়া সর্পভ্রমেরও নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাদ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে; ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া তৎসঙ্গে জগৎপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

শঙ্কু—(১) উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন নামক পণ্ডিতগণের অন্যতম। প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশে ইঁহার বচনসকল প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। (বররুচি দেখ)।

শমরু বেগম—বিখ্যাত দানশীলা খ্রীষ্টান রমণী। ইনি যৌবনের প্রারম্ভে নৃত্যগীতপরায়ণা গণিকা ছিলেন। রেনহার্ট (Reinhardt) নামক এক সাহেব ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে রোমন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করেন। এই স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি অতুল সম্পত্তি লাভ করেন। তৎপর এই রমণী অপর এক ফরাসী জাতীয় ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করেন। এই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শমরুর (Shamruor Sombre) পাণিগ্রহণ করেন। সার্দ্ধনা নামক স্থানে এই রমণীর বিস্তৃত জায়গীর ছিল। ইনি ইংরেজদিগকে অনেক সময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি মৃত্যুর সময় ৬ লক্ষেরও অধিক টাকা নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে অনুমতি দিয়া যান। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী ৮৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শম্ভুজি—মহারাষ্ট্রপতি বিখ্যাত শিবাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৬৫৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট্

আওরঙ্গজেবের কৌশলে শিবাজি দিল্লীতে অবরুদ্ধ হইলে ইনিও পিতার সহিত পলায়ন করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হন (শিবাজি দেখ)। শিবাজির মৃত্যুর পর ইনি ১৬৮০ খৃঃ হইতে ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মোগল-সৈন্তকর্ত্তৃক কৌশলে বন্দী হন এবং দিল্লীতে নীত হইয়া আওরঙ্গজেবের আদেশে ১৬৮৯ খৃঃ অতিনিষ্ঠুরভাবে হত হন। শম্ভুজি মহারাজ শিবাজির অযোগ্য পুত্র। তিনি ইন্দ্রিয়াসক্ত ও মদ্যপায়ী ছিলেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ। শম্ভুনাথ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম সদাশিব। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে পেস্কারের কার্য্য করিতেন। পিতৃব্য নিঃসন্তান ছিলেন; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়া তিনি শম্ভুনাথকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। শম্ভুনাথের স্বাস্থ্য কলিকাতায় ভাল না থাকাতে তিনি লক্ষ্ণৌসহরে মাতুলের নিকট শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। সেথানে কিছু উর্দ্দু ও পার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরেজী শিথিবার জন্য কাশীতে গমন করেন। কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে (Oriental Seminary) ভর্ত্তি হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। এখানে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অনেক উন্নতি লাভ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ২০৲ টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিক্রীজারী-মোহরের পদে উন্নীত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিক্রীজারী সম্বন্ধে একথানা গ্রন্থ লিথেন। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের জজদের প্রশংসাভাজন হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং এই বৎসরের ১৬ই নবেম্বর হইতে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জুনিয়র (Junior) সরকারী উকীল নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সিকলেজে আইনের অধ্যাপক হন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি হাইকোর্টের জজপদে নিযুক্ত হন। লাথেরাজ জমিঘটিত আইন সংস্কারে তিনি প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেস্ পিককে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পৃষ্ঠব্রণ রোগে শম্ভুনাথের মৃত্যু হয়। তিনি স্ত্রীশিক্ষার একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন; তিনিই প্রথম তাঁহার নিজ কন্যাকে বেথুন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। সৌজন্য ও নম্রতার জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি মধুর ছিল; পরদুঃথকাতরতাই তাঁহার হৃদয়ের বিশেষত্ব। তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন; ইহা এখন শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতাল নামে খ্যাত।

শাকটায়ন—একজন প্রাচীন ব্যাকরণ-প্রণেতা ঋষি। ইঁহার রচিত গ্রন্থ দুর্লভ।

শালিবাহন—বর্ষপ্রবর্ত্তক শকজাতীয় রাজা। ইঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দ "শক" নামে বিদিত। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৩৩ শক চলিতেছে।

শাহ্ আলম—দিল্লীর সম্রাট। ইনি সম্রাট ২য় আলমগীরের পুত্র। ইঁহার পূর্ব্ব নাম আলী গোহার; ১৭২৮ খৃঃ ১৫ই জুন ইঁহার জন্ম হয়। বিহারে অবস্থান কালে পিতার অপমৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তিনি দিল্লীতে গমন করেন এবং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর তদীয় মন্ত্রী অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব সুজা-উদ্দৌলার মৃত্যুর পর তিনি এলাহাবাদে গমন করেন এবং তথায় ইংরেজ কোম্পানিকে বাঙ্গালার দেওয়ানী সনন্দ দান করেন (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ ১২ই আগষ্ট)। ইহাতে চুক্তি হইল যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি, সম্রাটকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার আয় হইতে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা দিবেন। সম্রাটের সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লর্ড ক্লাইব কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন; জেনারেল স্মিথ লর্ড ক্লাইবের আদেশে সম্রাটের রক্ষার ভার লইয়া এলাহাবাদে রহেন। তিনি সম্রাটের রক্ষিরূপে থাকিয়া, তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করিতেন। সম্রাটের নহবতের বাদ্য জেনারেল স্মিথের প্রীতিকর না হওয়াতে তিনি উহা বন্ধ করিতে আদেশ দেন। সম্রাটের কর্ম্মচারিগণের এই আদেশ অমান্য

করিতে সাহস হয় নাই। সম্রাট শাহ্ আলম এলাহাবাদ সহরে থাকিতেন, তদীয় রক্ষক জেনারেল স্মিথ এলাহাবাদদুর্গে থাকিতেন। এই অবস্থায় সম্রাট্ ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন; তৎপর ইহা আর তাঁহার ভাল লাগিল না; তিনি ২৫শে ডিসেম্বর দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে সিন্ধিয়াপতি দিল্লী অধিকার করিয়া, উহার শাসন ভার রোহিলা সর্দ্দার গোলামকাদের খাঁর উপর অর্পণ করিয়া কিছুকালের জন্য স্বরাজ্যে গিয়াছিলেন। এদিকে ১৭৮৮ খৃঃ ১০ই আগষ্ট রোহিলা সর্দ্দার গোলাম কাদির খাঁ সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করেন। সিন্ধিয়ারাজ দিল্লীতে আগমন করিয়া শাহ্ আলমের দুর্দ্দশা দেখিয়া আবার তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ১৯শে নবেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

শাহ্ জালাল—বিখ্যাত মুসলমান সাধু। এই ফকির সাহেবের সমাধিমন্দির শ্রীহট্টে বর্ত্তমান আছে। বহু লোক এই সমাধিমন্দিরের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছে। এই মন্দিরের মধ্যে বহুসংখ্যক কবুতর ও অন্যান্য পাখী থাকে, ইহারা অবধ্য; লোকে ইহাদিগকে পবিত্র মনে করিয়া থাকে। সাধু শাহ্ জালাল আরবের অন্তঃপাতী "এমন" প্রদেশে "কণিয়া" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম "মহম্মদ শেখ-উস্-সুযুখ"। ইনি ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং কিয়ৎকাল পরে দিল্লীতে উপনীত হন। তিনি ৩৬০ জন দরবেশ লইয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিন ফেরোজ শাহ্ তোগলক শ্রীহট্টের অন্তর্গত গৌড়খণ্ডের রাজা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে সেকান্দর ও নাসিরুদ্দিন নামক দুইজন সেনাপতিকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। শাহ্ জালাল ইঁহাদের সহিত পথে মিলিত হন। সেনাপতিদ্বয় ইঁহারই পরামর্শে চলিতেন। উক্ত সেনাপতিদ্বয়সহ শাহ্ জালাল শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলে রাজা গৌরগোবিন্দ পরাজয় স্বীকার করিয়া পেঁচাগড় নামক পার্ব্বত্যদুর্গে প্রস্থান করেন। ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে এই শ্রীহট্টবিজয় সঙ্ঘটিত হয়। (গৌরগোবিন্দ দেখ)।

শাহ্ জাহান—ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সম্রাট্। ১৭২৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার শাসন সময়। ইঁহার শাসন সময়ে দিল্লী ও আগরা নগরী বিচিত্র হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। আগরার মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধিসৌধ মমতাজমহাল সৌন্দর্য্যে জগতে অতুলনীয়। ইহার নির্ম্মাণে যে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহা এক্ষণও নির্ণীত হয় নাই। ইহা প্রস্তুত করিতে ২০ হাজার কারিগরকে ২২ বৎসর দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাজমহাল নির্ম্মাণের প্রধান রাজমিস্ত্রি এবং প্রধান চিত্রকর প্রত্যেকে মাসিক এক হাজার টাকা বেতন পাইতেন। ইহা নির্ম্মাণের জন্য নানাদিগ্দেশ হইতে কারিগর আনীত হইয়াছিল। ইহা নির্ম্মাণের জন্য জয়পুর, নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী প্রদেশ, চীন প্রভৃতি স্থান হইতে বিবিধ বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর এবং বাগদাদ, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতে সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি বহুমূল্যে ক্রীত হইয়া আনীত হইয়াছিল। শাহ্ জাহানের মতি মস্‌জিদও সৌন্দর্য্যে জগতের সকল উপাসনা মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আগ্রার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শাহ্ জাহান দিল্লীতে আসিয়া বাস করেন। এখানে আসিয়া জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন; এই মসজিদ্ নির্ম্মাণে ৬ বৎসর লাগিয়াছিল। তৎপর দেওয়ান-ই-খাস অর্থাৎ খাস দরবার নামক প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়; এই সকল প্রাসাদ এখনও বিচিত্র ভাস্কর কার্য্যের পরিচয় দিতেছে।

তাজমহাল প্রাসাদ শাহ্ জাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের সমাধির উপর নির্ম্মিত। এই মহিলার পূর্ব্বনাম আর্জ্জুমন্দবানু। ইনি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যসম্পন্না জাহাঁগীর-মহিষী নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী। নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী কন্যা আর্জ্জুমন্দবানুকে প্রথমে জামাল খাঁ নামক একজন আমীরের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন।

দিল্লীতে মুসলমান সম্রাটদিগের অন্তঃপুরে খোসরোজ নামে এক উৎসব প্রতিবৎসর সমাহিত হইত। খোসরোজ স্ত্রীলোকদের মেলা। দিল্লী, আগরা প্রভৃতি সহরের রাজা, মহারাজ, আমীর ও ওমরাহগণ সম্রাটের পরওয়ানা পাইয়া তাঁহাদিগের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যা ও ভগিনীগণকে এই মেলাতে পাঠাইতেন। জামাল খাঁও, তাহার সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া লাবণ্যময়ী পত্নী আর্জ্জুমন্দবানুকে খোস্‌রোজে প্রেরণ করিতেন। এই মেলাতে সম্রাট পরিবারের পুরুষ ভিন্ন অন্য

কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজকুমার খরম পরম সুন্দরী আর্জ্জুমন্দের লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট কোন জিনিষ ক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইলেন। আর্জ্জুমন্দ একখণ্ড মিছরি দেখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার নিকট আর কোন জিনিষ নাই, সব বিক্রীত হইয়াছে; কেবল উপযুক্ত ক্রেতার অভাবে ইহাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। রাজকুমার উহাই বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া লইলেন। আলাপের সময় উভয়ের মধ্যে প্রাণের বিনিময় হইল, একে অন্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। পরস্ত্রী হইয়াও আর্জ্জুমন্দ রাজকুমারের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন। যুবরাজ আর্জ্জুমন্দকে নিজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন; তথাহইতে নৃত্যগীতাদির পর গভীর রাত্রিতে আর্জ্জুমন্দ বাড়ী ফিরিলেন। আর্জ্জুমন্দের স্বামী পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যাগের পর যুবরাজ আর্জ্জুমন্দকে মুসলমানের শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করেন। যুবরাজ উদয়পুরের রাণাকে পরাজিত করিয়া সম্রাট্ কর্ত্তৃক শাহ্জাহাননামে ভূষিত হন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঁগীরের মৃত্যুর পর শাহ্জাহান শ্বশুর আসফ খাঁর সাহায্যে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নূরজাহানের ইচ্ছা ছিল যে, রাজকুমার শাহরিয়ার সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়; যেহেতু শাহরিয়ার নূরজাহানের গর্ভজাত ও তদীয় পূর্ব্বস্বামীর (শের আফগানের) ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শাহ্জাহানও অল্প সহায়সম্পন্ন ছিলেন না; তিনি নূরজাহানের সহোদর আসফ খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশেষে শাহ্জাহানেরই জয় হয়; তিনি আসফ খাঁর সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহ্জাহান সম্রাট্ হইয়াই নবপরিণীতা আর্জ্জুমন্দকে মমতাজমহল নাম দেন। সম্রাট্ শাহ্জাহান তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। মমতাজ তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার প্রসবকালে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাট্ শাহ্জাহান প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতি-রক্ষার্থ তাঁহার সমাধির উপর আগ্রা নগরে তাজমহল নামে মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত ও নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরখচিত এই সুবৃহৎ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৮৬০ ফুট ও প্রস্থে ১০০০ ফুট ভূমির উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া পার্থিব প্রেমের প্রবল আসক্তির বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। শাহ্জাহান ৩০ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু বৃদ্ধকালে ১৬৫১ খৃঃ ৯ই জুন তারিখে তদীয় পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁহাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করিয়া স্বয়ং সম্রাট্ হন। শাহ্জাহান দীর্ঘকাল কারাকষ্ট ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খৃঃ ২৩শে জানুয়ারি সোমবার দেহত্যাগ করেন। কারারুদ্ধ হওয়ার সময় তাঁহার ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা বর্ত্তমান ছিল। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশেকোকে ও চতুর্থ পুত্র মোরাদবক্সকে নিহত করেন। দ্বিতীয় পুত্র (সুলতান) শাহ্‌শুজা ঢাকার নবাব ছিলেন; তাঁহার সময়ে ঢাকার বিখ্যাত হুসেনীদালান ও বড় কাটরা নির্ম্মিত হয়। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্‌লা কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া শুজা আরাকাণে পলায়ন করেন; কিন্তু তত্রত্য রাজার বিশ্বাসঘাতকতায় সপরিবারে নিহত হন। শাহ্জাহানের কন্যাগণের নাম আঞ্জুমন-আরা, গায়তি-আরা, জাহান-আরা ও রোশন-আরা। (জাহান-আরা দেখ)।

শাহ্ মীর—কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান রাজা। ইনি ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের তদানীন্তন রাজা শীনাদেবের (Seina Deva) অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। এই রাজার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রঞ্জনদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহ্মীর রঞ্জনদেবের প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। রঞ্জনদেবের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আনন্দদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। আনন্দদেবও শাহ্মীরকেই প্রধান মন্ত্রী রাখেন। আনন্দদেব এই মন্ত্রীর প্রবল ক্ষমতা দর্শনে ঈর্ষ্যাযুক্ত হন এবং তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মন্ত্রীর সহিত বহু সৈন্য ও সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে রাজা হত হন (১৩২৭ খৃঃ)। শাহ্মীর আবার মন্ত্রী হন; রাণীর নামে রাজকার্য্য চলিতে থাকে। কিছুকাল পরে শাহ্মীর রাণীকে বিবাহ করেন। শাহ্মীর সুলতান সামসউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরের রাজা হন (১৩৪১ খৃঃ)। কেহ কেহ বলেন যে, রাজার মৃত্যুর পর রাণী সহচরীগণসহ শাহ্মীরের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে দুষ্কার্য্যের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করেন। শাহ্মীর এই ঘটনার পরে সিংহাসন অধিকার করিয়া সুলতান সামস্-উদ্দিন নাম গ্রহণপূর্ব্বক কাশ্মীর শাসন করিতে থাকেন।

শাহ্ সুফী—মুসলমান সাধু। আগ্রার অন্তর্গত ফিরোজাবাদ পরগণায় সুফীপুর নামক স্থানে ইহার সমাধিমন্দির

(দরগা) বর্ত্তমান আছে। সম্রাট্ আকবরের সময় এই ফকির সাহেব ইস্পাহান হইতে ভারতে আসেন এবং চান্দোয়ার রাজ্যে এক বনমধ্যে বাস করেন। এই রাজ্যের রাজা চন্দ্রসেন ফকির সাহেবকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ফকির সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া রাজা ও তৎপারিষদ্বর্গ বিস্মিত হইতেন। নির্দ্দিষ্ট কর না দেওয়ায় সম্রাট্ আকবর চান্দোয়ার রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি কিছুতেই চান্দোয়ার দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। রাত্রিতে প্রবল ঝড়ে সম্রাটের ছাউনীর সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল অদূরে ফকির সাহেবের কুটীরের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই। ইহাতে আকবরের প্রধান কর্ম্মচারিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফকির সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা ফকির সাহেবকে ঈশ্বরানুগৃহীত মনে করিলেন। ফকির সাহেবও নিজকে ঐরূপই মনে করিতেন। তাঁহার কৃপা মোগল সম্রাটের উপর পতিত হইল। তিনি সম্রাটকে বলিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট তারিখে চন্দ্রসেনের দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইবে। এ দিকে ফকির সাহেব চন্দ্রসেনকে ডাকিয়া বলিলেন যে, কিছুতেই দুর্গ রক্ষা হইবে না। অতএব সপরিবারে বহুমূল্য দ্রব্যজাতসহ তিনি ফকির সাহেবের পরামর্শে রাজ্যত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গেলেন। এই কার্য্যের জন্য সম্রাট ফকির সাহেবকে একখানা গ্রামের অর্দ্ধ দান করেন। এই গ্রাম এখন সুফীপুর নামে খ্যাত।

শাহাব্-উদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরী—ইনি ঘোরের সোলতান গয়াস্-উদ্দিন মোহাম্মদের কনিষ্ঠ সহোদর। সোলতান গয়াস্-উদ্দিন ইঁহাকে ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে গজনীর শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। ইনি খোরাসান ও ভারতের অনেক স্থান জয় করেন। ইনি আজমীরের নরপতি পৃথ্বীরাওর সহিত দুইবার যুদ্ধ করেন। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাও ও দিল্লীর রাজা খান্দেরাও পরাজিত, বন্দীকৃত ও নিহত হন। সোলতান গয়াস্-উদ্দিন ১২০৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন এবং শাহাব্-উদ্দিন ভ্রাতার স্থানে ঘোরের সোলতান পদে অভিষিক্ত হন। ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর রাজ্য ও ভারতের অধিকৃত প্রদেশ ইঁহার অধীন থাকে। পরে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে গজনীর পথে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া ইনি নিহত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গয়াস্-উদ্দিনের পুত্র গয়াস উদ্দিন মাহ্মুদ ঘোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন—এই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাণিয়াচঙ্গগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং ব্যাকরণে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষাদিতেও ইঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি ১৮১৬ শকে আষাঢ় মাসে পরলোক গমন করেন।

শিবসিংহ—স্বর্গদেব শিবসিংহ আহম্ রাজ রুদ্রসিংহের পুত্র এবং গদাধর সিংহের পৌত্র। তিনি পিতার আদেশক্রমে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভট্টাচার্য্য নীলাচলে (কামাখ্যা শৈলে) থাকিবার অনুমতি পাইলেন। কামাখ্যা ও অন্যান্য দেবালয়ের পূজাদির কোন সুব্যবস্থা ছিল না; ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই সকল দেবতার পূজা-বিধি স্থির করিয়া দেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্বর্গদেব শিবসিংহ অনেক ব্রহ্মোত্তর এবং অনুরূপ বৃত্তি দান করেন। ইঁহার সময়েই বরপেটাসত্রের এবং কামাখ্যা মন্দিরের পূজক সকলের বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। শিবসিংহ গৌরীসাগর ও শিবসাগর দীর্ঘিকা এবং কানু গাঁ এর মন্দির এবং তাঁহার ধাইমাতার (ধাই আনি) নামে এক পথ নির্ম্মাণ করেন। শিবসাগর দীর্ঘিকার নামানুসারে জেলার নাম শিবসাগর হয়। রাজা এবং রাণী ফুলেশ্বরীর শাক্তধর্ম্মে অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। রাজা শিবসিংহের প্রতিমূর্ত্তির সহিত রাণী ফুলেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রাতে অঙ্কিত হইত। তিনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৬৬ শকে (ইং ১৭৪৪ খৃ:) ২৪শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ তিথিতে স্বর্গারোহণ করেন।

শিবাজী—রাজা শাহজি ভোসলার পুত্র। রাজা শাহজি তদানীন্তন মহারাষ্ট্রমণ্ডলে একজন পরাক্রান্ত বীর ও উদারচেতা পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। পরেও তৎপুত্র ছত্রপতি শিবাজি ও বালাজি বিশ্বনাথ ব্যতীত তাহার ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি মহারাষ্ট্রমণ্ডলে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। শিবাজির জন্মের প্রাক্কালে রাজা শাহজি আহমদনগরের সোলতানের চাকরী করিতেন। উক্ত সোলতানের পক্ষ হইতে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় তিনি অন্তর্বর্ত্তী স্ত্রী জিজাবাইকে শিউনেরী নামক একটী দৃঢ়

দুর্গে রাখিয়া যান। শিউনেরী পুণার ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই শিউনেরী দুর্গে ১৬২৭ খৃঃ বৈশাখ মাসের ২রা শুক্রবার শিবাজি জন্মগ্রহণ করেন। রাজা শাহজির দুই স্ত্রী; প্রথমা জিজাবাই (জন্ম ১৫৯৬ খৃঃ, বিবাহ ১৬০৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৭৪ খৃঃ); দ্বিতীয়ার নাম তুকাবাই। শিবাজির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শম্ভুজি। শিবাজির মাতা শিউনেরী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবাই দেবীর নামানুসারে পুত্রের নাম শিবাজি রাখিয়াছিলেন। ১৬৩৭ খৃঃ আহমদনগর রাজ্য ধ্বংস হইলে পর রাজা শাহজি বিজাপুরের সোলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সোলতান বিষয়কর্ম্মে শাহজির দক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহাকে রাজা উপাধি দেন। এই সময় তিনি জিজাবাই ও শিবাজিকে বিজাপুরে লইয়া যান। তথায় ১৬৩৭ খৃঃ সইবাইনাম্নী একটী উচ্চবংশীয়া মহিলার সহিত শিবাজির শুভ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। সই বাইর গর্ভে ১৬৫৭ খৃঃ শিবাজির এক পুত্র হয়। তাহার নাম শম্ভুজি রাখা হয়। শিবাজি বাল্যকাল হইতেই মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। এজন্য তিনি পিতার অনুরোধসত্ত্বেও বিজাপুরের সোলতানের সহিত প্রথমতঃ সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন নাই; কিন্তু অবশেষে পিতার পীড়াপীড়িতে তাহাকে সোলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইয়াছিল। সোলতান অল্পবয়স্ক শিবাজির সাহস ও তেজস্বিতা দেখিয়া তাহাকে একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করতঃ সম্মানিত করেন। সোলতান-বিদ্বেষী স্বাধীনতাপ্রিয় পুত্রকে বিজাপুরে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া শাহজি তাহাকে পুণায় পাঠাইয়া দেন। জিজাবাইও পুত্রকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে অসম্মত হওয়ায় পুত্রের সহিত পুণাতে গিয়া বসতি করেন। রাজা শাহজি স্ত্রীপুত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারীকে পুণায় প্রেরণ করেন। শাহজি একজন ধনিলোক, তিনি বিজাপুরের সোলতানের নিকট হইতে বহুগ্রাম জায়গীরস্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা বিজাপুরে থাকিতে হইত, এজন্য দাদোজি কোণ্ডদেব নামে এক মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর উপর উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। শিবাজি পুণায় আসিয়া দাদোজি কোণ্ডদেবের অধীনে থাকিয়া রীতিমত ব্যায়াম ও অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। শিবাজি জীবনে লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিক্ষা করেন নাই। তখনকার মহারাষ্ট্রীয়েরা লেখাপড়া কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে মনে করিতেন না। শারীরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিবাজির মুসলমান বিদ্বেষ ও স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। শিবাজি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সৈন্য ও অর্থের প্রয়োজন; পিতার প্রচুর অর্থ ছিল; কিন্তু পিতা তাঁহার মতের বিরোধী। এজন্য শিবাজি দস্যুদলে প্রবেশ করিলেন এবং অত্যল্পকালমধ্যেই দস্যুদলের নেতা হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রধানতঃ মুসলমানের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন। তিনি গো, ব্রাহ্মণ, অনাথ, ফকির, কৃষক ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে অনুচরদিগকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। শিবাজির চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ ছিল।

১৬৪৮ খৃঃ একজন মুসলমান সুবাদার সসৈন্যে বিজাপুরে যাইতেছিলেন। শিবাজির সৈন্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। উক্ত সুবাদারের পরমাসুন্দরী পুত্রবধূ ধৃত হয়, কিন্তু শিবাজি সসম্মানে তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বিজাপুরে পাঠাইয়া দেন। শিবাজি বিজাপুরের অধিকারেও উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। সহসা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন হইতে না হয়, এজন্য শিবাজি সহ্য পর্ব্বতের দুর্গম প্রদেশস্থিত টর্ণা, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি অজেয় গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া তথা হইতে নানাস্থানে সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বিজাপুরের সোলতান শিবাজিকে স্বপক্ষ করিবার জন্য তাঁহার পিতাকে বন্দী করিলেন। শিবাজি তদানীন্তন দিল্লীর বাদসাহ শাহ্‌জাহানের শরণাপন্ন হইলেন। শাহ্‌জাহানের আদেশে শাহজি কারামুক্ত হইলেন। ১৬৫৯ খৃঃ বিজাপুরের সোলতান শিবাজির বিরুদ্ধে আফজল খাঁকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। শিবাজি আফজল খাঁর সহিত সন্ধির প্রস্তাব তুলিয়া হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক হত্যা করেন। অতঃপর সেনাপতিবিহীন আফজল-সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া বিজাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এই সময়ে ময়ূর-সিংহাসন লইয়া সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সুযোগে শিবাজি নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলেন এবং মোগল বাদশাহের

অধিকৃত নানাস্থান আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। শিবাজিকে শাসন করিবার জন্য নূতন সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার স্বীয় মাতুল সায়েস্তা খাঁকে আদেশ করেন। কিন্তু শিবাজি অতর্কিতভাবে সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ অতিকষ্টে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল শিবাজির আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ১৬৬৪ খৃঃ শিবাজি রাজোপাধিগ্রহণপূর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দিল্লীর সম্রাট্ আওরঙ্গজেব জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। জয়সিংহের নিকট পরাজিত হইয়া শিবাজি তাঁহার পরামর্শানুসারে ১৬৬৬ খৃঃ দিল্লীতে আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হন। আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি অসম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক শিবাজিকে একপ্রকার বন্দীভাবে রাখেন। কিছুকাল পরে শিবাজি কৌশলপূর্ব্বক দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া ছদ্মবেশে নিজ রাজ্যে উপস্থিত হন। রাজ্যে আসিয়াই তিনি দিল্লীর সম্রাটের অধিকৃত বহুস্থান লুণ্ঠন করেন এবং ১৬৭৪ খৃঃ তিনি মহাসমারোহে রায়গড়ে মহারাজ (ছত্রপতি) উপাধি গ্রহণ করেন। রায়গড়ে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় রাজ্যের ব্রাহ্মণ, বড় বড় পণ্ডিত এবং বৈদিক ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদিগকে যানাদি প্রেরণপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে যেরূপে রাজ্যাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপে শিবাজির অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শিবাজির রাজ্য বহু বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার রাজকোষে দশ কোটী মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছিল ; তাঁহার সৈন্যগণ যথাশাস্ত্র হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চতুরঙ্গ সমন্বিত হইয়াছিল। ১৬৮০ খৃঃ শিবাজির মৃত্যু হয়। শিবাজি একটী মহাপরাক্রান্ত জাতির সৃষ্টি করিয়া বিস্তীর্ণ স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শিবাজির চরিত্রে অলসতা, ইন্দ্রিয়াসক্ততা প্রভৃতি দোষের লেশ মাত্রও ছিল না। সত্য ও ন্যায় তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে, সেনা ও মন্ত্রিগণের প্রতি সদয় ব্যবহারে শিবাজি সতত যত্নপর ছিলেন।

শিবানন্দ সেন—ইঁহার পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকণপূর উপাধি পাইয়াছিলেন। এই পুত্র ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পরমানন্দ জাতিতে বৈদ্য ; নিবাস কাঞ্চনপল্লী গ্রাম (বর্ত্তমান কাঁচারাপাড়া)। ইনি বিখ্যাত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা। এই নাটক ব্যতীত পরমানন্দ আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীদিগের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখা না হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত অসম্পূর্ণ এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক লীলা অপ্রকাশিত থাকিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ২। চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য। ৩। আনন্দবৃন্দাবন চম্পু। ৪। অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা। ৬। বৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা। ৭। আর্য্যা শতক।

মহাপ্রভু ইঁহাকে “কবিকর্ণপুর” উপাধি দান করিয়াছিলেন।

শিহ্লন—শান্তি-শতকপ্রণেতা। ইনি দ্বিতীয় চোর কবি বিহ্লনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। (বিহ্লন দেখ)।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—বিখ্যাত বাগ্মী ও সুলেখক। ইনি ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিম-পাড়া গ্রামনিবাসী কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। কাশীকান্ত ঢাকার জজ আদালতের উকীল ছিলেন ; তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। কাশীকান্তের ৪ পুত্র ; তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্যামাকান্তই কেবল হিন্দুসমাজে ছিলেন, অপর তিন পুত্র স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শীতলাকান্ত ১৭ বৎসর বয়সে ব্রাহ্ম হন। ২০ বৎসর বয়সে পঞ্জাবের বিখ্যাত দেশহিতৈষী দয়ালসিংহের প্রতিষ্ঠিত “ট্রিবিউন” নামক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক হন। এই সম্পাদক পদে থাকিয়া তিনি অতি যোগ্যতার সহিত উক্ত পত্রিকা পরিচালিত করেন। তিনি পঞ্জাব প্রদেশের বহু জন-হিতকর কার্য্য করেন। ৪ বৎসর শিরঃপীড়া ভোগ করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সালের ২রা মাঘ ৪১ বৎসর বয়সে শীতলাকান্ত দেহত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার মধ্যে নবকান্ত ঢাকা জুবিলী স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করেন। অপর ভ্রাতা নিশিকান্ত ইয়োরোপে গমন করিয়া জর্ম্মাণী হইতে Ph. D. উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নিশিকান্তও পরলোক গমন করিয়াছেন।

শুদ্ধোদন—কপিলাবস্তুর রাজা ও জগদ্বিখ্যাত বুদ্ধদেবের জনক। (বুদ্ধদেব দেখ)।

শুভঙ্কর—কায়স্থকুলোৎপন্ন বঙ্গের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। শুভঙ্কর বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজার মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিত্যব্যবহারোপযোগী অঙ্কসমাধানের জন্য কতকগুলি সহজ নিয়ম বাহির করেন। নিয়মগুলি পদ্যের আকারে লিখিত এবং ইহা 'শুভঙ্করী আর্য্যা' নামে বঙ্গীয় জনগণের নিকট পরিচিত। তৈল, লবণ, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি বিক্রেতা দোকানদারেরা এই শুভঙ্করী নিয়মের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে দ্রব্যের মূল্য নির্ণয় করিয়া থাকে।

শূজা (সোলতান)—সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র। সোলতান শূজা ১৬৬১ খৃঃ ১২ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আরাকান রাজ্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন। দুই বৎসর তথায় অবস্থানের পর তথাকার রাজা ইঁহাকে সপরিবারে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকাসহ নদীর মধ্যভাগে জলনিমগ্ন করেন। এই শোচনীয় ঘটনা ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হয়।

শূদ্রক—প্রসিদ্ধ মৃচ্ছকটিক নামক সংস্কৃত নাটক ইঁহার রচিত বলিয়া সকলে জানে। এই নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে, "গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, অগাধবুদ্ধিশালী শূদ্রক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।" অতঃপর লিখিত হইয়াছে, "শূদ্রক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া এবং একশত বৎসর দশ দিবস আয়ুলাভ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন।" যিনি অগাধ বুদ্ধিশালী কবি, তিনি কেন নিজকে "গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতে যাইবেন, আর অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগের পর কিরূপে তিনি স্বীয় গ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখিতে বসিলেন? ইহাতে নিশ্চয় উপলব্ধি হয় যে, শূদ্রক এই নাটক রচনা করেন নাই। তিনি অন্য কোন কবি দ্বারা এই গ্রন্থ লেখাইয়া স্বীয় নামে প্রচারিত করিয়াছেন। রাজা শ্রীহর্ষের সম্বন্ধেও এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে (শ্রীহর্ষ দেখ)। শূদ্রক খৃষ্টের পূর্ব্বে প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। (মার্শম্যান কৃত ইতিহাস ৬২ পৃ)

শূলপাণি—বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত। ইনি মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।

শেরশাহ্—দিল্লীর সম্রাট্ ও বর্ত্তমান পাটনা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনকে পরাভূত ও রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট হন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম ফরিদ। ইনি শেরশাহ্ নাম গ্রহণপূর্ব্বক ১৫৪২ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার পিতা হাসান, আফগান জাতীয় সুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদ প্রথমে বিহারের রাজা মোহাম্মদ লোহানীর কর্ম্মচারী ছিলেন এবং এক ব্যাঘ্র নিজ হস্তে নিহত করাতে তাঁহার মুনিব তাঁহাকে শের খাঁ উপাধি দান করেন। ইনি সম্রাট্ হুমায়ুনকে প্রথমে বিহারে পরাভূত করেন (১৫৩৯ খৃঃ ২৬শে জুন), তৎপর বৎসর কনোজে (কান্যকুব্জে) পরাভূত করেন (১৫৪০ খৃঃ ১৭ই মে)। এই স্থানে পরাভূত হইয়া হুমায়ুন শের খাঁ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইতে লাগিলেন। হুমায়ুন আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে পারস্যে উপনীত হন। শের খাঁ দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকার করেন। ১৫৪৭ খৃঃ শের কলিঞ্জার নামক স্থানে সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিতে গমন করেন। দুর্গ অধিকৃত হইল, কিন্তু বারুদাগারে অগ্নি লাগাতে তাঁহার শরীর দগ্ধ হইল; তিনি অনতিবিলম্বে যাতনায় ছটফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (১৫৪৮ খৃঃ ২৪শে মে)। (হুমায়ুন দেখ)।

শেষাদ্রি আয়ার (সার)—(Sir K. Sheshadri Aiyar K. C. S. I.) মহীশূর রাজ্যের বিখ্যাত দেওয়ান। সার শেষাদ্রি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন দাক্ষিণাত্যে মালবার জেলায় কুমারপুরম্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালিকটে প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপর তিনি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিকলেজে ভর্ত্তি হন। এই কলেজ হইতে তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. উপাধিধারী। কয়েক বৎসর পরে তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালিকটের কালেক্টরের আফিসে অনুবাদকের কর্ম্মগ্রহণ করেন। এই কার্য্যে তিনি অধিক দিন থাকেন নাই। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে রঙ্গচার্লুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আলাপের কিছুদিন পরে রঙ্গচার্লু মহীসুরের দেওয়ান হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গচার্লু শেষাদ্রিকে

মহীসুরের অন্তর্গত অষ্টগ্রাম বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শেষাদ্রি তুম্‌কার জেলার ডেপুটী কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইহার পর দেওয়ান রঙ্গচার্লু মহীসুর রাজ্যের জন্য আইন তৈয়ার করিবার ভার ইঁহার উপর অর্পণ করেন। দুই বৎসর পর রঙ্গচার্লু দেহত্যাগ করেন। এই পদ পূরণ করিতে মহীসুর রাজ্যে শেষাদ্রি অপেক্ষা যোগ্যতর লোক ছিল না। কিন্তু এই সময়ে শেষাদ্রির বয়স ৩৮ বৎসর মাত্র। এই জন্য অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইতে পারিবেন না। যাহাহউক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারি ৩৮ বৎসর বয়সে শেষাদ্রি দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে মহীসুর-রাজ ত্রিশলক্ষ টাকা ঋণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ বিপদে আর কখনও পড়িতে না হয় এজন্য রঙ্গচার্লু দেওয়ান হইয়াই রেলওয়ে নির্ম্মাণ কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রঙ্গচার্লুর মৃত্যু হইলে শেষাদ্রি তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন। তিনি দুই বৎসরের মধ্যে ১৪০ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। এই কার্য্যে আরও বিশ লক্ষ টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহীসুর রাজ্যে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩১৪ মাইল হইল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল হইয়াছিল। তাঁহার শাসন সময়ের প্রথম ১২ বৎসর তিনি কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য ৫৫৫ বর্গমাইল স্থানে খাল খনন করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে রাজ্যের ৮২৫০০০৲ টাকা আয় বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেওয়ানি পদ গ্রহণের সময় রাজসরকারের ত্রিশলক্ষ টাকা ঋণ; ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকোষে ১৭৬০০০০০৲ টাকা জমা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের আয় ১০৩০০০০০৲ টাকা ছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের আয় ১৮০০০০০০৲ টাকা হইয়া উঠে। তিনি টেক্‌স বাড়াইয়া বা প্রজার রক্তশোষণ করিয়া এই আয় বৃদ্ধি করেন নাই। তিনি রাজ্যে নানারূপে শিক্ষার বিস্তার করেন। ভূতত্ত্ব আলোচনা বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, রসায়ন বিভাগ, আবহবিদ্যা বিভাগ (Meteorological department) এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিভাগ, এই সমুদয় বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন করিয়া রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সি. এস. আই (C. S. I) এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কে. সি. এস. আই (K. C. S. I) উপাধি দান করেন। তাঁহার নিজের মনিব মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ তাঁহাকে রাজধুরন্ধর" উপাধি দান করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে "ফেলো" (Fellow) নির্ব্বাচিত করেন। ৩২ বৎসর কার্য্য করিয়া তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এই ৩২ বৎসরের মধ্যে তিনি ১৭ বৎসর কাল দেওয়ান ছিলেন। সার শেষাদ্রির ন্যায় কোন ব্যক্তি এত দীর্ঘকাল কোন রাজ্যে দেওয়ানি করেন নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি স্বর্গে গমন করেন। তিনি অত্যন্ত চরিত্রবলসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য লোকদিগকে তাঁহার সহকারিপদে নিযুক্ত করিতেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় তিনি চারি লক্ষ টাকা নগদ ও মাসিক দুই হাজার টাকা পেন্সন প্রাপ্ত হন। তিনি ধার্ম্মিক ও পরব্রহ্মপরায়ণ লোক ছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক তিনি এক ব্যাঘ্রচর্ম্মে গাত্র আবৃত করিয়া বাটীর কোন নিভৃত স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার শবদেহ অগ্নিসংস্কারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে রাখা হইয়াছিল।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্য্যদর্শন শাস্ত্রের ফেলোসিপের বৃত্তিদাতা।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—ইঁহার রচিত দায়ভাগের টীকা, কাব্য প্রকাশের টীকা এবং শ্রাদ্ধ বিবেকের টীকা বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত· ইনি পদাঙ্কদূতের অনুকরণে চন্দ্রদূত নামক খণ্ডকাব্য রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র—ইনি "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাকে কেহ কেহ কেশব মিশ্র কহিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—ইনি নবদ্বীপবাসী। ইনি ১৬৪৫ শকে পদাঙ্কদূত নামে একখানা খণ্ডকাব্য রচনা করেন।

শ্রীচন্দ্র—বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নানকের পুত্র। শ্রীচন্দ্র উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি অল্পবয়সেই সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শ্রীধরস্বামী—ভগবদ্গীতার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। ইনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় ভাষ্য রচনা করেন; এজন্য বোধ হয় ইনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী। ইনি বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতেরও টীকা রচনা করেন।

শ্রীনিবাস—বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য। ইনি শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং সর্ব্বদা হরিনামে মত্ত থাকিতেন।

শ্রীপতিদত্ত (মহামহোপাধ্যায়)—বিখ্যাত কলাপ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট রচয়িতা।

শ্রীহর্ষ—মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (আদিশূর দেখ)। ইনি বঙ্গের মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহারই সন্তান উৎসাহ ও গরুড় মুখোপাধ্যায় প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি আদিশূরের সমসাময়িক লোক এবং বোধ হয় ১০০০ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীহীর; মাতা মামল্লদেবী। ইনি নৈষধচরিতনামে নানাগুণালঙ্কৃত, রসযুক্ত, মনোরম কাব্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত "গৌড়োর্ব্বীশ-কুলপ্রশস্তি", "অর্ণববর্ণনকাব্য", "নবসাহসাঙ্ক চরিত" ও "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" নামক গ্রন্থ চতুষ্টয় লিখিয়াছেন; কিন্তু এই চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" ব্যতীত অপর তিন খানি গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বোধ হয় জনসাধারণের নিকট এই সমুদয় গ্রন্থের আদর ছিল না। যে যে রাজবংশের গুণাবলী এই সমুদয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছিল, সেই সেই রাজভবনেই গ্রন্থগুলি রক্ষিত হইত; পরে মুসলমানদিগের আক্রমণে রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, তৎসঙ্গে গ্রন্থগুলিও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া থাকিবে। "নৈষচরিত" শ্রীহর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য; ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পত্তি। এই কাব্যে "গৌড়োর্ব্বীশ-কুলপ্রশস্তি" ও "অর্ণববর্ণন" কাব্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীহর্ষ নিশ্চয়ই কান্যকুব্জে বসিয়া গৌড়ীয় রাজগণের বৃত্তান্ত লিখেন নাই, অথবা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াও অর্ণববর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গৌড়ে আসিয়া সাগরসঙ্গম দর্শনপূর্ব্বক "অর্ণববর্ণনকাব্য" লিখিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। অতএব ইহা একরূপ নিশ্চয় যে, শ্রীহর্ষ গৌড়ে আসিয়া তদীয় "নৈষধচরিত", গৌড়র্ব্বীশ-কুলপ্রশস্তি" ও "অর্ণববর্ণনকাব্য" লিখিয়াছিলেন। আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত তদানীন্তন রাজধানী রামপাল নামক স্থানেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞেই কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় এই রামপাল নামক স্থানেই "নৈষধচরিত" রচিত হইয়াছিল। (বল্লাল সেন দেখ)।

(২) কান্যকুব্জাধিপতি। ইঁহার প্রকৃত নাম হর্ষবর্দ্ধন। ইনি একজন দিগ্বিজয়ী রাজা; ইনি একসময়ে হিন্দু ও অন্য সময়ে বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহার সভায় কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচয়িতা বিখ্যাত কবি বাণভট্ট বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম প্রভাকর বর্দ্ধন। শ্রীহর্ষ দিগ্বিজয়ী রাজা হইয়া নাটক লিখিবেন ইহা সম্ভবপর নহে; কিন্তু স্বনামে গ্রন্থপ্রচার করিয়া যশোলাভ করা বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায় হইয়াছিল; এজন্য লেখককে প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া "রত্নাবলী" নাটিকা ও "নাগানন্দ" নাটক নিজনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ধাবক নামে কবি রত্নাবলী রচনা করিয়া শ্রীহর্ষ হইতে বহুধন লাভ করিয়াছিলেন। "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিবধনম্।" (কাব্যপ্রকাশ)। কাব্যপ্রকাশের টীকায় বৈদ্যনাথ লিখিতেছেন:—"শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞোনাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্যকবির্বহুধনং লেভে ইতি প্রসিদ্ধম্।" প্রকাশাদর্শে মহেশ্বর বলিতেছেন, "শ্রীহর্ষোরাজা ধাবকেন রত্নাবলীনাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্"। (হর্ষবর্দ্ধন দেখ)।

স

সংযুক্তা—পৃথ্বীরাজের মহিষী ও কনোজাধিপতি জয়চাঁদের কন্যা। ইনি ১১৭০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯০ খৃঃ পৃথ্বীরাজ ইঁহাকে বিবাহ করেন। ১১৯৩ খৃঃ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও শত্রু হস্তে বন্দী হইলে, সংযুক্তা জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করেন। পতিপরায়ণা বীররমণী যুদ্ধগমনোন্মুখ পতিকে স্বহস্তে বীরসাজে সজ্জিত করিয়াছিলেন।

সংসারচন্দ্র সেন (রাও বাহাদুর, সর্দ্দার, এম্‌. ভি. ও.)—জয়পুরের মহারাজের বিখ্যাত বাঙ্গালী মন্ত্রী। ইনি ১৮৩১ শকের ২৮শে বৈশাখ (১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই মে বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সন) মঙ্গলবার ৬১ বর্ষ বয়সে জয়পুরে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মন্ত্রিত্বে জয়পুরের সমৃদ্ধি ও সম্মান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। ৪৩ বৎসরকাল ইনি জয়পুরের মহারাজের দরবারে কার্য্য করিয়াছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইনি প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। ইঁহার চরিত্র ও গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ ইঁহাকে জায়গীর ও বংশানুক্রমিক সর্দ্দার উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অচলা প্রভুভক্তি ও প্রজাহিতৈষণার প্রভাবে জয়পুরাধিপতির শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি ইংরেজদিগের ও জয়পুরের জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রাওবাহাদুর উপাধি দান করেন। (কান্তিচন্দ্র দেখ)।

সনাতন গোস্বামী—চৈতন্যদেবের জনৈক পরম ভক্ত পার্শ্বচর। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোভাব হয়। বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধু ও শ্রীচৈতন্যের অন্যতম ভক্ত পার্শ্বচর রূপগোস্বামী ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইনি উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত সংসারাসক্ত হইয়া উঠেন। সনাতন, বিষয়ে এত আসক্ত হইয়াছিলেন যে, একদা কোন ব্রাহ্মণকে বাস্তুভিটা হইতে উৎখাত করিতেও সঙ্কোচ মনে করেন নাই। উক্ত দরিদ্র ভদ্রলোকটী নিরুপায় হইয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ রূপগোস্বামীর শরণাগত হন। রূপ এই ব্যক্তির নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া কনিষ্ঠ সনাতনের নিকট "যরী, রলা. ইরং, নয়" পত্রে এই আটটী অক্ষর লিখিয়া উহা এই ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া ভ্রাতার নিকট পাঠাইলেন। এই আট অক্ষরে সনাতন একটী শ্লোক পূর্ণ করেন শ্লোকটী এই:—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
নশ্বরজগদিদমবধারয় ॥"
(ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ইতি পাঠান্তরম্‌।)

এই শ্লোকের মর্ম্ম অবগত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি দুর্ব্যবহার স্মরণপূর্ব্বক মর্ম্মপীড়িত হইলেন। তাঁহার মনে বিবেকের উদয় হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে স্বীয় আবাসে স্থাপনপূর্ব্বক সংসারত্যাগী হইলেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি জীবন সার্থক বোধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি ধর্ম্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত করেন। রূপের কনিষ্ঠ বল্লভ। বল্লভের পুত্র বিখ্যাত ভক্ত পণ্ডিত জীবগোস্বামী। সনাতন গোস্বামী প্রণীত হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি ২৫ খানা গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে আদৃত।

সমুদ্র গুপ্ত—বিখ্যাত সম্রাট্‌। ইনি ৩২৬ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্র নগরে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যশের সহিত স্বীয় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করেন। দেশজয়ই ইঁহার রাজনীতির মূলসূত্র ছিল। তিনি বলিতেন, "রাজ্যগ্রহণই রাজাদের কাজ"। তিনি দাক্ষিণাত্যের ১১ জন ও আর্য্যাবর্ত্তের ৯ জন নরপতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সীমান্তস্থিত রাজা ও বহু বন্যজাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভারতের নেপোলিয়ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার মাতা কুমারদেবী লিচ্ছবি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা ১ম চন্দ্রগুপ্ত এবং পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাণী দত্তাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আর একজন চন্দ্রগুপ্ত আসীন ছিলেন, তিনি মৌর্য্যবংশীয় নরপতি (চন্দ্রগুপ্ত দেখ)। সমুদ্রগুপ্তের জনক চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি বংশীয়। সম্রাট্‌ সমুদ্রগুপ্ত একজন গোঁড়া হিন্দু নরপতি ছিলেন, তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এই যজ্ঞ বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই ; বোধ হয় আর্য্যাবর্ত্তে রাজা পুষ্যমিত্রের পরে আর কেহ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই। তিনি একাধারে বীর পুরুষ, কবি ও গায়ক ছিলেন।

সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য—সুপ্রসিদ্ধ কলাপব্যাকরণ-প্রণেতা। তিনি বিদ্যার্থী রাজা শালিবাহনকে কিরূপ সহজ উপায়ে বিদ্যা শিক্ষা দিবেন তাহা নির্ণয়ার্থ ধ্যানে নিমগ্ন হন। যোগরত হইয়া তিনি এক শিখিপুচ্ছ (কলাপ) দেখিতে পান। এই জন্য তদীয় ব্যাকরণের নাম "কলাপ" রাখেন। রাজা শালিবাহন মহিষীকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বিদ্যালাভার্থ সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। রাজা এক দিবস মহিষীর সহিত জলক্রীড়ায় রত ছিলেন। রাজা রাণীর গাত্রে জল প্রক্ষেপ করিতেছিলেন। রাণী জল প্রক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মোদকং দেহি" (মা উদকং দেহি) অর্থাৎ জল দিও না। রাজা মহিষীর কথার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া একটি মোদক (মোয়া) আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। মোদক শব্দের অর্থ মোয়া। ইহাতে রাণী অশিক্ষিত রাজাকে তীব্র ভৎর্সনা করেন। রাণীর ভৎর্সনায় রাজা লজ্জিত হইয়া বিদ্যালাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সহজ উপায়ে রাজাকে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র শিক্ষা দেন।

সলিম চিস্তি (শেখ)—ফতেপুরসিক্রির বিখ্যাত মুসলমান সাধু। সম্রাট আকবর ইঁহাকে প্রভূত সম্মান করিতেন। কথিত আছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত সম্রাটের সন্তান না হওয়ায়, ইনি ফকির সলিমচিস্তির নিকট স্বীয় মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন। ফকিরের প্রার্থনায় সম্রাটের সন্তানলাভ ঘটে। এজন্য সম্রাট আকবর, ফকিরের নামানুসারে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম "সলিম" রাখেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরীতে এই ফকিরের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বাহাউদ্দিন। আগ্রার ২০ মাইল দূরে সিক্রির নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ে এই ফকির বাস করিতেন। সম্রাটের আদেশে সিক্রির পাহাড়ের উপর ১৫৭১ খৃঃ ফকির সাহেবের জন্য এক প্রকাণ্ড মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দির নির্ম্মাণের অল্পকাল পরে ১৫৭৭ খৃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী ৯৪ বৎসর বয়সে এই ফকিরের মৃত্যু হয়। তিনি ২৪ বার মক্কাশরিফে গমন করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র কুতুব-উদ্দিন, নুরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে নিহত হন। ইঁহার অপর পুত্রের নাম বদর-উদ্দিন। বদর-উদ্দিনের পুত্র ইস্লাম খাঁকে সম্রাট জাহাঁগীর আমীর পদে উন্নীত করিয়া ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সায়ণাচার্য্য—বেদের বিখ্যাত টীকাকার। বিখ্যাত মাধবাচার্য্য ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (মাধবাচার্য্য দেখ)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—নীলাচলের (পুরীর) বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক পণ্ডিত। ইনি ঈশ্বর যে জীব হইতে পৃথক্ ইহা মানিতেন না সুতরাং অবতারও মানিতেন না। ইনি ঘোর মায়াবাদী ছিলেন। কাশীতে যেমন প্রকাশানন্দ সরস্বতী, নীলাচলে তেমনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানগরিমায় তৎকালে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। উভয়েই সমসাময়িক লোক এবং উভয়েই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (প্রকাশানন্দ দেখ)।

সায়েস্তা খাঁ—বঙ্গের শাসন কর্ত্তা ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের মাতুল। তাঁহার শাসনকালে রাজধানী ঢাকাতে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রীত হইত। তাঁহার আদেশে ঢাকায় ছোট কাটারা ও সপ্তগম্বুজ মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের বাণিজ্যের প্রসার হয়। ইঁহার সময়ে ইংরেজেরা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় কুঠী স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে ঢাকানগরী উত্তরে টঙ্গী পর্য্যন্ত ১৪ মাইল বিস্তৃত ছিল।

সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গালার বিখ্যাত নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর দৌহিত্র ও পোষ্যপুত্র। পিতার নাম জৈনুদ্দীন ও মাতা আমেনা বেগম। জৈনুদ্দীন নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তদীয় তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তিন কন্যার বিবাহ দেন। প্রথমা ঘেসিটীবেগমের স্বামী নোয়াজিস্ আহাম্মদ ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন। সিরাজের জনক জৈনুদ্দীন পাটনার নায়েব নাজিম ছিলেন। তিনি পাটনার বিদ্রোহী আফগান

সর্দ্দারগণের হস্তে নিহত হন; সিরাজ জননী আমেনাবেগম শত্রুহস্তে পতিত হন। নবাব আলীবর্দ্দী প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়া সসৈন্যে পাটনায় গমন করেন। আফগান সর্দ্দার সম্‌সের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ যুদ্ধে নিহত হওয়াতে আফগান সৈন্য ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। নবাব পাটনায় প্রবেশ করিয়া স্বীয় কন্যা আমেনা বেগমের উদ্ধারসাধন করেন। আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাবিপদে অধিষ্ঠিত হন। মুর্শিদাবাদ তখন বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। সিরাজ নিজ মন্ত্রিগণের চক্রান্তে বিপদগ্রস্ত হন। তাঁহাদের ষড়যন্ত্রই সিরাজের অধঃপতন ও মৃত্যুর হেতু। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিরাজ পলাশীক্ষেত্রে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে ধৃত হইয়া শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করেন। (ইতিহাস)।

সীতারাম রায় (রাজা)—যশোহর জিলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা। ইনি সেনাপতি মেনাহাতীর বীরত্বে ও যুদ্ধকৌশলে দৃপ্ত হইয়া বঙ্গের নবাবের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেন।

যশোহর জেলায় ভূষণা চাকলার মধ্যে হরিহরনগর গ্রামে কায়স্থকুলে বিশ্বাসবংশে সীতারাম জন্মগ্রহণ করেন। সীতরাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান; তাঁহার কয়েকখানা ক্ষুদ্র তালুক ছিল; তিনি অশ্বারোহণে এই সকল তালুক পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি শরীরে অসীম শক্তি রাখিতেন এবং অশ্বারোহণেও অতি দক্ষ ছিলেন। মোগল সম্রাট যখন বঙ্গের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে শাসন-শৃঙ্খলাস্থাপনে অসমর্থ হইতেছিলেন, যখন দস্যু তস্করের জ্বালায় অধিবাসিবর্গ উৎপীড়িত হইতেছিল, তখন সীতারাম কয়েকজন মাত্র সঙ্গী লইয়া আত্মরক্ষার জন্য এবং উৎপীড়িত লোকদিগকে রক্ষা করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমে সীতারামের দলে লোক সমবেত হইতে লাগিল। তিনি লাঠী ও তরবারির সাহায্যে দস্যুদিগকে তাড়াইয়া নিজে শক্তি ও অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই সীতারামের রাজ্যগঠনের সূত্রপাত হইল। যশোহরের ফৌজদার সীতারামের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিলেন না। সীতারাম ক্রমে ক্ষমতাসঞ্চয় করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। মহম্মদপুরে দুর্গ নির্ম্মিত হইল; ইহা প্রাকার ও পরিখায় বেষ্টিত হইল। এই নগরে বহু প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল; দুর্গের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই "রামসাগর" নামে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করা হইল। এই দীর্ঘিকা দৈর্ঘ্যে ১৫০০ হাত ও প্রস্থে ৬০০ হাত। "রামসাগর" ছাড়া আরও অনেক দীর্ঘিকা খনন করা হইল। মহম্মদপুর এইরূপে সুদৃঢ় করিয়া সীতারাম স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সীতারাম দেশীয় কর্ম্মকারদ্বারা কামান প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। মোগল সম্রাট সীতারামের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। আবুতোরাপ নামে এক ব্যক্তি সীতারামকে পরাজিত করিবার জন্য দিল্লী হইতে সৈন্যসহ বঙ্গে আগমন করিলেন। মোগলসম্রাট আবুতোরাপকে যশোহরের ফৌজদার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। অনতি-বিলম্বে আবুতোরাপ ও সীতারাম যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে আবুতোরাপের সৈন্য পরাজিত হইল এবং তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। আবুতোরাপের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মোগলসম্রাট বাঙ্গালার সুবাদারের উপর তীব্র আদেশ প্রেরণ করেন। এবার সুবাদারসৈন্যের নেতা হইয়া সংগ্রামসিংহ ও জমিদারফৌজের নেতা হইয়া দয়ারাম রায় দুই দিক হইতে ভূষণা আক্রমণ করিলেন। দয়ারামের কৌশলে সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী নিহত হইলেন। সেনাপতির মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে সীতারাম মর্ম্মাহত ও ভগ্নোদ্যম হইলেন। চারিদিক হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবের সৈন্য অগ্রসর হইয়া মহম্মদপুর অধিকার করিল। সীতারাম বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন এবং তথাকার কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুষিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

সুন্দর—ইঁহার রচিত পঞ্চাশৎশ্লোক অতি প্রসিদ্ধ। ইনি প্রথম চোরকবি নামে উক্ত হইয়াছেন। (বিহ্লন দেখ)। ইনি দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুর নগরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র। ইনি বর্দ্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়া চোরকবি নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইনি সুরঙ্গ কাটিয়া রাজকন্যা বিদ্যার গৃহে

উপস্থিত হন। তথায় ইঁহাদের প্রণয় জন্মে ও গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়। ঘটনাটী রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সুন্দর মশানে পঞ্চাশৎ শ্লোকে বিদ্যার (পক্ষে কালিকার) বর্ণন করেন। রাজা বীরসিংহ ইহা শুনিয়া সুন্দরকে ক্ষমা করেন এবং রাজকন্যাকে তদীয় হস্তে অর্পণ করেন।

সুবর্ণ ষ্ঠীবী—সৃঞ্জয়ের পুত্র। (সৃঞ্জয় দেখ)।

সুবন্ধু—ইনি বাসবদত্তা নামক কাব্য লিখিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ বররুচির ভাগিনেয়।

সুবিদনারায়ণ (রাজা)—দিল্লীর সিংহাসনে যখন বিল্লোললোদী অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুবিদনারায়ণ সেই সময়ে শ্রীহট্টের একটি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে অনেকাংশে দিল্লীর সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করিয়া চলিতে হইত। রাজা সুবিদনারায়ণ বীরপুরুষ ও সুশাসক ছিলেন। তিনি নিজ রাজ্য ইটার যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেন। ইটার পূর্ব্বদিকে বাড়ুয়া পাহাড়; ইহার প্রধান শৃঙ্গ পাগড়ীয়া টিলায় সুবিদনারায়ণের সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। তাঁহার প্রধান দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও পর্ব্বতপুর নামক স্থানে লক্ষিত হয়। সুবিদনারায়ণ দাতা, ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সমাজপতিরূপে সমাজ শাসন করিতেন। তিনি স্বীয় রাজ্যে নানাবিধ সামাজিক সংস্কার করেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে তাঁহাকে শ্রীহট্টের বল্লাল বলিতে হয়। রাজার চারি পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠাকন্যা রত্নাবতী কাত্যায়নগোত্রীয় রঘুপতির সহিত বিবাহিত হন। রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাই মিথিলার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের গর্ব্বহারী বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি।

রাজা সুবিদনারায়ণের সময় শ্রীহট্ট মুসলমানদের অধীন ছিল। শ্রীহট্টের রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যে দেওয়ানই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী; শাসনকার্য্য কাননগোদ্বারা সম্পন্ন করা হইত। শ্রীহট্টের দেওয়ান কোন কারণে রাজা সুবিদনারায়ণের বিরুদ্ধে খোয়াজ ওসমান খাঁকে প্রেরণ করেন। খোয়াজ ওসমান রাজার ভানুমতীনাম্নী কন্যাকে সম্রাটের জন্য গ্রহণ করিতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন; কিন্তু সফলকাম হন নাই। ঘোরযুদ্ধে রাজা সুবিদনারায়ণ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী, কন্যা প্রভৃতি সহ প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ বিসর্জ্জন করেন। খোয়াজ রাজপুত্র চতুষ্টয়কে দিল্লীতে প্রেরণ করেন; তথায় তাঁহাদিগকে মুসলমান করা হয়। জাত্যন্তরিত অবস্থায় তাঁহাদের জ্যেষ্ঠানুক্রমিক নাম জালাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁ। হাজি ও ঈশাখাঁর বংশীয়গণ ইটাপরগণায় এখনও বর্ত্তমান আছেন। রাজা সুবিদনারায়ণের ভ্রাতৃবংশীয়গণও শ্রীহট্টের নানাস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

সুরেশ বিশ্বাস (কর্ণেল)—বাঙ্গালী বীর। ইনি পর্টুগালের স্বাধীন উপনিবেশ ব্রাজিলে সেনাপতি-পদে উন্নীত হইয়া যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস নদীয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার এলাকায় নাথপুর গ্রামনিবাসী ছিলেন। পিতামহ রামচাঁদ বিশ্বাস ঐ গ্রামের জমিদার ছিলেন, কিন্তু নীলকর সাহেবদিগের সহিত মোকদ্দমায় ক্ষীণকোষ হইয়া পড়েন। পিতা গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় সার্ভেয়ার জেনারেল আফিসে চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময়ে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে সুরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথায় ছাত্রাবাসে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন। ১৩শ বর্ষ বয়সে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতা স্বধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। সুরেশ এণ্ট্রেন্সক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াই পড়া শেষ করেন। অবশেষে স্বীয় উদরান্নের জন্য চাকুরির অন্বেষণে বাহির হন। দেশে তাঁহার কাজ জুটিল না। তিনি বিলাতগামী এক জাহাজে খালাসীর কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হন; তথায় মুটের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। এখানে তিনি অসৎ সংসর্গে পতিত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তিনি এক সার্কাস্ কোম্পানির সঙ্গে আমেরিকায় উপস্থিত হন। তিনি যুক্তরাজ্যে সার্কাস্ কোম্পানির সঙ্গে ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলরাজ্যে উপস্থিত হন। এখানে

তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। তিনি এখানে এক পর্টুগিজ রমণীকে বিবাহ করেন। এখানে তিনি রাজকীয় পশুশালার সামান্য কর্ম্ম হইতে সেনাপতি পদ লাভ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর ৪৪ বর্ষ বয়সে ব্রাজিলে তিনি দেহত্যাগ করেন। সুরেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাজিলে বাঙ্গালীর স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে।

সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (মহারাজ)—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম; মৃত্যু ১৯০৮ ২০শে অক্টোবর বঙ্গাব্দ ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩১৫ সন। ৫৮ বৎসর বয়সে বৈদ্যনাথে জ্বররোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। মহারাজ বারেন্দ্র সমাজের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তিনি নিরাবিল পটীভুক্ত ছিলেন। ইনি কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধর। ময়মনসিংহ জিলাস্থ আলাপসিংহ পরগণা ইঁহার জমীদারী। মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য চৌধুরী মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের নিকট হইতে এই বিস্তীর্ণ জমীদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহের জনসাধারণের সুবিধার জন্য তিনি সহরের উপরে একটি টাউনহল নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহ সহরে নিজ সহধর্ম্মিণী রাজরাজেশ্বরীর নামে জলের কল স্থাপন করেন।

সাহেবদের আমোদপ্রমোদের জন্য সহরে এক ক্লাবঘর নির্ম্মাণ করেন। হিংস্রজন্তু শিকারে মহারাজ সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তিনি এই জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

ইনি ইঁহার জ্ঞাতি মুক্তাগাছার অন্যতম খ্যাতনামা জমীদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর পুত্র শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এই পুত্র মহারাজের মৃত্যু সময়ে বিলাতে কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত শশিকান্তের বিবাহ হয়। সূর্য্যকান্ত ১৮৮৭ খৃঃ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। বঙ্গের ছোটলাটের সদস্য পদ লইয়া ৺গুরুপ্রসাদ সেনের সহিত মহারাজের প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। মহারাজ এই প্রতিযোগিতা দেখিয়া বলিলেন, "গুরুপ্রসাদ বাবু আমা অপেক্ষা যোগ্যতর; সুতরাং তিনি সদস্য হইলে দেশের অনেক উপকার হইবে।" এই বলিয়া সদস্য পদের জন্য তিনি যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করেন। কয়জন লোক এরূপ করিতে পারে? মহারাজ সূর্য্যকান্তের জমীদারী ৯ লক্ষ বিঘারও অধিক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ, বগুড়া ও পাটনা জিলায়ও ইঁহার জমীদারী আছে। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডে আসে। ১৮৬৭ খৃঃ মহারাজ সাবালক হইয়া জমীদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। মহারাজ দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন। তিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিলের ও বেঙ্গল ন্যাসনাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি কলিকাতা ন্যাসনেল কলেজে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী এম ডি — কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। সূর্য্যকুমার ১৭৪৫ শকে (ইং ১৮২৩ খৃঃ, বঙ্গাব্দ ১২৩০ সালে) ঢাকা জিলায় বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কনকসার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাধামাধব চক্রবর্ত্তী। বাল্যকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাঁহার এক পিতৃষ্বসা তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। ইহার অনতিবিলম্বে তাঁহার পিতাও স্বর্গে গমন করেন। পিতৃবিয়োগে তিনি অতি দুরবস্থায় পতিত হন। সূর্য্যকুমার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের এক জ্ঞাতি পুলিশ দারোগার সহিত কুমিল্লায় গমন করেন এবং তথায় পরলোকগত স্কুল-ইনস্পেক্টর দীননাথ সেনের পিতা গোলোক মুন্সীর বাসায় থাকিয়া তাঁহারই সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজেণ্ডার সাহেব সূর্য্যকুমারকে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। এখানে তিনি "জুনিয়ার" বৃত্তি পরীক্ষায় মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য কলিকাতা গমনপূর্ব্বক মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি যখন ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গমন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫টী ছাত্রকে ডাক্তারি পড়িবার জন্য বিলাত প্রেরণ করেন। সূর্য্যকুমার এই সকল ছাত্রের অভিভাবকরূপে তাহাদের সঙ্গে

বিলাত গমন করেন। বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বেই মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক "গুডিব" সাহেব তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এখন হইতে তাঁহার নামের সহিত "গুডিব" নাম সংযোজিত হইল। তিনি বিলাত যাইয়া যশের সহিত এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যাবিষয়ে (মেটিরিয়ামেডিকার) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদেই ছিলেন। তিনি একটী ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই মহিলার গর্ভে তাঁহার ৫টী পুত্র ও ৩টী কন্যা জন্মে। তাঁহার প্রথম তিন পুত্র বিলাতেই আছেন; ৪র্থ ও ৫ম পুত্র "ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ান" হইয়া এদেশে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা অবিবাহিতা, তিনি কলিকাতাই আছেন; দ্বিতীয় কন্যা এম, ললিতা কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্যারীলাল রায়ের পত্নী। তৃতীয় কন্যা পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের পত্নী। ফার্লো লইয়া বিলাত যাওয়ার কালে আমাশয় রোগে লঙ্কাদ্বীপে গুডিব চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

সেকেন্দর (সোলতান)—বঙ্গের শাসনকর্ত্তা। ইঁহার পিতা সোলতান সামস্-উদ্দীন রাজধানী সুবর্ণগ্রাম হইতে (গৌড়ের নিকটবর্ত্তী উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত) পাণ্ডুয়াতে পরিবর্ত্তিত করেন। সোলতান সেকেন্দর পাণ্ডুয়াতে বিখ্যাত আদীনা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে পুত্র গিয়াস-উদ্দীনের সহিত যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সেলার জঙ্গ (নবাব, সার, জি. সি. এস আই)—হায়দরাবাদের নিজামের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী। ইঁহার প্রকৃত নাম তুরা আলী খাঁ। সেলার জঙ্গ নিজামরাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আরবের অন্তর্গত মদিনা হইতে হায়দরাবাদে আসিয়া বাস করেন। মহীসুরের টিপু সোলতানের সহিত যুদ্ধের সময় তাঁহার প্রপিতামহ নিজামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রপিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতামহ মুনিরুল-মুলুক এবং চণ্ডুলাল নামক অপর এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু উভয়ে এক সময়ে নিজামের প্রধান মন্ত্রিত্ব করেন। কাজেই সার সেলার জঙ্গের নিজামের মন্ত্রিপদে দাবি ছিল। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, সার সেলার জঙ্গ তাহার কিছুই পান নাই। যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন তাহা নিজের চেষ্টায়; তিনি স্কুল বা কলেজ হইতে কোন প্রকার শিক্ষাই প্রাপ্ত হন নাই। বাল্যকালে তিনি আরবি ও পার্সী ভাষা শিক্ষা করেন এবং তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ইংরেজীও শিক্ষা করেন। তাঁহার যৌবন সময়ে পিতা ও পিতামহের মৃত্যু হয়; বোধ হয় ইহাই তাঁহার শিক্ষা না পাওয়ার প্রধান হেতু। তিনি প্রথম সাত বৎসর গৃহশিক্ষকের (private tutor) অধীন ছিলেন। ভাবী জীবনে তিনি যে প্রখর রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তদুপযোগী কোন শিক্ষাই তিনি জীবনের প্রথম বয়সে প্রাপ্ত হন নাই। ২০ বৎসর বয়সে তিনি তালুকদার পদে নিযুক্ত হন। ৮ মাস এই পদে থাকিয়া তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কাজ শিক্ষা করেন। এই সময়ে সেলার জঙ্গের পিতৃব্য মন্ত্রিপদে আসীন ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃব্যের মৃত্যু হইলে সেলার জঙ্গ প্রধান মন্ত্রিপদ লাভ করেন। এই সময়ে নিজাম-রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। কর আদায়ের শৃঙ্খলা ছিল না; ধনাগার একেবারে শূন্য; আত্মীয় স্বজনগণের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অর্থাভাবে বন্ধ। নিজামের মণিমাণিক্যগুলি অর্থের বিনিময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বন্ধক রাখা হইল এবং ঐ কোম্পানী কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হইল। রাজ্যের ঋণ তিন কোটী টাকা হইয়া দাঁড়াইল। রাজ্যের এই দুরবস্থার সময়ে সার সেলার জঙ্গ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, আরবীয় সৈন্যদের বেতনে বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, এজন্য তিনি তাহাদিগের পদ উঠাইয়া দিলেন। আরবীয়দের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সমুদয় আরবীয়, রোহিলা ও পাঠান সৈন্যদিগকে পদচ্যুত করিবার জন্য তিনি তালুকদার ও জায়গীরদারদিগকে আদেশ দিলেন। আরবীয়দিগকে যে

সমুদয় ভূসম্পত্তি জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। এইরূপে ৬০০০ সৈন্যের বেতন ও ভরণপোষণের ব্যয় বাঁচিয়া গেল এবং বহুলক্ষ টাকার সম্পত্তি আরবীয় লোকদিগের গ্রাস হইতে উদ্ধার হইল। তালুকদারগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সরকারের বহু টাকা ক্ষতি করিতেন; সেলার জঙ্গ এই সমুদয় ঘুষখোর তালুকদারদিগকে পদচ্যুত করিলেন। এইরূপে তিনি নানাদিকে সংস্কার আরম্ভ করিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে, রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। মধ্যভারতবর্ষ ও দাক্ষিণাত্য হায়দরাবাদের দিকে চাহিয়াছিল। নিজামরাজ্যের লোকগুলি রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধের জন্য চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল যে, মান্দ্রাজের গবর্ণর হায়দরাবাদের রেসিডেন্টের নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিলেন, "যদি নিজাম বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হন, তবে আমাদের সর্ব্বনাশ, আর আশা নাই।" কিন্তু সার সেলার জঙ্গ অচল, অটল; তিনি ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুভাবে থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। এই উপকারের জন্য ইংরেজেরা বিদ্রোহের অবসানে তাঁহাকে ৩০০০০৲ টাকা মূল্যের খেলাত দেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য হায়দরাবাদে একটা ষড়যন্ত্র হয়। ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে একজন তাঁহাকে গুলি করে; গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অবশেষে তাঁহার রক্ষি-সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে গুলিনিক্ষেপকারী হত হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজামকে সোলাপুর রাজ্য দান করেন; এতদ্ব্যতীত যে দুইটী রাজ্য ইংরেজেরা নিজামের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহাও প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সার সেলার জঙ্গের সুবন্দোবস্তে রাজ্যের আয় আট লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইল এবং ধনাগার অর্থে পূর্ণ হইল। এই সময়ে তাঁহাকে বধ করিতে পুনরায় ষড়যন্ত্র হইয়াছিল; ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় বিফল হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যু হয়। ইংরেজগবর্ণমেণ্ট সেলার জঙ্গ ও অপর এক ব্যক্তিকে নাবালক নিজামের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের (সম্রাট ৭ম এডোয়ার্ডের) এদেশে আগমন কালে সেলার জঙ্গ বোম্বাই নগরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, যুবরাজও তাঁহাকে বিলাত যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। সেলার জঙ্গ পরবর্ত্তী বৎসর বিলাত যাইয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তিনি বেরার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইংরেজগবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. সি. এল্ উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৭৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি তিনি জি. সি. এস. আই উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি ব্যক্তিগত সম্মানস্বরূপ ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৩ খৃঃ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি ইংরেজী ধরণেই আহার বিহার করিতেন এবং ইরেজী চালচলন ভাল বাসিতেন। দরবারের সময় ব্যতীত তিনি কখনও মণিমাণিক্যাদি পরিধান করিতেন না।

সৈয়দ আহ্‌মদখাঁ (সার, কে সি এস আই)—আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। সার সৈয়দ আহ্‌মদ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের (যুক্ত প্রদেশের) একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। তিনি ১৮১৭ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবরসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতা মোহাম্মদ তকীখাঁ অতি ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তকীখাঁ দিল্লীর বাদশাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অনুরোধে তদীয় শ্বশুর প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। সার সৈয়দ ১৮৪১ খৃঃ ইংরেজগবর্ণমেণ্টের অধীনে সিক্রীর মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খৃঃ "দিল্লীর ধ্বংসাবশেষের পুরাতত্ত্ব" সম্বন্ধে তিনি একখানা গ্রন্থ লিখেন। ১৮৫০ খৃঃ তিনি সবজজ পদে উন্নীত হন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি বিজনোরে সব জজ ছিলেন। তিনি বিদ্রোহদমনে গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি দেন; এতদ্ব্যতীত তিনি একখান তরবারি ও একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

১৮৬৭ খৃঃ তিনি কাশীতে বদলী হন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পুত্র সৈয়দ মাহ্মুদকে বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের সঙ্কল্প করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মাহ্মুদ ও দ্বিতীয় পুত্র হামিদকে লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালেই তিনি সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। সৈয়দ মাহ্মুদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ও হামিদ ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। সার সৈয়দ আহ্মদ বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া বারাণসীতে সব জজ নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন। কলেজের সহিত ছাত্রাবাসও স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম হইতে পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ৩৭ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারের সময় তিনি জি. সি এস. আই. উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বড় লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তিনি এবং তাঁহার পুত্র মাহ্মুদ বিখ্যাত শিক্ষাকমিশনের সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে তিনি কর্ম্মবহুল জীবন ত্যাগ করেন।

সোমদেব ভট্ট—ইনি কথাসরিৎসাগর নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকার রচয়িতা। ইনি কাশ্মীররাজ অনন্তদেবের মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে অনন্তদেব ৯৫৫ শকের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ১০০০ শক কথাসরিৎসাগরের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সোমেশ্বর পাঠক—ইনি সুসঙ্গদুর্গাপুরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে রাজা বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনাথের ৪ পুত্র ঃ—রামকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ। মহারাজ রামকৃষ্ণের পুত্র, বর্ত্তমান মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি. এ. বাহাদুর। প্রিভিকাউন্সিলের নির্দ্ধারণানুসারে সুসঙ্গ ষ্টেট উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাতে বহু সরিক হইয়াছে। সুসঙ্গের পাহাড় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট খাস করিয়া লওয়াতে এই রাজবংশের আর্থিক অবস্থা আর পূর্ব্ববৎ নাই। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর পাঠক রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন ; কিন্তু কালক্রমে এই বংশীয় রাজগণ বারেন্দ্র শ্রেণীর লোকের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করাতে ইঁহারা বারেন্দ্র ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। কালক্রমে রাজসাহী জেলার নাটোর ও তাহেরপুরের রাজবংশের সহিত সুসঙ্গ রাজবংশ বৈবাহিক সম্পর্ক যুক্ত হওয়াতে বারেন্দ্র সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে।

স্বর্ণময়ী (মহারাণী)—দানশীলতার জন্য এই মহানুভবার নাম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। স্বর্ণময়ী অতি দরিদ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ভটকুল গ্রামে ১৭৪৬ শকে (ইং ১৮২৪ খৃঃ বঙ্গাব্দ ১২৩১ সাল) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জাতিতে তিলী। একাদশ বর্ষ বয়সের সময় কাশিমবাজারের রাজা ৺কৃষ্ণনাথ নন্দীর সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহ হয়। এই সময় হইতে দরিদ্রের কন্যা স্বর্ণময়ী, রাণী স্বর্ণময়ী হইলেন। রাজা কৃষ্ণনাথের প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠিতে দোভাষীর কাজ করিতেন। এই সময়ে বিখ্যাত হেষ্টিংশ সাহেব এই কুঠীতে কেরাণীগিরি করিতেন। এখানে কৃষ্ণকান্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সিরাজদ্দৌলা যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন, তখন হেষ্টিংশ প্রাণভয়ে কৃষ্ণকান্তের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণকান্ত সাহেবকে আপনার ঘরে এক জালার মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। এই জালার ভিতর থাকিয়া হেষ্টিংশ পান্তাভাত ও চিংড়ীমাছ খাইয়া জীবনধারণ করেন। সিরাজের পতনের পর দেশ ধীরে ধীরে ইংরেজের হস্তগত হয় এবং হেষ্টিংশ ভারতের গবর্ণর (পরে গবর্ণর জেনারেল) হন। দরিদ্র কৃষ্ণকান্তের ভাগ্য ফিরিয়া গেল। হেষ্টিংশ কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ বড় বড় জমিদারী কৃষ্ণকান্তকে দান করেন। কৃষ্ণকান্তের পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্র লোকনাথ এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। লোকনাথই প্রথমে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণকান্ত চিরজীবন "কান্তবাবু" নামেই পরিচিত ছিলেন। রাজা লোকনাথের পর তৎপুত্র হরিনাথ রাজা হইলেন। হরিনাথের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। রাজা কৃষ্ণনাথ বিদ্বান্ ও দয়ালু ছিলেন ; কিন্তু কোন কারণে তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া যায় ; তিনি আত্মহত্যা দ্বারা জীবনজ্বালা এড়াইয়া যান। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। এই

সময়ে রাণী স্বর্ণময়ীর বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। ইহার পর হইতে রাণী স্বর্ণময়ী ৫০ বৎসর কাল বিপুল অর্থদ্বারা দরিদ্রের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৭৪ খৃঃ উত্তরবঙ্গে বড় অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। রাণী স্বর্ণময়ী এই সময়ে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগের সাহায্যকল্পে একলক্ষ দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৭৭ খৃঃ মান্দ্রাজে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; এই সময়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ রাণী স্বর্ণময়ী দশহাজার টাকা দান করেন। দানশীলতার জন্য গবর্ণমেণ্ট রাণী স্বর্ণময়ীকে "মহারাণী" উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৭৬ খৃঃ কলিকাতার দুর্ভিক্ষের সময় ৮০০০৲ টাকা এবং মুর্শিদাবাদের অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের জন্য ১০০০৲ টাকা দান করেন। এইরূপে অন্নক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ মহারাণী নিজ জীবনে অন্যূন চারিলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান যে তিনি কত করিয়াছেন তাহার সংখ্যাই হয় না। যে কোন ব্যক্তি অর্থসাহায্যার্থ মহারাণীর নিকট আবেদন করিতেন, তিনি কিছু না কিছু নিশ্চয়ই পাইতেন। মহারাণী কাহারও প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, এরূপ কথা শুনা যায় নাই। মহারাণীর দান পায় নাই, এরূপ স্থান বঙ্গে কম। বহরমপুর কলেজটীতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলে, মহারাণী মাসিক ১২০০৲ টাকা দিয়া উহা রক্ষা করিতেছিলেন। মহারাণীর সাহায্য না পাইলে, কলেজটী উঠিয়া যাইত। কলিকাতা সহরে যে সমুদয় বড় বড় দাতব্য চিকিৎসালয় আছে সকলটীতে মহারাণীর নিয়মিত দান ছিল। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের শত শত স্কুল নিয়মিতরূপে মহারাণীর সাহায্য প্রাপ্ত হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সাল ১০ই ভাদ্র বুধবার) ৭১ বৎসর বয়সে মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বর্গে গমন করেন। মহারাণীর মৃত্যুতে তাঁহার শাশুড়ী সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এখন মহারাণীর ভাগিনেয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

হ

হরকৃষ্ণ (নবাব)—ইঁহার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ, পিতামহ শ্যামদাস এবং প্রপিতামহ কবিবল্লভ দস্তিদার। শ্রীহট্ট জিলায় ইঁহার নিবাস ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে যে কর্ম্মচারিগণের আদেশে সরকারী দলিল পত্রাদিতে মোহর দেওয়া হইত তাহাদের "দস্তিদার" উপাধি ছিল। সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে হরকৃষ্ণ শ্রীহট্টের আমিন বা নবাবী পদ লাভ করেন। তৎকালে শ্রীহট্টের শাসনকর্তৃগণ আমিন নামে অভিহিত হইতেন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদিগকে "নবাব" বলিত, নবাব বলিয়াই জানিত। সম্রাট্ আকবরের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে যে সকল শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইতেন তাঁহাদের সাধারণ উপাধি "কানন গো" ছিল। আকবরের রাজত্বের ১৫শ বর্ষে কাননগোদের ক্ষমতা নিতান্ত হ্রাস করা হয় এবং তদবধি তাঁহারা আমিন নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

কোন কারণে হরকৃষ্ণের জননী এক ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তিনি ফকিরকে প্রদান করিবেন। তদনুসারে হরকৃষ্ণ শিশুকালেই ফকিরের করে সমর্পিত হন। ফকির তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া পরস্যাদিতে সুশিক্ষিত করেন। হরকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে একটি সামান্য কাজ প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব্ববঙ্গের রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করার সময়ে রাজা রাজবল্লভের সাহায্য করিতে গিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার স্বরূপ দশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হন। এই টাকা ফকিরকে দিয়া তিনি আত্মস্বাধীনতা ক্রয় করেন এবং পরে নবাবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া শ্রীহট্টের আমিন পদ লাভ করেন। এই সময়ে ঢাকার নবাবের জনৈক আত্মীয় শ্রীহট্টের আমিনপদে আসীন ছিলেন; ইঁহার নাম শুকুরুল্লা। হরকৃষ্ণের আমিনি পদে নিয়োগে শুকুরুল্লা কর্ম্মচ্যুত হন। ইহাতে হরকৃষ্ণ ঢাকার নবাবের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাবও শুকুরুল্লা-প্রদত্ত বিষবটীকা গ্রহণ করিলেন। শুকুরুল্লা নবাব হরকৃষ্ণের সহিত প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শুকুরুল্লা নবাব হরকৃষ্ণের প্রাণবধার্থ গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করেন। যখন কাজল হাওর প্রান্তরে উভয় পক্ষের সেনানায়কগণ ভীষণ যুদ্ধে

লিপ্ত ছিল, সেই সময়ে ধ্যাননিরত নবাব হরকিষণ (হরকৃষ্ণ) গুপ্তঘাতকের নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। গুপ্তঘাতক যখন হরকিষণের ছিন্ন মুণ্ড রণক্ষেত্রের নিকট দিয়া শুকুরুল্লার বাটীর দিকে লইয়া যাইতেছিল, তখন উহা হরকিষণের সেনাপতি রাধানাথের দৃষ্টিগোচর হয়। বিজয়লক্ষ্মী সেনাপতি রাধানাথের অঙ্কগত হইলেও প্রভুর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া বিজয়ী সেনানায়ক রাধানাথ আত্মহত্যা করেন।

নবাব হরকিষণ দাসের মৃত্যুর পর, বলাবাহুল্য, শুকুরুল্লা আমিন পদ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি স্থায়ী হইতে পারেন নাই। অতঃপর নায়ের ফৌজদার প্রভৃতির উপর কিছু দিনের জন্য শ্রীহট্টের শাসন ভার অর্পিত হইয়াছিল।

হরিদাস— বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু। ইনি শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শান্তিপুরের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্রগ্রামে মুসলমান বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরে হরিভক্ত হইয়া উঠেন। ইঁহার মুখে সর্ব্বদা হরিনাম উচ্চারিত হইত। হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া পড়াতে ইঁহার উপর মুসলমানগণ অত্যন্ত উৎপীড়ন করেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন নবাব ইঁহার উপর প্রথম অমানুষিক অত্যাচার করেন; অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে হরিদাস প্রকৃতই সাধু। শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। বৈষ্ণবগণে পরিবৃত হইয়া ইনি নীলাচলে দেহত্যাগ করেন।

হরিদেব – শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদর দেবের ন্যায় ইনিও একজন আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক এবং উঁহাদের সমসাময়িক সাধু। ইঁহার জন্মস্থান লক্ষ্মীপুর জিলায় নারায়ণপুর নামক গ্রাম। ইনি দামোদর দেবেরই প্রায় সমমতাবলম্বী।

হরিনাথ মজুমদার—কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ নামে পরিচিত। বিখ্যাত গীতিকাব্য লেখক। কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের গান বঙ্গের সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। তিনি 'বিজয়বসন্ত', 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' ও 'বাউল সঙ্গীত' রচনা করেন। এই উপাদেয় ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি রচনা করিয়া হরিনাথ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। হরিনাথ স্বীয়নাম গুপ্ত রাখিয়া "ফিকিরচাঁদ" নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হন। তিনি ১৭৫৫ শকে (ইং ১৮৩৩ খৃঃ, বঙ্গাব্দ ১২৪০ সাল) নদীয়া জিলায় কুমারখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩ বৎসর বয়সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। হরিনাথের বয়স এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁহার জননী স্বর্গগত হন। পিতা আর বিবাহ করেন না; বোধ হয় এই জন্যই তিনি সংসারে উদাসীন ছিলেন। হরিনাথ খুল্লপিতামহী দ্বারা লালিত পালিত হন। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সমস্তই পিতার ঔদাসীন্যে নষ্ট হইয়া যায়। মাতৃবিয়োগ হইতেই দরিদ্রতা তাঁহার চিরসহায় হইয়াছিল। তিনি পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখেন। পরে গৃহে থাকিয়াই বেতালপঞ্চবিংশতি ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ভাষার উপর কিছু অধিকার জন্মিল। তৎপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি স্বগ্রামের লোকদিগের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া "সংবাদ প্রভাকরে" প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। জমিদারের অত্যাচার কাহিনী পত্রিকায় প্রকাশ করাতে জমিদার তাঁহার প্রাণনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত হন নাই। বৃদ্ধকালে হরিনাথ সতত ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র— ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার নিবাস হুগলী জিলায়; কিন্তু ইনি সর্ব্বদা ঢাকাতেই থাকিতেন। ইনি নিম্নলিখিত ৭ খানি কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। (১) নির্ব্বাসিতা সীতা, (২) পদ্য-কৌমুদী, (৩) বীর-বাক্যাবলী, (৪) কবি-রহস্য, (৫) কবিতাবলী, (৬) কবিতা-কৌমুদী, (৭) চারু-কবিতা।

"নির্ব্বাসিতা-সীতা" বহুকাল এতদ্দেশে মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কবি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে নানাবিধ রোগে কষ্ট পাইতে থাকেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে "কবি-রহস্য" ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "নির্ব্বাসিতা-সীতা" প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কবি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন। কবি রোগ-শয্যায়

থাকিয়া "কবি-কাহিনী" ও "নির্ব্বাসিতা-সীতা" রচনা করিয়াছিলেন। "প্রহ্লাদ-নাটক" ও "অযোধ্যাকাণ্ড" রচিত হইয়া যন্ত্রস্থ ছিল ; কিন্তু কবির অকাল-মৃত্যুতে ঐ দুইখানি গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। কবির মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাস মিত্র ঢাকার এক পুস্তকবিক্রেতার নিকট উক্ত কাব্যগুলির স্বত্ব বিক্রয় করেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক। হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত "হিন্দু-পেট্রিয়ট" (Hindu Patriot) নামক সংবাদ-পত্র সম্পাদন করিতেন। ইনি কলিকাতা ভবানীপুরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুরবস্থাপন্ন উচ্চশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রামধন মুখোপাধ্যায় ; মাতা রুক্মিণীদেবী। হরিশ মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আর্থিক দুরবস্থাহেতু অল্পবয়সেই পাঠ সমাপন করিয়া, তিনি চাকুরীর অন্বেষণে বাহির হন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, ঘরে একমুষ্টি চাউলও নাই ; তিনি একখানা কাঁসার থাল লইয়া তদ্বিনিময়ে চাউল ক্রয় করিতে বাহির হইলেন। ঠিক এই সময়ে একজন জমিদারের কর্ম্মচারী একখানা দলিলের অনুবাদ করাইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া হরিশ ২৲ দুই টাকা প্রাপ্ত হইলেন ; এবারে তাঁহার থাল বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইল না। এই অবস্থায় তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। তিনি মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে এক ইংরেজ সওদাগরের আফিসে কেরাণীগিরি পাইলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সৈনিক বিভাগের হিসাব পরীক্ষা-সংক্রান্ত আফিসে (Military Auditor General's Office) মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে এক কেরাণীগিরি প্রাপ্ত হন। ঐ আফিসে ক্রমে ক্রমে তিনি মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনের পদে উন্নীত হন। হরিশ পুস্তক পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ; নানাস্থান হইতে পুস্তক ধার করিয়া আনিতেন। তিনি ভবানীপুর হইতে ৪ মাইল হাটিয়া ডফ সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে কলিকাতা আসিতেন। এই সময়ে তিনি নানা ইংরেজী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাথ ও তাঁহার দুইভ্রাতা "হিন্দু-পেট্রিয়ট" পত্রিকা প্রকাশিত করেন এবং তিন ভ্রাতাই এই পত্রিকা সম্পাদন করিতে থাকেন। ইঁহারা সম্পাদন কার্য্যে অমনোযোগ প্রকাশ করাতে হরিশ এই পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। হরিশ একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া ইহার নাম "হিন্দু-পেট্রিয়ট-প্রেশ" রাখেন। এই পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া হরিশ নানাদিগ্দেশে পরিচিত হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। বহুলোক এই পত্রিকার গ্রাহক হইল। গবর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার সুযুক্তি গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ প্রথা লইয়া আন্দোলন হয় ; হরিশ বিধবাবিবাহের পক্ষে সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় দীর্ঘপ্রবন্ধ লিখিয়া যাহাতে দেশীয় সৈন্যগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের সদ্ভাব স্থাপিত হয় ও দেশে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজার পক্ষ হইয়া নীলকরদিগের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। নীলকরেরা তাঁহার নামে নালিশ করেন। নীলকরেরা মোকদ্দমায় জয়ী হন। এই সময়ে তিনি মিলিটারী অফিসে মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতন পাইতেন ; কিন্তু নীলকর সাহেবদের সহিত মোকদ্দমায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পপূর্ব্বে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ভারতের তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটরী সার চার্লস উড্ নীলকর মোকদ্দমায় প্রজার পক্ষে যথাযোগ্য মীমাংসা করিয়াছেন। এই সংবাদে, এই গৌরবান্বিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায়ও আপনাকে কৃতার্থ ও সুখী মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নীলকরেরা তাঁহার বাড়ী ঘর ক্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লন। তাঁহার পরিবারবর্গ এইরূপে নিঃসম্বল হইলেন। তিনি চিরকালই অর্থাভাবে কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে এক সময়ে "সিভিল সার্ভিস" পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তিনিই প্রথমে ভারতসচিবের নিকট আবেদন করেন। তিনি দেশের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি "ব্রিটিশইণ্ডিয়ান সভার" সভ্য ছিলেন। ৩৬ বৎসর বয়সে অকালে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন।

হরু ঠাকুর—বঙ্গের বিখ্যাত গীত-রচক। ইঁহার নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি; হরু ঠাকুর নামে ইনি বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত। ১৭৩৯ খৃঃ ইনি কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বেচ্ছায় কবির দলে প্রবেশ করিয়া গান বাঁধিয়া দিতেন, পরে নিজেই এক কবির দল গঠন করেন। রাজা নবকৃষ্ণ ইঁহার রচনা কৌশল দেখিয়া ইঁহাকে কবির দল গঠনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং যতদিন রাজা জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর হরু ঠাকুর কবির দল ত্যাগ করেন। ১৮১৩ খৃঃ এই বিখ্যাত কবিওয়ালা দেহত্যাগ করেন। ইঁহার রচনা মধুর ও স্নিগ্ধ ছিল। বিরহ বর্ণনাতেই ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন (মহারাজ)—কান্যকুব্জের অধিপতি। ইঁহার সভায় কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্ট বিদ্যমান ছিলেন। ইনি কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া অন্যতম সভাপণ্ডিত ধাবকের দ্বারা রত্নাবলী নাটিকা ও নাগানন্দ নাটক রচনা করাইয়া নিজ-নামে প্রকাশিত করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম হর্ষবর্দ্ধন। ইনি এক সময়ে হিন্দু ও অপর সময়ে বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম প্রভাকর বর্দ্ধন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন এবং ভগিনীর নাম রাজ্যশ্রী। ইনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের আদিপুরুষ পুষ্পভূতি। পুষ্পভূতি শৈব ছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক। ইনি ৬০৮ খৃঃ হইতে ৬৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

হলায়ুধ—"ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব", "কবি-রহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত বঙ্গীয় পণ্ডিতকুলভূষণ। ইনি "গীত-গোবিন্দ" রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর সমসাময়িক। ইনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। (লক্ষ্মণ সেন দেখ)। পরিশেষে অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে ইনি "ধর্ম্মাধিকরণিকের" পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ ১০০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১১০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুলজীকার ধ্রুবানন্দ মিশ্র, রামহরি তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির মতে হলায়ুধ কাশ্যপ-গোত্রীয় চট্টবংশ সমুদ্ভূত।

"বহুরূপঃ সুচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥"

(কুলরামঃ)

"চট্টবংশের কুলীন পঞ্চমহাশয়।
রূপ সূচ অর হল বঙ্গনাম কয়॥

(মেঘ-মালা)

কেহ কেহ বলেন, হলায়ুধ শাণ্ডিল্যগোত্রজ ভট্টনারায়ণ কবির বংশধর।

হুমায়ুন—ভারতের মোগল সম্রাট। ইনি ভারতের প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহের পুত্র ও বিখ্যাত মোগল সম্রাট আকবরের জনক। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার রাত্রিতে ইনি কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর ইনি আগ্রায় মোগল সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৫৪০ খৃঃ ১৭ই মে কনোজের যুদ্ধে শেরখাঁর নিকট পরাজিত হইয়া সাম্রাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। হুমায়ুন নানা স্থানে পলায়ন করিয়া অবশেষে ১৫৪৪ জুলাই মাসে পারস্যের অধিপতি কর্ত্তৃক যথাযোগ্য আদরে গৃহীত হন। তিনি তাঁহাকে সাম্রাজ্য লাভের জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য দেন। এই সৈন্যের সাহায্যে হুমায়ুন পুনরায় ভারতে আসিয়া দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট সেকেন্দর শাহকে সরহিন্দের যুদ্ধে পরাভূত করেন ও পুনরায় দিল্লীর সম্রাটপদ লাভ করেন। হুমায়ুন ১৫ বৎসর কাল সাম্রাজ্য ছাড়িয়া পলাতকের অবস্থায় ছিলেন। এই ১৫ বৎসরে ৫ জন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন:—সেরশাহ, তৎপুত্র সলিমশাহ, মোহম্মদ শাহ আদিলি, ইব্রাহিম খাঁ এবং সেকেন্দর শাহ। হুমায়ুন, সেনাপতি বৈরাম খাঁর বীরত্বে সেকেন্দরকে পরাভূত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন,

এজন্য তিনি সাম্রাজ্য লাভ করিয়াই তাঁহাকে খান্ খানান্ উপাধি দিয়া প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। সান্ধ্য উপাসনার পর যখন তিনি সোপানাবলী দিয়া নীচে নামিতেছিলেন, তখন হঠাৎ পদস্খলন হওয়াতে, নিম্নে পতিত হন ও এই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধি স্থানের উপর ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের বিখ্যাত কবি। কবিবর হেমচন্দ্র হুগলী জিলার অন্তর্গত গুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৩৮ খৃঃ এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ৯ বৎসর পর্য্যন্ত মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া করেন। তৎপর মাতামহের সঙ্গে কলিকাতা খিদিরপুরে আসিয়া হিন্দুকলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে একবারে সিনিয়র ও এফ. এ. পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হন। তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে একবৎসর পড়িয়া অর্থাভাববশতঃ কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হন এবং মিলিটারি অডিটর আফিসে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি বি এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং অল্প দিন পরে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা ট্রেনিং (নর্ম্মাল) স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ইহার তিন বৎসর পর তিনি বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল হাবড়া ও শ্রীরামপুরে মুন্সেফের কার্য্য করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অনন্তর মুন্সেফী পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসাতে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং অনতিবিলম্বে সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ বয়সে হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়া পড়েন। গ্রীসের মহাকবি হোমার অন্ধ হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; বঙ্গের মহাকবি হেমচন্দ্রও বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হন। কবিবর হেমচন্দ্র একটু অমিতব্যয়ী ছিলেন, এজন্য বৃদ্ধকালে অর্থাভাবে পতিত হন এবং জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করিয়া কাশীতে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া কবিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে এই শেষাবস্থায় মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দান করেন। ১৮২৫ শকের ১০ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯০৩ খৃঃ, বঙ্গাব্দ ১৩১০ সাল) রবিবার মহাকবি হেমচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনপূর্ব্বক অশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এজন্য বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

(১) চিন্তা-তরঙ্গিণী, (২) বীরবাহু-কাব্য, (৩) ভারত সঙ্গীত, (৪) আশাকানন, (৫) ছায়াময়ী, (৬) দশ মহাবিদ্যা, (৭) বৃত্রসংহার, (৮) কবিতাবলী। "বৃত্র-সংহার"ই মহাকবির শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই মহাকাব্যে তিনি আপনার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বড়ুয়া—আসামের অন্তর্গত শিবসাগর জিলায় রাজাবাহার নামক স্থানে ১৭৫৭ শকে (১৮৩৫ খৃঃ) ২৪শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সুযোগের অভাবে তিনি নিয়মিতরূপে বিদ্যাভাস করিতে পারেন নাই; কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি আসামী, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে কামরূপের ডেপুটী কমিশনারের আফিসে অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন; পরে মাসিক ২৫০৲ আড়াই শত টাকা বেতনে বিভাগীয় কমিশনার আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন। এই কার্য্য হইতে তিনি পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি গ্রন্থরচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ন্যূন কল্পে ১৬০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সাহিত্য চর্চ্চার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, তিনি ৫০০৲ পাঁচ শতটাকা বেতনের একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি আসামীয় ভাষার অভিধান "হেমকোষ"। এই অভিধান প্রণয়ন করিয়া তিনি আসামীয় ভাষার নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বাস্তবিকই আসামীয়

ভাষার যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। তাঁহার মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট এই অভিধান মুদ্রিত করেন। এই অভিধান ব্যতীত তিনি আসামীয় ভাষায় স্কুলপাঠ্য বহু পুস্তক লিখিয়া এই ভাষার অশেষ উন্নতি সাধন করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় Marriage system in Assam নামক গ্রন্থ লিখিয়া আসামবাসীদের বিবাহ প্রথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ১৮১৭ শকে (১৮৯৫ খৃঃ) ৬০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

হোসেন শাহ্— বঙ্গের বিখ্যাত নরপতি। ইনি বঙ্গের হাবসীদাস বংশীয় শেষ নৃপতি মজফর শাহের মন্ত্রী ছিলেন। অমাত্যগণ অত্যাচারী সোলতান মজফরকে নিহত করিয়া মন্ত্রী হোসেন শাহকে সিংহাসন অর্পণ করেন। হোসেন শাহ্ প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই কর্ম্মচারী ও সভাসদ্ বিখ্যাত ভক্ত ভ্রাতৃদ্বয়, রূপ ও সনাতন, নবদ্বীপের প্রেমাবতার চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন (রূপ সনাতন দেখ)। তাঁহারই রাজত্ব কালে কোচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জিলায় হোসেনপুর নগরী তাঁহারই নামানুসারে নির্ম্মিত হয়। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পরাগল খাঁর আদেশে তদীয় সভাসদ্ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১৭০০০ শ্লোকে মহাভারত অনুবাদ করেন এবং তদীয় পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে তাঁহার সভাসদ্ কবি শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চরিতাভিধান।

তৃতীয় খণ্ড

ঐতিহাসিক যুগ—ভারতবর্ষ ভিন্ন দেশ

অ

অগাষ্টাস্—(Caius Julius Cæsar Octavianus) প্রথম রোম সম্রাট্। জন্ম খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৪শ খৃষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট। তাঁহার পিতা কয়াস অক্টেভিয়াস এবং মাতা বিখ্যাত জুলিয়স সিজারের ভগিনী জুলিয়ার কন্যা এটিয়া। জুলিয়াস্ সিজার স্বীয় ভগিনীর দৌহিত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; তদবধি অগাষ্টাসের নামের সহিত জুলিয়াস সিজারের নাম যুক্ত হইল। অগাষ্টাসের সেনানীগণ স্পেন, জর্ম্মনি ও আফ্রিকাতে বহুযুদ্ধে জয়লাভ করেন। অগাষ্টাসের সময় রোমীয় সাহিত্য চরম উন্নতি লাভ করে। তাঁহার সাম্রাজ্যকালে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। জুলিয়াস সিজারের হত্যাকারী ব্রুটস ও ক্যাসিয়াসকে তিনি খৃঃ পূঃ ৪২ অব্দে ফিলিপি নামক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন।

(কর্ণেল) অল্‌কট—বিখ্যাত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও পরলোকবাদী। ইনি ১৭৯৭ শকে (ইং ১৮৭৫ খৃঃ) আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিউইয়র্ক সহরে "থিওসফিকেল সোসায়িটি" স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সমস্ত মানবে ভ্রাতৃভাবস্থাপন; প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনাও এই সম্প্রদায়ের অন্যতর উদ্দেশ্য। ইঁহারা বলেন যে, দূরস্থ লোকদের আত্মায় আত্মায় যোগ আছে এবং দূরে অবস্থিত হইয়াও একে অন্যের মনোভাব অবগত হইতে পারেন। ইঁহারা আরও বলেন যে, জীবিত মনুষ্য পরলোকগত আত্মার সহিত অনায়াসে আলাপ করিতে পারেন এবং পরলোকগত মহাত্মাদের সাহায্যে অন্যান্য আত্মার সহিতও পরিচয় করিতে পারেন। যদি এই মতবাদ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়, তবে চার্ব্বাক প্রভৃতি দার্শনিকগণের লোকায়তবাদ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে।

আ

আইটো (মার্কুইস, হিরোবুমি)—জাপানের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ। এই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞের বিষয় জানিতে হইলে গত রুষ জাপান যুদ্ধের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা আবশ্যক। এই রুষজাপ যুদ্ধ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ; এত লোকক্ষয় অপর কোন যুদ্ধে হয় নাই, আর এত যুদ্ধকৌশলও কোন যুদ্ধে প্রদর্শিত হয় নাই। এই কালান্তক সমর বিগত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ইহার অবসান হয়; ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩টা ৪৭ মিনিটের সময় উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের দ্বারা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে এই যুদ্ধের অবসান হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়।

এই জন্য রুষজাপান যুদ্ধের সহিত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা আলোচনা করা আবশ্যক।

১৮৬০ খৃঃ যখন ইংরেজ ও ফরাসী চীনরাজধানী পিকিন অধিকার করিয়া বসেন, তখন তদানীন্তন রুষ মন্ত্রী ইগ্‌নাটিয়েক চীন মন্ত্রী প্রিন্স কংকে বলেন যে, যদি চীন রুষকে একটু স্থান ছাড়িয়া দেন, তবে রুষ, ইংরেজ ও ফরাসীকে পিকিন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন। অদূরদর্শী চীন মন্ত্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; তিনি বুঝিলেন না যে ইংরেজ ও ফরাসী পিকিন অধিকার করিতে আসেন নাই। তাঁহারা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু অর্থ পাইলে, আপনা হইতেই পিকিন ছাড়িয়া যাইবেন। বস্তুতঃ ইংরেজ ও ফরাসী আপন হইতেই পিকিন ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। স্থূলবুদ্ধি চীন মনে করিলেন যে, তাঁহাদের নূতন বন্ধু রুষের ভয়েই ইংরেজ ও ফরাসী পিকিন পরিত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে রুষ মাঞ্চুরিয়ার সমস্ত পূর্ব্ব উপকূলভাগ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০০ ছয় শত মাইল স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই উপকূলে ব্লাডিভষ্টক বন্দর অবস্থিত। ৩০ বৎসর ব্যাপী চেষ্টায় রুষ এই বন্দরটীকে সুদৃঢ়, সুরক্ষিত, দুর্লঙ্ঘ্যদুর্গসমন্বিত এবং রণ-পোতের আশ্রয়স্থান করিয়া তুলিলেন। অনন্তর ১৮৯১ খৃঃ রুষ সাইবিরিয়ার মধ্য দিয়া ব্লাডিভষ্টক পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রেলপথ নির্ম্মাণ করিলেন। ব্লাডিভষ্টক এরূপ সুরক্ষিত ও দৃঢ় হইলেও উহা চীনের পিচিলি উপসাগরস্থ আর্থার বন্দরের তুলনায় সামান্য। পোর্ট আর্থার মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৯৫ খৃঃ জাপানের সহিত চীনের যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধের ফলে কোরিয়া স্বাধীন হইল এবং জাপান পোর্ট আর্থার অধিকার করিয়া বসিলেন। যখন চীন ও জাপানে ১৮৯৫ খৃঃ সন্ধি হয়, তখন রুষ মন্ত্রীর মনে ঈর্ষ্যা প্রজ্বলিত হইল। জাপান মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে এত বড় বন্দর দখল করিবে, ইহা তাঁহাদের সহ্য হইল না; তিনি আপত্তি করিলেন। রুষিয়ার প্ররোচনায় ফ্রান্স ও জর্ম্মণী একমত হইলেন। এইরূপে রুষের চক্রান্তে জাপান যুদ্ধজয়ের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া রুষের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং রুষের গতি বিধির উপর তীব্রদৃষ্টি রাখিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ রুষিয়া চীনের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক "রুষচীনীয় ব্যাঙ্ক" খুলিলেন। স্থির হইল এই ব্যাঙ্কে রুষীয় ও চীনীয় লোক ব্যতীত কেহ অংশীদার হইতে পারিবে না; এই ব্যাঙ্কের অধিকাংশই রুষের টাকা। এক রেল কোম্পানি স্থাপিত হইল; এই কোম্পানি পূর্ব্ব রুষিয়াতে রেলপথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে রুষের টাকায় তাঁহাদেরই তত্বাবধানে চীনের নামে রেলপথ প্রস্তুত হইল। সন্ধির সর্ত্তানুসারে রুষ রেলপথ নির্ম্মাণোপলক্ষে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন; সন্ধির সর্ত্তানুসারে রেলষ্টেসনগুলিও কোম্পানির দখলে রহিল। কিন্তু রুষের ইঙ্গিতে রেল কোম্পানি প্রত্যেক ষ্টেশনে এত স্থান অধিকার করিয়া লইলেন যেন তাহার প্রত্যেকটাতে এক একটা রুষীয় সৈন্যনিবাস হইতে পারে। রুষীয় ইঞ্জিনিয়ারের রক্ষার্থ কয়েকজন রুষ সৈন্য রাখা আবশ্যক, এই ছলে প্রত্যেক ষ্টেশনে বহুসংখ্যক রুষ সৈন্য রাখা হইতে লাগিল; ইহাতে বহুসংখ্যক রুষ সৈন্য মাঞ্চুরিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই চীন জাপান যুদ্ধে চীনের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হওয়াতে ইউরোপীয় শক্তি-নিচয় চীনে প্রবেশ করিবার সূত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ চীনীয়দের হস্তে জর্ম্মণীর কয়েকজন ধর্ম্ম-প্রচারকের মৃত্যু হওয়াতে চীনকে জর্ম্মণীর সন্তোষবিধানার্থ পীত সাগরের তীরবর্ত্তী কাউচাউ নগর বাণিজ্যের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিতে হয়। কাউচাউ জর্ম্মণীর অধিকারে আসিল; এই সময়ে রুষও পোর্ট আর্থারে শীত ঋতুতে তাঁহাদের প্রশান্তসাগরীয় রণপোত সমূহ রাখিবার জন্য চীনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। চীন সম্রাট্ রুষিয়ার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন; অনতিবিলম্বে যুদ্ধ জাহাজগুলি পোর্ট আর্থারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রণপোতসমূহ পিচিলি সাগরে উপস্থিত হইলে, রুষ চীনের নিকট কিছুকালের জন্য পোর্ট আর্থার 'ইজারা' চাহিলেন; রুষের পথানুসরণ করিয়া জর্ম্মণীও 'কাউচাউ' ইজারা চাহিলেন। ইংরেজ আপত্তি করিলেও, তাঁহারা ঐ ইজারা পাইলেন। রুষ জাহাজ এপর্য্যন্ত শীতকালে তুষারাচ্ছন্ন ব্লাডিভষ্টকের বাহিরে থাকিয়া জাপান সমুদ্রের বাত্যাতে তাড়িত হইত। এখন জাহাজগুলি

পোর্ট-আর্থারে আসিয়া নিরাপদ হইল। ১৮৯৯ খৃঃ এক ইংরেজ কোম্পানি রেলবর্ম্ম প্রস্তুত করিবার অনুমতি পান। এইরূপে পিচিলিতে পীতসাগরের তীরে রুষ, ফরাসী, ইংরেজ, জর্ম্মণী সকলেই বাণিজ্যের জন্য কিছু কিছু স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাতে পিচিলি উপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশের চীনীয়দের অসুবিধা হইল; একদল চীনবাসী চীন গবর্ণমেণ্টের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল; তাঁহারা চীন গবর্ণমেণ্টকে "স্বজাতিদ্রোহী" আখ্যা দিলেন। অসন্তোষ চীনীয় সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অসন্তোষের ফলে ১৯০০ খৃঃ "বক্সার" যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চীনীয়েরা বহু ইয়োরোপীয় ধর্ম্মযাজকের প্রাণ সংহার করেন। চীনের রাজধানী পিকিন সহরে জর্ম্মণ রাজদূত হত হইলেন এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় রাজদূতগণেরও বাটী আক্রান্ত হইল। এই বিদ্রোহ দমন করা চীন সম্রাটের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ইয়োরোপীয় রাজগণ প্রতিশোধবাসনায় বহু সহস্র সৈন্য রাজধানী পিকিন নগর অবরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন। ইংরেজের অনুরোধে জাপানও ২০ হাজার সৈন্য পিকিনে প্রেরণ করিলেন। পিকিন বৈদেশিক সৈন্যের অধিকারে আসিল; রুষ মাঞ্চুরিয়াতে বহু সহস্র সৈন্য সহ দৃঢ় হইয়া বসিলেন; চীন সম্রাট্ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তে প্রস্থান করিলেন। বিখ্যাত চীন মন্ত্রী লি হংচংএর চেষ্টায় চীনের সহিত ইয়োরোপীয় শক্তি-নিচয় ও জাপানের সন্ধি হইল। এই সন্ধিতে অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে এই এক সর্ত্ত ছিল যে, রুষকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তানুসারে কাজ হইতে লাগিল, কিন্তু রুষ আর মাঞ্চুরিয়া ছাড়িলেন না, অধিকন্তু কোরিয়াতে প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। জাপান দেখিলেন যে, যদি রুষ মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়াতে প্রাধান্য স্থাপন করেন, তবে তাঁহার ভবিষ্যদুন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে এবং কালে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করাও দুষ্কর হইবে। ইহা ভাবিয়া জাপান রুষকে মাঞ্চুরিয়া হইতে তাড়াইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। জাপান রুষ সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, রুষিয়াকে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিতে হইবে; চীনীয়েরাই প্রকৃত পক্ষে কেবল মাঞ্চুরিয়া শাসন করিবে এবং পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তগুলি কার্য্যে পরিণত হইতেছে কি না ইহা দেখিবার জন্য তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ মাঞ্চুরিয়ার প্রধান প্রধান নগরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। রুষ সম্রাট্ জাপানের প্রস্তাবগুলির কোন সদুত্তর না দিয়া বিবেচনার সময় লইতে লাগিলেন এবং গোপনে গোপনে মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্যবল বৃদ্ধি ও যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জাপান তীব্র পত্র লিখিলেন; কিন্তু রুষ তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া আপোষের জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চিঠি লেখালেখিতে সময় যাইতে লাগিল; এই অবসরে রুষ রেলপথ রক্ষার ভাণ করিয়া পোর্ট-আর্থারে ৩০০ কামান এবং মাঞ্চুরিয়ার নানাস্থানে লক্ষাধিক সৈন্য আনিয়া ফেলিলেন। জাপান রুষিয়ার নিকট উত্তরের জন্য তীব্র পত্র লিখিলেন; রুষ ইহার উত্তরে বলিলেন যে, তাঁহারা মাঞ্চুরিয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জাপানের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিবেন, কিন্তু তাঁহারা কোরিয়া রাজ্যটীকে জাপানের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইতে চাহিলেন। জাপান চীনের সহিত যুদ্ধ করিয়া, বহুরক্ত-পাতে, কোরিয়াকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন; এখন কোন প্রকার প্রলোভনেই তাঁহারা কোরিয়ার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারেন না। জাপান সম্রাট্ রুষসম্রাটকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিবেন না এবং এই পত্রই তাঁহার শেষ পত্র। ২২ দিন চলিয়া গেল তথাপি এই শেষপত্রের উত্তর দেওয়া হইল না দেখিয়া, জাপানের সম্রাট্ ১৯০৪ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী তাগিদ দিলেন। রুষ এই তাগিদেরও কোন উত্তর দিলেন না, বরং গোপনে গোপনে যুদ্ধোদ্যম করিতে লাগিলেন। এক রাত্রিতে রুষ সেনাপতি পোর্ট আর্থার হইতে বহু সৈন্য যুদ্ধ জাহাজে উঠাইয়া কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার মধ্যবর্ত্তী ইয়ালু নদীর তীরে রাখিয়া আসিলেন। জাপান সম্রাট্ তাগিদ দিয়াও নিজ পত্রের উত্তর পাইলেন না দেখিয়া, রুষিয়ার রাজধানী হইতে নিজ দূতকে চলিয়া আসিতে বলিলেন। জাপান দূত চলিয়া আসাতে বুঝা গেল যুদ্ধ আরম্ভের আর বিলম্ব নাই। হলণ্ডের হেগ নগরে ইয়োরোপীয় রাজগণের এক শান্তিসভা আছে; এই সভাতে রুষ এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ যে, তিনি কাহারও সহিত প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন না। এক্ষেত্রে রুষ চতুরতাপূর্ব্বক জাপানকে দিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করাইতে

চেষ্টা করিলেন। তিনি জাপানের পত্রের উত্তর না দিয়া মাঞ্চুরিয়াতে কেবল সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ পাঠাইতে লাগিলেন। জাপান সম্রাট্ দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৯০৪ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

৮ই তারিখের রাত্রি ১২টার সময় জাপানের যুদ্ধ জাহাজগুলি এড্‌মিরাল টগোর অধ্যক্ষতায় পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিল। রুষিয়ার ক্রুইজার "পালাডা" ডুবিয়া গেল এবং রণপোত "রেট্‌ভিসান" ও "জারেভিচ্" অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই যুদ্ধে রুষ পক্ষে ১৭ জন হত ও ৬৪ জন আহত এবং জাপপক্ষে ৪ জন হত ও ৩০ জন আহত হইল। ৯ই তারিখের পোর্ট আর্থারের জলযুদ্ধে রুষের তিনখানা যুদ্ধ জাহাজ নষ্টপ্রায় হইয়াছিল এবং চিমাল্‌পো নামক রুষীয় বন্দরে দুইখানা ক্রুইজার নষ্ট হইয়াছিল। এই তারিখেই "চিমাল্‌পোতে" জাপসৈন্য অবতরণ করে এবং ইয়ালু নদীর দিকে অগ্রসর হয়। এখন হইতে দিনরাত্রি ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৩ই তারিখে রুষের একখানা জাহাজ নষ্ট হয় এবং ৯৬ জন হত ও ৪০ জন আহত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রুষিয়ার মোট ১১ খানি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হইয়াছিল; জাপানের মাত্র একখানা ক্রুইজার নষ্ট হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। রুষীয় সম্রাট্ জানাইলেন যে, জাপান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তাঁহার যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ তিনি লইবেন; এই বলিয়া আরও ৬খানি যুদ্ধ জাহাজ বাল্টিক সাগর হইতে জাপানের দিকে প্রেরণ করিলেন। ১০ই মার্চ্চ তারিখে এডমিরাল টগো যুদ্ধ জাহাজ লইয়া পোর্ট আর্থার আক্রমণ করেন; উভয় পক্ষের বহুসৈন্য হতাহত হইল, ৪ খানা রণতরী ডুবিয়া গেল। ১৫ই তারিখে এক লক্ষ জাপান সৈন্য কোরিয়াতে উপস্থিত হইল; আরও ৮০ হাজার তাহার পশ্চাতে আসিয়া যোগ দিল। এই সময়ের মধ্যে জাপানীরা পোর্ট আর্থারের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা মেরামত করিবার জন্য রুষ তথায় ৩০০ ইঞ্জিনিয়ার প্রেরণ করেন। সমস্ত মার্চ্চ মাস এড্‌মিরাল টগো পোর্ট আর্থার বন্দরের মুখ বন্ধ করিতে সচেষ্ট থাকেন। রুষীয় সেনা প্রাণপণ করিয়া পোর্ট আর্থার রক্ষা করিতে লাগিল। ১০ই মে পর্য্যন্ত বহু জল ও স্থল যুদ্ধ হয়; স্থল যুদ্ধের মধ্যে ইয়ালুনদীর তীরবর্ত্তী যুদ্ধই প্রধান। এই যুদ্ধে জাপানীরা জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে জাপ পক্ষে ৩০ জন সৈনিক কর্ম্মচারী ও ৮৭০ জন সেনা হতাহত হয় এবং রুষ পক্ষে ৭০ জন সৈনিক কর্ম্মচারী ও ২৩২৪ জন সৈন্য হতাহত হয়। যাহাতে স্থলপথে রুষসৈন্য পোর্ট আর্থারে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য জাপসৈন্য রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; রুষসৈন্য বহুকষ্টে সেই রেলপথ পুনরায় মেরামত করিয়া লইল। রুষীয় নৌসেনাপতি প্রাণপণে পোর্ট আর্থারের মুখ খোলা রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এড্‌মিরাল টগোর অধ্যবসায়বলে পিচিলি উপসাগর দিয়া পোর্ট অর্থারে প্রবেশের পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। এই সময়ে সমস্ত রুষীয় স্থল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন বিখ্যাত জেনারেল কুরুপাট্‌কিন এবং নৌসেনাপতি ছিলেন ম্যাকারফ। জাপান স্থলসৈন্যের অধিনায়ক হইলেন মার্কুইস মার্শেল ওয়ামা। মার্শেল ওয়ামার অধীন জেনারেল কাউণ্ট নগি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জাপান নৌসৈন্যের অধিনায়ক হইলেন এড্‌মিরাল টগো (টগো দেখ)। লাওটাং উপদ্বীপের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে পোর্ট আর্থার বন্দরে প্রবেশ করিতে হইলে, পিচিলি উপসাগর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই পথ এডমিরাল টগো প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম ভাগেই রুষ নৌসেনাপতি ম্যাকারফ পরাজিত হইয়া জাহাজডুবিতে প্রাণত্যাগ করেন।

লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও কোরিয়া উপদ্বীপের মধ্যে পীত সাগরের এক শাখা বর্ত্তমান। এই সাগরশাখার পশ্চিম ও পূর্ব্ব তীরস্থ নানা বন্দরে জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বশাখার চিমাল্‌পো বন্দরে যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিন (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ খৃঃ) জাপ সৈন্য অবতরণ করে, তৎপর পিশিয়াং বন্দরে অবতরণ করে; এই উভয় সৈন্য কোরিয়ার মধ্যদিয়া ইয়ালু নদীর তীরে উপস্থিত হয়। ইয়ালু নদীর মুখ হইতে পোর্ট-আর্থার ২৫০ মাইল দূরে দক্ষিণ

পশ্চিমে অবস্থিত। ইয়ালু নদীর মুখ হইতে প্রায় ৯০ মাইল পশ্চিমে টাকুসান বন্দর ; এখানেও একদল জাপ সৈন্য অবতরণ করে। টাকুসান হইতে পিটস্যুও বন্দর প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ; ইহা রুষের অধিকৃত ছিল ; জাপান নৌসেনাপতি ১৯০৪ সনের ৫ই মে ইহা অধিকার করিয়া এখানে ৩দিন ব্যাপিয়া জাপান স্থলসৈন্য অবতরণ করাইয়া দেন। পিট্‌স্যুওর প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ডালনি বন্দর, ইহাও রুষের অধিকৃত ছিল। জাপ সেনাপতি ১৯০৪ খৃঃ জুন মাসে ইহা অধিকার করিয়া এখানে স্থলসৈন্য অবতরণ করান। পোর্টআর্থার হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যদিয়া রেলপথ মাঞ্চুরিয়ার প্রান্ত সীমাস্থ মুগডেন নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। জাপ সৈন্য ইয়ালু নদীর তীরে রুষকে পরাজিত করিয়া মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের অভিমুখে উত্তর পশ্চিমদিকে দ্রুতপদে চলিল। টাকুসান, পিটস্যুও এবং ডালনী বন্দরে যে সকল জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে, তাহারাও ঐ রেল পথের দিকে প্রবল বেগে যাত্রা করিল। জেনারেল নগি স্থলপথে অগ্রসর হইয়া পোর্ট আর্থার অবরোধ করিয়াছেন এবং টগো জলপথে পোর্ট আর্থারে প্রবেশের পথবন্ধ করিয়াছেন। এই সমুদয় সৈন্য রেলপথের উপরে নানাস্থানে রুষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিল। রেলপথের উপরিস্থ টেলিস্যু নগর ১৫ই জুন, কাইগিং নগর ৯ই জুলাই, টাসিচিও নগর ২৪শে জুলাই জেনারেল ওকু অধিকার করেন। ১৫ই জুন ওয়াফস্ক নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ১০ হাজার রুষ সৈন্য হত, আহত ও বন্দী হয়। টাসিচিও হইতে জাপ সৈন্য রেলপথ ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং জেনারেল ওকু নিউচাং নগর অধিকার করেন। নিউচাং নগরে একদল সৈন্য রাখিয়া জাপ সৈন্য রেলপথের উপর দিয়া মেইচাং নগরের দিকে অগ্রসর হন। মেইচাং এর রুষ সৈন্য ক্রমাগত পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া ভয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এই সময়ে ব্লাডিভষ্টকের রুষ নৌসেনাপতি স্ক্রাইড্‌লফ্ জাপানীদের দুইখানি রণপোত ডুবাইয়া দেয়, ইহাতে জাপের ১০০০ সৈন্য মারা যায়। ইয়ালু নদীর তীরে যে জাপ সৈন্য ১লা মে তারিখে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহারা উত্তর পশ্চিম দিকে রেলপথের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে ২৬শে জুন তারিখে মটিনলিং নামক স্থানে রুষ সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ৩০শে আগষ্ট তারিখে রেলপথের উপরস্থিত লিয়াওং নগরে উপস্থিত হয়। এখানে জাপ সৈন্যের সহিত রুষ সৈন্যের সংঘর্ষ হয় এবং জাপ জয়লাভ করে। এই সময়ে ১৯শে জুলাই তারিখে জাপ সৈন্য রুষকে কিয়াটুং নামক স্থানে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ১০০০ হাজার রুষ ও ৩৪৩২ জন জাপসৈন্য হত হয়। ২৯শে জুলাই নগি ভয়ানক যুদ্ধ করেন ; এই তারিখে আর্থার বন্দর জাপ হস্তে পতনোন্মুখ হয়। এই যুদ্ধে জাপের চৌদ্দ হাজার সৈন্য মারা যায়। লিয়াওংএর যুদ্ধ ৩০শে আগষ্ট হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হয় ; কুরুপাটকিনের সেনা পরাভূত হয়। উভয় পক্ষে দশ হাজার করিয়া মোট ২০ হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে হত হয়। উভয় পক্ষে মোট ১৩ শত কামান এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল ; জাপ পক্ষে অধিক সংখ্যক কামান ছিল। প্রত্যেক পক্ষে আড়াই লক্ষের অধিক সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। লিয়াওংএর যুদ্ধের পর রুষ সৈন্য নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এখনও সেনাপতি ষ্টোয়েসেল অমিতবিক্রমে পোর্ট আর্থার রক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে রুষ নৌ-সেনাপতি, এডমিরেল টোগোর সহিত নৌ-যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তিনি যে জাহাজে ছিলেন তাহা জলমগ্ন হওয়াতে প্রাণত্যাগ করেন। ১০ই আগষ্ট পোর্ট আর্থার হইতে ৬ খানি রণতরী, ৪ খানি ক্রুইজার এবং কয়েকখানি টর্পেডো বোট পলায়ন করে। ১১ই আগষ্ট হইতে ৫ দিন পর্য্যন্ত নগি এক পর্ব্বতের উপর হইতে আর্থার বন্দরের উপর কামানের সাহায্যে গোলাবৃষ্টি করেন। ইহাতে বহু রুষ সৈন্য হতাহত হয়। জেনারেল নগি এক লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য লইয়া স্থলপথে পোর্ট আর্থার অবরোধ করিয়াছিল ; পোর্ট আর্থারস্থিত রুষ সৈন্যসংখ্যা তখন মাত্র ১২ হাজার। ৮ই হইতে ১৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রুষ পক্ষে ২৫৫ জন হত ও ১৬৮৮ জন আহত হইয়াছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর নগি এরূপ বেগে পোর্ট আর্থার আক্রমণ করেন যে, তাহাতে ৮ শত রুষ অশ্বারোহী সৈন্য হত হয়। একে একে পোর্ট আর্থারের দুর্গ সকল নগির হস্তগত হইতে লাগিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর জেনারেল নগি পোর্ট আর্থারস্থ ৬টী দুর্গ

অধিকার করেন। রুষ সম্রাট এই সময়ে জেনারেল গ্রিপেনবর্গকে আর একদল সৈন্য সহ মাঞ্চুরিয়াতে প্রেরণ করেন। তাঁহাকে জেনারেল কুরুপাটকিনের উপদেশ মতে কার্য্য করিতে বলা হইয়াছিল। পোর্ট আর্থারে ১৯শে আগষ্ট হইতে ২৪শে আগষ্টের মধ্যে ৬ দিনে ১৪ হাজার জাপ সৈন্য হত হইয়াছিল। এদিকে লিয়াওংএর ভীষণ যুদ্ধের পর জাপ সৈন্য সাহোর দিকে অগ্রসর হয়। এই নগর হো নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। হো নদী রেলপথ কাটিয়া পূর্ব্বদিকে সাগরাভিমুখে গিয়াছে। অক্টোবরের ১৯শে হইতে ২১শে পর্য্যন্ত সাহো নগরে কুরুপাটকিনের সহিত জেনারেল ওকুর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ১২ হাজার রুষ সৈন্য হতাহত হয়। জেনারেল ওকু জয় লাভ করেন।

জেনারেল কুরুপাটকিন হো নদী উত্তীর্ণ হইয়া মুকডেনের দিকে চলিয়া গেলেন; জাপসৈন্যও নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। এদিকে এড্‌মিরাল টগো রুষ যুদ্ধ জাহাজ গুলির অধিকাংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন; উহার কতকগুলি ডুবাইয়া দিলেন আর কতকগুলি ধরিয়া লইয়া গেলেন; মাত্র অল্প কয়েক খান যুদ্ধ জাহাজ ব্লাডিভষ্টক বন্দরে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। রুষ সম্রাট্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, একজন রুষ জীবিত থাকিতেও তিনি যুদ্ধ ছাড়িবেন না। তাই তিনি বালটিক সাগরের রণপোতমালা প্রশান্ত মহাসাগরে প্রেরণ করিলেন। এই রণপোতমালাতে ৪০ খানি উৎকৃষ্ট যুদ্ধ জাহাজ ছিল। পৃথিবীর লোক বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল, এই ৪০ খানি রণতরী পোর্ট আর্থারে পৌঁছিয়া না জানি কি অদ্ভুত কাণ্ডই করে। অনেকে মনে করিল এবার রুষিয়া জাপানকে নৌ-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জাপান অধিকার করিবে। সকলেই এডমিরেল টগোর গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিলেন। বাল্টিক রণপোতমালা দ্রুতগতিতে আসিতে লাগিল। এদিকে জেনারেল ব্যারণ কুরুকি, কাউণ্ট ওকু ও কাউণ্ট নড্‌জু স্ব স্ব সৈন্যদল লইয়া কুরুপাটকিনের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ইঁহারা সকলেই মুকডেনের নিকট উপস্থিত হইয়া ছাউনি করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদলে প্রায়প্রত্যহই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষই বড় যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। মুকডেন হইতে বৈকাল হ্রদের মধ্যে যতগুলি রুষীয় হাসপাতাল আছে, সমুদয়গুলিই আহত সৈন্যে পূর্ণ; এই হাসপাতালগুলিতে ৮৬ হাজারেরও অধিক আহত সৈন্য চিকিৎসিত হইতেছিল। ১৬ই নবেম্বর পোর্ট আর্থারের রুষ সেনাপতি জেনারেল ষ্টোয়েসেল আহত হইয়া হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হইলেন। তথাপি তিনি সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন না। তিনি হাসপাতাল হইতে সৈন্যদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা যেন আত্মসমর্পণ না করে। কিন্তু রুষীয় সৈন্য নিরন্তর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় সাহস নাই, শক্তি নাই; তাহারা নিরাশায় ডুবিয়া পড়িয়াছে। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে পোর্ট আর্থারে যে কয়খানা রণতরী ছিল, জাপানীদের গোলাবর্ষণে প্রায় সমুদয় বিধ্বস্ত হইয়াগেল; ২।৩ খানা মাত্র যুদ্ধ জাহাজ রক্ষা পাইয়াছিল; সেগুলি বন্দর হইতে পলাইয়া ব্লাডিভষ্টকের দিকে চলিয়া গেল। এই সময়েই রুষিয়াতে শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তনের জন্য লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রধান মন্ত্রী গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিদ্রোহের চিহ্ন রাজ্যের সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতে লাগিল।

১৯০৫ সনের ১লা জানুয়ারী জেনারেল ষ্টোয়েসেল পোর্ট আর্থার রক্ষা করিতে না পারিয়া জেনারেল নগির হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে ষ্টোয়েসেল রুষ সম্রাটের নিকট এক চিঠি লিখিয়া আত্মসমর্পণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ২৪ হাজার রুষ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে পীড়িত ও আহত ১৬ হাজার। যে সমুদয় সেনানী জাপানের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধরিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহাদিগকে রুষিয়াতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল। বহু সেনানী এইরূপ চুক্তিতে সম্মত না হইয়া জাপানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী জেনারেল নগি পোর্ট আর্থার রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং বহু সহস্র সৈন্য সহ মুকডেনের দিকে দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল কুরুকি প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। জেনারেল গ্রিপেনবর্গ, জেনারেল কুরুপাটকিনের অধীন থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া রুষিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুকডেনের রুষ সৈন্যগণ

পোর্ট আর্থারের পতনে নিরুৎসাহ হইয়াছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী মুকডেনের দক্ষিণে দুইদিন ব্যাপী যুদ্ধ হয়; ইহাতে দুই হাজার রুষ সৈন্য আহত হয় এবং ৩টা কামান জাপানীরা অধিকার করে। মুকডেনের ১১ মাইল দক্ষিণে ব্যারণ কুরুকি, কাউণ্ট ওকু, নডজু ও কাউণ্ট নগি এই চারিজন সেনাপতির অধীনে ৪ দল জাপ সৈন্য কুরু পাটকিনকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। ৪ঠা মার্চ্চের যুদ্ধে দুই হাজার জাপানীয় ও ৩ হাজার রুষীয় সৈন্য হতাহত হয়।

৬ই মার্চ্চ জেনারেল নগি মুগডেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭ই হইতে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বভাগে জাপানের প্রথম সেনাদল লইয়া জেনারেল কুরুকি, মধ্যভাগে ৪র্থ সেনাদল লইয়া জেনারেল নড্‌জু এবং পশ্চিমভাগে ৩য় সেনাদল লইয়া জেনারেল নগি ও তৎপশ্চাৎ দ্বিতীয় সেনাদলসহ জেনারেল ওকু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬ দিন ক্রমাগত দিন রাত্রি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। জেনারেল কুরুকি জেনারেল লিনিভিচ্‌কে, জেনারেল নড্‌জু জেনারেল বিলুডার্লিংকে এবং জেনারেল নগি ও ওকু জেনারেল কলবাসকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। জাপ পক্ষে ৫ লক্ষ ও রুষ পক্ষে ৪ লক্ষ মোট ৯ লক্ষ সৈন্য এই মুকডেন ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে। ১৯০৫ খৃঃ ১২ই মার্চ্চ এই লোকান্তক যুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধে জাপ পক্ষে ৫৭০০০ হাজারেরও অধিক লোক হতাহত হয় এবং রুষ পক্ষে একলক্ষ ৩৫ হাজার হতাহত ও ৪০ হাজার সৈন্য বন্দী হয়। উভয় পক্ষে প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কিউবা দ্বীপ লইয়া স্পেন ও আমেরিকায় যে যুদ্ধ হয় তাহাতে যত বারুদ, গোলাগুলি খরচ হইয়াছিল, একমাত্র মুগডেনের যুদ্ধে তদপেক্ষা অধিক বারুদ ও গোলাগুলি খরচ হয়। এতদপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দৃষ্ট হয় না। এই যুদ্ধে রুষসেনাপতি কুরুপাট্‌কিন পরাজিত হইয়া প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্যসহ টিনলিং এর দিকে প্রস্থান করেন। সেনাপতি কুরুপাট্‌কিন মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে চলিয়া গেলেন; তাঁহার স্থানে লিনিভিচ্‌ প্রধান সেনাপতি হইলেন। রুষের স্থলযুদ্ধ জয়ের আশা ফুরাইল। এখন বাল্টিক বাহিনীর উপর একমাত্র ভরসা রহিল। বাল্টিক বাহিনী নৌসেনাপতি রোজডেভেনস্কির অধ্যক্ষতায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৯ই এপ্রিল এই পোতমালা শিঙ্গাপুর অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে উপস্থিত হইল। কুরুপাট্‌কিনের প্রস্থানের পর জাপানীয় সেনাপতিদিগের সহিত জেনারেল লিনিভিচের বহু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়; অধিকাংশ যুদ্ধেই রুষ পরাজিত হন।

বাল্‌টিক রণপোতসমূহ প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া জাপান সাগরে উপস্থিত হইল। এইস্থানে এড্‌মিরেল টোগো বাল্টিক পোতমালা আক্রমণ করিলেন। রুষীয় যুদ্ধ জাহাজগুলি টোগোর ক্ষিপ্রকারিতায় ও যুদ্ধনিপুণতায় অল্প সময়ের মধ্যেই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল; কতকগুলি ধৃত হইল। স্বয়ং রুষনৌসেনাপতি রোজ্‌ডেভেনস্কি আহত হইয়া বন্দী হইলেন। রুষের সমুদয় আশা ভরসা বাল্‌টিক পোতমালার সহিত প্রশান্ত সাগরের তলে ডুবিয়া গেল। এই জল যুদ্ধ সুসিমা নামক স্থানের অদূরে সমুদ্রে সঙ্ঘটিত হয় বলিয়া ইহা সুসিমাযুদ্ধ নামে খ্যাত।

ইহার পর সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এই সময়ে জাপানীয়েরা জাপান সাম্রাজ্যের অতি নিকটে উত্তর দিকে অবস্থিত সাগালিয়ান দ্বীপ অধিকার করিয়া বসিলেন। রুষসৈন্য সাগালিয়ন দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া মাঞ্চুরিয়াতে চলিয়া গেল।

সন্ধির কথাবার্ত্তা অনেকটা অগ্রসর হইল; যুদ্ধ স্থগিত হইল। যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হইলেন। রুষ পক্ষ হইতে কাউণ্ট ডিঃ উইট এবং জাপ পক্ষ হইতে জাপানের পররাষ্ট্র সচিব ব্যারণ-কমুরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া আমেরিকায় পোটস্‌মাউথ নগরে উপস্থিত হইলেন। ১৯০৫ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা অপরাহ্ণ তিনটা ৪৭ মিনিটের সময় উভয় পক্ষের প্রতিনিধি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। সন্ধিতে স্থির হইল, লিয়াওটাং উপদ্বীপ, পোর্ট আর্থার ও ইলিয়ট দ্বীপ পুঞ্জ জাপানের অধিকারে থাকিবে। রুষিয়ার যে সমুদয় যুদ্ধ জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ জাপান গবর্ণমেণ্ট ধৃত করিয়াছেন এবং যে সমুদয় জাহাজ জলমগ্ন আছে, তাহা জাপান প্রাপ্ত হইবেন

কিন্তু রুষিয়ার যে সকল যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজ নিরপেক্ষ বন্দরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহা রুষের থাকিবে। সাগালিয়ান দ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধ জাপানের অধীনে থাকিবে, উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্ববৎ রুষিয়ার শাসনেই থাকিবে। উভয়পক্ষ মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিবে। কোরিয়া সাম্রাজ্য জাপানের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে। হার্ব্বিন হইতে আর্থার বন্দর পর্য্যন্ত রুষিয়ার রেলপথ জাপানের অধিকারে আসিবে; ব্লাডিভষ্টক রেলপথ পূর্ব্ববৎ রুষিয়ারই থাকিবে। চীনসাম্রাজ্যে কোনও বৈদেশিক শক্তির অধিকার থাকিবে না; উক্ত সাম্রাজ্যে বৈদেশিক রাজগণের বাণিজ্যাধিকার সমান থাকিবে। যুদ্ধের ব্যয় একপক্ষ অপর পক্ষের উপর দাবী করিতে পারিবে না, কিন্তু বন্দী রুষসৈন্যদের জন্য জাপানের যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা জাপান রুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন। এই সন্ধিতে জাপানের মহানুভবতা ও ত্যাগস্বীকার প্রকাশ পাইয়াছে। কাউণ্ট্ নগির ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতি জাপান সাম্রাজ্যে দৃষ্ট হয় না। তিনি বাহিরে কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দিয়া থাকেন; এই কালান্তক সমরে তাঁহার দুইটী পুত্রই হত হয়, কিন্তু এজন্যও কেহই তাঁহার চক্ষে শোকাশ্রু দেখে নাই। কাউণ্ট নগি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, কিন্তু তিনি গৃহে দরিদ্রলোকের ন্যায় বাস করেন; তাঁহার চাল চলনে একটুও জাঁকজমক নাই, কিছুমাত্র বিলাসিতার চিহ্ন তাহাতে দৃষ্ট হয় না। প্রধান সেনাপতি মার্কুইস ওয়ামার বয়স ৬৫ বৎসর। রুষজাপ যুদ্ধে ইঁহার রণ-পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ সৈন্যপরিচালনশক্তি দেখিয়া সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। ইনি ১৮৯৪ খৃঃ সঙ্ঘটিত চীন জাপ যুদ্ধে মাত্র ৮০০০০ হাজার সৈন্য লইয়া জয়লাভ করেন। ইঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন। ব্যারণ কুরুকি ও কাউণ্ট নডজু উভয়েই বৃদ্ধ, উভয়েরই বয়স ৬৪ বৎসর, উভয়েই রণ-নিপুণ বলিয়া জাপানে খ্যাত। কাউণ্ট ওকুর বয়স ৬৮ বৎসর। বৃদ্ধ হইলেও ইঁহার মুখশ্রী এখনও সুন্দর এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত; ইনিও একজন্ প্রধান বীর পুরুষ বলিয়া জাপানে খ্যাত। সর্ব্বোপরি মার্কুইস হিরোবুমি আইটো। ইনি জাপানের চাণক্য; ইঁহার ন্যায় মন্ত্রণানিপুণ ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি জাপান সাম্রাজ্যে আর দ্বিতীয় নাই। ইনি ইউরোপে যাইয়া উন্নত প্রণালীতে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং জাপানে প্রত্যাগমন করিয়া ইউরোপের অনুকরণে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করেন। ইনি জাপানে রাজনীতি এবং শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার সাধন করেন, এই সংস্কার ফলেই জাপান জগতের মধ্যে এত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; জাপানের সমস্ত লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। জাপান সম্রাটের অনুরোধে তিনি কোরিয়া রাজ্যে জাপান রাজপ্রতিনিধিরূপে কর্ম্ম করিতেছিলেন। অল্পকাল হইল কোরিয়ার এক গুপ্ত ঘাতকের গুলিতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। জাপান সম্রাটকে জাপানীরা মিকাডো বলে; মিকাডো শব্দের অর্থ "দেবতার প্রতিনিধি"। জাপানের বর্ত্তমান মিকাডোর নাম মৎসুহিতো। ইনি ১৮৫২ খৃঃ ৩রা নবেম্বর রাজধানী কিয়টো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খৃঃ কিয়টোনগর হইতে রাজধানী জেডোনগরে স্থানান্তরিত হয় এবং এই বৎসরই "জেডো" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া টোকিয়ো (অর্থাৎ "প্রাচ্যরাজধানী") হয়। মিকাডো মৎসুহিতো অতি বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ নরপতি। ইঁহার মহিষীর নাম হারুকো। মহিষী ১৮৫০ খৃঃ ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৯ খৃঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মিকাডোর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে মিকাডোর দশটী সন্তান হয়; সন্তানগণের মধ্যে পাঁচটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে চারিজন অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন, তৃতীয় পুত্র যশোহিত হারুনোয়া এখন যুবরাজ। কন্যাগণের মধ্যে চারিজন বর্ত্তমান আছেন। এই যুবরাজ ১৮৭৯ খৃঃ ৩১শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। যুবরাজ পত্নীর নাম সাদাকো। যুবরাজের তিনটী পুত্র; তাঁহাদের নাম হিরোহিত, যাশুহিত, নবুহিত।

এই লোকবিনাশন যুদ্ধে রুষপক্ষে ১৬ জন এড্‌মিরাল নৌযুদ্ধে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এলেক্সিফপ্রমুখ ৪ জন অপমানিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; রোজ্‌ডেভেনস্কি প্রমুখ ৭জন জাপহস্তে বন্দী হন; ম্যাকরফ প্রমুখ ৪জন হত হন এবং এডমিরাল জেস্সুরু যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত ব্লাডিভষ্টকে অবস্থিত ছিলেন। ২৮ জন রুষীয় জেনারেল

স্থলযুদ্ধে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পোর্ট আর্থারের বিখ্যাত ষ্টোয়েসেল দীর্ঘকাল রুষকারাগারে বন্দী থাকিয়া অবশেষে সৈনিক আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন কিন্তু পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সম্রাটের আদেশে মুক্তি লাভ করেন। গ্রিপেনবার্গ প্রমুখ ৩ জন অপমানিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কেপার প্রমুখ ৬ জন যুদ্ধে নিহত হন; প্রধান সেনাপতি কুরুপাট্‌কিন প্রমুখ ৩ জন পদাবনত হন এবং অবশিষ্ট লিনিভিচ্ প্রমুখ তিন জন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। লিনিভিচ্ প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

আউটরাম (সার্ জেমস লেফটেনাণ্ট জেনারেল, জি, সি, বি)—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডার্ব্বিসায়রে ১৭২৫ শকে (১৮০৩ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিলাতে সৈনিক কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৭৪১ শকে (ইং ১৮১৯ খৃঃ) এক নিম্ন সৈনিক কর্ম্মচারিরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বহুস্থানে সরকারী কার্য্যে গমন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতপদে আরোহণ করিতে থাকেন। ইনি আফগান যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্রমে গুজরাটের পলিটিকাল এজেণ্ট, সিন্ধুদেশের কমিশনার, সেতারার রেসিডেণ্ট ও বরদার রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। বড় লাট লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যাপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের খাসে আনিয়া আউটরামকে তথায় কমিশনার নিযুক্ত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় অযোধ্যাপ্রদেশের বিদ্রোহদমনে ইনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে অযোধ্যার চিফ্ কমিশনার নিযুক্ত করেন এবং 'লেফটেনেণ্ট জেনারেল' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর ইনি বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে মনোনীত হন। ১৭৮৫ শকে (ইং ১৮৬৩ খৃঃ) ইনি ফ্রান্সের রাজধানী পারিশ নগরে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গড়ের মাঠে ইঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

আন্‌সারী—গজনীর বিখ্যাত সোলতান আহ্‌মুদের রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী। ইনি অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইনি একাধারে কবি ও দার্শনিক ছিলেন। তদানীন্তন গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শত পণ্ডিত ও কবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সোলতান মাহ্‌মুদের কার্য্যাবলী অবলম্বন করিয়া একখানা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখেন। তিনি ৩০ হাজার শ্লোকে একখানা দেওয়ান (Diwan) লিখেন। তিনি ১040 খৃষ্টাব্দে সোলতান মাহ্‌মুদের পুত্র সোলতান মসাউদ (১ম) এর রাজত্ব সময়ে দেহত্যাগ করেন।

আনারকলি—ইঁহার অপর নাম নাদিরা বেগম। এই স্ত্রীলোকটি জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় বর্ত্তমান ছিল। প্রবাদ এই যে এই রমণী যুবরাজ সলিমের দাসী ছিল; এবং ইহার সহিত সলিমের আসক্তি জন্মিয়াছিল। সম্রাট্ আকবর ইহা জানিতে পারিয়া জীবিতাবস্থায় ইহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। এই ঘটনা লাহোরের অনতিদুরে ঘটে। ইহার নামানুসারে স্থানটির ও তন্নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম আনারকলি হইয়াছে; যে বাড়ীতে আনারকলি থাকিত সেই বাড়ীটি এখন সাহেবদের গির্জ্জাঘর হইয়াছে। এই দালানের গায়ে প্রণয়ের গভীরতাসূচক একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে।

আবু-ইউসুফ্ (ইমাম)—বাগদাদের একজন বিখ্যাত কাজী। ইনি বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অর রসিদের রাজত্বে প্রধান বিচারপতি আবু-হানিফার ছাত্র। জন্ম ৭৩১ খৃষ্টাব্দে; মৃত্যু ৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর। তিনি "আদাব-উল-কাজী" নামে একখানি গ্রন্থ লিখেন; এই গ্রন্থে শাসনকর্ত্তার কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা লিখিত হইয়াছে।

আবু-ওবায়দা—ইনি মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মোহাম্মদের একজন সহচর ছিলেন। তিনি প্রথম খলিফা আবু-বকরের রাজত্ব সময় প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন কিন্তু গ্রীস সম্রাটের প্রেরিত সৈন্যের নিকট পরাভূত হওয়াতে তিনি পদচ্যুত হন। তখন এই প্রধান সেনাধ্যক্ষের পদ খালিদ্‌কে দেওয়া হয়। আবু বকরের

মৃত্যুর পর ওমার খলিফা পদে আসীন হইয়া আবু-ওবায়দাকে পুনরায় সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। ইনি পালেষ্টাইন ও সিরিয়া জয় করেন এবং গ্রীসীয় সৈন্যদিগকে ভূমধ্যসাগর হইতে ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ হইতে তাড়াইয়া দেন (৬৩৯ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে সিরিয়াতে এক মহামারী (Plague) উপস্থিত হয়। এই মহামারীতে ২৫০০০ মুসলমান প্রাণত্যাগ করে; ওবায়দাও এই ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবু জাফর মোহাম্মদ বিন-আলী বিন-বাবওয়াইহি অল্ কুমি—ইনি শিয়ামতাবলম্বী মুসলমান। শিয়াদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন কোরান লেখক ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি শিয়াদিগের আচার, রীতি, নীতি ও প্রাচীন আখ্যায়িকা সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে ইনি ১৭২ খানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রাচুর্ভাব সময় নিরূপণ করা কঠিন। কেহ বলেন ইনি ৯৪২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন; আবার কেহ বলেন যে ৯৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইনি বাগ্দাদ নগরে গমন করেন তখন ইঁহার পূর্ণ যৌবন।

আবুবকর সিদ্দিক—মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মোহাম্মদের পত্নী আয়েশার জনক। মোহম্মদ ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং ইঁহার সত্যবাদিতার জন্য মোহাম্মদ ইঁহাকে সিদ্দিক অর্থাৎ "সত্যবাদী" উপনাম দান করেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইনিই প্রথম খলিফা পদে বৃত হন। ইনি দুই চান্দ্র বৎসর ৩ মাস ৯ দিন খলিফা পদে আসীন থাকিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার দেহত্যাগ করেন। (মোহাম্মদ দেখ)।

আবু মসলেম—বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি। ইঁহার সাহায্যে আব্বাস্ বংশ খলিফা পদলাভে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি সদাশয় ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহারই ক্ষমতাবলে খলিফাপদ ওমায়া বংশ হইতে আব্বাস্ বংশে আসে এবং আব্বাস্ বংশের এক ব্যক্তি ১২শ খলিফা পদে বৃত হন। এই অন্তর্ব্বিবাদে প্রায় ৬ লক্ষ লোক নিহত হয়। যখন আব্বাস্ বংশের দ্বিতীয় খলিফা আবু-জাফর আল-মনসুরের সিংহাসন লাভের সময় আলীর পুত্র আবদুল্লা আপত্তি উপস্থিত করেন, তখন উক্ত আবুজাফর্ ইঁহাকে আব্দুল্লার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আব্দুল্লা ইঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া বস্রায় পলায়ন করেন। আবু-জাফর আল-মনসুরের এত উপকার করিলেও তিনি কৃতঘ্নতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইঁহাকে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং ইঁহার শব সমাহিত না করিয়া টাইগ্রিস্ নদীতে ফেলিয়া দেন।

আবু-মুসা জাফরাল্ সুফী ইনি আরবীয় রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistery) উদ্ভাবক। ইনি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকের মত এই যে তিনি খোরাসানের অন্তর্গত তুষ (Tus) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়ন সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেন এবং তাঁহার প্রবন্ধগুলি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় এবং ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

আবু-রায়হান্ আল্ বেরুণী—এই বিখ্যাত পণ্ডিত জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ইতিহাস, দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গজনীর সোলতান মামুদ ও মাসুদের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বেরুণী নামক নগরে ৯৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন যে তাহা একটা উষ্ট্রেও বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিত না। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে "তারিখ-উল্-হিন্দ" নামক গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কোয়ানুন মাসুদি (Qanun Masudi) নামক অপর একখানা গ্রন্থ তিনি গজনীর তদানীন্তন সোতলান মামুদকে উৎসর্গ করেন। সোলতান মামুদ এই উৎসর্গীকৃত গ্রন্থ খানার জন্য ইঁহাকে এক হস্তী যতগুলি রৌপ্যমুদ্রা বহন করিয়া আনিতে পারিয়াছিল ততগুলি রৌপ্যমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইঁহার জ্যোতিষিক গণনা সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা নিম্নে লিখিত হইল:—একদিন সোলতান মামুদ বলিলেন যে তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে যে দ্বার দিয়া বাহির হইবেন তাহা আল-বেরুণীকে বলিয়া দিতে হইবে। আল-বেরুণী স্বীয় গণনার ফল একখানা কাগজে লিখিয়া সোলতানের হস্তে দিলেন। প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব্বে উহা সোলতানকে দেখিতে নিষেধ করিলেন।

সোলতান মামুদ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বাহির না হইয়া দেওয়াল ভগ্ন করাইয়া বাহির হইলেন। অনন্তর কাগজখানা খুলিয়া দেখিলেন যে তিনি প্রকোষ্ঠের যে স্থান দিয়া বাহির হইয়াছেন ঠিক সেই স্থানই উহাতে নির্দ্দিষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে। সোলতান আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; তিনি মনে করিলেন যে জ্যোতিষী নিশ্চয়ই যাদুকর (Sorcerer); ইহা মনে করিয়া প্রকাশ্যে তিনি আল-বেরুণীকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং তাঁহাকে দালানের গবাক্ষ দিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিবার সময় সোলতানের কর্ম্মচারীরা এক কোমল শয্যা ভূমিতে পাতিয়া রাখিয়াছিলেন; আল-বেরুণী গবাক্ষ হইতে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া উক্ত শয্যার উপরে পতিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার শরীরে বিশেষ আঘাত লাগিতে পারে নাই। তিনি সুস্থ শরীরে সোলতানের নিকট উপস্থিত হইলেন। সোলতান মামুদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গবাক্ষ হইতে ভূমিতে পতনের বিষয় তিনি গণিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন কি না। আল-বেরুণী বলিলেন এ সমুদয়ই তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে লিখিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া তাঁহার গৃহ হইতে আনয়ন করা হইল। সোলতান দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে সেই দিনের সমস্ত ঘটনাই উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

আবু-সয়ীদ-মির্জ্জা (সোলতান)—ইনি বিখ্যাত তৈমুরের বা আবু-তৈমুরের (Tamurlane) প্রপৌত্র এবং সোলতান মোহাম্মদ মির্জ্জার পুত্র। ইনি ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মির্জ্জা আব্দুল্লাকে নিহত করিয়া সমরকন্দের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি তাঁহার রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি একদিন সহসা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দী হন ও শত্রুহস্তে নিহত হন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারি এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু সময়ে তিনি ১১টি পুত্র রাখিয়া যান, তন্মধ্যে ৪ জন বিভিন্ন স্থানের রাজা হন যথা:—একজন কাবুলের, একজন আন্দিজান ও ফরাগানের, অপর পুত্র কুন্দুজ ও বদকসানের এবং মির্জ্জা সোলতান আহ্‌মদ সমরকন্দের সিংহাসন লাভ করেন। কথিত আছে যে সোলতান আবু-সয়ীদ মির্জ্জা লেখাপড়ি জানিতেন না।

আবু-সীনা (বা আবু আলী সীনা)—বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক ও চিকিৎসক। তিনি সাহিত্য, গণিত ও উদ্ভিদ্ বিদ্যাতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি চিকিৎসানৈপুণ্যে বাগ্দাদের সোলতানের চিকিৎসক পদ লাভ করেন। ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বুখারা নামক নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫৪ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অত্যন্ত সুরাসক্ত ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন। এই সমুদয় দোষ থাকিলেও তিনি পণ্ডিত বলিয়া সকলের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দর্শন, গণিত, জ্যামিতি, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও চিকিৎসাদি বিষয়ে ১০০ খানা পুস্তক লিখেন; ইহার অধিকাংশই এখন পাওয়া যায় না।

আবুল ফরাজ্—ইনি আওরন নামক এক খৃষ্টান চিকিৎসকের পুত্র। ইনি ১২২৬ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত মালাসিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান ইউফ্রেটিশ নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটবর্ত্তী। ইনি প্রথমে পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করেন কিন্তু পরে ইহা পরিত্যাগ করিয়া ২০ বৎসর বয়সে গুবা নামক স্থানে পাদ্রি (বিশপ) পদে বৃত হন। ইনি একখানা ইতিহাস লিখেন। এই ইতিহাসের নাম মুক্তাসির-উদ্-দওয়াল (Mukhtasir-ud-Dawal)। এই ইতিহাসে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও হিব্রুভাষার অধ্যাপক ডাক্তার পোকক (Dr. Pococke) ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের এক সংস্করণ বাহির করেন। এই সংস্করণে মূল আরবী সহ লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

আবুল মাশার—বিখ্যাত আরবীয় জ্যোতির্ব্বিদ। ইনি খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে বাগ্দাদের খলিফা আল্-মামুনের রাজত্বসময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান বাহ্লিক (Balkh)। ইনি আরবীয় জ্যোতির্ব্বিদ্-গণের রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ইঁহার প্রণীত জ্যোতিষিক গ্রন্থের নাম কিতাব-উল-উলুফ (Kitab-ul-Uluf),

তিনি এই গ্রন্থ কোন সংস্কৃত জ্যোতিষিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন। ৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি জ্যোতিষ সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থগুলি পরবর্ত্তীকালে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস (Venice) নগরে লাটিন অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আব্দুল কাদের জিলানি (গিলানি) ওরফে পীর-ই দাস্তগীর—একজন মুসলমান সাধু। তিনি পারস্যের অন্তর্গত গিলান (বা জিলান) নামক স্থানে ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনে অনেক অতিমানুষিক কার্য্য (Miracles) লোকদিগকে দেখাইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাধুতার জন্য লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয় এবং বাগ্দাদ নগরে তাঁহার মৃতদেহের সমাধি হয়। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ ভক্ত মুসলমানগণ অতি সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তিনি অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

আব্দুল মত্তালিব—মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মোহাম্মদের পিতামহ। ইঁহার পিতার নাম হাসিম। ইনি সাধু ও ন্যায়পরায়ণ লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঈশ্বর ইশমাইলের মাতা হাগরকে যে কূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত দুর্গমস্থানে অবস্থিত থাকাতে, লোকে ইহা দেখিতে পায় নাই। অবশেষে এক আশ্চর্য্য উপায়ে মত্তালিব এই কূপ আবিষ্কার করেন। ভক্ত মুসলমানগণ এই কূপের জল হিন্দুদের গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র বলিয়া মনে করেন এবং এই জল বতলে ভরিয়া তাহারা নানা দিগ্দেশে লইয়া যান। মত্তালিবের ১০টা পুত্র জন্মে তন্মধ্যে আলীর পিতা আবুতালিব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং মোহাম্মদের পিতা আব্দুল্লা ৬ষ্ঠ সন্তান। অনুমান ৫৭৯ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

আব্দুল মালিক (১)—বিখ্যাত আরবীয় চিকিৎসক। ইঁহার পিতার নাম জুহার (Zuhr). ইঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই চিকিৎসক ছিলেন। ইনি ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে ইনি ১৩৫ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সুস্থশরীরেই বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এক বৃহৎগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; এই গ্রন্থ ১২৮০ খৃষ্টাব্দে হিব্রুভাষায় এবং পরবর্ত্তী কালে লটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ঔষধ ও আহারতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল।

আব্দুল মালিক—(২) ডামস্কাসের ৫ম খলিফা। ইঁহার পিতার নাম প্রথম মারওয়ান। ইনি ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল পিতার মৃত্যুর পর খলিফাপদে বৃত হন। ইঁহার সময়ে পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমে স্পেন পর্য্যন্ত মুসলমান ক্ষমতা বিস্তার লাভ করে। ইনি ২১ চান্দ্র বৎসর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ৭০৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ১৬টি পুত্র জন্মে ; তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠপুত্র ১ম ওয়ালিদ তদীয় মৃত্যুর পর খলিফা পদে আসীন হন।

আব্দুল্লা মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মোহাম্মদের জনক। ইঁহার পিতার নাম আব্দুল মত্তালিব ও পিতামহ হাসিম। ইনি অত্যন্ত সুশ্রীপুরুষ ছিলেন এবং ইঁহার পত্নী আমিনাও অতিশয় রূপলাবণ্যবতী রমণী ছিলেন। ইনি উষ্ট্রচালকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পিতার জীবদ্দশাতেই, আনুমানিক ৫৭১ খৃষ্টাব্দে, ইঁহার মৃত্যু হয় ; কাজেই বৃদ্ধ পিতার উপর মোহাম্মদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। এই বৃদ্ধের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আবু তালিব মোহাম্মদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। (মোহাম্মদ দেখ)।

আব্দুল্লা কুতুব শাহ্—হায়দরাবাদের অন্তর্গত গোলকুণ্ডার কুতুব শাহি বংশের ষষ্ঠ সোলতান। তিনি প্রথমে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সহিত মিত্রভাবে তদীয় রক্ষণাবেক্ষণেই ছিলেন কিন্তু পরে কোন কারণে সম্রাটের অবাধ্য হন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব রুষ্ট হইয়া তদীয় রাজ্য আক্রমণ করেন। সোলতান আব্দুল্লা পরাজিত হইয়া এক কোটি মুদ্রার বিনিময়ে সম্রাটের ক্ষমালাভ করেন এবং সম্রাটের পুত্র সোলতান মোহাম্মদের সহিত স্বীয়

কন্যার বিবাহ দেন। এই সময় হইতে আব্দুল্লা দিল্লীর সম্রাটের অধীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণনীয় হইলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আব্দুল্লা খাঁ (সৈয়দ) – ইঁহার উপাধি কুতুব্-উল্‌মুল্‌ক। ইনি দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুর শাহের সময় এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার ভ্রাতার নাম সৈয়দ-হোসেন আলী খাঁ। বাহাদুর শাহের পর সম্রাট্ ফেরক্‌শিয়ার এই দুই সৈয়দ ভ্রাতার সাহায্যে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। ফেরক্ শিয়ার সম্রাট্ হইয়াই সৈয়দ অব্দুল্লা খাঁকে কুতুব্-উল্-মুল্‌ক উপাধি দিয়া স্বীয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। ইনি পরবর্ত্তী সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহ্ কর্ত্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং ৩ বৎসর কারাগারে ক্লেশ ভোগ করিয়া ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কারাগারেই দেহত্যাগ করেন।

আব্বাস—আব্দুল মত্তালিবের পুত্র এবং মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহাম্মদের পিতৃব্য। তিনি প্রথমে মোহাম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের বিরোধী ছিলেন কিন্তু বদরক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের মত আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মতের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে এজন্য তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। তিনি মোহাম্মদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত প্রচার করিতে যাইয়া মোহাম্মদের সঙ্গে থাকিয়া হুনাইল ক্ষেত্রে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। আব্বাসের সমাধি মন্দির মদিনায় বর্ত্তমান আছে। তাঁহার মৃত্যুর ১০০ চান্দ্র বৎসর পরে আবুল-আব্বাস নামক তদীয় এক বংশধর বাগ্‌দাদে খলিফা হন। এই আব্বাস বংশ ৫২৪ চান্দ্র বৎসর বাগ্দাদে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

আমির-তৈমুর - ইনি তৈমুরলঙ্গ (Tamurlane) নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন সগ্‌ডেনিয়ার (Sogdania) অন্তর্গত কুশ (Kush) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন ইনি এক রাখালের পুত্র; আবার কেহ বলেন যে ইনি পারস্য বিজয়ী বিখ্যাত চেঙ্গিস খাঁর বংশসম্ভূত। তিনি সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল খোরাসানের রাজধানী বাহ্লিক (Balkh) অধিকার করেন এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা আমির হোসেনকে বধ করিয়া তদীয় সিংহাসন অধিকার করেন এবং তাঁহার ভগিনীকে বিবাহ করেন। তৎপর তিনি কান্দাহার, পারস্য ও বাগ্দাদ জয় করেন এবং এক প্রবল বাহিনী লইয়া ভারতে প্রবেশ করেন ও ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর দিল্লী অধিকার করেন। এই সময়ের মধ্যে বাগ্দাদ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহা অবগত হইয়া প্রভূত ধনরত্ন লইয়া তৈমুর দিল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক বাগ্দাদের দিকে অগ্রসর হন। এই নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি ৮০ হাজার অধিবাসীর প্রাণদণ্ড করেন ও নগর লুণ্ঠন করেন। অতঃপর তিনি তুরস্ক আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। তুরস্কের সোলতান বায়েজিদ্ ইহা অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তৈমুরকে আক্রমণ করিতে সসৈন্যে ধাবিত হন। ফ্রিজিয়াতে উভয় সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ হয়; তিন দিন যুদ্ধের পর বায়েজিদ্ পরাজিত ও তৈমুরের হস্তে পতিত হন (১৪০২ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই)। তৈমুর তাঁহাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করেন। (বায়েজিদ দেখ) অতঃপর তিনি মিশর জয় করিয়া কায়েরো হইতে মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করেন। এই সমুদয় যুদ্ধজয়ের পর তিনি সমরকন্দ নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইয়োরোপের অনেক রাজা উপঢৌকনসহ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর তিনি চীন সাম্রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করেন কিন্তু হঠাৎ কাল তাঁহাকে সংসার হইতে অবসৃত করেন (১৪০৫ খৃষ্টাব্দ ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুসময়ে তাঁহার ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি ভারতে মোগলরাজবংশের স্থাপয়িতা বাবরের পূর্ব্ব পুরুষ। তাঁহার ৪ পুত্র ছিল, মৃত্যু সময়ে দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিল কিন্তু কোন পুত্রকেই রাজ্য না দিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তান পীর মোহাম্মদকে এক উইল দ্বারা উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

এই পৌত্র গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে তৈমুরের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌রুখ মির্জ্জা সমরকন্দের সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

আয়েশা—আবু বক্‌রের কন্যা ও মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহাম্মদের প্রিয়তমা পত্নী। ইঁহার গর্ভজাত কোন সন্তান ছিল না। ইনি মোহাম্মদের তৃতীয় পত্নী; বিবাহের সময় ইঁহার বয়স মাত্র ৭ বৎসর ছিল। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর যখন আলী খলিফা পদ লাভের চেষ্টা করেন, তখন ইনি আলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ইঁহার সৈন্যের সহিত আলীর সৈন্যের বহু যুদ্ধ হয়; অবশেষে ইনি পরাজিত ও ধৃত হইয়া আলীর নিকট প্রেরিত হন। আলী ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মুসলমানগণ ইঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকেন। ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আরিষ্টটল—বিখ্যাত গ্রীসদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি ৩৮৪ পূঃ খৃঃ ষ্টাগিরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা নিকোমেকাস্ প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের পিতামহের চিকিৎসক ছিলেন। আরিষ্টটল ১৭ শ বর্ষ বয়সে বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য হন। ইনি মাসিডনের রাজা ফিলিপকর্ত্তৃক তৎপুত্র বিখ্যাত আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি এই শিক্ষকতা কার্য্যে এত যশস্বী হইয়াছিলেন যে রাজা ফিলিপ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহার সম্মানার্থ ও স্মরণার্থ ইঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। আলেক-জাণ্ডারের দিগ্বিজয় যাত্রার সময় ইনি তৎসঙ্গে যাইতে অসম্মত হইয়া এথেন্সে গিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিল। এথেন্সে বসিয়া তিনি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। এখান হইতে তিনি ইউবিয়ার অন্তর্গত ক্যালকিশ্ নগরে গমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল তথায় অতিবাহিত করেন। তিনি গণিত, অলঙ্কার, কাব্য, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখেন। ৩২৩ পূঃ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

আর্কিমিডিস্—ইটালীর সমীপবর্ত্তী সিসিলিদ্বীপের অন্তর্গত সিরাকুজ নগরে ২৮৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। সিরাকুজের রাজা হায়রো ইঁহার পরম সুহৃদ্ ও সহায় ছিলেন। দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সময় সিরাকুজবাসী গ্রীকগণ কার্থেজীয়দের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই বিখ্যাত গণিতজ্ঞও জাতিতে গ্রীক ছিলেন এবং ইনি কার্থেজীয়দের পক্ষভুক্ত ছিলেন। বহুবার বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করিয়া ইনি রোমীয় সেনাপতিকে জয়লাভে নিরাশ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ন্যুব্জপৃষ্ঠ দর্পণে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া রোমীয় যুদ্ধজাহাজে রশ্মিসমূহ কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। আলোকসমাহার কেন্দ্র যুদ্ধজাহাজের দাহ্য পদার্থে পতিত হওয়াতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজখানা ভস্মীভূত হয়। যখন রোমীয় সৈন্য সিরাকুজ নগর অধিকার করে, তখন আর্কিমিডিস্ স্বগৃহে গণিতের আলোচনায় গভীর ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। বাহিরের রণনাদ ও আহত সৈন্যের আর্ত্তনাদ এবং জনসঙ্ঘের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; এ সমুদয়ের কিছুতেই তাঁহার অভিনিবেশ ভঙ্গ হয় নাই। একজন রোমীয় সৈন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকছিন্ন করিতে তরবারি উত্তোলিত করিয়াছে, এমন সময় আর্কিমিডিস্ বলিলেন "ওহে, একটু থাম, আমার প্রমাণটী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।" মূর্খ সৈনিক তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না; সে এক আঘাতেই আর্কিমিডিসের মস্তক কণ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। রোমীয় সেনাপতির কর্ণে এই সংবাদ গেলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি সম্মানের সহিত তাঁহার শব সমাহিত করিলেন। এই ঘটনা ২১২ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

একদিন আর্কিমিডিসের বন্ধু সিরাকুজ রাজ হায়েরো একটা স্বর্ণমুকুট নির্ম্মাণ করাইয়া আনয়ন করেন কিন্তু স্বর্ণকারের উপর সন্দেহ করিয়া ঐ মুকুটে অন্য কোন ধাতু মিশ্রিত আছে কি না তাহা পরীক্ষার্থ আর্কিমিডিস্‌কে অনুরোধ করেন। আর্কিমিডিস্ বহু চিন্তা করিলেন কিন্তু কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছিলেন না।

পরদিন তিনি সাধারণ স্নানাগারে গিয়া স্নানার্থ জলপূর্ণ টবে অবতরণ করিয়াছেন, এমন সময়ে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে কতকটা জল টব হইতে উছলাইয়া পড়িয়া গেল এবং তাঁহার শরীরের ওজনও অনেকটা কম বোধ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি স্থির করিলেন যে উচ্ছলিত জলের আয়তন তাঁহার শরীরের আয়তনের সমান এবং এই সমানায়তন জলের উর্দ্ধচাপের দরুণ তাঁহার শরীরের ওজন লঘু বোধ হইতেছে। ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াই তিনি টব হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং "ইউরিকা, ইউরিকা" অর্থাৎ আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি, বলিয়া অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় দৌড়িতে দৌড়িতে গৃহে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর অল্পায়াসেই পরীক্ষণদ্বারা নির্ণয় করিলেন যে মুকুটে অন্য ধাতু মিশ্রিত আছে। রাজা প্রমাণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। স্বর্ণকারও অপরাধ স্বীকার করিয়া রাজার ক্ষমা ভিক্ষা করিল। রাজা বন্ধুকে পুরস্কৃত করিলেন ও স্বর্ণকারকে ক্ষমা করিলেন। এই পরীক্ষণ-দ্বারা এই সত্য আবিষ্কৃত হইল যে তরল পদার্থে কোন বস্তু নিমজ্জিত করিলে উহার সমঘন আয়তনবিশিষ্ট তরল পদার্থের যত ভার তত ভার উক্ত পদার্থ হইতে কমিয়া যায়। এই আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা আর্কিমিডিস্ জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

আরজুমন্দবানুবেগম—ইনি মমতাজমহল বা তাজমহল বা তাজবিবি নামেও পরিচিত। ইনি আসফ খাঁর দুহিতা ও জাহাঙ্গীরপত্নী বিখ্যাত নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং সম্রাট শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন (শাহ্‌জাহান দেখ)। সম্রাটের ঔরসে ইঁহার অনেক সন্তান জন্মে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ডহর আরা নাম্নী কন্যার জন্ম সময়ে ইনি প্রাণত্যাগ করেন (১৬৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই)। এই ঘটনা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বুরহানপুর নগরে ঘটে। তথায় জৈনাবাদ নামক উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়; পরে এই মৃতদেহ আগ্রায় আনয়ন করা হয়। এই মৃতদেহের উপর জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নামে এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

আলাউদ্দীন—দিল্লীর খিলিজিবংশীয় ২য় সম্রাট। ইনি ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২০ বৎসর রাজত্বের পর ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইনি চিতোরের মহারাণী পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন (পদ্মিনী দেখ)। তিনি একটি নূতন ধর্ম্মমত সংস্থাপন ও দিল্লীতে একজন প্রতিনিধি রাখিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তিনি রাজসিংহাসনে বসিয়াই "সেকান্দর সেনী" অর্থাৎ দ্বিতীয় আলকজেণ্ডার উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই নব উপাধি সংযোগে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন।

আল্-মনসুর—(১) ফাতেমা বংশের একজন খলিফা। ইনি বার্ব্বরি রাজ্যের দ্বিতীয় খলিফা বলিয়া পরিচিত।

(২) ইনি বিজয়ী আল্-মনসুর নামে পরিচিত। ইনি আববাস বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা। ইনি ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বাগ্দাদের অন্তর্গত ইরাক্ নামক স্থানে খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। আলীর পুত্র আব্দুল্লা ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আব্দুল্লা ডামাস্কাস নগরে খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। আব্দুল্লা আল্-মনসুরের প্রধান সেনাপতি আবুমসলেমের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হন (আবু-মসলেম দেখ)। ইনি অতিশয় পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ইঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। ইঁনিই টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগ্দাদ নগর স্থাপন করেন। ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মক্কা যাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার ধনাগারে ৬০ কোটি দিরহাম ও দুই কোটি ৪০ লক্ষ দিনার নামক মুদ্রা ছিল।

আল্কিবাইডিস্—প্রাচীন এথেন্সের বিখ্যাত যোদ্ধ্ পুরুষ। ইনি জগৎপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সক্রেটিশের শিষ্য ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি গুরুর উপদেশ বিস্মৃত হইয়া বিলাসিতার ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেন

ইনি ৪৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অলিম্পিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে তিনি গুণানুসারে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান বহুবার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। জন-সাধারণের নিকট প্রশংসা লাভের জন্য তিনি ক্রীড়ার পর দর্শকমণ্ডলীকে ভোজ দিতেন। ১৮শ বর্ষ বয়সে তিনি সক্রেটিশের সঙ্গে পটিডিয়ার যুদ্ধে গমন করেন এবং উক্ত দার্শনিক পণ্ডিত সঙ্কট সময়ে শিষ্যের জীবন রক্ষা করেন। আবার ডিলিয়মের যুদ্ধে উক্ত দার্শনিকের জীবন রক্ষা করিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন। পিলপনেসীয় যুদ্ধে তিনি এথেন্সের সেনাপতি হইয়া সিসিলি দ্বীপে গমন করেন ও সিরাকুজ নগর অবরোধ করেন। এদিকে এথেন্সে তাঁহার নামে এই অভিযোগ হয় যে তিনি রাজমার্গস্থ দেবমূর্ত্তি সকল বিকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সিরাকুজ হইতে তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশ দেওয়া হয় কিন্তু তিনি ভয়ে এথেন্সে না আসিয়া শত্রুনগরী স্পার্টায় গমন করেন এবং মাতৃভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে শত্রুদিগকে উত্তেজিত করেন। এই স্বদেশদ্রোহিতার জন্য তাঁহাকে জীবনে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি ৪০৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন।

আল্‌ফ্রেড্ (দি গ্রেট)—ইংলণ্ডের অন্তর্গত ওয়েসেক্সের বিখ্যাত রাজা। আল্‌ফ্রেডের সময় সমগ্র ইংলণ্ড এক রাজার অধীন ছিল না; উত্তরে এক রাজা, দক্ষিণে এক রাজা, মধ্যভাগে আর এক রাজা, ইত্যাদি। এইরূপে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এক সময়ে সাতজন রাজা রাজত্ব করিতেন। আল্‌ফ্রেড সমগ্র ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন না, এবং এই উপাধি কখনও তিনি দাবি করেন নাই। তাঁহার পিতা এথেল্ উল্‌ফ ও পিতামহ একবার্ট পূর্ব্বে এই ওয়েসেক্সেরই রাজা ছিলেন। উক্ত সাত রাজার মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইতেন তিনি ব্রিটোয়াল্‌ডা উপাধি পাইতেন। কোন বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ব্রিটোয়াল্‌ডার পরামর্শানুসারে অপর সকল রাজাকে কাজ করিতে হইত। আল্‌ফ্রেডের পিতামহ একবার্ট ইংলণ্ডের অপরাপর অংশের রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রিটোয়াল্‌ডা উপাধি লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অন্যান্য রাজাদিগের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই; তাঁহারা পূর্ব্ববৎ স্বাধীনই ছিলেন ৮৩৮ খৃঃ পিতামহ একবার্টের মৃত্যু হইলে পিতা এথেল্‌উল্‌ফ ওয়েসেক্সের রাজা হন। পিতার রাজত্বের একাদশ বৎসরে (৮৪৯ খৃঃ) বার্কসায়রে আল্‌ফ্রেড জন্মগ্রহণ করেন। আল্‌ফ্রেডের মাতা ওস্‌বার্ঘা অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। এথেল্‌উল্‌ফ ৮৫৫ খৃঃ কোন প্রয়োজনে ফ্রান্সে ৬ মাস কাল অবস্থিতি করেন। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের রাজা চার্লসের পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত তাঁহার প্রণয় হয়; এথেল্‌উল্‌ফের বয়স তখন ৫০ বৎসর। এথেল্‌উল্‌ফের প্রস্তাবে রাজা চার্লস বিবাহে সম্মতি দিলেন এবং ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর বিবাহ সম্পন্ন হইল। নববিবাহিত রাণী জুডিথকে লইয়া এথেল্‌উল্‌ফ ওয়েসেক্সে আসিলেন। জুডিথ রাজার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন; তিনি মস্তকে মুকুট ধারণ করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাণী ওস্‌বার্ঘা বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী কোন রাণী মস্তকে মুকুট ধারণ করেন নাই। দুই বৎসর পরে ৮৫৭ খৃঃ এথেল্‌উল্‌ফের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর সময় আল্‌ফ্রেডের বয়স ১০ বৎসর মাত্র ছিল। আল্‌ফ্রেডের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এথেল্‌বল্‌ড বিমাতা জুডিথের সমবয়স্ক ছিলেন। অচির কাল মধ্যেই ইঁহাদের প্রণয় হয় এবং জুডিথ সপত্নী পুত্র এথেল্‌বল্‌ডকে বিবাহ করেন। এই ধর্ম্মবিগর্হিত, আইন বিরুদ্ধ বিবাহ নানা বাদ প্রতিবাদের মধ্যে সম্পন্ন হইল; কিন্তু এথেল্‌বল্‌ড তিন বৎসর পরে ৮৬০ খৃঃ কালকবলে পতিত হন। ১৯ বৎসর বয়স্কা রাণী জুডিথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফ্রান্সে পিত্রালয়ে চলিয়া যান। এখানে তাঁহার পিতা চার্লস তাঁহার দুশ্চরিত্রতার জন্য তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। জুডিথ ফ্রান্সের কোন জমিদার সন্তানের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত রোমে পলায়ন করেন। রোমের পোপের মধ্যবর্ত্তিতায় চার্লস জুডিথের পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাঁহার এই তৃতীয় বিবাহে সম্মতি দেন। এই বিবাহের ফলে জুডিথের এক পুত্র ও ম্যাটিল্ডা নামে এক কন্যা জন্মে। জুডিথের এই পুত্রের সহিত তাঁহার সপত্নীপুত্র রাজা আল্‌ফ্রেডের জ্যেষ্ঠা কন্যা এল্‌ফ্রিডার বিবাহ হয় এবং

জুডিথের কন্যা ম্যাটিল্ডাকে ইংলণ্ডজয়ী ১ম উইলিয়ম বিবাহ করেন। আল্‌ফ্রেড ১৮শ বর্ষ বয়সে রাজত্ব প্রাপ্ত হন এবং মার্সিয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের দেড়মাস পরে ডেন্‌স নামক উত্তর সাগরীয় প্রবল দস্যুগণ সমস্ত ইংলণ্ড আক্রমণ করে। মার্সিয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করাতে ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রদেশের রাজারা আল্‌ফ্রেডকে সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে তাহারা ব্রিটোয়াল্‌ডা উপাধি দিয়া তাঁহারই পরামর্শানুসারে সমস্ত প্রদেশের রাজগণ ডেন্‌সগণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে আল্‌ফ্রেডের বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৮৭২ খৃঃ রাজত্বের প্রথম বর্ষেই আল্‌ফ্রেড ৮টী যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া আল্‌ফ্রেড ডেন্‌স-দিগের সহিত সন্ধি করেন। ডেন্‌সেরা ওয়েসেক্স পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের উত্তর ভাগ আক্রমণে গমন করে। ইত্যবসরে আল্‌ফ্রেড কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত করাইলেন। অল্পদিন পরেই আবার ডেন্‌সদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্যের সহিত এবার আর আল্‌ফ্রেড পারিয়া উঠিলেন না; তিনি পরাজিত হইয়া রাজধানী ত্যাগ করিলেন। ডেন্‌সরা রাজধানী অধিকার করিল এবং রাজবাড়ী ব্যতীত সহরের অপর সকল স্থান দগ্ধ করিল। আল্‌ফ্রেড কতিপয় মাত্র অনুচরসহ সোমারসেট্‌ সায়রে এথেল্‌নি নামক গ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে ছদ্মবেশে আশ্রয় লইলেন। একদিন গৃহস্থ-পত্নী চুল্লীর উপর স্থাপিত রুটি উল্টাইয়া দিবার জন্য আল্‌ফ্রেডকে আদেশ করিয়া কার্য্যান্তরে গেলেন; কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন রুটির এক পিঠ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; ইহাতে গৃহস্থ-পত্নী ক্রোধভরে আল্‌ফ্রেডকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। এদিকে কয়েক দিনের মধ্যে প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ হওয়াতে আল্‌ফ্রেড গৃহস্থ ও তৎপত্নীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ গমনে প্রস্তুত হইলেন। গৃহস্থ ও গৃহস্থ-পত্নী তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য রাজার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আল্‌ফ্রেড সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন এবং মিষ্টবচনে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে ডেন্‌সেরা পরাজিত হইল; আল্‌ফ্রেড্‌ ডেন্‌সদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপিত করিলেন। তিনি রাজ্যের নানাস্থানে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ও সৈন্যদিগকে উন্নত প্রণালীতে যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া নৌ-বল বৃদ্ধি করিলেন তিনি রাজ্যশাসনের জন্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন বিধিবদ্ধ করিলেন এবং হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত অপরাধীদের শাস্তি দিবার জন্য জুরীর বিচার প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র সুশিক্ষার বিস্তারের জন্য নানাস্থান হইতে জ্ঞানবান্‌ লোকদিগকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি রাজধানীতে উৎকৃষ্ট প্রাসাদশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে রাজ্যের নানাবিষয়ে উন্নতি সংসাধন করিয়া আল্‌ফ্রেড্‌ ৯০১ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার সাধ্বীপত্নী রাণী এল্‌সউইথা তাঁহার মৃত্যুর পর ৫ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং পুত্রের রাজত্ব সময়ে দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। আল্‌ফ্রেড মৃত্যুর সময় তাঁহার পতিপরায়ণা পত্নীর হস্তে প্রভূত অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন।

আল্‌-মামুন ওরফে আব্দুল্লা—ইনি আব্বাস বংশীয় ৭ম খলিফা। ইনি ৮১৩ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ নগরে খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। এই অভিষেক দিনে তদীয় ভ্রাতা আল-আমিন গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। তিনি স্বীয় সেনাপতি তাহির ইব্নে হোসেনকে বংশানুক্রমে ৮২০ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্ত্তৃত্ব দান করেন। এই শাসনকর্ত্তাকে অসীম ক্ষমতা দান করাতে খোরাসান রাজ্য ৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে খলিফাদিগের রাজ্য হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। ইঁহার রাজত্বে আফ্রিকাবাসী মুসলমানেরা সিসিলি দ্বীপ আক্রমণ করিয়া উহার অনেক স্থান অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত ইঁহার রাজত্বে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। আল্‌-মামুন ক্রীট্‌ দ্বীপ জয় করেন এবং তথা হইতে বহু গ্রীসীয় গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন। ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী বুরান তাঁহার মৃত্যুর পরও ৫৬ বৎসর জীবিত ছিলেন।

আলী—আবুতালিবের পুত্র ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহাম্মদের জামাতা। তৃতীয় খলিফা ওস্মানের মৃত্যুর পর

ইনি ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ খলিফা পদে বৃত হন। ৫৯৯ খৃষ্টাব্দে (হিজরী সালের ২৩ বৎসর পূর্ব্বে) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি তারিখে যখন তিনি কুফানগরীতে এক মসজিদে সান্ধ্য উপাসনা করিতেছিলেন, তখন আব্দুল রহমান ইবেন্মুলজিম নামক এক ব্যক্তি ইঁহাকে অস্ত্রাঘাত করেন। আহত হইয়া তিনি ৩ দিন জীবিত ছিলেন; ৪র্থ দিনে ২৫শে জানুয়ারি তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১২ জন ইমামের মধ্যে আলীই সর্ব্ব প্রথম; অপর ১১ জন ইমাম ইঁহার বংশধর। (মোহাম্মদ দেখ)।

আলী মাহাম্মদ খাঁ—রোহিলাদিগের দলপতি ও রোহিলারাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকজেণ্ডার (দি গ্রেট)—উত্তর গ্রীসে মাসিডন প্রদেশের বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী রাজা। ইঁহার পিতা ২য় ফিলিপ এবং মাতা ইপাইরসের রাজকন্যা ওলিম্পিয়াস্। ইনি ৩৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত দার্শনিকপণ্ডিত আরিষ্টটল আলেকজেণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন (অরিষ্টটল দেখ)। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডি॰ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃপুরুষকে শিক্ষাদানে গঠিত করিয়াছিলেন। আলেকজেণ্ডারের পিতা ২য় ফিলিপ কন্যাবিবাহের সময় গুপ্তঘাতকের হস্তে ৩৩৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে নিহত হন এবং আলেকজেণ্ডার ২০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতা এশিয়া-জয়ের আয়োজন করিতেছিলেন, পুত্র রাজপদে আসীন হইয়া আয়োজন পরিসমাপ্ত করিতে প্রয়াস পান। তিনি ৩৩৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে মাসিডনের উত্তরদিগ্বর্ত্তী অসভ্য জাতিগুলিকে দমন করিতে বহির্গত হইয়া দানিয়ুব নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের রাজাদিগকে পরাজয় করেন এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। ৩৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে বসন্ত কালে তিনি ত্রিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এশিয়া-জয়ে বহির্গত হন। আলেকজেণ্ডার এক মহাদেশ আক্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে তদুপযোগী সৈন্য ছিল না, অর্থাভাব তদপেক্ষা অধিক; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, মনে অসীম বল ছিল। তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে ৭ হাজার মাত্র খাস গ্রীসীয় সৈন্য; বাকী সৈন্য তাঁহার নিজ মাসিডোনিয়া রাজ্য ও তদধীন অপরাপর রাজ্য হইতে সংগৃহীত। গ্রীসীয়েরা সহজে আলেকজেণ্ডারের অধীন হইতে স্বীকৃত হইত না, এজন্য তিনি অল্পসংখ্যক গ্রীসীয় সৈন্য পাইয়াছিলেন; ইহাদের অনেকেই আবার পথে কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কর্ম্মপরিত্যাগকারিগণের মধ্যে মেম্নন নামে এক যোদ্ধৃপুরুষ পারস্য রাজ্যের সমস্ত নৌবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ৩৩৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ মেম্ননের মৃত্যু হওয়ায় আলেকজেণ্ডারের সুবিধা হয়, নচেৎ তাঁহার পক্ষে এশিয়া-জয় করা সহজ হইত না। গ্রীসীয় সৈন্য ব্যতীত আলেকজেণ্ডারের অপরাপর সৈন্য তাঁহার সবিশেষ অনুরক্ত ছিল; তাহাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার জন্যই আলেকজেণ্ডার দিগ্বিজয়ে সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে ডেরায়স্ কডোমেনস্ পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এই ডেরায়স দুর্ব্বলপ্রকৃতির নৃপতি; ইঁহার সময়ে পারস্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ৩৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেকজেণ্ডার গ্রানিকস্ নদীতীরে উপনীত হন; এই নদী মর্ম্মরা সাগরে পড়িয়াছে। এখানে পারস্যরাজের সহিত আলেকজেণ্ডারের প্রথম যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে শত্রুসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই সময়ে আলেকজেণ্ডার স্বয়ং দুইজন উচ্চপদস্থ পারস্য সৈনিক কর্ম্মচারীকে নিহত করেন। এই যুদ্ধে পারস্যরাজের পরাজয় হওয়াতে টরাস্ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ আলেকজেণ্ডারের হস্তগত হয়। যখন আলেকজেণ্ডার ফ্রিজিয়ার নিকটবর্ত্তী গর্ডিয়ান নগরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন উক্ত স্থানে প্রচলিত শকট গ্রন্থিমোচন সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনিতে পাইলেন। প্রবাদটী এই :—গর্ডিয়ান নগরে কোন শকটে একটী গ্রন্থি ছিল; যিনি এই গ্রন্থি মোচন করিতে পারিবেন, তিনি সমস্ত এশিয়ার উপর আধিপত্য লাভ করিবেন। এই জনরব শুনিয়া আলেকজেণ্ডার সৈন্যদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এক করাল করবাল হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এক আঘাতে গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইহার পর হেলিকারনেসাস্ নগরে যুদ্ধ হয়; এই নগরও অনতিবিলম্বে আলেকজেণ্ডারের হস্তগত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সকল নগরই আলেকজেণ্ডারের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। এই সময়ে হঠাৎ পারস্য রাজ্যের নৌসেনাপতি মেম্ননের মৃত্যু হওয়াতে ইজিয়ান সাগরের প্রধান উপদ্বীপগুলি আলেকজেণ্ডার অনায়াসে অধিকার করিয়া ফেলেন। মেম্ননের মৃত্যুতে

পারস্তরাজ ডেরায়সের যুদ্ধ জয়ের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। ইসাস্ নামক উপসাগরের তীরে ইসাস্ নগরের অনতিদূরে একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ত্রিশ সহস্র সৈন্সসহ স্বয়ং পারস্তরাজ ডেরায়স্ উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারস্তরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন এবং ইউফ্রেটিশ নদী উত্তীর্ণ হইয়া জীবন রক্ষা করেন; কিন্তু তাঁহার মহিষী শিশুপুত্রসহ আলেকজেণ্ডারের হস্তে পতিত হন। আলেকজেণ্ডার রাজপত্নী ও শিশুর প্রতি রাজযোগ্য সম্মান ও ভদ্রতা প্রকাশ করেন। এই যুদ্ধ ৩৩৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইহার পর বিখ্যাত টায়র নগরের অবরোধ। টায়র একটী বৃহৎ বাণিজ্যপ্রধান নগর। এই নগর সমুদ্রতীর হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। ফিনীসীয় প্রদেশের অপর সকল নগরই আলেকজেণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিল; কিন্তু টায়র আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল না; এজন্য আলেকজেণ্ডার এই নগর অবরোধ করেন। নগরবাসিগণ অসীম বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সাত মাস কাল নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। আলেকজেণ্ডারকে এই নগর অধিকার করিতে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আলেকজেণ্ডারের এই নগর প্রবেশের সময় আট হাজার অধিবাসী মৃত্যু-মুখে পতিত হন, ত্রিশ হাজার অধিবাসীকে দাসরূপে বিক্রয় করা হয় এবং দুই হাজার অধিবাসীকে অতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক হত্যা করা হয়। টায়র অধিকার করিয়া আলেকজেণ্ডার জেরুজেলম নগরে প্রবেশ করেন। এই নগর আলেকজেণ্ডারকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তিনি নগরবাসীদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই নগরের পুরোহিতেরা তাঁহার সম্মানার্থ এক ধর্ম্মভাবমূলক মিছিল (Religious Procession) বাহির করায় তাঁহাদের ধর্ম্মভাব দেখিয়া আলেকজেণ্ডার তাঁহাদিগকে ক্ষমা করেন। পুরোহিতগণ তাঁহাদের একখানি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন; তাহাতে লেখা ছিল যে গ্রীসদেশের রাজা পারস্যের রাজাকে পরাজিত করিবে। ইহাতে আলেকজেণ্ডার অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুরোহিতগণের প্রার্থনানুসারে তাঁহাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে যথোপযুক্ত পূজাসামগ্রী প্রেরণ করেন। জেরুজেলাম হইতে তিনি বিনা বাধায় মিশরে প্রবেশ করেন। মিশরের পারসিক শাসনকর্ত্তা আলেকজেণ্ডারকে বাধা দেওয়া অসম্ভব মনে করিয়া পথ ছাড়িয়া দেন। আলেকজেণ্ডার মিশরের রাজধানী হেলিপোলিস্ নগরে প্রবেশ করেন এবং তথাকার নানাবিধ দেবমন্দির ও প্রাচীন প্রাসাদাবলী দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন। তথা হইতে নৌকাযোগে তিনি নীলনদের পশ্চিম শাখা বাহিয়া মেরিয়া নামক হ্রদে প্রবেশ করেন এবং এই হ্রদের তীরে নিজ নামানুসারে আলেকজেন্দ্রিয়া নামক একটী নগর স্থাপন করেন। মিশর শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি পারস্তরাজকে আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন। পারস্তরাজ ইত্যবসরে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আলেকজেণ্ডার ৩৩১ পূঃ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার টায়র নগরে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন তথায় বিশ্রাম করেন। এখান হইতে যাত্রা করিয়া তিনি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদী পার হইয়া আর্ব্বেলা নামক স্থানে পারস্তরাজের সাক্ষাৎ পান। ঘোর যুদ্ধের পর পারস্তরাজ পরাজিত হইয়া মিডিয়ার অন্তর্গত একবাটানাতে পলায়ন করেন। আলেকজেণ্ডার আর্ব্বেলা-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিনা বাধায় পারস্ত রাজের রাজধানী বাবিলন নগর অধিকার করেন; এখান হইতে তিনি পার্শিপোলিস্ নগরে গমন করেন; তথা হইতে ৩৩০ পূঃ খৃষ্টাব্দে একবাটানা নগরে উপস্থিত হন। ডেরায়স্ এতদিন একবাটানায় অবস্থিতি করিতেছিলেন; আলেকজেণ্ডারের আগমনে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক এলবর্জ্জ পর্ব্বতের উপত্যকা দিয়া বাক্‌ট্রিয়া অভিমুখে প্রস্থান করেন। আলেকজেণ্ডার পারস্ত রাজের অনুসরণ করিয়া বাক্‌ট্রিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাক্‌ট্রিয়ার অভিমুখে পলায়নের সময় ডেরায়সের দুইজন প্রাচীন অনুচর তাঁহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করে। আলেকজেণ্ডার পারস্তরাজ ডেরায়সের মৃতদেহ রাজযোগ্য সমাধির জন্য পার্সিপোলিসে প্রেরণ করেন। অতঃপর আলেকজেণ্ডার বাক্‌ট্রিয়াতে উপনীত হন; এই নগরে তিনি রক্‌সনা নাম্নী এক উচ্চবংশোদ্ভবা রূপলাবণ্যসম্পন্না মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি শীতকাল অতিবাহিত করিয়া ৩২৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে তুষারাচ্ছন্ন ককেশশ্ পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষের অন্তর্গত তক্ষশিলা নগরে উপনীত হন। তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধে ও পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; অনেকে আর অগ্রসর হইতে

ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। কিন্তু আলেকজেণ্ডার শুনিয়াছিলেন যে, সিন্ধু-নদের অপর পার্শ্বে এক অতি সমৃদ্ধিশালী দেশ অবস্থিত; তিনি এই দেশ না দেখিয়া কিছুতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৩২৭ পৃঃ খৃষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইলেন। এখানে পঞ্জাববাসীরা প্রবলপ্রতাপে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। রাজা পোরস সসৈন্যে বিপাশা নদীতীরে উপস্থিত হইয়া আলেকজেণ্ডারের গতিরোধ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হইল; বীরবর পোরস যুদ্ধে আহত হইয়া বন্দী হইলেন এবং তাঁহার ২০ হাজার সৈন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। আলেকজেণ্ডার পোরসের বীরত্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা প্রকাশ না করায়, তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এখানে কতকগুলি পোত প্রস্তুত করিয়া সিন্ধুনদ বাহিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি নিয়ার্কস্ নামক সেনাপতিকে জাহাজগুলি লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া নিজে স্থলপথে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে এক বালুকাময় মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার সময় তাঁহার বহুসৈন্য পিপাসায় ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। ৩২৫ পৃঃ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনর্ব্বার পারস্যদেশে উপনীত হন। এখানে তিনি গ্রীসীয় ও পারসিকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধন সংস্থাপনের চেষ্টা করেন; তিনি নিজে মৃত পারস্যরাজ ডেরায়সের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসাইনের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ৮০ জন সেনাপতি ও ১০ সহস্র সৈন্য পারসিক রমণীগণের পাণিগ্রহণ করেন। ৩২৪ পৃঃ খৃষ্টাব্দে তিনি বাবিলন নগরটী আপনার রাজধানী মনোনীত করিয়া তথায় কিছুকাল সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; তিনি ২৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হন; এই জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ হইতে অন্ত্র বাহির করিয়া শবটী গন্ধদ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া রাখা হয়, এবং ৩২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে উহা মিশরের অন্তর্গত তৎপ্রতিষ্ঠিত আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে সমাহিত করা হয়।

আহ্মদ শাহ্ আব্দালী—ইনি শাহ্ দুরানী নামে সাধারণতঃ অভিহিত হইতেন। ইনি আব্দাল নামে এক আফগান জাতীয় লোকের দলপতির পুত্র। ইনি বিখ্যাত নরপতি নাদির শাহ্ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া তৎসঙ্গে পারস্যে নীত হন। এখানে তিনি নাদির শাহের অনুগ্রহে এক সামান্য আর্দ্দালীর কার্য্য হইতে সৈন্য বিভাগের এক উচ্চপদে উন্নীত হন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে নাদির শাহের হত্যার অব্যবহিত পরেই তিনি পারস্যের সিংহাসন লাভের চেষ্টা করেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া সসৈন্যে কান্দাহারের দিকে প্রস্থান করেন। তিনি স্বীয় প্রবল সৈন্যের সাহায্যে ক্রমে কান্দাহার, কাবুল, পেশোয়ার এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর পর্য্যন্ত জয় করেন। ইনি হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী অধিকার করিবার জন্য ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাহোর হইতে উক্ত রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। দিল্লীর সম্রাট্ আহ্মদ শাহ্ এই সময়ে অসুস্থ ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র আহ্মদকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ আব্দালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ্চ সরহিন্দ নামক স্থানে দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত ক্ষতি হয়। আব্দালী দিল্লীর দিকে এবার আর অগ্রসর না হইয়া কাবুলে প্রস্থান করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে দিল্লী ও আগ্রায় উপস্থিত হন। পরে মথুরায় উপস্থিত হইয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং বহু অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কান্দাহারে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়া ভারতের অনেক স্থান অধিকার করেন। ইহাতে রোহিলাদিগের অধিপতি নাজিবুদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতি আহ্মদ শাহ্ আব্দালীর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি ভারতে আগমন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করুন এবং দিল্লীতে সাম্রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহাদের আবেদনে আহ্মদ শাহ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করিয়া দিল্লীর অনতিদূরে পাণিপথ ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করেন এবং কাবুলে প্রস্থানের সময় শাহ্ আলমকে দিল্লীর সম্রাট করিয়া অযোধ্যার নবাব প্রভৃতিকে তাঁহার অধীন থাকিতে বলিয়া যান। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্মাদি—বিখ্যাত তুরস্ক দেশীয় কবি। ইঁহার প্রকৃত নাম খাজা আহ্মদ জাফারি। ইনি বিখ্যাত তৈমুরের

(Tamerlane) দিগ্বিজয় অবলম্বন করিয়া একখানা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখেন। তিনি তুরস্ক ভাষায় সেকেন্দর নাম লিখিয়াছিলেন। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ই

ইউক্লিড—বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত দশ অধ্যায় সমন্বিত জ্যামিতি তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী থেলস্ (Thales), পিথাগোরস (Pythagorus) প্রভৃতি গণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণের জ্যামিতি-শাস্ত্রসংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সহজ বোধ্য করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইউলিসিস—প্রাচীন গ্রীসে ইনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ ও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইনি ইথেকার রাজা। ইঁহার বুদ্ধিবলে গ্রীসীয়েরা বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অপহৃতা স্পার্টারাজমহিষী হেলেনাকে উদ্ধার করেন। ট্রয়ের যুদ্ধ ১০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হয়। এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ট্রয়ের রাজকুমার পারিশের সহিত দক্ষিণ-গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টার রাজা মেনেলসের প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। একদা পারিশ মেনেলসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্পার্টাতে গমন করেন এবং তথায় দুই বন্ধু কিছুকাল আমোদে বাস করেন। কিন্তু পারিশের স্কন্ধে অলক্ষ্মী চাপিল; পারিশ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রাজধানী হইতে মেনেলসের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার মহিষী হেলেনাকে লইয়া পলায়নপূর্ব্বক ট্রয়ে উপস্থিত হইলেন। মেনেলস এই বৃত্তান্ত গ্রীসের রাজগণের সমীপে জ্ঞাপন করেন এবং অপমানের প্রতিশোধ প্রার্থনা করেন। গ্রীসীয় রাজগণ এই ঘটনা অবগত হইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেন এবং এই রাজপত্নীহরণব্যাপার সমস্ত গ্রীসের লজ্জা ও অপমানের কারণ মনে করিয়া তাঁহারা ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিলেন। এগামেম্‌নন সমগ্র গ্রীসীয় সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। এগামেম্‌ননের অনুরোধে ইথেকার রাজা ইউলিসিস্‌ও গ্রীসীয় অন্যতম সেনাপতি হইয়া ট্রয়ে গমন করেন। ইউলিসিস্ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী পেনেলপ ও শিশুপুত্র টেলিমেকসকে পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে প্রথমতঃ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে হইয়াছিল। গ্রীসীয় সৈন্য ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ট্রয় নগর অবরোধ করিয়া রাখেন পুত্রের কুক্রিয়াহেতু ট্রয়ের বৃদ্ধ ভূপতি প্রায়ামকে এই দশবৎসরব্যাপী, লোকনাশন ভয়াবহ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হইয়াছিল। যখন বহুবর্ষ যুদ্ধের পর উভয় পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন, তখন ইউলিসিস্ সম্মুখযুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া দিলেন। এই কৃত্রিম অশ্বের উদরে ৫০ জন যোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লুক্কায়িত রহিলেন। ট্রয়বাসীরা কৌতূহলপরবশ হইয়া এই অশ্বটাকে নগর মধ্যে লইয়া গেল। নিশীথ সময়ে ৫০ জন গ্রীসীয় যোদ্ধা কৃত্রিম অশ্বের উদর হইতে নির্গত হইয়া নগরদ্বাররক্ষী সৈন্যদিগকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিল এবং দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক গ্রীসীয় সৈন্যদিগকে সঙ্কেতধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিল। সঙ্কেতধ্বনি হওয়ামাত্র ইউলিসিস্ গ্রীসীয় সৈন্যগণসহ প্রবলবেগে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ট্রয়সৈন্যদিগকে অল্পায়াসেই পরাভূত করিয়া ট্রয়নগর ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে হেলেনার উদ্ধার ও ট্রয়যুদ্ধের অবসান হয়। এখন স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের পালা আসিল। গ্রীসীয় সৈন্যেরা ইউলিসিসকেই তাঁহাদের অধিনায়ক স্থির করিয়া তাঁহারই নেতৃত্বে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অভিলাষ করিলেন। দশবৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর গ্রীসীয় সৈন্য ও সেনাপতিগণ পোতারোহণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ইউলিসিসের ভাগ্য এখনও সুপ্রসন্ন হয় নাই; তাঁহার জাহাজখানা বাত্যাতাড়িত হইয়া আফ্রিকার উপকূলে ভগ্ন হইল। তিনি ১০ বৎসর কাল নানাদেশে নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে নিজ রাজ্য ইথেকাতে উপনীত হন। যুদ্ধযাত্রার তারিখ হইতে ২০ বৎসর পরে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ট্রয়যুদ্ধের অবসান হইলে যে সমুদয় গ্রীসীয় রাজা ও সৈন্য জীবিত ছিলেন তাঁহারা ইউলিসিসের ১০ বৎসর পূর্ব্বেই গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। ইউলিসিসের সাধ্বী পত্নী

পেনেলপ পতির আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চিন্তায় বিশীর্ণ হইতেছিলেন। এদিকে কতকগুলি দুষ্ট লোক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্ররোচিত করিতেছিল। তাঁহারা পেনেলপকে বলিল যে, ইউলিসিস্ ঝড়ে পড়িয়া সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে, তাঁহার আশা করা বৃথা। পেনেলপ তাঁহাদের কথা অতি ঘৃণার সহিত শুনিতেন; তিনি ইহাদিগকে পাশববৃত্তিসম্পন্ন ঘৃণাজীব মনে করিতেন; কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় মনের ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে তাহাদের কথাতে বিশ্বাসস্থাপনের ভাণ করিতেন। তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি একটা উলের কাজ হাতে লইয়াছেন, এই কাজটা শেষ হইলেই তিনি একজনকে পতিত্বে বরণ করিবেন। প্রণয়াকাঙ্ক্ষিগণ এই কথাতেই নির্ভর করিয়া আশান্বিত হইয়া রহিলেন। পেনেলপ দিনে উলের যে কাজটুকু করেন, রাত্রিতে তাহা খুলিয়া রাখেন। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল; পাণিগ্রহণার্থীরাও উদ্বেগের সহিত দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; পেনেলপের হাতের কাজ আর শেষ হইল না। অবশেষে ইউলিসিস রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রণয়ার্থিগণের মধ্যে কেহ হত হইল, কেহ বা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইউলিসিস ১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন।

ইব্নে খালদুন—আফ্রিকাবাসী মুসলমান দার্শনিক। ইনি ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী টিউনিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যৌবনকাল মিশরে অতিবাহিত করেন। তৎপর তৈমুরের সাম্রাজ্যে ডমাস্কাসের প্রধান জজের পদে কার্য্য করেন। ডামাস্কাস হইতে তিনি মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথাকার প্রধান বিচারপতির পদলাভ করেন। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আরবীয়, পারসিক ও বার্ব্বরিরাজ্যবাসীদিগের এক বৃহৎ ইতিহাস লিখেন। এই গ্রন্থের নাম তারিখ-ইব্নে-খালদুন (Tarikh-ibn-Khaldun)।

ইব্নে খালেকান্—(Ibn Khallikan) ইঁহার পূর্ণনাম সামস্-উদ্দিন আবুল আব্বাস আহ্মদ ইব্নে-মোহাম্মদ ইব্নে-আবু বকর-ইব্নে-খালেকান্। এই বিখ্যাত ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি অরবেলায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তিনি ডামাস্কাসে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি ১২৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডামাস্কাসে প্রধান কাজীর পদে আসীন ছিলেন। অতঃপর তিনি পদচ্যুত হন। পদচ্যুত হওয়ার পর আর তিনি নিজ বাটীর বাহিরে যান নাই। তিনি একাধারে কবি, ইতিহাসজ্ঞ, বিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন। একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি আরবীয় ভাষায় একখানা জীবনী গ্রন্থ লিখেন। এই জীবনী গ্রন্থের নাম ওয়াফিয়ত-উল-আয়ন (Wafiat-ul-Aiyan)। এই গ্রন্থ অতি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা এখন বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইনি ১২১১ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্নে-বতুতা—বিখ্যাত আরবীয় ভ্রমণকারী। মহম্মদ টোগলক ইঁহাকে দিল্লীর জজপদে নিযুক্ত করেন। তিনি এই পদে থাকিয়া স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কাশরীফে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত এক প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ৮২৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের পাদ্রি লি সাহেব (Rev. S. Lee B. D.) ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইব্নে রশিদ—ইনি ১১৪৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অন্তর্গত কার্ডোভায় (Cardova) জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে স্পেনদেশ আফ্রিকার মুরদিগের অধীন ছিল। রশিদের পিতা কার্ডোভাতে মুর সম্রাটের অধীনে প্রধান বিচারপতি ও মৌলবীর পদে আসীন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ঐ পদ প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে তাঁহাকে প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরোধী সন্দেহ করিয়া পদচ্যুত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। তাঁহাকে অধিকদিন কারাগারে থাকিতে হয় নাই; তিনি কারামুক্ত হইয়া পুনরায় জজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন ও ফলিতজ্যোতিষ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রণয়-কবিতা লিখিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত গ্রীকদার্শনিক এরিষ্টটলের গ্রন্থগুলির ভাষ্যসহ অনুবাদ বাহির করেন। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে ভগবানের অস্তিত্ব মানিতেন। তাঁহার গ্রন্থ বহু ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে (কাহারও মতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে) দেহত্যাগ করেন।

উ

উইলবারফোর্স (উইলিয়ম)—বিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক ; ইঁহার যত্নে ও অধ্যবসায়ে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ঘৃণিত দাসব্যবসায় অন্তহিত হয়। ইনি ইংলণ্ডের অন্তর্গত হাল নগরের এক ব্যবসায়ীর পুত্র ; ১৬৮১ শকে (১৭৫৯ খৃঃ) হাল নগরে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি ১৬৯৮ শকে (ইং ১৭৭৭ খৃঃ) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সেণ্ট জন কলেজে ভর্ত্তি হন ; কিন্তু পিতামহ ও খুল্লতাতের মৃত্যুতে প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়াতে লেখাপড়ায় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি হাল নগরের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ লাভ করেন। বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী পিট তাঁহার পরম সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত তিনি দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া অবশেষে সফলকাম হন। ১৮০৭ খৃঃ দাসব্যবসায় প্রতিষেধক বিল "হাউস অব লর্ডস্" সভায় পাশ হয় ; এই ঘৃণিত ব্যবসা রহিত করিতে ইংলণ্ডের দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা (৩০ কোটি টাকা) ব্যয় হইয়াছিল। ১৭৫৫ শকে (১৮৩৩ খৃঃ) এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শব অতি সম্মানের সহিত ওয়েষ্টমিনিষ্টার সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

উর্ফী (মৌলানা)—বিখ্যাত পারস্য কবি। ইনি পারস্যের অন্তর্গত শিরাজ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জামাল-উদ্দিন। উর্ফী নামটি তাঁহার উপাধি মাত্র। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্যে আসেন তৎপরে আগ্রায় গমন করেন। কিছুকাল পরে সম্রাট্ আকবরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সম্রাট্ তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এক রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগের অল্পকাল পরে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে কবি দেহত্যাগ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এ

এগামেম্নন্—প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত রাজা। ইনি মাইসিনির রাজা এট্রিয়াসের পুত্র। ইনি ট্রয়ের বিরুদ্ধে গ্রীসের সমবেত সৈন্যের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইয়া গমন করিয়াছিলেন। ইনি ট্রয়ের পতনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় পত্নী ক্লাইটেমনষ্ট্রার হস্তে নিহত হন। কিন্তু বিখ্যাত কবি হোমর বলেন যে, ক্লাইটেমনষ্ট্রার উপপতি এজিষ্টাস ইহাকে নিহত করেন।

এপিকিউরাস—বিখ্যাত গ্রীসদেশীয় দার্শনিক। ইনি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সুখবাদ মতের প্রবর্ত্তক। ইনি ৩৪২ পূঃ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭০ পূঃ খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরে প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রায় ৩০০ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন সুখই জীবনের লক্ষ্য। এই সুখ আধ্যাত্মিক উন্নত সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ নহে। যেমন শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মিক উন্নত কৃষ্ণপ্রেম গ্রাম্য ভিক্ষুক নেড়া নেড়ীর দলে পড়িয়া কলুষিত হইতেছে, সেইরূপ এপিকিউরাসের উন্নত সুখবাদ অশিক্ষিত শিষ্যগণের হাতে পড়িয়া দূষিত ইন্দ্রিয় সুখবাদে পরিণত হইয়াছে।

এব্রাহিম—আরবদেশের অন্তর্গত বাবেলনগর নিবাসী এক মহাপুরুষ। পিতার নাম তেথর ও মাতা আদনা। বাবেল সমৃদ্ধিশালী নগর ; ইহা কুফানগরের অনতিদূরে ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এই নগরে ঈশ্বরদ্রোহী দুর্দ্দান্ত নোমরুদ নামক এক রাজা বাস করিতেন। এই রাজা মনে করিতেন যে, তিনিই ঈশ্বর ; তিনি প্রজাদিগকে তাঁহার পূজা করিতে বাধ্য করিতেন। এব্রাহিম একেশ্বরবাদী ছিলেন ; তিনি প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন। রাজা নোমরুদের আদেশে এব্রাহিম প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু অলৌকিকরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। তিনি পিতৃব্যপুত্রী সারাকে বিবাহ করেন ; ইঁহার গর্ভে য়িহুদিবংশের আদি পিতা এস্হাকের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, সারা বন্ধ্যা ছিলেন ; এস্হাক সারার পালিত পুত্র। সারার সন্তান জন্মিবার বয়স অতীত হইলে তাঁহার

অনুরোধে এব্রাহিম হাজেরা নাম্নী এক রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে মুসলমান জাতির আদি পুরুষ এস্মাইল জন্মগ্রহণ করেন। এস্মাইলের বংশে হজরৎ মোহাম্মদ জন্মিয়াছিলেন। এস্মাইলের জন্মের পর সারা সপত্নী হাজেরার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হন এবং তাঁহার অনুরোধে এব্রাহিম তাঁহাকে এক জলবিহীন ও শস্যহীন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করেন। এই স্থানেই মক্কানগর স্থাপিত হয়। হাজেরার জলপানের নিমিত্ত এই স্থানে জমজম্ নামে এক উৎস উৎপন্ন হয়। হাজেরার আগমনের পর এইস্থান লোকালয়ে পরিণত হয় এবং এব্রাহিম এখানে আসিয়া এই স্থানে মক্কানগরের সূত্রপাত করেন। ধর্ম্মপ্রাণ এব্রাহিমের আগমন হইতেই এই স্থান তীর্থে পরিণত হয়। তিনি এইস্থানে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন; এই মন্দির এখন কাবা মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। প্রতিমাপূজা বিরোধী এব্রাহিমের তিরোধানের পর এই মন্দিরে দীর্ঘকাল প্রতিমাপূজা হইতে থাকে; ১৩০০ শত বৎসর হইল হজরৎ মোহাম্মদ প্রতিমা ধ্বংস করিয়া কাবা মন্দিরে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন।

এলিজাবেথ— ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর কন্যা; ইঁহার মাতা রাণী এন্‌বোলিন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে গ্রিনিচ নামক নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম রূপবতী, সুশিক্ষিতা কিন্তু অত্যন্ত উগ্রা ও কোপনস্বভাবা ছিলেন। ইনি ১৫৫৮ খৃঃ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে স্কটলণ্ডের ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী রাণী মেরী প্রজাবিদ্রোহে উপদ্রুত হইয়া ইংলণ্ডে আগমনপূর্ব্বক ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এলিজাবেথ উক্ত রাণীর প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ইঁহাকে ১৯ বৎসর কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই অধর্ম্মকৃত কারাবরোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করাতে এলিজাবেথ ১৫৮৭ খৃঃ ইঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া ঘোর অখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইঁহার উৎসাহে ইংলণ্ডের নৌসেনার সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইঁহার শাসনসময়ে স্পেনের রাজা ফিলিপ স্পেনীয় আর্ম্মাডা নামে খ্যাত ১০৮ খানা যুদ্ধ জাহাজের বহর ইংলণ্ড-জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। এই প্রবল যুদ্ধজাহাজের বহর ইংলিশ প্রণালীতে বাত্যা-তাড়িত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং ইংলণ্ডের নৌবাহিনীকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অনুসৃত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাতে রাণী এলিজাবেথের প্রতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইনি ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এলিজাবেথ চিরকুমারী ছিলেন। ইঁহার সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি সেক্‌সপিয়র ও বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত বেকন ইংলণ্ডে প্রাদুর্ভূত হন। এই সময়ে প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্ম ইংলণ্ডের রাজধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয় এবং তদবধি ইহাই ইংরেজদের রাজধর্ম্মরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ফ্রান্‌সিস ড্রেক নামে এক সাহসিক নাবিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন; রাণী এলিজাবেথ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বয়ং ড্রেকের জাহাজে গমন করেন এবং তাহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ড্রেককে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দান করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা নৌবিদ্যা অভ্যাস করিতে যত্নপর হন। এই রাণীর সময়ে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে তামাক ও চা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইংরেজেরা কাগজ ও ছুরিকা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। ইঁহার সময়ে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানি সনন্দ লইয়া বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগিনী ছিলেন; স্বয়ং সেক্‌সপিয়রের নাটকা-ভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গালয়ে যাইতেন। ইঁহার সময়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়; তন্মধ্যে সার ওয়াল্টার রেলে ও তদানীন্তন আর্ল্ অব এসেক্‌স উল্লেখযোগ্য; ইঁহারা উভয়েই রাণী এলিজাবেথের প্রিয় সখা ছিলেন।

এস্কাইলাস—গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত নাটককার। ইনি শোকাবহ মর্ম্মবিদারক ঘটনাবলীর চিত্রাঙ্কনে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। দুঃখান্তক নাটক রচনায় ইংরেজ কবি সেক্‌সপিয়রই কেবল এস্কাইলাসের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। ইয়োরোপের অন্য কোন দেশে এরূপ কবি আর কেহ নাই।

এস্কাইলাস সামান্য সৈনিকমাত্র ছিলেন। তিনি সেলামিসের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন (জরাক্সিস্ দেখ)। এই যুদ্ধের ব্যাপার তিনি "পারসী" নামক নাটকে বর্ণন করিয়াছেন। এস্কাইলাসের বহু নাটক বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে "অরেষ্টিয়ান ট্রাইলজি" (Oresteian Trilogy) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই নাটকে ট্রয়যুদ্ধজয়ী আর্গসরাজ এগামেম্‌ননের সাগরতরঙ্গ নিবারণের জন্য দেবতার আদেশে কন্যা হত্যা, কন্যাবিয়োগবিধুরা রাণীর কন্যাহত্যার প্রতিশোধগ্রহণ-বাসনা, ট্রয় যুদ্ধের অবসানে এগামেম্‌ননের স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাণীর স্বহস্তে স্বামিহত্যা, চরিত্রভ্রষ্টা রাণী ক্লাইটেমনেষ্ট্রার পুত্রনির্ব্বাসন এবং পিতৃহত্যা-প্রতিশোধপরায়ণ রাজপুত্র ওরেষ্টিসের (Orestes) মাতৃবধ, এই সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।



ওমার খাইয়াম্—বিখ্যাত পারস্য দেশীয় কবি। ইনি পারস্যের ভল্‌টেয়ার (Voltaire of Persia) নামে অভিহিত হইতেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দিহান হন এবং তিনি একখানা কাব্যে নিরীশ্বরবাদিতা প্রকাশ করেন। ১১২৩ খৃষ্টাব্দে এই কবি দেহত্যাগ করেন।

ওমার বিন্ খাত্তাব—মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহাম্মদের প্রিয় সহচর ও শ্বশুর। ইনি আবুবকর্ সিদ্দিকের পরে দ্বিতীয় খলিফা হন (৬৩৪ খৃঃ)। ইনি সিরিয়া ও ফিনিসিয়া পর্য্যন্ত মুসলমানের জয়পতাকা উড্ডীন করেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে জেরুজেলেম অধিকার করেন। তাঁহার সেনাপতিগণ পারস্য ও মিশর পর্য্যন্ত জয় করিয়া বহুলোককে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মিশর নগর জয়ের সময়ে উক্ত স্থানের বিখ্যাত পুস্তকালয় ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এই পুস্তকালয়ে বহু প্রাচীন গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ৩রা নবেম্বর ফিরোজ (Firoz) নামক একজন পারস্য দেশীয় ক্রীতদাসের অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া ৩ দিন পরে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু সময়ে ইঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

ওয়ার্ডস ওয়ার্থ (উইলিয়ম)—বিখ্যাত ইংরেজ কবি। ইনি ইংলণ্ডের অন্তর্গত কাম্বার্লাণ্ড সায়রের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৭৭০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সেণ্টজন কলেজে ১৭৮৭ খৃঃ প্রবেশ করেন এবং ১৭৯১ খৃঃ উক্ত কলেজ হইতে বি. এ. উপাধি গ্রহণ করিয়া বাহির হন। বি. এ উপাধি গ্রহণের পরেই তিনি ফ্রান্সে গমন করেন; সেই সময়ে তথায় বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি রাজা ষোড়শলুইর প্রাণদণ্ডের পরেই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ১৭৯৩ খৃঃ "ইভিনিং ওয়াক্" বা সান্ধ্য ভ্রমণ নামে এক ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কবিতা রচনা। তাঁহার "ওড্ অন্ ইম্মর্টালিটি" নামে আত্মার অবিনশ্বরতা বিষয়ক কবিতা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টানেরা পরজন্ম স্বীকার করেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্ম মানেন না; ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ উক্ত কবিতায় আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিয়া উভয়জন্মই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু মৃত্যুসময়ে তাঁহাকে চিরকাল কবিতা রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ৯০০ পাউণ্ড দান করিয়া যান। এই অর্থ না পাইলে হয়ত তাঁহার জীবনের গতি অন্য দিকে ধাবিত হইত। তিনি বহু কাব্য ও গীতিকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড পেন্সন দেন। ইংলণ্ডের রাজকবি সাউদির মৃত্যুর পর ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ রাজকবি পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খৃঃ এই বিখ্যাত কবি পরলোক গমন করেন।

ওয়াজিদ্ (প্রথম)—ওমায়াবংশের দ্বিতীয় খলিফা। ইনি ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৭ই এপ্রিল ডামস্কাসে খলিফা পদে বৃত হন। ইনি এক জন বিখ্যাত বাগ্মী; ইঁহার কবিশক্তিও অসাধারণ ছিল। ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়াজিদ্ উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতির লোক ছিলেন; কোন কোন মুসলমানলেখক ইঁহাকে নিরীশ্বরবাদী (Athiest) বলিয়াছেন।

ওয়ালিদ্ (প্রথম)—ওমায়াবংশের ৭ম খলিফা। ৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার মৃত্যুর পর সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৭১৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে তদীয় সেনাপতিগণ স্পেন দেশ জয় করেন।

ওয়ালেস্ (সার উইলিয়ম্)—এই মহাত্মা স্কটলণ্ডের রাজা ৩য় আলেকজেণ্ডারের রাজত্ব সময়ে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৬ খৃঃ মার্চ্চ মাসে লোকপ্রিয় রাজা আলেকজেণ্ডার অশ্ব হইতে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। পুত্র সন্তান না থাকাতে রবার্ট ব্রুস্ ও জন বেলিয়ল নামক দুই ব্যক্তি মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইংলণ্ডের রাজা ১ম এড্ওয়ার্ডের উপর এ বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পিত হয়। ভূতপূর্ব্ব রাজা ৩য় আলেকজেণ্ডারের সহিত দূরবর্ত্তী সম্পর্ক থাকাতে স্কটলণ্ডের সিংহাসনে রাজা ১ম এড্ওয়ার্ডের সামান্য দাবী ছিল। এড্ওয়ার্ড ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক মধ্যবর্ত্তিতার সম্মান নষ্ট করিয়া নিজেই স্কটলণ্ডের সিংহাসন দাবী করিয়া বসিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে ওয়েল্স্ প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন; স্কটলণ্ড পাইলে সমগ্র ব্রিটিশদ্বীপের উপর তিনি একচ্ছত্র রাজা হইবেন, এই দুরাশা তাঁহার অন্তরে জাগিতেছিল। তিনি দুর্ব্বলচিত্ত বেলিয়লকে স্কটলণ্ডের অন্তর্গত স্কোন নামক প্রদেশের সামন্ত রাজা স্বীকার করিয়া ১২৯২ খৃঃ ৩০শে নবেম্বর তারিখে স্কোনের সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ইংরেজ সৈন্য স্কটলণ্ডে প্রবেশ করিল। স্কটলণ্ডবাসীদের উত্তেজনায় বেলিয়ল ১ম এড্ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ১২৯৬ খৃঃ বসন্তকালে ডানবার নামক যুদ্ধক্ষেত্রে বেলিয়ল পরাজিত ও ধৃত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন। ইহাতে ১ম এড্ওয়ার্ডের ক্ষমতা ও সাহস আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার সৈন্যগণ স্কটলণ্ডে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। স্কটলণ্ডের সমস্ত অধিবাসী—জমিদার, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর লোক, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রথমে জন (সার উইলিয়ম) ওয়ালেস্ ও তাঁহার মৃত্যুর পর রবার্ট ব্রুস্ নেতৃত্ব করেন।· এই রবার্ট ব্রুস্ (বেলিয়লের প্রতিদ্বন্দ্বী রবার্ট ব্রুসের পৌত্র) ইংরেজদিগকে স্কটলণ্ড হইতে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং স্কটলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। বেলিয়ল অপেক্ষা তাঁহার পিতামহেরই স্কটলণ্ডের সিংহাসনে অধিকতর দাবী ছিল। ওয়ালেসের সহিতই প্রথমে ১ম এড্ওয়ার্ডের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। ওয়ালেস ইংরেজ সৈন্যের সহিত বহু ক্ষুদ্র যুদ্ধ করেন; অনেক যুদ্ধে তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। গার্গুনক নামক স্থানে ইংরেজেরা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ওয়ালেস্ নিশাভাগে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন; দুর্গাধ্যক্ষ থর্ন টন সাহেব ওয়ালেসের হস্তে নিহত হন। ওয়ালেস্ হত সৈন্যাধ্যক্ষের পত্নী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগকে ইংরেজাধিকৃত স্থানে উপযুক্ত রক্ষিসৈন্য সমভিব্যাহারে প্রেরণ করেন। তিনি স্কোনে নামক স্থান সহসা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন এবং ইংরেজ শিবির হইতে বহুদ্রব্য ও অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লন। তৎপর তিনি ডণ্ডী নগরের ইংরেজ সৈন্যদিগকে অবরোধ করেন। ডণ্ডী উদ্ধারের জন্য অর্ল অব সারে (Earl of Surrey) বহু ইংরেজ সৈন্যসহ আসিতেছিলেন; ওয়ালেস্ ডণ্ডীর ইংরেজ সৈন্যের অবরোধের ভার নগরবাসীদের উপর অর্পণ করিয়া, ১২৯৭ খৃঃ ষ্টার্লিং নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি আর্ল অব সারেকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরাস্ত হয়। ইংরেজ সৈন্য ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যার দশগুণ অধিক ছিল। এই যুদ্ধে ৪0,000 সহস্র ইংরেজ সৈন্য হত হয়। ওয়ালেস্ এই যুদ্ধ জয় করিয়া ইংলণ্ডের উত্তরভাগস্থ

নর্দ্দাম্বার্লেণ্ড ও কাম্বালেণ্ড পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন। অতঃপর স্কট-সৈন্যের দলপতিত্ব লইয়া আত্মকলহ উপস্থিত হইল। আত্মকলহের ফলও অবিলম্বেই ফলিল। বীরবর ওয়ালেস্ ১২৯৮ খৃঃ ফলকার্ক নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং জঙ্গলে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহার ১৫ হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে পতিত হয়। তিনি স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে পলায়ন করেন। কিয়ৎকাল পরে তথা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে স্কটলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গুপ্তভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন বিশ্বাসঘাতককর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া স্বদেশদ্রোহী জমিদার সার জন মন্‌টিথ কর্ত্তৃক ধৃত হন ও বন্দিভাবে ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। ইংলণ্ডে নীত হইয়া তিনি ১৩০৫ খৃঃ ২৭শে আগষ্ট তারিখে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। পরবর্ত্তী সময়ে (বেলিয়লের প্রতিদ্বন্দ্বী রবার্ট ব্রুসের পৌত্র) রবার্ট ব্রুস বেনকবার্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ১৩১৪ খৃঃ এক লক্ষ ইংরেজ সৈন্য পরাজিত করিয়া ওয়ালেসের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। এক লক্ষ সৈন্যের মধ্যে অত্যল্পসংখ্যক সৈন্য মাত্র পরাজয়বার্ত্তা দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

ওয়াসিংটন (জর্জ্জ)—জর্জ্জ ওয়াসিংটনের পূর্ব্বপুরুষ ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দ্দামটন সায়ারবাসী ছিলেন। ইংলণ্ডের অন্তর্ব্বিপ্লবের সময় তাঁহারা সপরিবারে উত্তর আমেরিকায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ১৭৪৩ খৃঃ জর্জ্জ ওয়াসিংটনের পিতা অগাষ্টিন ওয়াসিংটনের মৃত্যু হয়; এই সময়ে জর্জ্জের বয়স ১২ বৎসর মাত্র ছিল। জর্জ্জ ওয়াসিংটন তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। এই সময়ে আমেরিকায় ভদ্র পরিবারের সন্তানদিগের উচ্চ শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না; ইংরেজিতে সাধারণ জ্ঞান হইলেই তাহাদের লেখা পড়া এক প্রকার শেষ হইত। জর্জ্জ ওয়াসিংটন সামান্য রকমের জরীপের কাজ ও সাধারণ কেরাণিগিরির উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার শরীরে শক্তি ও মনে নীতিজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল। ১৭৫২ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠের প্রভূত সম্পত্তি ছিল; এই সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর জর্জ্জ ওয়াসিংটন প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে উত্তর আমেরিকায় অধিকৃত স্থানের সীমানা লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। জর্জ্জ ওয়াসিংটন ভার্জ্জিনিয়ার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিক বিভাগে এক উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী যুদ্ধের পরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ফরাসীদিগকে উত্তর আমেরিকা হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিবার জন্য বড় রকমের যুদ্ধের আয়োজন করেন। এই যুদ্ধে জর্জ্জ ওয়াসিংটন ইংরেজ পক্ষে থাকিলেও ইংরেজেরা বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এই সমুদয় যুদ্ধে ইংরেজেরা ওয়াসিংটনের বীরত্বের অত্যন্ত পরিচয় পাইয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ জর্জ্জ ওয়াসিংটন মেরী ফিলিপ নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই মহিলা জর্জ্জ ওয়াসিংটনের প্রতি অনাসক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হন। ১৭৫৯ খৃঃ ৬ই জান্নুয়ারি জর্জ্জ ওয়াসিংটন অপর এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের পর তাঁহারা স্বামিস্ত্রীতে সুখে ৪০ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই। ১৭৬৩ খৃঃ ফরাসী এবং ইংরেজে সন্ধি হইয়া গেল; কিন্তু এই সময়ে দেশে অন্য প্রকার উপদ্রব আরম্ভ হইল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংরেজ ঔপনিবেশিকদিগের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ১৭৭৩ খৃঃ ইংরেজেরা 'চা'র উপর শুল্ক স্থাপন করেন; ঔপনিবেশিকেরা ইহাতে বাধা দেন, এমন কি তাঁহারা ইংরেজের একখানা চা-পূর্ণ জাহাজ বোষ্টন নগরের অনতিদূরে জলমগ্ন করেন। এই সঙ্কটসময়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণজন্য সমস্ত ঔপনিবেশিকগণ ১৭৭৪ খৃঃ ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে সমবেত হন। ইহাই আমেরিকার প্রথম "কংগ্রেস"। এই কংগ্রেস হইতে ইংরেজরাজ তৃতীয় জর্জ্জের নিকট চা-শুল্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে একখানা আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়; এই কংগ্রেসে ওয়াসিংটন এক প্রদেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজেরা চা-শুল্ক প্রত্যাহার করিতে অনিচ্ছুক, কাজেই কংগ্রেস দেশের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। চা-র দোকান অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে লাগিল; চা-র জাহাজ ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না। এই

কংগ্রেস, ওয়াসিংটনকে সভাপতি করিয়া দেশ রক্ষা ও সৈন্য বৃদ্ধির ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। ওয়াসিংটন অনতিবিলম্বেই ১০,০০০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তিনি বোষ্টন নগর অবরোধ করেন এবং ইংরেজ সেনাপতি হাউই সাহেবকে বলিয়া পাঠান যে, যদি তিনি সহরের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া শান্তভাবে বোষ্টন নগর ত্যাগ করেন, তবে ওয়াসিংটন তাঁহার উপর গোলাবৃষ্টি করিবেন না। ইংরেজ জেনারেল এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নিঃশব্দে বোষ্টন ত্যাগ করিলেন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে বোষ্টন নগর অধিকৃত হইল। অনন্তর যুদ্ধের পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে রণনিপুণ হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধে পতিত ইংরেজ সৈন্যের অস্ত্রে ও পোষাকে তাহাদের দেহ রণসজ্জায় সুশোভিত করিল। জলে স্থলে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ইংরেজেরা কর্ণওয়ালিশকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া আমেরিকায় পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বহুসৈন্যসহ ১৭৮১ খৃঃ ওয়াসিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। যুদ্ধের অবসানে কর্ণওয়ালিশ মুক্তি লাভ করেন এবং ১৭৮৬ খৃঃ ভারতে গবর্ণর জেনারেল হইয়া আগমন করেন। নিউইয়র্ক নগর ওয়াসিংটনের হস্তগত হইল। নিউইয়র্ক অধিকারের পরেও এক বৎসর কাল যুদ্ধ চলিয়াছিল; তৎপর ১৭৮৩ খৃঃ এপ্রিল মাসে এই লোক-নাশন যুদ্ধের অবসান হয়। ক্রমাগত ৮ বৎসর যুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাজ্য স্বাধীনতা লাভ করে। ১৭৮৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ওয়াসিংটন স্বদেশের স্বাধীনতা বিধানপূর্ব্বক রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিজের জমির চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ৮০০০ একর জমি ছিল। এই জমির চাষ আবাদ করিয়া তাঁহার সংসার বিলক্ষণ গুজরাণ হইত; কিন্তু স্বদেশবাসিগণ কংগ্রেসের নিয়মাবলী ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তাঁহাকে ১৭৮৯ খৃঃ পুনর্ব্বার আহ্বান করেন। তিনি এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলাগুলি একত্র করিয়া যুক্তরাজ্য নাম দেন। তিনি ১৭৮৯ খৃঃ জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বুধবার যুক্তরাজ্যের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। একাধারে তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতি-বিশারদ ছিলেন।

ওয়েলিংটন (ডিউক)—এই বিখ্যাত যোদ্ধৃপুরুষ আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত মিথ নামক কাউণ্টিতে ডান্‌গানম নামক প্রাসাদে ১৭৬৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ওয়েলিংটনের পিতা আর্ল অব মর্ণিংটন আয়র্লণ্ডের একজন জমিদার ছিলেন। ডিউক অব ওয়েলিংটনের প্রকৃত নাম আর্থার ওয়েলেস্‌লি; পরবর্ত্তী সময়ে ইনি ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর্থার ওয়েলেস্‌লি পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় যেমন নেলসন জলযুদ্ধে, তেমনি ওয়েলিংটন স্থলযুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা লর্ড ডনগাননের কন্যা এবং অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। ওয়েলিংটন ইটন কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৭৯৬ খৃঃ কর্ণেল ওয়েলিংটন ভারতবর্ষে সৈনিক বিভাগে চাকরী লইয়া আগমন করেন; এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আর্ল অব মর্ণিংটন (লর্ড ওয়েলেস্‌লি) ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। কর্ণেল ওয়েলিংটনের ভারতে উপস্থিত হইতে দশ মাস লাগিয়াছিল; তখন আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আসিতে হইত। তিনি ১৭৯৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

এখানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, মহীশুরের অধিপতি হায়দরআলির পুত্র নবাব টিপুসুলতান ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। তিনি জেনারেল হারিসের অধীনে থাকিয়া টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে তাঁহার সহিত টিপুর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হন এবং শ্রীরঙ্গপত্তন ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। এই যুদ্ধে কর্ণেল ওয়েলিংটন অত্যন্ত বীরত্ব দেখাইয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই যুদ্ধের অবসানে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর তাঁহাকে প্রবল মহারাষ্ট্র শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সিন্ধিয়া, হুলকার ও পেশওয়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত

হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ওয়েলিংটন ১৭000 সৈন্য লইয়া বিপক্ষের ৫৬000 সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ মার্চ্চ মাসে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। ভারতীয় যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কলিকাতাবাসিগণ তাঁহাকে ১০০০৲ মূল্যের একখানা তরোয়াল এবং সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ২0,000৲ মূল্যের একখানা মণিময় পাত্র উপহার স্বরূপ অর্পণ করেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইলে রাজা ৩য় জর্জ্জ তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময়ে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সঙ্গে ইংরেজ এবং ইউরোপীয় অন্যান্য নৃপতিবর্গের যুদ্ধ চলিতেছিল। ইনি স্পেনের নানাস্থানে নেপোলিয়ানের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। এই সময়ে ১৮০৯ খৃঃ তেলাভেরা যুদ্ধের পর তিনি "বেরণ" ও "ভাইকাউণ্ট" নামক সম্ভ্রমসূচক উপাধিদ্বয় লাভ করেন। ১৮১৫ খৃঃ ১৮ই জুন ইয়োরোপের নৃপতিগণের সমবেত সৈন্য বেলজিয়মের অন্তর্গত ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে নোপোলিয়নকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন ইংরেজ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। নেপোলিয়ন পরাজিত ও অবশেষে ধৃত হইয়া বন্দিভাবে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে প্রেরিত হন। এই ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের ৪0,000 সহস্র সৈন্য হত এবং কেবল ইংরেজ পক্ষেই ১৭000 সহস্র সৈন্য হত ও আহত হয়। ডিউক অব ওয়েলিংটন ১৮৫২ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৩ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ওস্‌মান—ইনি আফ্‌ফানের পুত্র। ইনি মোহাম্মদের প্রিয় সহচর ছিলেন। ইনি ওমারের মৃত্যুর পরে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে তৃতীয় খলিফা হন। ১২ বৎসর খলিফা পদে রাজত্ব করিয়া তিনি মদিনায় নিজ গৃহে কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারীকর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত ও আহত হইয়া দেহত্যাগ করেন (৬৬৫ খৃঃ ৩০ শে জুন)। ইঁহার পরে মোহাম্মদের জামাতা আলী খলিফাপদে অভিষিক্ত হন।

ওস্‌মান পাশা—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুষতুরস্ক যুদ্ধে তুরস্কের সুলতানের অন্যতম সেনাপতি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল রুষিয়ার সম্রাট্ আলেকজেণ্ডারই প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে তুর্কীর সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তুরস্করাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দেন। তুরস্কের অধীন হাজাগোবিনা ও বুলগেরিয়ার খৃষ্টান প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রুষিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী (Minister of Foreign affairs) লর্ড ডার্ব্বি বলেন, এরূপ যুদ্ধঘোষণা রুষিয়ার পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে। এই যুদ্ধঘোষণাদ্বারা রুষিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পারিশনগরীর সন্ধি ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরের সন্ধিপত্র অমান্য করিয়াছেন; কাজেই এই যুদ্ধে রুষিয়া ইংলণ্ডের সহানুভূতি পাইতে পারেন না। তুরস্কের সম্রাট সুলতান অব্দুল হামিদ বলিতেছেন যে, বুলগেরিয়ার ব্যাপার লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া রুষিয়ার একটা ছলনা মাত্র। রুষিয়ার বাস্তবিক অভিপ্রায় তুরস্করাজ্যের শাসন ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। কিন্তু তিনি প্রাণ থাকিতেও তাহা ঘটিতে দিবেন না। সুলতানের প্রধান মন্ত্রী ইব্রাহিম ইধাম ও রুষসম্রাটের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স গরটস্‌কফ উভয়েই নিপুণ ও রাজনীতিজ্ঞ। সুলতান আব্দুল হামিদ বীরপুরুষ। তিনি এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান (অটমান) হইতে ৩৪ জন সুলতানের পর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল সমুদ্রতীরে অবস্থিত অতি সুন্দর সহর। এই নগর ৩৩০ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য রোমীয় সম্রাট্ কনষ্টাটাইন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। রুষিয়ার সম্রাট্ দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার অত্যন্ত চতুর নরপতি। তিনি পূর্ব্বাপরই নিজ সদুদ্দেশ্য দেখাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ ছলনা করিয়া রুশীয়সম্রাট্গণ দুই শত বৎসরে আপনাদের রাজ্যের সীমা জার্ম্মেণীর দিকে ৭00 মাইল, সুইডেনের দিকে ৬৩0 মাইল, তিহারাণের দিকে ১000 মাইল, কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে ৫00 মাইল বিস্তৃত করিয়াছেন। এই যুদ্ধে রুষিয়ার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস্, ইনি রুষীয় সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৭৭ সনের ১২ই জুন তারিখের তারের খবরে প্রকাশ যে, রুষিয়া ২,২0,000 ও তুর্কী ২00,000 সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিয়াছেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তুরস্কের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন আব্দুল করিম

পাশা। ইনি সার্ভিয়ানদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভায়েনা নগরে জেনারেল হস্‌লবের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন।

রুষীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ--ডানিউব নদীর তীরে একলক্ষ পদাতিক, দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ৪৪৮টি কামান স্থাপিত করিলেন; ইহাদের প্রধান আড্ডা কিচিনিফ্, টিরাম্পল ও অরাসিকনগর। এতদ্ব্যতীত এশিয়িক তুরস্কের সীমায় ৯৫,০০০ পদাতিক, ১২,০০০ অশ্বারোহী ও ৩০০ কামান স্থাপন করিলেন। তুরস্কের প্রধান সেনাধ্যক্ষ বালকান-বিভাগে একলক্ষ আটাশ হাজার সৈন্য ও বালকান পর্ব্বতে ৩০,০০০ সৈন্য এবং এশিয়াটীক তুরস্কে ৭৬,০০০ সৈন্য স্থাপন করিলেন। নানাস্থানে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। জয়শ্রী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন বুঝা গেল না। ইয়োরোপের অন্যান্য রাজারা নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। নবেম্বরের প্রথম ভাগেই উভয় পক্ষের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ পদত্যাগ করেন। আব্দুল করিম পাশার পদচ্যুতির পর মেহমেট পাশা ও তৎপর সলিমান পাশা প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হন। রুষীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস্ অসুস্থতাহেতু কার্য্যত্যাগ করেন এবং জেনারেল কুরুপাট্‌কিন তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। তুর্ক জেনারেল ওসমান পাশা ৬০ হাজার সৈন্য ও ২২০ কামান লইয়া প্লেবনাতে অবস্থিত ছিলেন। এখানেই রক্তারক্তির একশেষ হয়। প্লেবনার নিকট রুষীয়দের ৮০ হাজার সৈন্য ও ৩৫৬টি কামান ছিল। ৩১শে আগষ্ট তারিখে ওসমান পাশা ১৩০০০ রুষীয় সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। রুষীয় সেনাপতিগণ প্লেবনা বেষ্টনে সচেষ্ট হন। ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্লেবনাতে রুষীয়দের ৩ হাজার সৈনিক কর্ম্মচারী, ১৫ হাজার ৬ শত সৈন্য হত হইল। বেদকেত পাশা ওসমান পাশার সহিত প্লেবনাতে মিলিত হইলেন। এই মিলিত তুর্ক সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে রুষীয়গণ প্লেবনাতে বেষ্টন করেন। ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত রুষীয়দের ৭৪৮৫৮ জন সৈন্য হত হইল। ডিসেম্বরের প্রারম্ভে প্লেবনাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে জানা গেল, প্লেবনা রুষহস্তে পতিত হইয়াছে। জেনারেল ওসমান পাশা উইডিনের দিকে রুষব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শত্রুরা সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আহত হইয়া পড়েন এবং শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই প্লেবনাসমরে ৪০ হাজার সবল ও ২০ হাজার পীড়িত তুর্কসৈন্য রুষের নিকট বন্দী হয়। প্লেবনার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই জয়শ্রী রুষের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইয়োরোপীয় রাজগণের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে তুরস্ককে অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে।

ক

কনফিউসিয়াস -- এই চীন রাজনীতিবিদ্ ও ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ ৫৫১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সু-লিয়েঙ্গ হেই চীনের অন্তর্গত লুপ্রদেশের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কথিত আছে যে, পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কনফিউসিয়াস চীনীয়দের প্রসিদ্ধ পাঁচখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ নানাস্থানে অধস্তন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি চাংটু নগরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। এই কর্ম্মে থাকিয়া তিনি কতকগুলি প্রয়োজনীয় সমাজ সংস্কার বিধান করেন। ইহাতে তিনি আরও উচ্চপদ লাভ করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার শাসনে দেশ হইতে পাপ একবারে দূর হইয়াছিল; দণ্ডবিধিসংক্রান্ত আইনের ধারাগুলি কার্য্যতঃ কোন প্রয়োজনেই আসিত না। অতঃপর জাতীয় উন্নতি সাধনার্থ তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যের নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক তত্তৎস্থান-সমূহের আচার, রীতিনীতি আলোচনা করেন এবং লুনগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক চীনীয় পবিত্র গ্রন্থগুলি মুদ্রিত

করিয়া প্রকাশ করেন। বহুলোক নানাস্থান হইতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করেন। কথিত আছে যে, তিনি তিন সহস্র শিষ্য রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার শিক্ষাবলে চীনের উচ্চ নীচ সকল-শ্রেণীর লোকই পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিয়া থাকে। এই পূজার উপকরণ মাংস, সুরা, ফল, ফুল ও গন্ধদ্রব্য। চীনীয়েরা মাতা পিতাকে বড় ভক্তি করে; মাতাপিতৃভক্তি হইতে ভ্রাতৃভক্তি উৎপন্ন হয়। চীনীয় স্ত্রীলোকের অধীনতা ত্রিবিধ:—পিতামাতার নিকট, স্বামীর নিকট এবং বিধবা হইলে জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট। চীনীয় মহিলাগণ বৈধব্যের পূর্ব্বপর্য্যন্ত স্বীয় সন্তান ও পরিবারস্থ অন্যান্য লোকের উপর প্রভুত ক্ষমতা পরিচালন করে। চীন সম্রাটের মাতা সম্রাট্ অপেক্ষা রাজ্যে অধিকতর ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকেন এবং তিনি সম্রাট্ অপেক্ষা প্রজাদের অধিক মাননীয়া। ৫২৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কনফিউসিয়াসের মাতার মৃত্যু হয়; তিনি মহা জাঁকজমকের সহিত মাতার শবের সৎকার করেন। ৪৪০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কনফিউসিয়াস পরলোক গমন করেন।

কর্ণওয়ালিশ (মার্কুইস)—ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল। লর্ড কর্ণওয়ালিশের পিতার নাম ফ্রেডেরিক; মাতা এন্‌স্কট। পিতা ফ্রেডেরিক ১৭৫৩ খৃঃ লর্ড ব্রোম ও আর্ল কর্ণওয়ালিশ উপাধি প্রাপ্ত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৬ খৃঃ হইতে ১৭৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেন। ইনি ১৭৩৮ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৮ খৃঃ ইনি যুদ্ধবিভাগে ক্যাপ্‌টেইন পদে নিযুক্ত হন; ১৭৬১ খৃঃ তিনি লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হন। আমেরিকার স্বাধীনতা সমর উপস্থিত হইলে, ইনি তথায় প্রেরিত হন; ইনি এই অযশস্কর যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি এই কাজ গ্রহণ করেন। প্রথমে দুই একটী যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু অবশেষে ১৭৮১ খৃঃ ওয়াসিংটনের নিকট সৈন্য সহ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৮৩ খৃঃ এই যুদ্ধের অবসানে কর্ণওয়ালিশ মুক্তিলাভ করেন এবং ১৭৮৬ খৃঃ ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনারেল হইয়া আগমন করেন। ১৭৯১ খৃঃ তিনি বঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন, এবং ১৭৯৩ খৃঃ এই বন্দোবস্তটীকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করেন। এই কার্য্যদ্বারা তাঁহার শাসনকাল স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৮০৫ খৃঃ ইনি পরলোক গমন করেন। বিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইঁহার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কলম্বস (ক্রিষ্টোফার)—এই বিখ্যাত নাবিক ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে ১৪৩৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ডোমিনিকো কলম্বস। পিতা ডোমিনিকো পুত্রকে বাল্যকালে তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া তাহার শিক্ষার প্রতি যথাসাধ্য যত্ন লইতে লাগিলেন এবং তাহাকে পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও জ্যামিতি অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে ইটালী বাণিজ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাণিজ্য ব্যাপার লইয়া এই দেশকে অন্যান্য দেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল; সুতরাং এমন সময়ে যুদ্ধবিভাগে প্রবেশ করা অনায়াসসাধ্য ছিল। তিনি অল্পকাল মধ্যেই লেখাপড়া শেষ করিয়া জেনোয়া সাধারণ-তন্ত্রে নৌযুদ্ধ বিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি অবসর পাইলেই সুন্দর সুন্দর মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া বিক্রয় করিতেন; মানচিত্র বিক্রয়ে তাঁহার বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ভূগোল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ভেনিস দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক, ক্যাথে ও জিপাঙ্গো (বর্ত্তমান চীন ও জাপান) সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কলম্বসের ধারণা হইল যে, এই সমুদয় স্থানে জলপথেও যাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার বার্থলোমিও ও ডিগো নামে দুই কনিষ্ঠ সহোদর এবং এতদ্ব্যতীত এক ভগিনীও ছিলেন। বার্থলোমিও পর্টুগালের রাজধানী লিসবন নগরে চাকরী করিতেন এবং তিনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় নাবিকদিগকে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কলম্বস লিসবনে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই লিসবন সহরের রাজপুত্র স্বয়ং নাবিকের কার্য্য করিতেন এবং একার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহও ছিল। এই যুবরাজের জাহাজের একজন উচ্চপদস্থ

নাবিক কর্ম্মচারীর কন্যা ফিলিপা পেলিষ্ট্রিলোর সহিত কলম্বসের বিবাহ হয়। কলম্বসের শ্বশুরের লিখিত ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহের বর্ণনা তাঁহার হস্তগত হয়। এই সমুদয় বর্ণনা পাঠ করিয়া কলম্বস ক্যাথে ও জিপাঙ্গো যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি জেনোয়া ও অন্যান্য স্থানের রাজগণের নিকট জাহাজ ও উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রার্থনা করিলেন; সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু পর্টুগালের রাজা কলম্বসের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না, এতৎসম্বন্ধে কতিপয় ব্যক্তির উপর বিবেচনার ভার অর্পণ করিলেন। এই সমুদয় ব্যক্তি কলম্বসের প্রস্তাবটী পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু গোপনে গোপনে একজন নাবিককে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে প্রেরণ করিলেন। এই নাবিক এজোর্স দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলম্বসের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। এই সময়ে কলম্বসের পত্নীবিয়োগ হয় এবং তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উত্তমর্ণেরা তাঁহার মানচিত্রগুলি ক্রোক করিয়া লইল এবং তিনি পুত্র ডিগোর সহিত লিসবন হইতে পলায়নপূর্ব্বক স্পেনের রাজা ফার্ডিনেণ্ড ও রাণী ইসাবেলার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী ইসাবেলা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং ১৪৯২ খৃঃ ৩রা আগষ্ট কলম্বসের জাহাজ "প্যালস" বন্দর ত্যাগ করিল। এই সনের ১২ই অক্টোবর নুতন পৃথিবীর "গুয়ানাহানি"তে (বর্ত্তমান সেণ্টসেলভেডর) অবতরণ করেন। এই স্থান ক্যাথে ও জিপাঙ্গোর পশ্চিমে অবস্থিত মনে করিয়া কলম্বস ইহার "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ" নাম রাখেন। এই সনের ২৭শে অক্টোবর তিনি "কিউবা" আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপবাসীরা প্রথমতঃ ভয়ে পলাইয়া যাইত, কিন্তু পরে সদয় ব্যবহার ও উপহার স্বরূপ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া জাহাজের স্পেনীয় লোকদের সহিত মিশিতে লাগিল। ডিসেম্বর মাসে "হাতি" দ্বীপ বা "সেণ্ট ডিমেঙ্গো" আবিষ্কার করেন; ১৪৯৩ খৃঃ মার্চ্চ মাসে তিনি আনন্দ কোলাহলের মধ্যে স্পেনের "প্যালস" বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্পেনরাজ ফার্ডিনেণ্ড ও রাণী ইসাবেলা তাহাকে অতি সম্মানের সহিত "বার্সিলোনা" নগরে অভ্যর্থনা করেন। ১৪৯৩ খৃঃ তিনি পুনর্ব্বার দেশ আবিষ্ক্রিয়ায় যাত্রা করেন। এইবার তিনি "জামেকা" দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ১৪৯৮ খৃঃ তিনি তৃতীয়বারের যাত্রায় আমেরিকা মহাদেশ ও "ত্রিনিদাদ" আবিষ্কার করেন। এখানে "ওজামা" নদীর ধারে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বার্থলোমিও ও কতিপয় স্পেনীয় লোক উপনিবেশ স্থাপন করেন। বার্থলোমিওর সহিত স্পেনীয়দের মনোবাদ হয়। মনোবাদ বিদ্রোহে পরিণত হয়। কলম্বস ও বার্থলোমিওর নামে স্পেনে অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। "বোবাডিলা" নামে এক উগ্রপ্রকৃতির লোক এই ব্যাপারের অনুসন্ধানার্থ আমেরিকায় প্রেরিত হয়। ইনি তথায় গমনপূর্ব্বক কলম্বস ও তাঁহার ভ্রাতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া স্পেনে প্রেরণ করেন। নূতন পৃথিবীর আবিষ্কর্ত্তা "কেডিজ" নগরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইলে জনসাধারণ "বোবাডিলার" উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। কলম্বস রাণী ইসাবেলার নিকট প্রকৃত ঘটনা বলিয়া পাঠান। রাণী কলম্বসের অপমানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিতে আদেশ দিয়া পাথেয় ব্যয়স্বরূপ তাঁহাকে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। ১৫০২ খৃঃ তিনি ৪র্থ বার আবিষ্ক্রিয়ার্থ বহির্গত হন; এবার তাঁহাকে ৪ খানা জাহাজ দেওয়া হয় এবং সেণ্ট ডোমিঙ্গোতে অবতরণ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। "বোবাডিলা" প্রভূত সম্পত্তি লইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন; কিন্তু কলম্বসের উপদেশ মতে ঝড়ের প্রতীক্ষা করিয়া রওনা না হওয়ায়, তিনি সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কলম্বস ১৫০৪ খৃঃ নানারোগে পীড়িত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে তাঁহার উপকারিণী রাজ্ঞী ইসাবেলা পরলোক গমন করিয়াছিলেন; রাজা ফার্ডিনেণ্ড কলম্বসের প্রতি বেশী অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন না। কলম্বস ১৫০৬ খৃঃ অর্থাভাবে কষ্ট পাইয়া ৭০ বৎসর বয়সে ভেলাডলিড নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ডিগো বর্ত্তমান রহিলেন। স্পেনের "বার্সিলোনা" নগরে তাঁহার স্মরণার্থ ২০০ ফুট উচ্চ এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

কেইন (উইলিয়ম স্পোর্টন)—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিভারপুল নগরের অনতিদূরে শিকুম্ব নামক একটী ক্ষুদ্র সহরে ১৮৪২ খৃঃ এই ভারতহিতৈষী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন লৌহ-ব্যবসায়ীর পুত্র। ডব্লু, এস, কেইন সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া প্রথমে এক জাহাজ কোম্পানীতে কাজ গ্রহণ করেন এবং তৎপর উহা পরিত্যাগ করিয়া দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে পিতার কারবারের অংশ খরিদ করেন। তিনি সততা ও শ্রমশীলতা হেতু ব্যবসায়ে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করেন এবং ১৫ বৎসরে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি দেশের কল্যাণের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং এজন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয়ও করিতেন। সুরাপান নিবারণ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি উদার-নৈতিকদিগের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং বহুকাল উক্ত সভার সভ্য পদে আসীন ছিলেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মভাবের জন্য পার্লেমেণ্টের সকল সভাই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি ভারতবর্ষের হিতকল্পে অনেক বিষয় পার্লেমেণ্টে উত্থাপিত করিতেন; ভারতীয় শিক্ষিত জনগণ তাঁহাকে ভারতবন্ধু বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার নিজের একটী ভজনালয় ছিল এবং এই গির্জ্জায় তিনি স্বয়ং প্রতি রবিবার ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

কেল্‌ভিন (লর্ড)—এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পূর্ব্বনাম সার উইলিয়ম টম্‌সন। ইনি ১৮২৪ খৃঃ আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত বেলফাষ্ট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জেম টম্‌সন স্কটলণ্ডের গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গণিতাধ্যাপক ছিলেন। তিনি পিতার নিকট থাকিয়া ১১শ বর্ষ বয়সে গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এথানে তিনি ১৮৪৫ খৃঃ গণিতের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়া "রেঙ্গলার" উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর তিনি গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে ৫০ বৎসরেরও অধিককাল অধ্যাপনা করিয়া নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সমগ্র সভ্যজগৎকে বিস্মিত করেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তাপ ও তাড়িতের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া জগতের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত আটলাণ্টিক মহাসাগরের গর্ভদিয়া যে তার গিয়াছে তাহার স্থাপনে তিনি ১৮৬৫-৬৬ খৃঃ অপরিসীম দক্ষতা প্রকাশ করিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই ব্যাপারে ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার (Electric Engineer) পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি সমুদ্রের গভীরতামাপক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রগামী পোতসমূহকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; সমুদ্রগামী জাহাজে স্থাপিত দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া দিঙ্‌নির্ণয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাতে যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি বিনয় এবং ধর্ম্মপ্রাণতাও পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। তিনি একজন প্রকৃত বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন। ইংরেজরাজ তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ১৮৯২ খৃঃ "লর্ড" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁহাকে প্রিভি কাউনসিলের (Privy Council) সভ্য নিযুক্ত করেন। জর্ম্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে তিনি বহু উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃঃ ১৮ই ডিসেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

কোপারনিকাস্—প্রুষিয়া দেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ। ইঁহার মতে সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে বর্ত্তমান এবং পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহসকল সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ইঁহার মতই এখন সমস্ত সভ্যজগতে গৃহীত। এই মত দ্বারা ইয়োরোপে প্রচলিত প্রাচীন "টলেমীর" মত বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; টলেমী প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে পৃথিবী কেন্দ্রস্থলে বর্ত্তমান এবং সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোপারনিকাস প্রুষিয়ার অন্তর্গত থর্ণনামক স্থানে ১৪৭৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রাকো নগরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমতঃ একজন চিকিৎসক হন, কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বিরক্তিকর বোধ হওয়াতে তিনি ১৫০০ খৃঃ ইটালীতে গমন করিয়া রোমনগরীর কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই অধ্যাপকের কার্য্যে কিছুকাল থাকিয়া তিনি জন্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং এক গির্জ্জায় ধর্ম্মযাজকের কাজ গ্রহণ করেন। এথানে তাঁহার শেষ জীবন শান্তিতে

অতিবাহিত হইল। তিনি গির্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং পীড়িত গরীব দুঃখীদিগকে অর্থগ্রহণ ব্যতিরেকে চিকিৎসা করিতেন। গৃহের বাহিরে এইরূপে ধর্ম্মচর্চ্চা ও পরোপকারে সময় অতিবাহিত করিয়া বাড়ীতে বসিয়া গভীর জ্যোতিষিক তত্ত্বে নিমগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নূতন জ্যোতিষিক আবিষ্ক্রিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই আবিষ্ক্রিয়া তাঁহাকে জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি অল্প কয়েক খান মাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ১৫৪৩ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

কোমৎ (অগাস্ট)—ফরাসীদেশীয় বিখ্যাত নব্য দার্শনিক। ১৭৯৫ খৃঃ মণ্টপেলিয়ার নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮২১ খৃঃ এক বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হন; দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ে কাজ করিয়া অবশেষে কোন কোন শিক্ষকের সহিত মনোবাদ হওয়াতে ১৮৫২ খৃঃ কার্য্যত্যাগ করেন। উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ১৮৩০ খৃঃ হইতে ১৮৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় একাদশবর্ষকাল পরিশ্রম করিয়া ৬টি বৃহৎখণ্ডে প্রামাণিকদর্শন প্রকাশ করেন। এই দর্শনে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে মনুষ্যের মন ক্রমে তিন সোপান অতিক্রম করে:—(১) আধ্যাত্মিক, (২) দার্শনিক, (৩) বৈজ্ঞানিক বা প্রামাণিক। মানব মনের অবস্থার পরিবর্ত্তের সহিত জ্ঞানী মানব জগৎকার্য্যের তিন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন:-(১) আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক বা ইচ্ছামূলক ব্যাখ্যা, (২) দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক ব্যাখ্যা, (৩) বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক ব্যাখ্যা।

(১) আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক বা ইচ্ছামূলক ব্যাখ্যা—শিশুগণ গতিবিশিষ্ট রেলগাড়ী, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতিকে সজীব জ্ঞান করে। পুরাকালে মানবগণ শিক্ষার আলোকাভাবে অনেকটা শিশুভাবাপন্ন ছিলেন; এজন্য তাঁহারা প্রবল ঝটিকাপ্রবাহে, উত্তালতরঙ্গমালাসমন্বিত সাগরবক্ষে, অন্ধকারনাশী সূর্য্যে, গৃহকাননধ্বংসকারী অগ্নিতে এবং বজ্রধ্বনি-মুখরিত ঘনাবলীতে দেবতা প্রত্যক্ষ করিতেন। এইরূপে পুরাণবর্ণিত বায়ু, জল, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মানব জ্ঞানের প্রথম সোপানকে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং এই সমুদয় ঘটনায় তাঁহাদের আত্মা ও ইচ্ছা বর্ত্তমান দৃষ্ট হইত বলিয়া এই সোপানকে আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

(২) দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক ব্যাখ্যা:-কাল সহকারে মানবজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বে যাহাদিগকে সচেতন ও ইচ্ছাবিশিষ্ট জ্ঞান করা হইয়াছিল, চৈতন্যের পরিচায়ক লক্ষণগুলি তাহাদিগতে বর্ত্তমান নাই; অগ্নিতে হাত দিলে উহা নিশ্চয়ই পুড়িবে, অগ্নি আত্মা ও ইচ্ছাবিশিষ্ট হইলে উহা হাতকে দগ্ধ নাও করিতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না। অগ্নির আত্মা বা ইচ্ছা প্রত্যক্ষ না হইয়া দাহিকাশক্তি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; জলের বা বরুণের আত্মা বা ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ না হইয়া শৈত্যগুণই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পৌরাণিক দেবতাগণের সকলের সম্বন্ধেই এই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। এজন্য জ্ঞানের এই দ্বিতীয় সোপানকে দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক বলা হইয়া থাকে।

(৩) বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক ব্যাখ্যা—মানবগণ যখন জ্ঞানের আরও উন্নতস্তরে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সমুদয় জগৎকার্য্যই নিয়মের অধীন। মানব-পদোদ্ধৃত ধূলিকণা হইতে গগনচারী জ্যোতিষ্কগণ পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তুই নিয়মের অধীন। কোমৎ, নিয়মভক্ত ও অজ্ঞেয়তা-বাদী। তিনি বলেন, জগতের মূল কারণ ও চরম লক্ষ্য আমাদের জানিবার সাধ্য নাই; উহা অজ্ঞেয়।

১৮৫৭ খৃঃ ফ্রান্সের রাজধানী পারিশ নগরে ইনি দেহত্যাগ করেন। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক মার্টিনো সাহেবের কন্যা মিস্ মার্টিনো এই প্রামাণিক দর্শন ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

ক্যানিং (লর্ড)—চার্লস্ জন্ ক্যানিং ১৮১২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জর্জ্জ ক্যানিং ইংলণ্ডের একজন বড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। চার্লস্ ক্যানিং পিতার দ্বিতীয় পুত্র; ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৌসৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১৮২৮ খৃঃ সমুদ্রমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৩৭ খৃঃ ক্যানিং

এর জননী পরলোক গমন করেন। জননীর মৃত্যুর পর তিনি "ভাই কাউন্ট" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সম্ভ্রান্ত পদবী লাভ করেন। ১৮৪১ খৃঃ সার রবার্ট পীলের মন্ত্রিত্ব সময়ে তিনি বৈদেশিক-রাজকার্য্য-বিভাগে "আণ্ডার সেক্রেটরী" পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বনবিভাগের কমিশনর পদে নিযুক্ত হন। কিয়ৎকাল পরে তিনি ডাকবিভাগে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল" পদ প্রাপ্ত হন। তৎপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লর্ড ডালহৌসীর শাসন কালের অবসানে তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হইয়া ভারতে আগমন করেন। ইঁহার শাসনসময়ে ভারতে বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে অনেক ইংরেজ ইঁহাকে দুর্ব্বলচিত্ত ও ভীরু বলিয়া আক্রমণ করেন; কিন্তু বিলাতের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন এবং ভারত হইতে বিলাতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহাকে ১৮৫৯ খৃঃ "আর্ল" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৬২ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

ক্যারি (উইলিয়ম)—ভারতে প্রথম আগত প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী খৃষ্টান মিশনারি (ধর্ম্মপ্রচারক)। এই বিখ্যাত ইংরেজ পাদ্রী ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দ্দমটন সায়ারের ১১ মাইল দক্ষিণে স্থিত পেনলার্সবারি নামক গ্রামে ১৭৬১ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে তাঁহার পিতা তন্তুবায়ের কাজ করিতেন। ক্যারির ৬ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা এক ফ্রি স্কুলে শিক্ষকতা প্রাপ্ত হন এবং এই সময় হইতে ক্যারি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতার সহিত ঐ ফ্রি স্কুলের গৃহে বাস করিতে থাকেন। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাই তাঁহার উন্নতির মূল। তিনি যে কাজ আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তিনি মাঠে সাধারণ শ্রমজীবীর কাজ করিয়া প্রথম অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সূর্য্যোত্তাপ অসহনীয় হওয়াতে এই কাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সপ্তদশবর্ষ বয়সে পেনলার্সবারির অদূরবর্ত্তী হেক্‌ল্‌টন গ্রামবাসী নিকলস নামে এক চর্ম্ম-পাদুকা নির্ম্মাতার দোকানে শিক্ষানবিশী করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গের ভাবী প্রধান খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক এইরূপে চর্ম্ম-পাদুকা নির্ম্মাণ কার্য্যে জীবিকা উপার্জ্জন আরম্ভ করেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে হেক্‌ল্‌টন গ্রামবাসী কয়েকজন লোকের সহিত মিলিত হইয়া তিনি এক ক্ষুদ্র গির্জ্জাঘরে প্রত্যহ উপাসনা ও বাইবেল পাঠ আরম্ভ করেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ এমন হৃদয়গ্রাহী হইত যে, সকলে আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে উপাসনালয় না থাকাতে গ্রামবাসিগণ ক্যারি সাহেবকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন। ক্যারিও আহ্লাদের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বক্তৃতা ও উপাসনা করিয়া আসিতেন। কোন কোন সময়ে তাঁহাকে দিনে ২০ মাইল হাটিতে হইত। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার লেখাপড়া শিখিতে অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছিল; তিনি অল্প বয়সেই একখানি ল্যাটিন ভাষার অভিধান কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি যে চামারের দোকানে কাজ করিতেন সেই চামারের মৃত্যু হইল এবং তিনি উক্ত চর্ম্ম-পাদুকা-নির্ম্মাতার ভগিনী ডরথি প্লাকেটকে বিবাহ করিয়া ঐ দোকানের মালিক হইলেন। তাঁহার পত্নী অশিক্ষিতা এবং স্বামীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন। ডরথি প্লাকেট স্বামীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বিষয় হৃদয়ে ধারণাই করিতে পারিতেন না। ক্যারি অশিক্ষিতা পত্নীকে যথাযোগ্য আদর প্রদর্শন করিতে ক্রুটি করিতেন না। অল্প বয়সে বিবাহ করায় ক্যারির পক্ষে স্ত্রী ও সন্তানগণের ভরণ পোষণের ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাঁহার যে আয় ছিল তাহাতে নিজের ব্যয় সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিত, কিন্তু পরিবারের ব্যয় বহন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি বাল্যবিবাহের বিষময় ফল হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি বার্ষিক ১০০৲ টাকা বেতনে এক পাদ্রির কার্য্যে নিযুক্ত হন। অল্পকাল কাজ করিয়াই তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করেন; একার্য্যে তাঁহার মাসিক আয় ১২৲ টাকার অধিক হইত না। শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় পূর্ব্বের জুতার ব্যবসায় অবলম্বন করেন। অল্পকাল মধ্যে অনেক পাদ্রির সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাদের পরামর্শে তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন। পাদ্রিগণ ক্যারিকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের গির্জ্জায় উপাসনা করিতে আহ্বান করিতেন; ১৭৯৩ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী ক্যারি টমাস নামক অপর এক পাদ্রির

সহিত ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারতে আসিতে অনুরুদ্ধ হন। ইনি বার্ষিক ৭৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। পাথেয় খরচ স্বতন্ত্র চাঁদা করিয়া তুলিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে আসিতে সম্মতা হইলেন না; অবশেষে তিনি একাকীই ভারতে যাত্রা করেন। ১৭৯৩ খৃঃ মধ্যভাগে তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া পাঁচমাস পরে ১১ই নবেম্বর ভারতে পদার্পণ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর হইয়াছিল। ক্যারি কলিকাতা হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীরামপুর নামক ক্ষুদ্র সহরে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নামে তাঁহার অপর দুইজন সহযোগীও ছিলেন। মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস বহুকাল এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইঁহাদের যত্নে বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বঙ্গে পূর্ব্বে ছাপাখানা ছিল না; ইঁহাদের যত্নে বাঙ্গালায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল। ইঁহারা ৪০০৲ টাকায় একটা কাঠের মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন এবং এই যন্ত্রে প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে বাইবেল মুদ্রিত হয়। অতঃপর উত্তম লৌহমুদ্রাযন্ত্র বিলাত হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। ক্যারি অধ্যবসায়ের সহিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন; মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইলে, তিনি সংস্কৃতে একখানা ব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করেন। পঞ্চানন নামে একজন কর্ম্মকার মনোহর নামক অপর একজন কর্ম্মকারের সাহায্যে নাগরি মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী নাগরি অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহার পর ঐ কর্ম্মকারদ্বয় উড়িয়া, পার্শী, আরবি প্রভৃতি ভাষার অক্ষরও নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশে ভাল কাগজ প্রস্তুত হইত না; ক্যারি, মার্শম্যান প্রভৃতি প্রচারকদিগকে খারাপ কাগজে বাইবেল মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। ইহার পর মিশনরিগণ শ্রীরামপুরে এক কাগজের কল স্থাপন করেন; এই কলে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতে লাগিল; এই কাগজ শ্রীরামপুরী কাগজ নামে বঙ্গে খ্যাত হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর কাগজের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮০০ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী ক্যারি সাহেবের পত্নী সন্তানগণ সহ বিলাত হইতে শ্রীরামপুরে আগমন করেন। ক্যারি সাহেবই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। ইহার পর কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে ক্যারি হিন্দি ও সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করেন। মার্শম্যান চীনভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে ক্যারি সাহেবের যত্নে ২২টী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হয়।

ক্যারি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন এবং একখানা বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন; ১৮২৫ খৃঃ এই অভিধান ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। ক্যারি হিন্দুদের গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন; এই প্রথা ১৮০২ খৃঃ গবর্ণমেণ্টের আদেশে রহিত হয়। তিনিই প্রথমে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং এই প্রথা রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, বহু আন্দোলনের পর ১৮২৯ খৃঃ গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক সাহেব এই প্রথা রহিত করেন। ক্যারি প্রমুখ শ্রীরামপুরের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের যত্নে শ্রীরামপুরে একটী কলেজ স্থাপিত হয়। এই সময়ে শ্রীরামপুর ডেনমার্কবাসীদিগের অধিকারে ছিল। শ্রীরামপুরের ডেনিস্ শাসনকর্ত্তা ও ভারতের তদানীন্তন ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস্ এই কলেজের সহায় হন। শ্রীরামপুরের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ এই কলেজের জন্য ভূমি ক্রয়, বাড়ী নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়ের সাহায্যকল্পে দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৩৪ খৃঃ ৯ই জুন ৭৩ বৎসর বয়সে ক্যারি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় বিখ্যাত ডফ ও মার্শম্যান সাহেব তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ক্রঞ্জি—বিখ্যাত বুয়র সেনাপতি। অনেকে বলেন, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পর আর এত বড় বীর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৯৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল সাধারণতন্ত্র ও অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ ট্রান্সভাল রাজ্যে ও ইংরেজেই যুদ্ধ উপস্থিত হয়; যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসিগণ জ্ঞাতি ভ্রাতাদের সহিত যোগ দিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ট্রান্সভ্যাল ও অরেঞ্জ রাজ্যবাসিগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী, এজন্য তাহাদিগকে বুয়র বা কৃষিজীবী বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই এই যুদ্ধকে বুয়র যুদ্ধ বলা হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হয়; প্রায় ৩ বৎসর যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে

সন্ধি স্থাপিত হইলে এই লোকনাশন যুদ্ধের অবসান হয়। বুয়রদের পূর্ব্বপুরুষ হলণ্ডবাসী। হলণ্ড হইতে কতকগুলি লোক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপকলোনিতে আসিয়া বাস করেন। ১৭৯৫ খৃঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাসী বিপ্লবের সময় হলণ্ড অধিকার করিলে, কেপকলোনিবাসী ডচ্ ঔপনিবেশিকেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হলণ্ড-বাসীদিগকে ডচ্ বলে। কেপকলোনির ডচ্ ঔপনিবেশিকেরা মাতৃভূমি হলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতেন। মাতৃভূমি ফরাসীদের হস্তগত হওয়াতে তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ইহার পর যখন ইংরেজদিগের সহিত ফরাসীদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ইংরেজেরা কেপকলোনি অধিকার করিয়া লন। স্বাধীনতাপ্রিয় বুয়রেরা কেপকলোনি পরিত্যাগ করিয়া অরেঞ্জ নদীর পর পারে রাজ্য স্থাপন করেন এবং নেটালের জঙ্গল আবাদ করিয়াও তথায় বাস করিতে থাকেন। অতঃপর ইংরেজেরা নেটালও অধিকার করিয়া লন। নেটালবাসী বুয়রেরা ভালনদী অতিক্রম করিয়া উহার অপর পারে ট্রান্সভ্যাল নামে রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক বসতি করিতে থাকেন। কেপকলোনি ও নেটাল ইংরাজদের অধিকারে থাকিল এবং অরেঞ্জ রাজ্য ও ট্রান্সভাল বুয়রদের অধীন রহিল। ১৮৭৭ খৃঃ পুনর্ব্বার বুয়রদের সহিত ইংরেজদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়; এই সময় মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। উভয় পক্ষে বহু যুদ্ধ হয়; মাজুবা ক্ষেত্রে বুয়রদের নিকট ইংরেজেরা পরাজিত হন; এই যুদ্ধে বুয়রেরা অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে বুয়রেরাই পরাজিত হন। গ্লাড্‌ষ্টোন স্বাধীনতাহরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি এই উদীয়মান বুয়র জাতির স্বাধীনতা হরণ না করিয়া তাঁহাদের রাজধানী প্রিটোরিয়া নগরে একজন ইংরেজ দূত (কন্সল-জেনারেল) রাখিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করেন। এখানেই এই যুদ্ধের অবসান হয়। ট্রান্সভ্যালে অনেক হীরক-খনি আছে; এই হীরকের লোভে বহু ইংরেজ-বণিক ট্রান্সভ্যালে গমনপূর্ব্বক তথায় স্থায়িরূপে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। ট্রান্সভ্যাল সাধারণতন্ত্রে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রচলিত। ক্রুগার নামে এক মনস্বী, সাহসী ও স্বাধীনতাপ্রিয় বীরপুরুষ এই সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। ষ্টিন নামে অপর এক বীরপুরুষ অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ষ্টিন, প্রবীণ ক্রুগারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জেনারেল জুবার্ট (বা জুবেয়র) এই উভয় রাজ্যের মিলিত সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে বৃত হইলেন। জুবার্টের অব্যবহিত নিম্নপদে জেনারেল ক্রঞ্জি আসীন হইলেন। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার স্বীয় রাজধানী প্রিটোরিয়াতে ও প্রেসিডেণ্ট ষ্টিন তদীয় রাজধানী ব্লুমফন্টিন নগরে থাকিয়া যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ এবং সৈন্য ও সেনাপতিগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ট্রান্সভ্যালে প্রবেশ করিতে হইলে নেটালের মধ্য দিয়া এবং অরেঞ্জ রাজ্যে যাইতে হইলে কেপকলোনির ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি জেনারেল জুবার্ট নেটালের পথে এবং জেনারেল ক্রঞ্জি কেপ-কলোনির পথে ইংরেজদের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জেনারেল জুবার্ট নেটালের অন্তর্গত লেডিস্মিথ নামক নগরে ইংরেজের প্রধান সেনাপতি সার জর্জ্জ হোয়াইটকে ১০ সহস্র সৈন্য সহ অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। ৬ মাসের উর্দ্ধকাল সার জর্জ্জ হোয়াইটকে এই অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যগণ অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; অবশিষ্ট সৈন্যগণ ঘোড়ার মাংস ও ঘাসের পিঠা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। কিম্বার্লি ও মেফেকিং নামক দুইটী নগরেও দুই দল ইংরেজ সৈন্য এইরূপে অবরুদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিল। লেডিস্মিথে সার জর্জ্জ হোয়াইট অবরুদ্ধ হওয়ার পর ইংলণ্ডের তৃতীয় সেনাপতি জেনারেল বুলার দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি জেনারেল হোয়াইটের উদ্ধারার্থ লেডিস্মিথের দিকে অগ্রসর হইয়া তিনবার টুগেলা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনবারই জেনারেল বোথার আক্রমণে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে নদীর অপর পারে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। জেনারেল বোথা নেটাল ক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি জুবার্টের অধীনে কাজ করিতেছিলেন। জেনারেল বোথার সহিত সংঘর্ষে বুলারের বহু সেনাপতি হত হয়; লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। বুলার লেডিস্মিথ হইতে সার জর্জ্জ হোয়াইটকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইল। এবার তথাকার দ্বিতীয় সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ আফ্রিকায় ইংরেজ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইয়া আগমন করিলেন। লর্ড

রবার্টস্ জেনারেল বুলারের ন্যায় নেটালের পথে শত্রুরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন না; তিনি কেপকলোনির পথে অগ্রসর হইয়া জেনারেল ক্রঞ্জির সম্মুখীন হইতে চলিলেন। এখানেও অরেঞ্জ নদী তাঁহার গমনের প্রধান অন্তরায়। এই নদী উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না; একজন ইটালীয় সেনাপতির নেতৃত্বে একদল বুয়র সৈন্য এই নদীবক্ষ রক্ষা করিতেছিল। এই ইটালীয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় লর্ড রবার্টস্ অরেঞ্জ নদী পার হইলেন; সেনাপতির অনভিমতে বুয়র সৈন্য লর্ড রবার্টস্‌কে বাধা দিল না। ক্রঞ্জি এই ইটালীয় সেনাপতিকে সপরিবারে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিলেন। লর্ড রবার্টস্ অরেঞ্জ নদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিতে পাইয়াই ক্রঞ্জি স্বীয় সৈন্যের ছাউনি উঠাইয়া অরেঞ্জ রাজ্যের রাজধানী ব্লুমফন্টিনের দিকে চলিলেন; কিন্তু লর্ড রবার্টস্ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া তাঁহার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। লর্ড রবার্টসের সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও একশত উৎকৃষ্ট কামান ছিল, কিন্তু ক্রঞ্জির সহিত চারি হাজার সৈন্য ও দুইটা মাত্র উৎকৃষ্ট ক্রপ কামান ছিল। এই চারি হাজার সৈন্য লইয়া ক্রঞ্জি লর্ড রবার্টসের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সহিত ৯ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একদল ইংরেজ সৈন্যকে ২৪ ঘণ্টা কাল ভূমিতে পড়িয়া থাকিয়া ক্রঞ্জির কামানের গোলা এড়াইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধ শীঘ্র কেহ দেখেন নাই। এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত পড়িয়া অনেকে বলিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরে আর এমন যুদ্ধ কেহ করেন নাই। ৯ দিন যুদ্ধের পর এই বীরকে সসৈন্যে লর্ড রবার্টসের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল। ক্রঞ্জির আত্মসমর্পণের পরই তিনি সেন্ট্‌হেলেনা দ্বীপে বন্দিভাবে প্রেরিত হইলেন; এদিকে জেনারেল জুবার্ট লেডিস্মিথ হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া গেলেন; তিনি নিজেও মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ক্রমে লেডিস্মিথ, মেফেকিং ও কিম্বার্লির উদ্ধার হইল। লর্ড রবার্টস্ অগ্রসর হইয়া ব্লুমফন্টিন অধিকার করিলেন এবং এখানে কিছুকাল সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করাইয়া সসৈন্যে প্রিটোরিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল জুবার্টের মৃত্যুর পর জেনারেল বোথা বুয়র সৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইলেন। লর্ড রবার্টস্ অগ্রসর হইয়া প্রিটোরিয়া অধিকার করিলেন। বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার হলণ্ডে চলিয়া গেলেন। সেখানে থাকিয়া তিনি যুদ্ধের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে জেনারেল বোথা, সেনাপতি ডিওয়েট ও ডিঃ লেরে ১০ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া আড়াই লক্ষ ইংরেজ সৈন্যের সহিত দেড় বৎসর যুদ্ধ করেন। এই তিন জন বুয়র সেনাপতির যুদ্ধকৌশলদর্শনে সমস্ত সভ্যজগৎ বিস্মিত হইয়াছিল। একদিন ডিঃ লেরে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ম্যাথুয়েনকে প্রায় দুই সহস্র সৈন্য সহ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। লর্ড ম্যাথুয়েন আহত হইয়াছিলেন, বুয়রেরা তাঁহার সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; লর্ড ম্যাথুয়েনের ক্ষত শুকাইল এবং তাঁহার শরীর সুস্থ হইল কিন্তু তাঁহার একখানা পদ অর্দ্ধ ইঞ্চ ছোট হইয়া গেল। এই ঘটনার পর উভয় জাতির সন্ধি স্থাপিত হইল। বুয়ার রাজ্যদ্বয় ইংরেজের হস্তগত হইল; কিছুকাল পরেই উহা ইংরেজ উপনিবেশ বলিয়া ঘোষিত হইল। এখন ট্রান্সভাল উপনিবেশে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; জেনারেল বোথাই তথায় এখন প্রধান মন্ত্রী। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করেন। সন্ধির সর্ত্তগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। বুয়রেরা সমরাস্ত্র পরিহার করিবেন।

২। আপনাদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বুয়রেরা আপন আপন বন্দুক আপনাদের নিকট রাখিতে পারিবেন।

৩। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ট্রান্সভ্যাল দেশে কোনও কর স্থাপিত হইবে না।

৪। বুয়রদিগের ঘর বাড়ী ও চাষবাসের ভূমি পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বুয়রদিগকে সাড়ে চারি কোটি মুদ্রা প্রদান করিবেন।

৫। ইংরেজদিগের হস্তে যে সকল বুয়র বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি কিছুরই হানি হইবে না; তাঁহারা ইংরেজের ব্যয়ে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হইবেন।

৬। বন্দিগণের মধ্যে যাঁহারা কোন সমর বিধান অমান্য করেন নাই, তাঁহাদিগকে কোনও প্রকারে দণ্ডভোগ করিতে হইবে না।

৭। বুয়রের মাতৃভাষা স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং আইন আদালতে যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইবে।

৮। ইংরেজ উপনিবেশের (কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানের) যে সকল বুয়র ইংরেজের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাহারা উপনিবেশের আইন অনুযায়ী দণ্ডভোগ করিবে। কেবল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না। তাহারা আজীবন দেশের রাজকার্য্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

এই সন্ধির পরেই সেনাপতি ক্রঞ্জি সেণ্টহেলেনা হইতে ইংরেজের ব্যয়ে স্বদেশে নীত হইলেন এবং গৃহে গিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি আর রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে এই বিখ্যাত সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছে।

ক্রমওয়েল (অলিভার)—এই বিখ্যাত যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ ১৫৯৯ খৃঃ ২৫শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রবার্ট ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত ছিলেন। মাতার নাম এলিজাবেথ ষ্টুয়ার্ট। ক্রমওয়েল বুরসিয়ার নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে ক্রমওয়েলের বহু সন্তান হয়, তন্মধ্যে কয়েকজন অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৬২৮ খৃঃ তিনি হাণ্টিংডন সায়ারের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। এই পার্লেমেণ্ট রাজা ১ম চার্লসের ৩য় পার্লেমেণ্ট নামে খ্যাত। এই পার্লেমেণ্টে রাজার যথেচ্ছাচার শাসননীতির তীব্র সমালোচনা হয়; রাজা ১ম চার্লস্ ক্রুদ্ধ হইয়া এই পার্লেমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন এবং যে সকল মেম্বর রাজার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করেন। অতঃপর চার্লস্ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে একবারও পার্লেমেণ্ট সভা আহ্বান করেন নাই। এই সময়ে রাজা যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা চালাইতে ও কর স্থাপন করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। হেমডেন নামক এক ব্যক্তি যথেচ্ছাচারে কর স্থাপনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। হেমডেন জনসাধারণের সহানুভূতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু মোকদ্দমা করিতে গিয়া পরাস্ত হন। উচ্ছৃঙ্খলভাবে অর্থব্যয় করায় অনতিবিলম্বেই রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল। বলপূর্ব্বক পুনরায় করস্থাপন করিতে সাহস না হওয়ায় তিনি ১৬৪০ খৃঃ নবেম্বর মাসে পুনর্ব্বার পার্লেমেণ্ট সভা আহ্বান করেন। এই পার্লেমেণ্ট দীর্ঘ পার্লেমেণ্ট নামে খ্যাত; ইহা ১১ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। সভ্যেরা এই পার্লেমেণ্টে আসীন হইয়া "ষ্টার চেম্বার" ও "হাই কমিশন কোর্ট" নামক দুইটী আদালত উঠাইয়া দেন এবং যাহাতে প্রজাগণের প্রাচীন অধিকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাজা যথেচ্ছভাবে শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা রাজাকে দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। প্রধান মন্ত্রী "আর্ল অব ষ্ট্রার্টফোর্ড" পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গণ্ডগোলের মূল; এজন্য এই পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-প্রণালী বলপূর্ব্বক স্কটলণ্ডে চালাইতে যাওয়াতে স্কটলণ্ডবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। পার্লেমেণ্ট রাজা চার্লস্‌কে প্রজাসাধারণের অধিকার মান্য করিয়া চলিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু চার্লস্ কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার সহিত ১৬৪২ খৃঃ পার্লেমেণ্টের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পার্লেমেণ্টের পক্ষে নেতা অলিভার ক্রমওয়েল; রাজার পক্ষে প্রায় সমস্ত গ্রাম্য জমিদারই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। আবার স্কটলণ্ডবাসীরাও পার্লেমেণ্টের সৈন্যের সহিত যোগদান করিলেন। উভয় পক্ষে নানাস্থানে ঘোর যুদ্ধ হইল; অবশেষে রাজা ১ম চার্লস্ পরাজিত ও ধৃত হইলেন, এবং ১৬৪৯ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারী তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। বধ ভূমিতে ঘাতকের কুঠারাঘাতে রাজার মস্তক ছিন্ন হইল; ইংলণ্ডে সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী ঘোষিত হইল। রাজা উপাধি ব্যতীত রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা ক্রমওয়েলের হস্তে ন্যস্ত হইল। ক্রম-ওয়েলের শাসন কাল সাধারণ-তন্ত্রনামে পরিচিত হইল; কিন্তু বাস্তবিক কোন রাজাই তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করিতে সমর্থ হন নাই। সেনাগণ তাঁহার অত্যন্ত বশীভূত ছিল; তাঁহাদের সাহায্যে তিনি সমস্ত আয়র্লণ্ডদেশ পরাজিত ও বশীভূত করেন। নিহত রাজা ১ম চার্লসের পুত্র ২য় চার্লস স্কটলণ্ডের সিংহাসনে স্থাপিত হইলে, ক্রমওয়েল তাঁহাকে

ডনবার ও উরষ্টার নামক দুই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন ; এবং স্কটলণ্ড দেশটাকে স্ববশে আনয়ন করেন। তাঁহার প্রতাপে হলণ্ডবাসীদিগের সামুদ্রিক প্রাধান্য লঘূকৃত হইল ; এবং ইংলণ্ডের সমুদয় বহিঃশত্রু সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। সমগ্র ইয়োরোপের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তিনি সাহায্য করিতে লাগিলেন ; ইহাতে তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। ইংরেজদিগের বাণিজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। এইরূপে অলিভার ক্রমওয়েল প্রায় ১০ বৎসর ইংলণ্ড শাসন করিয়া ১৬৫৮ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। কতকগুলি সৈন্য ক্রমওয়েলের পুত্রকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ১৬৬০ খৃঃ প্রথম চার্লসের পুত্র ২য় চার্লস্ পৈতৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন।

ক্রুগার—ট্রান্সভ্যাল সাধারণতন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট। (ক্রুগ্রি দেখ)।

ক্লাইব—ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড চাথাম ইঁহাকে "স্বর্গীয় সেনাপতি" আখ্যা দিয়াছিলেন। ইনি ১৭২৫ খৃঃ শ্রপসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সামান্য কেরাণীগিরি লইয়া তিনি এদেশে আগমন করেন। এই কাজে অবস্থান কালে তিনি একদা বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা পান ; কিন্তু গুলি লক্ষ্যচ্যুত হওয়াতে সে যাত্রায় রক্ষা পান। পরে কেরাণীগিরি পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। সৈনিক বিভাগে ক্রমশঃ উন্নতি দেখাইয়া তিনি ১৭৫৮ খৃঃ বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত হন। ১৭৬০ খৃঃ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৭৬৫—৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার গবর্ণরী করেন। ১৭৬৭ খৃঃ গবর্ণর পদ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে উপস্থিত হইলে তথায় তাঁহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা হয়। দেশীয় লোকের দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ১৭৭৪ খৃঃ তিনি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৭৬০ খৃঃ লর্ড উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৬৯ খৃঃ তিনি কে, বি, (অর্থাৎ নাইট অব বাথ) উপাধি প্রাপ্ত হয়। ইংরেজ জাতি ইঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ।

গ

গারিবল্ডি (যোশেফ)—এই বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী ইটালীর অন্তর্গত নিস্‌নগরে ১৮০৭ খৃঃ ২২শে জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিস্‌নগর তখন সার্দিনিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গারিবল্ডির সময়ে ইটালী এক রাজার অধীন ছিল না ; ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি অষ্ট্রীয়ার অধীন ও অপর কতকগুলি ফ্রান্সের অধীন ছিল। গারিবল্ডির পিতা ডোমেনিক গারিবল্ডি জেনোয়ার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ সিয়াবারি নামক ক্ষুদ্র নগরে বাস করিতেন। গারিবল্ডির মাতার নাম রোসা রাগুইন্‌ডো। কোন কারণবশতঃ পিতা ডোমানিক স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক নিস্‌নগরে আসিয়া বাস করেন। পিতা কতকগুলি জাহাজের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি নিস্‌নগরে আসিয়া যে বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন, সেখানে ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত বীর মার্সেল ম্যাসিনা জন্মগ্রহণ করেন। এই বাড়ীতেই তদপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান্ ও প্রতিভাশালী বীরপুরুষ যোসেফ গারিবল্ডির জন্ম হয়। গারিবল্ডি তাঁহার মাতার সম্বন্ধে কথার উল্লেখপূর্ব্বক সময়ে সময়ে গৌরব করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার মাতা রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন এবং তিনি যে সমস্ত গুণ লাভ করিয়াছিলেন তাহা একমাত্র মাতার চরিত্র হইতেই লব্ধ। ১৮৫১ খ্রীঃ বৃদ্ধবয়সে তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুত্রকে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিতে দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পুত্রকৃত ইটালীর উদ্ধারদর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

গারিবল্ডি নাবিকের কার্য্য ভালবাসিতেন এবং অল্পবয়সেই সার্দিনিয়ার নৌসৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। কতকগুলি লোক দেশোদ্ধারের জন্য "কর্ব্বনারো" নামক গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন ; গারিবল্ডি নাবিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া এই মন্ত্রণা সমিতিতে

যোগ দেন। কিছুকাল পরে বিপ্লবকারিগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অষ্ট্রীয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত অপর একজন স্বদেশহিতৈষীও নির্ব্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত হন ; ইঁহার নাম ম্যাটিসিনি। ম্যাটিসিনি সুইজরলণ্ডে ও গ্যারিবল্ডি ফ্রান্সে পলায়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তিনি স্বদেশোদ্ধারের জন্য প্রয়োজনমত নানা মূর্ত্তিধারণ করিতে লাগিলেন। ম্যাটিসিনি সুইজরলণ্ড হইতে ফ্রান্সের সামুদ্রিক বন্দর মার্সেলে গমন করেন ; এখানে গারিবল্ডির সহিত ম্যাটিসিনির প্রথম পরিচয় হয়। এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার কোন রাজ্যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উক্ত রাজ্যের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক রাজ্যের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। গারিবল্ডি দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিয়া সাধারণতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ; উক্ত সাধারণতন্ত্র তাঁহাকে নৌসেনার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। নৌযুদ্ধে গারিবল্ডি জয়লাভ করাতে রাইওডেজেনেরো সাধারণতন্ত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হন। এই সাধারণতন্ত্র তাঁহাকে নানাপ্রকারে সম্মানিত করেন। গারিবল্ডির যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদ ইটালীতে প্রচারিত হইল ; তিনি একখানা যুদ্ধজাহাজ ও কতকগুলি নৌসৈন্য লইয়া ইটালী উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিলেন। ভূমধ্যসাগরে তাঁহার রণতরী পৌঁছিলে বহুসংখ্যক স্বদেশপ্রেমিক তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। কয়েকটী যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সৈন্য দেশীয় লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাভূত হইল এবং দেশীয় লোকের উৎসাহ ও সাহায্যের অভাবে তিনি পরাভূত হইলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি বিষণ্নমনে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রস্থান করিলেন এবং বাণিজ্যোপজীবী হইয়া শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তথায় গমন করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁহার যশঃ পূর্ব্বেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল ; পেরুদেশে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি তথাকার সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। পেরুদেশের যুদ্ধ শেষ হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্রগণসহ ক্যাপ্রেরা দ্বীপে অজ্ঞাতভাবে ৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি বহু জমি গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন ; অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যসকল দেশান্তরে বিক্রয়ার্থ একখানি জাহজ নির্ম্মাণ করিলেন। সময়ে সময়ে তিনি জাহাজে পণ্যদ্রব্য লইয়া নিস্‌নগরে গমন করিতেন। এই সময়ে দাসত্বের মর্ম্মান্তিক আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ইটালী আবার অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। গারিবল্ডি স্বদেশসেবকের দলে যোগ দিলেন এবং সৈন্যের নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। বহু ইংরেজ ভলাণ্টিয়ার গারিবল্ডির সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ তিনি নেপল্‌স ও সিসিলি জয় করেন। ১৮৬১ খৃঃ টুরিন নগরে ইটালীর প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপিত হয় ; এই পার্লিয়ামেণ্টে গারিবল্ডি নেপল্‌সের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ ফ্রাঙ্কো-প্রুষীয় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ফরাসী সৈন্যদিগকে রোম হইতে উঠাইয়া নেওয়া হয়। এই সুযোগে গারিবল্ডি অনায়াসে রোমনগর অধিকার করিয়া লন। এই সনে তিনি অষ্ট্রীয়ার সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া ইটালীকে অষ্ট্রীয়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। স্বদেশপ্রেমিকের চিরপোষিত আশা এতদিনে সফলতা লাভ করিল। তিনি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া ইটালীর সম্রাট্ হইতে পারিতেন, কিন্তু এই অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিক নিজের পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি ভিক্টর-ই-মানুয়েলের হস্তে ইটালী সাম্রাজ্য ন্যস্ত করিয়া নিজে ক্যাপ্রেরা দ্বীপস্থিত গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ভিক্টর ই-মানুয়েল তাঁহাকে পেন্সন ও জায়গীর দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি সকলই প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৮৮২ খৃঃ ২রা জুন ক্যাপ্রেরা দ্বীপে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। গ্যারবল্ডি সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু শেষজীবনে ভিক্টর-ই-মানুয়েলের উপদেশে তিনি রাজ্যতন্ত্রবাদী হইয়াছিলেন। ভিক্টর-ই-মানুয়েলের গুণে তিনি স্বমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গারিবল্ডি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিকের আদর্শ ; তিনি জগতে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা সভ্যজগৎ চিরদিন অনুকরণ করিবে।

গার্ফিল্ড (জেমস এব্রাহাম)—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে এক ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। কতকগুলি দরিদ্র ধার্ম্মিক লোক তদানীন্তন রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে না

পারিয়া ১৬২০ খৃঃ আটলাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর আমেরিকায় উপস্থিত হন। সে সময় উত্তর আমেরিকা বনাকীর্ণ ছিল; এই সমুদয় লোক তথায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাস করিতে থাকেন এবং কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে এক দরিদ্র কৃষকের বংশে মহাত্মা গার্ফিল্ড জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর জেমস এব্রাহাম গার্ফিল্ডের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম এব্রাহাম, মাতা এলিজা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম টমাস। কৃষিকার্য্যজনিত দারুণ ক্লেশে পিতা এব্রাহাম অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এলিজা শিশুসন্তানগুলিকে লইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইলেন। ৪ বৎসর বয়সে জেম্‌স এক নিকটবর্ত্তী পাঠশালায় প্রেরিত হন। বালক জেম্‌স মাতার আদরে এবং শিক্ষকের যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। জেম্‌স ধর্ম্মপরায়ণা মাতার উপদেশেই মনুষ্যত্ব লাভ করেন। ১৭৫১ খৃঃ আগষ্ট মাসের শেষভাগে জেম্‌স হয়রম বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। এখানে তিনি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে তিনি বিদ্যালয়ে ঘড়ি বাজাইয়া ও গৃহ পরিষ্কার করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বালকের অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহাকে পড়িতে অনুমতি দিলেন এবং কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রায় দুই হাজার পুস্তক ছিল; অধ্যক্ষের উপদেশ অনুসারে তিনি পুস্তকগুলির অধিকাংশই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এক বৎসরে তাঁহার পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া স্কুলের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ইংরেজী. গ্রীক ও লাটিন ভাষায় সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি হয়রম স্কুল পরিত্যাগ করিয়া উইলিয়ম কলেজের প্রেসিডেণ্ট হপকিন্‌ সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। হপকিন সাহেবের অনুগ্রহে কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৮৫৬খৃঃ পারদর্শিতার সহিত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখান হইতে হয়রম বিদ্যালয়ে গমন করিয়া প্রাচীন ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ১৮৫৮ খৃঃ ১১ই নবেম্বর তিনি পূর্ব্বপরিচিত কুমারী রডফকে বিবাহ করেন। এখানে অধ্যাপনার সময় স্কুল বন্ধ হইলে অথবা রবিবার উপলক্ষে সস্ত্রীক দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এই সময়ে দাস ব্যবসায় লইয়া যুক্তরাজ্যে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গার্ফিল্ড নানাস্থানে দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। অনতিবিলম্বে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধবাদীদিগের সহিত ঐ ব্যবসায়ের পক্ষপাতীদিগের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৮৬১ খৃঃ গার্ফিল্ড এই যুদ্ধে ২০ সহস্র সৈন্য পরিচালনা করেন। এই বৎসরেই ওহিও প্রদেশবাসীরা তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে প্রেরণ করেন। এই সময়ে লিঙ্কলন্ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। সামরিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হইল। ১৮৮০খৃঃ কংগ্রেসের সভাপতিপদ শূন্য হইল, গার্ফিল্ড সকলের আনন্দধ্বনির সহিত ঐ পদে বৃত হইলেন; এই সম্মানিত পদে তিনি চারি মাস মাত্র কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ ২রা জুলাই তিনি যখন ওয়াসিংটনের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে যাইতেছিলেন, তখন একজন গুপ্ত ঘাতকের পিস্তলের গুলিতে আহত হইয়া ভূপতিত হন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মহাত্মা গার্ফিল্ড সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি ধার্ম্মিক, সরল, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও স্বদেশহিতৈষী ছিলেন।

গালিলিও—ইটালী দেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ইটালীর অন্তর্গত ফ্লরেন্সের নিকটবর্ত্তী পিহানগরে ১৫৬৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ২৫ বৎসর বয়সে পিহাকলেজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন; এখান হইতে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। তিনি প্রথমে ঘড়ির দোলকযন্ত্র আবিষ্কার করেন, তৎপর তাপমানযন্ত্র এবং ইহার পর দূরবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার করেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনব্যাপী অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তদানীন্তন লোকসমাজে জ্যোতিষসম্বন্ধে পৃথ্বীকৈন্দ্রিক মত প্রচলিত ছিল; লোকে মনে করিত বুধ, বৃহস্পতি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ সমুদয় পৃথিবীকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু গালিলিও দূরবীক্ষণযন্ত্র ও গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থলে

রাখিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং এই পরিভ্রমণকালে পৃথিবীও স্বীয় অক্ষদণ্ডোপরি ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন করে। ১৬৩২ খৃঃ তিনি টলেমি ও কোপারনিকাসের মত সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া টলেমির মত খণ্ডন করেন। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এই সৌরকৈন্দ্রিক মত প্রচার করাতে গালিলিও রোমের রাজদরবারে অভিযুক্ত হন। রাজদরবার হইতে তাঁহাকে নিজ মত প্রত্যাহার করিতে বলা হইল, কিন্তু ইহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাজার আদেশে তাঁহার গ্রন্থখানা দগ্ধ করা হয় এবং তিনি কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কারারুদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে প্রত্যহ নিম্নলিখিত কথাগুলি বলপূর্ব্বক শপথ করাইয়া বলান হইত—

(ক) আমি এই অভিনব মত প্রচার করিয়া অন্যায় করিয়াছি।

(খ) আমি ভবিষ্যতে এই মত প্রচার বা এতৎসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিব না।

এইরূপ শপথ করিবার পর তাঁহাকে কারামুক্ত করা হয়। কারামুক্ত হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় জ্যোতিষিক তত্ত্বালোচনায় ব্যয় করেন। অনবরত পরিশ্রম করাতে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অন্ধাবস্থায় অশেষ ক্লেশ পাইয়া তিনি ১৬৪২ খৃঃ ফ্লরেন্স নগরে নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখেন।

(১) কম্পাসের কার্য্য। (২) দোলক যন্ত্র। (৩) সূর্য্যবিম্বে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন। (৪) পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। (৫) টলেমি ও কোপারনিকাসের মত সমালোচন। (৬) চন্দ্রের দ্রুতগতি। (৭) যন্ত্র-বিজ্ঞান।

গোল্ডস্মিথ (অলিভার)—বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও গদ্য প্রবন্ধলেখক। ইনি আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লঙ্গফোর্ড কাউণ্টিতে ১৭২৮ খৃঃ নবেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৪৯ খৃঃ তিনি বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন ; জীবনের প্রথম ভাগে বাঁশী বাজাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। ১৭৫৫ খৃঃ তিনি স্বকীয় পরিধেয় বস্ত্র, তাঁহার প্রিয় বাঁশীটী ও একটী মাত্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ইয়োরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন। ১৭৫৬ খৃঃ তিনি রিক্তহস্তে ইয়োরোপ হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি একখানা গীতি কাব্য লিখেন, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এক শিলিং (বার আনা) মূল্যে এই গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। ১৭৫৭খৃঃ তিনি মান্থ্‌লি রিভিউ (Monthly Review) নামক একখানা মাসিক পত্রের সম্পাদন ভার প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে তিনি আহার ও বাসস্থান ব্যতীত কিছু বেতনও পাইতেন। এ কার্য্য তিনি ৫ মাস মাত্র করিয়াছিলেন। বহুদিন দুরবস্থায় কাটিয়া গেলে পর বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌সন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং অচিরেই ইঁহাদের উভয়ে গাঢ় বন্ধুতা জন্মে। ১৮৬১ খৃঃ তিনি ফ্লিট্‌ ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে বাস করিতেন ; এখানে জন্‌সন সাহেব মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সহিত ভোজন করিতেন। একদিন তাঁহার বাড়ীওয়ালা ভাড়ার টাকার জন্য আদালতে নালিশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। গোল্ডস্মিথ জন্‌সন সাহেবের নিকট এই অবস্থা লিখিয়া একজন লোক প্রেরণ করেন। জন্‌সন লোকটীর সঙ্গে এক গিনি পাঠাইয়া দেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমস্ত দেনা পরিশোধ এবং তাঁহাকে মুক্ত করেন। ১৭৬৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি "ট্র্যাভেলার" (The Traveller) নামে একখানি কাব্য লিখেন ; ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি "ভিকার অব ওয়েক্‌ফিল্ড" (The Vicar of Wakefield) নামে একখানি উপাদেয় গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন ; তাঁহার হাতে অর্থ থাকিত না। এই দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যে অর্থ পাইলেন তাহা ব্যয় হইতে অধিক দিন লাগিল না। আবার তিনি অর্থাভাবে পড়িলেন। এখন তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন ; তাঁহার Good-natured Man নামক উৎকৃষ্ট নাটক বাহির হইল ; এই নাটক লিখিয়া তিনি প্রভূত যশঃ উপার্জ্জন করেন। ইহার পর তিনি রোমের ইতিহাস লিখেন। ১৭৭০ খৃঃ তিনি Royal Academy নামক বিদ্যালয়ে প্রাচীন

ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তাঁহার বিখ্যাত কাব্য Deserted Village প্রকাশিত হয়। এই কাব্য জনসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃঃ ৪৬ বর্ষ বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় অকালে তিনি পরলোক গমন করেন।

গ্লাড্‌ষ্টোন্ (উইলিয়ম ইওয়ার্ট)—এই মহাপুরুষ ১৮০৯ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর লাঙ্কাসায়রের অন্তর্গত লিভরপুল নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার তিন জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ টমাস 'ব্যারনেট' উপাধি পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা ইংলণ্ডের রাজকীয় যুদ্ধজাহাজে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু তিনি ১৮৬৩ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তৃতীয় ভ্রাতা রবার্টসন্ একজন বড় সওদাগর ছিলেন এবং তিনি এক সময়ে লিভরপুলের মেয়রের পদ পাইয়াছিলেন; ১৮৭৫ খৃঃ এই ভ্রাতার মৃত্যু হয়। উইলিয়ম ইওয়ার্ট উপরিউক্ত তিন জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বাল্যবয়সে লিভরপুলের সমীপবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এখানে উপযুক্তরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া ১২শ বর্ষ বয়সে প্রসিদ্ধ ইটন কলেজে ভর্ত্তি হন। গ্লাডষ্টোন ১৮২৭ খৃঃ ইটনের শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং তৎপর ডাক্তার টার্ণার নামক এক ব্যক্তির প্রাইভেট ছাত্ররূপে দুই বৎসর শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই ডাক্তার টার্ণার পরে কলিকাতার বিশপের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর গ্লাডষ্টোন ২০শ বর্ষ বয়সের সময় অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্টচার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন। এই কলেজ হইতে ২২শ বর্ষ বয়সের সময় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় লন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া তিনি ইটালী ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়ে পার্লেমেণ্টে নিওয়ার্কের প্রতিনিধির পদ শূন্য হওয়াতে গ্লাড্‌ষ্টোনের উক্ত মহাসভায় প্রবেশের পথ পরিষ্কার হয়। ডিউক অব নিউকেস্‌ল (Duke of Newcastle) একজন বড় জমিদার; তিনি এই সময় পার্লেমেণ্টের লর্ড সভার (House of Lords) একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ও ক্ষমতাশালী রক্ষণশীল সভ্য ছিলেন। কমন্স সভায় (House of Commons) উদার-নৈতিক দলের সহিত যুক্তিতর্কে ও বাগ্মিতায় সমকক্ষতা করিতে পারে, তিনি এরূপ একজন লোকের অনুসন্ধানে ছিলেন। উক্ত ডিউকের পুত্রের সহিত গ্লাড্‌ষ্টোন এক সঙ্গে অক্স্‌ফোর্ডে (Oxford) অধ্যয়ন করিতেন; তিনি তদবস্থায় গ্লাড্‌ষ্টোনের বাগ্মিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। পুত্রের অনুরোধে ডিউক অব নিউকেস্‌ল ইটালী হইতে গ্লাড্‌ষ্টোনকে আনয়ন করেন এবং তাঁহার সাহায্যে গ্লাড্‌ষ্টোন নিওয়ার্কের (Newark) রক্ষণশীলগণের (Conservatives) প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। নিওয়ার্কে হেণ্ডলি ও ওয়াইল্ড নামে তাঁহার দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তি হইতে ৯৯ এবং শেষোক্ত হইতে ১৬৩ ভোট (Vote) বেশী পাইয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচনের সময় তিনি দাসব্যবসায়ের প্রতিকূলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৩ খৃঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্টে (Parliament) প্রথম বক্তৃতা করেন। নবীন যুবক রাজনীতি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৩৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে লর্ড মেলবোর্ণের (Lord Melbourne) মন্ত্রিত্বের অবসান হওয়াতে সার রবার্ট পিল (Sir Robert Peel) নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। নবনির্ব্বাচনে গ্লাড্‌ষ্টোন অতি সহজেই পুনর্ব্বার নিওয়ার্কের (Newark) প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। এবার তিনি মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেন এবং এই সভার মেম্বর হইয়া তিনি উপনিবেশসমূহের সহকারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি রাজস্ব সচিব, ভারতের সেক্রেটরী প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ বহু কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তিনি প্রথমতঃ সংস্কারের বিরোধী রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন; কিন্তু পরে সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া উন্নতিশীলগণের (Liberals) নেতা হইয়া উঠেন। ১৮৩৮ খৃঃ তিনি "ষ্টেটের সহিত চার্চ্চের সম্বন্ধ" নামক একখানা পুস্তক লিখেন; এই গ্রন্থ ইংলণ্ডে জনসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তিনি ৬০ বৎসরেরও অধিক কাল ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি বহুবার

উদার-নৈতিক দলের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশপূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইংরেজ-রাজ্যের নৈতিকগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজমান ছিলেন। ১৮৫২ খৃঃ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে ডিজরেলি (Disraeli, Earl of Beaconsfield) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। গ্লাড্‌ষ্টোনের বক্তৃতার প্রকৃত উত্তর তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মধ্যে কেবল ডিজরেলিই দিতে পারিতেন। লর্ড বিকন্সফিল্ড সংবাদ-পত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য যে আইন করেন, গ্লাড্‌ষ্টোন মন্ত্রী হইয়া তাহা রহিত করেন। তিনি জীবনের শেষভাগে আয়র্লণ্ডের হোমরুল বিল (Home Rule Bill) বা আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ করিতে পার্লেমেণ্টে তুমুল আন্দোলন করেন, কিন্তু লর্ড সভার প্রতিকূলতায় তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি ১৮৮৫ খৃঃ হোমরুল বিল কমন্স সভায় পাশ করাইয়া লন, কিন্তু লর্ড সভায় গৃহীত না হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়। ইহাতে রুষ্ট হইয়া গ্লাড্‌ষ্টোন লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাস করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি বার্দ্ধক্যহেতু ১৮৯৪ খৃঃ লর্ড রোজবেরীর হস্তে মন্ত্রিত্ব অর্পণ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রহইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খৃঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি পার্লেমেণ্টে প্রথম বক্তৃতা দেন এবং ১৮৯৪ খৃঃ ১লা মার্চ্চ উক্ত সভায় শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্লাড্‌ষ্টোন গ্রীক, লাটিন, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৫০ খৃঃ তিনি একটি পীড়িত পুত্রকে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ ইটালীর অন্তর্গত নেপল্‌স্ (Naples) নগরে গমন করেন। এখানে তিনি দেখিলেন যে, বহু স্বদেশহিতৈষী সাধু ব্যক্তি, দেশের মঙ্গলের জন্য আন্দোলন করাতে নেপল্‌সের রাজার আদেশে কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া গ্লাড্‌ষ্টোন নানাদেশের পত্রিকায় ঘোর আন্দোলন করেন এবং এই আন্দোলনের ফলে নেপল্‌সের কারাগার সংক্রান্ত আইন সংশোধিত হয়। গ্লাড্‌ষ্টোন ১৮৯৮ খৃঃ পরলোক গমন করেন ; তাঁহার শবদেহ গন্ধদ্রব্যে রক্ষিত করিয়া রাজসম্মানের সহিত ৭ দিন পর্য্যন্ত ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে (Westminister Hall) জনসাধারণের দর্শনার্থ সংস্থাপিত হইয়াছিল। এরূপ সম্মান কদাচিৎ কোন কোন খ্যাতনামা লোকের প্রতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

গ্লাড্‌ষ্টোন ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ, সরল, সাধু লোক ছিলেন। প্রত্যহ তিনি একান্তমনে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। তাঁহার এবং জন ব্রাইটের নির্ম্মল চরিত্র ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে এক পবিত্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিল। তিনি সাহসে, সভ্যতায়, পাণ্ডিত্যে, বাগ্মিতায় এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসে সমলঙ্কৃত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ মহাপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছিলেন।

জ

জন্‌সন্ (ডাক্তার, স্যামুয়েল)—এই বিখ্যাত গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদক ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের দীর্ঘশাসন কালের প্রথম চব্বিশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। ডাক্তার জন্‌সন শিক্ষাসময়ে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কিরূপে যে তিনি অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পেম্ব্রোক কলেজে অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সকলের নিকট বিস্ময়কর হইয়াছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া কোন কোন স্থানে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ কাজ তাঁহার ভাল না লাগাতে, তিনি এই বিভাগ ত্যাগ করিয়া গ্রন্থরচনাদ্বারা জীবিকার্জ্জন করা স্থির করিলেন। তিনি প্রথমতঃ "জেণ্টল্‌ম্যানস্ ম্যাগাজিন" (Gentleman's Magazine) নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু কিছু উপায় করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি নিজেই "স্পেক্টেটর" (Spectator) নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। এই বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া জন্‌সন ইয়োরোপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও আশার মুখ দেখিতেছিলেন, কখনও বা নৈরাশ্যের অতল জলধিতে ডুবিতেছিলেন।

"দি ভ্যানিটি অব হিউম্যান উইসেজ্" (The Vanity of Human Wishes) নামে একখানি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া তিনি দেড়শত পাউণ্ড (২২৫০ টাকা) প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খৃঃ তিনি "আইরিন" (Irene) নামে একখানি দুঃখান্তক নাটক লিখেন। নাটকখানি জনসাধারণের নিকট প্রশংসা পায় নাই, তথাপি উহার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া তিনি তিনশত পাউণ্ড (৪৫০০৲ টাকা) পাইয়াছিলেন। তৎপর তিনি আট বৎসর পরিশ্রম করিয়া একখানি অভিধান লিখেন। এই অভিধানখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম্, এ, উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, এল, (D. L.) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৬৬ খৃ তিনি জগদ্বিখ্যাত মহাকবি সেক্স্পিয়রের জীবনীসহ তদীয় নাটকগুলির সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া জগতের অশেষ হিতসাধন করেন। ১৭৮৪ খৃঃ সাহিত্যক্ষেত্রের এই বিখ্যাত মহাপুরুষ ৭৫ বর্ষ বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। ডাক্তার জন্সনের কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই।

জরথস্ত্র (স্পিতামা)--এই মহাপুরুষ ১৮০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ ইঁহার আবির্ভাব কাল ১০০০ পূঃ খৃঃ বলিয়া থাকেন। জরথস্ত্র প্রথমে "আভেস্তা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পারসিকেরা ইহার মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে তিনি "জেন্দ" নামক আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম খানি "আভেস্তা" ভাষায় এবং দ্বিতীয় খানি "জেন্দ" ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় সমগ্র পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম "জেন্দাভেস্তা" হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমকেরা এবং প্রাচীন পারসিক গ্রন্থকারেরা বলেন যে, সমস্ত পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্র স্পিতামা জরথস্ত্রকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। জরথস্ত্র বলেন, পরমেশ্বরের দুইটী শক্তি হইতেই জগতে যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে—একটী রক্ষণশক্তি, অপরটী বিনাশ-শক্তি। তাঁহার কথার অর্থ না বুঝিয়া তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ দুইটী ঈশ্বর কল্পনা করিয়াছেন—একের নাম "অহুরা মাজদা" (জ্ঞানী ঈশ্বর) এবং অপরের নাম "অহ্রিমাণ"। তাহাদের মতে অহুরা মাজদা হইতে মঙ্গলের এবং অহ্রিমাণ হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জরথস্ত্রের প্রতি পারসিকদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আহুরগণ কোনও মূর্ত্তি গঠন করিয়া সেই মূর্ত্তির পূজা করিতেন না, তাঁহাদের পূজামন্দিরও ছিল না। তাঁহারা জানিতেন মনুষ্যের উপাস্য দেবতা মনুষ্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নহেন। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, জল প্রভৃতি যে সমুদয় বস্তুতে ঐশী শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়, তাঁহারা সেই সকল বস্তুকে নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিতেন। কালক্রমে অগ্নি পূজা তাঁহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

জার্কসিস্ (প্রথম)—পারস্যের অধিপতি। ইনি বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পারস্যাধিপতি প্রথম ডেরায়সের (ডেরায়স্ হিষ্টাস্পেস) পুত্র। পিতা ডেরায়স্ গ্রীসজয়ের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই সৈন্য মেরাথন ক্ষেত্রে ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে গ্রীসীয়দের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় গ্রীস আক্রমণের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, আর গ্রীস জয় করা হইল না। জার্কসিস্ পিতার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি বিশ লক্ষ সৈন্য ও এক সহস্র রণতরী লইয়া গ্রীস আক্রমণে চলিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ গ্রীসের সমবেত সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল। দক্ষিণ গ্রীসের (বর্ত্তমান মোরিয়া উপদ্বীপের) অন্তর্গত স্পার্টানগরীর রাজা লিওনিডাস্ উত্তর গ্রীসের থার্ম্মোপলি নামক গিরিসঙ্কটে তিন সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া এই প্রবল পারস্যচমূর সম্মুখীন হইলেন (৪৮০ পূঃ খৃঃ) (লিওনিডাস্ দেখ)। পারস্য সৈন্য উক্ত সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়া আর গ্রীসে প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক এক গুপ্ত পথ প্রদর্শন করাতে বহুসংখ্যক পারস্য সৈন্য থার্ম্মোপলির দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। লিওনিডাস্ উভয়দিকে

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনশত সৈন্য ব্যতীত অপর সৈন্যগণকে দেশ রক্ষার্থ ফেরত পাঠাইয়া দিলেন, কেবল তিনশত মাত্র সৈন্য নিজের নিকট রাখিলেন। লিওনিডাস্ উভয় দিকে আক্রান্ত হইলেন; তিনি ৩০০ শত সৈন্যসহ সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পারস্যসৈন্যসাগরে ঝাঁপ দিলেন এবং যত পারিলেন শত্রু সংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। এই স্থানে লিওনিডাসের স্মরণার্থ এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতঃপর পারস্য সৈন্যে উত্তর গ্রীস ঢাকিয়া ফেলিল। এদিকে ১০০০ রণতরী এথেন্সের দক্ষিণ দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। থেমিষ্টক্লিশ নামক গ্রীসীয় সেনাপতির বুদ্ধি-কৌশলে অল্পসংখ্যক গ্রীসীয় নৌ-সৈন্য, ১০০০ পারস্য রণতরীর সম্মুখীন হইল। সেলামিস্ দ্বীপের সমীপে উভয় পক্ষীয় রণতরীর তুমুল যুদ্ধ হইল। ৩৬৬ খানা গ্রীসীয় রণতরীর নিকট ১০০০ পারস্য রণতরী পরাভূত ও বিধ্বস্ত হইল। নৌ-যুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্কসিস্ সভয়ে গ্রীস পরিত্যাগ করিলেন; যাইবার সময় মার্ডিনিয়াসের অধ্যক্ষতায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য রাখিয়া গেলেন। পরবর্ত্তী বৎসর ৪৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে মার্ডিনিয়স প্লেটিয়া নামক যুদ্ধ ক্ষেত্রে গ্রীসীয় সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। জার্কসিসের গ্রীসজয়ের আশা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইল। ৪৬৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে জার্কসিস্ স্বীয় শরীররক্ষক সৈন্যের নায়ক আর্টাবেনন্ কর্ত্তৃক হত হন।

জোন্স (সার, উইলিয়ম) – কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি। ইনি সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি ইংরেজী ভাষায় মনুসংহিতার অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত শকুন্তলা ও হিতোপদেশ ভাষান্তরিত করেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে লণ্ডন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা গণিতবিদ্ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রাচ্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নাদির শাহের জীবনী পারস্যভাষা হইতে ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পারস্য দেশীয় বিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ কবি হাফেজের কয়েকটী কবিতা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লেমেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা করেন; কিন্তু বিফলমনোরথ হন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং অল্পদিন পরেই "নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার অল্পকাল পরে তিনি এক পাদ্রীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার যত্নে এশিয়ার পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পাদির আলোচনার জন্য কলিকাতায় এক সভা স্থাপিত হয়। এই সভা পরে "এশিয়াটিক সোসায়িটি" (Asiatic Society) নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সভার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সার উইলিয়ম জোন্সের নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি গবর্ণমেণ্টের আদেশে হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের সার সঙ্কলন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তিনি কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। নানাভাষাভিজ্ঞ বলিয়াই কেবল তাঁহার সুখ্যাতি ছিল এমন নহে, তিনি একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ বিচারপতি বলিয়াও এদেশে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

ট

টমাস অর্ণল্ড ডি, ডি, (Thomas Arnold, D. D.)—বিলাতের বিখ্যাত শিক্ষাসংস্কারক। ইনি বিলাতে রাগবি (Rugby) নামক স্থানের একটী বড় স্কুলে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন এবং ৫৪ বৎসর কাল এই পদে আসীন থাকিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে দেহত্যাগ করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে ১৪ বৎসর প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া যে যশ অর্জ্জন করেন তাহাতে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী ইংলণ্ডের শিক্ষা কার্য্যে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তিনি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন; ছাত্রগণ যাহাতে

সত্য কথা বলে এবং মিথ্যা কথা, পরনিন্দা প্রভৃতির উপর যাহাতে সহজে তাহাদের ঘৃণাসঞ্চার হয়, তদ্বিষয়ে তিনি ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। আর্ণল্ড ১৭৯৫ খৃঃ ১৩ই জুন ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তস্থ "আইল অব ওয়াইট" (Isle of Wight) নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপে ওয়েষ্টকাউজ (West Cowes) নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা এই গ্রামের শুল্ক আদায় করিতেন। তিনি বাল্যকালেই পিতৃহীন হন এবং মাতার নিকট গৃহশিক্ষা লাভ করেন। ১৮০৩ খৃঃ হইতে ১৮০৭ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি উইল্টসায়রে (Wiltshire) অবস্থিত ওয়ারমিন্‌ষ্টার (Warminster) স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এখান হইতে উন্‌চেষ্টারে গমন করিয়া তথায় এক বিদ্যালয়ে ১৮১১ খৃঃ পর্য্যন্ত ৪ বৎসর শিক্ষালাভ করেন। এই বর্ষে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কর্পাস ক্রিষ্টি কলেজে (Corpus Christy College) প্রবেশ করেন। ১৮১৫ খৃঃ তিনি ওরিয়েল (Oriel) কলেজের ফেলো হন। এখন হইতে তিনি গ্রীকভাষার সাহিত্য ও ইতিহাস এবং খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। এই সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার সমসাময়িক হোয়েইলি, কপ্‌লষ্টন প্রভৃতি পণ্ডিত লোকদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি একজন গোড়া খৃষ্টান হইয়া উঠেন। যিশু খৃষ্টের উপদেশ তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মযাজকদের উচ্চউপাধি (D. D.) লাভ করেন। রাগ্‌বিতে যখন তিনি হেড্ মাষ্টার ছিলেন, তখন একদিন বহুছাত্রকে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে স্কুল হইতে বহির্গত করিয়া দেন। তিনি বলিতেন "আমি ৩০০। ৪০০ ছাত্র চাই না, আমি প্রকৃত খৃষ্টান ছাত্র চাই।"

টমাস রো (সার)—বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ। ইনি ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত এসেকস্ সায়রে (Essex Shire) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি চতুর ও মধুরভাষী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কঠোর শাসনে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল, তখন উক্ত কোম্পানি টমাস্ রোকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। কোম্পানির দূতকে মোগল সম্রাট্ গ্রাহ্য নাও করিতে পারেন, এজন্য কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডের রাজা জেমস্‌কে এ বিষয়ে সম্মত করাইলেন। রাজা জেমসের দূত হইয়া টমাস রো সম্রাটের নিকট উপঢৌকন প্রদানার্থ বহু বিলাতি জিনিষ পত্র গ্রহণপূর্ব্বক ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে উপস্থিত হন এবং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তিনি সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সম্রাট্ দরবারের মণিমাণিক্যশোভিত মনোহর সাজসজ্জা ও জাঁকজমক দেখিয়া টমাস রো স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সম্রাট্ দর্শনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। সম্রাট্ ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন এবং তাঁহাদিগের উপর যাহাতে উৎপীড়ন না হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বত্র আদেশ প্রচার করেন। কোম্পানির অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে টমাস রো বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রচুর সম্মান প্রাপ্ত হন এবং অবশিষ্ট জীবন সম্মানের সহিত অতিবাহিত করেন।

টলষ্টই (লিও)—কাউণ্ট টলষ্টই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রুষিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে এই মহাত্মা ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ে রুষিয়ার একজন প্রধান লোক ছিলেন। তিনি রুষিয়ার ধর্ম্ম সংস্কারক, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতি সংস্কারক। ইংলণ্ডে গ্লাডষ্টোনের উপর জনসাধারণের যেরূপ শ্রদ্ধা ছিল, রুষিয়াতে ইনিও সেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ রুষিয়ার ডিউমার (প্রজা-প্রতিনিধি সভার) কার্য্য বন্ধ ছিল। সমস্ত রুষিয়া তাঁহার মৃত্যুতে শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। ইনি বড় জমিদার ছিলেন; তিনি স্বীয় বিস্তৃত জমিদারী প্রজাসাধারণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রবল দুর্ব্বলের উপর, ধনী দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিবে, এদৃশ্য তিনি দেখিতে পারিতেন না। প্রজার উপর রুষিয়া সম্রাটের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা। সম্রাটের বিরুদ্ধে একটু কথা বলিলেই প্রজার কঠোর শাস্তি হইত, এমন কি, সাইবেরিয়ার জঙ্গলে তাহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইত। এই মহাত্মার আন্দোলনে এখন এ সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাঁহার চেষ্টায় প্রজাসাধারণ প্রবল হইয়া, তাহাদের প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্যশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে সম্রাটকে বাধ্য করিয়াছে। সম্রাট প্রজাপ্রতিনিধি সভা (ডিউমা) স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন সম্পাদনে বহু প্রজার রক্তপাত হইয়াছে, বহু রাজকর্ম্মচারী হত হইয়াছেন। রুষিয়া ব্যতীত ইয়োরোপের অন্যান্য খৃষ্টানরাজ্যে প্রজাপ্রতিনিধি দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; টলষ্টই এর চেষ্টায় রুষিয়াতেও এখন প্রজাদের ডিউমা বা পার্লেমেন্ট স্থাপিত হইয়াছে। টলষ্টই বলেন, আমরা সকলেই এক পিতা পরমেশ্বরের সন্তান। ধর্ম্মেই বল, সমাজ সম্বন্ধেই বল অথবা রাজনৈতিক অধিকারেই বল, সর্ব্বত্রই একজন জমিদারের যে অধিকার, একজন সামান্য কৃষকেরও সেই অধিকার। তিনি কৃষিজীবিগণের উন্নতির জন্য নিজের অর্থে সামর্থ্যে যাহা পারিয়াছেন, করিয়াছেন। দেশ বিদেশে তাঁহার রচিত গ্রন্থের সমান আদর।

টলেমি—(১) বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীসীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। ইঁহার জন্মস্থান মিশর দেশ; ১৩৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বহু ভৌগোলিক, জ্যোতিষিক ও গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার জ্যোতিষিক মত সমস্ত সভ্যজগতে সমাদৃত হইয়াছিল। তাঁহার পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের (Universe) কেন্দ্র স্থানে বর্ত্তমান; সূর্য্য ও অপর গ্রহাদি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইয়োরোপের কোপারনিকাস এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। (কোপারনিকাস দেখ)।

(২) বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডারের সেনাপতি। আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য তদীয় সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হয়; আফ্রিকার অন্তর্গত মিশরদেশ টলেমির ভাগে পড়ে। ইনি প্রথম টলেমি নামে খ্যাত। ইনি ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২৮৫ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত মিশরে রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে আলেকজেণ্ড্রিয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ইউক্লিড (Euclid) ইঁহার রাজত্বসময়ে মিশরে প্রাদুর্ভূত হন। একদিন রাজা টলেমি ইউক্লিডকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, অন্য কোন সহজ উপায়ে জ্যামিতি শিক্ষা করা যায় কি না। তদুত্তরে ইউক্লিড বলিয়াছিলেন "জ্যামিতি শাস্ত্রের নিকট উপস্থিত হইতে কোন রাজপথ পাই।"

টেলিমেকস—ইথেকার রাজা ইউলিসিসের পুত্র। (ইউলিসিস দেখ)।

ড

ডারুয়িন—(Charles Darwin M. A., F. R. S,) এই বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ও দার্শনিক পণ্ডিত ইংলণ্ডের অন্তর্গত শ্রুজবারি নামক স্থানে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতার নাম রবার্ট উইলিয়ম ডারুয়িন (Dr. Robert W. Darwin F. R. S.) এবং পিতামহ ইরেসমাস্ ডারুয়িন (Erasmus Darwin)। তাঁহার মাতা এক প্রসিদ্ধ কুম্ভকারের কন্যা ছিলেন। তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে রাজকীয় জাহাজে বহির্গত হন এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দীর্ঘকাল সমুদ্রভ্রমণে তিনি নানাদেশের জীবজন্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তিনি জীবোদ্ভিদের উৎপত্তি ও রক্ষণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। তাঁহার মত চিরন্তন সংস্কারের বিরোধী এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তৎপ্রণীত (১) "মানবের বিবর্ত্ত ও যৌন নির্ব্বাচন" (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex), (২) "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা জাতির উৎপত্তি বা জীবন সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভাবে অধিকতর যোগ্য জাতির রক্ষণ" (On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle of Life) এবং (৩) "মানব

সাহচর্য্যে উদ্ভিদ্ ও ইতর জন্তুর পরিবর্ত্তন" (The Variation of Animals and Plant under Domestication), এই তিনখানি গ্রন্থ সভ্যজগতে এক নূতন দার্শনিক চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে।

উপরি উক্ত তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও প্রণয়ন করেন।

(১) "একজন জীবতত্ত্ববিদের জলপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ" (A Naturalist's Voyage round the World)

(২) "কীটভুক্ উদ্ভিদ্" (Insectivorous Plants)

(৩) "কীটের কার্য্য প্রভাবে উদ্ভিদের আকৃতি গঠন।" (Formation of Vegetable mould through the action of Worms)

(৪) "উদ্ভিদের গমন শক্তি।" (Power of movement in Plants)

(৫) "প্রবাল শৈলের গঠন ও বিভিন্নস্থানে অবস্থিতি।" (On the Structure and Distribution of Coral Reefs)

(৬) "আগ্নেয়পর্ব্বতবিশিষ্ট দ্বীপ সম্বন্ধে ভৌতত্ত্বিক পর্য্যালোচনা। (Geological observations on Volcanic Islands.)

(৭) "এক জাতীয় বৃক্ষে বিভিন্ন প্রকারের ফুল" (Different forms of flowers on plants of the same species.)

(৮) "দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে ভৌতত্ত্বিক পর্য্যালোচনা।" (Geological observations on South America.)

ডারুয়িন বলেন যে, বানর বা তৎসদৃশ কোন জীব হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। মানবের উৎপত্তিবাদ তাঁহার মতের একাংশমাত্র। তিনি বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদ্ ও জীবই কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে যে জীবোদ্ভিদ্ কেবল গুণান্তর প্রাপ্ত হয় এমত নহে, ইহাতে উহাদের প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে। তিনি বলেন যে, প্রথমে পৃথিবীতে কয়েকটি জাতি হইতে অসংখ্যজাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি এমন আভাসও দিয়াছেন যে, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র জাতি বিদ্যমান ছিল, পরে সেই জাতি হইতে বর্ত্তমান সময়ের সমুদয় জাতি ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ডারুয়িন স্বমত সমর্থনার্থ দেখাইয়াছেন যে, ভূপঞ্জরের নিম্নতর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক উদ্ভিদের ও জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়; কিন্তু যত উর্দ্ধে উঠা যায় ততই অধিকসংখ্যক জাতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভূপঞ্জরের নিম্নস্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন যুগে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অতি প্রাচীনকালে অল্পসংখ্যক জাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। ডারুয়িন দেখাইয়াছেন যে, অল্প কয়েক পুরুষের মধ্যেই গৃহপালিত মেষ, কুকুর, পারাবত প্রভৃতি যত্ন ও শিক্ষার গুণে অনেকাংশে পৃথক্ আকার ও গুণ প্রাপ্ত হয়। তিনি বলেন যে, কোন জীবের বা উদ্ভিদের যে অংশটি বা যে গুণটি তাহার নিজের পক্ষে হিতকর, প্রাকৃতিক শক্তিতে সেই অংশ ও সেই গুণ রক্ষিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই সংসারের অস্তিত্বের জন্য নিরন্তর প্রাণী ও উদ্ভিদ্জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। প্রবল ও গুণসম্পন্ন জীব বা উদ্ভিদ্‌টি দুর্ব্বলকে পরাভূত করিয়া স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে এবং দুর্ব্বল ও নির্গুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম হইয়া ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। একটা স্থানে নানা জাতীয় বীজ বপন করিলে দেখা যাইবে, কতকগুলি বীজ বিনষ্ট হইয়াছে, কতকগুলি হইতে কৃশ ও নিস্তেজ চারা বাহির হইয়াছে এবং অপর কতকগুলি হইতে সবল ও হৃষ্টপুষ্ট চারা উদ্ভূত হইয়াছে। এই "অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর জাতির রক্ষণ" (The Survival of the fittest) নিয়মটি সংসারের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভাবে সর্ব্বদা

জীবের ও উদ্ভিদের ক্ষয় হইতেছে। এইরূপ ক্ষয় না হইলে কালসহকারে পৃথিবীতে জীবোদ্ভিদের থাকিবার স্থানের অভাব হইত। যেমন ক্ষয় ও হ্রাস, তেমনই উৎপত্তি ও স্থিতি প্রকৃতির নিয়মানুসারে হইতেছে। যাহা সারযুক্ত তাহা রক্ষিত হইতেছে, যাহা দুর্ব্বল তাহা বিনষ্ট হইতেছে। প্রকৃতির এই ক্রিয়াকে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" বলে। নিকটবর্ত্তী জাতিদ্বয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত প্রবল, দূরবর্ত্তী জাতিদ্বয়ের মধ্যে তত প্রবল নহে; এজন্য জলজন্তু ও স্থলজন্তুতে যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয় জলজন্তুর মধ্যে তদপেক্ষা অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান। বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব আপনা হইতে উৎকৃষ্টতর জাতি উৎপাদন করিয়া ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া—হয় একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে, নয় হীনভাবে অবস্থান করিতেছে। ডারুয়িন দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্য ও ইতর জাতির গর্ভাশয়ে শোণিত শুক্র প্রথমে একই অবস্থায় থাকে; কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, বানর প্রভৃতির প্রাথমিক ভ্রূণগুলির মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। পরে যতই ভ্রূণগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহাদের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইতে থাকে। মনুষ্য ও বানরের ভ্রূণে কেবল বৃদ্ধির চরম কালেই প্রভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা হইতে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বানরের সহিত নরের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ। সত্য বটে বানর ও নরে অনেক প্রভেদ কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে, বুশম্যান নামক অসভ্য জাতি হইতে যদি ইংরেজের ন্যায় সুসভ্য জাতির উদয় হইতে পারে, তবে সিম্পাঞ্জিনামক সুবুদ্ধি বানর জাতি হইতে বুশম্যানের উদ্ভব কি সম্ভবপর নহে?

ডালহৌসি (লর্ড)—ইঁহার প্রকৃত নাম জেমস্ এণ্ড্রু ব্রাউন রামজে (James Andrew Brown Ramsay)। ইনি ডালহৌসি নামক স্থানের ১০ম আর্ল (Earl) ও প্রথম মার্কুইস (Marquis)। ইনি সাধারণের নিকট লর্ড ডালহৌসিনামে পরিচিত। ইনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এম, এ, উপাধি লাভ করেন। দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইয়া ইনি লর্ড রামজে নামে খ্যাত হন। ইনি ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় কিছুকাল কাজ করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্যশাসন কালের প্রধান ঘটনা পঞ্জাব অধিকার। এজন্য একখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত এবং উহা মহারাজ রণজিৎসিংহের পুত্র মহারাজ দলীপসিংহদ্বারা স্বাক্ষরিত করাইয়া লওয়া হইল। সন্ধির সর্ত্তগুলি এই:—

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের স্বত্ব চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

(২) রাজসম্পত্তি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইল।

(৩) কোহিনুর ইংলণ্ডের রাণীর মস্তক শোভিত করিবে।

(৪) দলীপসিংহ বড় লাটের নির্দ্ধারণানুসারে কোন স্থানে বাস করিবেন।

(৫) "মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর" এই আখ্যা তাঁহার যাবজ্জীবন থাকিবে; এবং তিনি ৪ লক্ষের অন্যূন ও ৫ লক্ষের অনধিক টাকা বার্ষিক ভাতা পাইবেন।

ইহার পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত যুদ্ধ হয়; এই সনের ২০শে ডিসেম্বর ড্যালহৌসি পেগু অধিকার করেন। অতঃপর ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল, কিন্তু পেগু ইংরেজদিগের অধিকারেই রহিয়া গেল। ইহার পর ক্রমে সেতারা, ঝান্সি ও অযোধ্যা ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত করা হইল।

এইরূপে ভারতশাসন করিয়া লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ্চ ৪৪ বৎসর বয়সে অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য-পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন। তিনি বহুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ডিসেম্বর দেহত্যাগ করেন।

ডিগবি (উইলিয়ম, সি আই ই)—এই ভারতহিতৈষী মহাত্মা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কিছুকাল বিলাতের নানা সংবাদ পত্র আফিসে কাজ করিয়া, তৎপর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "সিলোন অবজারভার" (Ceylon Observer) পত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া সিংহলদ্বীপে আগমন করেন। ইনি আয়র্লণ্ডে "হোমরুল" (Home Rule) শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সিংহলে অবস্থান করিয়া বিলাতের "ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" (Fortnightly Review) নামক পত্রিকায় এতৎসম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। তিনি মাদক দ্রব্য সেবনের বিরোধী ছিলেন এবং মাদক নিবারণী সভার (Indian Temperance Society) এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "মান্দ্রাজ টাইমস্" (Madras Times) নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক হইয়া মান্দ্রাজে আগমন করেন। এই সময়ে ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ডিগবি সাহেবের যত্নে এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থ এক কোটি বিশলক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় এবং এই টাকা বিতরণের জন্য তাঁহার উপর ভার প্রদত্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পত্নীবিয়োগহেতু ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি মান্দ্রাজে পশুক্লেশনিবারণী সভা স্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষসম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখেন। তন্মধ্যে "Prosperous British India" নামধেয় পুস্তকখানাই বিশেষ প্রসিদ্ধ ; এই পুস্তকখানা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি এক জন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ৫৫ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডিজরেলি (বেঞ্জামিন) (Benjamin Disraeli, Lord of Beaconsfield)—এই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ লর্ড বিকন্সফিল্ড নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। ইনি জাতিতে য়িহুদি। ১৪৯২ খৃঃ স্পেন দেশবাসিগণ য়িহুদিদিগের উপর অসীম অত্যাচার করিয়াছিল। এই অত্যাচারে বহু য়িহুদি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, অনেকে ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা জীবনত্যাগ শ্লাঘ্য মনে করিয়া আত্মহত্যা করেন ; অপর কতকগুলি লোক স্পেন ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে চলিয়া যান। বিকন্সফিল্ডের পূর্ব্বপুরুষগণ স্পেন ত্যাগ করিয়া ইটালির অন্তর্গত ভেনিস্ নগরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে এই বণিক পরিবার ডিঃ ইজরেইলি (D'Israele) নামে খ্যাত হইলেন। প্রায় ২০০ শত বৎসর এই পরিবার ভেনিসে থাকিয়া বাণিজ্য করেন। ১৭২৩ খৃঃ অব্দে য়িহুদিগণ ইংলণ্ডে বাস করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইল ও উপযুক্ত মূল্যে তাহাদিগের নিকট জমি বিক্রীত হইতে লাগিল। ভেনিসের ডিঃ ইজরেইলি বংশীয় বেঞ্জামিন নামে এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে বাণিজ্য করিতে আসেন। এই যুবকের বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। বেঞ্জামিন অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। ইনি ৩৫ বর্ষ বয়সে বিবাহ করেন ; এবং এই বিবাহফলে আইজেক ডিঃ ইজরেইলি জন্মগ্রহণ করেন। আইজেকের বয়স যখন ৫০ বৎসর তখন তাঁহার পিতা বেঞ্জামিন ডিঃ ইজরেইলি ৮৬ বর্ষ বয়ক্রমে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। আইজেক ডিঃ ইজরেইলি পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ২১শে ডিসেম্বর আইজেক ডিঃ ইজরেইলির এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; এই পুত্রই বিখ্যাত "বেঞ্জামিন ডিজরেলি" (ডিঃ ইজরেলি) । এই পুত্র ভাবি-কালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিরূপে রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ডিজরেলি পিতার ন্যায় সাহিত্যে একান্ত অনুরাগী ছিলেন ; তিনি তাঁহার পুস্তকাগারে বসিয়া দিবারাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ১৮২৮ খৃঃ অব্দে "ভিভিয়ান গ্রে" (Vivian Grey) নামে একখান উপন্যাস লিখেন। এই উপন্যাস খানি জনসাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি আরও দুইখানি উপন্যাস লিখেন। অনন্তর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্রমে দুইবার পার্লেমেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা করেন ; কিন্তু দুইবারই বিফলপ্রযত্ন হন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন আবার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

করিয়া নূতন পার্লেমেণ্ট গঠন করেন। এবার "ডিজরেলি" "মেইড্‌ষ্টোন" (Maidstone) নামক স্থানের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথম দিন যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। তিনি একটু ক্রোধভরে বলিলেন, "আমি আজ বসিলাম, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যে দিন আপনারা আগ্রহের সহিত আমার কথা শুনিবেন।" ডিজরেলির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি একটী বিধবা ইংরেজ মহিলার পাণি গ্রহণ করেন; এই বিবাহ দ্বারা তিনি প্রভূত সম্পত্তি লাভ করেন। কিয়দ্দিবস পরে একটী ইংরেজ মহিলা মৃত্যুর সময় উইল করিয়া ডিজরেলিকে ৬০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯ লক্ষ টাকা দিয়া যান। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন আয়র্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত আইন পাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ করেন। নবনির্ব্বাচনে উদারনৈতিক দলে রক্ষণশীল অপেক্ষা ৬০ জন মেম্বর কম হওয়াতে, গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করেন এবং ডিজরেলি রক্ষণশীল দলের অগ্রণী হইয়া মন্ত্রিত্বের সভা গঠন করেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ডিজরেলি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া "আর্ল অব বিকন্সফিল্ড" উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ হয় এবং পুনর্ব্বার সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদলের পরাজয় হয় এবং গ্লাড্‌ষ্টোন পুনর্ব্বার উদারনৈতিক দলের নেতা হইয়া মন্ত্রিসমাজ গঠন করেন। অতঃপর তিনি রক্ষণশীল দলের নেতাই রহিলেন, কিন্তু আর প্রধান মন্ত্রী হইতে পারেন নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে তিনি বাত, শ্বাস ও কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

ডিমস্থিনিস—গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত বক্তা। ইনি ৩৮১ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা এথেন্সনগরবাসী একজন সৈনিক পুরুষ। ইনি তোত্‌লা ছিলেন এবং ইঁহার ফুসফুসের কার্য্য মৃদুভাবে চলিত, এজন্য তাঁহার প্রথম প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি ভাল হয় নাই। তাঁহার মুদ্রা দোষ ছিল; তিনি বক্তৃতাকালে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করিতেন; ইহা শ্রোতাদের ভাল বোধ হইত না। তিনি জিহ্বার জড়তা নাশের জন্য মুখে প্রস্তর খণ্ড রাখিয়া কথা বলিতেন এবং ফুসফুসের দোষ দূরীকরণের জন্য তিনি সমুদ্রের তীরে বা পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতাকালে হস্ত পদ সঞ্চালন দূরীকরণের জন্য তিনি সুতীক্ষ্ণ তরবারি তাঁহার স্কন্ধের ধারে ঝুলাইয়া রাখিতেন এবং মুখভঙ্গি সংশোধনের জন্য বক্তৃতা কালে এক খানি আয়না সম্মুখে রাখিতেন। তিনি সর্ব্বদা তদানীন্তন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত প্লেটোর বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তিনি ২৭শ বর্ষ বয়সে জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করিতে উপস্থিত হন। মাসিডনের রাজা ফিলিপ যে ধীরে ধীরে সমগ্র গ্রীস দেশ অধিকারের চেষ্টায় ছিলেন, তাহা তিনি গ্রীসীয়দিগকে বুঝাইবার জন্য নানাস্থানে বক্তৃতা করেন। ডিমস্থিনিস ফিলিপের বিরুদ্ধে গ্রীসের নানাস্থানে যে সমুদয় বক্তৃতা করেন, তৎসমুদয় ফিলিপিক্‌স্ (Philippics) নামে প্রসিদ্ধ। ফিলিপের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিখ্যাত আলেকজেণ্ডার, ডিমস্থিনিসকে ধৃত করিবার চেষ্টা করেন। আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনানী ও মাসিডনের উত্তরাধিকারী "এণ্টিপেটর" (Antipeter) ডিমিস্থিনিসকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য গ্রীসবাসীদিগকে আদেশ দেন। ডিমস্থিনিস আত্মরক্ষার্থ এক দেব মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ধৃত হইবার ভয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা ৩২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হয়।

ডেরায়স্ (১)—ইনি হিস্‌টাস্‌পেসের পুত্র ও পারস্যের একজন প্রধান রাজা। দশ মাস অবরোধ করিয়া ইনি বাবিল নগর অধিকার করেন। ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু মেরাথনক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। এই যুদ্ধে গ্রীস সেনাপতি মিলটিয়াডিস্ অশেষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক বহুগুণ অধিক পারসিক সৈন্যকে পরাভূত করেন। ডেরায়স্ পুনরায় গ্রীস আক্রমণের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু

আয়ুঃশেষ হওয়াতে তিনি সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ৪৮৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে সহসা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র জার্কসিস পিতার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। (জার্কসিস দেখ)।

ডেরায়স্ (২)—ইনি ওকাস্ বা নোথাস্ নামে পরিচিত। "নোথাস" শব্দের অর্থ জারজ। ইনি পারস্যের রাজা আর্টা জার্কসিসের জারজ পুত্র বলিয়া উক্ত নামে পরিচিত। ৪০৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম সাইরাস্।

ডেয়ায়স্ (৩)—ইঁহার অপর নাম কডোমেনাস্ (Codomanus)। ইনিই পারস্যের শেষ রাজা। ইঁহার রাজত্ব সময়ে মাসিডনের দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার পারস্য আক্রমণ করেন। ইনি আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নানাস্থানে পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষার চেষ্টা পান; কিন্তু পলায়নের সময় স্বীয় বিশ্বস্ত বন্ধু বেসাসের (Bessus) হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হন। (আলেকজেণ্ডার দেখ)।

ড্রাকো—এথেন্সের বিখ্যাত আইন কর্ত্তা। ৬২৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইনি আর্কন (Archon) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এথেন্সবাসীদিগকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য অতি কঠোর আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনের ধারাগুলির কঠোরতার জন্য তদানীন্তন বিখ্যাত বক্তা ডিমেডিস্ (Demades) বলিতেন, "ড্রাকো সকল প্রকার অপরাধেই মৃত্যুদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, অতি সামান্য অপরাধেই মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত; এতদপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড নাই বলিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রকার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বিধান করিয়াছেন। তৎপ্রণীত আইনগুলি কঠোর হইলেও এথেন্সবাসিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তদানীন্তন কালে এথেন্সবাসী-দিগের মধ্যে এই একটী প্রথা ছিল যে, কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে হইলে লোকে তাঁহার উপর টুপী ও কোট নিক্ষেপ করিত। এক দিবস এক সাধারণ সভায় ড্রাকোর উপর এত কোট ও টুপী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, সেগুলির চাপে পড়িয়া ড্রাকো শ্বাসরুদ্ধ হন এবং অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ড্রাকো খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে সোলন (Solon) নামে একজন জ্ঞানী এথেন্সে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি এথেন্সে প্রচলিত আইনের কেবল একটী ধারা ব্যতীত সমুদয় ধারাই রহিত করেন। হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে ড্রাকো যে ধারাটী করিয়াছিলেন, তাহাই কেবল সোলন অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছিলেন।



তারিক বিন্ জিয়াদ্ এই নামের অর্থ জিয়াদের পুত্র তারিক। এই বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি ৭১১ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশ জয় করেন। এই সময়ের পর হইতে ৮০০ বৎসর স্পেনদেশ মুসলমানগণের শাসনে থাকে। ইনি ফ্রান্সেরও দক্ষিণাংশ জয় করিয়াছিলেন; এই স্থানও ৫০ বৎসর কাল মুসলমানগণ শাসন করেন। স্পেনের দক্ষিণাংশে যে স্থানে তারিক অবতরণ করেন, সেই স্থান "জবলুল তারিক" (অর্থাৎ তারিকের পাহাড়) নামে অভিহিত হইত। এই নামের অপভ্রংসে এখন ইংরেজী "জিব্রাল্টার" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিব্রাল্টার প্রণালীর উপর একটী পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে; এই পর্ব্বতে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। তারিক এই প্রণালী পার হইয়া এই পর্ব্বতেই প্রথম অবতরণ করেন এবং তদবধি এই অবতরণ স্থান তাঁহার নামে খ্যাত হইয়াছে।



থিয়োডোর পার্কার—এই মহাত্মা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত বোষ্টন নগরের নিকটবর্ত্তী লেকসিংটন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম "জন পার্কার"। পার্কার কৃষকের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও কৃষিকার্য্যদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে যুক্তরাজ্যের নিয়মানুসারে শীত

কালে কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকিত এবং এই সময়ে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খোলা হইত। থিয়োডোর পার্কার এইরূপ এক পাঠশালায় বৎসরে তিনমাস অধ্যয়ন করিতেন এবং নানা লোকের নিকট হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন। এইরূপ পরিশ্রমসহকারে অধ্যয়ন করিয়া তিনি বোষ্টনের হার্বার্ট বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই দিনই ১০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বাড়ীতে আসিয়া পিতার নিকট সুসংবাদ দিলেন। কলেজের ব্যয় পিতা চালাইতে পারিবেন না মনে করিয়া, তিনি শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন এবং এই কাজে যাহা পারিশ্রমিক পাইতেন তাহা দিয়া কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিন বৎসরে তিনি গ্রীক, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করিলেন এবং গণিত বিজ্ঞানাদিতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ধর্ম্মযাজকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। পার্কার বাইবেল গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি তৎকালীন খৃষ্টানদিগের ভ্রান্তমত দূরীকরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সমস্ত পাদ্রী মিলিত হইয়া বোষ্টনের সকল গির্জ্জাঘর হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু পার্কার একটুকুও ভীত হইলেন না। তাঁহার অনুগামী কতকগুলি লোক বোষ্টনে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে পার্কারকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। এই সময়ে দাসব্যবসায় লইয়া আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। পার্কার দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য জর্ম্মানি, সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে গমন করেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তিনি অমর ধামে চলিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুস্তকালয়টী বোষ্টননগরবাসীদিগকে দান করিয়া যান; এই পুস্তকালয়ে ১১টী ভাষায় লিখিত ৭০০০ পুস্তক ছিল। তিনি উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মমত বিষয়ে তিনি জগতে অনেকের গুরু।

থেমিষ্টক্লিস বিখ্যাত এথিনীয় সেনাপতি। ইনি খৃঃ পূঃ ৫১৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৮০ খৃঃ পূঃ মেরাথন ক্ষেত্রে গ্রীস সেনাপতি মিলটিয়াডিসের সহকারী থাকিয়া অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যখন জার্কসিস্ গ্রীস আক্রমণ করেন, তখন থেমিষ্টক্লিস গ্রীসের নৌবাহিনীর পরিচালক ছিলেন। যখন উত্তর গ্রীস ও দক্ষিণ গ্রীস (পিলপনিসাস) পারসিক সৈন্যের বিরুদ্ধে একত্র হয়, তখন থেমিষ্টক্লিস্ সবেমত নৌবাহিনীর কর্ত্তৃত্ব দক্ষিণ গ্রীসের নৌবাহিনীর নেতার হস্তে অর্পণ করেন।

জার্কসিসের আক্রমণ কালে ডেলফির এপলোদেবতার মন্দিরে দৈব বাণী হয় যে, গ্রীসীয়দের সব বিনষ্ট হইবে; অবশেষে কাষ্ঠপ্রাচীর তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। থেমিষ্টক্লিস্ বলিলেন যে, কাষ্ঠের প্রাচীর অর্থ যুদ্ধ জাহাজ; তিনি এইনিমিত্ত গ্রীসবাসীদিগকে স্থল যুদ্ধের পরিবর্ত্তে জল যুদ্ধের আয়োজন করিতে বলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে উত্তর গ্রীসের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশের বালক, বৃদ্ধ স্ত্রীলোক দেশ ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে আশ্রয় লইল। সমবেত গ্রীসীয় সৈন্যের বহু পদস্থ লোক থেমিষ্টক্লিসের মতবিরোধী ছিলেন। থেমিষ্টক্লিস যখন স্বমত সমর্থনের জন্য বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তখন একজন পদস্থ লোক তাঁহাকে যষ্টি প্রহারে উদ্যত হইলেন। থেমিষ্টক্লিস্ বলিলেন, "আমাকে মার, কিন্তু আমার কথা শোন।" থেমিষ্টক্লিস্ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ কেহ গ্রহণ করে না তখন তিনি গোপনে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে এক চিঠি দিয়া পারস্য রাজ জার্কসিসের নিকট প্রেরণ করিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন যে গ্রীসের নৌবাহিনী ভীত হইয়া সেলামিস উপসাগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, যদি পারসিক নৌবাহিনী অতি প্রত্যুষে সেলামিস উপসাগরের মুখ অবরুদ্ধ না করে, তবে গ্রীসীয় যুদ্ধ জাহাজগুলি নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া যাইবে। থেমিষ্টক্লিস্ স্বদেশ-প্রেমে মত্ত হইয়া এরূপ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু পারস্যরাজ মনে করিলেন ইহা কোন স্বদেশদ্রোহীর কার্য্য; অতএব তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া শেষ রাত্রিতে সেলামিস উপসাগরের মুখ

রোধ করিতে স্বীয় নৌসেনাপতিকে আদেশ দিলেন। রাত্রি প্রভাতেই দেখা গেল, পারসিক যুদ্ধ জাহাজে উপসাগরের মুখ রুদ্ধ হইয়াছে; গ্রীসীয় নৌবাহিনীর আর সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। উভয় পক্ষের নৌবাহিনীতে ঘোরতর যুদ্ধ হইল; গ্রীসের পক্ষের ৩৬৬ খান জাহাজ পারস্য রাজের ১০০০ খানা রণতরী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিল। জার্কসিস গ্রীসীয়দের বীরত্ব দেখিয়া স্থলযুদ্ধের জন্য ৫০.০০০ সৈন্য সেনাপতি মার্ডোনিয়াসের অধীনে রাখিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মার্ডোনিয়াসও অচিরে ৪৭৯ খৃষ্টাব্দে প্লেটিয়া ক্ষেত্রে সমবেত গ্রীসীয় স্থলসৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হইল। এইরূপে থেমিষ্টক্লিসের বুদ্ধিবলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষিত হইল। এইরূপ উপকারী হিতৈষীকেও কোন অপরাধে এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। থেমিষ্টক্লিস নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্য রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন পারস্যরাজ জার্কসিস জীবিত নাই; তদীয় পুত্র আর্টাজার্কসিস্ পারস্যের সিংহাসনে আসীন। তিনি গ্রীসীয় বীরকে পদোচিত গৌরবের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য উপযুক্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করেন; কিন্তু পিতার পরাজয়ে আর্টাজার্কসিস্ গ্রীসের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন; তিনি থেমিষ্টক্লিসকে পারসিক সৈন্যসহ গ্রীস আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। থেমিষ্টক্লিস বিপদে পড়িলেন; একদিকে আশ্রয়দাতার অনুরোধ, অপরদিকে স্বদেশদ্রোহিতা। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া ৪৪৯ পূঃ খৃঃ বিষপানে উভয় সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার মৃতদেহ এথেন্সে আনা হইল এবং উহা মহা সমারোহে সমাহিত করা হইল। এই সমাধির উপর বহু অর্থ ব্যয়ে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল।

ন

নর্থব্রুক (লর্ড)—১৮৭২ খৃঃ ৩রা মে ইনি ভারতের গবর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় হন। এই সময়ে সার জর্জ ক্যাম্বেল বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর। ইঁহার শাসনসময়ে ভারতে দুইটী দুর্ঘটনা ঘটে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অনাবৃষ্টি হেতু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা. বেহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখনও ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের উড়িষ্যার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিষয় দেশের লোকে বিস্মৃত হয় নাই। যাহা হউক, বড়লাট সাহেব ও ছোট লাটসাহেব দ্বয়ের চেষ্টায় দুর্ভিক্ষ সহজে প্রশমিত হয়। এই সময়ে ২ কোটি মণ শস্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং সাড়ে সাতাইশ লক্ষ লোক আহার প্রাপ্ত হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, মাত্র ২০টী লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্তে বহুলোকের প্রাণ বিয়োগ হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা বরদার মলহর রাও গাইকোবারের পদচ্যুতি। বড়লাট মলহর রাওকে পদচ্যুত করিয়া তদ্বংশীয় অপর একজন যুবককে বরদার রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইঁহার নাম সয়াজিরাও গাইকোবার। সয়াজিরাও নানা সৎকার্য্য দ্বারা ভারতে যশস্বী হইয়াছেন।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সময়ে ১৮৭৫ খৃঃ প্রিন্সঅব্ ওয়েল্‌স্ (সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯৮৬ খৃঃ ১৫ ই এপ্রিল বড়লাট কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন।

নাদির শাহ—পারস্যের অধিপতি। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে পারস্যের অন্তর্গত খোরাসান নামক স্থানে ইনি সামান্য মেষপালকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ন্যায় ইনিও সামান্য দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি পারস্য. আফগানিস্তান প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সময় পারস্যাধিপতি নাদির শাহ ভারতে প্রবেশ করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণালের নিকটে মোগল সৈন্যের সহিত নাদির শাহের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ২০ হাজার মোগল সৈন্য রণশায়ী হয়; মোগল সৈন্যের প্রধান সেনাপতি খান-ই-দেওয়ান রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের পর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ নাদির শাহের অধীনতা স্বীকার করেন। নাদির বহু সমারোহে দিল্লীতে প্রবেশ করেন।

নাদিরের আদেশে দিল্লীতে ঘোর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডে এক লক্ষ বিশ হাজার নগরবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নাদির শাহ দিল্লীর রাজকোষস্থ ধনরত্ন, বিখ্যাত ময়ূরাসন লইয়া প্রস্থান করেন। প্রবাদ এই যে, তিনি ভারত হইতে প্রায় ৯ কোটী টাকা লইয়া গিয়াছিলেন। এই অত্যাচারের প্রতিফল তাঁহাকে শেষ জীবনে ভোগ করিতে হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন; তাঁহার অত্যাচারে প্রজাগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে নিশীথ সময়ে তিনি এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। এই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার ১৩টি পুত্রপৌত্রও নিহত হয়। নাদির সাহের পূর্ব্ব নাম নাদির কুলি খাঁ। পারস্যের সম্রাট্ হইয়া তিনি নাদির শাহ নাম গ্রহণ করেন।

নিউটন (সার, আইজেক)—সার আইজেক নিউটন উল্‌স্‌থর্প নামক স্থানে (গ্রন্থামের নিকটবর্ত্তী) ১৬৪২ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৬৪৫ খৃঃ তিনি গ্রন্থাম স্কুলে শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনি প্রথম ছাত্র ছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি বিখ্যাত গণিতবিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার ব্যারোর নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৬৬৭ খৃঃ তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য (ফেলো) নিযুক্ত হন এবং এক বৎসরেই তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি অধ্যাপক ব্যারোর স্থলে ট্রিনিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি ল্যাটিন ভাষায় আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এফ্. আর. এস. উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিজ হাতে তিনি একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ার করেন। তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত একটী দূরবীক্ষণ রয়াল সোসাইটীর লাইব্রেরীতে যত্নের সহিত অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। এখন হইতে ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত পার্লেমেণ্টে সভ্যরূপে থাকেন। ১৬৮৬ খৃঃ তিনি ল্যাটিন ভাষায় জ্যোতিষ এবং গণিত সম্বন্ধে "প্রিন্সিপিয়া" গ্রন্থ বাহির করেন। ১৭০৩ খৃঃ তিনি রয়াল সোসাইটীর সভাপতি হন। ১৭০৪ খৃঃ তিনি আলোক বিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। ১৭০৫ খৃঃ রাণী য়্যান তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি আতাফলের পতন দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ উদ্ভাবন করেন। তিনি চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। নিউটন জ্যোতিষিক এবং গণিত বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকিতেন, বোধ হয় তাহাতেই বিবাহাদি সাংসারিক বিষয় চিন্তা করিতে তাঁহার আর সময় হয় নাই। ১৭২৭ খৃঃ তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "প্রিন্‌সিপিয়া" পণ্ডিত সমাজে আদৃত। তিনি যৌবন সময়ে এই গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন; কিন্তু অনেক বয়োবৃদ্ধেরও ইহা বোধগম্য হওয়া কঠিন।

নিজামি গাঞ্জাবী—বিখ্যাত কবি। গাঞ্জা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া তিনি গাঞ্জাবী উপনামে অভিহিত। ইনি সেকেন্দর নামা পদ্যে রচনা করেন। এই গ্রন্থে মাসিডনের দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডারের জীবন-চরিত ও দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও ৯।১০ খানা কাব্য লিখেন। ইহার মধ্যে দুই খানা কাব্য লিখিয়া তিনি রাজার নিকট হইতে ১৪ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তিনি সেকেন্দর নামা রচনা শেষ করেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—ইনি ১৭৬৯ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট রবিবার ভূমধ্যসাগরস্থ কর্ষিকাদ্বীপে লিটিসিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কর্ষিকাদ্বীপ পূর্ব্বে ইতালির অধীন ছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা ইহা ইতালির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; কিন্তু কর্ষিকাবাসীরা সহজে ফরাসীর অধীনতা স্বীকার করিতে চায় নাই। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পরে নোপোলিয়নের জন্ম গ্রহণের দুইমাস পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণরূপে ফরাসীর অধীন হয়। শৈশবাবস্থায় পিতা মাতার নিকট কর্ষিকাবাসীদের বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া নেপোলিয়নের মুখ উৎসাহে পূর্ণ হইত। নেপোলিয়নের পিতা চার্লস বোনাপার্ট কর্ষিকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। মৃত্যু সময়ে তিনি স্ত্রী ও পুত্রের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট

সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। ৫।৬ বৎসর বয়সের সময় নেপোলিয়ন গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি শৈশবকালে "যুদ্ধ" খেলিতে ভালবাসিতেন। এখনও কর্ষিকায় নেপোলিয়নের বাটীতে পনর সের ওজনের একটী বন্দুক দেখিতে পাওয়া যায়; লোকে বলে উহাই নেপোলিয়নের শিশুকালের বন্দুক। ১৫ বৎসরের সময় তাঁহাকে প্যারিসের অদূরবর্ত্তী কোন সরকারী সৈনিক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত অভিনিবেশসহকারে সাহিত্য গণিতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, একবার তাঁহাকে একটি অঙ্ক কষিতে দেওয়া হয়, তিনি ৭২ ঘণ্টা একাসনে একভাবে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অঙ্কটী সমাধান করেন। নেপোলিয়ন গণিত শাস্ত্রে শ্রেণীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন।

২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তিনি সৈনিক বিভাগে সব্‌ লেপ্টেন্যান্টের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৭৯০ খৃঃ ও ১৭৯২ খৃঃ তিনি দুইবার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হন এবং মাতা ও ভগিনীদিগের সহিত ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেল্স বন্দরে বাস করেন। ১৭৯৩ খৃঃ তিনি কর্ণেলের পদে উন্নীত হন এবং টুলোনগর অবরোধের জন্য প্রেরিত হন। নেপোলিয়নের যুদ্ধকৌশলে টুলোতে জয় লাভ হয় এবং তিনি জেনারেলের পদে উন্নীত হন। ১৭৯৬ খৃঃ তিনি যোসেফাইন নাম্নী একটী সুন্দরী বিধবাকে বিবাহ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি যুদ্ধার্থ ইতালিতে প্রেরিত হন এবং তথায় সকল যুদ্ধেই জয় লাভ করেন। এখন হইতে তিনি (ফ্রান্সের এই সমুদায় যুদ্ধ জয়ের পর) ফরাসীদের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। ১৭৯৮ খৃঃ তিনি মিসর জয়ের জন্য বহুসংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ সহ প্রেরিত হন। তিনি মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। নৌযুদ্ধে যদিও নেলসন্ ফরাসীদের যুদ্ধ জাহাজগুলি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়ী হইয়া সমস্ত মিসর দখল করিয়া বসেন। যুদ্ধ জাহাজগুলি ধ্বংস হওয়াতে নেপোলিয়নের বহু ক্ষতি হইল এবং তিনি যে ইংলণ্ড জয়ের আশা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ফ্রান্সের বিপ্লব বর্দ্ধিত হইতেছে শুনিয়া তিনি হঠাৎ মিসর পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞাতভাবে তথায় উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া তিনি প্রবল দলের অধিনায়ক হন। ১৮০০ খৃঃ ষাইট হাজার সৈন্য সহ তিনি ইতালির দিকে বহির্গত হন। অষ্ট্রিয় সেনাপতি ১৮০০০ সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকেন। ১৮০০ খৃঃ ১৪ই জুন মেরেঙেন নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ করেন। যুদ্ধ জয়ের পর ইতালিস্থ সৈন্যের ভার সেনাপতি মেসিনার উপর অর্পণ করিয়া তিনি অতি ধূমধামের সহিত প্যারিস নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতালি জয়ের পূর্ব্বেই তিনি ইংলণ্ডের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরেজদিগকে মাল্টাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কথা ছিল; কিন্তু ফ্রান্সের যুদ্ধোদ্যোগ দেখিয়া তাঁহারা মাল্টা ছাড়িতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কাজেই ঐ সন্ধি ১০ মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১ খৃঃ ১৮ই মে ইংরেজেরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইংরেজদের বন্দরে যে কয়খান ফরাসী জাহাজ ছিল তাহা দখল করিয়া বসে। ইংরেজেরা এই যুদ্ধের জন্য ১৫০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেন। এদিকে ১৮০৪ খৃঃ নেপোলিয়ন সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন এবং ঐ সনের ডিসেম্বর মাসে রাণী জোসেফাইনের সহিত তিনি সম্রাট্‌পদে যথারীতি বৃত হন। ১৮০৫ খৃঃ ২৫শে অক্টোবর ইংরেজ নৌসেনাপতি নেলসন্ ট্রাফালগার নামক স্থানে ফরাসী ও স্পেনদিগের মিলিত নৌবাহিনী আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাভূত করেন। ইহার পর হইতে ফরাসীদের রণপোত ইংরেজ রণপোতের ভয়ে এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে পলাইয়া রক্ষা পাইতেছিল। নৌযুদ্ধে হারিলেও স্থলযুদ্ধে ফরাসী সৈন্য অজেয়। ইহার পরবর্ত্তী তিন বৎসরে নেপোলিয়ন ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান তিনটী সাম্রাজ্যকে (অষ্ট্রিয়া, রুষিয়া ও প্রুষিয়া) যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। ১৮০৬ খৃঃ ১৪ই অক্টোবরের যুদ্ধে প্রুষিয়ার ৫০,০০০ সৈন্য ধ্বংস হয়। ১৮০৬ খৃঃ বিজয়ী নেপোলিয়ন প্রুষিয়ার রাজধানী বার্লেন নগরে প্রবেশ করেন। প্রুষিয়ার সহিত নেপোলিয়নের সন্ধি হয়।

এই সন্ধিকে টিলসিট্ সন্ধি কহে। ১৮০৯ খৃঃ তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দুইটী যুদ্ধে নেপোলিয়নের ১১৮০০ সৈন্য হত এবং ৩০,০০০ সৈন্য আহত হয়। অস্ট্রিয়ারও বহু সৈন্য এই যুদ্ধে বিনষ্ট হয়। ইহার পর দেড় মাস কাল উভয় পক্ষের যুদ্ধ স্থগিত থাকে। এই দেড় মাসের মধ্যে নেপোলিয়নের সাহায্যার্থে বহু সৈন্য ফ্রান্স হইতে প্রেরিত হয়। তৎপর যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অস্ট্রিয়ার সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হয়। এই যুদ্ধের পর ওডেসা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির পরে নেপোলিয়ন ১৮১০ খৃঃ অস্ট্রিয়া সম্রাট্ ফ্রান্সিসের কন্যা মেরিয়া লুইসাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্বপত্নী সাধ্বী জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। জোসেফাইনের কোন সন্তান ছিল না। জোসেফাইনের পরিবর্জ্জনের পর হইতে নেপোলিয়নের পতনের আরম্ভ। ১৮১২ খৃঃ জুন মাসে তিনি রুষিয়া জয়ের জন্য ৭৫০,০০০ সৈন্য ও ১২০০ কামান লইয়া মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হন। রুষিয়ার সম্রাট্ রাজধানী মস্কো পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন এবং বিজয়ী নেপোলিয়ন জনশূন্য মস্কো নগরে প্রবেশ করেন। নেপোলিয়নকে বিপন্ন করার জন্য মস্কোর শাসনকর্ত্তার আদেশে সমস্ত মস্কো নগরী দগ্ধ করা হয়। নেপোলিয়নের সৈন্য খাদ্যাভাবে ও অত্যধিক শীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। রাজধানী প্যারিস হইতেও কোন সংবাদ না পাওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পশ্চাৎদিক হইতে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। একে শত্রুর আক্রমণ তাহাতে শীতাধিক্য এই উভয় কারণে তাঁহার সৈন্য অশ্বাদি প্রতিদিন বহু পরিমাণে ক্ষয়িত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন মধ্যপথ হইতে দুইজন মাত্র উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া প্যারিস নগরে উপস্থিত হইলেন। হতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য ধীরে ধীরে প্যারিসে ফিরিয়া আসিল। প্যারিসে আসিয়াই ১৮১৩ খৃঃ রুষিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য ৮০০,০০০ লক্ষ সৈন্যসংগ্রহে মনোযোগ দেন। সৈন্য সংগ্রহ হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় যোদ্ধা ও সাহসী সৈন্য পাওয়া গেল না। এদিকে ইউরোপের সমস্ত শক্তিপুঞ্জ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিলেন। তিনি লিপজিক নামক স্থানে ১৭০,০০০ সৈন্য সহিত সমবেত সৈন্য আক্রমণ করিলেন, ৫ দিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার ৮০,০০০ সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর ১৮১৪ খৃঃ ইউরোপের সমবেত শক্তিসমূহের ৪০০,০০০ সৈন্য ফ্রান্সে প্রবেশ করিল। তিনি পৃথক্‌ভাবে রুষিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রুষিয়া প্রভৃতি সমস্ত শক্তিকেই পরাভূত করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার নিজ সেনাপতিগণ অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। কাজেই তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পদবী সম্রাট্ই রহিল এবং রক্ষীসৈন্যগণের ভরণপোষণের জন্য বেশী পরিমাণ পেন্সন মঞ্জুর করা হইল। কিন্তু এলবা দ্বীপে তিনি বেশী দিন থাকেন নাই, তিনি তথা হইতে ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের (রুষিয়া, প্রুষিয়া, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি) সহিত ওয়াটারলু ক্ষেত্রে যুদ্ধ হইল, তথায় পরাভূত হইয়া তিনি জাহাজে চড়িয়া ইউরোপ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু ইংরেজকর্ত্তৃক বন্দী হইয়া সেণ্টহেলেনাতে প্রেরিত হন। সেখানে ১৮২১ খৃঃ ৫ই জুন অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ওয়াটারলুর যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন ইংরেজ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন।

নেল্‌সন্ (হোরেসিও) (Horatio Nelson)—জগদ্বিখ্যাত নৌসেনানী। ইঁহারই যুদ্ধকৌশলে ও পরাক্রমে ইংলণ্ড বড় বড় নৌযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জগতে এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১৭৫৮ খৃঃ ইংলণ্ডের নরফোক নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ে একটি উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মাতা লর্ড ওয়ালপোলের সহিত সম্পর্কিতা ছিলেন। এজন্য লর্ড ওয়ালপোল নেল্‌সনের ধর্ম্মপিতা হইয়াছিলেন। শৈশব অবস্থায় তিনি দুর্ব্বল ও পীড়িত ছিলেন। শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিলেও তাঁহার মানসিক বল যথেষ্ট ছিল। অল্প বয়সে তিনি নরউইচ্ হাইস্কুলে অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হন, কিন্তু নয় বৎসর বয়সের সময়ই ১৭৬৭ খৃঃ মাতার মৃত্যুতে গৃহে প্রত্যাগত হন। হোরেসিও তাঁহার পিতার পঞ্চম পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য যুদ্ধ জাহাজে কেপটেইন ছিলেন। তাঁহার মুখে অনেক যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়া তাঁহারও যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা হইত। ১৭৭৩ খৃঃ উত্তর কেন্দ্রে নূতন দেশের আবিষ্ক্রিয়ার জন্য কেপটেইন ফিপ নামক

এক ব্যক্তি দুইখানা জাহাজ লইয়া যাত্রা করেন; নেল্‌সন্ উহার একখানা জাহাজে কাজ গ্রহণ করিয়া রওনা হইলেন। এক রাত্রিতে অপর একজন খালাসীর সহিত তিনি ভল্লুক শীকারের নিমিত্ত জাহাজ হইতে অবতরণ করেন এবং ভল্লুক দ্বারা ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়াও বন্দুকের বাটের আঘাতে এই জন্তুটা বধ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে ১৫ বৎসরের বালক নেল্‌সন্ এক ভয়ানক হিংস্র ভল্লুক বধ করিলেন। ১৭৭৭ খৃঃ ৮ই এপ্রিল তিনি নৌযুদ্ধসংক্রান্ত একটী পরীক্ষা দেন এবং উহাতে যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক যুদ্ধজাহাজের দ্বিতীয় লেফটেনাণ্টের কাজ প্রাপ্ত হন। ১৭৭৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি ২৮টী কামান সমন্বিত এক যুদ্ধ জাহাজের কমাণ্ডার হইলেন। তিনি আমেরিকায় যুদ্ধার্থ প্রেরিত হন; এই যুদ্ধে তিনি প্রচুর ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করা ন্যায্য মনে করেন নাই। ইহার পরে ১৭৯৩ খৃঃ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁহাকে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি কর্ডোভার যুদ্ধে স্পেনীয় যুদ্ধ জাহাজগুলি বিধ্বস্ত করেন। ইহার পর তিনি মিশরে নীল নদের যুদ্ধে প্রেরিত হন। এখানে নেপোলিয়নের সহিত ১৩ খানা যুদ্ধ জাহাজ, ১১৯৬টা কামান ও ১১২৩০ সৈন্য ছিল। নেল্‌সনেরও ১৩ খানা যুদ্ধ জাহাজ ছিল; কিন্তু কামান মাত্র ১০১২ ও সৈন্য ৮০৬৮ জন ছিল। এই যুদ্ধেও ফরাসী যুদ্ধজাহাজগুলি পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। তৎপর ১৮০১ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ফরাসী যুদ্ধজাহাজগুলির সহিত বাল্টিক সাগরে কোপেনহেগেন নামক সহরের অদূরে নৌযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি সার্ হাইড পার্কারের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। এখানেও ইংরেজদের জয় হয়। তৎপর উক্ত সনের ২১শে অক্টোবর ট্রাফালগার নামক স্থানে বিখ্যাত নৌযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হইল। কিন্তু নেল্‌সন্ এক গোলার আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদের ছায়া ইংরেজ রণতরীতে পতিত হইল। নেল্‌সনের স্মরণার্থ লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক অত্যুচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

প

পিট (উইলিয়ম আর্ল অব চ্যাথাম)—ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ। কর্ণওয়ালের বোকোনক গ্রামবাসী রবার্ট পিটের পুত্র। ১৭২৬ খৃঃ পালিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। জন্ম ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। ইনি বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। ইনি সার রবার্ট ওয়ালপোলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইঁহার বাগ্মিতায় ওয়ালপোলের খ্যাতি হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৬৬ খৃঃ তিনি আর্ল অব চ্যাথাম উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৭৮ খৃঃ ৮ই এপ্রিল তিনি যখন আমেরিকার স্বাধীনতা সমর সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে গুরু গম্ভীরনাদে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার মূর্চ্ছা অপগত হইল বটে; কিন্তু রোগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন না; পরবর্ত্তী মাসের ১১ই তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর কাল ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে সমস্ত ইয়োরোপে তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ অল্পই ছিল।

পিটার দি গ্রেট—রুষিয়ার বিখ্যাত সম্রাট্। ইনি ১৬৭২ খৃঃ ৩০শে মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৭৬ খৃঃ তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলমাল এবং নানা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। অবশেষে ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা থিয়োডোর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পিটার তাঁহার মাতার সহিত মস্কো নগরের নিকটবর্ত্তী এক প্রাসাদে প্রেরিত হইলেন। নুতন সম্রাট্ বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ১৬৮২ খৃঃ ৬ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজ্যের মন্ত্রিসমাজের অধিকাংশের মতে ও প্রজাসাধারণের মতে পিটারই সম্রাট্ পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। আইভান নামে পিটারের আর এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন; তিনি নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য। পিটার তখনও নাবালক। স্থির হইল যে তাঁহার মাতা অভিভাবিকা হইবেন। সোফিয়া নাম্নী পিটারের বৈমাত্রেয় ভগিনী এই নির্ব্বাচনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আইভান সম্রাট্ হইবেন। তাহা না হওয়াতে তিনি জনসাধারণের সভায় এক তীব্র বক্তৃতা দিলেন। তিনি এই সভাতে এক অমূলক সংবাদ প্রচার করিলেন যে, পিটারের

পল্লীর লোকেরা তাঁহার ভাই আইভানকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া এক ভয়ানক দাঙ্গা করিল। এই দাঙ্গাতে ৬০ জন সম্ভ্রান্ত লোক ও পিটারের বহু আত্মীয় নিহত হয়। অবশেষে শান্তি স্থাপিত হইল। স্থির হইল যে, পিটার ও আইভান একত্র সম্রাট্ হইবেন ও আইভানের জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহাদের অভিভাবিকা হইবেন। যথাসময়ে ১৬৮২ খৃঃ ৬ই জুলাই রাজ্যাভিষেক প্রথা সম্পন্ন হইল। পিটার যুদ্ধ বিদ্যা অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তিনি সখের সৈন্যদল গঠন করিয়া উৎকৃষ্ট সেনাপতির অধীনে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ধীরে ধীরে সমুদয় রাজকার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে পড়িল। আইভান দুর্ব্বলমস্তিষ্কের লোক; তিনি নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। পিটারের লোকপ্রিয়তা দেখিয়া সোফিয়া ঈর্ষান্বিতা হইয়াছিলেন। তিনি পিটারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। পিটার নানা কৌশল করিয়া সোফিয়ার দলভুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন; সোফিয়াকেও মস্কোতে সরাইয়া দিলেন; এইস্থানে সোফিয়া ১৭০৪ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। পিটার ও আইভান উভয়ে সম্রাট্ হইলেও পিটারই প্রকৃত সাম্রাজ্য চালাইতেন। আইভান একে দুর্ব্বলমস্তিষ্ক তার উপর অতি রুগ্ন; কাজেই তিনি সাম্রাজ্যের কোন কাজে হাত দিতে পারিতেন না। পিটার মন্ত্রিগণের সহায়তায় সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রবল সেনাদল গঠন ও বহু যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ খৃঃ আইভানের মৃত্যু হয় ১৬৭৬ খৃঃ মে মাসে প্যারিসে অবস্থান কালে তিনি অনেক প্রকার কল কারখানা পরিদর্শন করেন।

এদিকে রুষিয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এলেক্‌সিসের দুর্ব্ব্যবহার পিটারকে জ্ঞাপন করা হয়। পিটার তাড়াতাড়ি প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া আমষ্টার্ডম হইয়া রুষিয়ায় স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হন। তিনি দুশ্চরিত্র পুত্রকে সন্ন্যাসীবেশে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করেন। পুত্র জর্ম্মনিতে ও অন্যান্য স্থানে গিয়া রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টা দেখিতে থাকেন। ইহা অবগত হইয়া পিটার মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে আনয়ন করেন। পুত্র রাজধানীতে উপস্থিত হইলেই তাহাকে বন্দী করা হয়; এবং বিচার করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। প্রাণদণ্ডের দিন সে কারাগারে অসুস্থ হয়; তাহার পর আর কেহ তাহাকে এ পৃথিবীতে দেখে নাই। অনেকে বলেন যে, পিটার স্বয়ং কারাগারে গিয়া পুত্রের প্রাণনাশ করেন।

১৬৯৬ খৃঃ আজফ্ সাগরের কর্ত্তৃত্ব লইয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধ হয়। এই সময়ে পিটার ৭৫,০০০ সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিলেন। তিনি ১৬ই মে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি আজফ্ নগর অবরোধ করিলে, ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে তুরস্ক সৈন্য পরাজয় স্বীকার করিল। তাঁহারা সমস্ত সৈন্য ও তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রগণ সহ বিনা বাধায় সহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবে এই চুক্তিতে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই যুদ্ধে পিটারের নাম ইউরোপে ব্যাপ্ত হইল। ইহার পর পিটার তুরস্ককে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। উৎকৃষ্ট যুদ্ধজাহাজ না হইলে তুরস্কের সহিত পারিয়া উঠিবেন না, এজন্য তিনি ৫০ জন লোককে যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষার জন্য হলণ্ডে পাঠাইলেন। হলণ্ডে সেই সময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাহাজ প্রস্তুত হইত। তিনি কেবল লোক পাঠাইয়া নিরস্ত হইলেন না; স্বয়ং হলণ্ডে যাইয়া জাহাজ প্রস্তুতপ্রণালী দেখিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু রাজবেশে জাঁকজমকের সহিত গেলে আমোদপ্রমোদে দিন কাটিবে, জাহাজ প্রস্তুত করা ভালরূপ অভ্যাস করিতে পারিবেন না, এজন্য ছদ্মবেশ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার যৌবনসহচর কয়েকটী নিপুণ সেনাপতি চলিলেন। ২৫০ জন সেনাপতি সঙ্গে লইয়া তিনি সামান্য ভদ্রলোকের বেশে চলিলেন। সাম্রাজ্য শাসনের ভার তিন জন উপযুক্ত মন্ত্রীর হস্তে দিয়া হলণ্ড যাত্রা করিলেন।

প্রথমে তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে যাইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু ভিয়েনাতে যাইতে অত্যন্ত পথকষ্ট হয় বলিয়া তথায় যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করেন। প্রথমে তাঁহারা প্রুষিয়ার অন্তর্গত রিগা ও ড্রেসডেন সহরে গেলেন। ড্রেসডেনে সম্রাট্ পিটার দুর্গে যাইয়া দুর্গ সম্বন্ধে কাগজে নোট করিতেছিলেন, এমন সময় একজন দারোয়ান তাঁহাকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই লোকটীকে তিনি অপরাধী মনে করিলেন না, যেহেতু তিনি সামান্য ভদ্রলোকের বেশে দুর্গে প্রবেশ

করিয়াছেন। সেনাপতি লিফোর্ট সর্ব্বস্থানে দুর্গ ও জাহাজ দর্শনে যাইতেছেন, ইহাই সকল রাজ্যে প্রচারিত হইল। সেনাপতি লিফোর্টের লোকের মধ্যে যে সম্রাট্ পিটার একজন সামান্য ভদ্রলোকের বেশে ছিলেন তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। এইরূপে তিনি জর্ম্মণি, প্রুষিয়া, হলণ্ড হইয়া ১৬৯৮ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তিনি লণ্ডনের সরফোক ষ্ট্রীটে এক বাটীতে বাস করিতেন; এখন সেখানে এক হোটেল। ইংলণ্ডের রাজা গুপ্ত-বেশে তাঁহার সহিত এই বাড়ীতে আসিয়া দেখা করেন। পিটারের একটা পোষা বানর ছিল; সে পিটারের চেয়ারে ও তাঁহার পিঠে বসিয়া থাকিত। যখন ইংলণ্ডের রাজা ৩য় উইলিয়ম তাঁহার সহিত সেই বাড়ীতে গুপ্তভাবে আলাপ করিতেছিলেন, তখন বানরটা ক্রোধের সহিত রাজা উইলিয়মের গায় লাফাইয়া পড়িয়াছিল; এজন্য পিটার রাজার নিকট বহুবার ক্রটী স্বীকার করেন। পিটার রাজার অনুমোদন ক্রমে গুপ্তভাবে পার্লেমেণ্ট সভার অধিবেশন দেখিয়া আসিয়া-ছিলেন। তিনি লণ্ডনের নানা স্থানে নাট্যাভিনয় দেখিয়া উলউইচ ও ডেপ্টফোর্ড বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিতে যান; তিনি এই সমুদয় স্থানে ৩ মাস ছিলেন। ইহার পর তিনি ইটালীতে ভেনিস্ সহরে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেখানে ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের জন্য ছোট ছোট জাহাজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু রুষিয়া হইতে রাজ্য সংক্রান্ত গোলমালের চিঠি পাইয়া তিনি ভেনিসে যাইবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। রুষিয়ায় একদল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়াছিল। .তাহারা পরাজিত হইয়া বন্দিভাবে ছিল। পিটার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং তাহাদের বিচার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ২২শে মে তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। তিনি ভিয়েনা হইয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর মস্কোতে উপস্থিত হইলেন। ১৭ মাস বিদেশভ্রমণে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে কঠোর শাস্তি দিলেন এবং নিজহস্তে অনেকের মস্তক ছেদন করিলেন। অতঃপর তিনি উত্তরে ফিনলাণ্ড উপসাগরে এক বন্দর স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে সুইডেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সুইডেনের রাজা চার্লস তুরস্কে গিয়া সুলতানকে রুষিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। কাজেই পিটরকে তুরস্ক ও সুইডেনের সঙ্গে একসময়েই যুদ্ধ করিতে হয়। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর এবং বহু লোকক্ষয়ের পর পিটার জয়ী হইলেন। পিটার ১৭১৬ খৃঃ অন্যান্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হন। এবার রাজবেশে ও সস্ত্রীক। তিনি হাম্বার্গ হইয়া কোপেনহেগেনে যান এবং তথা হইতে ১৭ই মে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যান। প্যারিসে তিনি সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হন। তাঁহার জন্য আহারাদির ও থাকিবার স্থানের খুব জাঁকজমক করা হয়। কিন্তু তিনি জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহার অনুরোধে তাঁহার জন্য এক কেম্প খাট ও সাধারণ রকমের রুটী ও কিছু মদ আহারার্থ রাখা হয়। তিনি আহারে ও খাদ্য দ্রব্যে বিলাসিতা ভালবাসিতেন না। ১৭২৫ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী পিটার দি গ্রেট প্রাণত্যাগ করেন, তৎপূর্ব্বে ১৭২১ খৃঃ তিনি রুষিয়ার সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন। "পিটার দি গ্রেট" ও "তদীয় রাজ্যের পিতা" এই দুই উপাধিও তাঁহাকে এই সময়ে দেওয়া হয়। এই সময় হইতে পিটারই একমাত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাণী ক্যাথেরিন কিছুকাল সাম্রাজ্য শাসন করেন; ক্যাথেরিনের মৃত্যুর পর এলেক্সিসের পুত্র সম্রাট্ হন।

পিথাগোরাস—বিখ্যাত গ্রীসীয় দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি সেমস দ্বীপে আনুমানিক ৫৭৩ খৃঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫০৪ খৃঃ পূঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি প্রথমে সৌরকৈন্দ্রিক মত প্রতিপাদন করেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি জ্যামিতি প্রথম অধ্যায়ের ৩২শ ও ৪৭ প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করেন।

পেনেলপ—বিখ্যাত গ্রীষ্টীয় বীর ইথেকার রাজা ইউলিসিসের মহিষী। ইঁহার পুত্রের নাম টেলিমেকস।

(ইউলিসিস দেখ)।

পেরিক্লিস—প্রাচীন এথেন্সের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ, বক্তা ও সেনাপতি। ইঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে এথেন্স সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ গ্রীসের উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বিলাসিতারও চরম সীমায় উপনীত হয়। ৪২৯ পূঃ খ্রীঃ মহামারী (প্লেগে) এথেন্স উৎসন্নপ্রায় হয়; এই সময়ে পেরিক্লিশও প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পেষ্টালজি—ইনি বিখ্যাত শিক্ষাসংস্কারক। ইনি সুইজর্লণ্ডবাসী। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত জুরিচ্ নামক নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই চেষ্টায়—কেবল সুইজর্লণ্ডে নয়—সমস্ত ইউরোপে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তৎপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা-সংক্রান্ত মত সকল লোকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিলেও শিশুদিগের শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালীর মূলসূত্র এই—(১) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাহায্যে জ্ঞান লাভ; ইহাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। (২) বস্তুপাঠদ্বারা শিক্ষাদান। (৩) প্রথমে শিক্ষা করা ও তৎপরে তাহার সমালোচনা করা। (৪) সহজ বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে কঠিন বিষয় বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া। (৫) বালকেরা যতক্ষণে না একটী বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহাদিগকে তত সময় দেওয়া। (৬) প্রত্যেক ছাত্রের প্রকৃতির বিশেষত্বের দিকে শিক্ষক মহাশয়ের লক্ষ্য রাখা। (৭) বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করাই প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। (৮) শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধের ভিত্তি প্রীতি, উহা এই ভিত্তির উপর স্থাপিত ও উহা দ্বারাই নিয়মিত হওয়া উচিত।

পেষ্টালজি বলেন যে বালককে প্রথমেই লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে নিযুক্ত না করিয়া তাহার চক্ষুর সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার আকারের বোধ জন্মান উচিত। প্রথমতঃ গোল, চৌকোণ বস্তুর আকার, তৎপর সরলরেখার বিভিন্ন প্রকারে অবস্থান, কোণ—সমকোণ, স্থূলকোণ, সূক্ষ্মকোণ ইত্যাদির জ্ঞান, দূরত্বজ্ঞান এবং তৎপর সমুদয় রেখা ও কোণ প্রভৃতি শ্লেটে অঙ্কণ শিক্ষা দিবে। পেষ্টালজি এই সমুদয় শিক্ষা দিতে যাইয়া বর্গক্ষেত্রের সাহায্যই অধিকতররূপে গ্রহণ করিতেন। পেষ্টালজি বলিতেন যে, শিক্ষার সময় মনকে সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তভাবে রাখা প্রয়োজন; কোন প্রকারের উত্তেজনা আসিয়া যেন শিক্ষার ব্যাঘাত না হয়। তিনি মানসিক শক্তির ক্রিয়া ত্রিবিধরূপে বিভক্ত করিয়াছেন।

পেষ্টালজি শিক্ষা সংক্রান্ত পাঁচখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৭৯৯ খৃঃ বার্গডর্ফে একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় ১৮০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত নিজে শিক্ষা দেন। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই তাঁহার আবিষ্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর আরম্ভ। তিনি বলেন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সমস্ত বস্তু আমাদের জ্ঞানরাজ্যের অধিগত হয়। সহজ বিষয় হইতে জটিল বিষয়ে উপস্থিত হওয়াই এই প্রণালীর মূলমন্ত্র। তিনি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা স্থানে বালকদের শিক্ষার্থ নূতন প্রণালীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৮২৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নিউহফ (Neuhof) নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

প্লেটো—বিখ্যাত গ্রীসীয় দার্শনিক। ইঁহার পিতার নাম এরিষ্টন; বিখ্যাত সোলন ইঁহার মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি ৪২৭ খৃঃ পূঃ এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম "এরিষ্টক্লিশ"; বূঢ়োরস্ক ও বলিষ্ঠদেহ বলিয়া ইনি "প্লেটো" নামে খ্যাত হন। ইনি বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের (Socrates) শিষ্য। প্রায় ১০ বৎসর কাল তিনি সক্রেটিসের নিকট অধ্যয়ন করেন, এই সময়ে তিনি এই বিখ্যাত দার্শনিকের উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করেন। ৩৯৯ খৃঃ পূঃ সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তিনি এথেন্স পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। ইনি মিশরে ১৩ বৎসর কাল থাকিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; তথা হইতে ইতালীতে এবং ইতালী হইতে সিসিলিতে গমন করেন। সিসিলি দ্বীপের অন্তর্গত সিরাকুজের স্বেচ্ছাচারী রাজার (Tyrant of Syracuse) সহিত ইঁহার পরিচয় হয়; কিন্তু স্পষ্টবাদিতার জন্য ইনি ডাইও-নিসিয়াসের (Dionysius) বিরাগভাজন হন এবং তাঁহারই চক্রান্তে প্লেটো দাসরূপে বিক্রীত হন। ক্রেতা প্লেটোর জ্ঞান-গরিমা দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে মুক্তি দেন। অতঃপর মুক্তিলাভ করিয়া তিনি পুনরায় এথেন্সে আসিয়া শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হন; তিনি আরও দুইবার, এথেন্স হইতে অন্যত্র গমন করেন। অবশেষে এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দার্শনিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এখানে তাঁহার আরও বহু শিষ্য জুটিল। শেষ জীবন তিনি এথেন্সে অতিবাহিত করেন। তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। গুরু সক্রেটিস বক্তা। প্লেটোর দার্শনিক গ্রন্থের গ্রীক ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট সংস্করণ ১৮২৩ খৃঃ বার্লিন সহরে প্রকাশিত হয়। পরে ইহার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়। ইনি ৩৪৭ পূঃ খৃঃ দেহত্যাগ করেন।

ফ

ফাহিয়ান—বিখ্যাত চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ও তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়ে তুষারমণ্ডিত দুরারোহ শৈলমালা অতিক্রম করিয়া ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। ১৪ বৎসর ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজে সমুদ্রপথে চীনে প্রত্যাগমন করেন। তিনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্তে (বর্ত্তমান তমলুক) গমন করিয়া দুই বৎসর অবস্থিতি করেন। তমলুক তখন বৌদ্ধরাজ্য; এখানে অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখান হইতে তিনি ভারতীয় জাহাজে সিংহলে গমন করেন; সিংহলে তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব। এখানে তিনি দুই বৎসর অবস্থিতি করেন এবং চীনীয়দিগের অপরিজ্ঞাত সন্নিপাত পিটক, বিনয় পিটক, দীর্ঘাগম, সংযুক্তাগম প্রভৃতি কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ভারতীয় জাহাজে সিংহল হইতে সমুদ্র পথে তিনি চীনের অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে ঝড় উঠে; ১৩ দিন ঝড় প্রবাহিত হয়, ঝড়ে জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়। বহু কষ্টে জাহাজ রক্ষা পায় এবং তিন মাসে যবদ্বীপে উপস্থিত হয়। এই স্থানে তখন ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল। ফাহিয়ান যে জাহাজে ছিলেন সেই জাহাজে প্রায় দুইশত আরোহী ছিল, ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু। এখান হইতে ৫০ দিনের খাদ্য বস্তু ও পানীয় জল লইয়া জাহাজ চীন অভিমুখে চলিল। প্রায় আড়াই মাসের পর বহু কষ্ট পাইয়া নানা প্রকার বিপদের মধ্য দিয়া ফাহিয়ান চীনে উপস্থিত হইলেন। এখানে ভারতপ্রত্যাগত ফাহিয়ানের প্রতি চীনবাসিগণ যথেষ্ট সম্মান ও আদর প্রদর্শন করেন। চীনীয় ধনিগণের অর্থ সাহায্যে ফাহিয়ানের সংগৃহীত বৌদ্ধগ্রন্থগুলি চীন ভাষায় অনূদিত হইল। ৮৬ বৎসর বয়সে ফাহিয়ান দেহত্যাগ করেন।

ফেরদৌসী (Ferdousi)—বিখ্যাত পারস্য দেশীয় কবি। ইনি পারস্যের শাহ সুলতান মহম্মদের শাসন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পারসী ভাষা আরবীর সহিত বিমিশ্র ছিল; বিশুদ্ধ পারসী ভাষায় কোন গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। একদিন সুলতান মহম্মদ তাঁহার সভাস্থিত কবি ফেরদৌসিকে বিশুদ্ধ পারস্য ভাষায় একখানা কাব্য লিখিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি প্রত্যেক শ্লোকের জন্য কবিকে এক এক স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। সুলতানের অনুরোধে কবি ফেরদৌসী বিশুদ্ধ পারস্য ভাষায় ষষ্টসহস্র শ্লোক সমন্বিত বিখ্যাত "শাহনামা" (অর্থাৎ পারস্যের শাসন কর্ত্তা শাহগণের ইতিহাস) নামে এক সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন। সুলতান মহম্মদ প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন না। তিনি প্রথমে ৬০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা কবির নিকট প্রেরণ করেন। কবি বিরক্তির সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দুঃখিতচিত্তে দেশ ত্যাগ করেন। ফেরদৌসী মর্ম্মাহত হইয়া অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর সুলতান মহম্মদ অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। তখন তিনি ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তদীয় কন্যার নিকট প্রেরণ করেন। ফেরদৌসীর পুত্রসন্তান ছিল না। কন্যা সুলতান কর্ত্তৃক প্রেরিত ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আর গ্রহণ করিলেন না। যে স্বর্ণমুদ্রার জন্য পিতা দেহত্যাগ করিলেন তাহা পিতৃবৎসলা তনয়া ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ফ্রাঙ্কলীন (বেঞ্জামিন)—ইনি ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের বোষ্টন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে সাধারণ গ্রাম্য স্কুলে পড়িতেন। পিতা একে দরিদ্র তাহাতে ব্যবসায়হীন; তিনি সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। দশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়া পিতার সাবানের কারবারে আসিতে হইল; কিন্তু এ কাজ ফ্রাঙ্কলিনের ভাল লাগিল না। তৎপরবর্ত্তী বৎসর তাঁহার ভ্রাতার ছাপাখানায় কাজ শিখিতে গেলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই ফ্রাঙ্কলিন এই কার্য্যে পারদর্শী হইলেন। ছাপাখানার কাজ করায়তে অনেক পুস্তক-বিক্রেতার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি তাহাদের নিকট হইতে পুস্তক আনিয়া পড়িতে লাগিলেন। ফ্রাঙ্কলিন মৎস্য মাংস ত্যাগ করাতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র পাক করিয়া খাইতে হইত। এই বাবদে যাহা কিছু খরচ বাঁচিত তদ্দ্বারা বই কিনিয়া পাঠ করিতেন। এইরূপে পুস্তক পাঠ এবং পত্রিকা পাঠ দ্বারা তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইল। ইহার পর ভ্রাতার সহিত কোন

কারণে মনোবাদ হওয়াতে তিনি পলায়নপূর্ব্বক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী নিউ ইয়র্ক সহরে উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার কোন সহায় নাই অথচ হাতে অর্থও নাই। নিউ ইয়র্ক হইতে তিনি এক ভদ্রলোকের পরামর্শে রাস্তায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিলাডেলফিয়া নগরে যান। এইখানে আসিয়া তিনি এক ছাপাখানার কাজ লইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি প্রাদেশিক গভর্ণরের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন ভগিনীপতির নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তিনি তাহা গভর্ণরকে দেখাইলেন। গভর্ণর ঐ পত্রের ভাষা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে কোন একটা সুবিধামত কাজ দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। একদিন হঠাৎ গভর্ণর তাঁহার ছাপাখানায় যাইয়া উপস্থিত। ছাপাখানার লোক গভর্ণরকে দেখিয়া অপ্রস্তুত, ছাপাখানার মালিক গভর্ণরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নামিয়া আসিলেন, গভর্ণর ছাপাখানার মালিককে ফ্রাঙ্কলিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গভর্ণরের পরামর্শে ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডে গেলেন; কিন্তু সেখানে তাঁহার কিছুই সুবিধা হইল না। আবার ফিরিয়া এই ছাপাখানায়ই আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। ইহার পর নিজেই একখানা পত্রিকা বাহির করিলেন। তৎপর তিনি কাগজ, কলম, ছুরি প্রভৃতির দোকান দিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থলাভ হইল।

ইনিই প্রথমে ইংরেজ পার্লেমেণ্টে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "প্রতিনিধি গ্রহণ ব্যতিরেকে ট্যাক্স্ বসাইতে পারিবে না।" (No taxation without representation)। যুক্তরাজ্যের লোক ইহাকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, উক্ত রাজ্যের পোষ্টাফিসের টিকেটের উপর বেঞ্জামিনের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। ১৭৩১ খৃঃ ফিলাডেলফিয়াতে তিনি এক সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ইহাতে ফিলাডেলফিয়া নগরের যুবকবৃন্দের বিশেষ উপকার হয়। তাহারা সকলেই ফ্রাঙ্কলিনকে বিশেষ সম্মান করিতে লাগিলেন। ১৭৩৮ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডাকঘরের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। ইহার পর বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য তিনি একটী সভা, বালকদের সুন্দর শিক্ষা বিধানের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বিপক্ষের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য তিনি সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব করেন। ফিলাডেলফিয়ার সকল সৈন্যই তাঁহাকে অধ্যক্ষ মনোনীত করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু অপর এক ধনশালী ব্যক্তি তাঁহার অনুরোধে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর ফ্রাঙ্কলিন ১৮৪৬ খৃঃ পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিয়া তড়িতের তত্ত্ব নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি দেখিলেন যে, বায়ুতে স্বভাবতঃ যে তড়িৎ আবির্ভূত হয় তাহাই বিদ্যুৎ। ১৭৫২ খৃঃ একটী ঘুড়ি শণনির্ম্মিত সূত্রদ্বারা উড়াইয়া দিয়া মেঘের তড়িৎ হস্তস্থিত সূত্র প্রান্তে বদ্ধ লৌহকীলকে অনুভব করিলেন। যখন তাঁহার অঙ্গুলী লৌহকীলকের নিকটে গিয়াছিল তখন তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক সমাজে লিখিয়া পাঠাইলেন, প্রবন্ধ লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক সভাতে পঠিত হইল, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা শুনিয়া ফ্রাঙ্কলিনকে উপহাস করিতে লাগিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন না। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত বাফোঁর নিকট পাঠাইলেন। বাফোঁ ঐ প্রবন্ধ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত করিলেন।

প্যারিসে ইহার পরীক্ষা হইল এবং পরীক্ষা সফল হওয়াতে ইয়োরোপের সকল বৈজ্ঞানিক সমাজে ইহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক সভার সভ্যগণের কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিলে, তাঁহারা লজ্জিত হইলেন এবং উহার পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়া সফলতা লাভ করিলেন। রাজকীয় সভা ফ্রাঙ্কলিনকে তাঁহাদের সভ্য করিয়া সম্মানিত করিলেন। অধিকন্তু প্রত্যেক সভ্যের দেয় বার্ষিক চাঁদা ২৫০৲ টাকার দায় হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। ১৭৫৭ খৃঃ তিনি আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের শাসনসংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয়ের ভার লইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হন এবং এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তিনি ৫ বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন, এই সময়ে অনেক স্থান পরিদর্শন করেন। স্কটলণ্ডের এণ্ড্রু বিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, এল উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ১৭৬২ খৃঃ তিনি আমেরিকায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ইংরেজেরা আমেরিকার ঔপনিবেশিকদিগের উপর

অত্যন্ত কঠোর আইন জারি করিতেছিলেন। ইহাতে আমেরিকার জনসাধারণের মনে অসন্তোষের উৎপত্তি হইল। যাহাতে এই প্রকার উৎপীড়ক আইন রহিত হয়, তাহার জন্য দেশের প্রতিনিধিরূপে ফ্রাঙ্কলিন পুনরায় ইংলণ্ডে আসেন। এইখানে মন্ত্রীসমাজের সহিত তাঁহার অনেক তর্কবিতর্ক হইল; কিন্তু তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া দেশে ফিরিলেন; ফলে ১৭৭৫ খৃঃ আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন; ১৭৭৮ খৃঃ তিনি কংগ্রেসের দূত হইয়া প্যারিসে গমন করেন। সেখানে যাইয়া দেশের অনেক মঙ্গলজনক কাজ সাধন করেন। আমেরিকা যে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহার ফলে আমেরিকা ইংরেজদের হস্তচ্যুত হইল এবং ঔপনিবেশিকেরা যুক্তরাজ্য নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রশাসনপ্রণালী স্থাপন করেন। ফ্রাঙ্কলিন দাসত্ব প্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৭৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাহার পর তিনি রোগশয্যায় পতিত হন। ১৭৯০ খৃঃ এপ্রিল মাসে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি হীনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার সর্ব্বদাই স্মরণ ছিল। তিনি যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না, সামান্য ভূমির জন্য বহুমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া তিনি লাভের বিষয় মনে করেন নাই। এজন্য যাহাতে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ উপস্থিত না হয় তিনি তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যেমন বিজ্ঞানের আলোচনায় তদানীন্তন সভ্যজগতে খ্যাত হইয়াছিলেন, তেমনই রাজনীতিক্ষেত্রেও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ফ্রেডেরিক দি গ্রেট—প্রুষিয়ার বিখ্যাত সম্রাট্। ১৭১২ খৃঃ ২৪শে জানুয়ারি ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ফ্রেডেরিক ১ম উইলিয়ম। ইঁহার জন্মের এক বৎসর পরে তদীয় পিতামহ রাজা ফ্রেডেরিকের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ রাজা জাঁকজমক খুব ভাল বাসিতেন। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর পিতা ফ্রেডেরিক ১ম উইলিয়ম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পিতা অতি যত্নের সহিত পুত্রের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শারীরিক শিক্ষার ফলে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট্ যুদ্ধ বিদ্যায় অত্যন্ত প্রাজ্ঞ হইয়া উঠেন। রাজা ফ্রেডেরিক অত্যন্ত শিকারনিপুণ, আমোদ ও রহস্যপ্রিয় এবং শিক্ষিত ছিলেন; তিনি সর্ব্বদা বহুসংখ্যক কৌতুকপ্রিয় লোক দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। রাজার ইচ্ছা ছিল যে, পুত্র উইলিয়মও এই আমোদ ও রহস্যপ্রিয় লোকদিগের সহিত যোগ দেন, কিন্তু যুবরাজ উইলিয়ম ইহাতে সম্মত হইলেন না; রাজা একটু বিরক্ত হইলেন। পার্শ্বচরগণ রাজাকে বুঝাইলেন যে, যুবরাজ তদপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া তাঁহাকে একটু হেয় জ্ঞান করেন। রাণী ইংলণ্ডের রাজা ১ম জর্জ্জের কন্যা। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, যুবরাজ ফ্রেডেরিক দি গ্রেট্ ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের কন্যাকে বিবাহ করেন; যুবরাজও মাতার মতানুবর্ত্তী ছিলেন। রাজার পার্শ্বচরগণ, যাহাতে এ বিবাহ না হয় তজ্জন্য রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এদিকে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটও মনে করিলেন যে, ইংলণ্ডের সহিত প্রুষিয়ার ঘনিষ্ঠতা হওয়া তাঁহার রাজ্যের পক্ষেও বিপজ্জনক; এজন্য তিনি একজন বুদ্ধিমান্ সভাসদ্কে প্রুষিয়ারাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই দুই দিকের পরামর্শে রাজার ধারণা হইল যে রাণী ও যুবরাজ তাঁহাকে রাজনৈতিক গোলযোগে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে তিনি পুত্র উইলিয়মের উপর আরও বিরক্ত হইলেন। একদিন রাজা ফ্রেডেরিক জর্ম্মনির দক্ষিণ দিকে ভ্রমণে গেলেন; ইত্যবসরে যুবরাজ উইলিয়ম ইংলণ্ডে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। একখানা বিনামা চিঠি রাজার হস্তগত হওয়ায় যুবরাজের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজা যুবরাজকে নজরবন্দী করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে সম্মুখে আনিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখে বেত্রাঘাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পলাইতেছিলে কেন?" যুবরাজ বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন, "আপনি ত আমাকে পুত্রের ন্যায় দেখেন না, আমার সহিত দাসের ন্যায় ব্যবহার করেন।" রাজা বলিলেন, "তোমার আত্মসম্মান জ্ঞান নাই।" পুত্র বলিলেন, "খুব আছে, আমার অবস্থা আপনার হইলে আপনিও এইরূপ ব্যবহার করিতেন।"

রাজা অসিনিষ্কোষিত করিয়া পুত্রকে কাটিতে গেলেন; একজন সেনাপতি তাহাতে বাধা দিলেন। রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া রাণী ও যুবরাজ উভয়ের প্রাণদণ্ড করিবেন স্থির করিলেন। রাজ-পরিবারে মহাগোল উপস্থিত হইল। সকলেই ভীত, কেহই রাজার মতের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। কেবল একটী বৃদ্ধা মহিলা রাজাকে বলিলেন, "দেখ তুমি ঘোর অন্যায় ও অধর্ম্মের কাজ করিতে চলিয়াছ; ঈশ্বর তোমাকে পুত্র দিলেন, আর তুমি ক্রোধবশে তাহাকে বধ করিতে যাইতেছ? পিটার দি গ্রেট ও দ্বিতীয় ফিলিপ এর কথা স্মরণ কর। তাঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন; নিঃসন্তান অবস্থায় উঁহাদের মৃত্যু হওয়াতে রাজ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব এ দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।" অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ও এ দুষ্কার্য্য হইতে রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রাজা দমিয়া গেলেন। যুবরাজের যে বন্ধু তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন, রাজা তাহার প্রাণ দণ্ড করিয়া কথঞ্চিৎ ক্রোধের উপশম করিলেন। কিন্তু যুবরাজকে এক দুর্গে অবরোধ করিয়া রাখা হইল, তাঁহার নিকট পুস্তক, কালী, কলম কিছুই দেওয়া হইল না। দুর্গরক্ষক সেনাপতি যুবরাজের প্রতি একটু সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এজন্য রাজা তাঁহাকে নিম্ন পদ দিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে পিতাপুত্রের মিলন হইল, রাজার ক্রোধের শান্তি হইল; আবার যুবরাজ স্বপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু রাণীর সহিত রাজার মিলন হইল না; তাঁহাদের দেখা সাক্ষাতও বন্ধ রহিল। রাজা ও রাণী বহু বৎসর পর এক টেবিলে কখন কখন আহার করিতেন বটে, কিন্তু উভয়েই নির্ব্বাক। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না। এই সমুদয় বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যুবরাজ সমস্ত ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন শিক্ষা করিলেন। যুবরাজ জর্ম্মান সম্রাটের এক আত্মীয়াকে বিবাহ করাতে রাজার ইংরেজভীতি দূর হইল। অষ্ট্রিয়ারাজের চক্রান্তে যুবরাজকে এই বিবাহে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। কাজেই অনভিপ্রেত বিবাহের ফল ভাল হইল না। যুবরাজ পত্নীকে ভাল বাসিতেন না এবং বিশ্বাস করিতেন না। যুবরাজকে এক দল সেনার অধিনায়ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তিনি এই কার্য্যে থাকিয়া বেশ সুযশ অর্জ্জন করেন। ১৭৪০ খৃঃ ৩১শে মে রাজা ফ্রেডেরিক পরলোক গমন করেন। ঐ তারিখেই যুবরাজ ১ম উইলিয়ম ফ্রেডেরিক নামে প্রুষিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। উইলিয়ম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যে বন্ধু "কেটি" (Keite) তাঁহার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহার পিতাকে অতি সম্ভ্রান্ত কাউণ্ট পদবীতে উন্নীত করেন। রাজা ফ্রেডেরিক যুবরাজ ফ্রেডেরিকের প্রাইভেট্ শিক্ষককে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যুবরাজ রাজা হইয়া শিক্ষককে আনাইলেন এবং তাঁহার জন্য প্রচুর বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। অপর দুইজন বন্ধু (Keith and Munchow) পলায়ন করিয়া রাজার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন।

সিংহাসনে আরোহণের অনতিবিলম্বেই একটী স্থানের অধিকার লইয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধ ১৭৪১ হইতে ১৭৪৭ খৃঃ পর্য্যন্ত হয়। বহু যুদ্ধের পর উইলিয়ম জয়লাভ করেন। আয়েলাসেপেল নামক স্থানে ১৭৪৮ খৃঃ উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। এই যুদ্ধে প্রুষীয় সৈন্যের বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত ইয়োরোপ স্তম্ভিত হইয়াছিল। ইহার পর ৮ বৎসর শান্তিতে কাটিয়া যায়, এই ৮ বৎসর ফ্রেডেরিক রাজ্যের অনেক সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের বন্দোবস্ত করেন। তিনি নিজে দেখিয়া শুনিয়া সমুদয় কার্য্য করিতেন। একদিন একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগ মঞ্জুর করিবার জন্য তাঁহার নিকট এক সেক্রেটারী কাগজ লইয়া উপস্থিত হন; কিন্তু সম্রাট্ নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করিলেন না। তিনি এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া সেক্রেটারীকে বলিলেন, "দেখ এই ব্যক্তি এক খণ্ড সামান্য ভূমি লইয়া তাঁহার মাতার সহিত মোকদ্দমা করিয়াছিল এবং মাতাকে তাঁহার মৃত্যু শয্যায় শপথ করাইয়া জবানবন্দী করাইয়াছিল। এই ব্যক্তিদ্বারা কিরূপে আমার প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে?" এই বলিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির নিয়োগ রহিত করিলেন। একদা তিনি ছদ্মবেশে জনৈক বংশীবাদকের বেশ ধারণ করিয়া এক

উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী ও একটী অল্পবয়স্ক চাকর সঙ্গে নিয়া হলণ্ড রাজ্যের চিত্রশালিকা দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রাজ্যের কয়েকজন পদস্থ লোক, পোলণ্ড ও স্যাক্সনির রাজা, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্, রুষিয়ার সম্রাট্ ও ফরাসী সম্রাট্ এই সকলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহারা এই সমুদয় রাজাদিগকে এক সময়ে প্রুষিয়া আক্রমণের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। চতুর উইলিয়ম ইহা বুঝিতে পারেন, এবং অবিলম্বে স্যাক্সনি আক্রমণ করেন। (১৭৫৬ খৃঃ)। তৎপরবর্ত্তী বৎসর (১৭৫৭ খৃঃ) অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এই যুদ্ধেও ফ্রেডেরিক জয়লাভ করেন। তাঁহার ২২০০০ সৈন্য অষ্ট্রিয়ার ৬৪ হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে। অষ্ট্রিয়ার ৮০০০ সৈন্য যুদ্ধে হত হয়। যুদ্ধাবসানে উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। অতঃপর ১৭৫৮ খৃঃ ১৪ই অক্টোবর অষ্ট্রিয়ার সৈন্য রাত্রিকালে ফ্রেডেরিকের শিবির হঠাৎ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ফ্রেডেরিকের ৯০০০ সৈন্য হত ও ১০১টী কামান বিপক্ষের হস্তগত হয়। ১৭৫৯ খৃঃ ফ্রেডেরিক ফ্রেঙ্কফোর্ট সহরের নিকট রুষীয়সৈন্যকে পরাস্ত করেন; কিন্তু যখন তিনি ক্লান্ত সৈন্য লইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন আবার রুষীয়সৈন্যদ্বারা অক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণ পরাভূত হন। এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফ্রেডেরিক অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়েন। অষ্ট্রিয়া ও রুষিয়ার নিকট পরাজিত হইয়া তিনি ১৮০০০ সৈন্য ও ১৭২টা কামান হারাইয়াছিলেন। ইহার পর আর এক যুদ্ধে ১২০০০ সৈন্য অষ্ট্রিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করে, ইহাতেও ফ্রেডেরিক শত্রু পক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন না। তৎপরবর্ত্তী বৎসর তিনি বহুযুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই বৎসর রুষিয়ার রাণীর মৃত্যু হওয়াতে রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ থামিয়া যায়। ফরাসী ও ইংরেজে সন্ধি হওয়াতে ফরাসীর সহিত যুদ্ধ থামিয়া যায়। এখন একমাত্র অষ্ট্রিয়ার রাণী মেরিয়াথেরেসা যুদ্ধক্ষেত্রে রহিলেন। তিনিও অবশেষে নানা স্থানে পরাজিত হইয়া ১৭৬৩ খৃঃ সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সমুদয় যুদ্ধে জয়লাভ করাতে তাঁহাকে সকলে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট্ বলিত। তিনি ১৭৮৬ খৃঃ ৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

ফ্রোবেল—বিখ্যাত জর্ম্মনদেশীয় শিক্ষাসংস্কারক। ইঁহার পূর্ণ নাম ফ্রেডেরিক উইলহেলম আগষ্ট ফ্রোবেল। ইনি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবয়িতা। ইনি ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রেল জর্ম্মনীর অন্তর্গত থুরিঙ্গিয়া প্রদেশে ওবার উইচ্ব্যাক (Oberweissbach) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। ইঁহার উদ্ভাবিত "কিণ্ডার গার্টেন" (Kindergarten) প্রণালীকে ফ্রোবেল প্রণালীও (Froebel system) বলা হইয়া থাকে। তিনি পিতৃবিয়োগের পর জীবিকার্জ্জনের জন্য ২০শ বর্ষ বয়সে পাঠ পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে গমন করেন। তিনি প্রথমে এক কৃষকের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থ গমন করেন। তৎপরে ইহা পরিত্যাগ করিয়া বনবিভাগে সামান্য কর্ম্ম গ্রহণ করেন, অনন্তর তিনি নেপোলিয়নের মস্কো হইতে দেশে প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে ভলণ্টিয়ার সৈন্য দলভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। প্রথম শিক্ষার্থীরা সৈন্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ, কর্ত্তব্যনিরত ও নিয়মানুবর্ত্তী না হইলে উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে না; ইহা তিনি রণক্ষেত্রে থাকিয়া ধারণা করেন। তৎপর তিনি এক অধ্যাপকের নিকট গণিত এবং দর্শন শিক্ষা করেন। অবশেষে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা করিবার অভিলাষে তিনি গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এইরূপে নানা বিভাগে শিক্ষা লাভ করিয়া ও কর্ম্ম করিয়া তাঁহার মনে এই ধারণা হইল যে, মানবের প্রকৃত শিক্ষার সময় বাল্যকালের প্রথম সাত বৎসর। ৭ বৎসরের পূর্ব্বেই মানবমনের বৃত্তিগুলি সম্যক্ বিকশিত করা আবশ্যক। তিনি মানব জীবনের শিক্ষাকাল তিন ভাগে বিভক্ত করেন। কিণ্ডারগার্টেন কাল ৩য় বর্ষ হইতে ৭ম বর্ষ পর্য্যন্ত; স্কুলে শিক্ষার কাল ৭ বর্ষ হইতে ১৮ বর্ষ এবং উচ্চশিক্ষার কাল ১৮ বর্ষ হইতে তদূর্দ্ধ বয়স। তিনি অল্পবয়স্ক বালককে অধিক পড়ার চাপ দিতে নিষেধ করেন। তাঁহার মতে জ্ঞানার্জ্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানসিক শক্তির বিকাশ সম্পাদন। তিনি বলেন যে, অল্প বয়সে পড়ার চাপ দিলে তাহাতে বালকের মানসিক শক্তি ক্ষীণ হয়। অঙ্গচালনার সময় না পাওয়াতে শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মে এবং উদ্ভাবনী শক্তির

প্রয়োগ করিতে বালককে অবসর দেওয়া হয় না। তাঁহার প্রণালীর মূল লক্ষ্য, কার্য্য দ্বারা মানসিক ও শারীরিক শক্তির উন্নতি সাধন। ফ্রোবেল তদানীন্তন সুইজর্লণ্ডবাসী বিখ্যাত শিক্ষাসংস্কারক পেষ্টালজির ছাত্র। তিনি ১৮০৮ খৃঃ হইতে ১৮১০ খৃঃ পর্য্যন্ত পেষ্টালজির নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মানবের শিক্ষা (Education of Man) নামে তাঁহার প্রধান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্লাঙ্কেনবর্গ নামক স্থানে প্রথম কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ফ্রোবেলমতাবলম্বীরা এই স্থানকেই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর উদ্ভব ক্ষেত্র বলিয়া প্রকাশ করেন। পেষ্টালজি ও ফ্রোবেল উভয়েই বলেন যে যেখানে জীবনীশক্তি আছে সেখানেই গতি শক্তি বা কার্য্যকরী শক্তিও বর্ত্তমান আছে (Wherever there is life, there must be motion or activity)। জন্মিবামাত্রই শিশু নিম্নলিখিত তিনটি শক্তির অধীন হয়। যথা ঃ—

(১) চেতন ও জড় প্রকৃতি (Animate and inanimate nature)

(২) মনুষ্যত্ব (Humanity)

(৩) ঐশী শক্তি (Power that pervades and directs these—উপরিউক্ত উভয় শক্তির চালক)।

বালকের শরীর প্রকৃতির সহিত, তদীয় মন ও হৃদয় (Mind and heart) মনুষ্যত্বের সহিত এবং তাহার আত্মা (Soul) পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বা সম্পর্কযুক্ত। বালক বাহ্য প্রকৃতির সাহায্যে বর্দ্ধিত হয় এবং ধীরে ধীরে তাহার মানসিক শক্তি ও গুণসমূহের পরস্পর বিকাশ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। অবশেষে সে দেখিতে পায় যে, পরমপিতার এক নির্দ্দিষ্ট সাধারণ নিয়মে এই মানবজগত চালিত হইতেছে। বালকের ক্রীড়ার সামগ্রীগুলি উপযুক্তরূপে স্থাপনেই (Organisation) ফ্রোবেলের কৃতিত্ব। তিনি ক্রীড়া ও ক্রীড়াসামগ্রী এবং কর্ম্ম-সঙ্গীত দ্বারা (Games, gifts and songs) এমন সুন্দররূপে মানসিকশক্তি বিকাশের পথ দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত সভ্যজগৎ তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি রাখিতে বলেন—(১) ছাত্রদের বসিবার আসন, (২) শিক্ষকের বসিবার আসন ও ডেস্ক, (৩) ব্লাক্‌বোর্ড (Black board), (৪) শিক্ষকের পুস্তক রাখিবার জন্য বুক্‌কেস্ (Book case) অর্থাৎ পুস্তকাধার, (৫) একটী ঘড়ি। তিনি ত্রয়োবিংশ বর্ষ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে "আজন্ম শিক্ষক" (Born teacher) বলিলেও বেশী বলা হয় না। তিনি শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই শিক্ষা প্রণালীর দোষ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই দোষ দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ফ্রোবেলের উদ্ভাবিত প্রণালী দ্বারা পেষ্টালজির প্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। শিক্ষাদান কার্য্যে একদিকে যেমন শারীরিক ও মানসিক শক্তির যুগপৎ প্রয়োগ আবশ্যক অপরদিকে তেমনি সৈন্যের ন্যায় তেজস্বিতা ও নিয়মপরায়ণতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত মানসিক শক্তির চালনা ও অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিলে কেবল শিশুদিগের কেন, যুবকদিগেরও উহা বিরক্তিকর হয়। ফ্রোবেল বিদ্যালয়কে প্রমোদাগারে পরিণত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। খেলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই তদীয় শিক্ষা-প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য।

ফ্রোবেলের শিষ্যেরা বলেন, শাসনের তিনটী অঙ্গ; (১) নিয়মাবলী প্রণয়ন, (২) দোষ পরিদর্শন, (৩) দণ্ডদান। প্রথমটী ব্যবস্থাপকের, দ্বিতীয়টী পুলিশের এবং তৃতীয়টী বিচারকোর্টের কার্য্য।

প্রত্যেক বিদ্যালয় একটী নিয়মতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্য। বিদ্যালয়ের কর্ত্তা কোন ক্ষমতাই নিজহস্তে না রাখিয়া এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিবেন, যাহাতে বিদ্যালয়ের কার্য্য যন্ত্রের ন্যায় চলে। নিয়মগুলি অবশ্য সরল ও সকলের বোধগম্য হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, শিশুরা স্বভাবতঃই চঞ্চল; নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে পারে না, কোন না কোন একটী কাজ হাতে থাকা চাই। এই স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তির চালনা হইতেই শিশুদের শিক্ষারম্ভ হওয়া উচিত। তিনি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শিক্ষাদানচ্ছলে শিশুদের জন্য ধারাবাহিক কয়েকটী কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যগুলিকে তিনি "ক্রীড়া" (Play) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শিশুদের প্রথম শিক্ষা ক্রীড়ামূলক হওয়া উচিত। এই ক্রীড়াগুলি তিনি ক্রমান্বয়ে এরূপভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন যে, একটা অভ্যস্ত হইলে তাহার পরবর্ত্তীটাও শিশুদের অনায়াসসাধ্য ও প্রিয় হইয়া উঠে। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রীড়া পরবর্ত্তী ক্রীড়ার ভিত্তিস্বরূপ। অতি সরল হইতে আরম্ভ করিয়া অতি কঠিন বিষয়ের অনুশীলনে শিশুর শৈশবশিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় এবং উহা এই শিক্ষা হইতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পুষ্টি সাধনের হেতু হইয়া স্কুলে এবং সংসারক্ষেত্রে সফলতা লাভের সহায় হয়।

তিনি কিণ্ডারগার্টেন শব্দের অর্থ শিশূদ্যান করিয়াছেন। বাগানে যেরূপ মালীর যত্নে বৃক্ষসকল বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় সেইরূপ শিশূদ্যানেও শিশুগণ শিক্ষকরূপ মালীর যত্নে বর্দ্ধিত ও শিক্ষাপুষ্ট হইয়া থাকে।

ব

বাইরণ — (Byron) ইংরেজ কবি। ইনি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে "চাইল্ড হেরল্ড" (Child Harold), "মানফ্রেড" (Manfred) প্রভৃতি কয়েকখানা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিলাতে সম্ভ্রান্ত (Lord) পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজে নিজের গৌরব করিতেন।

বায়েজিদ্ (প্রথম)—তুরস্কের বিখ্যাত সুলতান। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতার মৃত্যুর পর সুলতান পদবী লাভ করেন। তিনি বুলগেরিয়া, মাসিডোনিয়া ও থেসেলি জয় করেন এবং কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাটকে পরাজিত করিয়া স্বীয় করদ নৃপতি করেন। এই সময়ে বিখ্যাত আমির তৈমুর (তৈমুর লঙ্গ) তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। (আমির-তৈমুর দেখ)। তিনি তৈমুরের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া বন্দী হন এবং লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া বন্দিদশাতেই দেহত্যাগ করেন (১৪০৩ খৃষ্টাব্দ ৮ই মার্চ্চ)। বায়েজিদ্ বন্দী হইয়া যখন তৈমুরের সম্মুখে নীত হন, তখন তৈমুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি তিনি জয়ী হইতেন তবে তৈমুরকে কি করিতেন? বায়েজিদ গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিলেন, "আপনাকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিতাম।" তৈমুর উত্তর করিলেন "তবে আপনারও সেই দশাই হউক।" এই বলিয়া তৈমুর বায়েজিদকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। বায়েজিদের সহিত তদীয় পুত্র মুসাও তৈমুরের তাম্বুতে বন্দী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মুসা তাঁহার মৃতদেহ ব্রুসাতে লইয়া গিয়া সমাহিত করেন।

বায়েজিদ (দ্বিতীয়)—তুরস্কের সম্রাট্। ইঁহার পিতা ২য় মোহাম্মদ কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাট। ইনি পিতার মৃত্যুর পর ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কনষ্টাণ্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য অশেষ যত্ন করিতেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে পুত্র দুরাত্মা (প্রথম) সলিম (Salim I) ইঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন।

বার্ক (এড্মণ্ড)—ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বাগ্মিতায় ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এত বড় লোক আর পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন নাই। তিনি একজন প্রধান নীতিশাস্ত্রবিদ্ ও সুলেখক ছিলেন। ইনি ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী বিকন্‌স্‌ফিল্ড নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আয়র্লণ্ডের প্রধান নগর ডাবলিনের একজন এটর্ণি ছিলেন। বার্ক ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ডাবলিন নগরের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে বি, এ,

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে আইন শিক্ষা করিতে আগমন করেন। তিনি ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে মিডল্ টেম্পল্ (Middle Temple) হইতে ব্যারিষ্টারি সনদ প্রাপ্ত হন। ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগে নাই, তথাপি কতক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি উহাতে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিষ্টলের প্রতিনিধি হইয়া পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিনি ৪০০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিলাত গেলে পর, এডমাণ্ড বার্ক তাঁহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস বহুকষ্টে নিষ্কৃতি পাইলেও এই মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার আর বিলাতের গবর্ণমেণ্ট অধীনে কর্ম্ম পাওয়ার কোন আশা রহিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে মোকদ্দমা খরচ বাবদ ৭০০০ পাউণ্ড দিয়াছিলেন এবং কিছু পেন্‌সনও দিয়াছিলেন ; ইহাতেই অতিকষ্টে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস তাঁহার জ্বালাময় জীবন ত্যাগ করেন। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সহিত যখন ইংলণ্ডের বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন বার্ক পার্লেমেণ্টে দীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া ইংরেজ জাতিকে আমেরিকার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; তাঁহার কথা না শুনিয়া ইংরেজরাজ যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন ও তাহার ফলে আমেরিকা হারাইলেন, যুক্তরাজ্য স্বাধীনতা লাভ করিল।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রাজা ও রাণীর প্রাণবিনাশক অত্যাচারপরায়ণ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বার্ক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধসকল পাঠ করিয়া ইংরেজরাজ তাঁহার জন্য কিছু পেন্সন মঞ্জুর করেন। তিনি অর্থাভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়াতে এই পেন্সন গ্রহণে সম্মত হন। এই সময়ে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চিরসহচর রেনল্ড সাহেব পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যু সময় প্রিয় বন্ধু বার্ককে ২০০০ পাউণ্ড দান করিয়া যান। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এই ন্যায়পরায়ণ বিখ্যাত বাগ্মী দেহত্যাগ করেন। তিনি উৎপীড়িতের সহায় ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় পদবিন্যাসের সৌন্দর্য্য, ভাষার তেজ ও ভাবের গভীরতা অতি প্রশংসার্হ। তাঁহার একমাত্র পুত্র যৌবন কালেই দেহত্যাগ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুলাই বিকন্‌সফিল্ড ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহার নামে এক প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে। লর্ড রোজবারি এই প্রস্তরফলক উন্মোচন কালে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিসমার্ক (প্রিন্স)—জার্ম্মনসাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। এই বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই। এক্ষণ জার্ম্মন সাম্রাজ্য যেমন অবিভক্ত ও এক সম্রাটের অধীন, প্রিন্স বিসমার্কের শৈশবকালে তদ্রূপ ছিল না। তখন প্রুষিয়া ও জর্ম্মনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বা জমিদারীতে বিভক্ত ছিল। প্রিন্স বিসমার্কের কৌশলে ও পরামর্শে ঐ সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মিলিত হইয়া এক সম্রাটের অধীন হয়। এই সম্মিলিত রাজ্যের নাম জার্ম্মনসাম্রাজ্য। বর্ত্তমান জার্ম্মন সম্রাটের পিতামহ প্রথম উইলিয়ম এই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট্ এবং বিসমার্ক তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। জার্ম্মন সাম্রাজ্য সংগঠনের পর বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফ্রান্সের দর্পচূর্ণ করা বিসমার্কের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিড্‌নি নামক স্থানে ফরাসীরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। উইলিয়ম ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া ঐ রাজ্যের সমুদ্রোপকূলস্থ বন্দর মার্শেল নামক নগরে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির হস্তে প্রুষিয়ার রাণী অপমানিত হইয়াছিলেন, এই কার্য্যদ্বারা জর্ম্মনেরা তাহার প্রতিশোধ লইলেন। প্রায় ৪০ বৎসর কাল প্রিন্স বিসমার্ক ইউ-রোপের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতা ছিলেন।

বেকন (লর্ড)—ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। ইনি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিকোলাস বেকন। রাণী এলিজাবেথ ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি ইঁহার বাল্যজীবনেই ভাবী উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন।

এই সময়ে এরিষ্টটলের দার্শনিক মতই ইংলণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত ছিল। বেকন কলেজে অধ্যয়ন সময়েই এই দার্শনিক মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি ফ্রান্সে গমন করেন এবং সেখানে অবস্থান কালে "ইয়োরোপের অবস্থা" (State of Europe) শীর্ষক এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স উনবিংশ বৎসর মাত্র। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে আগমন করিয়া আইন অধ্যয়ন করেন এবং ব্যারিষ্টার হন। এই সময়ে তিনি "আর্ল অব এসেক্স" নামধেয় তদানীন্তন বিখ্যাত, কিন্তু দুর্ভাগ্য জমিদারের অনুগ্রহ লাভ করেন। উক্ত জমিদার প্রথমে রাণী এলিজাবেথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু অবশেষে রাণীর কোপে পতিত হইয়া প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই খ্যাতনামা আর্ল অব এসেক্স বেকনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ এক খণ্ড জমিদারী দান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সদাশয় আর্লের বিপত্তি সময়ে বেকন অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই অকৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া এবং তদীয় জ্ঞান গরিমা ও প্রতিভার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনৈক ইংরেজ কবি বেকন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—The wisest, brightest, meanest of mankind" অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী, প্রতিভাবান্ কিন্তু নীচমনা। ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে বেকন মিড্‌ল সেক্সের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। এই সভার সভ্যরূপে তিনি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন; ইহাতে তিনি রাণী এলিজাবেথের একটু অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। বিখ্যাত লেখক বেন জনসন (Benjonson) তাঁহার বক্তৃতার সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"No man ever spoke more neatly, more pressly, more weightily, or suffered less emptiness, less idleness, in what he uttered. His hearers could not cough or look aside from him without loss." অর্থাৎ পার্লেমেণ্টে উপস্থিত সভাগণ তাঁহার বক্তৃতা নিঃশব্দে অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন; তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী এবং তাঁহার উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ সারবান ও অর্থগৌরবসম্পন্ন ছিল। রাজা প্রথম জেমস্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এটর্নি জেনারেল (Attorney General) পদ লাভ করেন এবং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রেটব্রিটেনের "হাইচ্যান্সেলার (High Chancelor of Great Britain) পদে উন্নীত হন এবং এই বৎসরেই তিনি সম্ভ্রান্ত পদবীতে (লর্ড উপাধি) ভূষিত হন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "Novum organum" প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সমগ্র ইয়োরোপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি এখন উন্নতি ও সৌভাগ্যের শেষ সীমায় উঠিয়াছেন। ইহার পরই তাঁহার পতন। তিনি বিচারপতি হইয়া উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বিচারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। তিনি বিচারকগণের নিকট উৎকোচ গ্রহণের অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং আত্মপক্ষসমর্থনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বিচারে তাঁহার ৪০ হাজার পাউণ্ড অর্থদণ্ড ও কারাবাসের আদেশ হইল। কয়েকদিন কারাবাসের পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং অর্থদণ্ড রহিত করা হয়। রাজা প্রথম চার্লস্ তাঁহাকে পুনর্ব্বার পার্লেমেণ্টে প্রবেশের জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু তিনি এই অপমানের পর আর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন না; নির্জ্জনে থাকিতেই সঙ্কল্প করিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। ঘুষ গ্রহণ ব্যাপারে তাঁহার কর্ম্মচারিগণই অধিক পরিমাণে দায়ী। তাঁহার বিচারের সময় একদিন তিনি বিচারালয়ের কোন প্রকোষ্ঠ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণ গাত্রোত্থান করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, "তোমরা বস, তোমাদের উত্থানই আমার পতনের কারণ।" (Sit down, my masters, your rise hath been my fall")

ব্রাইট (জন)—(Jhon Bright) এই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ইংলণ্ডের অন্তর্গত ল্যাঙ্কাসায়রে "রকডেল" নামক স্থানে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ১১ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন রোমে যেরূপ "ট্রিবিউন"গণ, বর্ত্তমান রুষিয়াতে

যেরূপ টলষ্টই, ইংলণ্ডে সেইরূপ জন ব্রাইট প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া জগতে পরিচিত। পার্লেমেণ্টে কমন্স সভার সভ্যগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার শিক্ষা অতি সামান্য ছিল; তিনি ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্কুলে ভর্ত্তি হন নাই। স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া তিনি তাঁহার পিতার কারখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তন্তুবয়ন ও কার্পেট প্রস্তুতের ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এলিজাবেথ নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি পার্লেমেণ্টে প্রজার প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করেন। এই সময়ে পার্লেমেণ্টের বিখ্যাত সভ্য "কবডেনের" সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এক হওয়াতে তাঁহারা বন্ধুভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। উভয়েই বাগ্মী, উভয়েই প্রজাসাধারণের পক্ষপাতী এবং উভয়েই প্রবলের অত্যাচার হইতে প্রজাকুলের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র। "শস্য আইনের" (Corn Law) প্রতিকূলে বিলাতে যে সকল লোক আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের আন্দোলনের ফলে এই প্রজাপীড়ক আইন রহিত হয়, "রিচার্ড কবডেন" (Richard Cobden) তাঁহাদের অগ্রণী। জন ব্রাইট তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন এই উভয়ের বক্তৃতায় ও বাগ্মীতায় দেশ মুগ্ধ হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃঃ ব্রাইট সাহেবের পত্নীবিয়োগ হয়। তিনি যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ ক্রিমিয়াতে রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ হয়। এই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ না করিতে পরামর্শ দিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে নরহত্যা অমানুষিক পাশব অত্যাচার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি দাসব্যবসায়ের বিরোধী ছিলেন; আমেরিকা হইতে দাসব্যবসা উঠিয়া গেলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ তিনি বর্ম্মিংহামের উদারনৈতিকদলের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। এই ক্ষেত্রে লর্ড রেনডল্ফ চার্চ্চিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ যখন বিখ্যাত মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন "হোমরুল বিল" (Home Rule Bill) উপস্থিত করেন, তখন ব্রাইট উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। রক্ষণশীলদল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; ইহার উপর আবার ব্রাইট "হোমরুলের" বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়াতে গ্লাড্‌ষ্টোনের চিরপোষিত বিল আর বিধিবদ্ধ হইল না। "হোমরুল" আন্দোলনের পূর্ব্বে তিনি সর্ব্বদা গ্লাড্‌ষ্টোনের পার্শ্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ১৭৬৭ খৃঃ গ্লাড্‌ষ্টোন তাঁহাকে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরীর পদ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাহেতু ব্রাইট উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। ১৮৮৯ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

ব্রুস (রবার্ট—Robert Bruce)—এই বিখ্যাত পুরুষ স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা সমরের অন্যতম নেতা। এই স্বাধীনতা সমরের কারণ ও প্রারম্ভ "ওয়ালেসের" জীবনীতে দৃষ্ট হইবে (ওয়ালেস দেখ)। প্রতিভাসম্পন্ন, যুদ্ধ-বিশারদ ব্রুসের সময়ে এই লোকনাশক সমরের অবসান হয়। ইঁহার পিতামহ আনানডেলের জমিদার রবার্ট ব্রুস স্কটলণ্ডের রাজা তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর স্কটলণ্ডের সিংহাসন দাবী করেন। "বেলিয়ল" নামে অপর এক ব্যক্তিও ঐ সিংহাসন দাবী করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এড্‌ওয়ার্ড এই ব্যাপারের মধ্যস্থতা করিতে যাইয়া স্বয়ংই স্কটলণ্ডের সিংহাসন দাবী করেন এবং রাজা অধিকারের জন্য স্কটলণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি বেলিয়লকে স্কটলণ্ডের এক প্রদেশের সামন্ত রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; বেলিয়লও ইহাতে সম্মত হইয়া নিজকে এড্‌ওয়ার্ডের অধীন রাজা বলিয়া বিজ্ঞাপিত করেন। কিন্তু স্কটলণ্ডের অন্যান্য জমিদার, মধ্যবিত্ত লোক ও জনসাধারণ এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা ইংরেজকে স্কটলণ্ডের অধিপতি বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। উভয় রাজ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। স্কটলণ্ডবাসীরা সার উইলিয়ম ওয়ালেসের নেতৃত্বে যুদ্ধ করিল, রক্তারক্তির একশেষ হইল; বহু সহস্র সৈন্যের রক্তে মেদিনী প্লাবিত হইল। অবশেষে ওয়ালেস ১৩০৫ খৃঃ ধৃত ও নিহত হইলেন। এখানেই এই যুদ্ধের প্রথমাঙ্ক শেষ হয়। রবার্ট ব্রুস ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন ও বেলিয়ল ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন। রবার্ট ব্রুসের পুত্র ২য় ব্রুসও ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র

এই প্রবন্ধের আলোচ্য রবার্ট ব্রুস (৩য় ব্রুস) আর্ল অব কেরিক নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্কটলণ্ডবাসীদের অগ্রণী হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তিনি "স্কোন" নামক স্থানে যথারীতি মুকুট ধারণপূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার সহিত নানাস্থানে যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এড্ওয়ার্ডের মৃত্যু হইয়াছে; দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; ব্রুস পরাজিত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ৬ বার পরাজিত হইয়া ব্রুস বিমর্ষভাবে যুদ্ধের বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, একটা মাকড়শা ৬ বার জাল বুনাইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ৭ম বারে কৃতকার্য্য হইল। ইহা দেখিয়াই ব্রুস লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমার বিমর্ষ হওয়ার কারণ নাই, ৭ম বারে আমিও মাকড়শার ন্যায় কৃতকার্য্য হইব।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে "বেনকবার্ণ" ক্ষেত্রে ইংরেজরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রায় একলক্ষ সৈন্য হতাহত হয়। ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। ব্রুস তাঁহাদিগের শবদেহ অতি সম্মানের সহিত সমাহিত করেন। ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা আবার স্কটলণ্ডে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এইরূপে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিয়া রবার্ট ব্রুস ১৩২৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে দেহত্যাগ করেন।



ভল্টেয়ার—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। তিনি ফ্রান্সের অন্তর্গত সাটিনে নগরে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া ফরাসী সাহিত্যের অশেষ উন্নতি সাধন করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিশ নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ভার্জ্জিল—বিখ্যাত রোমীয় কবি। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম ইনিয়ড (Æneid)। ইংরেজ কবি ড্রাইডেন (Dryden), পিট (Pitt) এবং ওয়ার্টন (Warton) এই কাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ইনিয়ড্ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। এই কাব্য লিখিয়া ভার্জ্জিল জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি ৭০ পূঃ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

ভিক্টোরিয়া (মহারাণী)—মহারাণীর পূর্ব্বনাম আলেকজেণ্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া। তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী কেন্সিংটন রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম এড্ওয়ার্ড ও মাতা জর্ম্মনীর অন্তর্গত সেক্স্কোবার্গ নামক স্থানের ডিউকতনয়া ভিক্টোরিয়া মেরিয়া লুইসা। পিতা এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের ৪র্থ পুত্র, ইনি ডিউক অব কেণ্ট নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ৪র্থ জর্জ্জ রাজা হইলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ জর্জ্জ দেহত্যাগ করিলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব ক্লারেন্স ৪র্থ উইলিয়ম নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা ৪র্থ উইলিয়মেরও কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি কঠিন রোগগ্রস্ত হন; তাঁহার বাঁচিবার আর আশা রহিল না। এই সনের ২৪শে মে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়ার অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল; তিনি এখন ইংলণ্ডের আইন অনুসারে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। উক্ত ১৮৩৭ সনের ২৪শে জুন জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়া যথারীতি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি অতি দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইয়োরোপের কোন দেশের রাজা বা রাণী এত দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। মহারাণীর সাম্রাজ্যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তাঁহার ষষ্টিবর্ষ রাজত্বসূচক "হীরকমহোৎসব" (Diamond Jubilee) সম্পন্ন হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেক্স্কোবার্গের ডিউকের পুত্র আলবার্টের সহিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ হয়। আলবার্ট মহারাণী অপেক্ষা বয়সে ৩ মাসের ছোট ছিলেন এবং সম্পর্কে মহারাণীর সাক্ষাৎ মাতুল-ভ্রাতা। এই বিবাহের ফলে মহারাণীর ৪টী পুত্র ও ৫টী কন্যা হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন জর্ম্মন সাম্রাজ্যের যুবরাজ ফ্রেডিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বর্ত্তমান জর্ম্মন সম্রাট্ ২য় উইলহেলম (Wilhelm II) উক্ত কন্যার গর্ভজাত প্রথম সন্তান ও মহারাণীর দৌহিত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মহারাণীর দ্বিতীয় সন্তান আলবার্ট এডওয়ার্ড ৭ম এডওয়ার্ড নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাণীর তৃতীয় সন্তান রাজকুমারী এলিশ (Alice)। ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহারাণীর ৪র্থ সন্তান রাজকুমার আল্‌ফ্রেডে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সেক্‌সকোবার্গে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তথাকার "ডিউক" পদে আসীন আছেন। মহারাণীর পঞ্চম সন্তান রাজকুমারী হেলেনা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই কন্যার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে ৩ পুত্র ও ২ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহারাণীর ষষ্ঠ সন্তান রাজকুমারী লুইস ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু ইঁহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। মহারাণীর ৭ম সন্তান রাজকুমার আর্থার ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র ডিউক অব কনট নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। মহারাণীর ৮ম সন্তান রাজকুমার লিওপোল্ড ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডিউক অব আলবানী নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। মহারাণীর ৯ম সন্তান রাজকুমারী বিয়াট্রিস ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যগতিকে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৈধব্যদশাগ্রস্ত হন। ইঁহার গর্ভে ৩ পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহারাণী পরম দয়াশীলা ও পতিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনে সর্ব্বদাই তাঁহার উদারতা, দয়া ও সরলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের সমুদয় প্রজার দিকে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি ছিল। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৬½ ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আদর্শ কতকটা আর্য্যনারীর ন্যায় ছিল। ইংলণ্ডের জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করাতে মহারাণীর অতিশয় বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন।

ম

মনসুর হাল্লাজ—সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ ইঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইঁহার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, ইনি সাধু ছিলেন; আবার কেহ বলেন, ইনি যাদুকর; যাদুবিদ্যা প্রভাবে সাধুত্বের ভাণ করিয়া লোক ঠকাইতেন। ৯২২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ্চ বাগদাদের খলিফা ইঁহাকে শেষোক্তরূপ বিবেচনা করিয়া ইঁহার প্রাণদণ্ড করেন। অতি নৃশংসরূপে ইঁহাকে হত্যা করা হয়। প্রথমে ইঁহার হাত, তৎপর পা এবং অবশেষে মস্তক ছেদন করিয়া টাইগ্রিস নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, একজন ধার্ম্মিক সুফি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাধু হাল্লাজকে কেন এত কষ্ট দেওয়া হইল?" উত্তরে ঈশ্বর বলেন, "গোপনীয় সত্যের প্রকাশকের (Revealer of Secrets) ইহাই উপযুক্ত শাস্তি।"

মাসুউদি—এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ, লঙ্কা এবং চীনসাম্রাজ্যের উপকূল প্রদেশ ভ্রমণ করেন। ইঁহার রচিত বৃহৎ গ্রন্থ মদান-উল্-জওয়াহির (মণির খনি) তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ২০ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। ডাক্তার স্প্রেঙ্গার (Dr. Sprenger) এই প্রথম ভাগের অনুবাদ করিয়াছেন। ৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মাসুম-আলী-শাহ (মীর)—সুফি সম্প্রদায়ের বিখ্যাত উপদেষ্টা (Sufi Teacher)। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী বিখ্যাত সৈয়দ্ আলী রেজার শিষ্য। করিম খাঁর শাসনকালে তিনি ভারতবর্ষ হইতে সিরাজে গমন করেন। এখানে ৩০ হাজার লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এখানে গোঁড়া পুরোহিতগণ ইঁহার শত্রু হইয়া পড়ে। তাঁহাদের

অনুরোধে করিম খাঁ ইঁহাকে স্বীয় রাজধানী হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহার কিছুকাল পরে আলীমুরাদ খাঁর শাসনকালে পুরোহিতগণ স্মৃফি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেন। ইঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া ইস্পাহানের রাজা আলী-মুরাদ খাঁ মীর মাসুম-আলী-সাহেব ও তদীয় শিষ্যগণের নাককাণ কাটিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ দেন। নিরক্ষর সৈন্যগণ রাজার আদেশ পালন করিতে যাইয়া অনেক নিরপরাধ সাধু লোকেরও নাককাণ কাটিয়া ফেলে। মীর মাসুম আলী পলায়ন করিয়া কিরমানশা (Kirmanshah) নামক স্থানে গমন করেন। তথায় উপাসনাকালে তিনি এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। শত্রুগণের বহুচেষ্টাতেও মাসুম আলীর শিষ্যগণের পতন হয় না; বরং শিষ্যগণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ৬০ হাজার পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

মাহ্‌মুদ (২য়)—তুরস্কের সম্রাট্। ইনি সুলতান আব্দুল হামিদের পুত্র। ১৭৮৫ খ্রীঃ ২০শে জুলাই ইঁহার জন্ম হয়। গ্রীস দীর্ঘকাল তুরস্কের অধীন ছিল; ইঁহার শাসনকালে গ্রীস তুরস্কের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের অধীনতা-পাশ ছেদন করে (১৮২১ খ্রীঃ)। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রুষের সহিত যুদ্ধেও ইনি পরাস্ত হইয়াছিলেন।

মাহ্‌মুদ গাওয়ান—দাক্ষিণাত্যের নৃপতি নিজাম শাহ্ বাহমনির উজীর। রাজদরবারে শত্রুগণ চক্রান্ত করিয়া ইঁহাকে এক জালিয়াৎ ব্যাপারে সংসৃষ্ট করেন; ইহাতে সুলতান ২য় মাহ্‌মুদ ইঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তখন ইঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। এই ঘটনা ১৪৮১ খ্রীঃ ৫ই এপ্রিল ঘটে। মাহ্‌মুদ গাওয়ান পদ্যে ও গদ্যে অতি সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহার রচনা মৌলানা জামির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহম্মদ (আবুল কাশেম ইবন্ অ'বদল্লা)—প্রসিদ্ধ ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর আরবের অন্তর্গত মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ এই যে, মহম্মদের জন্ম সময়ে পারস্যের পুরোহিতগণের চিররক্ষিত অগ্নির নির্ব্বাপণ, আরবদেশে উজ্জ্বল আলোকের বিস্তার প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা আবদল্লা পরলোক গমন করেন সুতরাং আবদল্লার ভাগ্যে পুত্রমুখদর্শনসুখ ঘটিয়া উঠে নাই। পতিবিয়োগবিধুরা জননী আমিনা শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়া পুত্রের দ্বিতীয় বর্ষ বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। মহম্মদ পিতামহ আবদুল মোতালিবের যত্নে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহম্মদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বাল্যকালে মহম্মদ মেষচারণ করিতেন। এই সময়ে তিনি দীন দরিদ্র লোকদিগের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া দারিদ্র্যকষ্ট বিশেষরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া, ডামস্কস, বোগদাদ, বসোরা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। এই সময়ে দস্যুগণ বণিক্ ও তীর্থযাত্রিগণের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। মহম্মদ পিতৃব্যের অনুমতি লইয়া ২০ বৎসর বয়সে সদলে এই সমুদয় দস্যুকে দমন করিতে বহির্গত হন। দস্যুদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে তাঁহার যুদ্ধবাসনা বলবতী হইল। যৌবনকালে এইরূপে নানা কাজে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহাকে মাঝে মাঝে নির্জ্জনে চিন্তামগ্ন দেখা যাইত। প্রাচীন ধর্ম্মে ও ক্রিয়াকলাপে তাঁহার অনাস্থা জন্মিয়াছিল। বসোরায় অবস্থান কালে কোন বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক মহম্মদের উন্নত ধর্ম্মভাব দর্শনে তাঁহার পিতৃব্যকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনার এই ভ্রাতুষ্পুত্র কালে এক মহাপুরুষ হইবেন সুতরাং আপনি বিশেষ যত্ন সহকারে ইঁহাকে য়িহুদি ধর্ম্মযাজকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।" পিতৃব্যের অনুমতিক্রমে খদীজা নাম্নী এক সম্পত্তিশালিনী বিধবা রমণীর বিষয়রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া মহম্মদ পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে বাণিজ্যোপলক্ষে যিশুখৃষ্টের লীলাক্ষেত্র প্যালেষ্টাইন ও সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন সিরিয়া নগরীতে গমন করেন। তিনি যিশুখৃষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ ও সিরিয়ার ধর্ম্মবিস্তার স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি সর্ব্বদা কেবল ধর্ম্মবিষয়েই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এই ধর্ম্মচিন্তাভারগ্রস্ত হৃদয়ে স্বদেশে ফিরিলেন। এখানে আসিয়া যে সম্পত্তিশালিনী রমণীর বিষয় সম্পত্তির বৃদ্ধির মানসে তিনি বাণিজ্য গমন করিয়াছিলেন, সেই বিধবা রমণী খদীজার পাণিগ্রহণ করেন। খদীজা মহম্মদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও বিবাহের

ফল ভালই হইয়াছিল। তাঁহারা পতিপত্নীতে সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহাদের কতকগুলি পুত্র কন্যা জন্মিয়াছিল; কিন্তু দুইটী শিশুপুত্রই অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার কন্যা বিখ্যাত ফতেমা (ফতেমা জাহরা) মহম্মদের খুল্লতাত আবু তালিবের পুত্র আলীর সহিত বিবাহিত হন। ফতেমার গর্ভে ৬২৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে হাসেন ও তৎপর হোসেন নামে আলীর দুই পুত্র জন্মে। এজিদের চক্রান্তে হাসেন বিষপ্রয়োগে হত হন এবং হোসেন ইউফ্রেটিশ নদীর তীরবর্ত্তী কার্ব্বালাক্ষেত্রে অন্যায় যুদ্ধে ও পিপাসায় প্রাণত্যাগ করেন।

খদীজার সহিত বিবাহের পর হইতেই এই রমণীর ঐশ্বর্য্যে মহম্মদের সংসার চিন্তা দূর হইল; তিনি সাধুকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার মনে ধর্ম্মসংস্কারের ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। তিনি সালমের পুত্র আবদল্লা ও নিজের শ্যালকের পুত্র বরাকের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলাপ করেন। বরাক আরবীয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে য়িহুদীয় ও পরে খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের সহিত আলাপে মহম্মদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অদূরবর্ত্তীকালে আরবে নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মক্কা নগরে আরবীয় পৌত্তলিকতার প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে আরবগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; প্রচলিত ধর্ম্মমতে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল না। ধর্ম্মভাবের ক্ষীণতাহেতু মদ্যপান, পশুবধ, দ্যূতক্রীড়া, প্রতিহিংসা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা আরবদিগের চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইয়াছিল। উজ্জ্বল দিবালোকে প্রবল দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব হরণ করিত, একে অন্যের প্রাণ সংহার করিত। মহম্মদের চেষ্টায় এই সমুদয় অত্যাচার অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। ওথমান নামক এক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আরব মক্কানগরটি গ্রীকদিগের হস্তে অর্পণ করিবার ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু মহম্মদের চেষ্টায় বিশ্বাসঘাতক ওথমানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। এই ঘটনায় সর্ব্বত্র মহম্মদের প্রশংসাধ্বনি হইতে লাগিল। এই সময়ে মহম্মদের বয়স ৩৫ বৎসর। মহম্মদ ধর্ম্মচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বৃক্ষলতাবিহীন নির্জ্জন হরশৈলশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইলেন। কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে তিনি পয়গম্বররূপে প্রকটিত হন এবং জনসমাজে ইস্লাম (মুক্তি) ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নূতন ধর্ম্মমত ও পুরাতন পৌত্তলিক ধর্ম্মমত সম্বন্ধে লোকদিগের মধ্যে ঘোর তর্ক বিতর্ক হইল। মহম্মদের আত্মীয়গণ তাঁহাকে বাতুল মনে করিয়া তৎপ্রচারিত ধর্ম্মমতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি গুরুজন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াও স্বীয় ধর্ম্মমত মক্কার নানাস্থানে প্রচার করিতে লাগিলেন। "ঈশ্বর এক এবং পৌত্তলিকতার বাহাড়ম্বর মিথ্যা" ইহাই তাঁহার বক্তৃতার সার কথা ছিল। অনেকে তাঁহার আধ্যাত্মিক মতের পক্ষপাতী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন পৌত্তলিক ধর্ম্ম সহসা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। যাঁহারা তাঁহার ইসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারা মহম্মদকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু মহম্মদ বলেন যে, তাঁহার সত্যধর্ম্ম সত্যপথেই বিস্তার লাভ করিবে। কাহারও কাহারও মতে মহম্মদ একটী মাত্র অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি মক্কা হইতে রাত্রিকালে প্রস্থান করিয়া জেরুজেলেমে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে স্বর্গে গমন করিয়া সেই রাত্রিতেই মক্কাতে প্রত্যাবৃত্ত হন। মহম্মদ এই রাত্রিতে বোরক্ (বিদ্যুৎ) নামক জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে আবু ও বিদা, মহম্মদের পিতৃব্য হাম্জা, ওসমান, ওমার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মক্কানগরবাসিগণ মহম্মদীয় মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। পৌত্তলিকগণ মহম্মদের মতানুবর্ত্তিগণের উপর ভয়ানক উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে তাঁহারা দলে দলে বিভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিলেন। এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিল। পৌত্তলিক ও ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পৌত্তলিকগণ মহম্মদের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৬২২ খৃঃ ১৬ই জুলাই মহম্মদ মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করেন। এই দিন হইতেই মুসলমানদিগের হিজীরা অব্দের গণনা হইতেছে।

মদিনাবাসিগণ সাদরে মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মত দ্রুতগতিতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বহু সহস্র লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। তিনি খাইবার, ফদকবদী, অল্ কোরা প্রভৃতি য়িহুদি উপনিবেশ অধিকার করিয়া

তত্রত্য অধিবাসিদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মদিনা হইতে বহু য়িহুদি নির্ব্বাসিত হইয়া খাইবার নামক স্থান আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি ৬৩০ খৃঃ (হিঃ ৮ অব্দে) মক্কাবাসীদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য ১০ হাজার সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হন। মক্কাবাসিগণ যুদ্ধ না করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি সেনাপতিগণকে আদেশ দিলেন, যেন মক্কায় নররক্তস্রোত প্রবাহিত না হয়। তিনি প্রাচীন কাবামন্দিরের মধ্যে ও বাহিরে যে সমুদয় প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহা ভগ্ন করিতে আদেশ দিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থের কুলদেবতার মূর্ত্তি ধ্বংস করা হইল। মক্কা বিজয়ের পর তিনি বহুস্থান ও বহু জাতিকে পরাজিত করিয়া ইসলাম ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করেন। তিনি মক্কানগরীকেই ইসলাম ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিলেন। মহম্মদ চারিদিকে প্রচারক পাঠাইয়া মুসলমানধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সমগ্র আরববাসী ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তিনি ৬২৪ খৃঃ রোম সম্রাট্ হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি বস্রার শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে রোমীয় সৈন্য পরাভূত হইলেও সেনাপতি জাফরের মৃত্যুতে মদিনাবাসিগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন মহম্মদ জাফরের রোরুদ্যমান শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। রোম সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস মহম্মদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য আরবপ্রান্তে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যের গতি রোধের জন্য মহম্মদ ৬৩০ খৃঃ অক্টোবর মাসে সিরিয়া দেশে উপনীত হন। এই সময়ে ওমার, আব্বাস, আবুবেকার প্রভৃতি ভক্তবীরগণ আপনাদের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। এবারেও মহম্মদ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ৬৩১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের একমাত্র পুত্র ইব্রাহিম পঞ্চদশ মাস বয়সে দেহত্যাগ করেন। বৃদ্ধকালে পুত্রশোকে মহম্মদ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। পরবর্ত্তী বৎসর ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়। মহম্মদের সময় পিতৃধনে কন্যার কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু মহম্মদ কন্যাকে পিতৃধনের কিয়দংশের অধিকারিণী করিয়া মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় দাসত্ব প্রথার অত্যন্ত প্রভাব ছিল, কিন্তু মহম্মদ কোরাণে দাসদিগকে স্বাধীনতা দানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, দাসগণ আপনাদের উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিবে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, দাসদিগের স্বাধীনতা দান ঈশ্বরের একটী প্রিয় কার্য্য। মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ খলিফা নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন। খদীজা ব্যতীত মহম্মদ আরও ১৩টী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। খদীজা যখন বিবাহ করেন, তখন মহম্মদের বয়স ২৫ বৎসর ও তাঁহার নিজের বয়স ৪০ বৎসর ছিল। মহম্মদের ৫১ বৎসর বয়সে তদীয় পত্নী খদীজার মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম বিবি সাওদা। ইনি আবিসিনিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ব স্বামী ইসলামধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ করেন। যিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহার পত্নীকে অনুগৃহীত করিবার জন্য মহম্মদের এই বিবাহ। তাঁহার তৃতীয় পত্নীর নাম আয়েসা। মহম্মদ ৫১ বৎসর বয়সে ইঁহাকে বিবাহ করেন; এই পত্নীর বয়স তখন ৭ বৎসর মাত্র। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মহম্মদ এই বিবাহ করেন। বিবি আয়েসা সিদ্দিক আবুবেকরের কন্যা। মহম্মদের মৃত্যুর পর আবুবেকর প্রথম খলিফা পদে বৃত হন। আবুবেকর ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। তাঁহাকে স্বীয় দলভুক্ত করিবার জন্যই মহম্মদ আয়েসাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। মহম্মদের ৪র্থ পত্নীর নাম বিবি হাফেজা। ইনি ওমারের কন্যা। ওমার পরবর্ত্তি-কালে ২য় খলিফা পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ওমারের জামাতা যুদ্ধে নিহত হন। এই বিধবাকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি প্রথমে আবুবেকর ও পরে ওসমানকে অনুরোধ করেন, কিন্তু উভয়েই ওমারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মহম্মদ ইহা অবগত হইয়া স্বয়ংই তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। ওমার সাহ্লাদে ইস্লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। তৎপর মহম্মদ আরও ৩টি বিবাহ করেন; ইঁহাদের পূর্ব্ব স্বামিগণ ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া যুদ্ধে নিহত হন। যাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহাদের পত্নীগণকে অনুগৃহীত করিবার জন্যই তিনি তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মহম্মদ বহু পত্নী গ্রহণ করেন। তিনি সংযমী ছিলেন; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া তিনি পত্নীগ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ পানাহারাদি ব্যাপারে অত্যন্ত সংযত ছিলেন। তিনি কখনও

মদ্য পান করেন নাই ; পার্থিব ধনরত্নাদির উপরও তাঁহার স্পৃহা ছিল না। মক্কায় তাঁহার কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ, মদিনায় উহার পরিপুষ্টি এবং মক্কাতেই উহার অবসান হইয়াছে। হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিয়ল আউল সোমবার পূর্ব্বাহ্নে হজরৎ মহম্মদ দেহত্যাগ করেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা আলীকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আবুবেকর খলিফা হন। প্রায় আড়াই বৎসর রাজ্যশাসনের পর আবুবেকরের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওমার খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। ইঁহার শাসনসময়ে প্যালেষ্টাইন ও জেরুজেলেম নগর মুসলমানদের হস্তগত হয়। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ইনি পারস্যদেশও অধিকার করেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি মিশর দেশ জয় করিয়া তথায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ওমার একজন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। তৎপর ওসমান খলিফাপদে আরোহণ করেন। ইঁহার শাসনকালে ইস্‌লাম ধর্ম্ম পশ্চিমে জিব্রাল্টর, দক্ষিণে নিউবিয়া ও পূর্ব্বে খোরাসান রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ওসমান ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অনন্তর মহম্মদের জামাতা (ফতেমার স্বামী) আলী খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে আবুসোফিয়ানের পুত্র মাবিয়া বিদ্রোহী হইয়া ডামস্কাস নগরে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬৬০ খৃষ্টাব্দে আলী এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। অতঃপর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হাসেন খলিফাপদে আরোহণ করেন। হাসেন সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ৬ মাস রাজ্যশাসন করিয়া মাবিয়ার হস্তে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করিয়া ধ্যান ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাবিয়ার ইহাতেও সন্তোষ হইল না। তাঁহার পুত্র এজিদের চক্রান্তে বিষপ্রয়োগে হাসেন দেহত্যাগ করেন। ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মাবিয়ার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র এজিদ খলিফাপদে বৃত হন। কিন্তু মক্কা, মদিনা ও কুফানগরবাসিগণ আলীর দ্বিতীয় পুত্র হোসেনকে নেতৃপদে স্থাপন করিয়া বিদ্রোহী হইল। হোসেন মক্কা হইতে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইতে ইউফ্রেটিশ নদীর তীরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তিনি এজিদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। হোসেন ও তাঁহার সহচরগণ মরুক্ষেত্রে আক্রান্ত হইয়া পিপাসায় প্রাণত্যাগ করেন। এই বিষাদপূর্ণ ঘটনার স্মরণার্থ মহরম পর্ব্বের সৃষ্টি হয়। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসন সময়ে (৭০৫ খ্রীঃ—৭১৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) মুসলমান সাম্রাজ্য চরমোন্নতি লাভ করে। এই সময়ে মুসলমান সাম্রাজ্য উত্তরে গ্যালেসিয়া ও জর্জ্জিয়া হইতে দক্ষিণে নিউবিয়া পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে কাসগর ও সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিমে স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। মহম্মদের উপদেশমালা সংগৃহীত হইয়া কোরাণ নামে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ ১১৪ সুরা বা অধ্যায়ে বিভক্ত। আবুবেকর যখন খলিফা ছিলেন, তখন ওমরের অনুরোধে আবিদের পুত্র জেইদ প্রথমে মহম্মদের উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া রাখেন। ইহাই মূল কোরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে এই কোরাণ নকল করিয়া প্রচার করেন, কিন্তু নকল করিতে ভুল করাতে নকল কোরাণ পৃথক্ হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া খলিফা ওসমান সমুদয় নকল কোরাণ ধ্বংস করেন এবং মূল কোরাণ বিশুদ্ধরূপে নকল করাইয়া সর্ব্বত্র প্রচার করেন। কোরাণ একাধারে মুসলমানগণের ধর্ম্মশাস্ত্র, আইন ও বিজ্ঞান। ইহার মতে "এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই" (ইল্‌-লাল্‌-লা-হো)। তিনি জীবন্ত, জাগ্রত ও অদ্বিতীয়।

মহম্মদ যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন তাহার নাম "ইস্‌লাম" (ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ)। ইস্‌লাম দুইভাগে বিভক্ত:—"ইমান" (বিশ্বাস) ও "দিন" (অনুষ্ঠান)। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে বিশ্বাস, মহম্মদকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস, কোরাণের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস, এবং পরী, জিন, আত্মার অমরতা, আত্মার পুনরুত্থান, বিচারের দিন, স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস, এই সমুদয় "ইমানের" অন্তর্গত। কোরাণ পাঠ, প্রক্ষালন দ্বারা দেহশুদ্ধি ও প্রার্থনা, উপবাস, দান এবং তীর্থযাত্রা এই পাঁচটি অনুষ্ঠান "দিনের" অন্তর্গত। একমাত্র ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করাই মহম্মদের জীবনের লক্ষ্য ছিল; তাঁহার উপদেশাবলীতে (কোরাণে) এই পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০৯ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে "পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ঈশ্বরের রাজত্ব ; সুতরাং তোমরা যে দিকে ফিরিয়া উপাসনা কর সেইদিকেই ঈশ্বরের মুখ

বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। মিলকৃত স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থ (On Liberty) এবং স্ত্রীজাতির অধীনতা বিষয়ক গ্রন্থ (Subjection of Women) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসে "করেস্‌পণ্ডেন্স" বিভাগে সর্ব্বোচ্চপদে নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে দুই বৎসর ছিলেন। ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভারতবর্ষের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন মিল ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। মহারাণীকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, যে আবেদন করেন, সেই আবেদন পত্র মিল লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৫৮-৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্রামসুখলাভার্থ সস্ত্রীক ফ্রান্সের দক্ষিণে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী সহসা ফুস্‌ফুসের পীড়ায় দেহত্যাগ করেন। ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত দার্শনিক সার উইলিয়ম হ্যামিল্‌টন প্রণীত দর্শন প্রকাশিত হয়। জনষ্টুয়ার্ট মিল এই দর্শনের তীব্র সমালোচনা করেন। মিলের সমালোচনা (Examination of Hamilton's Philosophy) প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তিনি হ্যামিল্‌টনের দর্শন হইতে নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া তত্তৎস্থলের পরস্পর বিরোধিতা দেখাইয়াছিলেন। এই গবেষণামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হইলে মিলের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। তৎপর তিনি কোমৎ প্রণীত দর্শনের (Positive Philosophy) সমালোচনা করেন। মিল কৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই কোমৎ দর্শন পাঠ করিয়া দার্শনিকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে কোমতের নাম ইংলণ্ডে দূরে থাকুক ফ্রান্সেও অল্প লোকেই জানিত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জন ষ্টুয়ার্ট মিল ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণের পক্ষ হইতে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলি যখন উৎকোচ নিবারণের জন্য "ব্রাইবারি বিল" উপস্থিত করেন, তখন মিল বিশেষরূপে উহা সমর্থন করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই মে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত "আভিনে" নামক নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মিল্টন (জন)—ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি। মহাকবি সেক্সপিয়ারের নীচেই ইঁহার আসন। মিল্টন ১৬০৮ খৃঃ লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ধর্ম্ম সম্বন্ধে "পিউরিটান" সম্প্রদায়ভুক্ত এবং রাজনীতি সম্বন্ধে "সাধারণতন্ত্রাবলম্বী" ছিলেন। মিল্টন পিতার নিকট হইতে ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মত প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমে গৃহেই শিক্ষিত হইতেছিলেন, তৎপর লণ্ডনে সেণ্টপল স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্ট কলেজে শিক্ষিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৬২৩ খৃঃ ছাত্রাবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১৬২৯ খৃঃ "Hymn of Nativity" নামক একটী উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেন। ইহা তাঁহার কবিত্বের প্রথম স্ফূর্ত্তি। তিনি ১৬৩২ খৃঃ এই কলেজ হইতে এম, এ, উপাধি লইয়া বাহির হন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি প্রায় ৫ বৎসর পিতৃগৃহেই অবস্থিতি করেন। এই পাচ বৎসরে (১৬৩২—৩৭ খৃঃ) তিনি নানা শাস্ত্র, নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এমন দর্শন, বিজ্ঞান বা ব্যবসায়সংক্রান্ত পুস্তক ছিল না, যাহা অল্পাধিক পরিমাণে তিনি অধ্যয়ন করেন নাই। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি Comus, Lycidas, L' Allegro এবং Il Penseroso নামক ৪ খানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইউরোপ মহাদেশ পরিভ্রমণে বাহির হন এবং ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড ও ইটালীর অন্তর্গত বহু নগরে গমন করেন। ১৫ মাস এইরূপে দেশভ্রমণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ইংলণ্ডের অন্তর্বিপ্লবের সময় লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "মেরি পাউয়েল" নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু অল্পকাল পরেই এই পত্নীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয়। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়

এবং ক্রমওয়েল সাধারণতন্ত্রের প্রধান পুরুষ নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে মিল্টন "লাটিন সেক্রেটারী"র (Latin Secretary) পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার চক্ষুর জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে এবং ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া পড়েন। তিনি রাজার পদচ্যুতি ও শিরশ্ছেদ সমর্থন করিয়া যে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধসকল লিখেন তাহাই তাঁহার গদ্য রচনার চরমোৎকর্ষ সূচনা করিয়াছিল। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয় এবং প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতেই মিল্টনের দুঃখের দিন আরম্ভ হয়; কিন্তু এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া তিনি যে সমুদয় গ্রন্থ লিখেন, তাহাই তাঁহাকে সম্মানের উচ্চ সীমায় উন্নীত করিয়া অমর করিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক মতের জন্য ও রাজার শিরশ্ছেদ সমর্থনের জন্য তাঁহাকে কিছুকাল ২য় চার্লসের আদেশে কারাগারে থাকিতে হইয়াছিল। পরে তাঁহার শিক্ষা, কবিত্ব, দারিদ্র্য ও অন্ধত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করা হয়। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বগৃহে নির্জ্জনে বাস করেন। এই নির্জ্জন বাসকালে তিনি তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ মহা-কাব্য "স্বর্গচ্যুতি কাব্য" (Paradise Lost) ও "স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্তি কাব্য" (Paradise Regained) রচনা করেন। "Paradise Lost" ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত ও ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া তিনি এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে কবিবর মিল্টন "Samson Agonistes" নামক আর একখানি কাব্য রচনা করেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই নবেম্বর ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তিনি ক্রমে ৩ বিবাহ করেন। প্রথম পত্নী "মেরি পাউয়েলে"র গর্ভজাত কন্যাত্রয় মিল্টনের সহিত বৃদ্ধকালে বড়ই দুর্ব্যবহার করিতেন। প্রকাশ এই যে, অন্ধ হইয়া মিল্টন এই কন্যাগণের দ্বারা গ্রন্থ লিখাইতেন; কন্যাগণ ইহাতে বড়ই বিরক্তি বোধ করিত। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন, এই পত্নী ২ বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় বারে ৫৪ বর্ষ বয়স্কা এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন; এই মহিলা কবিবরের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। মিল্টনের কাব্যগুলি ৩ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) যৌবন সময়ে লিখিত, (২) প্রৌঢ়াবস্থায় লিখিত, (৩) বার্দ্ধক্যে লিখিত। প্রথমোক্ত গুলি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত; ২য় রচনাগুলি ১৬৪০ খৃঃ হইতে ১৬৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত এবং শেষোক্ত রচনাগুলি ১৬৬০ খৃঃ হইতে ১৬৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত হয়। মিল্টনের যৌবন সময়ে কোমল ও মনোমোহকর কাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি গদ্য প্রবন্ধ রচনা করেন এবং জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes রচিত হইয়াছিল।

মুলার (জর্জ্জ)—ইংলণ্ডের একজন প্রধান ঈশ্বরভক্ত, দরিদ্র-বন্ধু, পরদুঃখকাতর, মহাশয় ব্যক্তি। ইঁহার জন্মভূমি জর্ম্মণি। ইনি ২৪ বৎসর বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ১৮২৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে আগমন করেন। অনাথ শিশুগণের থাকিবার জন্য ১৮৩৬ খৃঃ এপ্রিল মাসে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া ৩৬ জন অনাথ বালকবালিকাকে আশ্রয় দেন। অনাথ দরিদ্রের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এজন্য তিনি ইংলণ্ডের সম্পত্তিশালী লোকদিগের সাহায্যে ৩০০ শত অনাথ লোকের থাকিবার জন্য ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন। ১৮৫৭ খৃঃ ৪০০ অনাথ লোকের বাসোপযোগী দ্বিতীয় এক বাটী নির্ম্মাণ করেন। ১৮৬২ খৃঃ ৪৫০ জন অনাথ বালকবালিকার আবাসের জন্য তৃতীয় একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে তিনি ২০৫০ জন অনাথ দুঃখী বালকবালিকার আবাসোপযোগী ৫টী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সমুদয় অনাথ আশ্রমের জন্য তাঁহাকে ১৮৩৬ খৃঃ হইতে ১৮৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত দেড়কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজে গরিব ছিলেন। এই সমুদয় অর্থই ইউরোপের সহৃদয় নরনারীগণ দান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের উপর তাঁহার একান্ত নির্ভর ছিল। অর্থের অভাব হইলে তিনি যখন অনাথদের সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, তখনই তাঁহার

নিকট অর্থ আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু; তিনি সর্ব্বদা অসহায়ের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর সাধুকার্য্যের সহায়। এজন্য তিনি যখন দরিদ্রদিগের জন্য অর্থ সাহায্য চাহিতেন, তখনই ভগবান ধনীলোকদের হস্তদিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রেরণ করিতেন। একদা ইংলণ্ডের একজন ধনীলোক অযাচিত ভাবে দরিদ্রের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে মূলারের হস্তে ৩৯ হাজার টাকা দান করেন। দুই হাজার অনাথ বালকবালিকার ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে প্রতি বৎসর তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। ১৮৯৮ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ৯২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন।

মেকলে (লর্ড)—বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ, গদ্য লেখক ও কবি। মেকলে ১৮০০ খৃঃ ২৫শে অক্টোবর ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিষ্টার সায়ারে রথ্‌লে টেম্পল নাক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৯ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট যে সমুদয় পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও এদেশে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপে পঠিত হইয়া থাকে। তৎপ্রণীত "Lays of Ancient Rome" একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। তিনি ১৮২৬ খৃঃ ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন; কিন্তু এ ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি ১৮৩০ খৃঃ প্রথমবার পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৮৩৩ খৃঃ বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের শাসনকালে বড়লাট সভার সভ্যরূপে ভারতে আগমন করেন। ৪ বৎসর ঐ পদে থাকিয়া ১৮৩৮ খৃঃ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই চারি বৎসরের মধ্যে তিনি দুইটী প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। (১) "ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে"র (Indian Penal Code) পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং (২) ভারতীয় বিদ্যালয়ে উচ্চবিষয়গুলি ইংরেজী ভাষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা। ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের পাণ্ডুলিপি অনুসারে ১৮৬০ খৃঃ "ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন" (Indian Penal Code) বিধিবদ্ধ হয় এবং ইহা ১৮৬২ খৃঃ কার্য্যে পরিণত হয়।

এদেশের কলেজ ও উচ্চশ্রেণীর স্কুলগুলিতে ইংরেজীর প্রাধান্য দেওয়া হইবে কি সংস্কৃতের প্রাধান্য দেওয়া হইবে, ইহা লইয়া শিক্ষা কমিটির মেম্বরগণের (Members of the Committee of Public Instruction) মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হয়। পাঁচ জন ইংরেজীর পক্ষে এবং অপর পাঁচ জন প্রাচ্য ভাষার পক্ষে মত দেন; কাজেই উহা কার্য্যে পরিণত হয় না। লর্ড মেকলে এদেশে আসিয়া ১৮৩৫ খৃঃ এই শিক্ষা কমিটীর সভাপতি (President of the Committee of Public Instruction) পদে আসীন হন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কাজেই ইংরেজী শিক্ষার জয় হইল। লর্ড মেকলে যে দীর্ঘ মন্তব্য (Minute) লিখেন, তাহার ফলে এদেশীয় কলেজ ও উচ্চ শ্রেণীর স্কুলগুলিতে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে উচ্চ বিষয়গুলি অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইল। কেবল নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

মেগাস্থিনিস—ইনি অশোকের পিতামহ মগধরাজ প্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীকরাজদূতরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ভারতের তদানীন্তন ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষ ১১৮টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নগরের কার্য্যাদি (Municipal Administration) ৬টি সমিতি দ্বারা পরিচালিত হইত। এই সমুদয় সমিতির উপর শিল্প, বাণিজ্য, শ্রমজাত দ্রব্য প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল। ইনি ভারতবাসীদিগকে ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) তত্ত্ববিৎ, (২) কৃষক, (৩) শিকারী, (৪) যোদ্ধা, (৫) চর, (৬) মন্ত্রী এবং (৭) কারু ও ব্যবসায়ী। তখন দাসত্বপ্রথা ছিল না। এই সময়ে লিখিবার কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই; বৃক্ষত্বক্ ও কাপড়ের উপর লিখা হইত। ভারতবাসীরা সরল, সাধু ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন; কেহ মিথ্যাসাক্ষ্য দিত না। যজ্ঞকার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে মদ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পুরুষগণ বীর্য্যশালী ও রমণীগণ পাতিব্রত্যের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। রাজকন্যাগণ স্বয়ংবর প্রথানুসারে পতিগ্রহণ করিতেন। গ্রামের

প্রধান ব্যক্তিরা বিবাদাদি মীমাংসা করিতেন। উৎপন্ন দ্রবের ⅙ হইতে ⅛ অংশ পর্য্যন্ত রাজকর নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণকে রাজকর দিতে হইত না।

মেহেদি (ইমাম—Mahdi, Imam)—দ্বাদশজন ইমামের মধ্যে আলী সর্ব্বপ্রথম এবং মেহেদি সকলের শেষ। মুসলমানেরা এই ইমামদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইঁহার পিতা হাসান আস্কারি একাদশ ইমাম ছিলেন। ইনি বাগ্দাদের অন্তর্গত সরমানরাই (Sarmanrai) নামক স্থানে ৮৬৯খৃঃ ২৯শে জুলাই শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ভক্ত শিষ্যগণ বিশ্বাস করেন যে, মেহেদির মৃত্যু হয় নাই ; তিনি কোথাও লুকাইয়া আছেন। যখন যিশুখ্রীষ্ট দ্বিতীয় বার এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন তখন মেহেদি ইলায়াসের (Elias) সহিত আবার আসিয়া অবিশ্বাসীদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।

মোহম্মদ (১)—মহম্মদ দেখ।

মহম্মদ ২য়—(Mahammad II or Mahammad the Great) তুরুস্কের বিখ্যাত সম্রাট্। ইনি ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মে কন্‌ষ্টান্টিনোপল অধিকার করেন। ইনি দুইটি সাম্রাজ্য, ১২টি রাজ্য এবং ২০০ নগর জয় করিয়া ইতালি অধিকারের আয়োজন করেন কিন্তু হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ৩রা মে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শাসনকালে স্ত্রীপুরুষ সমেত ৮০ হাজার খ্রীষ্টান নিহত হয়। তিনি আরও কিছু কাল জীবিত থাকিলে হয়ত সমস্ত ইয়োরোপ মুসলমান সাম্রাজ্যে পরিণত হইত।

ম্যাক্সমূলার—(Max Muller)—পাশ্চাত্যদেশীয় বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই খ্যাতনামা ব্যক্তি জর্ম্মনি দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জর্ম্মনি দেশেই সংস্কৃতের অধিক আদর। ইঁহার পিতার নাম উইলহেম মূলার (Wilhelm Muller)। ম্যাক্সমূলার বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২১ বৎসর বয়সে হিতোপদেশের অনুবাদ করেন। অতঃপর তিনি জর্ম্মনির রাজধানী বার্লিন নগরে গমন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বপ্ নামে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত এক ব্যক্তি ও শেলিং নামে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অপর এক ব্যক্তি বার্লিনে বাস করিতেন। তিনি বার্লিনে ইঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি আরও অধিক সংস্কৃত আলোচনার জন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিশ নগরে গমন করেন। এই নগরে ইউজিন বর্ণুফ নামে এক জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন। মাক্সমূলার ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন। ইহার পরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে আগমনপূর্ব্বক অক্সফোর্ডে বাস করিতে থাকেন, তিনি অক্সফোর্ডে থাকিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ঋগ্বেদ ইংরাজিতে অনুবাদে করেন। অক্সফোর্ডে বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী নামে এক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকালয় আছে। ম্যাক্সমূলার এই পুস্তকালয় হইতে অনুবাদ কার্য্যে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনূদিত ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইহার অপর খণ্ড মুদ্রিত করেন। এই ২৩ বৎসর কাল তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ২৩ বৎসরে তিনি আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সমুদয় গ্রন্থে তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাঁহাদের আচার পদ্ধতির আলোচনা করেন। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয়গণ হিন্দুদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইলে সমস্ত সভ্যজগতের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি সমস্ত সভ্যজগতের চিন্তাস্রোত এক অভিনব পথে প্রধাবিত করেন। বেদবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি বহুবর্ষ অতিবাহিত করেন। ইহার পর হইতে অবিশ্রান্তভাবে তিনি ভারতবর্ষীয় দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা গবেষণাপূর্ণ বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসরকাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলাচনা করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ

প্রচারিত হওয়া মাত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও রাজপরিবারের সমস্ত লোক এবং ইয়োরোপীয় নৃপতিবর্গ তাঁহার পত্নীর নিকট শোকসূচক টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার এক পুত্র ও কন্যা বর্ত্তমান ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে প্রিভিকাউন্সিলের সভাপদে নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও ঈশ্বরবিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন। জর্ম্মনির সম্রাট্, উপাধি ও উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার দুই কন্যা মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

ম্যাক্সমূলার কৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পণ্ডিত সমাজে সমধিক আদর লাভ করিয়াছে :—

(১) "ভারতবর্ষ, ইহা আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারে।" (India, what can it teach us)।

(২) "ধর্ম্মবিজ্ঞান" (Science of Religion)।

(৩) "ঋগ্বেদ সংহিতা" (Rig-Veda Samhita)।

(৪) "বেদান্ত দর্শন" (Vedanta Philosophy)।

(৫) "উপনিষদ্ প্রথমভাগ" (Upanishad Part I.)।

(৬) ঐ দ্বিতীয় ভাগ" (Do Part II.)।

(৭) "ভারতীয় ষড়দর্শন" (Six systems of Indian Philosophy)।

ম্যাট্‌সিনি—অষ্ট্রিয়া ও ফরাসীর হস্ত হইতে ইতালির উদ্ধার-কল্পে যে দুই ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব ও জীবন পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ম্যাট্‌সিনি অন্যতর। গ্যারিবল্ডি প্রথমে সাধারণতান্ত্রিক ছিলেন ; কিন্তু পরে ভিক্টর ই-মানুয়েলের গুণে মুগ্ধ হইয়া রাজতান্ত্রিক হইয়া পড়েন। ভিক্টর ই-মানুয়েলের হস্তে বিজিত ইতালি অর্পণ করিয়া গ্যারিবল্ডি শান্তিতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার দ্বীপাবাস ক্যাপ্রেরা দ্বীপে চলিয়া যান। ম্যাট্‌সিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত সাধারণতন্ত্রেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় ইতালির উদ্ধারসাধন হইলে পর, যখন গ্যারিবল্ডি ভিক্টর ই-মানুয়েলের হস্তে ইতালি রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডির প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ম্যাট্‌সিনির চিত্তশলকা চুম্বক শলকার ন্যায় সর্ব্বদাই সাধারণতন্ত্রের দিকে নিবদ্ধ ছিল।

যোসেফ ম্যাট্‌সিনি ১৮০৫ খৃঃ ২২শে জুন ইতালির অন্তর্গত জেনোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জেনোয়ার চিকিৎসা বিদ্যালয়ে এনাটমীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জননী যেমন সুন্দরী তেমনি অশেষ গুণের আধার ছিলেন। মাতার চরিত্র পুত্র ম্যাট্‌সিনিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু সাহিত্য শাস্ত্রে ইঁহার অত্যন্ত আসক্তি থাকাতে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় বীতস্পৃহ হন। এখন ইতালি যেরূপ এক রাজার অধীন হইয়াছে, ম্যাট্‌সিনির বাল্যকালে সেরূপ ছিল না ; ইহা তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ও জমিদারীতে বিভক্ত ছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীন ছিল। ম্যাট্‌সিনি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিরূপে ইতালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একতা-সূত্রে বদ্ধ করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। স্বদেশের দুর্গতি দর্শনে তিনি যৌবনসময়ে পরিচ্ছদে যে শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা যত দিন ইতালিকে বিদেশীয় অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত না করিয়াছিলেন ততদিন ত্যাগ করেন নাই। তিনি ইয়োরোপীয় গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সভ্য হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিপ্লবকারী মনে করিয়া গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণ না পাইলেও প্রধান প্রধান নগর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসিত হওয়াতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত চিঠি পত্র লেখা বন্ধ হইয়া গেল। তিনি যে সকল মলিন বসন ধৌত করিবার জন্য বন্ধুগণের নিকট পাঠাইতেন, তাহার উপর তিনি আপন বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি ইতালির ক্ষুদ্র নগরে অবস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার উপর পুলিশের তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইতালি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ফ্রান্সের

মার্শেল বন্দরে উপনীত হন। এখানে ইতালি হইতে নির্ব্বাসিত গ্যারিবল্ডির সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। মার্শেল হইতে তিনি স্বদেশীয় যুবকবৃন্দের নিকট উত্তেজনাপূর্ণ পত্র লিখিতেন। এই সকল চিঠি পণ্যদ্রব্যের আবরণের মধ্যে ভরিয়া প্রেরণ করা হইত। গবর্ণমেণ্ট ইহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং যাঁহাদের নিকট এই সকল পত্র পাওয়া গেল তাঁহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিলেন। কেহ কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল, কেহ বা নির্ব্বাসিত হইল, কেহ বা দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। সার্ডিনিয়ার শাসনকর্ত্তা ম্যাট্‌সিনিকে ধরিবার জন্য ফরাসী-গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি বিপদ্ গণিলেন। তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া সুইজারলণ্ডে গেলেন। এখানে সুইস্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধরিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। তিনি গুপ্তভাবে তথায় থাকা নিরাপদ নহে জ্ঞান করিয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া গেলেন। ১৮৩৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন। ম্যাট্‌সিনি ইংরেজ জাতির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য লণ্ডনের পত্রিকাগুলিতে নানা প্রবন্ধ লিখিতেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ইহার পরে ইংলণ্ড হইতে তিনি আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং এখানে গ্যারিবল্ডির সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেন, কিন্তু স্বদেশীয়দিগের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং স্বার্থপরতায় এবার তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হয়। ভগ্নোদ্যম হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু স্বদেশের মায়া কাটাইতে পারিলেন না, কখন কখন তিনি স্বদেশের প্রিয় নগরগুলি ছদ্মবেশে দেখিয়া আসিতেন। তিনি কখনও পাদ্রির বেশে, কখনও ফকিরের বেশে ভ্রমণ করিতেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে বহুবার তিনি শত্রুহস্তে পতন হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ম্যাট্‌সিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও বিদ্বান্ ছিলেন। সর্ব্বদা শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া অশান্তিপূর্ণ জীবনভার বহন করিলেও তিনি সাহিত্য চর্চ্চা হইতে বিরত হন নাই। তিনি ভিক্টর হিউগো, বায়রণ, দান্তে, গেটে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লিপিকুশলতারই পরিচয় দেয়। ম্যাট্‌সিনি দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ না করিলে ইতালির উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি একবার মাতার সঙ্গে ইতালিতে দেখা করিতে আসিয়া ধৃত হন এবং কারাগারে অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করেন কিন্তু কারাক্লেশ তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। ম্যাট্‌সিনি ১৮৫৯ সনে ইতালিতে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করেন; কিন্তু স্বদেশীয় লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইংলণ্ডের বিদ্বৎসমাজ একবাক্যে ম্যাট্‌সিনিকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। কার্লাইল শতমুখে বিখ্যাত Times পত্রিকায় তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

য

যিশুখৃষ্ট—খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। খৃষ্টানগণের মতে ইনি ঈশ্বরের পুত্র ও জগতের পরিত্রাতা। ইনি অলৌকিক প্রকারে প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত বেথলেহাম নামক স্থানে বর্ত্তমান সময়ের ১৯১৫ বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদিবংশে মেরী নামক মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের চারিবৎসর পর হইতে ইংরেজী সনের গণনা আরম্ভ হয়। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত মেষপালকদিগের নিকট প্রকাশ করেন। য়িহুদিদিগের রাজা যিশুর জন্ম সংবাদে ভীত হইয়া তাঁহার বধার্থ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মেরীর স্বামী যোসেফ শিশু যিশুকে ও মেরীকে লইয়া মিশরে পলায়ন করেন। পলায়নের সময় হিরড যিশুর সন্ধান না পাইয়া বেথলেহাম নামক স্থানের নব-প্রসূত সমস্ত য়িহুদি সন্তানদিগকে বধ করেন। হিরডের মৃত্যুর পর যোসেফ মিসর হইতে বেথলেহামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু এখানে নূতন রাজা অর্কিলস্ও তাঁহাদের বিনাশে চেষ্টিত থাকাতে তিনি যিশুকে লইয়া নেজারথ নামক স্থানে গমন করেন। এখানে যিশু ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সূত্রধরের কার্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। অতঃপর তিনি জনকর্ত্তৃক (জন দি ব্যাপটিষ্ট) দীক্ষিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কতকগুলি অশিক্ষিত লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। য়িহুদিগণ তাঁহার ধর্ম্মমত শুনিয়া এবং

তাঁহার কার্য্য ও গতিবিধি অবলোকন করিয়া তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিল এবং তিনি যে সমুদায় অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা ভূতের কাণ্ড বলিয়া মনে করিলেন। য়িহুদিরা তাঁহাদের পুরোহিতগণের সভায় যিশুর কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত যিশুকে ধরিতে পারিলেন না; অবশেষে "যুডাস ইস্পারিয়ট" নামে যিশুর এক অকৃতজ্ঞ শিষ্য ৩০টী রৌপ্য মুদ্রার লোভে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক স্বীয় গুরু যিশুকে শত্রুহস্তে অর্পণ করে। এই কার্য্যে যুডাসের নাম চির কলঙ্কে ডুবিয়া রহিয়াছে। প্রধান পুরোহিতের নিকট প্রথমতঃ যিশুর বিচার হয়। তৎপর উক্ত পুরোহিত যিশুকে প্যালেষ্টাইনের রোমীয় শাসনকর্ত্তা "পণ্টাস্ পাইলেটের" হস্তে অর্পণ করেন। "পাইলেট" যিশুকে রক্ষা করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের কর্ম্মচ্যুতির ভয়ে তিনি কিছুতেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। য়িহুদি পুরহিতগণ "পাইলেট" কে বলিলেন যে, যদি তিনি যিশুকে ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা রোম-সম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবেন। তাঁহারা পাইলেটকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যিশুকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন যে, তিনি রোমসম্রাটের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন। পাইলেট শাসনকর্ত্তা হইলেও প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করিলেন না। তিনি অবশেষে প্রজাগণের সন্তোষার্থে যিশুর প্রতি প্রথমতঃ বেত্রদণ্ড বিধান করিলেন এবং তৎপর লৌহকীলকদ্বারা কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। এই হত্যাকাণ্ড ৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল সঙ্ঘটিত হয়। যিশুর মৃত দেহ এক নূতন কবরে স্থাপিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে যিশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার উত্থিত হইবেন। য়িহুদিগণ এই সংবাদ পাইয়া পাইলেটের অনুমতিক্রমে একদল রক্ষিসৈন্য কবরের পার্শ্বে স্থাপন করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যিশু কবর হইতে উত্থিত হইলেন। সৈন্যগণ ইহা দেখিল। যাহারা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল, সৈন্যগণ তাহাদিগকে এই সংবাদ দিল; কিন্তু য়িহুদিগণ সৈন্যদিগকে ঘুষ দিয়া তাহাদের দ্বারা প্রচার করাইলেন যে, যিশুর শিষ্যগণ তাঁহার মৃতদেহ কবর হইতে অপহরণ করিয়াছেন। খৃষ্টানগণ বলেন যে, এই মৃতদেহ অপহরণ সম্বন্ধে অপবাদ নিরাকরণের জন্য যিশু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ৪০ দিন বর্ত্তমান ছিলেন; তৎপর তাহাদিগকে "অলিভেট" পর্ব্বতে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া তথা হইতে সর্ব্বসমক্ষে তিনি স্বর্গে প্রস্থান করেন। খৃষ্টানগণ বলেন যে প্রথমসৃষ্ট মানবের পাপ জগতে মনুষ্যগণের মধ্যে সংক্রান্ত হইয়াছে। একমাত্র যিশুখৃষ্টের মধ্যবর্ত্তিতায় মানবগণ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যাহাদিগের জন্য যিশু ঈশ্বরের নিকট অনুরোধ করেন, ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া কেবল তাহাদিগকেই পাপ মুক্ত করিয়া থাকেন।

যেনোফন—বিখ্যাত এথিনীয় সেনাপতি। ইনি একাধারে যোদ্ধা, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। ইনি প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত আটিকা প্রদেশে খৃঃ পূঃ ৪৪৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সক্রেটিসের সঙ্গে গ্রীক সেনাপতি ক্লিয়ার্কসের অধীনে সাইরাসের সাহায্যার্থ পারস্যে গমন করেন। পারস্যের সিংহাসন লইয়া সাইরাস ও আর্টাজার্কসিস দুই ভাইর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। সাইরাস গ্রীসে আসিয়া গ্রীকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গ্রীকদিগের তখনও জার্কসিস কৃত গ্রীস আক্রমণ স্মরণ ছিল; তখনও থার্ম্মাপলি, সেলামিস্ ও প্লেটিয়ার যুদ্ধ তাহাদের স্মৃতিপটে উদিত হইয়া চিত্তের পীড়া দিতেছিল। এবার তাহারা প্রতিশোধপরায়ণ হইল। জার্কসিসের মৃত্যুর পর পারস্যের সিংহাসন লইয়া তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল; এক পুত্র সাইরাস, আথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করিল; এথেন্সও সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া ক্লিয়ার্কসের অধীনে বহু সৈন্য প্রেরণ করিল। অবশ্য এই সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণের বেতন সাইরাসকে দিতে হইল। গ্রীক সৈন্য বাবিলনের নিকটবর্ত্তী কুনেক্সা নামক স্থানে পারস্যরাজ আর্টাজার্কসিসের সম্মুখীন হয়। উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধের পর পারস্যরাজ আর্টাজার্কসিসের পরাজয় হয়; কিন্তু গ্রীকদিগের প্রধান সেনাপতি ক্লিয়ার্কস ও স্বয়ং সাইরাস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। যাঁহাকে রাজ্য দিতে গ্রীক

সৈন্ত পারস্তে উপস্থিত হইয়াছিল, যুদ্ধে তিনিই প্রাণত্যাগ করিলেন। গ্রীকসৈন্য এখন শত্রু-বেষ্টিত। এই সৈন্যের পরিচালন ভার যেনোফনের উপর পড়িল। যেনোফন আর্টাজার্কসিসকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না; সৈন্ত সহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। পারস্তরাজ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যেনোফনের গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তন ইতিহাসে "১০ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" নামে খ্যাত। পারস্ত হইতে এথেন্সের পথে যেনোফন তিনদিক হইতে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনাহারে ও শীতে ভয়ানক ক্লেশ পাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ৩৯৬ খৃঃ পূঃ স্পার্টারাজ এজিসিলসের নিকট থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ করিস্থে অতিবাহিত করেন। তিনি ইতিহাস ও জীবন চরিত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখেন ও তন্মধ্যে গ্রীসের ইতিহাস, সক্রেটিসের জীবনী, এজিসিলসের জীবনী, পারস্তরাজ সাইরাসের জীবনী, দশ সহস্র গ্রীকের প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তিনি ৩৫০ খৃঃ পূঃ করিস্থ নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন।

র

রশিদ-উদ্দিন আমীর - বিখ্যাত চিকিৎসক ও ঐতিহাসিক। ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার গ্রন্থের নাম জামা-উৎ-তারিখ (Jam-ut-Tawarikh)। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ইনি প্রথমে পারস্ত সুলতান আবা খাঁর পরিবারে চিকিৎসক হন। পরে সুলতানের অনুগ্রহে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান উজীরের পদ লাভ করেন। কথিত আছে যে, পরবর্ত্তী সুলতানকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছেন সন্দেহে ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে সুলতানের আদেশে ইঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

রাফেল—ইটালীদেশীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের মধ্যে রাফেল অন্যতম। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল ইটালীর "আরবিনো" নামক প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাফেল দেখিতে অতি সুশ্রী পুরুষ। তাঁহার প্রকৃতিও মধুর ছিল। মাতার চরিত্রের গুণাবলী তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রকৃতির রম্য নিকেতন আরবিনোতে একদিকে তুষারধবল আপিনাইন গিরিশৃঙ্গ, অপরদিকে আড্রিয়াটিক সাগরের সুনীল বারিরাশি; এতদুভয়ের মধ্যে তাঁহার পিত্রালয় অবস্থিত ছিল। মাতাপিতার মৃত্যুতে রাফেলের বাল্যজীবন দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার ৮ বৎসর বয়সের সময় স্নেহময়ী জননী লোকান্তরিত হন এবং ১১ বৎসরের সময় পিতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান। তাঁহার লালনপালন ও শিক্ষার ভার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিমাতার উপর পড়িয়াছিল। পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া বিমাতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হয়; অবশেষে মাতুলের মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিবাদের মীমাংসা হয়। রাফেল ১২শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে "পেরুগিনো" নামক এক ব্যক্তির নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নিকট তিনি ৯ বৎসর শিক্ষা করিয়া, "যিশুর মাতা মেরীর বিবাহ" নামক বিখ্যাত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই চিত্রাঙ্কন উপলক্ষে তত্রত্য জমিদার ও বহু গণ্যমান্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাদের অনুরোধে তিনি নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত করেন। এই সময়ে ফ্লরেন্সবাসী বিখ্যাত মাইকেল এঞ্জিলোর চিত্র তাঁহার নয়ন পথবর্ত্তী হওয়াতে, উঁহার সহিত তাঁহার পরিচয়ের ইচ্ছা হইল। তিনি এক সুযোগে ফ্লরেন্সে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এঞ্জিলোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে রাফেলের যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। স্বয়ং পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস্ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার চিত্র দেখিয়া ইতালীর সমস্ত বড় লোক মুগ্ধ হইয়া গেলেন। রাফেল ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে "বেনিডিক্টাইন" মঠের সন্ন্যাসীদের জন্য তাঁহার জগদ্বিখ্যাত চিত্র "সিষ্টাইন মেডোনা" (Sistine Madona) অঙ্কিত করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যাকসনির (Saxony) তৃতীয় অগাষ্টাস ইহা একলক্ষ বিশহাজার টাকায় ক্রয় করেন। রাফেল সর্ব্বত্র সম্মানলাভ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল দুঃখে অতিবাহিত

করিয়াছিলেন এজন্য দুঃখীদের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল। তিনি উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ বিলাসে ব্যয় না করিয়া দুঃখীদিগকে দান করিতেন। তিনি কত যে বিদ্যার্থী, কত যে অন্নক্লিষ্ট লোককে সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সের মধ্যে তিনি ২৮৩ খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। পোপ দশম লিও তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রিপণ (লর্ড)—ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ইনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর লণ্ডননগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আর্ল অব রিপণ; মাতা বকিংহাম সায়ারের ৪র্থ আর্লের একমাত্র কন্যা, ইঁহার স্বামি-দত্ত নাম "সারা"। পিতা আর্ল অব রিপণ তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী রবার্ট পীলের মন্ত্রিত্ব কালে মন্ত্রি-সভার একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্য ছিলেন। ১৮৫৯ খৃঃ সাবালক রিপণ পৈতৃক জমিদারী ও উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "মার্কুইস্" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লর্ডরিপণ উদার-নৈতিক দলভুক্ত হইয়া পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমর বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটরীর পদে ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের আণ্ডার সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পদোন্নতি লাভ করিয়া সমর বিভাগের সেক্রেটরীর পদে আসীন হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের সেক্রেটরীর পদ লাভ করেন। অনন্তর ১৮৬৮ খৃঃ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি কাউন্সিলে লর্ড প্রেসিডেণ্ট্‌রূপে কাজ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ডরিপণ ভারতের গবর্ণর জেনারেল পদ লাভ করেন। এই পদে তিনি ৪ বৎসর মাত্র ছিলেন। তাঁহার ভারতশাসনকাল ঘটনাবহুল। তাঁহার ভারতে আগমনের পূর্ব্বে আফগানিস্থান লর্ড লিটনের ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিতেছিল। লর্ডরিপণ ভারতে আসিয়া অচিরে সে অগ্নির নির্ব্বাণ করেন। মহীশুর রাজ্য ন্যায্য অধিকারীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তিনি ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ হন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিয়া সংবাদ পত্র সমূহের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করিয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনে এক নবীন উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার করেন। তিনি ভারতীয় প্রজার দুঃখনিবারণকল্পে লবণের শুল্ক হ্রাস করেন এবং ভারতবাসীর শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তিনি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। তাঁহার শাসনকালে পরলোক-গত সার রমেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে কার্পাস তুলার শুল্ক উঠিয়া যায়। দুর্ভিক্ষনিবারণ-কল্পে তিনি কৃষি বিভাগের পুনর্গঠন করেন।

যাহাতে দেশীয় বিচারকগণ ইংরেজ অপরাধীর বিচার করিতে পারেন, তন্মধ্যে তিনি এক আইন প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী ইলবার্ট সাহেব এই বিলের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, এজন্য ইহা "ইলবার্ট বিল" নামে খ্যাত। এই বিল তাঁহার সভায় উপস্থিত করা হইলে এ দেশের ইংরেজ সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ইংরেজ পত্রিকায় ও সভাসমিতিতে এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। টাউনহলে এক বিরাট সভা হয়; এই সভায় ব্যারিষ্টার ব্রান্‌সন্ সাহেব বিল উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন। ইহার ফল এই হইল যে, কলিকাতা হাইকোর্টের বাঙ্গালী এটর্ণিরা ব্যারিষ্টার ব্রান্‌সনকে মোকদ্দমা দেওয়া বন্ধ করেন। কাজেই ব্রান্‌সন সাহেবকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে হয়। যাহা হউক, ইংরেজগণের বিপক্ষতায় ইলবার্ট বিল পাশ হয় নাই। দেশীয় লোকদিগকে স্বায়ত্তশাসনাধিকারদান লর্ডরিপণের অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র আর্ল অব গ্রে তদীয় ইয়র্ক সায়ারস্থিত বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইয়াছেন এবং লর্ড উপাধিও পাইয়াছেন।

রুসো (জিন্ জেক্স্)—বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও গ্রন্থকার। সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা নগরে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রুসো জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। দরিদ্রতা হেতু তিনি বেশী লেখা

পড়া শিক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি সুন্দর রচনা করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনোয়াতে নাটকঘর সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেন; তিনি নাট্যাভিনয়ের বিরোধী ছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি "এমিলি" (Emile) নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করেন। ইহাতে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হন। তিনি সুইজর্লণ্ডে পলায়ন করেন এবং তথা হইতে গুপ্তভাবে ফ্রান্সে আসেন। এখানে তিনি ছদ্মবেশে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে গমন করেন। লণ্ডন হইতে আবার তিনি ছদ্মবেশে ফ্রান্সে আগমন করেন। এখানে তিনি অধিকাংশ সময়ে আর্ম্মানির (Armenian) বেশে থাকিতেন। লিফিভার (Lefevre) সাহেব রুসোর রচিত গ্রন্থগুলি ২২ খণ্ডে প্রকাশিত করেন। তাঁহার গ্রন্থের উত্তেজক ভাষাই প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম হেতু। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রোবস্পিয়ার—বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিস (Paris) নগরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি এ ব্যবসাতে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ফরাসীবিপ্লবের প্রারম্ভে তিনি জাতীয় সভার সভ্য হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে জ্যাকোবিন (Jacobin) সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া উঠেন। তিনি ফরাসীদিগকে রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; তাঁহার উত্তেজনার ফল শীঘ্র ফলিল; বহুসংখ্যক নরনারী কারাগারে আবদ্ধ হইতে লাগিল; রক্তস্রোতে রাজমার্গ প্লাবিত হইতে লাগিল; অবশেষে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি কৌশলক্রমে কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। অতঃপর তিনি পুনরায় ধৃত হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কারাগৃহে অবস্থান কালে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন। গুলির আঘাতে তাঁহার দন্তপাটি ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু প্রাণনষ্ট হয় না। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থাতেই তিনি বধ্যভূমিতে নীত হন এবং "গিলোটিন" নামক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহাকে বধ করা হয়।

ল

লাইকার্গস (Lycurgus)—স্পার্টানগরীর বিখ্যাত ব্যবস্থাপক। প্রাচীন কালে দক্ষিণ গ্রীসে (বর্ত্তমান মোরিয়া উপদ্বীপে) স্পার্টানামে এক নগরী প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। লাইকার্গসের ব্যবস্থাগুণেই এই নগরী শক্তি সঞ্চয় করে। স্পার্টার উন্নতিকল্পে লাইকার্গস নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত করেন।

১। কেহ রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতে পারিবে না। একপ্রকার ক্ষুদ্র লৌহদণ্ড দ্বারা ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

২। ৭ম বর্ষ হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত লোকদিগকে সাধারণ ভোজনাগারে আহার করিতে হইবে।

৩। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না।

৪। পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলকেই মল্লক্রীড়া করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা যোদ্ধ‍ৃবেশে থাকিতে হইবে।

৫। চুরি করা আপত্তিজনক নয়, কিন্তু ধরা পড়িলে চোরকে শাস্তি পাইতে হইবে।

লাইকার্গসের পিতা ইওনোমাস (Eunomus) স্পার্টার রাজা ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলিডেক্‌টিস (Polydectes) রাজা হন। ৮৭০ খৃঃ পূঃ অব্দে লাইকার্গস দেহত্যাগ করেন।

লিওনিডাস—দক্ষিণ গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টার রাজা। ইনি ৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে গ্রীস আক্রমণকারী জার্কসিসের গতি অবরুদ্ধ করিবার জন্য মাত্র তিন সহস্র সৈনিকসহ থার্ম্মপলি গিরিসঙ্কটে গমন করেন। এই অল্পসংখ্যক সৈন্যের

সাহায্যে তিনি পারস্যরাজের বহুলক্ষ সৈন্যকে বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রীসে প্রবেশ করিতে দেন নাই। অবশেষে ইফিয়াল্টিশ (Ephialtes) নামে একজন বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী, পারস্য সৈন্যদিগকে এক গুপ্তপথ প্রদর্শন করেন, ইহাতে পারস্যসৈন্য থার্ম্মপলি গিরিসঙ্কটের অপরপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হয়। লিওনিডাস গিরিসঙ্কটের উভয় দিক্ দিয়া আক্রান্ত হইবেন বুঝিতে পারিয়া, মাত্র তিন শত সৈন্য নিজের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণকে দেশরক্ষা করিবার জন্য দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি এই তিনশত মাত্র সৈন্য লইয়া গিরিসঙ্কট পরিত্যাগপূর্ব্বক সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী হইলেন। এই স্বদেশপরায়ণ স্বার্থত্যাগী বীরপুরুষের অনুষ্ঠিত কার্য্য গ্রীসের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। (জার্কসিস দেখ)।

লিঙ্কলন (এব্রাহাম)—উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের (United States) কংগ্রেসের বিখ্যাত সভাপতি। এই মহাপুরুষের জন্মে যুক্তরাজ্য ধন্য হইয়াছে। ইঁহার জীবনে শিক্ষণীয় বিষয় বহু আছে। এব্রাহাম দীনদুঃখীর সন্তান হইয়া অধ্যবসায় বলে যুক্তরাজ্যের কর্ণধার হইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র জগতের আদর্শ পুরুষ বলিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি একজন সামান্য সূত্রধরের পুত্র; অতিকষ্টে লালিতপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রমজীবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি শ্রমসহিষ্ণু ও বলিষ্ঠকায় হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার জ্ঞানপিপাসাও বলবতী ছিল। বাল্যকালে গ্রাম্যপাঠশালায় অধ্যয়নসময়ে তিনি শিক্ষকের নিকট হইতে দৈনন্দিন পড়া বুঝিয়া আনিবার জন্য প্রত্যহ ২৫ মাইল যাতায়াত করিতেন। গৃহে কাগজ কলম ছিল না, এজন্য তক্তার উপরে তীক্ষ্ণাগ্র সূচীদ্বারা অঙ্ক কষিতেন ও প্রবন্ধ রচনা করিতেন। তক্তাখানা লেখায় ভরিয়া গেলে উহা লৌহযন্ত্রদ্বারা চাঁচিয়া পালিশ করিয়া লইতেন এবং পুনরায় তদুপরি লিখিতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপে কষ্ট করিয়া কিছু লেখাপড়া শিখিয়া গ্রাম্য ডাকঘরে কেরানিগিরি লইলেন। পৈতৃক ব্যবসায়ে অর্থাগমের সুবিধা নাই দেখিয়া, তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানা কার্য্য করিতে লাগিলেন। ডাকঘরের কর্ম্ম ছাড়িয়া তিনি ওকালতি পরীক্ষা দেন এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং প্রতিভারও বিকাশ হইতে লাগিল। লিঙ্কলনের সময় দাসব্যবসায় লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। নিগ্রো দাসেরা প্রভুর সম্পত্তিমধ্যে গণ্য ছিল এবং তাহারা হাটেবাজারে বিক্রীত হইত। লিঙ্কলন এই দাসব্যবসার প্রতিকূলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। যে সমুদয় ন্যায়পরায়ণ লোক দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তন্মধ্যে লিঙ্কলন সকলের অগ্রণী।

লিঙ্কলনের বক্তৃতা শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোক দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী তারিখে তিনি নিউইয়র্ক (Newyork) সহরে বক্তৃতা দেন, তাহা শুনিয়া সকলে তাঁহাকেই দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিল। এই বৎসর যখন কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হয়, তখন অধিক সংখ্যক সভ্যের মতানুসারে লিঙ্কলনই সভাপতিপদে বৃত হন। তাঁহার এই পদে আসীন হওয়ার পর দাসব্যবসায় লইয়া সমস্ত যুক্তরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। উভয় পক্ষে ৫ বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ হয়। তিনি দাসব্যবসায়ীদিগের বিরুদ্ধপক্ষের নেতা। তাঁহার বিপক্ষদলের সেনাপতি জেনারেল রবার্ট-লি। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বহু সহস্র সৈন্যের পতন হয়। অবশেষে লিঙ্কলন জয়ী হন এবং যুক্তরাজ্য হইতে দাসব্যবসায় তিরোহিত হয়। জয় লাভ হেতু আনন্দ প্রকাশার্থ মহোৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। লিঙ্কলন এই মহোৎসবের দিনে, ১৮৬৫ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল, নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। নাট্যদর্শন সময়ে বুথ নামক এক নরপিশাচ অলক্ষিতভাবে গুলি করিয়া তাঁহাকে বধ করে। এইরূপে যুক্তরাজ্যের আকাশ হইতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

লিভিংষ্টোন (ডাক্তার, ডেভিড্)—আফ্রিকা ভ্রমণকারী বিখ্যাত ইংরেজ পাদ্রি। এই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ১৮১৩ খৃঃ স্কটলণ্ডের গ্লাসগো সহরের অদূরবর্ত্তী ব্লেণ্টায়ার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক

দর্জ্জির কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেই দর্জ্জির দোকানে কাজ শিক্ষা করিতেন। লিভিংষ্টোনের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা চা-এর ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি অতিকষ্টে পুত্রের লালন পালন করিয়াছিলেন। লিভিংষ্টোন আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া প্রথমবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়। লিভিংষ্টোন মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার সহিত দেখা করিতে পারিলেন না, এজন্য শোকভরে অত্যন্ত বিলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা সচ্চরিত্রা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। লিভিংষ্টোনের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে এক ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে তদীয় সন্তান-সন্ততিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "আমাদের বংশে কোন ব্যক্তিই অসদ্বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন নাই এবং আমি তাঁহাদের মধ্যে যে সকলের বিষয় অবগত হইয়াছি তাঁহারা সকলেই সাধু ও সন্মার্গগামী ছিলেন। অতএব আমার উপদেশ এই যে, তোমরা সকলে সচ্চরিত্র ও সাধু হইবে।" এইরূপ লোকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া লিভিংষ্টোন যে সাধু হইবেন তাহা স্বাভাবিক।

বাল্যকাল হইতেই লিভিংষ্টোন পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। ১০ বৎসর বয়সের সময় তিনি এক তুলার কারখানায় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তিনি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে বেতন পাইতেন তাহা তাঁহার মাতার হস্তে অর্পণ করিতেন। অপর তিন সপ্তাহের বেতন দিয়া তিনি লাটিন ভাষার ব্যাকরণ ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। তিনি দিনে তুলার কারখানায় কাজ করিতেন, রাত্রিতে এক নৈশ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। স্কুল হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া তিনি রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাসে রত থাকিতেন; ভোর বেলায় শয্যা হইতে উঠিয়া কারখানায় যাইতেন। এইরূপে দিনে তাঁতির কাজ ও রাত্রিতে অধ্যয়ন করিয়া ভাবী ধর্ম্ম-যাজক জীবনে অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে লিভিংষ্টোন তাঁহার পিতামাতার নিকট ধর্ম্ম-যাজক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি নিজব্যয়ে পাদ্রি হওয়ার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে মনস্থ করিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি গ্লাসগো কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এই কলেজে শীতকালের ৬ মাস পড়া হয় এবং গ্রীষ্মের ৬ মাস পড়া বন্ধ থাকে। তিনি গ্রীষ্মের ৬ মাস তাঁতের কলে কাজ করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তদ্দ্বারা শীতের ৬ মাস কলেজে পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

১৮৩৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লণ্ডন মিশনারি সোসায়িটীর (London Missionary Society) পরিচালক-গণের (Directors) সহিত সাক্ষাৎ করিতে লণ্ডন নগরে গমন করেন। এই সমিতির পরিচালকবর্গ লিভিংষ্টোনের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলেন যে, বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারকভাবে যাইতে হইলে কিছু চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন এবং এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টসহিষ্ণুতাও অভ্যাস করা আবশ্যক। এজন্য তাঁহারা লিভিংষ্টোনকে আরও দুই বৎসর ডাক্তারি শিক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন এবং তদুপযোগী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহারা লিভিংষ্টোনকে লণ্ডনে রাখিয়া ডাক্তারি শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন এবং ইসেক্সের (Essex) অন্তর্গত ওনগার (Ongar) নামক স্থানে পাঠাইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণের বন্দোবস্ত করেন। এই ওনগার নামক স্থানে তাঁহার ন্যায় আরও কয়েকজন শিক্ষানবিশ পাদ্রি রেভারেণ্ড সিসিলের (Rev. Mr. Cecil) নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। লিভিংষ্টোন এখানে আসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ময়দা প্রস্তুত করা ও কোদালি দ্বারা ভূমি খনন ও তাহাতে নানাপ্রকার ফুলের গাছ রোপণ করিয়া বাগান প্রস্তুত করা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। লিভিং-ষ্টোনের উপস্থিত মতে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস একবারেই ছিল না; তিনি পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়া বক্তৃতা দিতে পারিতেন না। ওনগারে (Ongar) অবস্থান কালে একদিন পাদ্রি সিসিল হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন; সেই দিবস সন্ধ্যার সময় লিভিংষ্টোনকে বক্তৃতা দিতে বেদীতে আহ্বান করা হয়। তিনি বাইবেলের কতক অংশ পাঠ করিয়া থামিলেন; তিনি যাহা কিছু বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। লিভিংষ্টোন দাঁড়াইয়া বলিলেন "বন্ধুগণ, আমি যাহা বলিব মনস্থ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় ভুলিয়া গিয়াছি।' এই বলিয়া

সহসা বেদী পরিত্যাগপূর্ব্বক গির্জ্জাঘর ত্যাগ করিলেন। পাদ্রি সিসিল ৩ মাস লিভিংষ্টোনের কার্য্য দেখিয়া তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রতিকূল রিপোর্ট (Report) করেন। লণ্ডনমিসনরি সমিতি তাঁহাকে আরও দীর্ঘকাল শিক্ষা করিতে সময় দেন। অবশেষে তাঁহাকে বিদেশে পাঠানই স্থির হইল।

লিভিংষ্টোন প্রথমে চীনদেশে গমনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আফ্রিকাগামী একজন পাদ্রির সহিত আলাপের পর তিনি স্বাভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে চীনদেশে অহিফেন ব্যবসা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। ইহাও তাঁহার চীনদেশে গমন না করিবার অন্যতম হেতু। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারি বিদ্যায় উপাধি লাভ করেন (Licentiate of the Faculty of Physicians and Surgeons)। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের (Cape of Good Hope) অভিমুখে যাত্রা করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ আফ্রিকাস্থ কেপকলোনি প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে। তিনি উত্তমাশা অন্তরীপে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া কেপকলোনির প্রধান নগর কেপটাউনে গমন করিলেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে হলণ্ডবাসিগণ কেপকলোনিতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তথায় পুরুষানুক্রমে প্রায় দেড়শত বৎসর বাস করেন। তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ বুয়ার বা কৃষক নামে আখ্যাত হইলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত হলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হয়; এই সময়ে ইংরেজেরা হলণ্ডের উপনিবেশ কেপকলোনি অধিকার করিয়া লন; তদবধি ইহা ইংরেজের অধিকারেই আছে। লিভিংষ্টোন কেপটাউনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় জাহাজে উঠেন এবং পূর্ব্বদিকে আল্‌গোয়া উপসাগরে (Algoa Bay) উপনীত হন। এখানে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া তিনি ৭০ মাইল উত্তরদিকে অবস্থিত কুরুমান নামক স্থানে উপস্থিত হন। কুরুমান আফ্রিকাস্থিত খৃষ্টান পাদ্রিগণের কেন্দ্রস্থল। কুরুমানে তিনি অল্পকাল অবস্থান করিয়া আরও উত্তরে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে অপর একজন পাদ্রি ছিলেন। এই স্থানে বেচুয়ানা নামক অসভ্যজাতি বাস করে। বেচুয়ানাগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটী ইতর জন্তুর নামে অভিহিত, যথা—বানর, কুম্ভীর, মৎস্য। এই বানর, কুম্ভীর প্রভৃতি জাতীয় বেচুয়ানাগণ (Bechuana) বানর, কুম্ভীর প্রভৃতিকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে। তাহারা কখনও আপন আপন জাতীয় জন্তুর হিংসা বা তাহাদের মাংস আহার করে না। যাঁহারা রামায়ণের বানর ও ভল্লুকসেনাদিগকে বন্যজন্তু বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বেচুয়ানাদিগের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিবেন। এই স্থান হইতে তিনি পুনরায় কুরুমানে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু তথায় অল্পদিন থাকিয়া পুনরায় উত্তরাভিমুখে বেচুয়ানাদের মধ্যে গমন করেন। এখানে ক্রমে ৬ মাস কাল কোন ইয়োরোপীয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেখা করেন নাই, যেহেতু দেশীয়দের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিলে তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি অনেকটা জানিতে পারিবেন। তিনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মাবোটসা (Mabotsa) নামক রমণীয় উপত্যকায় বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে গ্রামবাসিগণ সিংহের উৎপাতে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিত; সিংহগুলি রাত্রিকালে গরুর খোয়াড়ে প্রবেশ করিয়া গরু বধ করিত; দিনের বেলাও দল বান্ধিয়া মাঝে মাঝে মাঠে গরুর পাল আক্রমণ করিত। সিংহের স্বভাব এই যে যদি দলের একটা সিংহ হত হয় তবে অপরগুলি সেই স্থান ছাড়িয়া দুরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া যায়। লিভিংষ্টোন গ্রামবাসীদিগকে একটা সিংহ বধ করিতে উত্তেজিত করিয়া তিনি স্বয়ং বন্দুকহস্তে সিংহশিকারে গমন করিলেন। তিনি বহুলোক লইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতপার্শ্বস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটী সিংহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইলেন। সিংহের এগারটী দাঁত তাঁহার স্কন্ধদেশ ও বাহুর সন্ধিস্থলে বিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঘা সারিল বটে, কিন্তু সন্ধিস্থলের একখানা হাড় অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়াতে তাঁহার বাহুটী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সিংহও লিভিংষ্টোনের গুলিতে আহত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই ভূপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। আফ্রিকায় ৪ বৎসর বাস করিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মোফা (Dr. Moffat) নামক অপর এক আফ্রিকা-ভ্রমণকারী পাদ্রির কন্যা মেরীকে

বিবাহ করেন। মেরী পিতার সহিত বহুকাল আফ্রিকায় বাস করিতেছিলেন ; এজন্য তদ্দেশবাসী লোকদিগের ভাষা তিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। লিভিংষ্টোন ও মেরী সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মাবোটসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পতিপত্নীতে জনমানবের দুরধিগম্য বনাকীর্ণ নানাপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক বিভিন্নজাতীয় অসভ্যমানবগণের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। লিভিংষ্টোন এই সকল অসভ্যজাতীয় নরনারীগণের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্মের আলো বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে আফ্রিকার ভূগোলের এক নূতন পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত হইল। তিনি কালাহারি নামক মরুপ্রদেশের অদূরবর্ত্তী গামিনামক হ্রদের (Lake Ngami) তটবর্ত্তী প্রদেশে কিছুকাল বাস করেন। এই স্থানের অধিবাসীদিগের নাম ম্যাকলোলো Makololo)। এই ম্যাকলোলো-দিগের দলপতি বা সর্দ্দারের নাম সিবিটুয়ানি (Sibituane)। এই দলপতির বয়স অনুমান ৪৫ বৎসর। সে লিভিংষ্টোন ও তাঁহার পত্নীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে। লিভিংষ্টোন এই জাতীয় লোকদিগকে অতিথিপরায়ণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ম্যাকলোলোদিগের যত গ্রামে গিয়াছেন সর্ব্বত্রই আদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে বৃষ, গোদুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি উপহার দিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি পত্নী ও সন্তানগণসহ কেপটাউনে প্রত্যাগমন করেন। বেচুয়ানাদিগের সহিত অত্যন্ত মিশামিশি করাতে বুয়ারগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার অনুপস্থিতকালে বুয়রেরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া সমুদয় জিনিষপত্র ঔষধাদি লুঠ করে ও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে ; তিনি গৃহে থাকিলে হয়ত প্রাণ হারাইতেন। তিনি পুনর্ব্বার ম্যাকলোলোদিগের দেশে গমন করেন।

ম্যাকলোলো জাতীয়দিগের অধ্যুষিত স্থানের মধ্যে লিন্যান্টি (Linyanti) নামক স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ; এই স্থানে তাহাদের সর্দ্দার সিবিটুয়ানি (Sibituane) বাস করিত। এই সময়ে সিবিটুয়ানি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত স্বীয় ক্ষমতা কন্যাতে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কন্যা দলাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না ; তিনি বিবাহিত হইয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ঘরকন্না করিতে চাহিলেন এবং স্বজাতীয়দিগকে আহ্বান করিয়া তাহার ভ্রাতা সেকিলেটুকে (Sekeletu) তাহাদের দলপতি করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের অভিপ্রায় অনুসারে সেকিলেটু (Sekeletu) ম্যাকলোলোদিগের দলপতি হইলেন। সেকিলেটু লিভিংষ্টোনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। লিভিংষ্টোনের চেষ্টায় এই জাতীয় লোকদিগের অন্তঃকরণ ও সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা উন্নত হয়। এই জাতীয় লোক সাধারণতঃ বৃষচর্ম্ম পরিধান করে ; চর্ম্মখানা হাটুর নীচে নামে না। হাতে বালার মত পিত্তলের অলঙ্কার ও অনন্তের ন্যায় পিত্তল বা লোহার অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ মাঝে মাঝে লিভিংষ্টোনের গৃহে আসিয়া তাঁহার আয়নাতে নিজদের আকৃতি দেখিত এবং দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও কখন কখন ভীত হইত। আয়নাতে মুখ দেখিবার সময় কেহ কেহ বলিত "এই কি আমি ! এই আমার চেহারা ! আমার মুখ এত বড় ! আমার কাণ কুমরার পাতার ন্যায় বড় ! ইত্যাদি।" লিভিংষ্টোন এই জাতীয় লোকদিগকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এই স্থানে পীড়িত হইয়া পড়াতে লিভিংষ্টোন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লিন্যান্টি (Linyanti) পরিত্যাগ করেন। প্রায় ৮০০ মাইল অতিক্রম করিয়া তিনি নানাপ্রকার পথ-ক্লেশ সহ্য করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত লোয়াণ্ডা (Loanda) নামক স্থানে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গীয় খৃষ্টান ম্যাকলোলোগণ সমুদ্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে পৃথিবীর শেষ নাই ; কিন্তু এখানে আসিয়া সমুদ্র দর্শনপূর্ব্বক তাহারা পৃথিবীর অন্ত দেখিল ! তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ১৬ বৎসর আফ্রিকায় বাস করিয়া লিভিংষ্টোন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পত্নীকে তিনি পূর্ব্বেই দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নানাস্থানে বিপুল আয়োজন হইল ;

নানা সভাসমিতিতে তিনি অভিনন্দন প্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডের সমস্ত লোক তাঁহার নিকট আফ্রিকার বৃত্তান্ত জানিতে সমাগত হইলেন। লণ্ডনের রাজকীয় ভৌগোলিক সভা হইতে (Royal Geographical Society) তিনি আফ্রিকার নদী, পর্ব্বত, হ্রদ আবিষ্ক্রিয়ার জন্য এক স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া লিভিংষ্টোনকে দেখিবার ইচ্ছা করায় এই বিখ্যাত ভ্রমণকারী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাণী প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা লিভিংষ্টোনের সহিত আলাপ করেন। লিভিংষ্টোন তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে বাহির করেন; ইহাতে তিনি বহুসহস্র টাকা লাভ করেন। এই টাকার অর্দ্ধাংশ তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকার জাম্বেজি (Zambesi) নামক স্থানের খৃষ্টান প্রচারক সমিতিতে অর্পণ করেন; অবশিষ্ট টাকা তিনি স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের জন্য রাখেন। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকায় গমন করেন। ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী (Foreign Secretary) লর্ড ক্লেরেণ্ডন (Lord Clarendon) ম্যাকলোলোদের সর্দার সেকেলেটুর নিকট এক চিঠি লিখিয়া লিভিংষ্টোনের সহিত দেন; এই চিঠিতে লিভিংষ্টোনের প্রতি সদয় ব্যবহার করাতে তিনি মহারাণীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। লিভিংষ্টোন এইবারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফ্রিকায় ছিলেন। এই বারে তিনি দুইটি জাতির সহিত পরিচিত হন; একটির নাম বটোকা (Batoka) জাতি এবং অপর জাতির নাম মঙ্গঞ্জা (Mangonja)। বটোকা জাতীয় লোক তাহাদের মুখের উপরের পাটির সম্মুখের দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং মস্তক হইতে ৮।৯ ইঞ্চ উচু করিয়া চুল বাঁধিয়া থাকে। মঙ্গঞ্জা জাতীয় লোকেরা সামান্য গাত্রাবরণ মাত্র ব্যবহার করে, কিন্তু তাহাদের চুলের দিকে অত্যন্ত দৃষ্টি। তাহারা চুল চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া পাক দেয় এবং মহিষের শিংএর মত করিয়া রাখে। লিভিংষ্টোন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জাম্বেজি হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া ভারতের বোম্বাই নগরে উপস্থিত হন এবং এখান হইতে উক্ত সনের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। তিনি এবার দুই বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তৃতীয় বার আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে তিনি মিরো নামক হ্রদের (Lake Moero) তীরে উপস্থিত হন। এই হ্রদের বিস্তার ৪০ মাইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গউইলোনামক হ্রদ (Lake Bangweolo) আবিষ্কার করেন। এই হ্রদ দীর্ঘে ১৫০ মাইল এবং প্রস্থে ৮০ মাইল। এখানে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। উক্ত সনের ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি বোম্বারা (Bombarre) প্রদেশে উপনীত হন এবং এখানে পীড়িত হইয়া তিনি ৬ মাস অবস্থান করেন। এখানে তিনি দেশীয়দের উপর দাসব্যবসায়ীদিগের অকথ্য অত্যাচার অবলোকন করেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, প্রায় ১৫০০ শত স্ত্রীলোক এক বাজারে বাহির হইয়াছে; হঠাৎ দাসব্যবসায়িগণ তাহাদের উপর গুলি নিক্ষেপ করে। স্ত্রীলোকগণ ভীত হইয়া দৌড়িয়া নৌকায় উঠিল; অনেকে জলে পড়িয়া গেল। ব্যবসায়িগণ আহত স্ত্রীলোকগুলিকে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি এই দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রতিবাদে অনেক ফল হইয়াছিল। অতঃপর তিনি উজিজি (Ujiji) নামক স্থানে আগমন করেন। এখানে অবস্থানকালে তাঁহার অলীক মৃত্যুসংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইল। ইংলণ্ডের অনেকে এসংবাদ বিশ্বাস করেন নাই, তথাপি তদীয় বন্ধুগণ ইয়ং (Mr. Young) নামক এক ব্যক্তিকে ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। ইয়ং সাহেব ন্যাসা হ্রদ পর্য্যন্ত (Lake Nyassa) গিয়াই সংবাদ পাইলেন যে, লিভিংষ্টোন জীবিত আছেন। ইহা অবগত হইয়া ইয়ং ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল; লিভিংষ্টোনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আমেরিকায় নিউ হেরাল্ড নামে একখানা প্রসিদ্ধ পত্রিকা আছে; জেমস্ গর্ডন বেনেট নামে এক সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ইহার স্বত্বাধিকারী। তিনি লিভিংষ্টোনের অনুসন্ধানার্থ হেনরি মর্লেণ্ড ষ্ট্যানলিকে (Mr. Henry Morland Stanley) নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। ষ্ট্যানলি সাহেব ১৮৭১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে

জাঞ্জিবার প্রদেশে উপস্থিত হন এবং এই সনের নবেম্বর মাসে তিনি উজিজিতে (Ujiji) উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া তিনি লিভিংষ্টোনের সাক্ষাৎ পাইলেন। উভয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। লিভিংষ্টোন তখনও রুগ্ন ছিলেন। ষ্ট্যানলি বিলাত হইতে বহু সামগ্রী আনিয়াছিলেন; উপযুক্ত শুশ্রূষায় তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অতঃপর উভয়ে টেঙ্গানিকা হ্রদের (Lake Tanganyika) উত্তর তীরে নৌকাযোগে উপস্থিত হইলেন। এই সমুদয় নৌকাকে ক্যানো (Canoe) বলে। এখানে আসিয়া ষ্ট্যানলি অসুস্থ হইলেন; লিভিংষ্টোনের শুশ্রূষায় তিনি সুস্থতা লাভ করিলেন। এখান হইতে ষ্ট্যানলি বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ সনের ২৫শে আগষ্ট লিভিংষ্টোন নীল নদের উৎপত্তিস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই সময় ভয়াবহ শীত, তদুপরি অনবরত বৃষ্টিপাতে লিভিংষ্টোন অত্যন্ত কষ্টে পড়িলেন। এখানে তিনি ১৮৭৩ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। এখান হইতে তিনি বাঙ্গউইলো হ্রদের (Lake Bangweolo) নিকট উপস্থিত হন। এখানে ইলালা (Ilala) নামক গ্রামে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অসুস্থ শরীরে বাস করিতে থাকেন। ১৮৭৩ সনের ৪ঠা মে এই কুটীরে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শবদেহের কিয়দংশ লণ্ডনে আনয়ন করিয়া ওয়েষ্ট মিনষ্টার সমাধিক্ষেত্রে (Westminster Abbey) সমাহিত করা হয়।

লিহংচং—বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ চীনে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহারই মন্ত্রণাবলে চীনের বৃদ্ধা মহারাণী ও নবীন সম্রাট্ চালিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইয়ান্-সি-কাই চীনসাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিপদে বৃত হইয়া সাম্রাজ্য চালাইতেছেন।

লুথার (মার্টিন)—এই বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক মহাপুরুষ ১৪৮৩ খৃঃ ১০ই নবেম্বর ইয়োরোপে সাক্সনির অন্তর্গত আয়লাবেন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন লুথার এবং মাতা মার্গারেট। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন; বহুক্লেশে নানাস্থানে ঘুড়িয়া বহুযত্নে লেখাপড়া করিয়া ২০ বৎসর বয়সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরে লাটিন ভাষায় লিখিত একখানা বাইবেল (Bible) তাঁহার হস্তগত হয়। ইহা পাঠ করিয়া তিনি অতুল আনন্দ লাভ করেন। ১৫০৬ খৃঃ তিনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। এখন তিনি ধর্ম্মযাজক হইতে ইচ্ছা করিলেন। ১৫০৭ খৃঃ তিনি ধর্ম্মযাজক পদ লাভ করেন। ১৫০৯ খৃঃ ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে বি, ডি (B. D.) উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি গির্জ্জা সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম উপলক্ষে রোমনগরে প্রধান ধর্ম্মযাজকের (Pope) নিকট গমন করেন; তথায় তিনি অবগত হইলেন যে পোপের পাপ ক্ষমা করিবার (Absolution) ক্ষমতা আছে; কিন্তু ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি রোম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। পোপের মতাবলম্বী রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা নানাস্থানে সভা করিয়া লুথারের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন; এদিকে লুথারও জর্ম্মনির নানাস্থানে প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। বহুলোক লুথারের মতাবলম্বী হইল। লুথারের সহিত বিচারের জন্য জর্ম্মণির অন্তর্গত আকস্‌বার্গ নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। লুথার নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পোপের ক্ষমাপত্র দেওয়ার অধিকার নাই; একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই লোক পরিত্রাণ লাভ করে। যুক্তিতর্কে কেহ লুথারের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। এক্ষণ হইতে জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যে লুথারের মতাবলম্বী লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জর্ম্মণসম্রাট্ লুথারকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। জর্ম্মণ দূতের সহচর পোপের মতাবলম্বী ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহার প্রাণ সংহারের চেষ্টায় ছিল; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে উপনীত হইলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল জর্ম্মণির রাজধানীতে সমবেত বহুরাজ্যের রাজগণের সমীপে জর্ম্মণসম্রাট্ লুথারের পরীক্ষা করিলেন; লুথার অকুতোভয়ে সমবেত রাজগণের প্রশ্নাবলীর সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। সভা ভঙ্গের পর হইতে লুথারের প্রটেষ্টাণ্ট মত সমগ্র ইয়োরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনেক রাজা

লুথারের মত গ্রহণ করিলেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারি লুথার স্বর্গে গমন করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি মহা সমারোহে তাঁহার শবদেহ সমাধিস্থ হয়।

স

ষ্টানলি (Sir H. M. Stanley) —এই বিখ্যাত আফ্রিকা পর্য্যটক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ডেনবিগ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৪ খৃঃ ১০ই মে লণ্ডননগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম রাওল্যাণ্ডস্ (Rowlands)। তিনি ১৮৫৫ খৃঃ আমেরিকায় গমন করেন এবং তথায় ষ্টানলি নামে এক সদাগরের আফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় নাম পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে তিনি বন্দী হন এবং যুদ্ধাবসানে মুক্তিলাভ করিয়া যুক্তরাজ্যের নৌ-বিভাগে কর্ম্মলাভ করেন।

১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার নিউইয়র্কহেরল্ড (Newyork Herald) নামক পত্রিকার পক্ষ হইতে আফ্রিকার আবিসিনীয় সমরে গমন করেন। তথা হইতে তিনি স্পেন ও ফ্রান্সে গমন করেন। ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে অবস্থান কালে, তিনি বিখ্যাত আফ্রিকা ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোনের অন্বেষণার্থ উক্ত নিউইয়র্ক হেরল্ডের স্বত্বাধিকারী গর্ডন বেনেট (Gordon Benett) সাহেবের নিকট হইতে টেলিগ্রাফে আদেশ প্রাপ্ত হন। (লিভিংষ্টোন দেখ)। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মিশর, প্যালেষ্টাইন, পারস্য ও ভারতবর্ষ হইয়া আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে জাঞ্জিবরে উপস্থিত হন এবং উজিজি (Ujiji) নামক স্থানে গমন করিয়া লিভিংষ্টোনকে প্রাপ্ত হন। অতঃপর উভয়ে টাঙ্গানিকা হ্রদের (Lake Tanganyika) উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, এই হ্রদের সহিত নীলনদের যোগ নাই। ইহার পর তিনি আসাণ্টি সমরে উক্ত হেরল্ড পত্রের সংবাদদাতার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। অনন্তর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন; ঠিক এই সময়ে লিভিংষ্টোনের মৃতদেহ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হইতেছিল। তিনি মৃত সমধর্ম্মী বন্ধুর সমাধি সময়ে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর উক্ত হেরল্ড পত্রিকা ও ডেইলি টেলিগ্রাফের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে মধ্য আফ্রিকা আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা হ্রদের চারিদিকে নৌযানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে উজিজি হইয়া কঙ্গো নদীর তীরে উপস্থিত হন। ১৮৭৮ খৃঃ তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর পুনরায় কঙ্গোনদীর তীরে যাইয়া তথায় কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য (Congo Free State) স্থাপন করেন। এই ঘটনার পর হইতে ইয়োরোপীয় অন্যান্য রাজগণ আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ খৃঃ এমিন পাশার উদ্ধারার্থ একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। এই সৈন্যদলের সহিত ষ্টানলিও আগমন করেন। বহু রক্তপাতের পর ষ্টানলি ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা হ্রদের তীরে এমিন পাশাকে প্রাপ্ত হন। এই বারে ষ্টানলি মধ্য আফ্রিকার বহু জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ও পর্ব্বতমালা আবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। নানা সভা ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লেমেণ্টের সভ্য হন এবং ১৮৯৯ খৃঃ তিনি জি. সি. বি (G. C. B.) উপাধি লাভ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ খানি গ্রন্থ প্রধান। (১) How I found Livingstone (২) Through the Dark Continent (৩) In Darkest Africa.

ষ্টিফেন্‌সন (জর্জ্জ) —বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। ইঁহার পিতা কয়লার খনিতে সামান্য বেতনে কাজ করিতেন। ইনি ইংলণ্ডে নর্দাম্বার্লেণ্ডের অন্তর্গত উইলেম (Wylam) নামক স্থানে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও বাল্যকালে ১৪ বর্ষ বয়সের সময় তাঁহার পিতার সহকারী কারিকররূপে নিযুক্ত হন। ইনি নিজের অধ্যবসায়গুণে উন্নতি লাভ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে লেখাপড়া জানিতেন না, অবশেষে দিনে কঠিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে এক নৈশবিদ্যালয়ে অধ্যয়নপূর্ব্বক সামান্য লেখাপড়া শিখিলেন।

কয়লার খনির কাজে উন্নতি দেখাইয়া তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড বেতনে ইঞ্জিনিয়ার পদ লাভ করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম বাষ্পীয় যন্ত্র (Steam Engine) নিৰ্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্রে একটু দোষ ছিল। তিনি প্রথম দোষরহিত করিয়া যে উৎকৃষ্ট বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত করেন তাহার নাম রকেট (Rocket)। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি লিবারপুল হইতে মাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত প্রথম রেলগাড়ী চালান। ইহাই বিলাতের প্রথম রেলগাড়ী। ১৮৪৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

স

সক্রেটিশ—প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি প্রাচীন গ্রীসে আটিকা প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ৪৬৯ খৃঃ পূঃতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই; পিতা সফ্রোনিশকাস ও মাতা কিনারিটা সামান্য কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি প্রথমতঃ পৈতৃক ব্যবসায়—মনুষ্যমূর্ত্তি খোদাইয়ের কাজে নিযুক্ত হন; পিতার মৃত্যুর পরেও সংসার ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে কিছুদিন এই কাজ করিতে হয়। এ কাজে তাঁহার বড় আসক্তি ছিল না; যখনই তিনি অবসর পাইতেন, তখনই দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। ক্রীটো নামক একজন ধনী দার্শনিক সক্রেটিশের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আসক্তি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের সন্তানদিগের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল গেলে, তিনি পৈতৃক ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ করেন। সক্রেটিশ প্রথমতঃ আর্কিলস্ নামক একজন দার্শনিকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আর্কিলস্ ইঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সক্রেটিশ ইঁহার সঙ্গে সেমস্, পাইথো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে যান। তিনি দামে ও প্রডিকাস্ নামক ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট হইতেও অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। সেই প্রাচীন কালে গ্রীসে যতপ্রকার বিদ্যার চর্চ্চা হইত, সক্রেটিশ নানা ব্যক্তির সাহায্যে সেই সমস্ত বিদ্যাতেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলেন। যখন এথেন্সের সহিত স্পার্টার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সক্রেটিশকে নিজ দেশের পক্ষে স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। পটিডির যুদ্ধে সক্রেটিশ অসীম বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সামান্য সৈনিকরূপে যান। যুদ্ধ সময়ে খাদ্যবস্তুর অভাব উপস্থিত এবং অতি তীব্র শীত অনুভূত হয়। সক্রেটিশের ক্ষুধা নিরোধের শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া শিবিরের সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শৈত্যাধিক্য বশতঃ উষ্ণ পোষাক ব্যতীত কখনও কেহ শিবিরের বাহির হইত না; কিন্তু সক্রেটিশ খালি গায়ে বরফের উপর দিয়া হাটিয়া যাইতেন এবং গ্রীষ্মে যে পোষাক ব্যবহার করিতেন, এই তীব্র শীতেও সেই পোষাকেই বাহির হইতেন। এই যুদ্ধে তিনি আহত সৈনিক কর্ম্মচারী ও নিজের শিষ্য আল্‌কিবাইডিসের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার বহু বৎসর পর তিনি বিওসিয়ার বিরুদ্ধে সামান্য সৈনিকরূপে যুদ্ধ করিতে গমন করেন; এখানে ডিলিয়ম নামক যুদ্ধক্ষেত্রে এথেন্সের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হওয়াতে সক্রেটিশ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। পলাইয়া আসিবার সময় প্রিয় শিষ্য যেনোফনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত দেখিতে পান। সক্রেটিশ পদাতিকের বেশে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। রক্তাপ্লুত যেনোফনকে স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক তিনি নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হন। তাঁহার এই শ্রমশীলতা ও ক্লেশসহিষ্ণুতা দেখিয়া সমুদয় সৈন্য ও সেনাপতিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন প্রাতে দেখা গেল যে, তিনি স্কন্ধাবারের এক স্থানে দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ে চিন্তামগ্ন আছেন; এই দাঁড়ান অবস্থায় তাঁহার সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল; তৎপর দিন সূর্য্য উঠিলে তিনি সূর্য্য নমস্কার করিয়া সে স্থান ত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের অল্পকাল পরে তাঁহাকে তৃতীয় বার যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। ইহার পর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এথেন্সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত এই নগরেই বাস করেন। তিনি নিজের জেলার প্রতিনিধি হইয়া এথেন্সের সেনেট সভায় সভ্যরূপে প্রবেশ করেন। এই কাজে যদিও তিনি অনভিজ্ঞতা হেতু প্রথমতঃ সভ্যদের উপহাসপাত্র

হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি দেখাইলেন যে, অন্যান্য সভ্য অপেক্ষা তিনি জ্ঞানে ও সততায় অনেক শ্রেষ্ঠ। এই সময়ে, ৪০৬ পূঃ খৃঃ, আর্গিনিউস্ নামক স্থানে নৌযুদ্ধে স্পার্টা-সেনা পরাস্ত ও তাহাদের সেনাপতি ক্যালিক্রাটিডাস্ হত হন এবং এথেন্সের সৈন্য জয়ী হয়। কিন্তু এথেন্সের সেনাপতিগণ প্রবল ঝড় বৃষ্টির জন্য সমুদায় সৈন্যের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া এথেন্সের সেনেটে তুমুল আন্দোলন হয়। সেনেটের অধিকাংশ সভ্যের মতে সেনাপতিগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সক্রেটিশ এই অপরাধে প্রাণদণ্ড করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; তিনি এই প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইহাতে অনেক সভ্যের সহিত সক্রেটিশের বিরোধ হয়, তাঁহারা সক্রেটিশকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় ডেল্‌ফির এপোলো দেবের মন্দিরে দৈববাণী হইল যে, সক্রেটিশ গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। সকলে আসিয়া সক্রেটিশকে এই সংবাদ দিল, কিন্তু সক্রেটিশ ইহা বিশ্বাস করিলেন না। সক্রেটিশ এই দৈববাণী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এথেন্সের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিজ্ঞ, অভিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত, ডাক্তার ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাদের নিজ নিজ শিক্ষিত বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। সক্রেটিশের ধারণা ছিল, এই সমুদয় ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, কিন্তু আলাপের পর বুঝিলেন যে, তাঁহারা নিজের মূর্খতা বুঝেন না, কিন্তু সক্রেটিশ নিজের অজ্ঞতা নিজে বুঝিতে পারেন এবং তিনি স্থির করিলেন যে, এই হিসাবে ডেল্‌ফির দৈববাণী সত্য। এনিটস্ নামে এক ধনী চর্ম্মব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার ২য় পুত্রের শিক্ষা লইয়া সক্রেটিশের মনোবাদ হয়। এনিটসের ২য় পুত্র সক্রেটিশের ছাত্র ছিল, তিনি এই ২য় পুত্রের সম্মুখেই সক্রেটিশকর্তৃক ভর্ৎসিত হন। ভর্ৎসনার হেতু এই যে, এনিটস্ পুত্রদ্বয়কে লেখা পড়া ছাড়াইয়া চর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়ের সম্মুখে ভর্ৎসিত হইয়া নিজকে অপমানিত বোধ করেন, এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। এনিটস্ এথেন্সে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সক্রেটিশ যুবকদিগকে বিপথে চালাইতেছেন। বড় লোকের সন্তানেরা সক্রেটিশের উপদেশ লাভের জন্য ব্যগ্র হইত এবং তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের প্রতি অমনোযোগী হইয়া অনেক সময় সক্রেটিশের নিকট উপস্থিত থাকিত, এবং সৎ কি, অসৎ কি, ন্যায় কি, অন্যায় কি, সুন্দর কি, কুৎসিৎ কি, এই সমুদয় বিষয়ের বিচারে নিযুক্ত থাকিত। এই সমুদয় কারণে এনিটস্, লিকো ও মিলিটাস্-নামে তিন ব্যক্তি সক্রেটিশের নামে অভিযোগ করেন। বিপক্ষীয়েরা আরও বলিলেন যে, তিনি কোন দিন কোন দেবতার পূজা করেন নাই, বা দেবতার নিকট উপহার দেন নাই। সক্রেটিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার চলিতে লাগিল; বিচারস্থলে সক্রেটিশ বলিলেন, তিনি কোন অপরাধ করেন নাই। অধিকাংশ সভ্যের মতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তৎকালে বিষপ্রয়োগে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। হেমলক্ নামক বিষ তাঁহাকে পান করিতে দেওয়া হয়। ৩৯৬ পূঃ খৃঃ তিনি হেমলক্ বিষপানে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এথেন্সের নিয়মানুসারে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে ১ মাস কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল, এই সময় তাঁহার আত্মীয়, স্বজন, শিষ্য এবং পরিবারবর্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন এক শিষ্য বলিলেন "মহাশয়! আমাদের দুঃখ হয় যে আপনি বিনা দোষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন।" সক্রেটিশ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "দেখ, তোমরা কি ইচ্ছা কর যে আমি দোষী হইয়া প্রাণত্যাগ করি?" শিষ্য উত্তর শুনিয়া নির্ব্বাক্, অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইল। আর এক দিন এক শিষ্য কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়া সক্রেটিশের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিয়া গুরুর নিকট স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সক্রেটিশ শিষ্যকে বলিলেন "আমি কোথায় যাইব? যদি তুমি এমন স্থানে লইয়া যাইতে পার যেখানে মৃত্যু নাই, তাহা হইলে আমি তোমার অভিপ্রায়ানুসারে কাজ করিতে পারি।". সক্রেটিশ মনে করিতেন যে, ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার আত্মা আছেন; ইঁহারা মনুষ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, এই সমুদয় আত্মা পবন, বজ্র ইত্যাদি নৈসর্গিক পদার্থ। ইঁহারা ঈশ্বরের ভৃত্য এবং তাঁহারই আদেশে ইঁহারা মনুষ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

সক্রেটিশ বলিতেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে (ঈশ্বরে) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে পৃথক্ বস্তু। এই হিসাবে সক্রেটিশ দ্বৈতবাদী। বস্তুতঃ সক্রেটিশ একেশ্বরবাদী ছিলেন ; কিন্তু তিনি নিম্ন দেবতাদিগের (Lesser Gods) পূজা সমর্থন করিতেন। পূজা সমর্থন করিলেও তিনি বলিতেন, দেবতারা অভক্তের পূজা গ্রহণ করেন না। তিনি নিজে কোন দিনও কোন দেবতার নিকট পূজোপহার দেন নাই।

সালাহ্ উদ্দীন (Saladin)—মিশরের বিখ্যাত সুলতান। ইনি ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে মিশরের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের কার্য্যকুশলতায় ও বুদ্ধিবলে মিশরের রাজপদ লাভ করেন। তাঁহার সময়ে ইয়োরোপের রাজগণ তৃতীয়বার ধর্ম্মযুদ্ধ (ক্রুসেড্) ঘোষণা করিয়া জেরুজেলমে প্রবল সেনাদল প্রেরণ করেন। সালাহ্উদ্দীন এই ধর্ম্মযুদ্ধঘোষণাকারী ইয়োরোপীয় সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া জেরুজেলম অধিকার করেন। জেরুজেলম খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয়েরই নিকট পবিত্র। যেহেতু যিশুখৃষ্টকে মুসলমানগণও অতি ভক্তির সহিত দর্শন করিয়া থাকেন। প্রথম ধর্ম্মযুদ্ধের সময় ইয়োরোপীয় সৈন্য জেরুজেলম মুসলমানদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তত্রত্য বহুসহস্র মুসলমান ও য়িহুদি অধিবাসিগণকে হত্যা করে। কিন্তু সালাহ্উদ্দীন তৃতীয়বার ধর্ম্মযুদ্ধে খৃষ্টানগণের নিকট হইতে জেরুজেলম উদ্ধার করিয়া খৃষ্টান অধিবাসীদিগকে নিজ ব্যয়ে ৪০ দিন পর্য্যন্ত নিজ সৈন্য সঙ্গে দিয়া ইয়োরোপে পাঠাইয়া দেন। তিনি বিজিত অধিবাসিগণের উপর যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। জেরুজেলম অবরোধ করিয়া তিনি অধিবাসীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনারা জানেন এবং আমিও জানি যে জেরুজেলম পবিত্র স্থান ; আমি ইহা রক্তস্রোতে অপবিত্র করিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা নগর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসুন, আমি আপনাদিগকে প্রচুর অর্থ দিব এবং আপনাদের ভরণপোষণের জন্য আপনারা যত জমি চাহিবেন, আমি তত জমিই আপনাদিগকে দিব।" কিন্তু জেরুজেলমবাসিগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করাতে তিনি বলপ্রয়োগে উহা অধিকার করেন। অবাধ্যতার জন্য অধিবাসীদিগকে শাস্তি না দিয়া তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন।

সিজার (জুলিয়াস)—এই জগদ্বিখ্যাত বীরপুরুষ ১০০পূঃ খৃষ্টাব্দে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কয়াস জুলিয়াস সিজার ও মাতা অরিলিয়াস। সিজার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় সিনার কন্যা কর্ণিলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। কর্ণিলিয়ার গর্ভে সিজারের জুলিয়া নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই সময়ে সলা রোমের সর্ব্বপ্রধান লোক ছিলেন ; এবং তিনি ডিক্টেটর পদে আসীন ছিলেন। সলা সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের প্রতিনিধি। সলার দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন —একজনের নাম মেরিয়াস ও অপর ব্যক্তি জুলিয়াস সিজারের শ্বশুর সিনা। মেরিয়াস ও সিনা উভয়েই জনসাধারণের প্রতিনিধি। সিজার শ্বশুরের সাহায্যে ধীরে ধীরে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। সলা সিজারের প্রতিভা ও ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। সিজার রোম হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। সিজার বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ যে প্রচুর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা সলার আদেশে সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। সলা বুঝিয়াছিলেন যে, সিজার যেরূপ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ এবং অল্পকালের মধ্যে যেরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বধ না করিলে, অচিরে অভিজাতদিগের ক্ষমতা লুপ্ত হইবে। সিজার এসিয়ামাইনরে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং সলার মৃত্যুর পর তিনি রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন যে, মিটেলাস, ক্রেসাস ও পম্পী অভিজাতদলের প্রতিনিধিরূপে প্রবল ক্ষমতাবিস্তারপূর্ব্বক শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। সিজার ৬৯ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসর ট্রিবিউন পদ হইতে ক্রমে কোয়েষ্টার ও এডিলি পদে উন্নীত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি নানাপ্রকার সৎকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক রোমীয়দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রোমনগরী সুশোভিত করেন এবং রোমবাসীদিগকে নিজ ব্যয়ে প্রদর্শনী (Exhibition) প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শনীতে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ক্রীতদাসদিগকে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর সহিত যুদ্ধ করান হইত। এই যুদ্ধকে "গ্লডিয়েটরিয়েল যুদ্ধ" (Gladiatorial fight) বলা হইত।

এই নিষ্ঠুর মল্লক্রীড়া দেখিয়া তদানীন্তন রোমীয়েরা অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিতেন। সিজার নিজব্যয়ে এইরূপ ৩৫০টী মল্লক্রীড়া রোমবাসিগণকে দেখাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নৃত্য, গীত ও অভিনয়, দেখাইবার ও শুনাইবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, সিজার এইরূপে ব্যয় করিয়া ১৩ শত স্বর্ণ ডিউকাট অর্থাৎ প্রায় ৮ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। ৬০ পূঃ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে স্পেনে প্রেরিত হন এবং অল্পকাল পরেই রোমে প্রত্যাগমন করিয়া কন্সাল পদে নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে আসীন হইয়া ক্রেসাস ও পম্পীকে নিজ মতে আনয়ন করেন। এখন সিজার, ক্রেসাস ও পম্পী এই তিন জন রোমে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। সিজার কন্সাল পদ পরিত্যাগ করিয়া ৫ বৎসরের জন্য আল্পস পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বস্থ "গল" (Gaul) প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে গমন করেন। তাঁহার সহিত ২৪ হাজার সৈন্য রোম হইতে দেওয়া হয়। তিনি এই কাজে এরূপ যুদ্ধ-কৌশল ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি রোমরাজ্যে সর্ব্বপ্রধান পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। সিজার রোণ নদীর তীরস্থ জর্ম্মণ জাতিকে পরাজিত করেন এবং উত্তরে ব্রিটিশ প্রণালী পর্য্যন্ত আপনার ক্ষমতা বিস্তার করেন। তাঁহার প্রতাপে উত্তরে ব্রিটিশ প্রণালী, দক্ষিণে আল্পস পর্ব্বত, পূর্ব্বে রাইন নদী ও পশ্চিমে রোণ নদী, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ রোমের অধীন হইল। তিনি ব্রিটিশ প্রণালী পার হইয়া ইংলণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য ব্রিটনদিগকে পরাভূত করিয়া কর প্রদান করিতে বাধ্য করেন। ইহার পর ক্রেসাসের মৃত্যু হইলে সিজার ও পম্পী রোম সাম্রাজ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। নানা কারণে সিজার ও পম্পীতে মনোবাদ উপস্থিত হয়; মনোবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। পম্পী রোম পরিত্যাগ করিয়া গ্রীসে প্রস্থান করেন। নানা স্থানে সিজারের সৈন্যের সহিত পম্পীর সৈন্যের যুদ্ধ হইল। অবশেষে ফার্সেলিয়া ক্ষেত্রে সিজার ও পম্পী উভয়ে সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে সিজারের ৩১০০০ হাজার ও পম্পীর ৪৭ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল। পম্পী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মিশরে পলায়ন করেন। এখানে মিশরের রাজা টলেমি পম্পীর হত্যা সম্পাদন করিয়া তাঁহার মস্তক সিজারের নিকট পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে যে, সিজার পম্পীর ছিন্নমস্তক দর্শনে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। পম্পীকে বধ করিয়াও টলেমি সিজারের মন পাইলেন না। সিজারের সহিত টলেমির মনোবাদ উপস্থিত হইল। টলেমি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তিনি নীলনদে নৌকাসহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সিজার মিশরের ভূতপূর্ব্ব রাজার ভগিনী অতুলনীয় রূপলাবণ্যসম্পন্না ক্লিওপেট্রাকে মিশরের সিংহাসনে স্থাপন করেন; মিশরের যুদ্ধ শেষ হইল। সিজার রোমে ফিরিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেনে যাইতে হইল। সেখানে শান্তি-সংস্থাপন করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক বিজয় ঘোষণার সহিত তিনি রোমে প্রবেশ করেন। এই ঘটনার পর সিজার অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সিজারের বহু শত্রু এবং মিত্রগণের মধ্যেও অনেকে সিজারের ক্ষমতাদর্শনে মনে করিলেন যে, সিজার সম্রাট্ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। যাহাতে রোমে রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না হয়, তজ্জন্য সিজারের শত্রু ও মিত্রগণ গোপনে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারগৃহে দিবালোকে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করেন। এই ঘটনা ৪৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হয়। সিজারের পরম বন্ধু ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস্ নামে অপর এক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের নেতা ছিলেন। ইনি স্বীয় নামানুসারে বৎসরের ৭ম (প্রাচীন রোমীয় পঞ্জিকার ৬ষ্ঠ) মাসের নাম "জুলাই" রাখেন। ইঁহার পোষ্যপুত্র রোমের প্রথম সম্রাট্ অগাষ্টাস সিজার স্বীয় নামানুসারে বৎসরের ৮ম মাসের নাম আগষ্ট রাখেন।

সিসিরো—প্রাচীন রোমের একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও বক্তা। সিসিরো ১০৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে রোমে কন্সাল পদ লাভ করেন। জুলিয়াস সিজার ও পম্পীতে যখন মনোবাদ উপস্থিত হয় তখন সিসিরো পম্পীর পক্ষ অবলম্বন করেন। ফার্সেলিয়া ক্ষেত্রে পম্পীর পরাভবের পর সিসিরো রোমে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সিজারের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হন। অতঃপর তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সিজারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি এণ্টনি রোমে

প্রাধান্য লাভ করেন। সিজারের হত্যাকাণ্ডে যাঁহারা সংসৃষ্ট ছিলেন তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য ইনি এণ্টনিকে পরামর্শ দেন; কিন্তু এণ্টনি ইঁহার কথায় কর্ণপাত করেন না। ইহা লইয়া এণ্টনি ও সিসিরোতে মনোবাদ উপস্থিত হয়। এণ্টনির চক্রান্তে সিসিরো ৪৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে হত হন। তাঁহার মস্তক ও হস্তদ্বয় কর্ত্তিত হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ এণ্টনির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপে রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ও দার্শনিক পণ্ডিতের শোচনীয় অবসান হয়।

সেক্‌স্‌পীয়ার (উইলিয়ম)—সর্ব্বপ্রধান ইংরেজ কবি। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ওয়ারউইকসায়ারে (Warwickshire) এভননদীর তীরবর্ত্তী ষ্ট্রটফোর্ড নগরে (Stratford-on-Avon) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জন সেক্‌স্‌পীয়ারের যে বংশে জন্ম, সে বংশীয়দের ব্যবসায় দোকানদারি, কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়ার এক উচ্চবংশীয়া মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মহিলার নাম মেরি আর্ডেন। এই বিবাহে তিনি কিছু ভূসম্পত্তিও পাইয়াছিলেন। জন সেক্‌স্‌পীয়ার অল্প বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; নানাপ্রকার দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি হস্তচ্যুত হয় এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া কিছুকালের জন্য তিনি কারাবাস ভোগ করেন। এই সমুদয় ঘটনা হইতে অনুমিত হয় যে, উইলিয়ম সেক্‌স্‌পীয়ারের পিতা অর্থাভাবে ভাবিকবির অধ্যয়নাদি সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। উইলিয়ম সেক্‌স্‌পীয়ার উপযুক্ত বিদ্যাচর্চ্চার অভাবে অল্পবয়সেই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি হইয়া উঠেন। স্থানীয় শান্তিরক্ষক তাঁহার প্রতি কঠোর শাসন ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সেক্‌স্‌পীয়ার ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তিরক্ষকের নামে একটী কুৎসাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া তাঁহার বাড়ীর সদরদরজায় টানাইয়া দেন। এই ঘটনায় শান্তিরক্ষক সেক্‌স্‌পীয়ারের উপর আরও ক্রুদ্ধ হন। সেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৃহত্যাগপূর্ব্বক লণ্ডনে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। রাজধানীতে আসিয়া তিনি এক নাটকের দলে প্রবেশ করেন এবং অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকেন। এখানেই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। নাটকের দলে থাকিয়া তিনি নানাবিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার নাটকগুলি অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, তিনি প্রচলিত আইন, নৌবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

লোকচরিত্র অঙ্কনে তিনি অদ্বিতীয়। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন "কালিদাস ভারতের কবি, কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়ার জগতের কবি।"

লণ্ডনের নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ গ্রামে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহার উপর নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; মাতা ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ছিল; এই পুত্রের নাম তিনি "হেমলেট" (Hamlet) রাখেন। পুত্রটী দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কালকবলে পতিত হয়। এই পুত্রের মৃত্যুর সহিত সেক্‌স্‌পীয়রের বংশ লোপ হয়। তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা ছিল; এই কন্যাদ্বয়কে তিনি উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতাটীকে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নূতন বাড়ীতে লইয়া যান। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত কবি দেহত্যাগ করেন। তিনি ৩৮ খানি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই নাটকগুলির অধিকাংশই অত্যুৎকৃষ্ট; ইহাতে মানবচরিত্র যেরূপ বিশ্লিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রকৃতই বিস্ময়োদ্দীপক।

এই মহাকবিপ্রণীত নাটকগুলি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত (Historical), (২) কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত (Fictitious)। এই প্রথমোক্ত নাটকগুলি আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(ক) যে সমুদয় ঘটনার ঐতিহাসিক তথ্য যথার্থরূপে নির্ণীত হয় নাই তদবলম্বনে লিখিত (Legendary), যথা, হেমলেট (Hamlet); ম্যাকবেথ (Macbeth) ইত্যাদি। (খ) যে সমুদয় ঘটনার ঐতিহাসিক তথ্য যথার্থরূপে নির্ণীত হইয়াছে (Authentic), যথা, জুলিয়াস সিজার (Julius Caesar), রাজা জন (King John) ইত্যাদি। এই (ক) বিভাগের নাটকগুলিতে মোট ৬ খানা নাটক; তন্মধ্যে ৫ খানা দুঃখান্তক ও

একখানা সুখদুঃখাত্মক। (খ) বিভাগের অন্তর্গত মোট ১৩ খানা নাটক; তন্মধ্যে তিন খানা রোমীয় ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, বাকী ১০ খানা ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। এই দশ খানার মধ্যে আবার ৫ খানা ইয়র্ক পরিবারের ও অপর ৫ খানা ল্যাঙ্কাষ্টার পরিবারের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে ১৯ খানি নাটক লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে মার্চেণ্ট অব ভেনিস (Merchant of Venice), মিড্ সামার নাইট্স্ ড্রিম (Mid Summer Night's Dream), রোমিও জুলিয়েট (Romeo Juliet) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

সোলন—প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত ব্যবস্থাকর্ত্তা ও জ্ঞানিপুরুষ। সোলন ৬৩৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এথেন্সের দক্ষিণে অবস্থিত সেলামিস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সোলন এথেন্সবাসিগণের অনুরোধে তাহাদের শাসনপ্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। প্রাচীন গ্রীসে যে সাতজন জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে সোলন অন্যতম। সোলন গ্রীসের প্রাচীন রাজা কোড্রাসের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এথেন্সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন। বিদেশ পরিভ্রমণের পর তিনি জন্মভূমি সেলামিসে যাইয়া দেখেন যে, উহা আত্মকলহে উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে। দেশের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি একখানি কবিতা রচনাপূর্ব্বক এথেন্সের জনসাধারণের নিকট তাহা পাঠ করেন। এথেন্সবাসিগণ ইহা শ্রবণে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বহু সৈন্য সেলামিসে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যের সাহায্যে তিনি সেলামিসে শান্তি স্থাপন করেন। ইহার পর হইতে সেলামিসের লোকেরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতে লাগিল এবং দেশ-রক্ষার সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিল। অতঃপর তিনি আবার ১০ বৎসরের জন্য বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন। এইবার তিনি লিডিয়ার বিদ্যোৎসাহী রাজা ক্রিসাসের সভায় উপস্থিত হন। ক্রিসাস পূর্ব্বেই সোলনকে জ্ঞানী বলিয়া জানিতেন। তিনি তাঁহার নিকট নিজ ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি সুখী কি না। সোলন উত্তরে বলিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত লোকের মৃত্যু না হয়, ততদিন তিনি তাহাকে সুখী বলিতে পারেন না। রাজা ক্রিসাস এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি একটু বিরক্তির সহিতই সোলনকে বিদায় করিলেন। কিছুদিন পরে পারস্যরাজ সাইরাস লিডিয়া আক্রমণ করিয়া ক্রিসাসকে বন্দী করেন এবং তাঁহাকে দগ্ধ করিতে আদেশ দেন। পারস্যরাজের আদেশানুসারে ক্রিসাসকে সজ্জিত কাষ্ঠস্তূপের উপর স্থাপন করা হইল এবং কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করা হইল। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তখন ক্রিসাস মনের আবেগে "সোলন", "সোলন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পারস্যরাজ এরূপভাবে সোলনের নাম উচ্চারিত হওয়ার কারণ অবগত হইয়া অবিলম্বে ক্রিসাসকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, পারস্যরাজ ক্রিসাসকে তদীয় রাজ্যসহিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন প্রত্যর্পণ করিলেন। সাইরাস মনে করিলেন যে, ক্রিসাসের দশা তাঁহারও হইতে পারে। এইরূপে সোলনের উপদেশ লিডিয়ারাজ ক্রিসাসকে এবং পারস্যপতি সাইরাসকে সৎপথে চালিত করিয়াছিল। ৫৫৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে সোলন পরলোক গমন করেন।

স্কট (সার, ওয়াল্টার)—বিখ্যাত উপন্যাসলেখক ও কবি। সার ওয়াল্টার স্কট ১৭৭: খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্কটলণ্ডের প্রধান নগর ‘ডিনবার্গ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ধনাঢ্য ও মাতা বিদুষী ছিলেন। স্কটের ভ্রাতা ও ভগিনী ১১জন ছিল; তন্মধ্যে ৬ জন অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশিষ্ট ৫ জনের মধ্যে ৪টী ভাই ও একটী ভগিনী। ভগিনীটী চিররুগ্না ছিলেন; এজন্য স্কট সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বাল্যকালে স্কটও রুগ্ন ছিলেন। .৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হন; স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি কলেজে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন না. মধ্যম রকমের ছাত্রমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া প্রায় দুই বৎসর শয্যাগত থাকেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কিছু সুস্থতা লাভ করিয়া এক আফিসে কেরাণীগিরি গ্রহণ করেন। ১৭৯২-৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এডিনবার্গ সাহিত্য-সভায় তিনখানি রচনা পাঠ করেন, তিনখানিই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং রচনার মৌলিকতার জন্য তিনি প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

তৎপরবর্ত্তী বৎসর জুলাই মাস হইতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু ভাবী ঔপন্যাসিক এই ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারেন নাই। তিনি চৌদ্দ বৎসর ব্যাপী ওকালতির মধ্যে একদিন মাত্র দেওয়ানি আদালতে গিয়াছিলেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্গারেট নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খৃঃ তিনি বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বেতনে সেরিফের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮০৬ খৃঃ তিনি সেসন কোর্টের প্রধান কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন; এই কাজের বার্ষিক আয় ১৩০০ পাউণ্ড। তিনি ১৮৩০ খৃঃ নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই কাজে ছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ তিনি পিতৃব্যপরিত্যক্ত এক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন; এই সম্পত্তিতে তাঁহার প্রচুর আয় ছিল। ১৮০৫ খৃঃ ৩৪ বৎসর বয়সে "লে অব দি লাষ্ট মিনিষ্ট্রেল" (Lay of the Last Ministrel) নামক একখানা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখেন। ১৮২২ খৃঃ ও ১৮৩০ খৃঃ দুইখানি নাটক লিখেন; কিন্তু নাটক দুইখানি ভাল হয় নাই। ১৮১৪ খৃঃ হইতে তিনি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। উপন্যাস লিখিয়াই তিনি জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৪ খৃঃ হইতে ১৮২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরে তিনি ২৮ খানি উপন্যাস লিখেন। এই উপন্যাসগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত: (১) ঐতিহাসিক, (২) ব্যক্তিগত জীবন ও অন্যবিধ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। প্রথমোক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে ৭ খানি স্কটলণ্ডের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে, অপর ৭ খানি ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লইয়া এবং অপর তিনখানি ইয়োরোপ মহাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ১৮২৬ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহার সময় সুখে অতিবাহিত হয়। কাব্য ও উপন্যাস লেখার সময়ে বহুলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি বন্ধুদিগের সহিত অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি প্রত্যহ নিজ বাগানের কাজ করিয়াও বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। ১৮১৫ খৃঃ যুবরাজ তাঁহাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সহিত স্কটের সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুবরাজ রাজা হইয়া ৪র্থ জর্জ নাম গ্রহণ করেন এবং স্কটকে সম্ভ্রান্ত পদবীতে উন্নীত করেন। এক্ষণ হইতে তিনি সার ওয়াল্টার স্কট নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ১৮২৬ খৃঃ তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। আর্থিক কষ্টে ও সাংসারিক বিপদে তাঁহার শরীর ও মন ভগ্ন হইল। ১৮৩০ খৃঃ তিনি বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৩১ খৃঃ ২১ শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। সার ওয়াল্টারের তিন পুত্র ছিল; ইঁহারা নিঃসন্তান। পুত্রগণের মৃত্যুর সহিত সার ওয়াল্টারের বংশ লোপ পায়।

হ

হস্‌দ্রুবল—জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি হানিবলের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনিও রোমীয়দের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পুনিকযুদ্ধে কার্থেজীয়সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন। হানিবলের কার্য্যক্ষেত্র ইতালি; কিন্তু ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র স্পেনদেশ। ২০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে হানিবল রোমীয়দিগকে ক্যানে নামক যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া হস্‌দ্রুবল্‌কে তাঁহার সাহায্যার্থ ইতালিতে আগমন করিতে লিখেন। হস্‌দ্রুবল আল্পস্ পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া ইতালিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এমন সময় একজন রোমীয় সেনাপতি অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড কৌশলক্রমে হানিবলের শিবিরে নিক্ষিপ্ত হয়। হানিবল ভ্রাতার মৃত্যুতে নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (হানিবল দেখ)।

হাউয়ার্ড (জন—John Howard the Philanthropist)—এই বিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক ইংলণ্ডের অন্তর্গত "হেকনে" নগরে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের কারাগারসমূহে বন্দীদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার হইত। এই অত্যাচারে বহু কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত একপ্রকার সংক্রামক জ্বরে কয়েদীগণ আক্রান্ত হইয়া কালকবলে পতিত হয়। জন হাউয়ার্ড ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বেড্‌ফোর্ডের শেরিফ পদে নিযুক্ত হইয়া কয়েদীদিগের এই দুর্দ্দশা নিজচক্ষে দেখিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। তিনি কারাগারের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য পার্লেমেণ্টে তুমুল

আন্দোলন করেন। তাঁহার অশেষ চেষ্টায় "কারাগার সংস্কারক আইন" বিধিবদ্ধ হইল। কয়েদীদের দুঃখ দূর হইল। এই সময় হইতে হাউয়ার্ড বিশ্বপ্রেমী (Philanthropist) নামে অভিহিত হইলেন।

হানিবল—বিখ্যাত কার্থেজীয় সেনাপতি। ইনি ২৪৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হামিল্কর। পূর্ব্বকালে এশিয়ামাইনরের উপকূলে ফিনিসীয় নামে একজাতি বাস করিত। উহারা বণিক; বাণিজ্য ব্যবসায়ে ইঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এশিয়ামাইনরের উপকূল হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে এক দ্বীপের উপর টায়র নগর অবস্থিত; এই নগরই ফিনিসীয়দিগের প্রধান বাণিজ্যবন্দর। আফ্রিকাখণ্ডে পূর্ব্বকালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী কার্থেজ (Carthage) নামে এক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এই নগর ফিনিসীয়দের উপনিবেশ। রোমীয়েরা ফিনিসীয় জাতিকে পুনিক (Punic) বলিতেন; এজন্য রোমীয়দিগের সহিত কার্থেজবাসীদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহা পুনিকযুদ্ধ (Punic war) নামে ইতিহাসে খ্যাত। কার্থেজীয়েরা কেবল বাণিজ্যেই নিপুণ ছিলেন, এরূপ নহে, তাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে ও যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সিসিলিদ্বীপ ও স্পেনের উপকূলভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য-প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে রোমীয়েরা মহাবিপদ গণিলেন; তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, কার্থেজীয়েরা তৎকালপরিজ্ঞাত পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছেন। অতএব তাঁহারা কার্থেজীয়দিগকে উন্নতির পথে বাধা দিলেন। দুই প্রবলজাতির মধ্যে অনতিবিলম্বে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ তিনবার সঙ্ঘটিত হয়। প্রথম পুনিক যুদ্ধ ২৬৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২৪১ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৩ বৎসর কাল, দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ ২১৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২০১ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর কাল এবং তৃতীয় পুনিক যুদ্ধ ১৪৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একবৎসর কাল স্থায়ী হয়। প্রথম পুনিক যুদ্ধে হানিবলের পিতা হামিল্কর কার্থেজীয় সৈন্যের নেতা ছিলেন। এই যুদ্ধে হামিল্কর পরাজিত হন এবং উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধে মহাবীর হানিবল কার্থেজীয়দের নেতা। এই যুদ্ধের মধ্যভাগে হানিবল ইটালীতে প্রবেশ করিয়া রোমের অতি নিকটে ক্যানে নামক স্থানে লক্ষাধিক রোমীয় সৈন্যকে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধে রোমের পতন আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনে হানিবল পরাজিত হন এবং ১৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে শত্রুকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া বিষাক্ত অঙ্গুরীয় লেহনে প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয় পুনিক যুদ্ধে কার্থেজীয়দিগের পরাজয় ও কার্থেজ নগর ধ্বংস হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজীয় রমণীগণ ধনুর জ্যা-নির্ম্মাণার্থ স্ব স্ব কেশপাশ কর্ত্তন করিয়া দিয়া স্বদেশপ্রীতির জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হাফেজ—বিখ্যাত পারসিক কবি। হাফেজ তাঁহার প্রকৃত নাম নহে, উপাধি মাত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম খাজা হাফেজ সমসুদ্দীন মহম্মদ। বোগদাদের অধিপতি সুলতান আহাম্মদ ইঁহাকে পারস্যদেশের অন্তর্গত সিরাজ হইতে স্বীয় রাজধানী বোগদাদে আনয়ন করেন। পারস্যের সিরাজনগরেই কবির জন্ম এবং এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ৭৯৪ হিজিরিতে কবি পরলোক গমন করেন। সুলতান বাবর তাঁহার সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। এই বিখ্যাত কবির সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম "দেওয়ান হাফেজ"।

হাম্বাল (Hambal)—ওরফে আহ্‌মদ-ইব্নে-হাম্বাল। ইঁহার পিতা মোহাম্মদ-ইব্নে-হাম্বাল চতুর্থ ইমাম বলিয়া পরিচিত। আহ্‌মদ হাম্বালও অন্যতম ইমাম ছিলেন। ইঁহাকে মুসলমানগণ গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম এবং ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, মৃত্যুর পর ইঁহার সমাধির সময় ৮ লক্ষ পুরুষ ও ৬০ হাজার স্ত্রীলোক ইঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন; এবং ইহাও কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর দিবস ২০ হাজার খৃষ্টান ও য়িহুদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

হারুণ-অর-রশিদ (অর্থাৎ ন্যায়পর হারুণ)—বোগদাদ নগরের বিখ্যাত কালিফ (খলিফা)। এই মহাত্মা ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে বোগদাদ প্রায় সমগ্র মুসলমান

সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। হারুণ ৭৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ২০ বৎসর বয়সে সাম্রাজ্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৪৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি সাহসী, উদারহৃদয় ও দানশৌণ্ড নরপতি ছিলেন। তিনি অত্যাচারিতকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, দীন দুঃখীকে দরিদ্রতার নিষ্পেষণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, রাত্রিতে ছদ্মবেশে বোগদাদ সহরের গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিতেন। অনেক সময় রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতেন। রাজ্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে তিনি যত্নের ত্রুটি করেন নাই; তিনি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে প্রজার হিত হয় তজ্জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি রাজ্যের নানাস্থানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া এবং খাল ও কূপ খনন করিয়া প্রজার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নীর নাম জোবায়েদা। এই পত্নীর নামে মক্কা তীর্থে একটী খাল খনন করা হইয়াছে।

খলিফা হারুণ-অর-রশিদের কবিশক্তি ছিল এবং তিনি কবিদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। চীনের সম্রাট্ ও ফ্রান্সের রাজা সার্লামেন উভয়েই তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বোগদাদের অপর কোন খলিফার নিকট তাঁহারা দূত প্রেরণ করেন নাই। হারুণ-অর-রশিদ ফ্রান্সের রাজদূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজা সার্লামেনের নিকট বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। •এই উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে একটী সুকৌশলে নির্ম্মিত ঘটিকা যন্ত্র ছিল। এই ঘড়িতে, ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা যখন কোন পূর্ণ ঘণ্টার সময় সূচনা করিত, তখন ঘণ্টাসূচক কতকগুলি গোলা একটা পিতলের থালার উপর পতিত হইত এবং সেই গোলাগুলির শব্দ হওয়া মাত্র যতটা শব্দ হইত ততজন অশ্বারোহী একটি দ্বারদিয়া বাহির হইত; শব্দ থামিলে অশ্বারোহীগুলি পুনরায় সেই দরজাদিয়া মধ্যে প্রবেশ করিত।

হাক্‌সলি—জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত। হাক্‌সলি ৩০ বৎসর কাল "রয়েলস্কুল অব সায়েন্‌স" (বর্ত্তমান "রয়েল কলেজ অব সায়েন্‌স") নামক রাজকীয় বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। এই দীর্ঘকালে তিনি বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের অশেষ হিতসাধন করেন। তিনি যে সমুদয় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য বহু পণ্ডিত সমবেত হইতেন এবং বৈজ্ঞানিক সভাসমিতিতে ও পত্রিকায় যে সমুদয় প্রবন্ধ লিখিতেন, জগতের জ্ঞানিজনগণ তাহা পাঠ করিয়া অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার এক একটী প্রবন্ধ এক এক খানা পুস্তক। বহু আয়াস ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া ও অধ্যবসায় দেখিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ চমৎকৃত হইল। ইয়োরোপ ও অন্যান্য দেশ হইতে তাঁহার উপর উপাধি বৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ তাঁহাকে "রয়েল সোসায়িটী"র সভাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া আপনাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। প্রধান মন্ত্রী মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের সহিত জগৎসৃষ্টি ব্যাপার লইয়া তাহার মসীযুদ্ধ হইত; এই গভীর বিষয়ে উভয়ের আলোচনা পাঠ করিয়া লোকে কত উপকার পাইত। হাক্‌সলি দেখাইয়াছেন যে, একটী উচ্চশ্রেণীর বানর ও একটী মনুষ্যে যত প্রভেদ, একটী উচ্চশ্রেণীর ও একটী নিম্নশ্রেণীর বানরে তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, সরীসৃপ (টিকটিকি, সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি) ও পক্ষী এই দুই জাতি একই জাতীয় জীব হইতে উৎপন্ন। তিনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মিড্‌লসেক্‌স্ নামক কাউন্টিতে ইলিং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন দেহ ত্যাগ করেন। তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ "ভিক্টোরিয়া নামক" রণপোতের ও ১৮৪৭ খৃঃ "রটল্‌স্নেক" রণপোতের সরকারী ডাক্তার নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিন বৎসর থাকিয়া ১৮৫০ খৃঃ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি "রয়েল সোসায়িটীর" সভ্য হন। এত অল্প বয়সে অতি অল্পলোকই এই সভার সভ্য হইতে পারিয়াছিলেন।

হাণ্টার—(Sir W. W. Hunter C. I. E. K. C. S. I.)—ইনি ১৮৪০ খৃঃ জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। হাণ্টার সাহেব ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন এবং "সিভিলিয়ান" হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাকে বিভিন্ন জিলার শাসনকার্য্যে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই; অন্যবিধ রাজকার্য্যেই তাঁহার চাকরির অধিকাংশকাল অতিবাহিত হয়। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশে ও দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি Annals of Rural Bengal রচনা করেন। এই বৎসর তিনি ভারতবর্ষ ও এশিয়ার ১৩৯টি অনার্য্য ভাষার একখানি অভিধান রচনা করেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন এবং নগদ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী পদ লাভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের Director General of Statistics পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম লোকগণনা (Census) হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ২০ খণ্ড পুস্তকে বঙ্গদেশের Statistical Accounts প্রকাশিত করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সি আই ই. উপাধি এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কে. সি. এস আই. উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি হন। এই কমিশনে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়গণ সভ্য ছিলেন। এই সভার সভাপতিরূপে এবং বড়লাটের সভার সভ্যরূপে তিনি যে পরিশ্রম করেন তজ্জন্য তিনি বড়লাটের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি বড়লাট লর্ড মেওর (Lord Mayo) অনুরোধে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার" সঙ্কলন করেন। তিনি এই গ্রন্থ শতাধিক খণ্ডে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ পাঠে জগতের লোক অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তৎপ্রণীত "ভারতে ইংলণ্ডের কাজ" (England's work in India) নামক গ্রন্থ তাঁহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছে। এই সমুদয় গ্রন্থ ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি লিখিয়াছেন (১) Orissa (২) A System of Famine Warnings (৩) Life of Lord Mayo (৪) Life of Lord Dalhousie (৫) The Indian Empire its History, Peoples & Products. ১৯০০ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

হিউয়েন্‌সঙ্গ (হুয়েনসঙ্গ)—চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের যোগকাণ্ড শিক্ষা করিবার জন্য তিনি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ৬৩০ হইতে ৬৪৫ খৃঃ মধ্যে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বুদ্ধের জন্মস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ম্লান হইয়া আসিতেছিল। হিউয়েনসঙ্গ জ্ঞানী ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা তদানীন্তন ভারতের অনেক বিষয় অবগত হইতে পারি।

হেয়ার (ডেভিড)—এই ভারত-হিতৈষী মহাত্মা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঘড়ির ব্যবসায় লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি নিজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া বহুলোকের সঙ্গে আলাপে বুঝিতে পারিলেন যে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন না হইলে, দেশীয় লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। এজন্য কর্ম্মসূত্রে যাহাদের সহিত দেখা হইত সকলের নিকটই তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে কথা উপস্থিত করেন। উভয়ে বহুক্ষণ আলাপ করিয়া স্থির করিলেন যে, বালকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য একটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করা হইবে। সুপ্রিমকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার জন হাইড্‌ ইষ্ট এর (Sir John Hyde East) নিকট এ বিষয় উপস্থিত করা হইল। তিনি এ বিষয়ে উৎসাহ দেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। হেয়ার সাহেবের যত্নে এবং উক্ত চিফ জষ্টিশ, রামমোহন রায় ও অন্যান্য দেশীয় ভদ্রলোকগণের পোষকতায়, ১৮১৭

খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরেই হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে "স্কুলবুক্ সোসায়িটী" নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যগণ স্কুলের পাঠোপযোগী ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থনিচয় প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন ও তাঁহার বন্ধু হেয়ার সাহেব নূতন প্রকারের স্কুলপাঠ্য পুস্তক সকল প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে "স্কুল সোসায়িটী" নামে আর একটী সভা স্থাপিত হইল। হেয়ার সাহেব ও রাধাকান্ত দেব এই সভার সম্পাদক হইলেন। কলিকাতা সহরের নানাস্থানে ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনই এই সভার উদ্দেশ্য। হেয়ার সাহেব এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য নিজের ব্যবসায়ের দিকে না চাহিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার ঘড়ির কারবার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা কলিকাতা সহরের উপর একটু স্থান ক্রয় করিলেন। এই স্থানের আয় হইতে তাঁহার নিজের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তিনি এখন এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষার জন্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। ঠনঠনিয়া, কালীতলা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া তিনি প্রথমে স্বপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলি পরিদর্শন এবং তৎপর যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন। অনন্তর হিন্দুকলেজে গমন করিয়া শ্রেণীতে শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। এইরূপে সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রতি এবং আরও কতিপয় ইংরেজের প্রাত লোকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কোন উদ্ভট কবিতা লেখক তাঁহাদের নামে একটী কবিতা রচনা করিয়া প্রচার করেন। সেই কবিতাটী এই ঃ—

"হেয়ার কল্‌ভিন পামরশ্চ ক্যারিমাশম্যানস্তথা।
পঞ্চগোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হেষ্টিংশ—ভারতবর্ষে ইংরেজাধিকৃত স্থানসমূহের প্রথম গবর্ণরজেনারেল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশীর রাজা চৈৎসিংহের উপর অত্যাচার করিতে যাইয়া কাশীবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। এই পলায়ন সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য আছে ঃ—

"হাতী পর হাওদা, ঘোড়ে পর জীন।
জল্‌দি চল্ জল্‌দি চল্, ওয়ারেন হেষ্টিং॥

(এই প্রবাদ বাক্যটী ভ্রমক্রমে কাঃ বাবুর জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে—কান্ত বাবু দেখ।) ইনি ভারতে অনেক উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া বিলাতের পার্লেমেণ্টে ইঁহার নামে অভিযোগ হয়। পার্লে-মেণ্টের সভ্য বিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্কের বক্তৃতায় হেষ্টিংশের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত হেষ্টিংশের বিচার হয়; হেষ্টিংশ বিচারে মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অর্জ্জিত অর্থ মোকদ্দমা পরিচালনে ব্যয়িত হওয়াতে তিনি অতি কষ্টে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ১৭৭২ হইতে ১৭৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেন। চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদিগের ধন লুণ্ঠনই তাঁহার প্রধান কলঙ্ক। (বার্ক দেখ)।

হোমার—প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত অন্ধ কবি। ইনি "ইলিয়ড" ও "ওডিসি" নামক ৬ই খানা মহাকাব্য রচনা করিয়া জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

স্মার্ণার অদূরে মিলিশ নদীর তীরবর্ত্তী কোন স্থানে হোমার জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অজ্ঞাত; মাতার নাম "মিলানোপাস"। মাতা ইঁহাকে "মিলিশিগেনিশ" অর্থাৎ "মিলিশ নদীর সন্তান" বলিয়া ডাকিতেন। "ফিমিয়াস" নামক স্মার্ণার একটী স্কুলমাষ্টার হোমারকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহার যত্নেই হোমার লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হন। ফিমিয়াসের মৃত্যুর পর হোমার তদীয় ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ করেন। অতঃপর হোমার নিজেই অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। হোমার স্কুল বন্ধ করিয়া "মেন্‌টিশ" নামক একজন নাবিকের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। ইনি ইথেকা দ্বীপে উপস্থিত হইয়া কঠিন চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন এবং মেণ্টর নামে কোন সদাশয় ধনীর যত্নে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করেন। মেণ্টরের নিকট তিনি ট্রয়বীর ইউলিসিসের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। ইথেকা হইতে বহির্গত হইয়া তিনি কলোফননামক স্থানে উপনীত হন। এখানে তাঁহার চক্ষুরোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং কিয়দ্দিবস পরে অন্ধ হইয়া পড়েন। অন্ধাবস্থায় কলোফন হইতে স্মার্ণাতে প্রত্যাবৃত্ত হন। বাড়ীতে বসিয়া জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া কষ্টসাধ্য মনে করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কিউমিনামক স্থানে এক চর্ম্ম বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে লোকে তাঁহার কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া তাঁহার নিকট ট্রয়যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কবিতার আবৃত্তি শুনিত। ইহাতে অন্ধ কবির কিছু কিছু আয়ও হইতে লাগিল। এখান হইতে কবি কিয়সদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া লোক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এখানে সকলেই অন্ধ কবিকে সম্মান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্কুলে নিজ নিজ বালকদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি বিবাহ করেন এবং এই বিবাহের ফলে তাঁহার দুইটী কন্যা সন্তান জন্মে। অন্ধকবির রচিত "ইলিয়ড" নামক মহাকাব্যে দশমবর্ষব্যাপী ট্রয়যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণ গ্রীসের (বর্ত্তমান মোরিয়া উপদ্বীপের) অন্তর্গত স্পার্টার রাজা মেনেলসের সহিত এশিয়ামাইনরের অন্তর্গত ট্রয়নগরের রাজপুত্র পারিশের মিত্রতা ছিল। পারিশ মেনেলসের মহিষী হেলেনকে হরণ করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমস্ত গ্রীসের রাজন্যবর্গ ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। দশ বৎসর অবরোধের পর ট্রয়নগর অধিকৃত হয় ও হেলেনের উদ্ধার হয়। ইহাই ইলিয়ড কাব্যের বিষয়। অনন্তর গ্রীসীয় বীর ইউলিসিস ট্রয় হইতে নিজ রাজধানী ইথেকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথে অনেক বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হয়। ইহাই ওডিসি কাব্যের বিষয়।

পরিশিষ্ট

পৌরাণিক যুগ।

সুরথ—চৈত্রবংশজাত নৃপতি; ইঁহার রাজধানী কোলা নগরী। এই নগরী রাজা নন্দিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় ও এক বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর অধিকৃত হয়। রাজা নন্দি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত, ধ্রুবের পৌত্র ও উৎকলের পুত্র। সুরথ পরাজিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করেন এবং অরণ্য আশ্রয় করেন। অরণ্যবাসকালে সমাধি নামক এক বৈশ্যের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব হয়। সমাধি ধনলুব্ধ স্বীয় পুত্রগণকর্ত্তৃক নিজ গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। স্ত্রীপুত্র ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও সমাধি প্রত্যহ কোটিরত্ন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। পুনরায় অনুতপ্ত স্ত্রীপুত্রগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও সংসারে বিরক্ত সমাধি আর গৃহে ফিরেন নাই। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি উভয়ে পুষ্করতীর্থে গমন করেন; তথায় মেধস নামক মুনির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। মুনির পরামর্শে সমাধি প্রকৃতিদেবীর উপাসনা করেন এবং এই দেবীর নিকট উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশে নিষ্কাম গুণাতীত ঈশ্বরকে ভজনা করেন এবং চরমে দুর্লভ পদলাভ করেন। এদিকে মহামুনি মেধস রাজা সুরথকে দুর্গাপূজা-বিধি বলিয়া দেন এবং উক্ত দেবীর মন্ত্র, স্তব ও কবচ দান করেন। রাজা দেবীর কবচ ধারণ করিয়া এবং তদীয় মন্ত্র জপ করিয়া বৈশ্য সমাধির জন্য সিদ্ধিলাভ করেন। আদি প্রকৃতি ঈশ্বরী উভয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। পরমা প্রকৃতির অনুগ্রহে রাজা সুরথ রাজ্য ও বাঞ্ছিত সুখলাভ করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতিখণ্ড ৬২-৬৬ অ)

ঐতিহাসিক যুগ—ভারতবর্ষ।

ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রাজসাহীর পুঁটিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যাবাগীশ প্রণীত কাব্য-চন্দ্রিকার টীকা অতি প্রসিদ্ধ।

কিশোরীলাল রায়—ঢাকা জিলার অন্তর্গত বালিয়াটীর উদারহৃদয় জমিদার। কিশোরীলাল বাল্যকালে সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য ইনি বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ইঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া, ইনি তাহা পিতা জগন্নাথের নামে অভিহিত এবং জগন্নাথ স্কুল "কিশোরীলাল জুবিলী" নামে প্রবর্ত্তিত করেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ টর্ণেডোতে কলেজ গৃহাদি বিলুপ্ত হইলে ইনি তৎক্ষণাৎ বহু টাকা ব্যয়ে তাহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর একবার অগ্নিতে কলেজ গৃহ আসবাবপত্রসহ ভস্মীভূত হইয়া যায়; এবারও তিনি কলেজ গৃহের দেওয়াল ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি টিনের ছাদ দিয়া দেন। কলেজের ছাত্রগণের বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমুদলালের বিবাহ উপলক্ষে তিনি লেবরেটারীর জন্য যথোপযোগী দালান তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। কত শিক্ষার্থী যে তাঁহার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ

সাহায্য লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলেজ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল, এজন্য তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে তিনি জগন্নাথ কলেজ ও জুবিলী স্কুল জনসাধারণের সম্পত্তি করিয়া ট্রষ্টি নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ১৩১৬ সনে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে কিশোরীলাল দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

গদাধর ভট্টাচার্য্য—রাজসাহী জিলার আগদিঘার ভট্টাচার্য্য-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়ার নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিবাদ ও শক্তিবাদ গদাধরের কীর্ত্তি। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গদাধরের বংশজাত।

গোবিন্দ দাস—পিতার নাম পরমানন্দ দাস। রাজসাহীর অন্তর্গত বুধরীগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ইনি বাঙ্গালা ও হিন্দির মিশ্রণে পদ্যমালা নামে এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের আবির্ভাবের ৮২ বৎসর পর গোবিন্দ প্রাদুর্ভূত হন।

জগন্নাথ রায় চৌধুরী—ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ উপবিভাগস্থ বালিয়াটীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার। পিতার নাম নিত্যানন্দ রায় চৌধুরী। ১২১৮ সনের ১৫ই বৈশাখ জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার দ্বিতীয় সন্তান। ধনিগৃহে জন্ম হেতু জগন্নাথ বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষায় অমনোযোগী ছিলেন সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার আদৌ হয় নাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই জগন্নাথ একগুঁয়ে ছিলেন—যাহা মনে করিতেন তাহাই সম্পন্ন করিতেন। ১২৩৩ সনে জগন্নাথ বিবাহিত হন। বিবাহের কতিপয় বৎসর পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং স্বয়ং পৈত্রিক ব্যবসায় ও জমিদারী শাসন সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর জগন্নাথ ক্রমে ক্রমে সাতটী পরগণার অংশ ও বহু তালুক ক্রয় করিয়া বালিয়াটীর জমিদারী প্রভূত পরিমাণ বর্দ্ধিত করেন। জমিদারী দখল এবং জেদ বজায় রাখিবার জন্য জগন্নাথ এক সময়ে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে জনৈক ইংরেজকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি নাগরপুরের কাছারীর ভার প্রদান করিয়াছিলেন। অতি বড় জমিদারীর শাসন সংরক্ষণে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হইলেও জগন্নাথ পৈত্রিক কারবারগুলির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার সময়ে নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, ঝালকাটী, চট্টগ্রামে লবণের, নলছিটিতে চাউলের এবং তুরঙ্গমারীতে সুবৃহৎ তৈলের আড়ত ছিল; এতদ্ব্যতীত মাণিকগঞ্জে তাঁহাদের অতি বড় তামাকের ব্যবসায় আছে। জগন্নাথ বাবু স্বয়ং এই সকল ব্যবসায় পরিদর্শন ও তাহার ব্যবস্থা করিতেন। বালিয়াটীর বসতবাড়ী, ঢাকা বাবুর বাজারের বাড়ী তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। জগন্নাথ বাবু একজন দানশৌণ্ড ভূস্বামী। তাঁহার দানের পাত্রাপাত্র বা জাতি বিচার ছিল না। তিনি বহু ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও কন্যার বিবাহ স্বব্যয়ে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন, বহু অনন্যোপায় লোকের সাহায্য করিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিয়াছেন। জগন্নাথ বাবু ৺কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দির প্রাঙ্গন ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্বেত-প্রস্তরে মণ্ডিত করিয়া দেন। বৃন্দাবনধামে গোবিন্দ জীউর বাটী ও সিংহদ্বার এবং দ্বারপার্শ্বস্থ অট্টালিকা বাবু জগন্নাথের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। উহা প্রস্তুত করাইতে প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি গয়ালীদের থাকিবার জন্য বাঁকীপুরে একটী বাটী ও গয়াধামে ধর্ম্মারণ্যে একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত বহু টাকা ব্যয়ে ফল্গুনদীর গর্ভ হইতে উঠিবার জন্য সুবৃহৎ পাকা ঘাট প্রস্তুত করিয়া যাত্রীদিগের অশেষ আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। নবদ্বীপে মদন গোপাল মহাপ্রভুর বাটীর সুবৃহৎ নাটমন্দির জগন্নাথ বাবুরই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ব্রহ্মপুত্র স্নানের লাঙ্গলবন্ধের পঞ্চমী ঘাট নামক পাকা ঘাট জগন্নাথ বাবু প্রস্তুত করাইয়া দেন। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার তীরে বক্ল্যাণ্ড বাঁধ নামে যে প্রসিদ্ধ বাঁধ আছে জগন্নাথ বাবু উহার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অধিকার মধ্যে তিনি স্বীয় ব্যয়ে বহু জলাশয় খনন করাইয়া পিপাসার্ত্তের ক্লেশ দূর করিয়াছিলেন; মাণিকগঞ্জের "জগন্নাথ ট্যাঙ্ক" তাঁহার সৎকার্য্যের পরিচয় দিতেছে। বালিয়াটীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি উঁহার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, ঢাকার

ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণার্থও তিনি এককালীন ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। জগন্নাথ বাবু নিজে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ না করিলেও বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এজন্য তিনি ঢাকা নগরে জগন্নাথ স্কুল নামে একটী উৎকৃষ্ট উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়া দেন। এক সময়ে ঢাকার সকল স্কুলে যত ছাত্র অধ্যয়ন করিত, এক জগন্নাথ স্কুলের ছাত্র সংখ্যাই তত হইত। জগন্নাথ স্কুল এখন "জুবিলী স্কুল" নামে সর্ব্বত্র খ্যাত। এই প্রসিদ্ধ দানশৌণ্ড ভূস্বামী গ্যাংগ্রিং ক্ষত রোগে কলিকাতাস্থ হাটখোলার ২নং বাটীতে ১২৭৭ সনের ২০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র বাবু কিশোরীলাল জগন্নাথ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা (কিশোরীলাল দেখ)।

জয়নারায়ণ ঘোষাল (রাজা)—কলিকাতার সন্নিহিত ভূকৈলাসের রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কাশীর বিখ্যাত "জয়নারায়ণ কলেজ" ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান আছে। ইনি ভারতের বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; এই সময়ে তদীয় নামানুসারে নোয়াখালিতে জয়নগর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি বহু পণ্ডিতের সাহায্যে কাশীখণ্ডের একখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও রাজা জয়নারায়ণের অপর কীর্ত্তি।

পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার—জন্মস্থান বুড়ির ভাগ—জিলা রাজসাহী। ইনি "ভাষাবৃত্তি" নামে পাণিনীয় ব্যাকরণের এক বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

প্রমথনাথ রায় (রাজা)—দিঘাপতিয়ার প্রসিদ্ধ রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের পোষ্যপুত্র। ইনি পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও সৎকার্য্যে দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ ইনি "রাজাবাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ছোটলাটের আইন সভায় সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে দারুণ জ্বর-রোগে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা প্রমথনাথের চারি পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে কুমার শরৎকুমার রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ। রাজসাহা জিলায় রামপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জীর্ণ সংস্কারার্থ ১০০০০৲ টাকা, দিঘাপতিয়া হইতে রামপুর পর্য্যন্ত রাজপথের সমগ্র সংস্কার ব্যয়, রাজসাহী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ১৮০৲ টাকা আয়ের কোম্পানির কাগজ, রাজসাহী কলেজে বি এ পরীক্ষার শ্রেণী সংযোজিত করিবার জন্য এক কালীন দেড়লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সংখ্যা করা যায় না।

প্রসন্ননাথ রায় (রাজা)—রাজসাহীর দিঘাপতিয়ার প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি সুপ্রসিদ্ধ দয়ারাম রায়ের প্রপৌত্র। ইনি রামপুর জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথায়ই পাঠ শেষ হয়। কিন্তু প্রতিভায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। রাজা প্রসন্ননাথ অতিশয় উদ্যোগী ও কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দানই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। দিঘাপতিয়া হইতে নাটোর হইয়া রামপুর পর্য্যন্ত যে পথ আছে—তাহার জীর্ণ সংস্কারের জন্য রাজা প্রসন্ননাথ—এককালীন ৩৫ হাজার টাকা দান করেন; দিঘাপতিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, নাটোর ও রামপুরের চিকিৎসালয়ের জন্য প্রসন্ননাথ ১০৪৫৬৭৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত দিঘাপতিয়ায় "প্রসন্নকালী" প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন একমণ চাউলের অন্ন ও তদনুযায়ী উপকরণ দ্বারা ভোগ দানের ব্যবস্থা করেন। প্রজাগণের সুবিধার জন্য জমিদারীর স্থানে স্থানে জলাশয় খনন ও নানাক্ষুদ্র দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সৎকার্য্যের জন্য তিনি ১৮৫৪ খৃঃ "রাজাবাহাদুর" উপাধি লাভ এবং ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে অবৈতনিক আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পান। তিনি স্বীয় রাজধানীতে বসিয়া ফৌজদারীর বিচারের কাজ করিতেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

বৎসাচার্য্য—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা। ইনি পুঁটিয়ার রাজবংশের আদি পুরুষ। জন্মভূমি রাজসাহী।

বান্দা—শিখদিগের গুরু। গুরুগোবিন্দের মৃত্যুর পর ইনি গুরুপদে অভিষিক্ত হন। ইনি গুরুগোবিন্দের পুত্রগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় মুসলমানগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন। সম্রাট্ ফেরক্সিয়ার কাশ্মীরের

শাসনকর্ত্তা আব্‌দুস সমাদখাঁকে ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বান্দা পরাজিত ও ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন ও তথায় নৃশংস ভাবে নিহত হন। (১৭১৫ খৃঃ)

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু—বিখ্যাত "বঙ্গবাসী" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। ইনি এই পত্রিকা প্রচার করিয়া বাঙ্গালীজাতির অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। কেবল পত্রিকা প্রচারই ইঁহার একমাত্র স্মরণীয় কর্ম্ম নহে। তিনি অল্পমূল্যে হিন্দু-শাস্ত্র গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনি ১৭৭৬ শকের ১৬ই পৌষ (বঙ্গাব্দ ১২৬১ খৃঃ ১৮৫৪) বর্দ্ধমান জিলায় ইলসরা গ্রামে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু; পৈতৃক নিবাস বেড়ুগ্রাম। ইনি ১৮২৭ শকের ২রা ভাদ্র (বঙ্গাব্দ ১৩১২, খৃঃ ১৯০৫) পরলোক গমন করেন। তিনি এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্ম তাঁহাকে পড়া ছাড়িতে হয় এবং স্বাস্থ্য লাভের জন্য নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে চুঁচুড়ায় অবস্থান কালে তিনি "সাধারণী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকতা করেন; পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ১৮০২ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৮৭, খৃঃ ১৮৮০) বিখ্যাত "বঙ্গবাসী" পত্রিকা প্রকাশিত করেন। পত্রিকা ব্যতীত তিনি মডেলভগিনী, রাজলক্ষ্মী, বাঙ্গালী চরিত প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি হিন্দী বঙ্গবাসী ও টেলিগ্রাফ নামক ইংরেজী পত্রিকাও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বিখ্যাত লেখক ও সমাজ সংস্কারক। যে সময়ে বিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন করিতেছিলেন, যোগেন্দ্রনাথ সেই সময়ে উক্ত সমাজসংস্কার ব্যাপারে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি খ্যাতনামা মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমাজসংস্কার কার্য্যে উৎসাহিত করেন। তিনি এম. এ উপাধি লাভ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের কল্যাণকর বহু গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; এই সমুদয় গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি নদীয়া জিলায় সুবর্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ লাভ করেন এবং ১৮২৬ শকের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (বঙ্গাব্দ ১৩১১, খৃঃ ১৯০৪) পরলোক গমন করেন।

রাজকৃষ্ণ রায়—বঙ্গের বিখ্যাত কবি। ইনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়া এবং বহু বাঙ্গালা নাটক ও প্রহসন লিখিয়া যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইনি "বীণা থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করিয়া বালকদ্বারা ইহাতে স্বীয় নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় করেন। নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি অভিনয়মঞ্চ হইতে বেশ্যা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার এই কার্য্য যে সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি ঋণে জর্জ্জরিত হইয়া, বীণা থিয়েটার, বীণা প্রেস বিক্রয় করেন; ইহাতেও ঋণ পরিশোধ না হওয়াতে পরিবারের স্ত্রীলোকদের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বাল্যকালেই তাঁহার মাতা ও পিতা পরলোক গমন করেন; মাতৃস্বসার যত্নে ও স্নেহে তিনি বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হন। মাতৃস্বসারও আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। দরিদ্রতা রাজকৃষ্ণের চিরসঙ্গিনী; দারিদ্র্যেই তাঁহার জীবনের আরম্ভ এবং দারিদ্র্যেই উহার অবসান হয়। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জীবনের শেষভাগে ইনি ষ্টার থিয়েটারের সংশ্রবে আইসেন; এই নাট্যমঞ্চে তাঁহার নরমেধযজ্ঞ, লয়লামজনু, বনবীর প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হয়। ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া একেবারে নিবিয়া যায়, রাজকৃষ্ণের শেষ জীবনও তদ্রূপ হইয়াছিল। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ; দরিদ্রতা এই বিখ্যাত কবিকে পুড়িয়া মারিয়াছে। রাজকৃষ্ণ অতি দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; তিনি এত অধিক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, যে বঙ্গের আর কোন কবি তাহা পারেন নাই। এই কবি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৬২) জন্মগ্রহণ করেন

এবং বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালের (খৃঃ ১৮৯৩) ২৮শে ফাল্গুন পরলোক গমন করেন। ইনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় বহু কাব্য, নাটক ও প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী (রাজা)—ঢাকা জিলার জয়দেবপুরের জমিদার। ইঁহার পিতা রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন। সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতির দিকে এবং জনহিত কার্য্যে ইনি বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। জয়দেবপুরের সাহিত্য সমালোচনী সভা রাজেন্দ্র নারায়ণের অক্ষয় কীর্ত্তি। কত কবি, কত কাব্যকার, কত লেখক যে সাহিত্য সমালোচনীর সহায়তায় কৃতার্থ হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নগণ্য ব্যক্তির গুণও তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইত না। কবি রাজকৃষ্ণরায়কে মূল রামায়ণের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন—পরে মহাভারতের অনুবাদের জন্যও তিনি ১২,০০০ বার হাজার টাকা দান করেন। বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দেন। ১২৬৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ইঁহার জন্ম এবং ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে মৃত্যু হয়। (কালীনারায়ণ দেখ)।

লালবিহারী দে (রেভারেণ্ড)—"গোবিন্দ সামন্ত" (Bengal Peasant Life) নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিখ্যাত উপন্যাস ও Folk Tales of Bengal নামক গ্রন্থের প্রণেতা। কৃষক-জীবন অবলম্বনে লিখিত এই উপন্যাস রচনা করিয়া ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকও আছে। ইনি হুগলী কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি ১৭ বৎসর বয়সে খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। দেশী খৃষ্টান হইলেও ইনি এমন সুন্দর ইংরেজী লিখিতে পারিতেন, যে অনেক খাস বিলাতী শিক্ষিত সাহেবও তদ্রূপ পারিতেন না। ইনি জেনারেল এসেম্ব্লি বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ পাদ্রি ডফ সাহেবের ছাত্র এবং "Reminiscences of Dr. Duff" নামক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ৬৩ বৎসরে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৬৮ বৎসরে পক্ষাঘাত রোগে দার্জ্জিলিঙ্গে দেহত্যাগ করেন।

লালমোহন সাহা শঙ্খনিধি—এই অদৃষ্টবান্ ব্যক্তি ঢাকা নগরীর দক্ষিণমৈশণ্ডী নামক মহল্লায় গন্ধবণিক্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গারাম সাহা। ইনি নিঃস্ব বণিকের ছেলে; অতি হীনাবস্থা হইতে ইনি ব্যবসায় বুদ্ধিবলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইনি নানাবিধ সৎকার্য্যে অর্থ ও অন্নবস্ত্র দান করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে ইঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমবেত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে "শঙ্খনিধি" উপাধি দান করিয়া গিয়াছেন। যে কয়টী পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয় করিয়া ইনি এই অতুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে "সর্ব্বদদ্রু হুতাশন" ও "সর্ব্বজ্বর গজসিংহ" প্রধান। ১৩১২ সনে ৪৬ বৎসর বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত—ইনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদাদি শাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন। শ্রুতিধর বলিয়া সিদ্ধান্ত মহাশয়ের খ্যাতি ছিল। ইঁহার প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত (১) সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা, (২) সুধাসিন্ধু, (৩) রুদ্রাধ্যায়ের "কাশিনী" নাম্নী টীকা, (৪) বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী কাব্য, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত "বিধবা বিবাহ খণ্ডন" তদীয় পাণ্ডিত্য, বিচার ও অসাধারণ ধীশক্তির পরিচায়ক। রাজসাহীর অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত মহাশয় স্বয়ং পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার প্রণীত পাণিনীয় ব্যাকরণের "ভাষাবৃত্তি" স্বীয় চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করাইয়া প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা—রাজসাহী জিলার অন্তর্গত খুরকাগ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। পদাঙ্কদূত নামক সংস্কৃত খণ্ড কাব্য আজিও শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

হরনাথ রায় (রাজা)—রাজসাহীর অন্তর্গত দুবলহাটীর ভূম্যধিকারী। ইঁহারা জাতিতে শৌণ্ডিক। হরনাথ একজন দানশৌণ্ড ভূস্বামী; তিনি যে সকল সাধু কার্য্যে অর্থ দান করিয়াছেন তাহার পরিচয় এইরূপ :—

(১) রাজসাহী জেলা স্কুল কলেজে পরিণত করিবার জন্য বার্ষিক ৫ পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি, (২) দুবলহাটী হইতে নওগাঁ পর্য্যন্ত পথের জন্য—২০০০০৲ টাকা, (৩) কলিকাতায় জিওলজিকেল বাগানে ১০০০৲, (৪) দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্যাবাসে ১০০০৲, (৫) কলিকাতা ইডেনহিন্দু হোষ্টেলে ১০০০৲, (৬) ছোটলাট ইডেন সাহেবের জীবনী মুদ্রণ জন্য নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১০০০৲, (৭) কলিকাতায় সিটিকলেজের অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থ ৪০০৲, (৮) রাজসাহী কলেজের বোর্ডিং নির্ম্মাণ জন্য ১০০০৲; এতদ্ব্যতীত বোবালিয়া ধর্ম্মসভায় একটী ছাপাখানা ও নওগাঁ সবডিভিসনের কাছারী প্রভৃতি নির্ম্মাণার্থ ৩৬ বিঘা ভূমি দান করিয়াছিলেন।

দুবলহাটীর অতিথিশালা তদ্দত্য ভূস্বামীগণের পুণ্য কীর্ত্তির নিদর্শন। এই সকল সাধু কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা ও ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে রাজাবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯১ খৃঃ রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক যুগ—ভারতবর্ষ ভিন্ন দেশ।

কার্লাইল (টমাস্)—ইংরেজ সাহিত্য ক্ষেত্রের এক উজ্জ্বল রত্ন। এই মহাত্মা ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী এনানডেল (Annandale) এক্লিফেকান নামক স্থানের অদূরে মিড্লবি (Middlebie) নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জেমস্ কার্লাইল; মাতা মার্গারেট। পিতা জেমস্ সরল, সাধু ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন; মাতা সাধ্বী ও পরম গুণবতী ছিলেন। টমাস কার্লাইলে পিতা মাতার গুণাবলী সংক্রান্ত হইয়াছিল। টমাস্ বাল্যকালে এক পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন, পরে ১১শ বর্ষ বয়সে উচ্চশ্রেণী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া ১৪শ বর্ষ বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Edinburgh University) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালে এডিনবরা প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৫ বৎসর কাল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এই পাঁচ বৎসরে তিনি এত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যে তৎকালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপকও তত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ধর্ম্মযাজক হন। কিন্তু কার্লাইল ইহাতে সম্মত হন নাই। যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে টমাস কার্লাইলের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কখনই বলিবেন না যে কার্লাইলের পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। টমাস তাঁহার জন্মস্থান হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী এনান নগরে এক বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হন। এখানে ২ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া তাঁহার বন্ধু আর্ভিং (Edward Irving) সাহেবের পরামর্শে কির্কালডি (Kircaldy) নামক স্থানে গমন করেন এবং তত্রত্য এক স্কুলে অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। কিন্তু এস্থান ভাল না লাগাতে তিনি দুই বৎসর পরে এডিনবরাতে গমন করেন। এই সময়ে সার ডেভিড্ ব্রুষ্টার (Sir David Brewster) এডিনবরা বিশ্বকোষ (Edinburgh Encyclopœdia) সঙ্কলন করিতেছিলেন। তিনি টমাস কার্লাইলের গুণগ্রাম ও বিদ্যাবত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকে ১৪টি শব্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। এই ১৪টি শব্দের কতকগুলি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম:—যথা আর্ল অব চ্যাথাম ও তৎপুত্র উইলিয়ম পিট, ডাক্তার মুর ইত্যাদি; অপরগুলি স্থানের নাম, যথা—হলণ্ড, নরফোক, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নর্দ্দাম্বার্ল্যাণ্ড ইত্যাদি। টমাসের লিখিত এই ১৪টি প্রবন্ধ তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর তিনি চার্লস বুলার (Charles Buller) নামক জনৈক ধনী যুবকের গৃহশিক্ষক হন। এই যুবক সভ্যরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিয়া যে সমুদয় সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা টমাস কার্লাইলের শিক্ষার ফল সূচিত করিয়াছিল। এই যুবকের অকালমৃত্যু কার্লাইলের গভীর শোকের হেতু

হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি লণ্ডন ম্যাগাজিন (London Magazine) নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক জন স্কটের (John Scott) নিকট পরিচিত হন এবং এই পত্রিকায় তিনি জর্ম্মান কবি শিলারের (Schiller) জীবনী লিখিতে থাকেন। শিলারের জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পরে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই জীবনী লিখিতে গিয়া তিনি বিচারশক্তি ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাক্তার ওয়েলস্ (Dr. Welsh) সাহেবের একমাত্র কন্যা জেন ওয়েলস্‌কে বিবাহ করেন। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত এই বিদুষী সাধ্বী রমণী পতির পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে সাহিত্যিক আলোচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। বিবাহের প্রথম ৬ বৎসর তাঁহারা এডিনবরাতে ছিলেন। টমাস রাজধানীর গোলমাল পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পত্নী এডিনবরা হইতে অনতিদূরে ক্রেগেন পাট্টক (Craigen Puttoch) নামক স্থানে এক ক্ষুদ্র তালুক উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। ইহাতে টমাসের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহারা পতি-পত্নীতে তথায় যাইয়া সুখে বাস করিতে থাকেন। এখানে তাঁহারা ৬ বৎসর অবস্থান করেন। এখানে থাকিয়া টমাস এডিনবরা রিভিউ (Edinburgh Review) নামক সাময়িক পত্রিকায় কবি বার্ণসের (Burns) জীবনী লিখেন এবং এখানে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত বিখ্যাত জর্ম্মণ কবি গেটের সহিত চিঠিপত্রে আলাপ হয়। অতঃপর টমাস কার্লাইল লণ্ডনে যাইতে ইচ্ছা করেন। ক্রেগানপাট্টকে ভাল পুস্তকালয় না থাকাতে তাঁহার অসুবিধা হইতেছিল; বিশেষতঃ বৃদ্ধ পিতাকে রাখিয়া জন্মভূমি হইতে দূরদেশে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। ক্রেগানপট্টকে অবস্থানকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং এখন লণ্ডনের দিকে যাইতে আর কোন বাধাই রহিল না। তিনি পত্নীসহ অবিলম্বে লণ্ডনে উপস্থিত হন এবং এখানে চেলসি (Chelsea) নামক স্থানে এক ত্রিতল বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। (১৮৩৩ খৃঃ)। জীবনের অবশিষ্ট সময় তাঁহারা এই বাড়ীতেই বাস করিয়াছিলেন। লণ্ডন নগরে উপস্থিতির পর হইতেই তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এখানে তিনি প্রথমে "সার্টার রিসার্টার" (Sartor Resartur) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থের গৌরব প্রথমে লোকে বুঝিতে পারে নাই; এমন কি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় পণ্ডিত লোকও প্রথমে ইহার গৌরব অনুভব করিতে পারেন নাই। আমেরিকার বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক এমার্শন প্রথমে ইহার গৌরব অনুভব করেন এবং তৎপর ইহার শ্রেষ্ঠতা লোকের নিকট অনুভূত হইতে থাকে। এই সময়ে ১৮৩৭ খৃঃ তিনি ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লিখেন। ইহার প্রথম খণ্ড লিখা হইলে মুদ্রণের পূর্ব্বে তিনি বন্ধু জন ষ্টুয়ার্ট মিলকে দেখিতে দেন। মিলের নিকট হইতে মিসেস্ টেলার নাম্নী এক মহিলা ইহা পাঠ করিতে লইয়া যান। এই হস্ত লিখিত পুস্তক মিসেস্ টেলারের টেবিলের উপর ছিল; দুর্ভাগ্যগতিকে তাঁহার এক পরিচারিকা ইহা অনাবশ্যক কাগজবোধে অগ্নিসাৎ করে। এই দুর্ঘটনা কার্লাইলের গোচর হইলে তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। তিনি মন স্থির করিবার জন্য উপন্যাস পড়িতে থাকেন। কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত উপন্যাস পাঠ করিয়া তিনি পুনরায় উক্ত নষ্ট অংশ লিখিয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি জনসাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়া নানাবিষয়ে স্বীয়মত ব্যক্ত করিতে থাকেন। তাঁহার সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া লোকে তাঁহাকে একজন প্রধান বাগ্মী বলিয়া মনে করিল। তাঁহার বক্তৃতাগুলি নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত। (১) জর্ম্মণ সাহিত্য বিষয়ক (On German Literature), (২) সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক (On the History of Literature, (৩) বর্ত্তমান ইয়োরোপের বিপ্লব-বিষয়ক (On the Revolutions of Modern Europe), (৪) বীর ও বীরপূজা বিষয়ক (On Heroes and Hero-worship)। জার্ম্মাণ সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বীর ও বীরপূজা বিষয়ক বক্তৃতা দিয়া তিনি এই বক্তৃতাবলী শেষ করেন।

অনন্তর তিনি আরও একটি কঠিন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন। জর্ম্মণীতে সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক (Frederick the Great) খ্যাতনামা নৃপতি ছিলেন। কার্লাইল এই বিখ্যাত সম্রাটের জীবনী ও রাজত্বকালের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ লিখিতে ৭ বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়।

ইহার পর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের (Lord Rector) পদ শূন্য হয়। কার্লাইলকে এই পদে মনোনীত করা হয়। বিখ্যাত বেঞ্জামিন ডিজরেলী (The Right Honourable Benjamin Disraeli) যিনি পরবর্ত্তী কালে আর্ল অব বিকন্‌স্‌ফিল্ড (Earl of Beaconsfield) নাম গ্রহণ করিয়া সম্ভ্রান্ত পদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং যিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, তিনি এই পদের প্রার্থী হন কিন্তু অধিক সংখ্যকের মতানুসারে কার্লাইল লর্ড রেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে টমাস কার্লাইল এই সম্মানিত পদ গ্রহণ করিতে এডিনবরাতে উপস্থিত হন। যিনি ৫০ বৎসর পুর্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সামান্য ছাত্র মাত্র ছিলেন, তাঁহাকে এই উচ্চপদে আসীন দেখিতে অধ্যাপক হাক্সলী (Huxley) ও টিণ্ডেল (Tyndall) প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সম্মানিত পদ লাভের পর তাঁহার জীবনের প্রধান দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া দেখেন যে তাঁহার পত্নী ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই দুর্ঘটনার পর তিনি আরও ১৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কোপ্রুশিয় যুদ্ধ (Franco Prussian War) উপস্থিত হইলে তিনি ফরাসীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া টাইমস্ (The Times) নামক বিখ্যাত পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গে প্রস্থান করেন। জীবনের পবিত্রতা, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও মতের বিশুদ্ধিতার জন্য তিনি সভ্য জগতে চিরকাল আদৃত থাকিবেন।

খাকানী (Khaqani) –বিখ্যাত পারস্য কবি। ইঁহার জন্মস্থান শির্‌ওয়ান্। ইঁহার প্রকৃত নাম আফ্‌জাল-উদ্দিন-ইব্রাহিম বিন্‌-আলী-শির্‌ওয়ানী। শির্‌ওয়ানের অধিপতি ইঁহাকে "খাকানী" উপাধি দেন। মক্কা শরীফে গমন কালে ইনি পথিমধ্যস্থ দুইটি প্রদেশের বর্ণনা করিয়া এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য লিখেন। এই কাব্যের নাম তাফাৎ-উল্-ইরাকিন্ (Tuhfat-ul Iraqin)। ইনি পারস্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতিকাব্য লেখক বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং লোকে ইঁহাকে কবিদিগের রাজা (King of Poets) বলিত। ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাব্রিজ নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ১১ ৯ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

খালেদ-ইব্নে-ওয়ালিদ্—ইনি প্রথমে খ্রীষ্টান ছিলেন পরে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি কোরাণের ধর্ম্ম বিস্তৃত করিতে যাইয়া গ্রীক ও অন্যান্য লোকের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেন; কিন্তু তিনি অধিকদিন উৎপীড়ন করিতে অবসর পান নাই। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে যে দেশব্যাপী মহামারী (Plague) হয় তাহাতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গাজ্জালি—বিখ্যাত মুসলমান ডাক্তার। কথিত আছে যে, ইনি ৯৯ খানি চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; ইহার অধিকাংশ আরবী ভাষায় লিখিত এবং কয়েকখানা পারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তুষ বা বর্ত্তমান মাসাদের অন্তর্গত গাজ্জালা নামক গ্রামে ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১১১ খৃষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর দেহত্যাগ করেন।

গেটে—(Johaun Wolfgang Von Goethe) ইনি বিগত ১৮শ শতাব্দীর জর্ম্মাণ সাহিত্য ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত কবি। ইঁহাকে জর্ম্মাণ কবিগণের রাজা বলা যাইতে পারে। ভারতে যেমন কালিদাস, ইংলণ্ডে যেমন সেক্‌স্‌পীয়র, জর্ম্মণীতে তেমনি গেটে। লর্ড বাইরণ গেটে সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "Who for fifty years, has been the undisputed sovereign of European literature" (অর্থাৎ যিনি ৫০ বৎসর কাল ইয়োরোপীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিসংবাদিতরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন)। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর অন্তর্গত ফ্রাঙ্কফোর্ট (Frankfort--on-the-main) নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জোহান কেস্‌পার গেটে (Johaun Kaspar Goethe) তদানীন্তন জর্ম্মাণগবর্ণমেণ্টের আইন-উপদেষ্টা ছিলেন এবং একজন সমৃদ্ধিশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৫শ বর্ষ বয়সে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি লিপ্‌জিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। এখানে তিনি পাঠাভ্যাসে বেশী মনোযোগ দেন নাই; তাঁহার প্রকৃতিও একটু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে; এজন্য তাঁহার পিতা

তাঁহাকে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ইহার দুই বৎসর পরে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ষ্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হয়; কিন্তু রসায়ন ও দর্শন শাস্ত্র আলোচনাতে এবং সেক্‌স্‌পীয়র ও রুসোর গ্রন্থ নিচয়ের অধ্যয়নেই তাঁহার মন আইন অপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইত। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি আইনে ডাক্তার উপাধি (Doctor of Law) লাভ করেন। এই উপাধি লাভ করিয়া তিনি ওয়েজলার (Wetzlar) নামক স্থানে গমন করেন। এই স্থানে জেরুজেলেম (Jerusalam) নামে একটি যুবক কোন যুবতীর প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা দর্শনে আইনজ্ঞ ডাক্তারের মন কাব্যজগতে প্রধাবিত হয়। তিনি উক্ত ঘটনা অবলম্বনে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্থারের দুঃখ (Woes of Werther) নামে এক খানি নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকখানা জনসাধারণের অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সেক্‌স উইমার (Saxe-Weimer) নামক স্থানের গ্রাণ্ড ডিউক কার্ল অগাষ্টের (Karl August) জমীদারিতে এক কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। উক্ত ডিউক কবিকে নানা সম্মানে বিভূষিত করেন। এক্ষণ হইতে তিনি উইমারেই থাকিতেন। এই ক্ষুদ্র রাজধানীটি প্রাচীন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের ন্যায় জর্ম্মণীর শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখানে তাঁহার উপর রঙ্গমঞ্চের (Theatre) তত্ত্বাবধান ন্যস্ত হয়। এই সময়েই তিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কাব্য "ফষ্ট" (Faust) রচনা করেন। ফষ্ট একখানা উৎকৃষ্ট জর্ম্মাণ কাব্য; ইহাকে এক হিসাবে নাটকও বলা যায়, যেহেতু ইহা নাটকীয় চিত্রে পরিপূর্ণ। ফষ্ট ছাড়া অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য তিনি এই স্থানে থাকিয়াই রচনা করেন। Tasso, Iphigenia in Tauris, Stella, Count Egmont এবং Venetian and Roman Elegies, এগুলি কবি প্রণীত শ্রেষ্ঠ কাব্য। শেষোক্ত কাব্য খানির নায়িকা (Christiana Vulpius) ক্রিষ্টিয়ান ভালপায়াস নাম্নী এক রূপলাবণ্যবতী রমণী। কবি এই রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ৫৫ বর্ষবয়সে ইঁহাকে বিবাহ করেন। এই রমণীর সহিত যথাশাস্ত্র বিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বেই ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার গর্ভে কবির জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করে। কবি স্বীয় প্রণয়িনীকেই স্বীয় কাব্যের নায়িকা করিয়াছেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কবি উইমার (Weimer) পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসর কাল ইটালীর বিভিন্ন নগরে ভ্রমণ করেন। ইটালী পরিভ্রমণের ফলে তিনি Iphigenia, Egmont, Tasso এবং Venetian ও Roman Elegies রচনা করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রাণ্ড ডিউকের সহিত ফরাসী রাজ্যে যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উক্ত গ্রাণ্ড ডিউক তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে (Minister) নিযুক্ত করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সম্রাট্ আলেকজেণ্ডার তাঁহাকে "Alexander Nevsky" এবং বিখ্যাত ফরাসী সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন "Grand Cross of the Legeon of Honour" নামক উপাধি দান করেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা গ্রাণ্ড ডিউক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে কবি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে কাল কর্ত্তন করিতে থাকেন এব ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

জাফর সাদেক—(অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ জাফর) ইঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ বাকির (Muhammad Baqir) ইনি ৬ষ্ঠ ইমাম বলিয়া পরিচিত। ইনি ৭০২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এই সহরেই ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য সকলের সম্মানার্হ ছিলেন। খলিফা আল-মনসুর উপদেশ লাভের জন্য তাঁহাকে নিজ রাজসভায় আহ্বান করেন। জাফর সাদেক খলিফাকে বলিয়া পাঠান, "যে ব্যক্তি সংসারাসক্ত তিনি আপনাকে কখনও মন খুলিয়া উপদেশ দিবেন না; আর যিনি সংসার অসার জ্ঞান করিয়া পারলৌকিক চিন্তায় নিমগ্ন তিনি কখনও আপনার সাহচর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছুক নন।" খলিফা ইঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ফালনামা (Fal Nama) নামে একখানা গ্রন্থ লিখেন। প্রথম খলিফা আবুবেকরের পৌত্র কাসিম; কাসিমের কন্যা উম্মফারওয়া (Umne Farwah) জাফর সাদেকের জননী।

জামি—বিখ্যাত পারস্য কবি। ইঁহার পিতার নাম মৌলানা মোহাম্মদ ইস্পাহানি। ইনি ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই

নবেম্বর হিরাটের অন্তর্গত "জাম" (Jam) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জামগ্রামে জন্মেন বলিয়া তাঁহাকে জামি বলা হইত; তাহার প্রকৃত নাম নূরউদ্দিন আব্দুর রহমান। তিনি অতিশয় বিনীত ও জ্ঞানী ছিলেন। লোকে মনে করিত যে, তাঁহার স্তায় পারস্তভাষাভিজ্ঞ লোক তৎকালে পারস্তে বর্ত্তমান ছিল না। হিরাটের সুলতান আবু সৈয়দ-মির্জ্জার সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি পারস্ত কবিদিগের জীবনী লেখক দৌলত শাহের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। উক্ত জীবনীলেখক তদীয় জীবনী গ্রন্থে জামির জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যোসেফ ও জালি খাঁর প্রণয় ব্যাপার অবলম্বন করিয়া পারস্তভাষায় এক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য লিখেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রোস্তম—পারস্তের পৌরাণিক ইতিহাসে এই প্রসিদ্ধ বীর পুরুষের নাম দৃষ্ট হয়। ইনি জুবিলিস্তানের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম জাল (Zal) এবং পিতামহ সাম (Sam)। ইনি কস্তানীয় রাজবংশের ৬ষ্ঠ রাজা বাহমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

লোকমান হাকিম (Luqman Hakim – য়িহুদীদিগের রাজা ডেভিডের সমকালবর্ত্তী লোক। ইনি খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত ধর্ম্মনীতিজ্ঞান-সম্পন্ন এবং ঈশ্বর-পরায়ণ লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহাম্মদও কোরাণের ৩১শ অধ্যায়ে ইঁহার বিষয় গভীর শ্রদ্ধাসহকারে লিখিয়া গিয়াছেন। কোরাণের এই অধ্যায়ের নাম "সুরা লোকমান"। লোকমানের উপদেশমালাতে ১০ হাজার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আছে। কথিত আছে যে, স্বয়ং পরমেশ্বর লোকমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। লোকমান ব্যবসায়ে সূত্রধর ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু লোকমান তাঁহার পৈতৃক সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করাতে ঈশ্বর তাহাতেই সম্মতি দিয়াছিলেন।

সল্মান্ ফারসি—(Salman Farsi) ইনি ইস্পাহানের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে এবং তিনি সত্যধর্ম্মের অন্বেষণে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। অবশেষে মক্কা নগরীতে গমন করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মই তাঁহার নিকট সত্যধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ইনি মোহাম্মদকে তদীয় ধর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি পারস্তের অন্তর্গত মদাইন (Madain) নামক স্থানে ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

সাফী (ইমাম)—ইঁহার প্রকৃত নাম আবু আব্দুল্লা মোহাম্মদ বিন্ ইদ্রিস্। ইনি সুন্নি সম্প্রদায়ের তৃতীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। মোহাম্মদের পিতামহ আব্দুল মোত্তালিবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ডাক্তার "ইমাম-উল-মোতালিব" এই উপনাম প্রাপ্ত হন। প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত ঘাজা (Ghaza) নামক নগরে ৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মদিনে আবু হানিফার মৃত্যু হয়। ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার মিশরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুন্নিসম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁহাকে পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী বলিয়া জানেন।

সেল্জুক্—একজন বিখ্যাত তাতার সর্দ্দার। ইনি দলবলসহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি ১০৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহার জীবদ্দশায় ইঁহার একমাত্র পুত্র মিকাইলের (Mikail) মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ সেল্জুকের উপর মিকাইলের দুই পুত্র তুগ্রল (Tughral) ও জাফরের (Jafar) ভরণপোষণের ভার পতিত হইল। পিতামহের যত্নে তুগ্রল বেগ ও জাফর বেগ বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই দুই ভ্রাতা গজনীর সুলতান মাহমুদের অধীনে দীর্ঘকাল চাকরি করেন। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের খলিফা তুগ্রল বেগকে খোরাসানের সুলতান পদে অভিষিক্ত করেন। তুগ্রল বেগই পারস্তে সেল্জুকবংশের প্রথম নরপতি। সেল্জুক্ বংশের কাদার্দ কিরমানের প্রথম রাজা এবং ঐ বংশের সুলেমান রুম বা এনাটোলিয়ার প্রথম সুলতান হইয়াছিলেন।